জেরুসালেম

ওয়ান সিটি থ্রি ফেইথস
(এক নগরী তিন ধর্ম)

ক্যারেন আর্মস্ট্রং

অনুবাদ : মোহাম্মদ হাসান শরীফ

জেরুসালেম- ওয়ান সিটি থ্রি ফেইস

ক্যারেন আর্মস্ট্রং

আরো বই সংগ্রহ করুন

কিন্ডল বাংলা

https://kindlebangla.com

কিন্ডলবাংলা যদিও একটি ডিজিটাল লাইব্রেরী, কিন্ডলবাংলা তার সম্মানিত পাঠকদের বইয়ের হার্ডকপি কিনে পড়ার জন্য সুপারিশ করে। যাতে লেখক এবং প্রকাশক উভয়েরই স্বার্থ রক্ষিত হয়।

সূচীপত্র

অনুবাদ – মোহাম্মদ হাসান শরীফ

প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০১৯

অনুবাদ উৎসর্গ

শিক্ষকতুল্য জনাব দীন মোহাম্মদকে

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

লেখালেখি একটি নিঃসঙ্গ ও অনেক সময় একাকী চলার পেশা হলেও সমর্থন ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমার এজেন্ট ফেলিসিটি ব্রায়ান, পিটার গিনসবার্গ ও অ্যান্ড্রু নুর্নবার্গ এবং সেইসাথে সম্পাদক জেন গ্যারেট ও স্টুয়ার্ট পোফিটকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষজ্ঞসুলভ মূল্যায়ন, ধৈর্য, পরামর্শ ও সহায়তার জন্য রজার বোয়স, ক্লেয়ার ব্র্যাডলি, জুলিয়েট ব্রাইটমোর, ক্যাথেরিন হরিগান, টেড জনসন, অ্যানথিয়া লিঙ্গম্যান, জোনাথন ম্যাগোনেট, টবি মান্ডি ও মেলভিন রোসেনথালের প্রতিও কৃতজ্ঞ। সবশেষে ধন্যবাদ জানাব ব্যালান্টাইনে আমার পূর্বতন সম্পাদক জুলি ডেলবারগোকে। তিনিই আমাকে এ নিয়ে বই লিখতে প্রথম পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি সবসময় আমাকে বিপুল উদ্দীপনা আর উৎসাহ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

বাংলা সংস্করণ নিয়ে কিছু কথা

জেরুসালেম। সম্ভবত ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় থেকে শব্দটি আমার পরিচিত। সময় গড়ানোর সাথে সাথে নানাভাবে নগরীটি সম্পর্কে ধারণা বাড়তে থাকে। পরে সাংবাদিকতায় জড়িয়ে পড়লে এ সম্পর্কে আগ্রহ আরো বাড়ে। প্রতিনিয়তই নতুন নতুন রূপে ধরা দিতে থাকে এই নগরী। আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে জেরুসালেমের ইতিহাস এখন অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। প্রতিনিয়তই জেরুসালেম থাকছে খবরের পাতায়। ফলে জেরুসালেম : দি বায়োগ্রাফি কিংবা জেরুসালেম : ওয়ান সিটি থ্রি ফেইথস বইগুলো আমাকে স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রমুগ্ধ করে।

জেরুসালেমের প্রতি যত শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে কিংবা একে নিয়ে যত বিতর্ক, বিরোধ, যুদ্ধ হয়েছে- তা অন্য কোনো নগরীর ক্ষেত্রে ঘটেনি। তিন ইব্রাহিমি ধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই নগরী। ইতিহাসের আগে থেকেই এই নগরী আলোচনায় থাকলেও এখনকার সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে জেরুসালেম প্রবলভাবে আলোর মধ্যে থাকছে।

ফলে জেরুসালেম নিয়ে লেখা যেকোনো বইই যথেষ্ট গুরুত্ব পাবে। তবে লেখক যদি ক্যারেন আর্মস্ট্রংয়ের মতো কেউ হন, তবে এটি আরো বেশি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তার লেখা হিস্টোরি অফ গড, দি ব্যাটল ফর গড, হলি ওয়ার, ইসলাম, বুদ্ধ, এন্ড দি গ্রেট ট্রান্সফরম্যাশন এবং দুটি স্মৃতিকথা: থ্রু দ্য ন্যারো গেইট এবং দি স্পাইরাল স্টেয়ারকেস ইত্যাদি বইগুলো বিশ্বজুড়ে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। এ বইটি তারই লেখা। আরো আগেই এটি অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল।

লেখক বস্তুনিষ্ঠভাবে একেবারে শুরু থেকেই জেরুসালেমের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। সত্য প্রকাশে তিনি বেশ কঠোরতাই অবলম্বন করেছেন। কে খুশি হলো, কে নাখোশ হলো- সে দিকে পরোয়া করেছেন সামান্যই। জেরুসালেমের নামটি কিভাবে এলো, কিভাবে ইহুদি সম্প্রদায়ের সাথে এই নগরী সম্পৃক্ত হলো, তাদের আগে এখানে কারা বসবাস করত, এখনকার অধিবাসীদের সাথে তাদের সম্পর্ক কী, খ্রিস্টানরা কিভাবে নগরীর সাথে যুক্ত হলো, মুসলিমরা কেন নগরীর প্রতি এত আকর্ষণ অনুভব করে, সবই তিনি সামনে নিয়ে এসেছেন।

হানাহানির এই সবার সহাবস্থান নিশ্চিত করা যায় কিভাবে, বিশেষ করে জেরুসালেমে শান্তি কিভাবে আসতে পারে। সে দিকেই পাঠককে নিয়ে যেতে চেয়েছেন তিনি। বলতে চেয়েছেন, জেরুসালেমই হতে পারে শান্তির মডেল। যুগে যুগে নবী, স্বপ্নদ্রষ্টারা আসলে শান্তির বাণীই প্রচার করতে চেয়েছেন। তারা ধর্মের কথা বলেছেন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, ধর্ম অশান্তির বাহন নয়। বরং স্বার্থন্বেষী কিছু লোক ধর্মের অপব্যাখ্যা করে অশান্তি সৃষ্টি করেছে।

তিনি জোরালোভাবে বলেছেন, প্রাচীন দুনিয়ায় ন্যায়বিচারের মতবাদ কোনো ধার্মিক স্বপ্ন নয়, বরং সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারণার মধ্যেই তা নিহিত ছিল। সামাজিক অস্থিরতার কারণে রাজ্যের পতন ঘটত। প্রজাদের ওপর বিপুল বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থার কারণে সেই খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতকে উগারিতের পতন ঘটেছিল।

তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, প্রবল শক্তি নিয়ে জেরুসালেমের ওপর আছড়ে পড়েছিল ক্রুসেড বাহিনী। কিন্তু তাদের পতন হলো কেন? তারা যিশুখ্রিস্টের ভালোবাসার বাণীকে গ্রহণ করেনি। তারা ভয়ঙ্কর খুনি মনোবৃত্তি নিয়ে মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জয়ও তারা পেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। তার মতে, ক্রুসেড ছিল ভয়ানক, ভীতিকর, বিপজ্জনক ও ব্যয়বহুল। তাতে লাভ হয়নি কিছুই, কিন্তু ক্ষতি হয়েছে বিপুল।

তিনি বর্তমান ইহুদি রাষ্ট্রটিকেও একইভাবে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, তারা যদি সবাইকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ না করে, তবে তাদের পতন অনিবার্য। আপস করার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ।

তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে হজরত ওমর ও গাজী সালাহউদ্দিনের উদারতার কথা তুলে ধরেছেন। বিপুল বিজয়ের পরও তারা যে শান্তি আর সবাইকে নিয়ে সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করেছিলেন, কেবল জেরুসালেম কেন, পৃথিবীর ইতিহাসেই তা বিরল। তিনি দেখিয়েছেন, হজরত ওমরের সময় খ্রিস্টানরা আত্মসমর্পণ করার পর কোনো হত্যাকাণ্ড, সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়নি, প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মীয় নিদর্শনে অগ্নিসংযোগ করা হয়নি, কোনো

বহিষ্কার বা সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ হয়নি, অধিবাসীদের বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়নি। নগরীর পূর্ববর্তী অধিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন যদি একেশ্বরবাদী শক্তির পূর্ণাঙ্গ প্রকাশক হয়ে থাকে, তবে বলতে হবে জেরুসালেমে ইসলাম তার দীর্ঘ শাসনকাল ঠিক সেভাবেই শুরু করেছিল।

সালাহউদ্দিনের কথাও তিনি বলেছেন মুগ্ধভাবে। তিনি আমাদের জানাচ্ছেন, মুসলিমেরা ১১৮৭ সালের ২ অক্টোবর যখন নবীর মিরাজ ও ইসরা উদযাপন করছিল তখন সালাহউদ্দিন ও তার সৈন্যরা বিজয়ী বেশে জেরুসালেমে প্রবেশ করলেন। সুলতান তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। একজন খ্রিস্টানকেও হত্যা করা হয়নি। ব্যারনরা সহজেই তাদের মুক্তিপণ আদায় করেছিল, তবে গরিব মানুষরা পারেনি। তারা যুদ্ধবন্দি হয়। অবশ্য বিপুলসংখ্যককে মুক্তি দেওয়া হয়। কারণ দাসত্বের কারণে আলাদা হয়ে যাওয়া পরিবারগুলোর দুর্দশা দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন সালাহউদ্দিন। সালাহউদ্দিনের ভাই আল-আদিলও এত বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন যে তার নিজের ব্যবহারের জন্য রাখা এক হাজার বন্দিকে তিনি সাথে সাথে মুক্ত করে দেন। প্রতিটি মুসলমান কল্পনাতীত কষ্ট পেয়েছিলেন এটি দেখে যে ধনী খ্রিস্টানরা তাদের স্বদেশী লোকদের মুক্তিপণ দেওয়ার কোনো চেষ্টা না করেই তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে পালাচ্ছে। মুসলিম ইতিহাসবিদ ইমাদ উদ্দিন যখন দেখলেন যে প্যাট্রিয়ার্ক হেরাক্লিয়াসের গাড়ির ঘোড়াগুলো তার সম্পদের ভারে গোঙাচ্ছে, তখন তিনি সালাহউদ্দিনের কাছে অনুনয় করেছিলেন ওইসব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বাকি বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে। কিন্তু সালাহউদ্দিন তা করতে অস্বীকার করেন এই যুক্তিতে যে শপথ ও চুক্তি অবশ্যই আক্ষরিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ‘খ্রিস্টানরা সবখানে তাদের প্রতি দেখানো দয়ার কথা স্মরণ করবে।’ সালাহউদ্দিন ঠিক কথাই বলেছিলেন। পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানরা অস্বস্তিকরভাবে অবগত ছিলেন যে তাদের নিজস্ব ক্রুসেডারেরা জেরুসালেম জয়ের সময় যা করেছিল এই শাসক তাদের সাথে তার চেয়ে অনেক বেশি ‘খ্রিস্টান’ আচরণ করেছেন। তারা নানা কিংবদন্তি সৃষ্টি করে তাকে নিয়ে।

জেরুসালেমের কথা বলতে বলতে লেখক ইহুদি, খ্রিস্টান, ইসলাম- এই তিন ধর্মের উৎস, বিবর্তন চমৎকারভাবে সামনে নিয়ে এসেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে জেরুসালেম বারবার

ধ্বংস হয়েছে, সেই ধ্বংস্তুপ থেকে আবারো জেগে ওঠেছে। শান্তির বাণী ঘোষণা করেছে।

আমাদের কী শিক্ষা দেয় জেরুসালেম? এই ঐশী নগরী আমাদের শিক্ষা দেয় হাল না ছাড়ার। যতই শক্তিশালী উৎপীড়ক হোক না কেন, তার পতন অনিবার্য। কেবল শান্তি, সহানুভূতি, দয়ার শক্তিই চূড়ান্তভাবে জয়ী হয়। সব ধর্ম এই শিক্ষাই দেয়। কেবল এটিই আনতে পারে পরম শান্তি।

এই অনুবাদে দি কোরআনকে পবিত্র কোরআন, মোহাম্মদকে মুহাম্মদ (সা.), সালাদিনকে সালাহউদ্দিন হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। প্রচলিত দামেস্ক না লিখে দামাস্কাস লেখা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের মানুষের একটি বড় অংশ নগরীটিকে জেরুজালেম নামে চেনে। অথচ নগরীর নাম 'জেরুসালেম'।

বইটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ। এ ধরনের বই যত বেশি প্রকাশ পাবে, ততই মঙ্গল।

বইটি উৎসর্গ করার মাধ্যমে দীন মুহাম্মদ ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তার সাথে যখন আমার পরিচয়, তখন তিনি সরকারি চাকরি জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন, আর আমিও কর্মজীবনের মাঝামাঝি পর্যায়ে। তবুও তার কাছ থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। কিন্তু হঠাৎ করে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যাওয়া আমার জন্য ছিল খুবই কষ্টদায়ক। অনুমতি চাইলে দেবেন না- কাজেই বিনা অনুমতিতেই তার নামে বইটি উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বইটি অনুবাদের কাজ করার সময় সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে কঠিন কিছু অধ্যায় অতিক্রম করেছি। ফলে এসবের ছায়াও অবচেতনভাবে এতে পড়ে থাকতে পারে। বিষয়টিকে ক্ষমাসুন্দরভাবে দেখার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

মোহাম্মদ হাসান শরীফ

সূচনা

আমি অন্য যেকোনো জায়গার চেয়ে জেরুসালেমেই সবচেয়ে বেশি সফর করেছি, এই স্থানেই ইতিহাস থাকে বর্তমানের ব্যাপ্তিতে। যেকোনো বিরোধপূর্ণ এলাকার ক্ষেত্রেই বিষয়টি সম্ভবত প্রযোজ্য। তবে ১৯৮৩ সালে আমি যখন কাজ করতে প্রথমবারের জেরুসালেম যাই, তখনই নগরীটি আমাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। প্রথমত এর প্রতি নিজের প্রতিক্রিয়ার শক্তি দেখে অবাক হয়েছিলাম। একেবারে শৈশব থেকে দাউদ নবী (কিং ডেভিড) বা যিশু সম্পর্কে যেসব কাহিনী শুনে আসছিলাম, আমার জীবনের কল্পণাপ্রবণ বাস্তবতায় থাকা সেই স্থানে হাঁটতে পারাটা ছিল অবাক করা বিষয়। তরুণ নান হিসেবে ধ্যানমগ্ন থাকার সময় মনে গেঁথে থাকা বাইবেলের ছবি ভাবার শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল আমাকে। ফলে গেথসেম্যান গার্ডেন, মাউন্ট অলিভেস কিংবা ভায়া ডোলোরোসা মনের ভেতর থেকে বের হয়ে এলো। এখন প্রতিদিন ওইসব এলাকা দিয়ে যাতায়াতের সময় আবিষ্কার করেছিলাম যে প্রকৃত স্থানটি অনেক বেশি বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্তিকর। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, আমাকে হজন করতে হলো যে জেরুসালেম ইহুদি ও মুসলিমদের কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঢোলা হাতার জামা পরা ইহুদিদের বা কঠোর দর্শন ইসরাইলি সৈন্যদের ওয়েস্টার্ন ওয়ালের পাথরে চুমু খেতে দেখে কিংবা মুসলিম পরিবারগুলোকে সবচেয়ে ভালো পোশাক পরে হারাম আল-শরিফে জুমার নামাজ পড়তে যেতে দেখে আমি প্রথবারের মতো ধর্মীয় বহুত্ববাদের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতন হলাম। লোকজন একই নিদর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখতে পারে। আমার জেরুসালেমে তারা ছিল পুরোপুরি অনুপস্থিত, অথচ এসব লোকের প্রত্যেকেই যে তাদের পবিত্র নগরীর সাথে সম্পৃক্ত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও নগরীটি আমারও হয়ে গেছে। ২০ শতকের জেরুসালেমের সাথে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সময় আমার পুরনো বাইবেলিক ছবি সার্বক্ষণিক মিশে ছিল। যেভাবেই হোক না কেন, আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর সাথে সম্পৃক্ত জেরুসালেম আমার স্বকীয় পরিচিতিও গড়ে দিয়েছিল।

অবশ্য ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে নগরীর ওপর আমার কোনো রাজনৈতিক দাবি ছিল না। অবশ্য জেরুসালেমে আমার নতুন সহকর্মী ও বন্ধুদের তা ছিল। আবারো বলছি, ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনিরা আমার সামনে যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করার সময় অতীত ঘটনাবলীর তরতাজাভাবে বিরাজ করতে দেখে হতবাক হয়েছি। সবাই, অনেক সময় একেবারে নিখুঁতভাবে, ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টি, ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনাগুলো বলতে পারত। আমি প্রায়ই লক্ষ করেছি যে অতীত নিয়ে এসব ভাষ্য কেন্দ্রভূত রয়েছে এই প্রশ্নের ওপর যে ওই প্রথম কাজটি কে করেছে? কারা প্রথম সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছিল : জায়নবাদীরা না আরবরা? কারা প্রথম ফিলিস্তিনের সম্ভাবনা দেশটিকে উন্নত করার সম্ভাবনা লক্ষ করেছিল? জেরুসালেমে প্রথমে কারা বাস করত : ইহুদিরা না ফিলিস্তিনিরা? গোলযোগপূর্ণ বর্তমান নিয়ে আলোচনা ওঠলেই ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনি উভয় পক্ষই সহজাতভাবেই অতীতের দিকে ফিরে যায়, বিতর্ক চলে ব্রোঞ্জ যুগ থেকে মধ্য যুগ হয়ে বিশ শতকে। আবারো বলছি, ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনিরা বেশ গর্বভরেই আমাকে তাদের নগরী দেখিয়েছিল, প্রতিটি স্মারক সৌধই সঙ্ঘাত সৃষ্টি করছিল।

জেরুসালেমে আমার প্রথম সকালে আমাকে আমার ইসরাইলি সহকর্মীরা দেখিয়ে দিয়েছিল অনেক নিচুতে থাকা বিশেষ ধরনের খাড়া প্রান্ত দেখে রাজা হেরডের ব্যবহার করা পাথরগুলো চেনা যায়। এসব পাথরই দৃশ্যপটে ইসলামের আগমনের অনেক অনেক আগে সেই খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে জেরুসালেমে ইহুদিদের অস্তিত্ব থাকার সর্বব্যাপী ও স্থায়ী প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুরনো নগরীর নির্মাণকর্মীদের অতিক্রম করার সময় আমাকে বারবার বলা হয়েছে, উসমানিয়ারা তাদের শাসনকালে কত চরমভাবে নগরীটিকে অবহেলা করেছিল। ১৯ শতকে নগরীটি আবার প্রাণ ফিরে পায়। আর এর পেছনে অবদান ছিল প্রধানত ইহুদি বিনিয়োগের। এর প্রমাণ হলো স্যার মোজেজ মন্টেফিয়রের তৈরি উইন্ডমিল ও রথচাইল্ড পরিবারের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল। আর ইসরাইলের কারণেই নগরীটি এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ।

আমার ফিলিস্তিনি বন্ধুরা আমাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জেরুসালেম দেখিয়েছেন। তারা জেরুসালেমের প্রতি মুসলিমদের দায়বদ্ধতার প্রমাণ হিসেবে হারাম আল- শরিফের

চমৎকারিত্ব, এবং এর চারধারে মামলুকদের নির্মিত নান্দনিক মাদরাসার দেখায়। তারা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জেরুসালেমকে রক্ষার জন্য জেরিকোর কাছে নবী মুসার উপাসনালয়, কাছাকাছি নির্মিত উমাইয়া আমলের প্রাসাদগুলোও দেখায়। আমরা যখন একবার বেথলেহেম যাচ্ছিলাম, তখন আমার ফিলিস্তিনি মেজবান গাড়িটি রাস্তার পাশে অবস্থিত রাচেলের কবর দেখাতে থামালেন। তিনি আবেগপূর্ণভাবে বললেন, ফিলিস্তিনিরা কয়েক শত বছর ধরে এই ইহুদি উপাসনালয়ের পরিচর্যা করেছে। তাদের এই পূণ্য কাজের বিনিময়ে কেবল তিরষ্কার পেয়েছেন।

একটি কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসছিল। এমনকি চরম সেক্যুলার ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনিরা পর্যন্ত উল্লেখ করছিল, জেরুসালেম তাদের জনসাধারণের কাছে ‘পবিত্র’। ফিলিস্তিনিরা নগরীটিকে বলে আল-কুদস বা ‘পবিত্র নগরী’। কিন্তু ইসরাইলিরা তাচ্ছিল্যভরে এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলে, জেরুসালেম প্রথমে ইহুদিদের কাছেই পবিত্র নগরী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল, এটি মুসলিমদের কাছে মক্কা ও মদিনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়নি কখনোই। তাহলে এই প্রেক্ষাপটে ‘পবিত্র’ শব্দটির মানে কী? ভ্রমপ্রবণ মানুষে পরিপূর্ণ এবং সবচেয়ে অপবিত্র কর্মকাণ্ডে ভরপুর স্রেফ একটি নগরী কিভাবে পবিত্র হতে পারে: কেন ঘোষিত যুদ্ধংদেহি নাস্তিক ইহুদিরাও পবিত্র নগরী নিয়ে ভাবে, ওয়েস্টার্ন ওয়াল পুরোপুরি দখল করার ব্যাপারে এত আগ্রহী? অবিশ্বাসী কোনো আরব যখন মসজিদ আল-আকসায় প্রথমবারের মতো দাঁড়ায়, তখন কেন সে কান্নায় ভেঙে পড়ে? খ্রিস্টানদের কাছে নগরীটি কেন পবিত্র তা আমি আনায়াসেই দেখতে পারি। কারণ জেরুসালেমেই যিশুর মৃত্যু ও সমাধি থেকে উত্থান হয়েছিল : এই নগরী এই বিশ্বাসের জন্ম প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু ইহুদি ও ইসলাম উভয় ধর্মের গঠনমূলক ঘটনাগুলো ঘটেছে জেরুসালেম থেকে অনেক অনেক দূরে : সিনাই উপত্যকায় কিংবা আরবের হিজাজে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যেখানে ঈশ্বর মুসাকে কিতাব দিলেন এবং ইসরাইলের সাথে তার চুক্তি করলেন সেই মাউন্ট সিনাইয়ের বদলে কেন জেরুসালেমের মাউন্ট জায়ন ইহুদিদের কাছে পবিত্র হলো? স্পষ্টভাবেই বলা যায়, এটি ধরে নেওয়া ভুল হবে যে পাপমোচন ইতিহাসের ঘটনাবলীর সাথে তথা মানুষের সাথে ঈশ্বরের যোগাযোগের পৌরাণিক ভাষ্যের সাথে সম্পৃক্ততার ওপর কোনো নগরীর পবিত্রতা নির্ভর

করে। পবিত্র নগরী বলতে কী বোঝায় তা খুঁজতেই আমি এই বইটি লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমি যা আবিষ্কার করেছি তা হলো, জেরুসালেমের সাথে 'পবিত্র' শব্দটি তেমন ভাবনা চিন্তা না করে অবাধে সংযুক্ত করা হলেও (স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নিয়ে), বাস্তবে বিষয়টি বেশ জটিল। তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রতিটিই যেসব ঐতিহ্য বিনির্মাণ করেছে, সেগুলোর মধ্যে ব্যাপক মিল রয়েছে। তাছাড়া, কোনো পবিত্র স্থান বা কোনো পবিত্র নগরীর প্রতি ভক্তি প্রায়-সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য। ধর্মের ইতিহাসবিদেরা বিশ্বাস করেন, সব সংস্কৃতিতেই এটি হলো বিশ্বাসের আদিতম প্রকাশ। লোকজন যেটিকে পবিত্র ভূগোল হিসেবে অভিহিত করে, বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মানচিত্রে এর কিছুই করার নেই, বিষয়টি আসলে অন্তরের ব্যাপার। পার্থিব নগরী, উপবন, পর্বতমালা এই আধ্যাত্মিকতার নিদর্শনে পরিণত হয়। 'ঈশ্বর' বা অতিপ্রাকৃতিক দুনিয়া সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, এগুলো এতই প্রবলভাবে উপস্থিত থাকে যে মনে হয়, এটি মানুষের অনিবার্য প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত। নানা কারণে জেরুসালেম ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমদের পবিত্র ভূগোলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এর ফলে তাদের পক্ষে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নগরীটিকে দেখা খুবই কঠিন করে তুলেছে। কারণ ওই বিশ্বাস তাদের নিজেদের সম্পর্কে ধারণা এবং আমাদের নশ্বর দুনিয়াকে অর্থ ও মূল্য প্রদানকারী 'ঈশ্বর' বা ঐশী সত্তা হিসেবে অভিহিত চূড়ান্ত বাস্তবতাকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে।

তিনটি পরস্পরভাবে সংযুক্ত ধারণা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বারবার আসবে। প্রথমটি হলো ঈশ্বর বা ঐশী সত্তা-সম্পর্কিত সামগ্রিক ধারণা। পাশ্চাত্য বিশ্বে আমরা ঈশ্বরকে মনুষ্যমূলক ও ব্যক্তিকভাবে দেখতে অভ্যস্ত হওয়ায় ঐশী-সম্পর্কিত পুরো ধারণাটি প্রায়ই অসংলগ্ন ও অবিশ্বাস্য হিসেবে আবির্ভূত হয়। 'ঈশ্বর' শব্দটিতে অতি সরলতা এবং তার' নামে অনেক অগ্রহণযোগ্য কাজ হয় বলে অনেকের কাছে প্রত্যাখ্যাত। এ কারণে এর বদলে 'ঐশী সত্তা' পরিভাষাটির ব্যবহারই অনেক সহজ। বিশ্ব নিয়ে বিশ্লেষণের সময় মানুষ সবসময়ই অস্তিত্বের কেন্দ্রে থাকা অতিলৌকিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মুখে পড়ে। তারা মনে করে, পরিভাষাটি তাদের সাথে এবং প্রাকৃতিক বিশ্বের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

তাদের মতে, পরিভাষাটি কেবল এখানেই সীমিত না থেকে আরো অনেক দূর ছাড়িয়ে যায়। আমরা তাকে ঈশ্বর, ব্রাহ্মণ বা নির্বাণ- যে নামেই ডাকি না কেন, অতিলৌকিকতা মানবজীবনেরই অংশবিশেষ। আমাদের ধর্মতাত্ত্বিক মতামত যা-ই হোক না কেন, আমরা সবাই এ ধরনের কিছু জিনিসের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, কখনো সুন্দর কোনো কবিতা পড়ে, কখনো চমৎকার গান শুনে আমরা নিজেদের মধ্যে থেকেই ক্ষণিকের জন্য নিজেদের ছাড়িয়ে গেছি। আমরা এই অভিজ্ঞতা খুঁজে ফিরি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চার্চ বা সিনাগগ বা অন্য কোথাও এই অভিজ্ঞতা না পেলে অন্য স্থানে যাই। ঐশী সত্তার অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় অনেকভাবে : ভয়, ভীতি, উদ্দীপনা, শান্তি, ভয়ঙ্কর কিছু ও নৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তা জেগে ওঠে। এটি আমাদের সম্পূর্ণভাবে আরো পূর্ণাঙ্গ, সম্প্রসারিত অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করে, আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। এটি কেবল ‘চরম বা অতি অস্বাভাবিক’ শক্তিই নয়, এটি আমাদের নিজের ভেতরে অনেক গভীরে লুকিয়ে আছে। তবে নান্দনিক অভিজ্ঞতার মতো, ঐশী সত্তাকে অনুভব করার জন্যও পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। আমাদের আধুনিক সেক্যুলার সমাজে এটি সবসময় অগ্রাধিকার না পাওয়ায় অনেক অব্যবহৃত সামর্থ্যের মতো এটিও শুকিয়ে যায়। যেসব সমাজ অনেক বেশি ঐতিহ্যবাদী, সেখানে ঐশী সত্তাকে উপলব্ধি করার সামর্থ্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। সত্যিকার অর্থে, ঐশী অনুভূতি ছাড়া লোকজন অনেক সময়ই বেঁচে থাকাকেই মূল্যহীন মনে করে।

এর আংশিক কারণ হলো, মানুষ সবসময়ই দুনিয়াকে বেদনাপূর্ণ স্থান হিসেবে মনে করে। আমরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মৃত্যু, বিলুপ্ত হওয়া, অপরদের অবিচার ও নৃশংসতার শিকার হই। ধর্মীয় অনুসন্ধানে সবসময়ই শুরু করা হয় এই ধারণা দিয়ে যে, কিছু একটা ভুল হচ্ছে। বৌদ্ধ এ কথাটিই বলেছিলেন ‘অস্তিত্বই অস্বাভাবিক বিষয়।’ আমাদের কষ্ট দেয়, এমন অভিন্ন আঘাত ছাড়াও আমরা সবাই ব্যক্তিগত মর্মপীড়ায় আক্রান্ত হই, যা অগুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয় মনে হলেও পুরোপুরি বিধ্বস্ত করে দেয়। পরিত্যক্ত হওয়ার অনুভূতি যেমন ঘনিষ্ঠ স্বজনের মৃত্যু, বিবাহবিচ্ছেদ, বন্ধুত্বের অবসান কিংবা এমনকি প্রিয় বস্তুকে হারানোও অনেক সময় অপরিহার্য ও সার্বলৌকিক সঙ্কটের মতো অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। অনেক সময় এই ভেতরের রোগটি বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি হিসেবে প্রকট হয়ে ওঠে। মনে হয়, আমাদের জীবন থেকে কিছু হারিয়ে যাচ্ছে; অস্তিত্ব মনে হয় একেবারে তুচ্ছ বিষয়,

অসম্পূর্ণ ব্যাপার। আমাদের মধ্যে এমন অপরিণত অনুভূতিও থাকে যে জীবনের কোনো মানেই নেই এবং মৃত্যুর মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে, এমনকি যদিও বিষয়টি যৌক্তিকভাবে বোঝাতে পারি না। হারানোর এই অনুভূতি বিভিন্নভাবে সামনে আসে। যমজ আত্মাবিষয়ক প্লেটোনিক ধারণা সৃষ্টি হয় এ নিয়ে। আমাদের মনে হতে থাকে, জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, হারানো স্বর্গের সার্বজনীন কল্পকথায় আমরা মজে থাকি। আগের শতকগুলোতে নারী- পুরুষেরা এই বেদনা থেকে মুক্তি পেতেই ধর্মের দিকে চলেছিল, ঐশী সত্তার মধ্যেই মুক্তির উপদান খুঁজেছে। পাশ্চাত্যে আজ লোকজন অনেক সময় মনোসমীক্ষণের আশ্রয় নিয়ে থাকে। এতে আরো বৈজ্ঞানিক অবয়বে আদি বিচ্ছিন্নতার এই অনুভূতি প্রকাশ করে। ফলে এটি গর্ভকালীন স্মৃতি এবং জন্মের বেদনাদায়ক কষ্টের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। অবশ্য নিজেরাই এটিকে বেছে নিয়েছি। পবিত্র স্থানের প্রতি ভক্তি নিবেদনের কেন্দ্রে যা রয়েছে তা হলো আলাদা হওয়ার ও কারো সাথে পুনঃমিলনের আকাঙ্ক্ষা।

দ্বিতীয় যে ধারণাটি নিয়ে আমরা অবশ্যই আলোচনা করব, তা হলো মিথের প্রশ্নটি। লোকজন যখন ঐশী সত্তা নিয়ে বা মানব-অস্তিত্বের বেদনা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করে, তারা তখন যৌক্তিক, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, বরং তারা পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করে। এমনকি আত্মা অনুসন্ধানের কথাকথিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথিকৃত হিসেবে পরিচিত ফ্রাউড ও জাঙ পর্যন্ত অন্তরাত্মার বিষয়াদি প্রকাশের চেষ্টার সময় ক্লাসিক্যাল জগতের মিথ বা ধর্মের দ্বারস্থ হয়েছেন। তারা আসলে তাদের নিজেদের মতো করে নতুন মিথ গড়ে নিয়েছেন। বর্তমান ‘মিথ’ শব্দটি আমাদের সংস্কৃতিতে মূল্য অনেক হারিয়ে ফেলেছে। অনেক সময়ই এটি সত্য নয়, এমন ঘটনা বোঝাতে এ পরিভাষা প্রয়োগ করা হয়। ‘স্রেফ’ মিথ বলেই ঘটনাগুলোকে খারিজ করে দেওয়া হয়। জেরুসালেম নিয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই সত্য। ফিলিস্তিনিরা দাবি করে, রাজা দাউদের প্রতিষ্ঠিত ইহুদি রাজ্যের কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই এবং সোলায়মানের টেম্পলের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ইসরাইল রাজ্যের উল্লেখ সমসাময়িক কোনো গ্রন্থে নেই, আছে কেবল বাইবেলে। ফলে এটি যে স্রেফ ‘মিথ’ তাই মনে হতে থাকে। ইসরাইলিরাও জেরুসালেমের হারাম আল-শরিফ থেকে নবী মুহাম্মদের

(সা.) সপ্তম আসমানে যাওয়ার কাহিনী প্রত্যাখ্যান করে। তারা বলে এই কাহিনীর উৎস আল-কুদসের প্রতি মুসলিম ভক্তির মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাদের মতে, মিরাজের কাহিনীর পুরোটাই নির্জলা মুর্খতা। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি, এখানে একটি বিষয় বিবেচনা করা না করার কারণেই এমনটি ঘটছে। সত্যিই ঘটেছে এমন ঐতিহাসিকভাবে সত্যায়িত ঘটনাগুলো বর্ণনা করার কোনো পরিকল্পনা পুরানতত্ত্বের কখনোই থাকে না। এটি হলো তাদের অন্তরাত্মাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রকাশের প্রয়াস কিংবা জোরালো যুক্তিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, এমন বাস্তবতাগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা। পুরানকে প্রাচীন কালের মনোস্তাত্ত্বিক বিষয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। কারণ অন্তরাত্মা এর মাধ্যমে নিজেকে বর্ণনা করে, যা খুবই রহস্যজনক হলেও আমাদের মোহাবিষ্ট করে। অর্থাৎ 'ঐশী সত্তার ভূগোল'-এর মিথগুলো অন্তরাত্মা সম্পর্কে সত্য কথা বলে। এগুলো মানব বেদনা ও আকাঙ্ক্ষার অস্পষ্ট উৎসগুলো স্পর্শ করার মাধ্যমে অত্যন্ত শক্তিশালী আবেগকে প্রকাশ করে। 'কেবল' মিথ হওয়ার কারণেই জেরুসালেম- সম্পর্কিত কাহিনীগুলোকে খারিজ করে দেওয়া উচিত নয়। মিথ হওয়ার কারণেই এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পৌরাণিক মর্যাদা লাভ করার কারণেই জেরুসালেম প্রশ্নটি বিস্ফোরক হয়েছে। বর্তমানে সঙ্ঘাতের উভয় পক্ষে থাকা লোকজনের ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রায়ই অধিকার ও সার্বভৌমত্ব, আবেগপূর্ণ কাহিনী থেকে দূরে গিয়ে যৌক্তিক হওয়ার আহ্বান জানানোর মধ্যে বিস্ময়কর কিছু নেই। যৌক্তিক হওয়া সম্ভব হলে খুবই ভালো হতো। কিন্তু আমরা পৌরাণিক কাহিনীর ঊর্ধ্বে ওঠতে পারব, এমন কথা বলা কখনো নিরাপদ হবে না। অতীতে লোকজন অনেকবারই ধর্ম থেকে কল্পকথাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছে। উদাহরণ হিসেবে প্রাচীন ইসরাইলের নবী ও সংস্কারকদের কথা বলা যায়। তারা আদি কেনানবাসীর পৌরাণিক কাহিনী থেকে তাদের বিশ্বাসকে আলাদা করা নিয়ে চরমভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু তারা সফল হননি। কাব্বালাহর পুরাণতত্ত্বে পুরনো কাহিনী ও কিংবদন্তিগুলো আবারো শক্তিশালী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রক্রিয়াকে ধর্মের আরো যৌক্তিক আকারের ওপর কল্পকথার চরম জয় হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। জেরুসালেমের ইতিহাসে আমরা দেখব, জীবন যখন বিশেষ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে,

অধিকতর জানা দর্শনে কোনো ধরনের সান্ত্বনা না পায়, তখন লোকজন সহজাতভাবে কল্পকথার দিকে ছোটে। অনেক সময় বাইরের ঘটনাবলী লোকজনের মনের বাস্তবতাকে এত নিখুঁতভাবে প্রকাশ করে যে তারা সাথে সাথে তাতে পৌরাণিক মর্যাদা আরোপ করে, পৌরাণিক উদ্দীপনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এই ধরনের দুটি ঘটনা হলো চতুর্থ শতকে খ্রিস্টের কবর আবিষ্কার এবং ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের জেরুসালেম জয়। উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট লোকজন মনে করেছিল যে তারা আদি ধারণা অনেক পেছনে ফেলে এসেছে, কিন্তু ঘটনার ফলাফল তাদের ওই বিশ্বাস গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। আমাদের নিজেদের শতকে ইহুদি ও ফিলিস্তিনি জনগণ এমনসব বিপর্যয়ে পড়েছে যে তাতে করে কল্পকথার পুনরাগমন না হওয়াটাই ছিল বিস্ময়কর। ভালো বা খারাপ যা-ই হোক না কেন, এ ধরনের আধ্যাত্মিকতায় আক্রান্ত লোকজনের আকাঙ্ক্ষা ও আচরণ বুঝতে চাইলে জেরুসালেমের পৌরাণিক বিবেচনা অপরিহার্য

জেরুসালেমের ইতিহাস শুরুর আগে আমাদেরকে শেষ যে পরিভাষাটি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে তা হলো প্রতীকবাদ বা নির্দর্শনবাদ। আমাদের বৈজ্ঞানিকমনস্ক সমাজে স্বাভাবিকভাবেই এখন আর ছবি ও প্রতীকের পরিভাষায় চিন্তা করি না। আমরা চিন্তা করার অনেক বেশি যৌক্তিক ও এক বিষয় থেকে অন্যটিতে যাওয়ার পদ্ধতি বিকশিত করতে পেরেছি। বস্তুগত প্রপঞ্চ কাল্পনিকভাবে দেখার বদলে আমরা আবেগগত সবকিছু ঝেড়ে ফেলে জিনিসটির দিকেই পুরো মনোযোগ দেই। এটি পাশ্চাত্যের অনেকের কাছে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বদলে দিয়েছে, আমরা দেখতে পাব যে এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে ষোড়শ শতকে। আমাদের মধ্যে এ কথা বলার ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছে, কোনো কিছু কেবলই একটি প্রতীক, এটিকে প্রতিনিধিত্বকারী আরো রহস্যজনক বাস্তবতা থেকে এটি অনিবার্যভাবেই আলাদা। অবশ্য প্রাক-আধুনিক বিশ্বে এমনটি ছিল না। প্রতীক বা নিদর্শন যে বিষয়টি দেখাতে চায়, সেটিকে বাস্তবতায় দেখানো হতো। এ কারণেই কোনো ধর্মীয় প্রতীক উপাসনকারীদেরকে কাছে পবিত্র এলাকার সাথে পরিচয় ঘটানোর ক্ষমতা থাকত। অতি ব্যতিক্রমধর্মী গুটিকতেক লোক ছাড়া ইতিহাসজুড়ে কখনো ঐশী সংস্পর্শ কখনো সরাসরি পাওয়া যায়নি। একে সবসময়ই সরাসরি না দেখে অন্য কিছুর মাধ্যমে অনুভূত হয়েছে। ফলে ঐশী সত্তাকে নারী বা পুরুষ যেভাবেই হোক না কেন মানবীয় অবয়বে দেখা

হয়ে ঐশী অবতারে পরিণত হয়েছে। একে পবিত্র গ্রন্থে, আইনি বিধান কিংবা মতবাদেও দেখতে পাওয়া যায়। ঐশী সত্তার প্রাচীনতম ও সবচেয়ে সর্বব্যাপী প্রতীক হলো স্থান। লোকজন পর্বতমালা, উপবন, নগরী ও মন্দিরে ঐশী সত্তার অনুভূতি পেত। তারা যখন এসব স্থানে হাঁটত, তখন তাদের মনে হতো যে তারা ভিন্ন এক মাত্রায় প্রবেশ করেছে। তাদের এ মাত্রাটি আলাদা হলেও স্বাভাবিকভাবে যে বাহ্যিক জগতের সাথে তারা অভ্যস্ত তার সাথে এর মিল ছিল। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমদের কাছে জেরুসালেম হলো এ ধরনের ঐশী প্রতীক!

এটি এমন কিছু নয়, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে। একবার কোনো স্থান কোনো না কোনোভাবে ঐশী সত্তার সংস্পর্শ পেয়ে গেলে এবং সেটি যদি লোকজনকে ঐশী সত্তায় প্রবেশের সুযোগ দিতে পারে বলে প্রমাণ করতে পারে, তবে উপাসকেরা এই সর্বোকৃষ্ট অনুভূতি পরিচর্যায় অন্যদের সহায়তার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিপুল পরিমাণে সৃষ্টিশীল শক্তি ব্যয় করে। আমরা দেখতে পাবো, মন্দির, চার্চ ও মসজিদের স্থাপত্য প্রতীকীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো তীর্থযাত্রীর ঈশ্বরের কাছে পৌছানোর জন্য অন্তরাত্মাকে যে পথ পাড়ি দিতেই হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ প্রায়ই তাতে থাকে। প্রার্থনা ও শাস্ত্রাচারও এই ঐশী স্থানের অনুভূতিকে উচ্চকিত করে। প্রটেস্ট্যান্ট পাশ্চাত্যে লোকজন প্রায়ই ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার প্রতি অবিশ্বাসের ঐতিহ্য লালন করে। তারা একে মনে করে বিভ্রান্ত করার ধর্মীয় চাতুরি। তবে সম্ভবত আরো বেশি নিখুঁত হবে উপাসনার স্তোতবাক্যকে থিয়েটারের আকারে বিবেচনা করা। এটি এমনকি পুরোপুরি সেক্যুলার প্রেক্ষাপটেও শক্তিশালী ঐশী অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করতে পারে। পাশ্চাত্যে নাটকের ধর্মীয় উৎস রয়েছে : তা দেখা যায় প্রাচীন গ্রিসের পবিত্র উৎসবে, চার্চে ইস্টার উদযাপনে, মধ্যযুগীয় ইউরোপের ক্যাথেড্রালে। কল্পকথাগুলো জেরুসালেম ও এর বিভিন্ন ধর্মস্থানগুলো অন্তরের অর্থ প্রকাশ করার ব্যবস্থাও।

এসব কল্পকথনের একটিকে পরলোকগত রোমানিয়ান-আমেরিকান বিশেষজ্ঞ মিরসিয়া ইলিয়াড শ্বাশত কল্পকথনের প্রত্যাবর্তন হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি প্রায় সব সংস্কৃতিতেই এটি দেখতে পেয়েছেন। এসব চিন্তার পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া হয় যে এই

দুনিয়ায় আমরা যেসব বস্তুর মুখোমুখি হই, তার ঠিক প্রতিরূপ ঐশী জগতে রয়ে গেছে। এই কল্পকথনকে এই অনুভূতি প্রকাশের প্রয়াস হিসেবে দেখা যেতে পারে যে এখানে এই দুনিয়ায় আমাদের জীবনটি আসলে অন্য কোথাও থাকা কোনো স্থানের পূর্ণাঙ্গ ও পরিতৃপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে অনেকটাই অসম্পূর্ণ ও আলাদা। সব মানবীয় তৎপরতা ও দক্ষতাও ঐশী প্রতিকৃতি : ঈশ্বরদের তৎপরতার অনুকরণ করে লোকজন তাদের ঐশী জীবন লাভ করতে পারে। ঈশ্বরের এই অনুসরণ বর্তমানেও অনুসৃত হয়। লোকজন এখনো সাবাথে বিশ্রাম নেয়, চার্চে রুটি খায় ও মদ্য পান করে। এসব কাজের এমনিতে কোনো অর্থ নেই। কিন্তু তারা এ কারণে করে যে ঈশ্বরও একদিন এ কাজটি করেছিলেন। পবিত্র স্থানে শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানও ঈশ্বরদের অনুকরণের আরেকটি প্রতীকী উপায় ও অস্তিত্বের আরো পূর্ণাঙ্গ ও আরো বিপুল শক্তির প্রবেশের ব্যবস্থা। পবিত্র নগরীর মতবাদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানেও স্বর্গে ঈশ্বরদের আবাসের প্রতিফলন ঘটে বলে মনে করা হয়। এতে কোনো একটি মন্দিরকে বিবেচনা করা হয় বিশেষ কোনো দেবতার স্বর্গীয় প্রাসাদের প্রতিকৃতি। এর স্বর্গীয় আদিরূপ নিখুঁতভাবে অনুকরণ করা সম্ভব হলে মন্দিরও হতে পারে দুনিয়ায় ঈশ্বরের বাড়ি।

যুক্তিবাদী আধুনিকতার স্বল্প আলোকে এ ধরনের কল্পকথনগুলো উদ্ভট মনে হতে পারে। কিন্তু এসব ধারণা প্রথমে কিছুতে পরিণত হয়, পরে বিশেষ ‘পবিত্র’ স্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। এগুলো হলো একটি অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস। ধর্মে, অভিজ্ঞতা সবসময়ই আসে ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আগে। লোকজন প্রথমে অনুভব করে যে তারা কোনো উপবন কিংবা পর্বত চূড়ার ঐশী সত্তাকে অনুধাবন করতে পেরেছে। অনেক সময় স্থাপত্য, সঙ্গীত, প্রার্থনার (এগুলো তাদেরকে তাদের নিজেদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়) নান্দনিক অবয়বও ঐশী সত্তাকে অনুভব করতে সহায়তা করে। পরে এটিই তাদেরকে তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। তারপর তারা এই অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে পৌরাণিকের কাব্যিক ভাষায় কিংবা পবিত্র ভূগোলের প্রতীকের মাধ্যমে। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমদের জন্য ‘কাজ করতে পারে’ এমন স্থানগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে জেরুসালেম। কারণ এ স্থানটি তাদেরকে ঐশী সত্তার সামনে উপস্থিত করে।

এ নিয়ে আরেকটি মন্তব্য প্রয়োজনীয়। ধর্মচর্চার অনুশীলন শিল্পকলার অনুশীলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ত্রুটিপূর্ণ ও মর্মান্তিক দুনিয়াকে শিল্পকলা ও ধর্ম উভয়টিই এক ধরনের চূড়ান্ত অনুভূতিতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ধর্মে নৈতিক মাত্রা থাকতেই হয় বলে শিল্পকলার চেয়ে ধর্ম ভিন্ন জিনিস। ধর্মকে নৈতিক নান্দনিকতা হিসেবেও সম্ভবত অভিহিত করা যায়। ঐশী বা অতিলৌকিকতার সংস্পর্শ লাভই যথেষ্ট নয়। সংস্পর্শ অবশ্যই অন্যদের প্রতি আমাদের আচরণে মূর্ত হতে হবে। সব মহান ধর্মই জোর দিয়ে বলে, সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতার পরীক্ষা হলো বাস্তব সহানুভূতি। বৌদ্ধ একবার বলেছিলেন যে আলোকসম্পাতের অভিজ্ঞতার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবশ্যই পর্বতশীর্ষ ত্যাগ করে বাজারে যেতে হবে, সব জীবন্ত প্রাণীর প্রতি সমব্যথী হতে হবে। পবিত্র স্থানের আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। জেরুসালেম কাল্টের জন্য বাস্তব দানশীলতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের গুরুত্ব পুরোপুরিই অপরিহার্য বিষয়। দুর্বল ও অরক্ষিতদের প্রতি ন্যায়বিচারপূর্ণ ও সমব্যথী না হলে নগরীটি পবিত্র হতে পারে না। কিন্তু দুঃখের কথা হলো, এই নৈতিক নির্দেশনা প্রায়ই এড়িয়ে যাওয়া হয়। সবচেয়ে জঘন্য কিছু নৃশংসতা ঘটেছে এখানে। আর তা হয়েছে ন্যায়বিচার ও দানশীলতার অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনের আগে যখন লোকজন জেরুসালেমের বিশুদ্ধতা প্রয়োগ করেছে এবং এর মহা পবিত্রতায় প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা করেছে। এই সব মূলগত স্রোত জেরুসালেমের দীর্ঘ ও টালমাটাল ইতিহাসে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করেছে। জেরুসালেমের ভবিষ্যত নিয়ে বিধিবিধান প্রণয়নের উদ্দেশে এই গ্রন্থ লেখা হয়নি। তা করা হবে অসঙ্গত। এই বইতে স্রেফ এই চেষ্টাই করা হয়েছে যে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমরা যখন বলে, নগরীটি তাদের কাছে 'পবিত্র' তখন তারা আসলে কী বুঝাতে চায় এবং এই ধর্মগুলোর প্রতিটির কাছে রুসালেমের কিছু অর্থ সামনে নিয়ে আসা। নগরীতে কারা প্রথমে ছিল এবং এর ফলে কাদের এখানে থাকা উচিত, বিশেষ করে জেরুসালেমের উৎস গোলকধাঁধার মোড়া থাকার কারণে, তা ফয়সালা করার মতোই তা গুরুত্বপূর্ণ।

জায়ন

বর্তমানে জেরুসালেম নগরী হিসেবে পরিচিত এলাকাটির পাহাড় উপত্যকাগুলোতে প্রথম কারা বসতি স্থাপন করেছিল, সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। পুরনো নগরীর বর্তমান প্রাচীরগুলোর দক্ষিণে অবস্থিত ওফেল পাহাড়ের করবগুলোতে পাওয়া মৃৎপাত্রগুলো খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ সালের। এই সময়ে আধুনিক ইসরাইলের কেনানের অন্যান্য অংশে, মেগিডো, জেরিকো, আই, ল্যাচিশ ও বেথ শানে নগর আবির্ভূত হতে শুরু করেছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মন্দির, ঘর-বাড়ি, কারখানা, রাস্তা ও পয়োঃপ্রণালি আবিষ্কার করেছেন। তবে ওই সময়ে জেরুসালেমে নগরজীবন শুরু হয়ে গিয়েছিল, এমন কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং পরিহাসের বিষয় হলো যে পরবর্তীকালে কোটি কোটি ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমের কাছে বিশ্বের কেন্দ্র হিসেবে যে স্থানটিকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে, সেটি ছিল প্রাচীন কেনানের পরিচিত অংশের বাইরে। পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত এ স্থানটিতে বসবাস করা ছিল কঠিন, এটি ছিল দেশের মূলকেন্দ্রের বাইরে। প্রাথমিক ব্রোঞ্জ যুগের বিকাশ প্রধানত উপকূলীয় সমতল এলাকা, উর্বরা জেজরিল উপত্যকা ও নেগেভেই মূলত সীমিত ছিল। এখানেই মিসরীয়রা তাদের বাণিজ্য গুদামগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিল। কেনান ছিল সম্ভাবনাময় সমৃদ্ধ দেশ : এর অধিবাসীরা মদ, তেল, মধু, বিটুমিন ও শস্য রফতানি করত। এর কৌশলগত গুরুত্বও ছিল। এশিয়া ও আফ্রিকার সংযোগস্থলে অবস্থিত স্থানটি মিসর, সিরিয়া, ফোনেশিয়া ও মেসোপোটিমিয়ার সভ্যতার মধ্যে সেতুবন্ধ প্রতিষ্ঠা করেছিল। তবে ওফেল পাহাড়ের চারপাশে বসন্তকাল সবসময়ই শিকারী, কৃষক ও সাময়িক বসতি স্থাপনকারীদের প্যালেওলিথিক যুগের চকমকি পাথর, কাচ পাওয়া গেছে – আকৃষ্ট করলেও আমরা যতটুকু জেনেছি, জেরুসালেম এই প্রাথমিক বিকাশকালে কোনো ভূমিকা পালন করেনি।

প্রাচীন বিশ্বে সভ্যতা সবসময়ই ছিল অনিশ্চিত অর্জন। খ্রিস্টপূর্বে ২৩০০ সালে কেনানে কার্যত আর কোনো নগরীই ছিল না। জলবায়ু পরিবর্তন, বিদেশী আগ্রাসন কিংবা মারাত্মক গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি যে কারণেই হোক না কেন, নগরজীবন অদৃশ্য হয়ে যেত। তখন ছিল নিকট প্রাচ্যজুড়ে টালমাটাল ও অস্থিতিশীলতার সময়। মিসরে ওল্ড কিংডম (আনুমানিক

২৬১৩-২১৬০ খ্রিস্টপূর্ব) হিসেবে পরিচিত রাজবংশ ধ্বংস হয়ে যায়। মেসোপটেমিয়ার আক্কাডিয়ান রাজবংশকে উৎখাত করে অ্যামোরাইটসরা, ওয়েস্টার্ন সেমিটিক এই জাতিগোষ্ঠী ব্যাবিলনকে রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এশিয়া মাইনরজুড়ে শহুরে স্থানগুলো পরিত্যক্ত হয়ে যায়, ফিনিসিয়ান উপকূলের উগারিট ও বাইবলোরাও ধ্বংস হয়ে যায়। আমাদের কাছে এখনো অজ্ঞাত এমন কোনো কারণে সিরিয়া অক্ষত থেকে যায়, মেগিডো ও বেথ শানের মতো নগরীগুলো তাদের দক্ষিণ প্রতিবেশীদের চেয়েও বেশি সময় টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তারপরও লোকজন যাতে অনেক নিরাপদ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন চালিয়ে যাওয়ার জন্য এসব অঞ্চল একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, সে প্রয়াস অব্যাহত রাখে। নতুন নতুন নগরী ও নতুন নতুন রাজবংশ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, পুরনো বসতিগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে কেনানের পুরনো নগরীগুলোতে আবারো মানব বসতি দেখা যেতে থাকে।

এই সময়কালে কেনানের জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। দেশটিতে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে ওঠেনি। প্রতিটি শহর ছিল স্বায়াত্তশাসিত, তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব শাসক ছিল, আশপাশের গ্রাম এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার করে থাকত। অথচ তখন মেসোপোটেমিয়ায় সভ্যতার সূচনা ঘটেছে। কেনান তখনো প্রবলভাবে পশ্চাদপদ দেশ হিসেবে রয়ে যায়। এখানে বড় ধরনের বাণিজ্য বা শিল্প ছিল না। তাছাড়া অঞ্চলে অঞ্চলে ভৌগোলিক ও আবহাওয়াগত ব্যাপক পার্থক্য থাকায় বিভিন্ন জেলার মধ্যে একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা থাকার প্রবণতা ছিল। পার্বত্য এলাকা, জুদার প্রান্তর বা জর্দান উপত্যকায় অল্প কিছু লোক বাস করত। এখানকার নদীগুলো নৌচালনার উপযোগী ছিল না, চলাচল করা যেত না। যোগাযোগব্যবস্থা ছিল কঠিন। লোকজন দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খুব বেশি দূর যেতে পারত না। মিসর ও দামাস্কাসকে সংযুক্তকারী প্রধান সড়কটি উপকূল বেয়ে গাজা থেকে জাফা পর্যন্ত গিয়েছিল, তারপর মাউন্ট কারমেলের চারপাশের জলাভূমি এড়িয়ে মেগিডো, জেফরিল উপত্যকা ও গ্যালিলি সাগর পর্যন্ত যায়। প্রাকৃতিকভাবে এসব অঞ্চল সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ ছিল। এই এলাকাটির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে টুয়েলফথ ডাইনেস্টির ফারাওরা। খ্রিস্টপূর্ব বিশ ও উনিশ শতকে তারা উত্তর দিকে তাদের প্রভাব বাড়ানোর কাজ শুরু করে। মিসরীয়দের কাছে 'রেতিনু'

নামে পরিচিত কেনান আসলে মিসরের প্রদেশে পরিণত না হলেও ফারাওরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তৃতীয় সেসোসত্রিস অত্যন্ত শক্তিশালী ও স্বাধীন হওয়া স্থানীয় শাসকদের বশ মানতে উপকূলীয় পথে সৈন্য পাঠাতে দ্বিধা করেননি। মেগিযো, হাজর ও অ্যাক্কোর মতো নগরীগুলোকে নগর-রাষ্ট্র হিসেবে সুরক্ষিত করলেও ফারাওরা এমনকি কেনানের অন্যান্য অংশের প্রতিও তুলনামূলক কম আগ্রহ দেখায়। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে বসতি স্থাপনকারীরাও পার্বত্য দেশটিতে অনুপ্রবেশ করে সেখানে নগরী বানাতে থাকে। শেচেম হয়ে পড়ে এসব সুরক্ষিত পার্বত্য শহরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। কোনো কোনো এলাকায় শহর ৩৭ একর জায়গাজুড়ে বিদ্যমান ছিল, পল্লীর বিশাল এলাকাও ছিল তার নিয়ন্ত্রণে। দক্ষিণের পাহাড়ি এলাকাগুলোতে হেবরন ও জেরুসালেমের মতো নগরী গড়ে ওঠে।

বলা যায়, এই পর্যায়েই ইতিহাসে প্রবেশ করে জেরুসালেম। ১৯৬১ সালে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ক্যাথলিন কেনিয়ন প্রায় সাড়ে ছয় ফুট চওড়া একটি প্রাচীর আবিষ্কার করেন। এটি ওফেল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। প্রাচীরটিতে গিহন স্প্রিঙের কাছে একটি বড় দরজা ছিল। তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে এ নগর প্রাচীরটি পাহাড়টির দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত চলে গিয়ে পশ্চিম ঢালু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, উত্তরে পরবর্তীকালের একটি নগর প্রাচীরের নিচে হারিয়ে যায়। প্রাচীর আর পাথুরে খাড়াইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে মৃৎপাত্রও আবিষ্কার করেছেন কেনিয়ন। পাত্রটি খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ সালের। নগরীটি উত্তর দিকে প্রায় অরক্ষিতই ছিল, পরে সেখানে জায়ন দুর্গ নির্মাণ করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতকে সেখানে কোনো দুর্গ থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ওফেলের পূর্ব ঢালুতে বেশ নিচু করে তৈরী প্রাচীরগুলোর মধ্যে সম্ভবত গিহন স্প্রিং' পর্যন্ত একটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গও ছিল। ব্রিটিশ প্রকৌশলী চার্লস ওয়ারেন ১৮৬৭ সালে সুড়ঙ্গটি আবিষ্কার করেন। নগরীর অভ্যন্তরীণ পাহাড় থেকে শুরু হয়ে এটি তির্যকভাবে নেমে গিয়ে তারপর উলম্বভাবে পানিতে মিশেছে। এই পানি সম্ভবত গিহন থেকে অপর একটি অনুভূমিক সুড়ঙ্গের মাধ্যমে আসত। অবরোধের সময় সম্ভবত জগ ও কলস খাদে ডুবিয়ে রাখতে হতো। একই ধরনের সরঞ্জাম পাওয়া গেছে মেগিডো, গেজার ও গিবেয়নে। কেনিয়ন বিশ্বাস করতেন, ব্রোঞ্জ যুগে খাদটি ব্যবহৃত হতো। কিন্তু তার তত্ত্বটি বিতর্কিত : অনেকে সন্দেহ করেন, এই পর্যায়ে এ

ধরনের ব্যবস্থা নির্মাণের প্রযুক্তিগত দক্ষতা অধিবাসীদের ছিল না। তবে সাম্প্রতিক ভূতত্ত্বগত আবিষ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে, 'ওয়ারেন্স শাফট' নামে পরিচিত খাদটির পুরোটা মানবনির্মিত নয়। এটি চুনাপাথরের সন্ধিক্ষণে একটি প্রাকৃতিক গর্ত। প্রাচীন জেরুসালেমবাসী সম্ভবত এটিকে সংস্কার করে বড় করেছিল।

সম্ভবত গিহনের কাছাকাছি থাকার কারণেই ওফেলের প্রতি আকৃষ্ট হতো বসতি স্থাপনকারীরা। স্থানটির কৌশলগত সুবিধাও ছিল। পার্বত্যভূমির ঢালুতে ছিল এর অবতরণস্থল। এর ফলে এখান দিয়ে জুদা মরুভূমিতে যাওয়া যেত। তবে বিপুল জনসংখ্যাকে সঙ্কুলান করার মতো ব্যবস্থা ছিল না ওফেলের। নগরীটির আয়তন ছিল মাত্র ৯ একরের কিছু বেশি। তবে তিন খাড়া উপত্যকা বসতি স্থাপনকারীদের বিপুল সুরক্ষা দিত : পূর্ব দিকে কিদরন উপত্যকা, দক্ষিণে হিন্নম (বা গেহেন্না) উপত্যকা, পশ্চিমে সেন্ট্রাল উপত্যকা। এটি এখন পলি জমে ভরাট হয়ে গেছে। ইহুদি ইতিহাসবিদ ফ্লাভিয়াস যোসেফাস একে টাইরোপোয়ন উপত্যকা হিসেবে অভিহিত করেছেন। এমনকি তখনো শহরটি কেনানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নগরীগুলোর মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবে এর অস্তিত্ব সম্ভবত মিসরীয়দের জানা ছিল। ১৯২৫ সালে লুক্সরে সিরামিক সামগ্রী পাওয়া গেছে। এগুলো জোড়া লাগিয়ে ৮০টি থালা ও পাত্র পর্যন্ত তৈরি করা সম্ভব ছিল। এতে প্রাচীন মিসরীয় পুরোহিতদের বক্তব্য খোদাই করা ছিল। পাঠ উদ্ধারের পর লিখিত লিপিতে দেশ, নগরী ও শাসকদের নাম উদ্ধার করা হয়। এগুলো মিসরের শত্রুদের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হয়েছে। পাত্রগুলো সম্ভবত বৈরী সামন্তদের পতনের জন্য কোনো মন্ত্রযপ অনুষ্ঠানে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাত্রগুলোতে ফারাও তৃতীয় সেসোসট্রিস (১৮৭৮-১৮৪২ খ্রিস্টপূর্ব) আমলের তারিখ দেওয়া ছিল। এগুলোতে ১৯টি কেনানি নগরীর নাম রয়েছে। এগুলোর একটি হলো 'রুশালিমাম'। কোনো ঐতিহাসিক নথিতে এই প্রথম নগরীটির নাম দেখা গেল। পাঠে দুই রাজপুরুষের নামও পাওয়া যায় : তারা হলেন ইয়রম ও শাশান। এসব তথাকথিত 'এক্সেক্রেশন টেক্সটের' আরেকটিতে সম্ভবত এক শ' বছর পর খোদাই করা হয়েছিল। এখানে আবারো 'রুশাললিমামকে' অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। তবে এ সময় নগরীতে সম্ভবত একজন শাসকই ছিলেন। এই অপ্রতুল বিচ্ছিন্ন প্রমাণ থেকে অনেক বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে অষ্টাদশ শতকে কেনানের বাকি

অংশের মতো জেরুসালেমও অনেক গোত্রপতির শাসিত গোত্রীয় সমাজ থেকে একজন একক রাজার শাসিত নগর বসতিতে বিবর্তিত হয়েছে।

এখানে আমাদের উচিত হবে একটু বিরতি নিয়ে নগরীর নামটি বিবেচনা করা। মনে হচ্ছে অস্তায়মান সূর্য কিংবা সন্ধ্যা তারার নামের সাথে সম্পৃক্ত সিরিয়ার ঈশ্বর সালেম থেকে তা এসেছে। কেনানে মিসর রাজনৈতিকভাবে আধিপত্য বিস্তার করলেও সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়াদিতে সিনিয়ার প্রভাব ছিল। হাজর, মেগিডো ও শেচেমে এই আমলের আবিষ্কৃত মন্দিরগুলো সিরিয়ান মডেলেই তৈরি হয়েছে বলে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। রাজার প্রাসাদের মূল পরিকল্পনা অনুযায়ীই এসব মন্দির নির্মিত হয়েছে। এর মাধ্যমে এ ধারণাও দেওয়া হয় যে ঈশ্বরদের কাছ থেকেই আসে সব নিয়ম-কানুন। সাধারণ লোকজনের জন্য কাল্ট হল বা হেখালে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল, ঠিক যেভাবে রাজার উপস্থিতিতে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। হলরুমের কুলুঙ্গিতে রাখা রাজার প্রতিকৃতি তারা আঙিনা থেকে হেখালের খোলা দরজা দিয়ে একনজর দেখতে পেত। জেরুসালেমে ব্রোঞ্জ যুগের কোনো মন্দির এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, তবে নগরীর নামে বোঝা যাচ্ছে, অধিবাসীরা সিরিয়ান ধর্মের কাছে উন্মুক্ত ছিল। 'এক্সারক্রেশন টেক্সটে জেরুসালেমের রাজপুরুষদের নাম পাওয়া যাওয়ায় ইঙ্গিত দিচ্ছে সিরিয়ার জনসাধারণের মতো জেরুসালেমবাসীও ছিল ওয়েস্টার্ন সেমিটিক বংশোদ্ভূত, তারা একই ধরনের বিশ্ববীক্ষা পোষণ করত।

'রুশালিমাম' নামটির অনুবাদ করলে এর অর্থ দাঁড়াতে পারে 'সালেম (শান্তি) পাওয়া গেছে।' নিকট প্রাচ্য ও ভূমধ্য সাগরীয় এলাকার প্রাচীন দুনিয়ার বসতি স্থাপন ও নগর-পরিকল্পনা করাকে বিবেচনা করা হতো ঐশী উদ্যোগ। ওফেল পাহাড়ের প্রতি উপনিবেশকারীদের প্রথম আকৃষ্ট হওয়ার কারণ ছিল এর পানি সরবরাহ এবং এর কৌশলগত উপযোগিতা। তবে নগরীর নামে বোঝা যায়, উদ্যোগ এসেছিল ঈশ্বরের কাছ থেকে। এই সময়ে সব নগরীই বিবেচিত হতো পবিত্র স্থান হিসেবে। এ ধারণাটি আধুনিক পাশ্চাত্যে আমাদের কাছে অচেনা। বর্তমানে নগরী প্রায়ই ধর্মের বাইরের কাজ বিবেচিত হয়, ধর্ম এখানে ক্রমবর্ধমান হারে প্রান্তিক ভূমিকায় চলে গেছে। কিন্তু লোকজন তাদের দুনিয়াকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার অনেক অনেক আগে আবেগগত ও

আধ্যাত্মিকভাবে বিশ্বে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করার জন্য ঐশী ভূগোলের বিবর্তন ঘটিয়েছিল। পবিত্র স্থানগুলোর সংজ্ঞা ও ভূগোল গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী মিরসিয়া ইলিয়াড উল্লেখ করেছেন, কোনো একটি ঐশী স্থানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের আগে বিশ্বের প্রকৃতি নিয়ে অন্য সব ধরনের জল্পনা কল্পনা চলে। সব সংস্কৃতিতে তা পাওয়া যায়, এটি আদিম ধর্মীয় বিশ্বাস। কোনো কোনো স্থান ঐশী এবং এ কারণেই স্থানটি মানব বসতির উপযোগী – এমন বিশ্বাস বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান বা মহাবিশ্বের প্রকৃতিবিষয়ক অধিবিদ্যাগত জল্পনার ভিত্তিতে হয়নি। বরং নারী, পুরুষেরা তাদের সাথে সম্পর্কিত বিশ্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় অন্যান্য স্থান থেকে পুরোপুরি আলাদা বিবেচিত কিছু এলাকার প্রতি অপ্রতিরোধ্যভাবে আকৃষ্ট হতো। এটি ছিল এমন অভিজ্ঞতা যা ছিল বিশ্ব সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি এবং ভা মনের যৌক্তিক পর্যায়ের অনেক গভীর ধারণায় চলে যেত। এমনকি আজও আমাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ পুরোপুরি পুরনো ঐশী ভূগোলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেনি। আমরা দেখতে পাবো যে ঐশী স্থান-সম্পর্কিত প্রাচীন ধারণাগুলো এখনো জেরুসালেমের ইতিহাসকে প্রভাবিত করছে, এমনকি যেসব লোক নিজেদের সাধারণভাবে ধার্মিক মনে করে না, তারাও তাতে প্রভাবিত হচ্ছে। নারী ও পুরুষেরা শত শত বছর ধরে নানাভাবে ঐশী স্থান সম্পর্কে তাদের ধারণা বিনির্মাণ করেছে। তবে জেরুসালেমের মতো নগরী বিশেষ মর্যাদা নিয়ে তাদের আলোচনায় নির্দিষ্ট কিছু থিম বারবার ঘটতে থাকায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তারা মানুষের মৌলিক কিছু প্রয়োজনের কথা বলে। এমনকি যারা ঐতিহ্যগতভাবে পবিত্র নগরীগুলো নিয়ে কোনোভাবেই আগ্রহী নয়, অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের প্রতি কোনো বিশ্বাস নেই, তাদেরও অনেক সময় বিশেষ কিছু স্থান থাকে, যেখানে তারা যেতে চায়। এ ধরনের স্থানগুলো আমাদের কাছে 'ঐশী' হওয়ার কারণ তারা আমদের নিজেদের সম্পর্কিত ধারণার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত; আমাদের শৈশব বা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তির সাথে জড়িত বলে তারা হয়তো আমাদের জীবনকে প্রবলভাবে বদলে দেওয়া অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত। এ ধরনের স্থান যখন আমরা সফর করি, তখন আমরা সেখানে কোনো একসময়ের প্রবলতর জীবনের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করি। ওই অভিজ্ঞতা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের ভেতরে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে আমাদের নশ্বর অস্তিত্ব যন্ত্রণা ও অযৌক্তিক

প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও এর কিছু চূড়ান্ত অর্থ ও মূল্য রয়েছে, এমনকি যদিও যৌক্তিক পরিভাষায় এই উপলব্ধিকে ব্যাখ্যা করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

আমাদের নিজস্ব আমলের ঐতিহ্যবাহী সমাজগুলোর মতোই প্রাচীন দুনিয়ায় লোকজন তাদের ঐশী ভূগোল এই বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করত যে দুনিয়াটা সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বরেরা। ফলে এটি নিরুৎসুক ভূখণ্ড নয় : এই ভূ-প্রকৃতির মানুষকে বলার কিছু আছে। তারা মহাবিশ্বের দিকে তাকিয়ে অস্তিত্বের এমন একটি মাত্রা উপলব্ধি করে যা তাদের জীবনে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকা ক্ষণস্থায়িত্ব ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যায়। এটি আরো পূর্ণাঙ্গ ও আরো শক্তিশালী মাত্রার প্রতিনিধিত্ব করে। এটি এমন বাস্তবতা যা এক হলেও আলাদা এবং তারপরও গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পবিত্র রাজ্যের সাথে ঘনিষ্ঠতার অনুভূতি প্রকাশ করার সময় তারা প্রায়ই একে মানবীয় আকারে প্রকাশ করত, তাদের নিজেদের পরিচিত ব্যক্তিত্বের সাথে দেব-দেবীর সাথে কল্পনা করত। তারা এই ঐশী উপস্থিতিকে প্রাকৃতিক বিশ্বে অনুভব করার কারণে এসব দেবতা সূর্যের সাথে, বাতাসের সাথে কিংবা জীবন প্রদানকারী বৃষ্টির সাথেও সম্পৃক্ত ছিল। লোকজন এসব দেব-দেবী সম্পর্কে গল্প বলত সত্যি সত্যি যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো বর্ণনা করার জন্য নয়, বরং তা ছিল বিশ্ব সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা তারা লাভ করেছিল, তা ছিল ওই রহস্য প্রকাশ করার দ্বিধান্বিত প্রয়াস। সর্বোপরি মানুষ চায় যতটা সম্ভব অতিলৌকিক বাস্তবতার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকতে। যদি বলা হয় যে তারা জীবনের অর্থ কামনা করত, তবে তা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। কারণ পরিভাষাটি এমন একটি পরিষ্কার সমাধান-সূত্র দেয় যা মানুষের অবস্থা সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা দিতে পারে। বাস্তবতা হলো, ধর্মীয় অনুসন্ধানের লক্ষ্য সবসময়ই অভিজ্ঞতা অর্জন, কোনো বার্তা প্রদান নয়। আমরা চাই সত্যিকারভাবে জীবন্ত থাকতে, আমাদের মানবীয় সম্ভাবনা পূর্ণ করতে, এমনভাবে বাঁচতে চাই যাতে আমরা অস্তিত্বের গভীরতর স্রোতের সাথে মিশে থাকতে পারি। অতিপ্রাচুর্যের জীবনের (সম্ভাবনা ও অবিনশ্বর ঈশ্বরে প্রতীকিভাবে ফুটে ওঠা) জন্য এই অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করে সব ধর্ম। মানুষ চায় নশ্বরতা ও নশ্বর দুনিয়ার তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে ওঠে- এমন একটি বাস্তবতা খুঁজে পেতে, যেখানে তারা তাদের জীবনের প্রকৃতির পরিপূরকতা পাবে। প্রাচীন বিশ্বে মানুষেরা

অনুভব করত, এই ঐশী উপাদানের সাথে সংযুক্ত হয়ে বাঁচার সম্ভাবনা ছাড়া জীবনের টিকে থাকা অসম্ভব।

এ কারণেই ইলিয়াড দেখিয়েছেন, মানুষ ও ঈশ্বরদের মধ্যে বিভক্তকারী প্রতিবন্ধকতা গুঁড়িয়ে দিয়ে যেসব স্থানে একবার পবিত্র সত্তা নিজেকে প্রকাশ করেছিল, ওইসব স্থানেই লোকজন বাস করতে চাইত। সম্ভবত ঈশ্বর সালেম নিজকে ওফেল পাহাড়ে প্রকাশ করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে স্থানটিকে বিশেষভাবে নিজের করে নিয়েছিলেন। লোকজন একথা জেনে সেখানে যেত যে ঈশ্বর যে নগরীতে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, সেখানে গিয়ে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব। কিন্তু ঈশ্বর কেবল অশরীরী ও অতিপ্রাকৃত অবয়বে এই নশ্বর দুনিয়ায় হঠাৎ করেই আত্মপ্রকাশ করেন- বিষয়টি এমন নয়। যেকোনো কিছুই যখন এর আশপাশ থেকে স্বাতন্ত্র্যসূচিত হয়ে এসে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীতে চলে সেটি পবিত্রতা, ঐশী সত্তার প্রকাশ হতে পারে। কোনো পাথরখণ্ড বা পাহাড় বা উপত্যকা বিশেষভাবে সুন্দর বা রাজসিক গাম্ভীর্যের অধিকারী হলে সেটি ঐশী উপস্থিতির ইঙ্গিত দিতে পারে। কারণ এটি সাবলীলভাবে তার পারিপার্শ্বিকতার সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনি। এর উপস্থিতিই অন্য কিছু আছে বলে প্রকাশ করে। অচেনা, অজানা কিংবা এমনকি নিখুঁত কিছুও প্রাচীন কালের সমাজের নর-নারীদের কাছে তাদের থেকে ভিন্ন কিছু মনে হতে পারে। মাটি থেকে উঁচুতে উঠা পর্বতগুলো ঐশী সত্তা উপলব্ধি করার বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতীক হতে পারে। এর চূড়ায় উঠে উপাসনাকারীরা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে থাকা ভিন্ন মাত্রায় উঠার অনুভূতি পেতে পারে। মেসোপোটমিয়ায় জিগারাত নামে পরিচিত টেম্পল-টাওয়ারগুলো পাহাড়ের মতো করে তৈরি করা হয়েছিল। এর পাথুরের বিশাল সিঁড়িগুলোর সাতটি মাত্রা সাত আসমানের প্রতিনিধিত্ব করত। ফলে তীর্থযাত্রীরা কল্পনা করতে পারত, তারা মহাবিশ্ব বেয়ে উঠছে, শীর্ষে গিয়ে তারা ঈশ্বরের সাক্ষাত করতে পারে বলে ভাবত। সিরিয়া অনেক বেশি পার্বত্যপূর্ণ হওয়ায় সেখানে কৃত্রিম পাহাড় বানানোর প্রয়োজন হয়নি, এর সত্যিকারের পর্বতগুলোই পবিত্র স্থান হিসেবে শ্রদ্ধা পেত। জেরুসালেমের ইতিহাসে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান হতে পারত মাউন্ট জাফন বা বর্তমানের জেবেল আল-আকরা। এটি ওরোনটেসের মুখে উগারিতের ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত।' কেনানের মাউন্ট হারমন, কারমেল ও তাবরও পবিত্র স্থান হতে পারত। হিব্রু

সালেম থেকে আমরা জানি, জেরুসালেমের ওফেল পাহাড়ের উত্তরে অবস্থিত মাউন্ট জায়নও পবিত্র ছিল। পর্বতটির প্রাকৃতিক সীমা দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ ইহুদিদের টেম্পল নির্মাণের জন্য খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে রাজা হেরড সেখানে একটি বিশাল প্লাটফর্ম নির্মাণ করেছিলেন। তবে প্রাকৃতিক অবস্থায় মাউন্ট জায়ন নাটকীয়ভাবে আশপাশের পাহাড়গুলো থেকে এতই ভিন্নভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যে তাকে দেখেই মনে হয়েছিল এটি ঐশী 'অন্য'। ফলে একে 'ঐশী' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

একবার কোনো স্থান ঐশী সত্তার সংস্পর্শে এলে সেটি অপবিত্র পরিবেশ থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে পড়ে। ঐশী সত্তা সেখানে প্রকাশিত হওয়ায় স্থানটি পৃথিবীর কেন্দ্রে পরিণত হয়ে যায়। এটি কোনো আক্ষরিক, জ্যামিতিক পদ্ধতিতে বোধগম্য নয়। জেরুসালেমের অধিবাসীদের কাছে কাছাকাছি থাকা কাছের হেবরনও ঐশী 'কেন্দ্র' হিসেবে বিবেচিত হওয়াটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এমনকি সামবাদী বা রাব্বিরা যখন বলতেন, মাউন্ট জিয়ন হলো পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চ স্থান, অথচ বাস্তবে টাইরোপিয়ন উপত্যকার অপর দিকে অবস্থিত ওয়েস্টার্ন হিলটি ছিল জায়নের চেয়ে উঁচু, কিন্তু তাতেও জেরুসালেমবাসীর বিশ্বাসে কোনো পরিবর্তন হতো না। সামবাদী বা রাব্বিরা নগরীর ভৌত ভূগোল বর্ণনা করতেন না, বরং তাদের আধ্যাত্মিক মানচিত্রে এর অবস্থান প্রকাশ করতেন। ঐশী সত্তা নিজেকে প্রকাশ করেছেন এমন যেকোনো ঐশী পাহাড়ের মতোই জায়ন তাদের কাছে মহিমান্বিত হওয়ার কারণ ছিল এই যে লোকজন এখানে স্বর্গের অনেক কাছাকাছি যেতে পারত বলে মনে করত। একই কারণে এটি তাদের বিশ্বের 'কেন্দ্র' : তাদের মতে, যেসব স্থানে স্বর্গীয় সত্তার সাথে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব, এটি ছিল তারই একটি। আর কেবল এই সত্তাই তাদের জীবনকে প্রকৃত রূপ দিত, স্পষ্টভাবে প্রকাশ করত।

প্রাচীন সমাজে লোকজন এমনসব স্থানে বসতি স্থাপন করত, যেখানে ঐশী সভার সাথে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। ইলিয়াড উল্লেখ করেছেন, অস্ট্রেলিয়ার আচিলপা গোত্রটি পুরোপুরি দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে, যখন সফরের সময় তাদের বয়ে বেড়ানো ঐশী দণ্ডটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। দণ্ডটি ঐশী সত্তার সাথে তাদের সংযোগের প্রতিনিধিত্ব করত। ফলে সেটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর আচিলপারা স্রেফ মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আমরা অর্থ-

অনুসন্ধানী প্রাণী, একবার আমরা আমাদের পরিচিত পরিবেশ হারিয়ে ফেললে কিভাবে বাঁচতে হবে কিংবা এই দুনিয়ায় আমাদের স্থান কোথায় হবে তা আমাদের জানা নেই। এ কারণেই ঐশী উপস্থিতির আবাস হিসেবে তৈরী উপাসনা স্থান ও মন্দিরকে ঘিরেই প্রাচীন দুনিয়ায় নগরগুলো নির্মিত হয়েছিল। ঐশী সত্তা ছিল সবচেয়ে নিরেট বাস্তবতা, এটি আমাদেরকে অনেক বেশি অসম্পূর্ণতাকে অস্তিত্বের নির্যাস দিতো। ঐশী সত্তাকে ভীতিকর ও 'অন্য' হিসেবে অনুভব করা হতো। জার্মান ইতিহাসবিদ রুডলফ ওট্টো তার ক্লাসিক গ্রন্থ দি আইডিয়া অব হলি-এ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এটি অনেক সময় ভয়াবহ ভীতি ও আতঙ্ক উস্কে দিতে পারে। এটি ভালোবাসার জিনিস হলেও এটি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণও প্রকাশ করতে পারে। কারণ এটি প্রবলভাবে একই ধরনের এবং অনেক সময় মানুষের জন্য অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত হতো। আরো সম্ভাবনাময় এই বাস্তবতার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে মানব সত্তা নিশ্চিত করতে পারত যে তাদের সমাজ টিকে থাকবে। সভ্যতা ছিল ঠুনকো : প্রায় রাতারাতি নগরীগুলো অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত। প্রাথমিক ব্রোঞ্জ যুগে ফিলিস্তিনে এমন ঘটনা ঘটেছিল। ঈশ্বরদের আরো শক্তিধর ও কার্যকর জীবনের সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত না হতে পারলে তারা টিকে থাকতে পারবে না বলে মনে করত।

অনেক সময় এটি ঐশী সত্তার ও পবিত্র স্থানের মতাদর্শের এই অনুসন্ধান স্বর্গের জন্য নস্টালজিয়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকত। প্রায় প্রতিটি সংস্কৃতির সূচনা-কালের স্বর্ণযুগ নিয়ে যে মিথ রয়েছে, যেখানে বলা হয়ে থাকে, ওই সময় ঈশ্বরদের সাথে যোগাযোগ ছিল সহজ ও অন্তরঙ্গ। ঐশী সত্তাকে দূরের, বিস্ফোরণশীল শক্তি হিসেবে বোঝানো হতো না, বরং দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা হিসেবে উপলব্ধি করা হতো। মানুষ বর্ধিত শক্তি উপভোগ করত : তখন মৃত্যু ছিল না, অসুস্থতা ছিল না, কোনো বিভেদ ছিল না। লোকজন আদিম সুখ ও সম্প্রীতির এই অবস্থায় ফিরে যাওয়ার আকজ্ক্ষা পোষণ করত, মনে করত যে ত্রুটি না থাকলে জীবন এমনই হতে পারত। বর্তমানে আমরা হয়তো আর দুনিয়াবি স্বর্গ বা ইডেন উদ্যানে বিশ্বাস করি না, কিন্তু ত্রুটিযুক্ত বর্তমান থেকে ভিন্ন কিছুর আকাঙ্ক্ষা এখনো বিরাজ করছে। সহজাত বিশ্বাস রয়েছে যে জীবনের মানে এমন হওয়া উচিত নয় : যা হতে পারত, তার জন্য লালায়িত আমরা, নশ্বর অস্তিত্বের ক্ষয়িষ্ণু প্রকৃতির জন্য শোক

করি, মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হই। আরো নিখুঁত সম্পর্কের অনুভূতি আমাদেরকে তাড়িত করে, সম্প্রীতিপূর্ণ ও সামগ্রিক এমন এক দুনিয়ার কথা কল্পনা করি, যেখানে আমাদের চারপাশের সাথে লড়াই করার বদলে মিলেমিশে থাকতে পারব। অপ্রবেশযোগ্য স্বর্গের জন্য এই আকঙ্ক্ষা জনপ্রিয় সঙ্গীত, ফিকশন, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, প্রচারকদের কল্পরাজ্যের কল্পনায় অপ্রতিরোধ্যভাবে বিরাজ করছে। মনঃসমীক্ষকেরা এই নস্টালজিয়াকে জন্মের সময় (যে সময়টাতে আমরা সহিংসভাবে আমাদের মায়ের দেহ থেকে চিরদিনের জন্য নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম) আমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনার সাথে সম্পৃক্ত করেন। বর্তমানে অনেক লোক শিল্পকলা, ড্রাগ বা সেক্সে এই স্বর্গীয় সম্প্রীতি কামনা করে। আর প্রাচীন দুনিয়ায় নারী-পুরুষেরা তা কামনা করত এমন এক স্থানে বসবাস করে যেখানে হারানো সামগ্রিকতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতকে জেরুসালেমের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ কোনো তথ্য নেই। বাস্তবে 'এক্সাক্রেশন টেক্সটের' পর বেশ কিছু সময়ের জন্য জেরুসালেমের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। তখন ছিল কেনানের সমৃদ্ধির সময়। সপ্তদশ শতকে ফারাওরা ঘরোয়া বিষয়াদি নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল যে 'রেতিনু' নিয়ে ভাবার ফুসরতই পায়নি। ফলে দেশটি সমৃদ্ধ হয়েছিল। মিসরীয়দের আগ্রাসী কোনো অভিযান না থাকায় স্থানীয় সংস্কৃতি এর ফলে বিকশিত হতে পেরেছিল। কেনানের কোনো কোনো শহর পুরোপুরি নগর-রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এগুলোর স্থাপত্য, আসবাবপত্র, গৃহস্থালি সামগ্রী, অলঙ্কার ইত্যাদি মেগেডো, হাজর ও শেচেমে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু জেরুসালেমে সপ্তদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত কোনা মৃৎপাত্র পাওয়া যায়নি। আমরা যতটুকু জানি তা এই যে এ সময়কালে নগরীটি সম্ভবত তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের পরেই আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি, নগরীটি আবার জন বসতিপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। ওই সময় নাগাদ মিসর আবার কেনানে তাদের উপস্থিতি আবারো জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ফারাওরা এখন আনাতোলিয়ায় নতুন হিতিতি সাম্রাজ্য ও উত্তর মেসোপোটেমিয়ার তিত্তানির হুরিয়ান রাজ্যের সাথে সঙ্ঘাতে জড়িত। তাদের এখন নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট দেশ কেনান প্রবলভাবে তাদের

নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ১৪৪৬ সালে ফারাও তৃতীয় থুতমোস মেগিডোতে কেনানি ও সিরীয়দের একটি বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি 'রেটিনোর' মর্যাদা হ্রাস করে মিসরের স্রেফ একটি এলাকায় পরিণত করেন। দেশটিকে চারটি প্রশাসনিক জেলায় ভাগ করা হয়, কেনানের নগর-রাষ্ট্রগুলোর শাসকেরা ফারাওদের সামন্তে পরিণত হয়। তারা তার কাছে ব্যক্তিগতভাবে শপথ গ্রহণ করতেন, তাদের ওপর বিপুল কর চাপানো হলো। বিনিময়ে তারা আরো বেশি সহায়তা ও সমর্থন পাবেন বলে আশা করেছিল। তবে ততটা দিতে আসলে ফারাও প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তারপরও রাজপুরুষেরা বেশ ভালো রকমের স্বাধীনতাই ভোগ করতেন। দেশটি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করার মতো উপায় মিসরের ছিল না। রাজপুরুষেরা সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারতেন, নিজেদের ভূখণ্ড সম্প্রসারণ করতে পারতেন। অবশ্য তত দিনে অন্য বড় শক্তিগুলোও কেনানের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। মিতানি রাজ্যের হুরিয়ানরা পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিক থেকেই দেশটিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা শুরু করে দেয়। বাইবেল অনুযায়ী, এসব লোক নিজেদের বলড হিভিতি' বা 'হোরিত'। স্থানীয় লোকজনের বিপরীতে তারা ছিল আর্য বংশোদ্ভূত। তবে তারা বিজয়ী হিসেবে না এলেও এত প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল যে মিসরীয়রা কেনানকে হুরু' বা 'হুরিয়ান ভূমি' বলতে শুরু করেছিল। হুরিয়ানরা প্রায়ই নগর-রাষ্ট্রগুলোতে ক্ষমতার অবস্থান লাভ করত। তারা স্থানীয় লোকজনের সাথে মিলেমিশে বসবাস করে তাদেরকে আক্কাইডিয়ান ভাষা শেখাতে থাকে। এটিই কূটনৈতিক ভাষা ও কোনিফর্ম লিপিতে পরিণত হয়।

জেরুসালেমে হুরিয়ান প্রভাব ছিল প্রবল। চতুর্দশ শতকে কেনানের অন্যতম নগর-রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল জেরুসালেম। অবশ্য তার মর্যাদা হ্যাগর বা মেগিডোর চেয়ে কম ছিল। এর আয়তন তখন শেচেম ও গেজার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এর শাসক আবদি-হেপার নামটি হুরিয়ান। এই পর্যায়ে জেরুসালেম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ১৮৮৭ সালে মিসরের তেল আল আমারনায় প্রাপ্ত কোনিফর্ম ট্যাবলেট থেকে পাওয়া। এগুলো সম্ভবত ফারাও তৃতীয় আমেনহোটেপ (খ্রিস্টপূর্ব ১৩৮৬-৪৯) ও তার ছেলে আখেনাতেনের (খ্রিস্টপূর্ব ১৩৫০-৩৪) রাজকীয় আর্কাইভের অংশ ছিল। এগুলোর মধ্যে ছিল ফারাও প্রভুর কাছে লেখা কেনানের রাজপুরুষদের প্রায় ৩৫০টি চিঠি। এগুলোতে দেখা যায়, দেশটি

তখন গোলযোগের মধ্যে ছিল। নগর-রাষ্ট্রগুলো একে অপরের সাথে যুদ্ধে মত্ত ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শেচেমের প্রিন্স ল্যাবায়ু নির্মমভাবে সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তার ভূখণ্ড উত্তরে গ্যালিলি সাগর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেছিলেন, পশ্চিম দিকে তা গাজা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। রাজপুরুষেরা অভ্যন্তরীণ শত্রুদের সম্পর্কেও অভিযোগ করেছিলেন। তারা ফারাওয়ের কাছে সহায়তা কামনা করেন। এতে আরো মনে হয়, হিত্তিতিদের সাথে তখন যুদ্ধে নিয়োজিত মিসর তাদের সহায়তা দিয়েছিল সামান্যই। কেনানের অস্থিরতায় সম্ভবত ফারাওকে নাখোশ করেনি। কারণ এর ফলে নগর-রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে মিসরীয় প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করা অসম্ভব করে তুলেছিল।

আমারনা চিঠিগুচ্ছের মধ্যে ছয়টি ছিল জেরুসালেমের আবদি-হেপার। কেনানের যেসব শাসক অপেক্ষাকৃত সফল হয়েছিলেন, তিনি সম্ভবত তাদের মধ্যে ছিলেন না। তিনি অসংযত ভাষায় ফারাওয়ের প্রতি তার আনুগত্যের কথা দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করেন, তার শত্রুদের বিরুদ্ধে সহায়তা করার জন্য জোরালো আবেদন করেন। তবে ওই সাহায্য কখনোই আসেনি। শেচেমের বিরুদ্ধে আবদি- হেপা এগিয়ে যেতে পারেননি, শেষ পর্যন্ত তিনি তার সব মিত্রকে হারান। জেরুসালেম নগরীতে পর্যন্ত অভ্যুত্থান ঘটেছিল। কিন্তু তবুও আবদি-হেপা চাননি, জেরুসালেমে মিসরীয় সৈন্য পাঠানো হোক। তিনি ইতোমধ্যেই অতি সামান্য প্রশিক্ষিত ও অপর্যাপ্ত মিসরীয় সৈন্যদের হাতে হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন। তিনি অভিযোগ ^রেছেন, তারা তার প্রাসাদ ভেঙ্গেছে, তাকে হত্যার চেষ্টা করেছে। তিনি এর বদলে বরং গেজার, ল্যাচিশ বা আশকেলনে শক্তি বাড়ানোর জন্য ফারাওয়ের প্রতি আবেদন জানিয়েছন। মিসর থেকে সহায়তা না এলে জেরুসালেম ভূমি নিশ্চিতভাবেই তার শত্রুদের হাতে পতন ঘটবে।

প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, আবদি-হেপা কখনো তার সৈন্য পাননি। বস্তুত, এই পর্যায়ে, পার্বত্য দেশটি দ্রুত অসামরিককৃত এলাকায় পরিণত হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সুরক্ষিত শহর শিলোহ পরিত্যক্ত হয়, ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট পার্বত্যাঞ্চলের ৮০ ভাগ স্থানের বসতি অদৃশ্য হয়ে যায়। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ

মনে করেন, অস্থিরতার এই সময়ই বাইবেলে বর্ণিত জেবুসিতরা নিজেদেরকে জেরুসালেমে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সাহিত্যিক প্রমাণের ভিত্তিতে অন্যদের দাবি, হিত্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত জেবুসিতরা প্রায় ১২০০ খ্রিস্টপূর্ব সালের দিকে বর্তমান উত্তর তুরস্কের উত্তরে অবস্থিত হিত্তিতি সাম্রাজ্যের পতনের আগে ওই দেশে পৌছেনি! কোনটা সত্য তা নির্ধারণ করা অসম্ভব। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এখন পর্যন্ত কিছু পাওয়া না গেলেও ব্রোঞ্জ যুগের (খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫০-১২০০) শেষ সময়ের দিকে জেরুসালেমের জনসংখ্যার পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আরো দেখা যায়, জেবুসিতরা ছিল স্রেফ অভিজাত পরিবার। তারা শহরের লোকজনের থেকে আলাদা হয়ে দুর্গে বাস করত। ফলে এমনটা হতে পারে যে জেবুসিতরা ওফেলের পুরনো দুর্গগুলো মেরামত করেছিল এবং পাহাড় চূড়া ও প্রাচীরের মাঝখানের পূর্ব দিকের ঢালুতে নতুন এলাকা নির্মাণ করেছিল। ক্যাথলিন কেনিয়ন পাথরে পূর্ণ অনেক চত্বর আবিষ্কার করেছেন। এর ফলে, তিনি বিশ্বাস করতেন, ঢালু এলাকাটি বসবাস উপযোগী হয়, পুরনো নড়বড়ে বাড়িঘর ও খাড়া রাস্তাগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয় এগুলোই। নতুন কাজে দীর্ঘ সময় লাগে। কেনিয়ন দাবি করেছেন, প্রকল্পটি চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝিতে শুরু হলেও তৃতীয় শতকের প্রথম দিকের আগে শেষ হয়নি। কোনো কোনো প্রাচীর ছিল ৩৩ ফুট উঁচু। আর ভূমিকম্প ও ভূমিক্ষয়সহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে নির্মাণকাজে প্রায়ই বিঘ্ন ঘটত।' আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি ছাড়াও নতুন কাঠামোটি সম্ভবত নগরীর প্রতিরক্ষার কাজেও ব্যবহৃত হতো। কেনিয়ন মনে করেছিলেন, বাইবেলিক লেখকদের উল্লেখিত 'মিলো' হতে পারে এটি। কারণ জুদার পরবর্তী রাজাদের কেউ কেউ মিলো মেরামতের কথা বলেছেন। মিলো সম্ভব সামরিক কাজেও ব্যবহৃত হতো। ওফেলের শীর্ষে থাকা নগরদুর্গের অংশও হতে পারে এটি। ধারণা করা যেতে পারে 'জায়ন' নামটি দিয়ে পুরো জেরুসালেম নগরীর কথা বোঝাত না, বরং শুরুতে এটি দিয়ে দুর্গ বোঝানো হতো। এই দুর্গ নগরীর উত্তর ও আরো নাজুক এলাকা নিরাপদ রাখার মাধ্যমে নগরীকে সুরক্ষা রাখত।

আমারনার আমলে জেরুসালেম সম্ভবত এর প্রতিষ্ঠাতা-দেবতা সালেমের প্রতি অনুগত্য বহাল রেখেছিল। ফারাওয়ের কাছে লেখা চিঠিতে আবদি-হেপা 'জেরুসালেম ভূখণ্ডের রাজধানী হিসেবে বেইত-সুলমানির [সালেমের ঘর]' কথা বলেছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা

বিশ্বাস করেন, হুরিয়ানরা নগরীতে নতুন দেবতা নিয়ে এসেছিল। এই দেবতা ছিলেন ঝড়ের দেবতা বাল। সিরীয় উপকূলের উগারিত লোকজন তার উপাসনা করত। ২২ ১৯২৮ সালে রাস শামরায় (প্রাচীন উগারিত এলাকার আধুনিক নগরী) আবিষ্কৃত কোনিফর্ম ট্যাবলেট থেকে আমরা বাল ধর্মমত সম্পর্কে জানতে পারি। আমরা বিষয়টি বিবেচনায় নিতে একটু দম নেব। কারণ জেরুসালেমের আধ্যাত্মিকতার ওপর এর বিপুল প্রভাব রয়েছে।

বাল কিন্তু সিরীয় দেবমণ্ডলের প্রধান দেবতা ছিলেন না। তার বাবা ছিলেন আল। তিনিও হিব্রু বাইবেলে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। আল পৃথিবীর উর্বরতা উৎস দুটি মহানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি তাঁবু-মন্দিরে বাস করতেন। মহাবিশ্বের নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতি বছর দেবতারা সেখানে 'ঐশী পরিষদে' অংশ নিতেন। ফলে আল ছিলেন আইন, শৃঙ্খলা ও উর্বতার উৎস। এগুলো ছাড়া কোনো মানব সভ্যতাই টিকতে পারে না। তবে সময়ের পরিক্রমায় অন্যান্য পরাক্রমশালী দেবতার মতো আলও অনেক দূরের চরিত্রে পরিণত হন। অনেক লোক তার আরো গতিশীল ছেলে বালের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই বাল আকাশের মেঘে চড়তেন, তপ্ত পৃথিবীতে জীবনদায়ী বৃষ্টি আনতে আকাশ থেকে বজ্রপাত ছুঁড়ে মারতেন।

তবে পৃথিবীর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছিল বালকে। নিকট প্রাচ্যে জীবন প্রায়ই বিশৃঙ্খলা, অন্ধকার ও মৃত্যুর শক্তির বিরুদ্ধে নরিয়া সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েছে। সভ্যতা, শৃঙ্খলা ও সৃষ্টিশীলতা কেবল মহা প্রতিকূলতার বিপরীতেই অর্জিত হতে পারে। লোকজন সময়ের সূচনায় দেবতাদের অংশ নেওয়া বিশাল বিশাল যুদ্ধের কাহিনী বলে। এসব যুদ্ধের মাধ্যমেই অন্ধকার থেকে আলো বের হয়ে এসেছিল, বিশৃঙ্খলা অবসানকারী শান্তি এসেছিল, অরাজকতাকে মহাবিশ্বের যথাযথ ও ব্যবস্থাপনাযোগ্য উপাদান হিসেবে রেখেছিল। ফলে বেবিলনের উপাসনাবিধিতে সমুদ্র-দানব তিয়ামাতকে হত্যা করে তার মৃতদেহ দুই টুকরা করার মাধ্যমে দুনিয়া সৃষ্টিকারী তরুণযোদ্ধা মারদুকের যুদ্ধ জয়ের স্মারক অনুষ্ঠান ছিল। বাল সম্পর্কেও এ ধরনের কাহিনী রয়েছে। একটি মিথ অনুযায়ী, তিনি সাত মাথাওয়ালা সমুদ্র-রাক্ষস লোতানের,

হিব্রু বাইবেলে বর্ণিত 'লেভিয়াথান', বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। প্রায় সব সংস্কৃতিতেই ড্রাগন বা রাক্ষসেরা অবয়বহীন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যহীনতার প্রতীক বিবেচিত হয়। লোতানকে হত্যার মাধ্যমে বাল অরাজকতার (এ থেকেই ফলে মানুষ ও ঐশী সত্তাসহ সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে) অবয়বহীন অপচয় রোধ করেন। মিথটি বিলুপ্তি ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার শঙ্কা এঁকেছে, বিশেষ করে সভ্যতার প্রাথমিক ওই সময়ে তেমনটি হওয়ার সার্বক্ষণিক আশঙ্কা ছিল।

সাগর দেবতা ও মরুভূমির বিরুদ্ধে বালের অন্যান্য যুদ্ধের কাহিনীতেও একই ধরনের সম্রদ্রতা দেখা যায়। নিকট প্রাচ্যের নগরীগুলো এই দুই প্রাকৃতিক শক্তির কাছে হুমকিগ্রস্ত ছিল। সভ্য নয় এমন সবকিছুর প্রতিনিধিত্ব করত সাগর। আর সবকিছুই ছিল ভয়-জাগানিয়া। সাগর হলো সীমাহীন, অবয়বহীন। এটি বিশাল, উন্মুক্ত ও অমূর্ত। একইসাথে মরুময় প্রান্তরও এগিয়ে গিয়ে উর্বরা ভূমির প্রতি হুমকি সৃষ্টি করত। অথচ উর্বরা ভূমিই ছিল মানব বসতির জন্য একমাত্র উপযোগী স্থান। উগারিতের মিথে সাগর ও নদীর দেবতা যম-নাহার, মৃত্যু, উর্বরতা ও খরার দেবতা মতের বিরুদ্ধে বালের মরিয়া যুদ্ধের কাহিনী রয়েছে। মত বিশেষভাবে ছিল মৃত্যুর মতো। প্রচণ্ড শক্তির আধার মত অতৃপ্তভাবে মানুষের রক্ত-মাংসের অনুসন্ধান করত। মারাত্মক কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করে বাল এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হন। মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধটি ছিল বিশেষভাবে ভীতিকর। কারণ, বালকে দৃশ্যত বন্দি করে মতের রাজ্য ভূগর্বে তথা ভয়ঙ্কর শূন্যতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বালের বন্দিত্বের আমলে খরায় ঝলসে গিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল দুনিয়া। সবশেষে বালই জয়ী হন। অবশ্য তার জয় কখনো সম্পূর্ণ হয়নি। যম ও মত উভয়ই টিকে যায়। ফলে বিশৃঙ্খলার ভীতিকর শক্তির অনেক বছর বিরাজ করার আশঙ্কা থাকে, মৃত্যু সবচেয়ে অপরিহার্য বিষয়। ঈশ্বর ও মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ হয়, তাদের বিরুদ্ধে সীমাহীন যুদ্ধে লড়াই করে।

জয়ের উৎসব করার জন্য নিজের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণের জন্য আলের কাছে অনুমতি চান বাল। প্রাচীন মিথে এমনটা বারবারই দেখা যায়। মারদক পৃথিবী সৃষ্টির পর দেবতা ও মানুষ মিলে পৃথিবীর কেন্দ্রে বেবিলন নগরী সৃষ্টি করেছিল। বাব-ইলানিতে ('ঈশ্বরদের দরজা') দেবতারা ঐশী পরিষদের সভায় অংশ নিতে প্রতি বছর জমায়েত

হতেন। এটি ছিল নারী-পুরুষের নশ্বর জগত! তারা জানত, তারা সেখানে ঈশ্বরদের কাছে যেতে পারে। নগরীর কেন্দ্রে তারা মারদকের প্রাসাদ হিসেবে মহামন্দির ইসাগিলাও নির্মাণ করেছিল। তিনি সেখানে বাস করতেন, তার প্রতিনিধিত্বকারী রাজার মাধ্যমে ঐশী নির্দেশনা জারি করতেন। অর্থাৎ স্থাপত্যকে বিবেচনা করা হতো ঐশী উদ্দীপ্ত কার্যক্রম হিসেবে। বিশাল বিশাল পাথুরে নগরী, মন্দির ও উপাসনালয়কে বিপুল অর্জন বিবেচনা করা হতো। এসব বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্পন্নকারী মানুষ অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী বলে বিবেচিত হতো। এগুলো ছিল অবয়বহীনতা ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে মানব-দেবতা বিজয়ের স্থায়ী স্মারক।

একইভাবে কোনো প্রাসাদ ছাড়া বালের পক্ষে দেবতাদের ওপর শাসন চালানো সম্ভব ছিল না। মাউন্ট জ্যাফনের ওপর স্বর্ণ ও রত্নপাথরের তৈরি অনিন্দ্যসুন্দর প্রাসাদটি তৈরির পরই তিনি সত্যিকারের 'প্রভু' হয়েছিলেন। এরপর থেকে দেবতা ও মানুষ উভয়কেই শাসন করতে লাগলেন বাল। তিনি ঘোষণা করলেন :

একমাত্র আমিই দেবতাদের রাজা হতে পারি,

যা দেবতা ও মানুষদেরকে পুষ্ট করে

পৃথিবীকে বহু ভাবে তৃপ্ত করে।২৩

বাল ও তার স্ত্রী আনাত ওই মন্দিরে পৃথিবীতে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের মহাবিজয় উদযাপন করেন :

আমি কি আলের প্রিয়ভাজন যমকে ধ্বংস করিনি...

ড্রাগনকে ধরে বিলীন করা হয়নি?

আমি সাত মাথাওয়ালা ফনা ধরা সাপকে

ধ্বংস করেছি। ২৪

উগারিতের লোকজন বালের জাফোন আবাসস্থল থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে বাস করত। তারা মনে করত, বালের ভূখণ্ডে বাস করায় তারাও ওই বিজয়ের অংশীদার। উগারিতের প্রার্থনাবিধিতে জাফোনকে বাল বলেন, 'পবিত্র স্থান, আমার ঐতিহ্যের পর্বত... মনোনীত স্থান, বিজয়ের পাহাড়।' জাফোন ছিল তাদের দুনিয়ার কেন্দ্র। এটি ছিল 'পবিত্র স্থান,' 'সুন্দর পর্বত' ও 'পুরো দুনিয়ার আনন্দ।'২৫ বাল সেখানে থাকার কারণেই তিনি জাফোনকে শান্তি, উর্বরতা ও সম্প্রীতির দুনিয়াবি স্বর্গে পরিণত করেছিলেন। তিনি 'দুনিয়া থেকে যুদ্ধ দূর করেছিলেন। পৃথিবীর গভীরে শান্তি এবাহিত করেছিলেন।' 'মাঠে গভীরে ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২৬ উগারিতের লোকজন এই ঐশী উর্বরতা ও শান্তি উপভোগ নিশ্চিত করার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করে। এটি ছিল মাউন্ট জাফোনে বালের প্রাসাদের প্রতিরূপ। বাল যাতে ঈশ্বরকে অনুকরণ করার মূলনীতি অনুযায়ী তাদের সাথেও যাতে বাস করতে থাকেন সেজন্য তারা তাদের কাছে প্রকাশ হওয়া চূড়ান্ত অবয়বটি নকল করে নিয়ে আসে অবিকল প্রতিকৃতি তৈরি করার জন্য। ফলে স্বর্গ দুনিয়াতে তাদের নগরীতে চলে আসে, তারা জীবনের স্বতন্ত্র অবস্থান রচনা করতে পারে। বিপজ্জনক দুনিয়ার মধ্যে থাকায় এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করত তারা।

উগারিতের মন্দিরে বালের উপস্থিতির কারণেই সেখানে মানবজীবন সম্ভব করে তোলে। লোকজন মন্দিরে প্রবেশ করার সময় অস্তিত্বের আরেক মাত্রায় প্রবেশের অনুভূতি লাভ করত, মানুষের কাছে সাধারণভাবে গোপন থাকা প্রাকৃতিক ও ঐশী মাত্রার সাথে আবারো তারা যোগাযোগ করতে পারত। তারা শুনতে পেত

গাছের কথা, পাথরের ফিসফিসানি,

পৃথিবীর সাথে আকাশের কথোপকথন

তারকারাজির সাথে তাদের সম্পর্ক।

...বিদ্যুত চমকে তারা আকাশের কিছু জানত না

কথা যা মানুষ জানত না

এবং পৃথিবীর ব্যপ্তি বুঝত না। ২৭

প্রাচীন দুনিয়ায় মন্দিরকে প্রায়ই স্বপ্নাবিভাবের স্থান বিবেচনা করা হতো। এখানে লোকজন অধিকতর দূরকে ও ভিন্নভাবে দেখতে পাওয়া শিখত। তারা কর্মধারার জীবনকে দেখার জন্য নিজেদের কল্পনাপ্রসূতভাবে বিস্তৃত করত। মন্দিরের প্রার্থনাবিধি ও স্থাপত্য ছিল অস্তিত্বের আরো পূর্ণাঙ্গ ও তীব্রতর কল্পনার সৃষ্টিশীল প্রয়াসের অংশবিশেষ। তবে এটি লক্ষ্য বাস্তবায়নের কর্মসূচিও ছিল। উগারিতের লোকজন তাদের শাস্ত্রাচারে বালের যুদ্ধের পুনারাবৃত্তি করত, ঐশী নাটকে মাউন্ট জাফোনে তার সিংহাসন আরোহণ উদযাপন করত। এই বসন্তকালীন উৎসব নতুন বছরের সূচনা প্রকাশ করত। বালের বিজয়গুলো পুনরাবৃত্তি ও অনুকরণ করা হতো, যাতে জীবনদায়ী বৃষ্টি আবারো নেমে আসে, নগরীটি ধ্বংসকারী বিশৃঙ্খলার বিপরীতে শান্তিপূর্ণ থাকে। রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানও উগারিতের বালের শ্বাশত ঐতিহ্যের' তথা তারা যাতে শান্তিতে ও প্রাচুর্যে থাকতে পারে, এমন আশার অংশ হিসেবে হতো।২৮

উপাসনাবিধির কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব থাকতেন খোদ রাজা। তিনি সিংহাসনে বসতেন, তার মাথা বালের প্রতিনিধি হিসেবে তেলে ঝকমক করত। নিকট প্রাচ্যের অন্যান্য রাজার মতো তিনিও ঈশ্বরের প্রতিভূ বিবেচিত হতেন, তার সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত কর্তব্য থাকত। এই পর্যায়ে নিকট প্রাচ্যের লোকজন ধর্ম নিয়ে অসংযত আশাবাদী ছিল না। তাদের কাছে 'পাপমোচনের' মানে অবিনশ্বরতা ছিল না : তা ছিল দেবতাদের একান্ত অধিকার। তাদের লক্ষ্য ছিল আরো সাদামাটা : দুনিয়ার বুকে পরিমার্জিত, সুশৃঙ্খল জীবন টিকিয়ে রাখতে, বৈরী শক্তিগুলোকে কোণঠাসা রাখতে দেবতাদের সহায়তা করা। যুদ্ধ ছিল রাজার অপরিহার্য কর্তব্যকর্মগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নগরীর শত্রুদের প্রায়ই বিশৃঙ্খল শক্তির সাথে মিলিয়ে ফেলা হতো। কারণ তারা কেবল ধ্বংসই করতে পারত। কিন্তু তারপরও শান্তির জন্যও যুদ্ধ করা হতো। নিকট প্রাচ্যের রাজাকে তার নগরীর দেবতাদের জন্য মন্দির নির্মাণ ও সেগুলো যথাযথভাবে মেরামত করার শপথ জোর দিয়ে করতেন। এভাবে ঐশী বিশ্বের হাতে থাকা নগরীর জীবনপ্রবাহ সুরক্ষিত রাখার কথা ভাবা হয়েছিল। তবে নগরীর জন্য খাল খনন করা, নগরী যাতে সবসময় সুরক্ষিত থাকে, সে ব্যবস্থাও তাকে করতে

হতো। কোনো নগরীই মূল্যবান বিবেচিত হতো না যদি না সেটি তার শত্রুদের থেকে নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে না পারত। বেবিলনের গিলগামেশ মহাকাব্যের শুরু ও শেষে থেকে উরুকের লোকজনকে নগরীর প্রাচীরগুলোর শক্তিমত্তা ও শিল্প-কুশলতার প্রশংসা করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয়েছে :

ভিত্তি বিন্যাস খতিয়ে দেখো, ইটভাটা পরীক্ষা করো

ইটভাটা যদি ইট পোড়াতে না পারে

আর সাত [জ্ঞানী] ভিত্তি স্থাপন করছেন কিনা দেখো। ২৯

রাজা গিলগামেশ মানবীয় অবস্থা থেকে উত্তরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নগরী ত্যাগ করে শ্বাশত জীবনের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। তার প্রয়াস ব্যর্থ হলেও কবি 'আমাদের বলছেন, তিনি অন্তত আক্রমণ থেকে তার নগরীকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন, নিজেকে উরুকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। পৃথিবীতে এ স্থানটি তার সমার্থক হয়ে ওঠেছিল।

নিকট প্রাচ্যের রাজার আরেকটি কাজও থাকত। তাকে আইন জারি করতে হতো। এই আইন অনেকটাই ঐশী সৃষ্টি বলে বিবেচিত হতো। মনে করা হতো ঈশ্বরেরাই এই আইন রাজার কাছে নাজিল করেছেন। বিখ্যাত একটি কেন্দ্রস্তম্ভে অষ্টাদশ শতকের বেবিলনের রাজা হাম্বুরাবিকে দেখা যায় সিংহাসনে বসা ঈশ্বর শেমেশের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তার কাছ থেকে আইন গ্রহণ করছেন। তার আইন সংহিতায় তিনি দৃঢ়ভাবে জানান, ঈশ্বরেরা তাকে নিযুক্ত করেছেন

রাজ্যে বিচারের ব্যবস্থা করতে,

বদ ও অপঃশক্তিকে ধ্বংস করতে,

যাতে শক্তিশালীরা দুর্বলদের নির্যাতন করতে না পারে।

নগরীর ভৌত আবরণ রক্ষার জন্য রাজা এর সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করতে বাধ্য ছিলেন। নগরীর অভ্যন্তরে শোষণ, দারিদ্র ও অসন্তোষ যদি অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে, তবে বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্গ সুরক্ষিত করার কাজটি তেমন ফলপ্রসূ হবে না। ফলে রাজা নিজেকে জাতির রাখাল হিসেবে উপস্থাপন করতেন, ঠিক যেমনভাবে হাম্বুরাবি তার নিজের আইন সংহিতার উপসংহারে বলে গেছেন

আমি লোকজনকে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বাস করার ব্যবস্থা করেছি;

আমি কাউকে তাদেরকে অন্যদের সন্ত্রস্ত্র করতে দেইনি...

ফলে আমি কল্যাণকামী রাখাল যার রাজদণ্ড সত্যনিষ্ঠ;

আমার সদয় ছায়া পুরো নগর ছেয়ে আছে।

আমার হৃদয়ে আমি সুমের ও আকাদ জাতিকে বহন করি;

আমার সুরক্ষায় তারা সমৃদ্ধ হয়;

আমি তাদের শান্তিতে পরিচালনা করি;

আমার শক্তিতে তাদের আশ্রয় দিয়েছি। ৩১

উগারিতেও রাজাকে বিধবা ও এতিমদের যত্ন নিতে হবে বলে বিবেচনা করা হতো।৩২ আর তা করা হতো নগরীতে বিরাজমান ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষ ব্যবস্থার মাধ্যমে। দুর্ভিক্ষ ও খরা যাতে দূরে থাকে, জমি যাতে উর্বরা থাকে সেটিও তাকে নিশ্চিত করতে হতো। ঐশী ব্যবস্থার জন্য দুটিই দরকারি। বৈরী দুনিয়ার মধ্যে কোনো নগরী শান্তিপূর্ণ, উর্বরা হতে পারে না যদি জনগণের কল্যাণের প্রতি সবচেয়ে অগ্রাধিকার না দেওয়া হয়।৩৩ নিকট প্রাচ্যজুড়ে ন্যায়বিচারের এই আদর্শ ছিল ঐশী রাজা ও পবিত্র নগরীর ধারণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোকজন ভালোভাবেই অবগত ছিল, কেবলমাত্র সুবিধাভোগী এলিটরাই সভ্যতার কল্যাণ উপভোগ করতে পারে। ভঙ্গুরব্যবস্থা আনায়াসেই ক্রুদ্ধ কৃষকেরা গুঁড়িয়ে

দিতে পারে। ফলে সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য যুদ্ধ ছিল শান্তির আদর্শ নগরীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উগারিতের ইতিহাসেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। এখানকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাত হাজার। তারা প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল রাজকীয় ব্যবস্থার ওপর। আর এই ব্যবস্থা টিকে ছিল আশপাশের মাত্র ২৫ হাজার কৃষকের সহায়তার ওপর। এই বিশাল সভ্যতা নির্মিত হয়েছিল গরিবদের ওপর ভর করে। এটি হয়তো বালের যুদ্ধগুলোর কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে। এসব যুদ্ধে অন্যকে বশ মানানোর ওপর সৃষ্টিশীলতা ও শৃঙ্খলা নির্ভরশীল বলে দেখা হতো। শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থাটি অকার্যকর প্রমাণিত হয়, ত্রয়োদশ শতকের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, গ্রামবাসীরা চলে যায়, নগর-রাষ্ট্রগুলো এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও আনাতোলিয়ার 'সাগর মানবদের' আক্রমণ সহ্য করতে পারেনি। বৃহত্তর সামাজিক সাম্য অনুসন্ধান স্রেফ ধর্মীয় কল্পকথা ছিল না, এটি ছিল পবিত্র নগরীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার অপরিহার্য বিষয় এবং তা রয়ে যায়। পরে জেরুসালেমের ইতিহাসে দেখা যাবে, নিপীড়নকারী সরকারগুলো অনেক সময় তাদের নিজেদের পতনের বীজ বপণ করেছে।

ব্রোঞ্জ যুগে জেরুসালেমের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা জেবুসিতদের কোনো মন্দিরের চিহ্ন খুঁজে পাননি, মাউন্ট জায়ন ধর্মাদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে উগারিতের মতো কোনো কিছু এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু তার পরও উগারিত টেক্সট ও কিছু হিব্রু সালমের মধ্যে অস্পষ্ট সামঞ্জস্য দেখা যায়। এগুলোই মাউন্ট জায়ন প্রশ্নে ইসরাইলি ধর্মাদর্শে ব্যবহৃত হয়েছিল। সামে থাকা উগারিতের স্রোত বাক্যসমষ্টিতে মাউন্ট জায়নে ইসরাইলের ঈশ্বরের সিংহাসনে আহরণ উদযাপন করতে দেখা যায়। এতে 'লেভিয়াথান' ও সৃষ্টির দিনে ড্রাগনের বিরুদ্ধে জয়ের প্রশংসা করা হয়েছে। মাউন্ট জায়নকে শান্তির নগরী, পবিত্র পর্বত ও একে ঈশ্বরের শ্বাশত ঐতিহ্য হিসেবেও অভিহিত করা হয়েছে। হিব্রু বাইবেলে অনেক সময় 'জায়নকে' এমনকি 'জাফোন' নামেও ডাকা হয়েছে। আমরা জানি যে হুরিয়ানরাও বাল ও জাফোনে তার মন্দির সম্পর্কে গল্প বলেছে। এ কারণে বিশেষজ্ঞরা উপসংহার টেনেছেন যে তারা

জেরুসালেমে বালের মতাদর্শ নিয়ে এসেছিল। এটি একদিন মাউন্ট জায়নে ইসরাইলি মতাদর্শের শান্তির নগরীর উগারিটিক ধারণার প্রবর্তন করেছিল।৩৪ নিকট প্রাচ্যের লোকজন অনাদি কাল থেকে নিরাপত্তা লাভের আকাঙ্ক্ষা করে আসছে। মনে হচ্ছে, জেরুসালেম তার লোকজনকে তাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছিল। নগরীটি ত্রয়োদশ শতকের অস্থিরতা থেকে টিকে থাকতে পেরেছিল, অথচ ওই সময় কেনানি পাহাড়ের অনেক বসতি পরিত্যক্ত হয়েছিল। বাইবেল ইঙ্গিত দিচ্ছে, জায়নের জেবুসাইত দুর্গটি অভেদ্য বিবেচিত হতো। দ্বাদশ শতকে নতুন নতুন হুমকি ও শত্রুর আবির্ভাব ঘটে। আবারো মিসর কেনানের ওপর থেকে তার নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করে; হিত্তিতি সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়, মেসোপোটেমিয়া প্লেগ ও দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত হয়। আবারো সভ্যতা ভঙ্গুর ও ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়। লোকজন নতুন স্বর্গের খোঁজ করতে থাকায় বিপুল মাত্রায় অভিবাসন ঘটে। পরাশক্তিগুলোর পতন ঘটতে থাকায় তাদের স্থানে নতুন নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এগুলোর একটি হলো কেনানের দক্ষিণ উপকূলের ফিলিস্তিয়া। মিসর আক্রমণকারী 'সাগর-মানবদের' মধ্যে হয়তো ফিলিস্তিনিরাও ছিল। তাদের দমন করা হয়, তারা হয় ফারাওদের সামন্ত। তৃতীয় রামসেস তার প্রতিনিধি হিসেবে কেনান শাসন করার জন্য ফিলিস্তিনিদের সেখানে বাস করতে দিয়ে থাকতে পারেন। নতুন ভূখণ্ডে তারা স্থানীয় ধর্ম গ্রহণ করে নিজেদের আশখেলন, অ্যাশদোদ, একরন, গথ ও গাজা নামের পাঁচটি নগর-রাষ্ট্রে সংগঠিত করে। মিসর দুর্বল হতে থাকায় ফিলিস্তিয়া শেষ পর্যন্ত স্বাধীন হয়ে এবং এমনকি কেনানের কার্যত শাসকে পরিণত হয়। কিন্তু একাদশ শতকে কেনানের অধিবাসীদেরকে সেখানে এক নতুন শক্তির মুখোমুখি হতে হয়। পাহাড়ি দেশে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আগের যেকোনো কেনানি সত্তার চেয়ে পুরোপুরি ভিন্ন ছিল। শেষ পর্যন্ত জেবুসাইত জায়ন নিজেকে নতুন আগ্রাসী শক্তির সামনে পুরোপুরি ঘেরাও দেখতে পায় : ইসরাইল রাজ্য চির দিনের জন্য তার ভাগ্য বদলে ফেলে।

ইসরাইল

ইসরাইলি ছিল কারা? বাইবেল আমাদের জানায় যে তারা শুরুতে এসেছিল মেসোপোটেমিয়া থেকে। একসময় তারা কেনানে বসতি স্থাপন করে। তারপর খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ সালের দিকে দুর্ভিক্ষের সময় ইসরাইলের ১২টি গোত্র মিসরে অভিবাসন করে। প্রথমে তারা মিসরে সমৃদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তাদের অবস্থার অবনতি ঘটে, তারা ক্রীতদাসে পরিণত হয়। সবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ১২৫০ সালের দিকে তারা মুসার নেতৃত্বে মিসর থেকে পালিয়ে গিয়ে সিনাই উপদ্বীপে যাযাবর জীবনযাপন করতে থাকে। তবে তারা একে তাদের স্থায়ী সমাধান মনে করেনি। কারণ তারা নিশ্চিত ছিল, তাদের ঈশ্বর যিহোবা তাদেরকে কেনানের উর্বরা ভূমির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইসরাইলিরা প্রতিশ্রুত ভূমিতে পৌঁছার আগেই মুসা মারা যান। তবে যশুয়ার অধীনে গোত্রগুলো বলপূর্বক কেনানে ঢুকে পড়ে, তাদের ঈশ্বরের নামে তরবারির সাহায্যে দেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সালের দিকে ঘটনাটি ঘটেছিল। বাইবেল ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞের কথা বলে। যশুয়া জয় করেছিলেন 'পার্বত্যাঞ্চল, নেগেভ, নিম্নভূমি, পাহাড়ি এলাকা এবং তাদের সব রাজাকে। তিনি একজনকেও জীবিত রাখেননি। ১২টি গোত্রের সবাইকে কেনানের একটি করে অংশ বরাদ্দ করা হয়। তবে জুদা ও বেনিয়ামিনের ভূখণ্ডের মধ্যে একটি নগরী প্রতিরোধ ছিল : 'জুদার ছেলেরা জেরুসালেমে বসবাসকারী জেবুসিতদের তাড়িয়ে দিতে পারেনি' বলে স্বীকার করে নিয়েছে বাইবেল। 'জেবুসিতেরা জুদার সন্তানদের পাশাপাশি জেরুসালেমে বাস করতে থাকে, ঠিক এখন তারা যেভাবে বাস করছে।২ শেষ পর্যন্ত ইসরাইলের ধর্মের মূল বিষয়ে পরিণত হয় জেরুসালেম। তবে বাইবেলে স্পষ্টভাবে এই নগরীর নাম প্রথমবার উল্লেখ করার সময় এটিকে শত্রু ভূখণ্ড হিসেবে অভিহিত করেছিল।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষজ্ঞরা বাইবেলের ভাষ্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। প্রত্নতাত্ত্বিদেরা কেনানি কিছু এলাকায় ধ্বংসের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। তবে এগুলো সুনির্দিষ্টভাবে ইসরাইলের সাথে সম্পর্কিত নয়। ইসরাইলিদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হওয়া পাহাড়ি এলাকায় বিদেশি আক্রমণের কোনো চিহ্ন নেই। এমনকি বাইবেল লেখকেরা

স্বীকার করেছেন, যশুয়ার বিজয় সামগ্রিক ছিল না। তারা বলছেন, তিনি কেনানি নগর-রাষ্ট্রগুলোকে পরাজিত করতে পারেননি, তিনি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে কোনো সাফল্য পাননি। যওয়ার গ্রন্থটির প্রথম ১২টি অধ্যায় সতর্কভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে বেশির ভাগ পদক্ষেপ বেনিয়ামিন ভূখণ্ডের খুবই ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। বস্তুত বাইবেল আমাদের মধ্যে বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি করে যে যশুয়ার বিজয় বড় ধরনের কিছু ছিল না। অবশ্য ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রে এমন অনেক বিশেষজ্ঞ এখনো আছেন যারা মনে করেন, এই প্রক্রিয়ায় ইসরাইলিরা দেশটি জয় করেছিল। তবে অন্যরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন যে বাইরে থেকে হঠাৎ করে সহিংসভাবে প্রবেশ করার বদলে কেনানি সমাজের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ও ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়েছিল ইসরাইল।

ইসরাইল যে ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে কেনানে পৌঁছেছিল তা নিয়ে সন্দেহ নেই। খ্রিস্টপূর্ব ১২০৭ সালে ফারাও মারনেপতাহর সফল অভিযানের কেন্দ্রস্তম্ভ স্মারকে আমরা অন্য বিজয়ীদের মধ্যে এই আগমন দেখতে পাই : 'ইসরাইল খুবই ক্ষতিকারক, কিন্তু এর বীজের নয়।' তবে এই সময় বাইবেলের বাইরের এর উল্লেখ এই একটিই পাওয়া যায়। সাধারণভাবে মনে করা হয়, চতুর্দশ শতকে বিভিন্ন খোদাইলিপি ও নথিপত্রে উল্লেখিত হ্যাপির বা অ্যাপিরু ছিল যওয়ার 'হিব্রু' গোত্রগুলোর পূর্বসূরী। তবে মনে হয়, হ্যাপির কোনো জাতিগত গ্রুপ ছিল না, বরং কেনানি সমাজের কোনো শ্রেণি ছিল। তারা সামাজিক অচ্ছ্যুতে পরিণত হয়ে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে নগর-রাষ্ট্রগুলো থেকে নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিল। অনেক সময় তারা লুটতরাজকারীতে পরিণত হয়, অনেক সময় ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিল। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, কেনানে তারা ধ্বংস সৃষ্টিকারী বাহিনী হিসেবে বিবেচিত হতো। হ্যাপিরুদের ব্যাপারে আবদি হেপা নিজেও উদ্বেগে ছিলেন। মিসরে দলচ্যুত হয়ে ইসরাইলিরা প্রথমে নিজেদের 'হিব্রু' হিসেবে অভিহিত করেছিল। তবে ওই এলাকায় একমাত্র তারাই হ্যাপির ছিল না।

এর বদলে বর্তমান সময়ের বিশেষজ্ঞরা কেনানের মধ্য পাহাড়ি এলাকায় নতুন বসতি স্থাপনের প্রবল উদ্যোগের সাথে ইসরাইলের জন্মকে সম্পৃক্ত করেছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা জেরুসালেমের উত্তরে পার্বত এলাকায় খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সালের অরক্ষিত নতুন প্রায় ১০০

গ্রামের সন্ধান পেয়েছেন। এই বিরানভূমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব ছিল না। তারা সম্ভবত ওই সময়ের সর্বশেষ কোনো প্রযুক্তি করায়ত্ত করে সেখানে বসতি স্থাপন সম্ভব করেছিল। নতুন বসতি স্থাপনকারীরা ভেড়া, ছাগল ও ষাঁড়ের শঙ্করকরণের কষ্টকর কাজের মাধ্যমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। বসতি স্থাপনকারীরা যে বিদেশি ছিল- এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এসব গ্রামের

বস্তুগত সংস্কৃতি উপকূলীয় সমভূমির মতোই একই ধরনের দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এ কারণে উপসংহার টেনেছেন, বসতি স্থাপনকারীরা প্রায় নিশ্চিতভাবেই ছিল স্থানীয় কেনানি।' তখন ছিল বিশেষ করে নগর-রাষ্ট্রগুলোতে অস্থিরতার সময়। অনেকে পাহাড়ি এলাকাকেই বাস করার স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিল। সেখানে তাদের কঠোর জীবনযাপন করতে হলেও যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত ছিল, এ দুটি তখন উপকূলের ক্ষয়িষ্ণু নগর-রাষ্ট্রগুলোর স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। বসতি স্থাপনকারীদের অনেকে হ্যাপির হলেও অন্যরা ছিল যাযাবর। এই বিক্ষুব্ধ সময়ের সাথে মানিয়ে নিতে তারা এই অবস্থা গ্রহণ করেছিল। কেনানি শহরগুলো থেকে আলাদা হওয়ার এই অভিবাসনই কি ইসরাইলের কেন্দ্রবিন্দু ছিল? নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতকে এ এলাকাতেই ইসরাইল রাজ্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই তত্ত্ব ঠিক হলে 'ইসরাইলিরা' সম্ভভত কেনানের স্থানীয় বাসিন্দা ছিল, তারা পাহাড়ি এলাকায় বসতি স্থাপন করে ধীরে ধীরে আলাদা পরিচিতি অর্জন করেছিল। অনিবার্যভাবেই তারা মাঝে মাঝে অন্যান্য নগরীর সাথে সঙ্ঘাতে জড়িয়ে পড়ত, এসব সংঘর্ষের কাহিনীই যওয়া ও জাজের বর্ণনার ভিত্তি।

কিন্তু ইসরাইলিরা যদি কেনানিই হয়ে থাকে, তবে কেন বাইবেলে এত জোর দিয়ে বলা হলো যে তারা বহিরাগত? ইসরাইলি পরিচিতিতে তাদের বহিরাগত উৎস নিরঙ্কুশভাবে মূল বিষয়। বস্তুত, পেন্টাটেয়ুচের, বাইবেলের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থে, গল্পে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে ইসরাইলের আবাসভূমি অনুসন্ধানের কাহিনী। বহিষ্কারের পুরো গল্পই বানোয়াট, এমনটি বিশ্বাস করা অচিন্তনীয় ব্যাপার। সম্ভবত কিছু হ্যাপিরু ফারাওয়ের করভি (বাধ্যতাপূর্ণ শ্রমিক) পালিয়ে পরে পাহাড়ি দেশের কেনানি বসতিগুলোতে যোগ দিয়েছিল। এমনকি বাইবেলেও ইঙ্গিত দিচ্ছে, ইসরাইলের সব মানুষ এক্সডাসে অংশ নেয়নি।' শেষ

পর্যন্ত মিসর থেকে নবাগত এসব লোকের ধর্ম ও পুরাণতত্ত্বই ইসরাইলের প্রধান মতাদর্শে পরিণত হয়। দাসত্ব থেকে ঐশী মুক্তির গল্প ও ঈশ্বর যিহোবার বিশেষ সুরক্ষা হয়তো কেনানিদের কাছে বিশেষ আবেদনময় হয়েছিল। কারণ তারাও নির্যাতনকারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছিল। তারা সচেতন ছিল যে তারা তাদের পাহাড়ি এলাকায় বসতি স্থাপনে উত্তেজনাকর নতুন পরীক্ষা চালাচ্ছে।

ইসরাইলিরা দেশে প্রধান শক্তিতে পরিণত হওয়ার আগে পর্যন্ত নিজেদের ইতিহাস লিখতে শুরু করেনি। বিশেষজ্ঞরা ঐতিহ্যগতভাবে পেন্টাটেয়াচের গ্রন্থে থাকা চারটি উৎস দেখতে পেয়েছেন। প্রথম দুই লেখক পরিচিত 'জে' ও 'ই' নামে। কারণ, তারা ইসরাইলের ঈশ্বরের পদবি হিসেবে যথাক্রমে 'যিহোবা' ও 'ইলোহিম' ব্যবহার করেছিলেন। তারা সম্ভবত দশম শতকে লিখেছিলেন, অবশ্য কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এগুলো লেখা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে। ডিউটারোনোমিস্ট ('ডি') ও প্রিস্টলি ('পি') নামের দুই লেখক ষষ্ট শতকের সময় সক্রিয় ছিলেন। এই সময় বা এর আগেই ইসরাইলিদের বেবিলনে নির্বাসন ঘটেছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই ব্যাখ্যা পরিতৃপ্ত করতে পারছে না। অনেক বিশেষজ্ঞ আরো চরম তত্ত্ব প্রকাশ করছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তাদের অনেকে বলছেন, পুরো পেন্টাটেউচই রচিত হয়েছিল ষষ্ট শতকের শেষ দিকে, তা লিখেছিলেন মাত্র একজন লেখক। তবে এখন পর্যন্ত প্রথাগতভাবে চার উৎস তত্ত্বের আলোকে বাইবেলের প্রাথমিক গ্রন্থগুলো বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ইসরাইল ও জুদার- যশুয়া, জাজেজ, স্যামুয়েল ও রাজাদের গ্রন্থরাজি- পরবর্তী ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলো লেখা হয়েছিল প্রবাসকালে ডিউটারোনোমিস্ট অনুসারী ('ডি') ইতিহাসবিদদের হাতে। তাদের আদর্শগুলো আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করব। তারা অনেক সময় আগের উৎস ও ইতিহাস ধারা নিয়ে কাজ করলেও নিজেদের ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দিকেই ধাবিত হতেন। দি ক্রোনিক্লেয়ার সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে লিখেছিলেন। তিনি তার সূত্রগুলোর প্রতি বেশ উদ্ধত্য ছিলেন। আমাদের লেখকদের কেউই আজকের মানদণ্ড অনুযায়ী বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস লেখেননি। তাদের নিজেদের সময়ে জনগণ অতীতকে কিভাবে দেখেছে তাই তারা তুলে ধরেছেন।

ইসরাইলের তিন গোষ্ঠীপতি (প্যাট্রিয়াক) ইব্রাহিম (আব্রাহাম), ইসহাক (আইজ্যাক) ও ইয়াকুব (জ্যাকব) সম্পর্কে এসব কাহিনী বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যেসব ঘটনার বর্ণনা তারা দিচ্ছেন বলে দাবি করেছেন, সেগুলো ঘটেছিল তাদের লেখা শুরু করার হাজার বছর আগে। তারা কিংবদন্তি, আমাদের দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নন। বাইবেলের লেখকেরা ঊনিশ ও আঠারো শতকের কেনানের জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দেশটিতে ওই সময় মিসরীয়দের শক্তিশালী উপস্থিতি সম্পর্কে তারা কিছুই উল্লেখ করেননি। কিন্তু তার পরও গোষ্ঠীপতিদের এসব কাহিনী গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ, জে ও ই যখন লিখছিলেন, তখন ইসরাইলিরা কিভাবে নিজেদের আলাদা পরিচিতি নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন তা তারা দেখেছেন। এই সময় ইসরাইলিরা বিশ্বাস করত, তারা সবাই অভিন্ন পূর্বপুরুষ ইয়াকুবের বংশধর। এই ইয়াকুবই দেবতার সাথে তার বিশেষ সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে নতুন নাম ইসরাইল ('আল্লাহ তার শক্তি প্রদর্শন করুন!' কিংবা বিকল্পভাবে বলা যায়, 'আল্লাহর জন্য যে সংগ্রাম করে') দিয়েছিলেন। ইয়াকুব/ইসরাইলের ১২টি ছেলে ছিল। তাদের প্রত্যেকে একটি করে গোত্রের জনক। এরপর ইসরাইলিরা যার দিকে তাকাত, তিনি হলেন ইয়াকুবের দাদা ইব্রাহিম। তাকে ঈশ্বর নতুন জাতির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। তাদের বিশ্বাস এতই প্রবল ছিল যে তারা তাদের মূল কেনানে নিজেদের সীমিত না রেখে পূর্বপুরুষদের সন্ধানে মেসোপোটেমিয়ায় ফিরে গিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫০ সাল নাগাদ তারা বিশ্বাস করত, ঈশ্বর হারানে ইব্রাহিমের কাছে এসে তাকে বলেছিলেন : 'আমি তোমাকে যে ভূমি দেখিয়ে দেব, তার জন্য তুমি তোমার দেশ, তোমার পরিবার ও তোমার বাবার গৃহ ত্যাগ করো। ওই দেশটি হলো কেনান। ইব্রাহিম কথামতো মেসোপোটেমিয়া ত্যাগ করেছিলেন, তবে কেনানে বসবাস করছিলেন অভিবাসী হিসেবে। হেবরনের ম্যাচপেলাহ গুহায় স্ত্রীর কবরের জন্য এক টুকরা জমি কেনার আগে তার কোনো ভূমি ছিল না।

একটি আবাসভূমির সন্ধান করার জন্য গোষ্ঠীপতির ভাষ্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুব সবাই কেনানে তাদের বিদেশি পরিচিতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।' ইব্রাহিমের পৌছার ঘটনা বর্ণনা করার সময় 'জে' পাঠককে একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : 'ওই সময় ওই ভূমিতে ছিল কেনানিরা।' এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

জেরুসালেমের ও পবিত্র ভূমির ইতিহাসে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম- সবাইকে এই সত্যের সাথে মানিয়ে নিতে হয়েছিল যে নগরী ও ভূমিটি তাদের আগে অন্য জাতির কাছে ঐশী শক্তিসম্পন্ন ছিল এবং তাদের অধিকারের সত্যতা অনেকাংশে নির্ভর করতে তাদের পূর্বসূরীদের প্রতি তারা কেমন আচরণ করছে তার ওপর।

মনোনীতি জাতির আগে কেনানে অন্য জনগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ধারণাটিকে দেখা যেতে পারে প্রথম ছেলের বদলে দ্বিতীয় ছেলেকে গ্রহণ করার ঈশ্বরের দৃঢ় ইচ্ছায়। এ কারণে ইব্রাহিমের ছিল দুই ছেলে। প্রথমজন ছিলেন ইসমাইল। তিনি উপপত্নী হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারপরও ইব্রাহিমের বৃদ্ধ বয়সে ও বন্ধ্যা স্ত্রী সারাহর গর্ভে অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইসহাক। তখন ঈশ্বর বড় ছেলেকে কোরবানি করতে ইব্রাহিমকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইসমাইলও একটি মহান জাতির পিতা হয়েছিলেন। তবে ইব্রাহিমের নাম অবশ্যই বয়ে চলেছিল ইসহাকের মাধ্যমে। গোষ্ঠীপতি এরপরপরই হাজেরা ও ইসমাইলকে কেনানের পূর্ব দিকের মরুভূমিতে নির্বাসন দিলেন। এখানে তারা নিশ্চিতভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে, ঈশ্বর তাদেরকে সুরক্ষা না দিলে। তাদের প্রতি বাইবেল লেখকদের আর তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। তবে আমরা **১১**তম অধ্যায়ে দেখা যাবে, কয়েক শত বছর পর ইসমাইলের বংশধর দাবিদার একটি জনগোষ্ঠী জেরুসালেমে এসে পড়েছে। পরবর্তী প্রজন্মেও ঈশ্বর দ্বিতীয় ছেলেকেই মনোনীত করেছেন। ইসহাকের স্ত্রী রেবেকার মনে হয়েছিল, গর্ভে তার যমজ শিশু লড়াই করছে, ঈশ্বর তাকে বললেন, তার দেহে দুটি জাতি লড়াই করছে। যমজ দুজনের জন্মের সময় দ্বিতীয়টি তার ভাই ইসাউর গোঁড়ালি ধরে বাইরে আসে। এর পরপরই তাকে বলা হলো ইয়াকুব : গোঁড়ালি ধারক বা সাপ্লান্টার। যমজ দুজন বড় হলে ইয়াকুব বৃদ্ধ ইসহাককে কৌশলে কব্জা করে তাকেই তার বড় ভাইয়ের জন্য নির্ধারিত অধিকারটি দিতে রাজি করিয়ে নেন। এরপর ইসাউকে পূর্বাঞ্চলীয় ভূমিতে পরিত্যক্ত করা হয়। জে কিংবা ই প্রত্যাখ্যাত বড় ছেলের দাবির গুরুত্ব হ্রাস করেননি। হাজেরা ও ইসমাইলের কাহিনীতে করুণ রস রয়েছে, ইসাউর মর্মপীড়ার প্রতি পাঠক সহানুভূতিসম্পন্ন হয়। জে ও ই যখন লিখছিলেন, তখন ইসরাইলিরা প্রতিশ্রুত ভূমিতে উগ্র স্বাদেশিকতার যুক্তি হিসেবে তাদের

মালিকানার বিষয়টি উপলব্ধি করেনি : তাদের নিজেদের ভূমিতে জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়াটি ছিল অন্যদের জন্য বেদনাদায়ক ও নৈতিকভাবে হতবুদ্ধিকর।

যশুয়ার মতো উগ্র উদ্দীপনা অন্য কারো ছিল না। তাকে ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছিলেন কেনানের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সব বেদী ও ধর্মীয় প্রতীক সমূলে উচ্ছেদ করার। পরে এটিই হয়ে পড়ে ইসরাইলি আদর্শ। জে ও ই উভয়েই দেখিয়েছেন, বেশির ভাগ সময়েই গোষ্ঠীপতিরা কেনানিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। তাদের মতে, গোষ্ঠীপতিরা দেশের ওপর তাদের নিজেদের ঈশ্বরকে চাপিয়ে দিতে চাননি, এমনকি স্থানীয় লোকজনের বেদীতে তারা মন্দিরও বানাননি। ইব্রাহিম দৃশ্যত ওই দেশের পরাক্রমশালী ঈশ্বর আলের উপাসনা করতেন।

পরে আলই কল্পনাপ্রসূতভাবে যিহোবা তথা মুসার ঈশ্বরের সাথে মিশে যায়। জ্বলন্ত ঝোপ থেকে মুসাকে ঈশ্বর নিজেই বলেছেন, 'আমি হলাম প্রভু। আমি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতাম। তারা আমায় এলসদাই (সর্বশক্তিমান ঈশ্বর) বলে ডাকত। আমি যিহোবা নামে তাদের কাছে আমাকে পরিচিতি করিনি। এদিকে কেনান ভূমিকে গোষ্ঠীপতিদের কাছে নিজের পবিত্রতাকে প্রকাশ করতে হয়েছিল। এসব গোষ্ঠীপতি স্বাভাবিক স্থানগুলোতে আল তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন- এ অপেক্ষায় ছিলেন।

ফলে ইয়াকুব অপ্রত্যাশিতভাবে বেথ-আলের পবিত্রতার ব্যাপারে অসচেতন ছিলেন। তিনি অনুল্লেখযোগ্য মনে হওয়া একটি স্থানে একটি পাথরকে বালিশ বানিয়ে ঘুমানোর উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু আসলে ওটা ছিল একটি মাকুম ('স্থান'), শব্দটি কালটিক দ্যেতনাযুক্ত। ওই রাতে স্বপ্নে ইয়াকুব তার পাশে ভূমি থেকে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মই দেখলেন। এটি একটি চিরায়ত স্বপ্নাবিভাব, এটি আমাদেরকে মেসোপোটেমিয়ার মিনারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মইয়ের শীর্ষে ছিলেন ইব্রাহিমের ঈশ্বর, তিনি এখন ইয়াকুবকে তার সুরক্ষা ও আনুকূল্য প্রদান করার আশ্বাস দিলেন। ঘুম ভাঙার পর ইয়াকুব ঐশী সত্তার মুখোমুখি হওয়ার পর প্রায়ই দেখতে পাওয়া আতঙ্ক দূর করলেন। তিনি সম্ভ্রামে বললেন : 'আমি জানি, প্রভূ এই জায়গায় রয়েছেন। কিন্তু আমি না ঘুমানো র্যন্ত জানতাম না যে তিনি

এখানে রয়েছেন!’ সাদামাটা মনে হওয়া একটি স্থান একটি আধ্যাত্মিক স্থান হিসেবে আবির্ভূত হলো, যেটি মানুষকে ঐশী দুনিয়ায় প্রবেশের সুযোগ দেয়। ‘এ এক মহান জায়গা! এ হলো ঈশ্বরের গৃহ [বেথ-আল]; এটি স্বর্গের দ্বার!’ চলে যাওয়ার আগে ইয়াকুব যে পাথরে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন, সেটি উল্টিয়ে দিলেন; আশপাশের অন্যান্য কিছু থেকে এটিকে পুরোপুরি আলাদা করার জন্য এটিকে তেল লেপন করে পবিত্র করলেন।

ইসরাইলিদের পরবর্তী প্রজন্মগুলো প্রবলভাবে কেনানি ঐশী প্রতীক হিসেবে বিবেচিত পবিত্র পাথর-স্তম্ভ ধারণার নিন্দা করেছে। কিন্তু জে ও ই এখানে ইয়াকুবের ধর্মীয় কাজের মধ্যে খারাপ কিছু দেখেননি। আমাদের মনে হয়, তারা যখন লিখছিলেন, তখন ইসরাইলিরা এখনকার ধারণায় একেশ্বরবাদী ছিল না। মুসার ঈশ্বর যিহোবা ছিলেন তাদের ঈশ্বর, অনেকে বিশ্বাস করত যে ইসরাইলিদের কেবল তারই উপসনা করা উচিত। তবে তারা বিশ্বাস করত, অন্যান্য ঈশ্বরের অস্তিত্বও আছে। কারণ আমরা নবী ও ইতিহাসবিদদের লেখালেখি থেকে জানতে পারি যে অনেক ইসরাইলি অন্য দেব-দেবতাদের উপাসনা করা অব্যাহত রেখেছিল। মনে হয়, দীর্ঘ দিন ধরে কেনানের উর্বরতা নিশ্চিতকারী ঈশ্বরদের অবহেলা করা মূর্খতা বিবেচনা করে এর ঐশী সত্তা-সম্পর্কিত ‘স্থানগুলোর’ (বামথ) সামনে আসতে পারত। আমরা জানি, খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সালে নেবুচাদনেজারের হাতে জেরুসালেম ধ্বংস হওয়ার আগে ইসরাইলিরা অন্যান্য দেব-দেবীর উপাসনা করত। আমরা দেখতে পাবো, জেরুসালেমে আলের উপপত্নী উর্বরতার দেবী আশেরাহকে সম্মান জানাত ইসরাইলিরা। তারা একইসাথে জেরুসালেমে তাদের মন্দিরে সিরিয়ার নাক্ষত্রিক দেব-দেবীকেও গ্রহণ করেছিল, তারা বালের উর্বরতার শাস্ত্রাচারেও অংশ নিত। বেবিলনে প্রবাস জীবনের (৫৯৭-৩৯) আগে পর্যন্ত ইসরাইলিরা যিহোবাকে একমাত্র ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করেনি। ওই সময়ই তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে যিহোবা ছাড়া অন্য কোনো দেব-দেবীর অস্তিত্ব নেই। তখন তারা সব ‘পৌত্তলিক’ উপাসনার প্রতি খুবই বৈরী হয়ে ওঠে। তবে প্রাথমিক বাইবেল লেখক জে ও ই তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম কল্পনা করার সময় তারা ইয়াকুবের একটি পৌত্তলিক ধর্মীয় স্থানে ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া এবং পাথর-স্তম্ভ দিয়ে স্থানটি চিহ্নিত করে রাখার মধ্যে অন্যায় কিছু দেখেননি।

ফলে অনেক সময় গোষ্ঠীপতিদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে জে-এর বর্ণিতদের- পরবর্তী প্রজন্মের ইসরাইলিদের কাছে সন্দেহজনক মনে হতে পারে। এ কারণে, ইহুদিরা এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছে যে মানবীয় আকারে তাদের ঈশ্বরকে প্রতিনিধিত্ব করাটি ধর্মের অবমাননা। কিন্তু জে তাকে মানুষ হিসেবে ইব্রাহিমের মানে হাজির করেছেন। ইব্রাহিম হেবরনের কাছে মামরেতে তার তাঁবুর বাইরে বসেছিলেন, ওই সময় তিন আগন্তুক এলেন। নিকট প্রাচ্যের চিরায়ত প্রথা অনুসরণ করে গোষ্ঠীপতি জোর দিয়ে বললেন, তাদের সবাইকে বসতে হবে, তিনি তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করছেন। তারপর তারা চারজন একসাথে খাবার খেলেন, কথোপকথনের ধারাবাহিকতায় স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হলো, এই তিন মুসাফিরের একজন হলেন ঈশ্বর ও অপর দুজন হলেন তার দুই ফেরেশতা।' ইহুদিরা এই গল্প তাদের হৃদয়ে লালন করে, খ্রিস্টানদের কাছেও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তারা এটিকে ত্রিত্ব হিসেবে ঈশ্বরের প্রাথমিক প্রকাশ বলে বিবেচনা করে। মামরেতে ঈশ্বরের এই আবির্ভাব গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার একটি কারণ হলো এই যে এটি একেশ্বরবাদের মূল বিষয় বিবেচিত একটি সত্য প্রকাশ করেছে। ঐশী সত্তা কেবল পবিত্র স্থানগুলোতেই নিজেকে প্রকাশ করেন না। আমরা অন্যান্য মানবীয় অবয়বেও ঐশীর মুখোমুখি হতে পারি। ফলে এটি অপরিহার্য যে আমরা নারী ও পুরুষ যাদের মুখোমুখি হই, এমনকি পুরোপুরি আগন্তুক হিসেবেও- তাদের প্রতি পুরোদস্তুর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। কারণ তারাও ঐশী রহস্য প্রকাশ করতে পারে। এই তিন মুসাফিরের সাথে সাক্ষাতকালেও ইব্রাহিম এটি আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি তাদেরকে সব ধরনের হালকা খাবার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই সহানুভূতি ও সৌজন্যই ঐশী সত্তার সামনে আসার ব্যবস্থা করেছিল।

আমরা দেখতে পাই যে সামাজিক ন্যায়বিচার ও গরিব ও দুর্বলদের প্রতি উদ্বেগ নিকট প্রাচ্যের পবিত্রতার ধারণার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শান্তির পবিত্র নগরীর আদর্শে এটি অপরিহার্য। ইসরাইলি ঐতিহ্যের একেবারে প্রাথমিক সময়েই আমরা মানুষের অপরিহার্য ঐশী সত্তার আরো গভীর উপলব্ধি পাই। আমরা সম্ভবত ঈশ্বরের ইব্রাহিমকে প্রলুব্ধ করার অদম্য ও ভীতিকর কাহিনীতে এটি দেখতে পাই। তিনি গোষ্ঠীপতিকে নির্দেশ দিয়েছেন ইসহাককে তথা 'তোমার ছেলে, তোমার একমাত্র ছেলেকে, যাকে তুমি

ভালোবাসো' তাকে 'মরিয়াহর ভূমিতে' নিয়ে মানব কোরবানি হিসেবে নিবেদন করো। ১৬ ইব্রাহিম মাত্র অল্প কিছু দিন আগে তার বড় ছেলে ইসমাইলকে হারিয়েছিলেন। ফলে এই নির্দেশ ইব্রাহিমকে একটি মহান জাতির পিতা বানানোর ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির সমাপ্তি বলে মনে হয়েছিল। এটি তার বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিপূর্ণ জীবনের প্রতি বিদ্রুপে পরিণত হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইব্রাহিম নির্দেশটি পালন করলেন, ঈশ্বরের নির্দেশিত পর্বত-শীর্ষে ইসহাককে নিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি যে মুহূর্তে ইসহাকের বুকে ছুরি চালাতে যাবেন, ঠিক তখনই ঈশ্বরের এক ফেরেশতা এসে এই কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বললেন। ইব্রাহিমকে তার সন্তানকে কোরবানি না দিয়ে কাছের ঝোপ থেকে শিং ধরে টেনে এনে একটি ছাগল কোরবানি দিতে হবে। এই পাঠে জেরুসালেমের কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে, অন্তত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক নাগাদ 'মোরিয়াহ ভূমি' সম্পৃক্ত হয়ে গেল মাউন্ট জায়নের সাথে।' ইব্রাহিম যেখানে ইসহাককে কোরবানি দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানেই ইহুদি টেম্পল নির্মাণ করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। মুসলিমদের ডোম অব দি রকও ইব্রাহিমের তার ছেলেকে কোরবানি দেওয়ার স্মারক। এই শনাক্তকরণের প্রতীকি কারণ রয়েছে। কারণ এই ঘটনায় যিহোবা জানিয়েছেন, মানুষ কোরবানি করা তার মতাদর্শে স্থান পাবে না। অথচ প্রাচীন বিশ্বে এই নিষেধাজ্ঞা কোনোভাবেই সার্বজনীনই ছিল না। কিন্তু যিহোবা জানালেন, তার মতাদর্শে উৎসর্গ করা যাবে কেবল প্রাণিদেরই। বর্তমানে আমরা পশু কোরবানির প্রতিও বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠছি। তবে আমাদের বুঝতে হবে যে এ প্রথাটি অনাদিকাল থেকে ধর্মের মূল বিষয় হিসেবে রয়েছে। এতে পশুদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করা হয় না। কোরবানির মাধ্যমে এই বেদনাযুক্ত বাস্তবতা তুলে ধরা হয় যে মানুষের জীবন নির্ভর করছে অন্যান্য সৃষ্টির হত্যার ওপর। এটি এমন এক অন্তর্দৃষ্টি যা মারদুক ও বাল-সম্পর্কিত যুদ্ধ মিথের কেন্দ্রবিন্দুতেও রয়েছে। টিকে থাকার জন্য মাংশাসী মানুষ শিকার করে উদ্ভিদ ও প্রাণি। এই পন্থায় যেসব পশুকে কোরবানি দেওয়া হয় তাদের প্রতি থাকে অপরাধবোধ, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা। এই জটিল আবেগই হয়তো ল্যাসকাক্সের গুহাগুলোতে প্রাগৈতিহাসিক চিত্রগুলো আঁকতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। কসাইয়ের দোকান থেকে পরিপাটি করে প্যাকেটজাত গোশত পেতে থাকায় আমরা সতর্কভাবে নিজেদেরকে এই সত্য থেকে আড়াল করে রেখেছি যে পশুরা আমাদের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করছে। কিন্তু প্রাচীন দুনিয়ায় বিষয়টি তেমন ছিল না। অবশ্য

এটিও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে পরবর্তী বছরগুলোতে এই ধারণা দিয়েছিল যে জেরুসালেন মতাদর্শ একেবারে শুরু থেকেই উদ্দীপনা যতই থাকুক না কেন, কখনো আরেকটি মানুষকে কোরবানি দেওয়া অনুমোদন করেনি।

এই অগ্নিপরীক্ষার পর ইব্রাহিম যেখানে ইসহাককে বেঁধেছিলেন সেই জায়গাটিকে 'যিহোবা দর্শন স্থান' বলে অভিহিত করেছেন। আর ই স্থানীয় একটি প্রবাদবাক্যের উদ্ধৃতি দিয়ে উপসংহার টেনেছে এভাবে যে : 'যিহোবার পর্বতে এটি দেখা গেছে।' ঐশী পর্বতে, পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্তী স্থানে, মানুষ ঈশ্বরদের দেখতে পায়, ঈশ্বরেরাও তাদের দেখতে পান। এটি হলো স্বপ্নাবিভাবের স্থান, এখানে লোকজন ভিন্নভাবে তাকাতে শিখতে পারে। তারা তাদের নশ্বর দুনিয়ার ঊর্ধ্বে ওঠে তাদের চোখ মেলে তাদের অস্তিত্বের কেন্দ্রে থাকা শ্বাশত রহস্য দেখতে পারে। আমরা দেখতে পাব, জেরুসালেমের মাউন্ট জায়ন ইসরাইলি জনগণের স্বপ্নাবিভাবের স্থানে পরিণত হয়েছে, যদিও তাদের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে এটিই তাদের একমাত্র পবিত্র স্থান ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের কফিন। তিনি ১৯৯৫ সালের ৪ নভেম্বর নিহত হন। এক ইহুদি ঈশ্বরের হয়ে তাকে হত্যা করেছেন বলে দাবি করেন। এটা যেকোনো আধ্যাত্মিকতার বিপদের ভয়ঙ্কর উদাহরণ। এই স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে যে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই রয়েছে ঐশী সত্তা।

ইসরাইলের নতুন জাতির তার আত্মাকে দেখতে পাওয়ার গঠনাত্মক ঘটনাগুলোতে জেরুসালেম কোনো ভূমিকা পালন করেনি। আমরা দেখেছি, এমনকি যখন যশুয়া ও জাজেজ গ্রন্থগুলো লেখা হয়েছে, তখনো অনেক ইসরাইলি নগরীটিকে অনিবার্যভাবে বিদেশী স্থান হিসেবে দেখেছে, তাদের কাছে একে জেবুসিত প্রাধান্যপূর্ণ নগরী মনে হয়েছে। গোষ্ঠীপতিরা বেথেল, হেবরন, শেচেম ও বিরসোর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাদের সফরকালে তারা জেরুসালেমকে দৃশ্যত লক্ষ্য করেননি। তবে একটি সামরিক অভিযান থেকে ফিরে ইব্রাহিম 'সালেমের' রাজা ও পুরোহিত মেলচিজেদেকের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। রাজা তাকে রুটি ও মদ উপহার দিয়েছিলেন, তাকে সালেমের দেবতা আল ইলিয়নের নামে আশীর্বাদ করেছিলেন।' ইহুদি ঐতিহ্যে জেরুসালেমকে 'সালেম' হিসেবে

অভিহিত করা হয়, যদিও বিষয়টি নিশ্চিত নয়। সাক্ষাতটি কিদরন ও হিম উপত্যকার সন্ধিক্ষণে এন রোগেলে (বর্তমানে বির আইয়ুব : জবস ওয়েল) ঝরনার কাছে হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। এন রোগেল নিশ্চিতভাবেই প্রাচীন জেরুসালেমের কোনো কান্টিক স্থান ছিল। সম্ভবত নগরীর রাজাদের অভিষেকের সাথে সম্পৃক্ততা ছিল এর। স্থানীয় কিংবদন্তি অনুযায়ী মেলসিজেদেক ছিলেন জেরুসালেমের প্রতিষ্ঠাতা। জেরুসালেমের পরবর্তী রাজারা তার বংশধর বলে বিবেচনা করা হসো।২২ পরে আমরা হিব্রু সামে দেখতে পাবো, জুদার দাউদীয় রাজারা তাদের অভিষেকে বলেছেন : ‘আপনি মেলচিজেদেকের নিয়মের পুরোহিত এবং তা চিরদিনের জন্য।২৩ অর্থাৎ তারা মাউন্ট জায়ন-সম্পর্কিত জেবুসিত ঐতিহ্যসহ আরো অনেক কিছুর সাথে এই প্রাচীন পদবির উত্তরসূরি হয়েছিলেন। ইব্রাহিমের সাথে মেলচিজেদেকের সাক্ষাতের কাহিনীটি হয়তো তার পদবির বৈধতা দিতে নগরীতে রাজা দাউদের জয়ের সময় প্রথমবারের মতো বলা হয়েছিল। এতে দেখা যায়, তার পূর্বপুরুষ জেরুসালেমের প্রতিষ্ঠার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছেন ও সম্মানিত হচ্ছেন। ২৪ তবে কাহিনীটিতে আরো দেখা যায়, নগরীর বর্তমান ক্ষমতাসীনদের সৌজন্যের প্রতি সাড়া দিচ্ছেন ইব্রাহিম, মেলচিজেদেককে শ্রদ্ধার নির্দশন হিসেবে যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর এক দশমাংশ দিচ্ছেন এবং একটি বিদেশী ঈশ্বরের আশীর্বাদ গ্রহণ করছেন। কাহিনীটিতে জেরুসালেমের আগের অধিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে ও তাদের ঐতিহ্যের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতেও দেখা যায়।

মেলচিজেদেকের দেবতাকে বলা হতো আল ইলিয়ন তথা ‘সর্বশক্তিমান ঈশ্বর’। পরে যিহোবা যখন জেরুসালেমের শক্তিমান ঈশ্বরে পরিণত হয়েছিলেন, তখন এই পদবিটি তাকে দেওয়া হয়েছিল। মাউন্ট জাফোনের বালের অন্যতম পদবিও ছিল আল ইলিয়ন। ২৫ প্রাচীন বিশ্বে দেব-দেবতাদের প্রায়ই একটিকে অপরটির সাথে গুলিয়ে ফেলা হতো। একে বিশ্বাসঘাতকতা বা অনাকাঙ্ক্ষিত আপস বিবেচনা করা যায় না। দেবতাদের সারাবাহিকতাহীন ও অবিভেদ্যসম্পন্ন কঠিন ব্যক্তি বিবেচনা করা হতো না। বরং তাদের ঐশী সত্তার প্রতীক মনে করা হতো। লোকজন যখন নতুন স্থানে যেত, তখন তারা প্রায়ই স্থানীয় দেব-দেবতাদের সাথে তাদের নিজস্ব ঈশ্বরকে মিশিয়ে দিত। নতুন দেবতা তার পূর্বসূরিদের অনেক বৈশিষ্ট্য ও কার্যক্রম গ্রহণ করে নিতেন। আমরা দেখতে পাই যে

ইসরাইলের কল্পনায় মুসার দেবতা যিহোবা হয়ে গেছেন ইব্রাহিমের দেবতা আল শাদ্দাই। ইসরাইলিরা জেরুসালেমে পৌঁছামাত্র প্রায় নিশ্চিতভাবে মাউন্ট জায়নে উপাসনা লাভকারী বাল আল ইলিয়নের সাথেও সম্পর্কযুক্ত হয়ে যান যিহোবা।

ইসরাইলিদের মিসর থেকে এক্সোডাসের কাহিনীগুলো তাদের ধর্মের নিরঙ্কুশভাবে কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হলেও এসবের সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয় জেরুসালেম। এসব ঘটনার বাইবেলীয় ভাষ্য সেগুলোকে পৌরাণিক কাহিনীতে পরিণত করে সেগুলোতে আধ্যাত্মিকতা আরোপ করে সময়াতীত অর্থ প্রদান করেছিল। আধুনিক ইতিহাসবিদদের সন্তুষ্ট করতে পারে, এমন কোনো পন্থায় সেগুলো পুনঃনির্মিত করার কোনো চেষ্টা হয়নি। এটি অনিবার্যভাবেই মুক্তি ও বাড়ি ফেরার এমন কাহিনী যা ইহুদিদের মধ্যে লালিত দীর্ঘ ও করুণ ইতিহাসের অন্ধকারময় অনেক মুহূর্তকে ধারণ করে আছে। অবিচারের শিকার ও নির্যাতিত খ্রিস্টানদেরও বহির্গমনের বর্তা উদ্দীপ্ত করে। এক্সোডাসের কাহিনীতে জেরুসালেম কোনো ভূমিকা না রাখলেও এর ঐতিহ্য মাউন্ট জায়নের ওপর ইসরাইলিদের আধ্যাত্মিকতার বড় অংশ জুড়ে আছে। ঘটনাগুলো নিকট প্রাচ্যের সৃষ্টি ও সংগ্রামমুখর মিথের সংস্করণ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। অবশ্য ভিন্নতা হলো, সেগুলো আদিম সময়ে ঘটার বদলে নশ্বর দুনিয়ায় ঘটেছে এবং মহাজাগতিক ব্যাপারে না হয়ে জনগণের মধ্যে ঘটেছিল। ২৬ বাল ও মারদুকের যুদ্ধের পুরান কাহিনী একটি নগরী ও একটি মন্দির নির্মাণের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। এক্সোডস মিথটি একটি আবাসভূমি নির্মাণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। এই বছরগুলোতে ইসরাইল বিশৃঙ্খল ও অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে ঐশীভাবে প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতায় পৌঁছেছে। মারদুকের মতো দুনিয়া সৃষ্টির জন্য সাগর-দানবের মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করার বদলে ফারাও ও তার ধাবমান সেনাবাহিনী থেকে তার জাতিকে পালানোর সুযোগ দিতে রিডস সাগরকে বিভক্ত করেছিলেন যিহোবা। মারদুকের মতো দানবীয় বাহিনীকে হত্যা না করে যিহোবা মিসরীয়দের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। নতুন সৃষ্টি সবসময়ই অন্যদের ধ্বংসের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় জেরুসালেমের ভবিষ্যত ইতিহাসে এ বৈশিষ্ট্যটি বারবার ঘটতে দেখা যাবে। সবশেষে ইসরাইলের জনগণ বিভক্ত পানিরাশি অতিক্রম করে নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা লাভ করেছিল। সব সংস্কৃতিতেই অবগাহন আদিম পানি তথা মূল উপাদানে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে, যা বিবেচনা

করা হয় অতীতকে ফেলে দিয়ে নতুন জন্মকে সম্ভব করে তোলার প্রয়াস।২৭ অর্থাৎ পানির রয়েছে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক। সাময়িক সময়ের জন্য হলেও এটিই সূচনার আদি বিশুদ্ধতা। রিডস সাগর দিয়ে তাদের গমন ইসরাইলকে যিহোবার নতুন সৃষ্টিতে পরিণত করেছিল।

ইসরাইলিরা পরে যেখানে সফর করেছিল তা হলো সিনাই। সেখানেই গায়োত্তীর্ণ ঘটনা হিসেবে মুসা তার ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাত করতে পর্বত চূড়ায় উঠেছিলেন, যিহোবা প্রবল ঝড় ও আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মধ্যে নেমে এসেছিলেন। নির্দেশমতো লোকজন দূরত্ব বজায় রেখেছিল : ঐশী সত্তা বিশেষ জ্ঞান না-থাকা লোকজনের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে বলে অন্তত ইসাইলি ঐতিহ্যে মনে করা হতো। এ কারণে ঐশী সত্তার কাছাকাছি হতে পারত কেবল সতর্কভাবে নির্দেশিত এলিটরাই। মাউন্ট সিনাইয়ে যিহোবা ইসরাইলকে তার নিজের জাতিতে পরিণত করেন, তার অঙ্গীকারের নিশ্চয়তা হিসেবে মুসাকে তাওরাত বা বিধিবিধান দেন, যার মধ্যে টেন কমান্ডমেন্টসও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য আমরা পরে দেখতে পাবো, বেবিলনে নির্বাসনের আগে পর্যন্ত তাওরাত ইসরাইলের ধর্মীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না।

সবশেষে তাদেকে প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার আগে ইসরাইলিদেরকে মরুভূমিতে ৪০ বছরের অগ্নিপরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছিল। এটি কোনো রোমান্টিক অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা ছিল না। বাইবেল পরিষ্কার করে জানাচ্ছে, এই বছরগুলোতে লোকজন অব্যাহতভাবে যিহোবার কাছে অভিযোগ জানিয়েছে, বিদ্রোহ করেছে। মনে হয়েছে, তারা মিসরে তাদের সহজতর জীবনের স্মৃতিতে কাতর হয়ে সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। নিকট প্রাচ্যে মরুভূমির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে মৃত্যু ও আদিম বিশৃঙ্খলা। আমরা দেখেছি, সিরিয়ার মরু দেবতা মত ছিলেন নরকের বুভুক্ষু ঈশ্বর, তথা মৃত্যু ও নশ্বরতার অন্ধকার শূন্যতা। মরুভূমি তাই এমন ঐশী এলাকা, যা কুটিল হয়ে পিশাচে পরিণত হয়েছে।২৮ এটি ইসরাইলি অভিবাসনের চরম বিচ্ছিন্ন স্থান হিসেবে বিরাজ করতে থাকে। অনেক বাইবেল পণ্ডিত যেভাবে দেখেন তেমন ধরনের এক্সোডাসে ঊষর প্রান্তরে অবস্থানের বছরগুলোর প্রতি কোনো নস্টালজিয়া ছিল না। এর বদলে নবী

ও বাইবেল লেখকেরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে 'ঊষর প্রান্তরে আর্তনাদ করার সময় ইসরাইলকে ঈশ্বর তার মনোনীত জাতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন; আর ওই মরুভূমি হলো 'এমন বিরান ভূমি যেখানে 'কেউ বাঁচে না', এটি বসবাসের অনুপযোগী, কোনো রাজ্য নেই সেখানে। এটি অব্যাহতভাবে বসতি ভূমির অস্তিত্ব বিনাশ ও আদি অস্তিত্বহীনতার ফিরিয়ে নেওয়ার হুমকি সৃষ্টি করে। কোনো নগরীর ধ্বংসের কল্পনা করার সময় সম্পূর্ণভাবে মানুষ-বর্জিত ওই স্থানে পেলিক্যান, সজারু অপদেবতার আবাস দেখতে পায়।৩১ ৪০ বছর ধরে – এটি এমন এক পরিভাষা যা দিয়ে বাস্তবিকই সুদীর্ঘ সময় বোঝাতে ব্যবহৃত হয় – ইসরাইলিরা বৈরী এলাকায় সংগ্রাম করেছিল, সবশেষে ঈশ্বর তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার আগে তারা প্রতীকীভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

মুসার আমলে জনমানবহীন প্রান্তরে ঐশী সত্তার কাছে যাওয়ার সুযোগ ইসরাইলিদের করে দিয়েছিল বিধান। ১৯৬৭ সালে দখলের পর থেকে বর্তমান ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা পশ্চিম তীরে প্রার্থনায় অংশ নেয়, তওরাত অধ্যায়ন করে। তারা বিশ্বাস করে, এর মাধ্যমে তারা মনোনীত জাতি ও এর ঈশ্বরের মধ্যে আবারো পবিত্র সংযোগ সাধন করবে।

অবশ্য ঈশ্বর তার জাতিকে বুনো এলাকায় একেবারে পুরোপুরি পরিত্যাগ করেননি। অন্যান্য যাযাবর জনগোষ্ঠীর মতো ইসরাইলিরাও ঐশী এলাকার সাথে তাদের প্রতীকী সংযোগ সাথে নিয়ে বয়ে বেড়াত। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের পবিত্র লাঠি বহন করার মতো ইসরাইলিরা 'আর্ক অব কোভেন্যান্ট' বহন করত। এই উপাসনালয় পরবর্তী সময়ে জেরুসালেমে তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছিল। বাইবেলে আর্ক সম্পর্কে যেসব ভাষ্য এসেছে, সেগুলোর বেশির ভাগের উৎসই পরবর্তী সময়ে। ফলে গোড়াতে এগুলো কেমন ছিল, তা অনুধাবন করা কঠিন। সম্ভবত এটি ছিল একটি বাক্স, যেখানে বিধানের ট্যাবলেটগুলো ছিল। এর উপরে ছিল দুটি সোনালি মূর্তি। তাদের বিস্তৃত পাখা যিহোবার সিংহাসনের পেছনের অংশ গ্রহণ করেছিল।৩২ আমরা জানি, ঐশী প্রতীক হিসেবে প্রায়ই ফাঁকা সিংহাসন ব্যবহার করা হয়। এটি ঈশ্বরকে তার উপাসনাকারীদের মধ্যে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এ কারণে ইহুদি ঐতিহ্যে ঐশী উপস্থিতির প্রতীক হিসেবে সিংহাসনের অবস্থান দেখা যায়। ফলে আর্ক ছিল যিহোবার উপস্থিতির সুস্পষ্ট চিহ্ন। এটি বহন করত

লেভি গোত্রের সদস্যরা। তারা ছিল ইসরাইলের পুরোহিত বর্ণ হিসেবে তারা এ কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। মুসার ভাই হারুন ছিলেন প্রধান পুরোহিত। আদিতে আর্ক সম্ভবত ছিল একটি সামরিক রক্ষাকবচ, কারণ এর ঐশী শক্তি ছিল যা প্রাণঘাতী হতে পারত। ফলে তা ইসরাইলের শত্রুদের থেকে তাদেরকে রক্ষা করত। জে আমাদেরকে বলেন, ইসরাইলিরা তাদের দিনের যাত্রা শুরুর সময় যিহোবার উপস্থিতির প্রতিনিধিত্বকারী মেঘ আর্কের ওপর নেমে আসত এবং মুসা চিৎকার করে বলতেন : 'ওঠুন, যিহোবা, আপনার শত্রুরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক!' রাতে তাঁবু ফেলার সময় তিনি চিৎকার করে বলতেন : 'ফিরে আসুন যিহোবা, ইসরাইলের মেজবান হন!৩৩ ইসরাইলিরা আর্ককে নিরাপদে রাখতে একটি ক্যাপসুলে রেখে দিত, এটি এভাবেই ছিল। আর তা মরুভূমিতে নরকে বাস করার কথা স্মরণ করিয়ে দিত, কারণ এটি তাদেরকে ঐশী বাস্তবতার সংস্পর্শে রাখত।

আমরা কেনানে ইসরাইলের প্রাথমিক সময় সম্পর্কে সামান্যই জানি। পি মনে করেন, পাহাড়ি দেশে তারা বসতি স্থাপন করা মাত্র ইসরাইলিরা আর্কের জন্য শিলোহে একটি তাঁবু স্থাপন করে। পি কল্পনা করেছেন, মাউন্ট সিনাইয়ের উপর মুসাকে এই পূণ্যমণ্ডল সম্পর্কে খুবই সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন যিহোবা। যদি আর্ক সত্যিই কোনো তাঁবুকে আলোকিত থাকে, তবে যিহোবা ছিলেন একেবারেই আলের মতো। তিনিও তাঁবু-মন্দিরে বাস করতেন, ছিলেন বিধানের উৎস এবং আল সাবোথে ('আল আরমিস) আবির্ভূত হওয়ার সময় পাখার ডানায় সিংহাসন বসিয়েছিলেন। স্যামুয়েল গ্রন্থে অবশ্য মনে হয় শিলোহের আরো বেশি প্রচলিত মন্দিরের হেখালে (বা কাল্ট হল) আর্ককে স্থাপন করা হয়েছিল। ৩৪ তবে ইসরাইলিরা সম্ভবত আরো অনেক প্রচলিত মন্দিরে উপাসনা করত। এগুলোর মধ্যে ছিল দান, বেথেল, মিজপাহ, ওপরাহ ও গিবেয়ন, সেইসাথে উন্মুক্ত ব্যামথে। অনেক ইসরাইলি যিহোবার পাশাপাশি অন্য দেবতাদেরও উপাসনা করতেন। তাদের কাছে যিহোবাকে এখনো কেনানে যথাযথভাবে স্থায়ী হতে না-পারা বিদেশী দেবতা মনে হতো। তিনি তখনো সিনাই, পারান ও সেইয়ের মতো দক্ষিণাঞ্চলীয় অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তারা ভাবত, লোকজন ঝামেলায় পড়লে তিনি তাদের সহায়তার জন্য মেঘে চড়ে নেমে আসেন। বাইবেলের প্রথম দিকের কয়েকটি বাক্যে বিষয়টিকে এমনই মনে হয়।৩৫ ইসরাইলিরা সম্ভবত প্রার্থনাবিধি তৈরি করেছিল, যা ঢাকের শব্দকে

বজ্রপাতের এবং ধূপের ধোঁয়াকে পাহাড়ের শীর্ষে মেঘ হিসেবে মাউন্ট সিনাইয়ে কথা নতুন করে মনে করিয়ে দিত। এসব উপাদান পরে জেরুসালেম কাল্টেও আবির্ভূত হয়েছিল। ফলে অনুষ্ঠানটি সিনাইয়ে যিহোবার চূড়ান্ত আবির্ভাবের অনুকরণ করা হতো। এই প্রতীকী অনুসরণ তার জাতির মধ্যে আবারো যিহোবার উপস্থিতির অনুভূতি প্রকাশ করত।৩৬ নিকট প্রাচ্যের প্রায় সব ঈশ্বরের বিপরীতে যিহোবা প্রথমে চলমান দেবতা বিবেচিত হতেন, তিনি কোনো নির্দিষ্ট মন্দিরের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। অবশ্য ইসরাইলিরা মিসর থেকে তাদের স্বাধীনতার কথাও স্মরণ করত। অনেক বছর ধরে প্রাচীন বসন্ত উৎসব ইসরাইলিদের মিসরে শেষ খাবার অনুষ্ঠানের স্মরণে অনুষ্ঠিত হতো। এ সময় মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেও মিসরীয়দের নবজাতক ছেলেদের সবাইকে মেরে ফেলেছিল। শেষ পর্যন্ত এই পারিবারিক উৎসবটি পাসওভার (পেসাহ) নামে পরিচিত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ১০৩০ সাল নাগাদ উত্তর পাহাড়ি দেশের লোকজন রাজত্ব ও সংহতির প্রবল ধারণার অধিকারী হয়। তারা নিজেদেরকে অভিন্ন পূর্বপুরুষের স্বতন্ত্র জাতি মনে করতে থাকে। তখন পর্যন্ত তারা কয়েকজন ‘বিচারক’ বা গোষ্ঠীপতির মাধ্যমে শাসিত হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তারা ওই অঞ্চলের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো একটি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। বাইবেল লেখকেরা এই পদক্ষেপ সম্পর্কে মিশ্র অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। তারা দেখেছেন, শেষ বিচারক স্যামুয়েল এই ধারণার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাদের ওপর রাজা বসানো হলে তিনি নির্যাতন ও নৃশংসতা চালাবেন বলে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ৩৭ অবশ্য বাস্তবতা হলো, ইসরাইলে একটি রাজত্ব সৃষ্টি ছিল সহজাত বিষয় ও অনিবার্য ঘটনা।৩৮ ওই সময়ে আসিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া ও মিসরের পরাশক্তিগুলো ঝিমিয়ে পড়েছিল, অন্য দিকে আম্মন, মোয়াব, ইদোম নামে ছোট ছোট রাষ্ট্র ক্ষমতার শূন্যতা পূরণ করতে আবির্ভূত হচ্ছিল। ইসরাইলিরা নিজেদেরকে কেনানের পাহাড়ি এলাকা জয় করতে অধীর হয়ে ওঠা আগ্রাসী প্রতিযোগীদের ঘিরে থাকা অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল। আম্মোনি ও মোয়াবিয়ারা পূর্ব দিক থেকে তাদের ভূখণ্ডে হানা দিচ্ছিল, পশ্চিম দিক থেকে আসছিল ফিলিস্তিনিরা। একবার ফিলিস্তিনিরা শিলোহ নগরী লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে দেয়, যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী হিসেবে আর্ক অব কোভেন্যান্ট নিয়ে যায়।

অবশ্য এ রক্ষাকবচটির মৃত্যুঘাতী শক্তি উপলব্ধি করতে পেরে তারা এটিকে ফিরিয়েও দেয়। এখন এটি কোনো মন্দিরে সুরক্ষিত ছিল না। ইসরাইলিরাও আর্কের পবিত্রতায় ভীত হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা তাদের সীমান্ত এলাকায় কিরেথ-জেরিমে একটি বেসরকারি বাড়িতে এটিকে স্থান দেয়। এসব গোলযোগপূর্ণ ঘটনাার কারণেই সম্ভবত ইসরাইলিরা বুঝতে পারে যে তাদের একজন রাজার শক্ত নেতৃত্ব প্রয়োজন। এর ফলে অনিচ্ছুকভাবে স্যামুয়েল বেঞ্জামিন গোত্রের সলকে ইসরাইলের প্রথম রাজা হিসেবে বরণ করে নেন।

কেনানের আগের যেকোনো রাজার চেয়ে অনেক বড় ভূখণ্ড শাসন করেছিলেন সল। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল মধ্য পাহাড়ি এলাকার পুরোটা, জর্দানের উভয় এলাকা, নগর-রাষ্ট্র জেরুসালেমের উত্তরাংশ। জেরুসালেম তখনো জেবুসিতরা শাসন করত। (মানচিত্র দেখুন)। বাইবেলে সল হলেন ট্রাজিক ব্যক্তিত্ব : একটি কাল্টিক বিষয় সূচনা করতে চাওয়ায় তার ঈশ্বরের তাকে পরিত্যক্ত করা, হতাশার আক্রান্ত হওয়া এবং ধীরে ধীরে ক্ষমতা হারানো প্রত্যক্ষ করেন তিনি। এমনকি এই তীব্র সমালোচনাপূর্ণ ভাষ্যেও আমরা সলের অর্জনকে ব্যাপক অবস্থায় দেখতে পাই। গিবেয়ন (এখানে ইসরাইলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যিহোবাবাদী মন্দিরটি ছিল) থেকে শাসনকাজ পরিচালনা করে সল ধীরে ধীরে তার এলাকা সম্প্রসারিত করেন, পাহাড়ি এলাকার লোকজন স্বেচ্ছায় তার সাথে যোগ দিয়েছিল। ২০ বছর পর্যন্ত তিনি তার রাজত্বকে শত্রুদের বিরুদ্ধে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরে খ্রিস্টপূর্ব ১০১০ সালের দিকে মাউন্ট গিলবোয়ার যুদ্ধে ফিলিস্তিনিরা তাকে ও তার ছেলে জোনাথনকে হত্যা করে। তার মৃত্যুর পর বাইবেলের সবচেয়ে উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতার স্থান পায় তাকে নিয়ে করা স্তুতি

সল ও জোনাথন একে অপরকে ভালোবাসতেন

এবং জীবনভর একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন।

মৃত্যুও তাদের আলাদা করতে পারেনি।

তারা ছিলেন ঈগলের চেয়েও ক্ষিপ্র,

তারা ছিলেন সিংহের চেয়েও শক্তিশালী।

এই হাহাকার সলের কোনো অনুগত অনুসারী আউড়াননি, বরং তার রাজদরবার থেকে পালিয়ে যাওয়া এক বিদ্রোহীর মুখে শোনা যায়। সলের রাজত্বে দাউদ ছিলেন অত্যন্ত সুবিধাভোগী যোদ্ধা। তিনি ছিলেন জোনাথনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সলের মেয়ে মিচেলকে তার সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একমাত্র তিনিই সলের বিষণ্নতার মধ্যেও তাকে কিছু স্বস্তি দিতে পারতেন, গান ও কবিতা দিয়ে তার হতাশা কিছুটা দূর করতে পারতেন। কিন্তু বাইবেলের ইতিহাসবিদেরা আমাদের বলেন, দাউদের জনপ্রিয়তা ও মর্যাদায় ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিলেন সল। ফলে দাউদকে জীবন নিয়ে পালাতে হয়েছিল। প্রথম তিনি জেরুসালেমের দক্ষিণে জনশূন্য পাহাড়গুলোতে হ্যাপিরু (বিদ্রোহী) হিসেবে একদল অনুসারীকে নিয়ে বাস করতে থাকেন। সবশেষে তিনি ইসরাইলের প্রাণঘাতী শত্রু ফিলিস্তিনিদের সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হন। সলের মৃত্যুর খবর দাউদ শুনেছিলেন জিগ-লাগের নেগেভ শহরে জুদা গোত্রের সাথে বাস করার সময়। তার নতুন প্রভু গথের রাজা অচিশ তাকে এই ভূখণ্ডটি দিয়েছিলেন। বাইবেলের সবচেয়ে জটিল চরিত্রগুলোর অন্যতম হলেন দাউদ। কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, যোদ্ধা, বিদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, ব্যাভিচারী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার মধ্যে (তবে নিশ্চিতভাবে তিনি পৌত্তলিক ছিলেন না), কিন্তু তবুও তাকে ইসরাইলের আদর্শ রাজা হিসেবে শ্রদ্ধা করা হয়। সলের মৃত্যুর পর সলের জীবিত ছেলে ইশবাল ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য শাসন করেন। আর দাউদ দক্ষিণের স্বল্প বসতিপূর্ণ পাহাড়ি এলাকায় নিজের জন্য একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এর রাজধানী ছিল হেবরন। ফিলিস্তিনিরা সম্ভবত এই উদ্যোগে উৎসাহিত করেছিল। কারণ তারা তাদের সামন্তদের মাধ্যমে পাহাড়ি এলাকায় পা রাখার জায়গা সৃষ্টি করেছিল। তবে দাউদ দু'মুখী নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তার ছিল অনেক বড় উচ্চাভিলাষ। ফলে জেরুসালেমে জেবুসিতরা দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য দিয়ে নিজেদের ঘেরাও দেখতে পেল। উত্তরে ছিল ইশবালের শাসনে থাকা ইসরাইল রাজ্য, আর দক্ষিণে ছিল দাউদের শাসনে থাকা জুদা রাজ্য। তবে ইশবাল ছিলেন দুর্বল শাসক। তার রাজ্য সম্ভবত সলের রাজ্যের চেয়ে অনেক ছোট ছিল, তিনি তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডারকে ক্ষুব্ধ করেছিলেন। এই কমান্ডার সম্ভবত দল ত্যাগ করে দাউদের শিবিরে যোগ দিয়েছিল। অবশেষে সাড়ে সাত

বছর পর হেবরনের রাজা হিসেবে দাউদ মুকুট পরেন, ইশবাল খুন হন, হত্যাকারী দাউদের রাজদরবারে পালিয়ে যান। দাউদের চূড়ান্ত সময় এসে পড়েছিল। ইশবালের হত্যাকারীকে হত্যার মাধ্যমে তিনি ওই মৃত্যুর সাথে নিজেকে সম্পর্কহীন করেন। সলের মেয়ে মিচেলের স্বামী হিসেবে তিনি ক্ষীণভাবে ইসরাইল রাজ্যের সিংহাসনের দাবি করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের উপজাতীদের প্রতিনিধিরা দাউদের কাছে আসে, তারা হেবরনে যিহোবার মন্দিরে তার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাকে ইসরাইলের রাজা হিসেবে তেলে সিক্ত করে। দাউদ এখন ইসরাইল ও জুদার ঐক্যবদ্ধ শাসক। তবে তার রাজ্যের মাঝখানে ছিল জেবুসিত নগর-রাষ্ট্র জেরুসালেম। তিনি এই নগরীকে তার রাজধানী করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

দাউদের নগরী

জেবুসিতেরা বিশ্বাস করত, দাউদ কখনো তাদের নগরী জয় করতে পারবেন না। কেনানি নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে জেরুসালেম সবচেয়ে মর্যাদাবান কিংবা শক্তিশালী না হলেও দাউদের দ্রুত ভুঁইফোড় রাজ্যের তুলনায় ওই নগরী বিবেচিত হতো অনেক প্রাচীন, অত্যন্ত সুরক্ষিত, এবং অনেক বছর ধরেই নগরীটি দুর্ভেদ্য হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। দাউদের সৈন্যরা ওফেলের পাদদেশে পৌঁছার পর জেবুসিভরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বলতে লাগল : 'তোমরা এখানে ঢুকতে পারবে না। নগরীর অন্ধ ~ পঙ্গুরা তাদের আটকে দেবে।' সুরক্ষিত দুর্গে হামলা চালালে কী পরিণাম হতে পারে সে সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিতে সম্ভবত তারা হিত্তিতি সেনাবাহিনীর প্রথা অনুসরণ করে প্রাচীরগুলোর ওপর দিয়ে অন্ধ ও পঙ্গুকে দিয়ে প্যারেড পর্যন্ত করেছিল। কিন্তু দাউদ ভয় পেতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি সংকল্প করেন, যে ব্যক্তি প্রথমে কোনো জেবুসিতকে হত্যা করতে পারবে, সে হবে তার সেনাবাহিনীর কমান্ডার। তার প্রবীণ সহকর্মী জেরুয়ার ছেলে জোয়াব চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করে 'ওয়ারেন্স শ্যাফটে চড়েন। গিহোন স্প্রিং থেকে পানি এখান দিয়েই নগরীতে যেত। আমরা জানি না, দাউদ কিভাবে জেরুসালেম দখল করেছিলেন। বাইবেলের সূত্র একইসাথে অপূর্ণাঙ্গ ও অস্পষ্ট। তবে তার এই জয় ছিল একটি বড় ধরনের মাইলফলক। এর প্রভাব এখনো প্রতিধ্বনিত হয়! যে নগরী তখন পর্যন্ত কেনানের কেবল দ্বিতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ নগরী ছিল, সেটি এই জয়ের মধ্য দিয়ে এমন এক ঐতিহ্যের বলয়ে প্রবেশ করেছিল যা শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক একেশ্বরবাদে পরিণত হয়েছিল। এই জয় তাকে অন্যতম পবিত্র নগরীতে পরিণত করেছিল, সেই সূত্রে পরিণত হয় বিশ্বের সবচেয়ে বিরোধপূর্ণ স্থানে।

দাউদ সম্ভবত এমন ভবিষ্যত দেখতে পাননি। তিনি যখন খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ সালের দিকে নগরীটি জয় করলেন, তখন তিনি তার ঐক্যবদ্ধ রাজ্যের কেন্দ্রে থাকা একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিদেশি জেবুসিত ছিটমহল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার স্বস্তি অনুভব করেছিলেন। তাছাড়া এর মাধ্যমে তিনি নিজের জন্য আরো মানানসই রাজধানী পেয়েছিলেন। ইসরাইল ও জুদার মিলন ছিল ক্ষণস্থায়ী। উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যটি তখনো মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা বিবেচিত হচ্ছিল, লোকজনের জন্য অতি সাম্প্রতিক সময়কালেও

বিশ্বাসঘাতক বিবেচিত দাউদের কাছে আত্মসমর্পণ নিয়ে মিশ্র অনুভূতিতে ছিল। হেবরন থেকে শাসনকাজ চালানো অব্যাহত রাখা অবিজ্ঞজনোচিত মনে হয়েছে। কারণ এটি দাউদকে তার নিজের দক্ষিণাঞ্চলীয় জুদা রাজ্যের সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করত। পুরনো জেরুসালেম নগর-রাষ্ট্র জেরুসালেম অবশ্য ছিল নিরপেক্ষ ভূখণ্ড। কারণ এটি ইসরাইল বা জুদা- কোনোটিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তাছাড়া পুরনো গোত্রীয় ঐতিহ্যের সাথেও এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। দাউদ তার নিজের সৈন্যদের নিয়ে নগরীটি জয় করায় ওই এলাকার প্রথা হিসেবে এটি তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি এর নিজের নামে এর নতুন নাম দেন 'ইর ডেভিড' বা দাউদের নগরী। ফলে এটি জুদা বা ইসরাইল থেকে নিরপেক্ষ ও সংযুক্তহীন থাকে, দাউদ তার নিজস্ব রাজকীয় এলাকা হিসেবে নগরীটি ও এর আশপাশের এলাকাকে বিবেচনা করতে পারতেন। এতে কৌশলগত সুবিধাও ছিল। জেরুসালেম ছিল খুবই সুরক্ষিত, হেবরনের চেয়ে অনেক বেশি কেন্দ্রবিন্দুতে। পাহাড়ি দেশে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত জেরুসালেম ফিলিস্তিনদের, সিনাই ও নেগেভের গোত্রগুলোর কিংবা নতুন আম্মন রাজ্যের বা জর্দান নদীর পূর্ব তীরের মোয়াবদের আকস্মিক আক্রমণ থেকে নিরাপদ ছিল। নতুন রাজধানীতে দাউদ এখন পাহাড়ি দেশের অবিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত এলাকার অবিসংবাদিত রাজা। এটি ছিল কেনানের এ যাবৎকালের বৃহত্তম ঐক্যবদ্ধ রাজ্য।

দাউদের রাজধানী দেখতে কেমন ছিল? বর্তমানের মানদণ্ডের আলোকে নগরীটি ছিল অতি ক্ষুদ্র। এর আয়তন ছিল প্রায় ১৫ একর এবং ওই এলাকার অন্যান্য শহরের মতো এটিও ছিল একটি দুর্গের চেয়ে একটু বড়। এতে একটি প্রাসাদ, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের কিছু বাড়ি ছিল। এখানে দুই হাজারের বেশি লোকের ঠাঁই হতো না। অবশ্য দাউদ যে নগরীটি জয় করেছিলেন, তা কিন্তু বাইবেল আমাদের বলে না; আমাদের লেখকেরা জোর দিয়ে বলেন যে তিনি 'জায়নের দুর্গটি' জয় করেছিলেন এবং তিনি 'দুর্গে বসবাস করেছিলেন। যশুয়া গ্রন্থে একটি অধ্যায়ে জেরুসালেমকে 'জেবুসিতদের পার্শ্বদেশ' বলা হয়েছে। এ থেকে মনে হতে পারে জেরুসালেমকে 'জায়ন দুর্গ' থেকে আলাদা হিসেবে দেখা হতো। দাউদ হয়তো স্রেফ জেবুসিতদের দুর্গটি দখল করেছিলেন। আর এ কাজটি হয়তো একটি সামরিক অভ্যুত্থানের সমপর্যায়ের বিবেচিত হতো। যশুয়া গ্রন্থের

মতো করে জেরুসালেমের লোকজনের ওপর গণহত্যা চালানোর কোনো উল্লেখ নেই। এমনকি জেরুসালেমের জেবুসিত অধিবাসীদের নগরী থেকে তাড়িয়ে তাদের স্থানে যিহোবাবাদীদের স্থলাভিষিক্ত করারও কোনো উল্লেখ নেই। ফলে অসম্ভব নয় যে দাউদের বিজয়টি ছিল স্রেফ একটি 'প্রাসাদ অভ্যুত্থান।' এতে করে বোঝা যাচ্ছে, দাউদ ও তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী মিলে জেবুসিত রাজা ও তার অতি কাছের সহকর্মীদের উৎখাত করে জেবুসিত নগরী ও এর জনগণকে আগের মতোই রেখে দিয়েছিলেন। আমরা এই নিয়ে কেবল কল্পনাই করতে পারি। কারণ বাইবেলে জেরুসালেমের প্রথম উল্লেখে লেখক আমাদের বলছেন যে জেবুসিত ও জুদাবাসী তখনো নগরীতে পাশাপাশি বসবাস করছিল।

ফলে ফিলিস্তিনি ও ইদোমিতিসদের পাইকারি গণহত্যার জন্য বিখ্যাত হওয়া দাউদ সম্ভবত ছিলেন জেরুসালেমের ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু বিজয়ী। তিনি নগরীর বিদ্যমান নাগরিকদের প্রতি কেবল মর্যাদাপূর্ণ আচরণই করেননি, সেইসাথে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন, তার নিজ প্রশাসনে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। যওয়া সম্ভবত জেবুসিতদের বেদীগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাদের ঐশী প্রতীকগুলোর প্রতি কঠোর আচরণ করেছিলেন। তবে দাউদ স্থানীয় ধর্মমতের

ওপর কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করেছেন বলে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বস্তুত আমরা দেখব, জেবুসিত ধর্মীয় আদর্শ ও উদ্দীপনা সত্যি সত্যিই জেরুসালেমের যিহোবার প্রার্থনাতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। জে আরেক ইব্রাহিম হিসেবে দেখেছিলেন দাউদকে। তিনি বিশ্বাস করতেন, দাউদের রাজ্য প্রাচীন প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করেছিল। কারণ ইব্রাহিমের বংশধরেরা একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিল, তারা কেনান ভূমির উত্তরসূরি হয়েছিল। তবে ইব্রাহিমের মতো দাউদও দেশের জনগণের বিশ্বাসের প্রতি এঁদ্ধাশীল ছিলেন।

ইর ডেভিডে আসলে জেবুসিত ও ইসরাইলি ঐতিহ্যের মধ্যে একটি সৃষ্টিশীল মিথস্ক্রিয়া ঘটিছিল। শেষ জেবুসিত রাজা (সম্ভবত) অরুনাহকে নগরীর বাইরে মাউন্ট জায়নের উপকণ্ঠে তার এস্টেট বহাল রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। দাউদ পুরনো জেবুসিত প্রশাসনের দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। কেনানি নগর-রাষ্ট্রগুলো কয়েক শতকের পরিক্রমায়

একটি রাজনৈতিক ও আর্থিক আমলাতন্ত্র বিকাশ করেছিল। অন্য দিকে ইসরাইলি বা পাহাড়ি দেশের জুদাবাসীর নগর-রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতা বা বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ছিল না। তাদের বেশির ভাগই ছিল সম্ভবত নিরক্ষর। ফলে পুরনো প্রশাসনকে কেন বহাল রাখা হয়েছিল, জেবুসিত কর্মকর্তাদের কেন কাজে লাগানো হয়েছিল, তা বোঝা যায়। এই কর্মকর্তারাই নগরীর সাবলীল পরিচালনা বহাল রাখতে সহায়তা করেছিল, এবং নতুন জেবুসিত প্রজাদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করতে দাউদকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জেরুসালেমে দাউদের আচরণ ইঙ্গিত দেয়, ইসরাইলিরা দেশের জনগণের কাছ থেকে দূরে থাকাটা তখনো পবিত্র দায়িত্ব মনে করত না। বেবিলনে নির্বাসিত জীবন পর পর্যন্ত ইসরাইলে তা রীতি ছিল না। মিসরীয়রা যখন কেনান নিয়ন্ত্রণ করে, তারা সম্ভবত লোকজনকে তাদের প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিল। বাইবেলে আমরা দেখি, দাউদীয় ও সোলায়মানীয় রাজদরবার মিসরীয়দের আদলে গড়া। এর একজন প্রধান উজিড় রয়েছেন, একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি দেখার জন্য অন্য একজন আছেন; আর আছেন একজন 'রাজার বন্ধু।' ফলে আমারনা আমলে যে পদ্ধতিটি সক্রিয় ছিল তা দাউদের ছেলে সোলায়মানের আমলেও কার্যকর ছিল। সোলায়মানের কয়েকজন কর্মকর্তার অ-সেমিটিক নাম ছিল। আর দাউদ প্রায় নিশ্চিতভাবেই জেবুসিতদের স্থায়ী সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বাইবেলে কেরেতি ও পেলেতি ('ক্রেতান' ও 'ফিলিস্তিন') নামের দুটি পরিভাষা রয়েছে। তারা সম্ভবত ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে দাউদের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করত। ফলে নগরীতে দাউদের বিজয়ের ফলে বলতে গেলে নগরীর স্বাভাবিক কার্যক্রমে কোনোই ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি, আগের জেবুসিত বৈশিষ্ট্যই অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। 'ইর ডেভিড' হিসেবে যে নতুন নাম দেওয়া হয়েছিল, তা কখনো জনপ্রিয় হয়নি। বেশির ভাগ লোক দাউদ-পূর্ব নাম জেরুসালেম ও জায়নই বলা অব্যাহত রাখে।

বস্তুত, রাজকীয় পরিবারের জেবুসিত রক্তও মিশতে পারে। কারণ দাউদ সত্যিই কোনো জেবুসিত রমনীকে বিয়ে করে থাকতে পারেন। পরবর্তীকালে ইসরাইলিদের জন্য বিদেশীদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ করার কঠোর আইন করা হয়। তবে দাউদ বা সোলায়মানের এ নিয়ে কোনো সঙ্কোচ ছিল না। দাউদ তার সেনাবাহিনীর জেবুসিত অফিসারদের একজন 'উরিয়াহ দি হিত্তিত -এর স্ত্রী বাথশেবাকে প্রলুব্ধ করেছিলেন।

(হিত্তিতের সাথে জেবুসিতরা সম্পর্কযুক্ত ছিল বলে বলা হয়ে থাকে।) দাউদ যাতে বাথশেবাকে বিয়ে করতে পারেন, সেজন্য তিনি আম্মোনিতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উরিয়াহকে বিশেষভাবে বিপজ্জনক স্থানে মোতায়েন করেন। বাথশেবার নামটি এসে থাকতে পারে ‘সাত ঈশ্বরের মেয়ে’ (কনিফর্ম লিপিতে তা সিব্বিতি লেখা হলেও হিব্রুতে তা হয়ে যায় শেভা বা ‘সাত’।)’ ফলে দাউদ ও বাথশেবার যে ছেলের জন্ম হয় তিনি ছিলেন অর্ধেক জেবুসিত। তাকে ভালো ইসরাইলি নাম জেদিদা (‘যিহোবার প্রিয়) দেওয়া হয়। তাকে যে দাউদের উত্তরসূরি মনোনীতি করা হয়েছে, তারই চিহ্ন ছিল এটি। তবে তার মা-বাবা তাকে যে নামটি দিয়েছিলেন তা হলো সোলায়মান। এ নামটি জেরুসালেমের প্রাচীন দেবতা সালেমের সাথেও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। ইতিহাসলেখকেরা অবশ্য একে হিব্রু সালোমের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেন। পিতার বিপরীতে সোলায়মান হয়েছিলেন ‘শান্তির মানব।’

ইহুদি ঐতিহ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়া অন্যান্য জেরুসালেমবাসীর মধ্যেও জেবুসিত থেকে থাকতে পারেন। এদের একজন হলেন নবী নাথান।’ বাইবেলে অন্য প্রায় সব নবীর পারিবারিক পরিচিতি দেওয়া হলেও নাথানের বেলায় ব্যতিক্রম দেখা যায়। তিনি সম্ভবত ছিলেন জেবুসিত রাজার উপদেষ্টা। তা হয়ে থাকলে দাউদ ও তার নতুন জেবুসিত প্রজাদের মধ্যে খুবই সম্ভাবনাময় মধ্যস্ততাকারী ছিলেন তিনি। এ কারণেই উরিয়াহর মৃত্যুর পর দাউদকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন নাথান। মুসায়ী নৈতিকতায় উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি এমনটি করেছিলেন তা নয়, বরং রাজ্যে ন্যায়বিচার রক্ষার সংকল্প ব্যক্ত করা নিকট প্রাচ্যের রাজতন্ত্রের দায়দায়িত্বের সুস্পষ্ট বরখেলাপ ছিল ওই ঘটনা। উরিয়াহর হত্যাকাণ্ডটি জেবুসিত জনসাধারণের সাথে দাউদের সম্পর্কও মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করেছিল। জেরুসালেমের প্রধান পুরোহিত জাদোকও সম্ভবত জেবুসিত ছিলেন। অবশ্য এ নিয়ে অতীতে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছে।১২ পরে আমরা দেখতে পাবো, ইসরাইলের সব পুরোহিতকে প্রমাণ করতে হয়েছিল, তারা ছিলেন জাদোকের বংশধর। কারণ ওই সময় জাদোক পরিণত হয়েছিলেন ইহুদি বিশুদ্ধতার প্রতীক। তবে জাদোক আসলে জেবুসিত নাম। পরে ইতিহাসলেখকেরা একটি অনবদ্য বংশলতিকা উপস্থাপন করেছিলেন। এতে তাকে হারুনের বংশধর হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু দাউদ ও হারুনের মধ্যে আরো

বেশি প্রজন্মের অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা করা হয়ে থাকে।১৩ সম্ভবত ইতিহাসলেখকেরা জাদোকের নিজস্ব জেবুসিত বংশই অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। আল ইলিয়নের প্রধান পুরোহিতকে বরখাস্ত করাটা সম্ভবত স্থানীয় লোকজনের ভালো লাগেনি। ইসরাইলিদের সন্তুষ্ট করার জন্য জাদোকের পাশাপাশি দায়িত্ব পালনের জন্য শিলোহের পুরোহিতদের বংশধর আবিয়াথারকে নিয়োগ করেছিলেন দাউদ। তবে আবিথার সম্ভবত দাউদের মৃত্যুর গর বেশি দিন বাঁচেননি। জাদোকই জেরুসালেমের প্রধান পুরোহিত হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও একজন ইসরাইলি ও একজন জেবুতিকে পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করতে দেখাটি জেরুসালেমে দাউদ যে সহাবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, সেটিই প্রতীকীভাবে ফুটে ওঠেছে। তার ক্রমবর্ধমান হারে বৈচিত্র্যপূর্ণ রাজ্যে ঐক্য ও বিভিন্ন উপাদানকে একত্রিত করার জন্য সংহতি প্রদর্শনকারী প্রতীকের প্রয়োজন ছিল। দাউদ তার এক ছেলেকে বলতেন বালিদা। এতে বোঝা যাচ্ছে, তিনি স্থানীয় জায়ন ঐতিহ্যের কাছে উন্মুক্ত ছিলেন, মাউন্ট জায়নবিষয়ক জেবুসিতদের অনেক পুরনো কান্টিক রীতিনীতি জেরুসালেমের যিহোবার ইসরাইলি ঐতিহ্যের সাথে সফলভাবে মিশ্রিত হয়েছিল।

দাউদের অন্যতম প্রথম কাজ ছিল আর্ক অব দি কোভেন্যান্টকে জেরুসালেমে সরিয়ে নেওয়া। তখনো সেটি তার রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তের কিরেথ জেরিমে ছিল। এটি বিপজ্জনক হলেও উদ্দীপ্ত সিদ্ধান্ত ছিল। দাউদের প্রতি তখনো অস্বস্তিতে থাকা রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের লোকজন তার নগরীতে আর্কের (এটি ছিল তাদের সবচেয়ে পবিত্র ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত) উপস্থিতিতে অভিভূত হয়ে যেতে পারে মনে করা হয়েছিল। এটি তার শাসনের বৈধতা দিয়েছিল, নগরীকে পবিত্র করেছিল। কারণ, তখন পর্যন্ত জেরুসালেমে যিহোবাবাদীদের জন্য পবিত্র স্থান হিসেবে কোনো ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল না। অবশ্য, আর্ক স্থানান্তরে দাউদের প্রথম প্রয়াস মর্মান্তিকভাবে ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিল। কোনো পবিত্র স্থানকে নিজেদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা কোনো মানবীয় দায়িত্ব ছিল না। পবিত্র স্থানটিকে নিজে থেকে আবির্ভূত হতে হয়। যিহোবাকে অতীতে চলমান দেবতা হিসেবে দেখা হতো, তবে তিনি চলতে পারতেন কেবল রাজার ইচ্ছানুযায়ী। যেকোনো পবিত্র বস্তু বিপজ্জনক হওয়ার আশঙ্কাযুক্ত থাকে, তা কেবল যাদের কাছে যথাযথ প্রতিষেধক আছে, তারাই নাড়াচাড়া করতে পারে। বিষয়টি ভয়াবহভাবে দেখা গিয়েছিল আর্কের প্রথম সফরকালে।

ওই সময় উজ্জাহ নামের এক সাহায্যকর্মী এটিকে ধরার জন্য হাত বাড়ালে এটি গাড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, সে সাথে সাথে মারা যায়। যিহোবার উপস্থিতির প্রতীকে পরিণত হয় আর্ক। ফলে ঘটনাটি প্রমাণ করে, দাউদ নগরীতে ধার্মিক স্মারক হিসেবে নয়, বরং শক্তিশালী ও নজিরবিহীন শক্তিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। যদি যিহোবাকে জায়নে আসতে হয়, তবে তা হবে তিনি – কেবল একমাত্র তিনিই – তা করতে চেয়েছেন বলেই।

তিন মাস পর দাউদ আবার চেষ্টা করলেন। এবার যিহোবা কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই জেরুসালেমের ভূখণ্ডে আর্কের প্রবেশ অনুমোদন করলেন। আর্কের সামনে দাউদ নৃত্য করলেন, চক্কর খেলেন। এ সময় তিনি পুরোহিতের মতো লিনেনের সংক্ষিপ্ত পোশাক পরেছিলেন। মাঝে মাঝেই তিনি শোভাযাত্রাটি থামিয়ে ভেড়া বা ছাগল কোরবানি দিচ্ছিলেন। সবশেষে আর্কটিকে বিপুল জাঁকজমক ও উল্লাসের মধ্য দিয়ে গিহোন স্প্রিংয়ের পাশে এ উদ্দেশ্যে নির্মিত তাঁবু-মন্দিরে নিয়ে আসা হলো।১৪ দাউদের নগরীতে বসবাস করার পরিকল্পনা করার মাধ্যমে যিহোবা দ্ব্যর্থহীনভাবে ইঙ্গিত দিলেন যে তিনি দাউদকে ইসরাইলের রাজা করার জন্য মনোনীত করেছেন। স্থায়ী আবাস হিসেবে যিহোবার জায়নকে গ্রহণ করার বিষয়টি দাউদের পরিবারকে নির্বাচন করার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। দাউদ জেরুসালেমে যিহোবার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তাতেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। নাথানের কাছে আইডিয়াটি উপস্থাপনের সময় নবী ছিলেন খুবই উদ্দীপ্ত। নিকট প্রাচ্যের রাজাদের কর্তব্য হলো যে ঈশ্বরের ওপর তার শাসন নির্ভরশীল, তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করা। কিন্তু যিহোবার ছিল অন্য পরিকল্পনা : তিনি নাথানকে বললেন, তিনি সবসময় কোনো তাঁবুতে ভ্রাম্যমাণ জীবন কাটাতে চান। তিনি নিজের জন্য কোনো গৃহ চান না, এর বদলে তিনি চান গৃহটি দাউদের জন্য নির্মাণ করা হোক তথা এ রাজবংশটি চিরদিন টিকে থাকুক।১৫

সম্ভবত নাথানের মনে শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল যে জেবুসিত জেরুসালেমের মধ্যে কোনো বিদেশী ঈশ্বরের জন্য মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে আল ইলিয়নকে সরিয়ে দেওয়ার কাজ দাউদের জন্য খুব বেশি তাড়াহুড়া হয়ে যাবে। দাউদ সম্ভবত গিহন স্প্রিংকে স্থান নির্বাচন

করেছিলেন। এটি ছিল প্রাচীরগুলোর বাইরে, জেবুসিত স্পর্শকাতরতা-বহির্ভূত। কিংবা সম্ভবত ইসরাইল ও জুদার গোত্রগুলোর মধ্যে এ নিয়ে পরস্পরবিরোধী ধারণা ছিল। তারা সম্ভবত যিহোবার যাযাবর ভাবমূর্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় কোনো পবিত্র স্থানে আবদ্ধ থাকার কেনানি অন্যান্য ঈশ্বরের মতো তাকে দেখতে চাচ্ছিল না। সম্ভবত লোকজন এই মন্দির দাউদকে যে ক্ষমতা দেবে, তার ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েছিল। বাইবেললেখকরা মন্দির প্রত্যাখ্যান করার যিহোবার কাহিনীটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এ জন্য যে তাদের আদর্শ রাজা দাউদ তার ঈশ্বরের জন্য কোনো মন্দির নির্মাণ করতে ব্যর্থ হওয়াটা তাদের জন্য ছিল বেশ বিব্রতকর অবস্থা। লেখকেরা মনে করেছেন, দাউদ খুব বেশি রক্তপাত করায় ওই উচ্চ সম্মান দেওয়া হয়নি তকে, এবং সোলায়মান শান্তিবাদী হওয়ায় তিনিই পেয়েছেন তা।১৬ আমরা দেখেছি, প্রাচীন দুনিয়ার নগরীগুলোতে ভবনের ধর্মীয় তাৎপর্য থাকে। দাউদ জেরুসালেমে একজন রাজার জন্য মানানসই অনেক ভবন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি লেবানন থেকে সিডর কাঠ এনে নিজের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন; তিনি 'মিলো' মেরামত করেছিলেন। বাইবেল লেখকেরা এই 'মিলো' শব্দটি নিয়ে ধাঁধায় পড়েছিলেন। তারা শেষ পর্যন্ত একে ওফেলের উপরে প্রাচীন কোনো বারান্দা বুঝেছিলেন। দাউদ নতুন দুর্গ হিসেবে 'টাওয়ার অব দাউদ' নির্মাণ করেছিলেন। সাম্রাজ্যের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকা সরকারি কর্মকর্তা, শিল্পী ও সৈন্যদের আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি নগরীটি সম্প্রসারণ করেন। কাজটি করার জন্য একপর্যায়ে তিনি প্রাচীরগুলোও ভেঙ্গে ফেলেন। কিন্তু মুসা যেমন তার লোকজনকে মিসর থেকে বের করে প্রতিশ্রুত ভূমির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, একইভাবে দাউদও যিহোবার লোকজনকে জেরুসালেমে নিয়ে গেলেও মন্দির নির্মাণ করার সুযোগটি পাননি, যা একদিন এই জেবুসিত নগরীটি ইহুদি বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্র স্থানে পরিণত হবে।

নিকট প্রাচ্যে ধর্ম এখনো নিজের প্রয়োজনে ভূমি ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হয়। পাসওভারের উৎসবে ইসরাইল-অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা আরব এলাকা দিয়ে শোভাযাত্রা বের করে। এটি এমন এক 'তীর্থযাত্রা' যা তাদের বিশ্বাস করা পবিত্র ভূমিতে আগ্রাসী ইহুদি উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে।

ভবিষ্যতে সোলায়মানের মন্দিরের স্থানের জন্য তিনি আরাউনার (তিনি সম্ভবত ছিলেন শেষ জেবুসিত রাজা) কাছ থেকে জমি কিনে আয়োজন সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদের লেখকেরা বলছেন, আদমশুমারির নির্দেশ দিয়ে দাউদ সম্ভবত পাপ করেছিলেন। এটি সবসময় অজনপ্রিয় পদক্ষেপ বিবেচিত হতো। কারণ, এর ফলে সাধারণত কর ও বাধ্যতামূলক শ্রমের ব্যবস্থা করত। ফলে ঈশ্বর রাজ্যে প্লেগ পাঠালেন। ওই রোগে তিন দিনে ৭০ হাজার লোক মারা গেল। শেষ পর্যন্ত দাউদ দেখলেন, মাউন্ট জায়নের উপরে অরুনাহর বিশাল গোলাকার চত্বরে যিহোবার 'ফেরেশতা' নিচের নগরীর দিকে হাত বিস্তৃত করে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজদরবারের এক নবী দাউদকে অবগত করেন যে এই ঐশী স্থানে যিহোবার জন্য একটি বেদী নির্মাণ করার মাধ্যমেই তিনি কেবল প্লেগ দমন করতে পারেন। বাইবেল লেখকেরা দেখলেন, দাউদ ও অরুনাহ এই সঙ্কটকালে সম্প্রীতিপূর্ণভাবে একসাথে কাজ করছেন। ঘটনাটি ইব্রাহিমের ইফরোন দি হিত্তিত থেকে ম্যাচফেলাই গুহা ক্রয় করার ঘটনাটি মনে করিয়ে দেয়। ইফরোনের মতো অরুনাহও বিনা মূল্যেই জমিটি দাউদকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দাউদ স্থানটি স্রেফ দখল করেও নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার পূর্বসূরীর প্রতি প্রশংসনীয় সৌজন্যতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাকে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে অটল থাকেন।১৭ বর্তমানে অনেকে মনে করেন, জেবুসিত জেরুসালেমের অন্যতম পবিত্র স্থান ছিল এলাকাটি। কেনানে উন্মুক্ত চত্বর প্রায়ই জনসমাবেশ বা ভবিষ্যদ্বাণী শোনার জন্য কিংবা বালের উর্বরা মতবাদের জন্য ব্যবহৃত হতো এবং নগরীর প্রবেশপথে প্রকাশ্য স্থানে এ ধরনের একটি স্থানের মালিক অরুনাহর হওয়াটা প্রমাণ করে, এটি ওই মতাদর্শের জন্য ব্যবহৃত হতো।* বাইবেল লেখকেরা এটি উল্লেখ করেননি। কারণ এতে বোঝা যেত, পৌত্তলিক বামাহ (কাল্ট স্থান)-এর জায়গাটি তাদের মন্দির প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার কথা প্রকাশ পাওয়াটা তাদের জন্য ছিল বিব্রতকর। কিন্তু এ ধরনের ধারাবাহিকতা প্রাচীন কালে সাধারণ বিষয় ছিল। অরুনাহ কোনো ধরনের ক্রোধ.... প্রকাশ করেননি, তবে সম্ভবত দাউদের সাথে এ পবিত্র স্থানটি ভাগাভাগি করতে চেয়েছিলেন। তিনি এমনকি নতুন বেদীতে প্রথম কোরবানির জন্য মূল্যও দিতে চেয়েছিলেন। ঐশী সত্তা এমন এক জিনিস যার মালিকানা মানুষের পক্ষে অর্জন করা বা সামগ্রিকভাবে অনুভব করা সম্ভব নয়। ঐশী-প্রকাশটি দেখিয়েছে যে স্থানটি ঈশ্বরদের

মালিকানাধীন, পরের প্রজন্মে দাউদ ও অরুনাহর সন্তানেরা একসাথে মাউন্ট জায়নে প্রার্থনা করেছিল।

দাউদও নতুন মন্দিরের জন্য সামগ্রীও সংগ্রহ করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। তিনি সিডার কাঠ ও জুনিপার বৃক্ষ পাঠানোর জন্য তার মিত্র টায়ারের রাজা হিরামকে অনুরোধ করেছিলেন। মন্দির নির্মাণে দাউদ কোনো ধরনের অংশগ্রহণ করেননি, এমনটা ইতিহাসলেখক বিশেষভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি আমাদের জানাচ্ছেন, যিহোবা ভবিষ্যতের পবিত্র স্থানটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা দাউদকে জানিয়েছিলেন, এবং তিনি এইসব ঐশী নির্দেশনা তার ছেলে সোলায়মানকে অবগত করেছিলেন।১৯ ফলে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল 'যিহোবা যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই। কোনো রাজা মন্দিরের জন্য স্থান নির্বাচন করতে পারেন না : সেই স্থানেই মন্দির নির্মিত হতে পারে সেখানে বিশ্বের 'কেন্দ্রগুলোর' একটি প্রকাশিত হয়। ফলে রাজারা প্রায়ই সাবেক মন্দিরের স্থানই বেছে নিতেন। কারণ এসব স্থানের সাথে ঐশীর সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে জানা থাকত। একইভাবে কোনো স্থাপত্যবিদ নতুন কোনো মন্দির নির্মাণ করার সময় মৌলিক হিসেবে তার নক্সা প্রণয়ন করেছেন বলে প্রত্যাশিত ছিল না। এটি হতে হতো প্রতীক। যে গ্রিক শব্দটি থেকে এটির উদ্ভব ঘটেছে তাতে দুটি বিষয় একসাথে প্রকাশ করে। প্রাক-আধুনিক বিশ্বে এই আইডিয়া খুবই গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হতো। এটি ছিল প্রাচীন ধর্মের ভিত্তি। মন্দিরকে হতে হতো ঈশ্বরের স্বর্গীয় আবাসের অনুকরণ। আর এই পছন্দই স্বর্গীয় আদিরূপের সাথে নিচে দুনিয়ায় অনুকরণটিকে সম্পর্কযুক্ত করে দুটিকে একই অনুভূতিতে প্রকাশ করত। একই ঘনিষ্ঠ মিলের কারণেই দেবতাকে তার দুনিয়াবি তীর্থক্ষেত্রে বাস করা সম্ভব করে তুলত। তিনি দুনিয়াতে স্বর্গীয় স্থানের মতো করেই বাস করতেন। একইসাথে কোনো মন্দিরের পরিকল্পনা প্রকাশ করতে হতো। দাউদও তেমনটি করেছিলেন, যাতে দুনিয়ার উপরে ঈশ্বরের গৃহটির মাত্রা ও গৃহসজ্জাগুলো নিখুঁতভাবে দুনিয়াতেও তৈরি করা সম্ভব হয়।

কিন্তু তারপরও এসবের মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক উপাদান ছিল। আর্ককে জেরুসালেমে নিয়ে আসার মাধ্যমে দাউদ ধীরে ধীরে নগরীকে নিজের করে নিচ্ছিলেন। প্রথমে তিনি

ওফেলের পাদদেশে তার জনগণের সবচেয়ে ঐশী বস্তুটিকে নিয়ে এলেন, তারপর অরুনাহর গোল চত্বর ক্রয় করার মাধ্যমে মাউন্ট জায়নের ওপরে তার নিজস্ব মন্দিরে যিহোবার স্থায়ী অভিষেকের ব্যবস্থা করলেন। সোলায়মানের আমলে যিহোবা জেরুসালেমের আল ইলিয়নে তথা এর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে পরিণত হয়েছিলেন। একইভাবে দাউদ তার ছোট সাম্রাজ্য গড়েছিলেন ধাপে ধাপে। প্রথমে তিনি ফিলিস্তিনিদের বশ করেন। বস্তুত, তিনি নগরীটি জয়ের আগে জেরুসালেমের দক্ষিণে রেফাইম উপত্যকায় তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন। পর্যায়ক্রমে তিনি অবশ্যই কেনানের অন্যান্য নগর-রাষ্ট্রকেও তার সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তবে বাইবেল এর উল্লেখ করেনি। তারা সম্ভবত সামন্ত মর্যাদা গ্রহণ করেছিল। সবশেষে তিনি মোয়াব ও ইদোমের প্রতিবেশী রাজ্য দুটিকে বশ মানান। সিরিয়ার বিশাল এলাকাজুড়ে ছিল এই দুই রাজ্যের অবস্থান। (মানচিত্র দেখুন।) ইসরাইলিরা দাউদের রাজ্যের কথা ভোলেনি : তারা আর কখনো রাজনৈতিকভাবে এত শক্তিশালী হয়নি। অবশ্য নিকট প্রাচ্যের ওই সময়ের অন্য কোনো গ্রন্থেই রাজ্যটির কথা উল্লেখ নেই। এ কারণে অনেকে মনে করে, এটি একটি কল্পকথা,

এগুলো গোষ্ঠপতিদের কাহিনীর মতো, এর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তবে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে, ইসরাইল ও জুদার ঐক্যবদ্ধ রাজ্যটি বাস্তবেই অস্তিত্বশীল ছিল। বাইবেলে এই সময়ে আমাদের পরিচিত নিকট প্রাচ্যের সামজের সাথে দাউদের সাম্রাজ্যের প্রচুর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বর্ণনা থাকায় পুরোটাই বানোয়াট দাবি করা কঠিন। তখন মেসোপোটেমিয়া ও মিসর উভয়টিই নিজেদের অন্তঃদ্বন্দ্বে পতনমুখী হতে থাকায় দাউদের রাজ্যের সাথে তাদের সম্ভবত কোনো যোগাযোগ ছিল না। অধিকন্তু, বাইবেল রাজ্যটিকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেনি। বিপুল প্রশংসাপূর্ণ ভাষ্যের পাশাপাশি আমরা সম্পদ ছাপিয়ে রাজ্যটিকে ভেতর থেকেই তিক্তভাবে বিভক্ত হওয়ার কথাও পাঠ করি। স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে, রাজ্যটি সঙ্কটের দিকে এগিয়ে চলেছিল।

দাউদ মরনোত্তর বীর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকলেও জীবদ্দশায় তিনি সার্বজনীনভাবে ভালোবাসা পাননি। তার ছেলে আবসালোম তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল,

জেবুসিত রাজ্যের সাথে সম্পৃক্ত কান্ট-প্রাসাদ এন রোগেলের ঝরনায় নিজের জন্য একটি স্মৃতিসৌধ স্থাপন করেছিল, হেবরনে নিজেকে ইসরাইল ও জুদার রাজা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। পরিস্থিতি এত মারাত্মক হয়ে পড়েছিল যে দাউদকে জেরুসালেমে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। তবে তিনি বিদ্রোহ দমন করতে পেরেছিলেন। বিদ্রোহীদের প্রতি জনসমর্থন থাকায় কেবল শ্রেয়তর সামরিক সামর্থ্যের কারণেই দাউদ তাতে সাফল্য পেয়েছিলেন। ইসরাইল ও জুদার মিলন ও ছিল ভঙ্গুর। কারণ দাউদকে সম্ভবত তার নিজ রাজ্য জুদাতে বেশি পছন্দ করা হতো। আবসালোমের বিদ্রোহের পর পুরো ইসরাইল তার ঐক্যবদ্ধ রাজ্য থেকে সরে যায়। দাউদ আবারো তার শক্তি প্রয়োগ করেই ক্ষমতা ফের জাহির করতে পেরেছিলেন। জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে জেরুসালেমে জেবুসিত ও ইসরাইলিদের মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়। দাউদ মৃত্যুশয্যায় থাকার সময় তার বেঁচে থাকা বড় ছেলে আদোনিজাহ কমান্ডার জোয়াব ও পুরোহিত অ্যাবিথারসহ হেবরনের অভিজাতদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে এন রোগেলে নিজেকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন। পাল্টা ব্যবস্থার জন্য জেবুসিত গ্রুপটি দাউদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। কেরেতি ও পেলেতির পুরনো জেবুসিত সেনাবাহিনীকে নিয়ে নাথান, জাদোক ও বাথশেবা এবার সোলায়মানকে গিহোন স্প্রিংয়ের পাশে অবস্থিত ইয়ায়ের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে সেখানে বিপুল তুর্যনিনাদে তাকে মুকুট পরান। আদোনিজাহ সাথে সাথে আত্মসমর্পণ করেন। জোয়াবের সাথে তাকেও শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হয়, অ্যাবিথারকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। দাউদ যখন মারা যান, তখন জেবুসিত গ্রুপটি জেরুসালেমে নবাগতদের বিরুদ্ধে বিপুলভাবে বিজয়ী হয়েছিল বলে বলা যায়।

দাউদের অধীনে জেরুসালেম ছোট একটি কেনানি নগর-রাষ্ট্র থেকে সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৯৭০ সাল থেকে শুরু হওয়া সোলায়মানের আমলে জেরুসালেম লাভ করে আঞ্চলিক মর্যাদা, এর আকার হয় দ্বিগুণ। অনুগত বা মিত্র রাজাদের মেয়েদের নিয়ে রাজকন্যা/রানিদের বিশাল হেরেম ছিল সোলায়মানের। তিনি ফারাওদের এক মেয়েকে বিয়ে করার বিরল সম্মানও অর্জন করেন। রাজ্যের এখন ওই সময়ের সর্বাধুনিক সামরিক প্রযুক্তি শক্তিশালী রথ বাহিনী ছিল, আকাবা উপসাগরে ইজিয়ন গেবারে একটি নৌবহরও ছিল। সোলায়মান হন মিসর ও সিলিসিয়ায় অস্ত্র

ব্যবসায়ী, রথ ও ঘোড়া বিক্রিকারী। বাইবেল আমাদের জানাচ্ছে, সোলায়মানের জ্ঞানের খ্যাতি শুনে শেবার (আধুনিক ইয়েমেন) রানি তার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। কাহিনীটি সম্ভবত সোলায়মানের রাজ্যের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কথা প্রতিফলিত করছে। কারণ তিনি লোহিত সাগরে বাণিজ্য শুরু করে দিলে শেবার অর্থনীতিতে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারত। সোলায়মান কিংবদন্তির মর্যাদা লাভ করেন। তার সম্পদ ও বিচক্ষণতা বিস্ময়কর পর্যায়ে ছিল বলে ধারণা করা হয়। সফল রাজার মর্যাদার সাথে সঙ্গতি রেখে তিনি বিশাল নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেন। হাজর, মেগিডো ও আরাদের নগর দুর্গগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

জেরুসালেম পরিণত হয় কসমোপলিটান নগরী। এটিই সোলায়মানের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী নির্মাণ কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছিল। নগরীকে উত্তর দিকে সম্প্রসারিত করে সোলায়মান মাউন্ট জায়নের ঢালে অরুনাহর পুরনো এস্টেট এলাকায় একটি রাজকীয় নগর-দুর্গ নির্মাণ করেন। বাইবেলের সূত্রগুলো আমাদের বলছে, এটি সিরিয়া ও উত্তর-পশ্চিম মেসোপোটেমিয়ার বিভিন্ন স্থানে উদ্ঘাটিত ১০ শতকের অন্যান্য নগর-দুর্গের মতো ছিল। এতে যিহোবার একটি বিশাল টেম্পল ছিল, রাজার জন্য ছিল একটি প্রাসাদ। প্রাসাদটি আয়তনে টেম্পলের প্রায় দ্বিগুণ ছিল। ২১ আরো কিছু ভবনও ছিল তাতে। এগুলোর একটি ছিল সিডর-স্তম্ভের 'হাউস অব ফরেস্ট অব লেবানন'। এটির কার্যক্রম এখনো আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। এছাড়া ছিল ছিল খাজাঞ্চি খানা, বিচার দরবার। এখানেই সোলায়মানের চমকপ্রদ হাতির দাঁতের সিংহাসনটি ছিল। আর ছিল ফারাওয়ের মেয়ের জন্য বিশেষ একটি প্রাসাদ। এই মেয়ে ছিলেন সোলায়মানের সবচেয়ে খ্যাতিমান স্ত্রী।

এর কিছুই টিকে থাকেনি। এসব ভবনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল টেম্পল। আর এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পুরোপুরি বাইবেললেখকদের ওপর নির্ভরশীল। তারা শ্রুতিনির্ভর প্রচলিত ভাষ্যের (এগুলোর কোনো কোনোটি প্রচরিত হয়েছিল টেম্পলটি ধ্বংস হওয়ার অনেক দিন পর) বিস্তারিত বিবরণ অনুরাগসিক্ত হয়ে তুলে ধরেছেন। যিহোবার উদ্দেশে নিবেদিত টেম্পলেই আর্ক অব কোভেন্যান্ট রাখা হয়েছিল। নিকট প্রাচ্যের মন্দিরগুলোর

সাথে এর সবচেয়ে অমিল ছিল এই যে এখানে প্রধান দেবতার উপস্থিতি প্রতীকীভাবে ফুটিয়ে তুলতে তার কোনো মূর্তি ছিল না। জ্বলন্ত ঝোপে মুসার কাছে আত্মপ্রকাশের সময় থেকে যিহোবার মানবীয় মূর্তিতে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করতে কিংবা প্রতিনিধিত্বশীল হতে অস্বীকার করে আসছেন। তবে অন্য সব দিক থেকেই টেম্পলটি স্বাভাবিক কেনানি ও সিরিয়ান মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। সম্ভবত টায়ারের শিল্পীদের নক্সায় তারাই এটি নির্মাণ করেছিল। এটি সম্ভবত ছিল সিরিয়ার রাজকীয় স্থাপত্যের বিশেষ উদাহরণ। ২২ সাধারণ পূজারীরা মন্দির ভবনটিতে প্রবেশ করত না, বাইরের আঙিনায় বলি দেওয়া হতো। পবিত্র স্থানটি ছিল বেশ ছোট ও তিন ধাপবিশিষ্ট। পূর্ব প্রান্তে ছিল বেস্টিবুল (চাঁদনি, উলুম), কাল্ট হল (হেখাল) ও ছোট কয়েকটি ধাপের ওপরে ছিল হলি অব হলিস (দেভির)। এতে আর্কটি রাখা ছিল। এটি নীল, আরক্ত ও রক্তবর্ণের লিনেনে মোড়া ছিল। ২৩ (দেখুন ডায়াগ্রাম।) আসবাবপত্রে নিকট প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক দৃশ্যপটে যিহোবার মতবাদ নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া বিষয়টি দেখা যায়। আর্ক ছাড়া এক্সোডাসের আর কোনো নিশ্চিত প্রতীক ছিল না। বরং বাইবেল আমাদের বলে, হেখালে দুটি বড় আকারের সোনার মোমদানি ছিল। এগুলোর সাথে ছিল পবিত্রতার জন্য সোনার টেবিল, সোনার আবরণ দেওয়া সিডর কাঠের ধূপদানি। এছাড়া ছিল ব্রোঞ্জের সাপ। পরবর্তীকালে বলা হতো, প্লেগ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য এটি মুসা ব্যবহার করেছিলেন। তবে সম্ভবত এটি পুরনো জেবুসিত মতবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।২৪ উলামের প্রবেশপথে মুক্তভাবে দাঁড়ানো স্তম্ভ ছিল। এ দুটি রহস্যময় কারণে 'ইয়াখিন' ও 'বোয়াজ' নামে পরিচিত ছিল। বাইরে ছিল খোলা আঙিনা।২৫ সেখানে ছিল বিশাল এক কোরবানির বেদী ও আদি সাগর যমের প্রতিনিধিত্বকারী ১২টি ষাঁড়ে চাপানো একটি বিশাল ব্রোঞ্জের বেসিন। টেম্পলের দেয়ালগুলোর বাইরের দিকে স্বর্গীয় দূত, খেজুর গাছ, ফুটন্ত ফুলের চিত্র খোদাই করা ছিল। ২৬ সিরীয় প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। ব্রোঞ্জের সাগর বালের যম-নাহারের সাথে যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ষাঁড় ছিল ঐশীত্ব ও উর্বরতার অভিন্ন প্রতীক। আর ইয়াখিন ও বোয়াজের স্তম্ভগুলো সম্ভবত কেনানি স্থায়ী পাথর (ম্যাটজাভোত) বোঝাত। টেম্পল নির্মাণ নিয়ে বাইবেলের লেখকেরা হিব্রু পঞ্জিকার বদলে কেনানি দিনপুঞ্জির উল্লেখ করেছেন। এটি উৎসর্গ করা হয়েছিল ইথানিম' (সেপ্টেম্বর/অক্টোবর) মাসে। এটি বালের শরৎকালীন উৎসবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। এটি মোতের জয় ও মাউন্ট জাফোনে তার

সিংহাসনে আরোহণের উৎসব হিসেবে পালিত হতো। ইসরাইলি ঐতিহ্যে এই উৎসবের নাম ছিল সুখোথ (ত্যাবেরনাকে) এবং পরিশেষে আমরা দেখতে পাবো, এই কৃষি উৎসব নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে এক্সোডসের সাথে সম্পর্কিত হবে।

দৃশ্যত ‘পৌত্তলিক কল্পনায় সাজানো হলেও টেম্পলটি ইসরাইলের সবচেয়ে প্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অনেক নবী ও সংস্কারক এতে অসন্তুষ্ট হয়ে এক্সোডস সময়কার অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ধর্মে ফিরে যেতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তবে নেবুচাদনেজার যখন সোলায়মানের মন্দিরটি ধ্বংস করেছিলেন, তখন বেশির ভাগ ইসরাইলি মনে করেছিল, তাদের দুনিয়া শেষ হয়ে গেছে। আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত হবে না এ কথা জেনে যে বেশির ভাগ মানুষই কেনানি ও সিরিয়ার পৌরাণিক কাহিনীকে আর্ক ও নির্বাসনের ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচনা করত। আমরা এক্সোডস কিংবদন্তি অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাল ও নারদোকের পুরনো মিথে বদলে যেতে দেখেছি। আমরা যদি এক্সোডসের গল্পকে স্রেফ ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে ‘সত্য’ বলে ধরে নেই, তবে যমের সাথে বালের যুদ্ধ স্রেফ কল্পকথা অর্থাৎ ‘মিথ্যা’ হয়ে যায়। কিন্তু যদি আমরা এক্সোডসের অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে তাকাই এবং এর সময়কে ছাড়িয়ে যাওয়া সত্য হিসেবে এর শক্তিকে উপলব্ধি করি, তবে আমরা দেখতে পাবো যে সোলায়মানের মন্দিরে আঙিনায় থাকা ব্রোঞ্জের সাগরটি একেবারে বেখাপ্পা কিছু নয়। উভয়টিই অন্ধকারের শক্তি ও পথচলার শাস্ত্রাচারের সীমাহীন যুদ্ধের কথা বলে। ইহুদিরা যেমন তাদের প্রতিটি প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে মিসরে ক্রীতদাসের জীবন থেকে তাদের পালাতে হবে, একইভাবে যমের উপস্থিতিও মনে করিয়ে দেয়, বিশৃঙ্খলার শক্তিকে কখনো পুরোপুরি উরানো যাবে না। ঐশী উপস্থিতির আবাস টেম্পলের দরজায় স্থাপন করায় এটি চ্যালেঞ্জ ও প্রয়াসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা উদ্দীপনা ও প্রয়োজনের আলোকে ঐশী সত্তার সৃষ্টিশীলতাকে উদ্দীপ্ত করে।

বর্তমানে জেরুসালেমে টেম্পল মাউন্টের স্থানের কাছে একজন রাব্বি প্রার্থনা করছেন। সোলায়মানের টেম্পলের মহান পবিত্রতা ধারণ করে তিনি এর ভিত্তির যতটুকু সম্ভব কাছাকাছি যেতে চান। বর্তমানে এটি মুসলিম হারাম আল-শরিফের নিচে অবস্থিত।

আমরা জেরুসালেমের যিহোবা মতবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত সম থেকে জানতে পারি, টেম্পলটি কাল্পনিকভাবে মাউন্ট জায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। সেখান আর্ককে স্থাপন করা মাত্র স্থানটি ইসরাইলের এমন এক 'কেন্দ্রে' পরিণত হয় যা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, এর শেকড় নিচের পৃথিবীতে থাকায় এটি আদি সাগরের প্রতিনিধিত্বও করত। ঐশী পর্বতের মতো মহাবিশ্বের জীবনকে টিকিয়ে রাখার বাস্তব প্রতীক ছিল টেম্পল। ইয়াকুবের মইয়ের মতো এটি সত্তার উৎসের সাথে সেতুবন্ধের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এই সত্তার সাথে সংযোগ ছাড়া ভঙ্গুর দুনিয়াবি জগত টিকে থাকতে পারে না। অতীতে ঐশী সত্তা নিজেকে প্রকাশ করেছিল, এমন একটি স্থানে এটি নির্মিত হওয়ায় পূজারীরা ঐশী শক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করার আশা করতে পারত। তারা যখন টেম্পল এলাকায় প্রবেশ করত, তখন তারা আরেক মাত্রায় ঢুকে পড়ত। তারা বিশ্বাস করত, এই মাত্রাটি দুনিয়াবি জগতে ঠিক ওই সময়ে অস্তিত্বশীল এবং এখানে তা ধারণ করা হয়। মাউন্ট জায়ন আশপাশের এলাকা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে পড়ে। হিব্রু শব্দ 'পবিত্র' (হলি : কাদোশ) অর্থ হলো 'অন্য' 'স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। তিন স্তরের পবিত্রতার সর্বোচ্চ মাত্রা ফুটে ওঠত দেভিরে (দি হোলি অব হোলিসে)। এতে ঐশী সত্তার সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রতীকীভাবে একাশ পেত। পুরোহিত ছাড়া অন্য সবার জন্য দেভিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এটি নীরব, ফাঁকা ও অপ্রবেশযোগ্য হয়ে বিরাজ করতে থাকে। তবে আর্ককে সুরক্ষিত রাখায় ঐশী উপস্থিতি প্রদর্শন করার কৌশলটি প্রমাণ করত যে ঐশী সত্তা নারী ও পুরুষের দুনিয়ায় প্রবেশ করতে পারে : তাৎক্ষণিকভাবে আসন্ন ও সর্বোচ্চ অবস্থায় প্রস্তুত।

পবিত্র জায়ন পর্বতের শীর্ষে নির্মিত টেম্পলটি যিহোবার উদ্যানেরও প্রতিনিধিত্ব করত। জেনেসিসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে জে এমনই বর্ণনা দিয়েছেন। ২৭ বিশাল বিশাল মোমদানি শাখাসমৃদ্ধ বৃক্ষের পরিবেশ সৃষ্টি করত। এটি ঢাকা থাকত বাদাম ও ফুলে, দরজাগুলোতে থাকত খেজুর গাছ ও ফুল, হেখালের দেয়ালও সেই উদ্যানের কথা স্মরণ করিয়ে দিত, যেখানে সময়ের শুরুতে পাখাযুক্ত ফেরেশতা হেঁটে বেড়াত, এমনকি সেখানে সাপও ছিল। জে সম্ভবত রাজা সোলায়মানের সময়কালে লিখেছিলেন। তবে তিনি যদি পরবর্তীকালের লোকও হতেন, তবুও নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তিনি সুস্পষ্টভাবে টেম্পলের

আধ্যাত্মিকতায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। মারদোক যখন দুনিয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি তখন একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তবে জে আমাদের জানাচ্ছেন, সৃষ্টি সম্পূর্ণ করার পর তিনি একটি উদ্যানের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি সেখানে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ পরশ পেতে হাঁটতেন। এটি ইতিহাসের সূচনায় প্রথম মানুষের সাথে পরিচিত কাহিনীর বিপরীত।

ইডেনে কাহিনীতে আমরা সোলায়মানের মন্দিরে উপাসকেরা ঐশী সত্তা বলতে কী বুঝত, তা উপলব্ধি করতে পারি। হারানো স্বর্গবিষয়ক সব মিথের মধ্যেই ইডেনকে এমন এক স্থান হিসেবে দেখা যায় যেখান থেকে সহজেই স্বর্গীয় দুনিয়ায় প্রবেশ করা সম্ভব। বস্তুত, ইডেন নিজেই ঐশী সত্তার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। জে বলছেন, এটি ছিল বিশ্বের উর্বরতার উৎস। এর মধ্যে থাকা একটি নদী চারটি ধারায় বিভক্তি হয়ে উদ্যান ত্যাগ করা মাত্র এটি বাকি দুনিয়াকে উর্বর করেছিল। এসব ধারার একটিকে বলা হতো গিহন। টেম্পলে দুটি বিশাল মোমদানি ছিল। আর ইডেনে ছিল দুটি বৃক্ষ। এ দুটি প্রতি বছর নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করত, এগুলো ছিল ঐশী সত্তার অভিন্ন প্রতীক। ইডেন ছিল আদি সামগ্রিকতার সংস্পর্শ লাভ করার প্রতীক। এই সামগ্রিকতাই দুনিয়ার মানুষ তাদের পবিত্র স্থানগুলোর মধ্যে কামনা করত। ঈশ্বর ও মানুষ বিভক্ত ছিল না, তারা বরং একই স্থানে বসবাস করতে পারত। নারী ও পুরুষ জানত না যে তারা একে অন্যের চেয়ে ভিন্ন, ভালো ও মন্দের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। ফলে আদম ও হাওয়া এমন এক স্থানে থাকতেন, যা সব বিপরীত ও সর্ব বিভক্তিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এটি ছিল আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে থাকা একটি ঐক্য, পরমানন্দ বা অন্তর্দৃষ্টির বিরল মুহূর্তগুলো ছাড়া আমরা একে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি ছিল এমন এক সম্প্রীতির মরমি ভাষ্য যা সব সংস্কৃতিতে মানবতার বিষয়টি বোঝে। 'পতন' ঘটলে আদম ও হাওয়া এটি হারিয়ে ফেললে ও ঐশী উপস্থিতি থেকে প্রত্যাখ্যাত হলে ইডেন থেকে বহিষ্কৃত হন। কিন্তু তারপরও উপাসনাকারীরা যখন সোলায়মানের টেম্পলে প্রবেশ করেন, তখন এর কল্পনাপ্রবণতা ও আসবাবপত্রগুলো তাদেরকে যিহোবার উদ্যানে ফিরে যাওয়া অনুভব করে, ক্ষণিকের জন্য হলেও হারিয়ে যাওয়া স্বর্গের ওই সময়ে ফিরে যায়। এটি তাদেরকে বিচ্ছেদের অনুভূতিতে প্রলেপ দেয়। ধর্মীয় অনুসন্ধানের শিকড় এখানেই নিহিত রয়েছে।

প্রার্থনাবিধি ও স্থাপত্য সবই ওই ঐক্যের আধ্যাত্মিক সফরে সহায়তা করে। আমাদের কথিত 'ঈশ্বর' বা 'ঐশী সত্তা'র বাস্তবতা সাথে ওই ঐক্য অবিভাজ্য।

এসব ধারণা জে'র টাওয়ার অব বাইবেলের কাহিনীতেও পরোক্ষভাবে থাকতে দেখা যায়। এই কাহিনীতে বিকৃতভাবে পবিত্র স্থান সৃষ্টির বর্ণনা রয়েছে। ঐশী স্থানটি তাদের কাছে আত্মপ্রকাশের জন্য অপেক্ষা করার বদলে মানুষ নিজেরাই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 'এসো... আমরা নিজেরাই স্বর্গে পৌঁছার একটি শহর ও টাওয়ার বানিয়ে ফেলি।' স্বর্গকে পরিমাপ করার এই চেষ্টা গর্ব ও আত্ম-গরিমামূলক কাজ : মানুষ উৎসাহভরে নিজেই সুনাম অর্জন করতে চায়। এর ফলে যা হয়েছে তা ঐক্যে নয়, বরং অনৈক্য, বিভক্তি। এসব লোককে তাদের অনুমানের জন্য শাস্তি দিতে ঈশ্বর 'তাদেরকে পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিলেন' এবং তাদের ভাষাকে এত এলোমেলো করে দিলেন যে তারা আর একে অন্যকে চিনতে পারল না। এরপর থেকে স্থানটিকে বাবেল বলার কারণ হলো, 'ঈশ্বর (সব) ভাষাকে সেখানে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন।২৮ জে'র কাহিনী বেবিলন ও সেখানকার বিস্ময়কর উপাসনালয় সম্পর্কে প্রবল বৈরিতা প্রকাশ করে। এটি 'ঈশ্বরদের প্রবেশদ্বার (বাব-ইলামি) হওয়ার বদলে বিচ্ছিন্নতার, অনৈক্যের ও বিভেদের উৎসে পরিণত হয়েছিল, যা সবচেয়ে জঘন্যভাবে নশ্বর অস্তিত্বকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছিল। শান্তি (সালম) ও পুনঃএকত্রীকরণের নগরী জায়নের উপাসনাকারীদের অভিজ্ঞতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে ঈশ্বর তার উত্তরাধিকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এমন এক পবিত্র পর্বতে ইসরাইল জাতি সমবেত হতে পারত। এটি মানবীয় উচ্চাভিলাষ ও ক্ষমতার লোলুপতার শিকড় গেঁড়ে থাকা কৃত্রিমভাবে তৈরি পবিত্র কোনা স্থান ছিল না।

মাউন্ট জায়নের উপর সোলায়মানের নির্মিত টেম্পলটি তীর্থযাত্রী ও উপাসনাকারীদেরকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করার সুযোগ দিত। পরের অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাবো, অনেকেই সেখানে যিহোবার প্রত্যাদেশ লাভ করার আশা করত। বাবেলের নির্মাতাদের মতো দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়ার বদলে তাদের অনেকে যিহোবার টেম্পলে প্রবেশের সময় বাড়িতে ফিরে এসেছে বলে অনুভব করত। ঐশী প্রতীক হিসেবে টেম্পলটি ছিল বিশ্বের উর্বরতা ও শৃঙ্খলার প্রতীকও।২৯ তবে, নিকট প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মতো, এর

মহাপবিত্রতা বর্তমানে আমরা যাকে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' বলি, তার সাথে অবিচ্ছেদ্য ছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন নিজেদের রাজ্য থাকায় ইসরাইল ও জুদার লোকজন স্বাভাবিকভাবেই ঐশী রাজ্যের স্থানীয় আদর্শ গ্রহণ করেছিল। রাজা ছিলেন যিহোবার ম্যাসিয়াক তথা তার 'তৈল সিক্ত ব্যক্তি।' ঈশ্বরের 'পবিত্র পর্বত, জায়নে নিজের অভিষেকের দিনে ঈশ্বর তাকে তার নিজের ছেলে হিসেবে গ্রহণ করতেন। তার স্থান ছিল টেম্পলের কাছেই এবং তার বিচার করার সিংহাসনটি ছিল দেভিরে যিহোবার সিংহাসনের পাশে। তার দায়িত্ব ছিল ঈশ্বরের শাসন জারি করা, এই ভূমিতে ঈশ্বরের নিজের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। সালম আমাদেরকে বলে, রাজাকে 'গরিবদের রক্ষা করতে হবে, অভাবগ্রস্ত শিশুদের সহায়তা করতে হবে, এবং তাদের ওপর নির্যাতনকারীদের ধ্বংস' করতে হবে।১ এই ন্যায়বিচার বিরাজ করলে রাজ্যে শান্তি, সম্প্রীতি ও উর্বরতা থাকবে। ২ প্রাচীন দুনিয়ায় আকূল ও অব্যাহতভাবে যে বস্তুটি কামনা করা হতো যিহোবা তা নিশ্চয়তাসহকারে প্রদান করবেন। কারণ জায়ন এখন যিহোবাই উত্তরাধিকার। ফলে এটি 'সবসময়ের জন্য ঈশ্বরের সংরক্ষিত। ৩৩ কিন্তু জায়নে যদি ন্যায়বিচার না থাকে তবে নিরাপত্তা ও শান্তি বিরাজ করার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আদর্শটি তিনটি শব্দে প্রকাশ করা যায়। এই শব্দগুলো জেরুসালেম সামে বারবার দেখা যায় : মিসপাত (ন্যায়বিচার), জেদেক (সত্যনিষ্ঠতা) ও শ্যালম (শান্তি)। ৩৪ মিসপাত শব্দটির আসলে আইনগত পরিভাষা। এর অর্থ 'বিচার' বা 'রায়'। তবে এ দিয়ে মাউন্ট জায়নের ওপর যিহোবার সম্প্রীতিপূর্ণ শাসনও প্রকাশ করে। আর্ক অব দি কভেন্যান্টটি দেভিরে নিয়ে আসার সময় যিহোবা তার পবিত্র পর্বতের উপর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি জেরুসালেমের সত্যিকারের রাজায় পরিণত হন। আর নশ্বর রাজা ছিলেন স্রেফ তার মানবীয় প্রতিনিধি। মানব রাজার দায়িত্ব হলো জেদেক প্রতিষ্ঠা করা। কেনানে জেদেক (ন্যায়বিচার ও সত্যনিষ্ঠতা) ছিল সূর্য ঈশ্বরের গুণ। তিনি গোপন অপরাধগুলো সামনে নিয়ে আসতেন, নির্দোষ লোকদের ওপর করা অন্যায় শুধরে দিতেন, বিচারক হিসেবে পুরো দুনিয়ার ওপর নজর রাখতেন। জায়নে যিহোবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে জাদেক তারও গুণে পরিণত হলো। তার রাজ্যে ন্যায়বিচার বিরাজ করছে কিনা, অরক্ষিতরা সুরক্ষা পাচ্ছে কিনা, দুর্বলদের শক্তিশালীরা নির্যাতন করছে কিনা তা

নজর রাখতেন। কেবলমাত্র তখনই জায়ন পরিণত হতো শান্তির নগরীতে। সালম শব্দটি 'শান্তি' হিসেবে অনূদিত হলেও এটির মূল অর্থ ছিল 'পূর্ণাঙ্গতা,' 'সামগ্রিকতা' অর্থাৎ লোকজন তাদের ঐশী স্থানগুলোতে সামগ্রিকতা ও পূর্ণাঙ্গতার অনুভূতি কামনা করত। অর্থাৎ, সালমের মধ্যে কল্যাণের সামগ্রিক ধারণা তথা উর্বরতা, সম্প্রীতি, যুদ্ধে সফলতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। সালমের অভিজ্ঞতা দুনিয়ার বুকে মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী অনৈতিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ বাতিল করে দেয়। আমরা দেখেছি, এটি ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত শান্তির অনুভূতিও। তবে জাদেক বা 'সত্যনিষ্ঠতা' যদি না থাকে তবে পবিত্র নগরীটি শান্তির হতে পারে না। ইসরাইলের লোকজন বারবার এটি ভুলে গিয়েছিল। তারা পরে জেরুসালেমের পবিত্রতা ও অখণ্ডতার ওপর মনোনিবেশন করেছিল, এর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য লড়াই করেছিল। তবে নবীরা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তারা যদি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস না চালায়, তবে তারা অনিবার্যভাবেই সালম হারানো তাদের ললাট-লিখন হবে।

জায়নের ওপর যিহোবার টেম্পল নির্মাণ করে তাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে সোলায়মান কেনানিদের ধারা অনুযায়ী দাউদীয় রাজবংশের নামে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিটির গ্রহণ করলেন। যিহোবা এখন জেরুসালেমের শাসক। আর ইসরাইল তার লোকজন হওয়ায় ভূমিটি তাদের হয়ে গেল। মাউন্ট জাফোনে বালের প্রাসাদটি আশপাশের এলাকাটিকে তার হস্তান্তর অযোগ্য উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছিল। এখন শ্বাশত উত্তরাধিকার হিসেবে জায়ন হলো যিহোবার। টেম্পল ও যিহোবার সিংহাসন ছিল দাউদ পরিবারের শ্বাশত উত্তরসূরি হিসেবে জেরুসালেমে সোলায়মানের দাবির ভিত্তি। টেম্পল নির্মাণ ছিল বিজয়মূলক কাজ। এর অর্থ হলো ঐশী সহায়তায় প্রতিশ্রুত ভূমিটি দখল করা। অট্টালিকাটি ঘোষণা করছিল, ইসরাইলের যাযাবর দিনের অবসান ঘটছে, ঐক্যবদ্ধ রাজ্যের জনগণ অবশেষে বাড়ি ফিরেছে, নিজেদেরকে এমন এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে যেখানে তারা ঐশীর ঘনিষ্ঠতায় বসবাস করতে পারবে।

অবশ্য চূড়ান্তভাবে সোলায়মান ছিলেন একটি হতাশা। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ট শতকে ডিউটারোনোমিস্ট ইতিহাসবিদ তাকে মূর্তিপূজক বিবেচনা করেছেন। সোলায়মান তার

বিদেশী সব স্ত্রীর জন্য জেরুসালেমে আলাদা আলাদা মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিনি আশপাশের সব দেবতা- সিডনের দেবী আস্তারতে, আম্মনের দেবতা মিলকম, মোয়াবের দেবতা চেমোশের পূজাও করতেন। জেরুসালেমের পূর্ব দিকের পাহাড়গুলোতে মিলকম ও চেমোশের বেদীও ছিল।৩৫ ডি বিশ্বাস করতেন যে এই অবিশ্বস্ততার কারণেই সোলায়মানের মৃত্যুর পর তার ইসরাইল ও জুদার ঐক্যবদ্ধ রাজ্যটি ভেঙে গিয়েছিল। তবে ডি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখেছেন। ষষ্ঠ শতক নাগাদ ইসরাইলিরা পুরোপুরি একেশ্বরবাদী হয়ে পড়েছিল। তারা তখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, যিহোবাই একমাত্র ঈশ্বর, অন্য সব দেবতা মিথ্যা। তবে সোলায়মান ও তার প্রজারা তখনো ওই বিশ্বাসের সাথে একমতে ছিলেন না। সোলায়মানের নির্মিত টেম্পলটিতে পৌত্তলিক মূর্তি যেমন কারো কাছেই অদ্ভূত ঠেকেনি, একইভাবে জেরুসালেমে সোলায়মানের নির্মিত অন্যান্য মন্দিরও সম্ভবত তার স্ত্রীদের প্রতি সৌজন্যতা প্রদর্শনমূলক কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। এগুলোতে যিহোবার মর্যাদা প্রভাবিত হয়নি। তিনি তখনো ছিলেন জায়নের রাজা, ছোট ছোট এস্টাবলিশমেন্টে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঈশ্বরদের ওপর প্রভূত্ব করতেন। অবশ্য সামবাদীদের চিত্রে ঐশী সভায় অন্যান্য ঈশ্বরের ওপর তাকে প্রভুত্ব করতে দেখা যায়।

তবে সোলায়মান যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন, তবে তার কারণ তিনি জাদেক অনুসরণ করেননি। তার রাজ্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি ছিল দুর্বল। সম্পদ ফুরিয়ে যাওয়ায় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। আর সোলায়মানের কথিত বিপুল সম্পদ সত্ত্বেও জাতিটি তার সীমার বাইরে সম্প্রসারিত হয়েছিল। সোলায়মান টায়ারের রাজা হিরামের কাছ থেকে মূল্যবান সামগ্রী কিনেছিলেন, কিন্তু ঋণ শোধ করতে পারেননি। এ কারণে তিনি টায়ারকে সম্ভবত পশ্চিম গ্যালিলিতে ২০টি শহর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার শক্তিশালী সেনাবাহিনী সত্ত্বেও সোলায়মান কিন্তু দাউদের কাছ থেকে উত্তরসূরি হিসেবে পাওয়া ভূখণ্ড ধরে রাখতে পারেননি। প্রথমে ইদোম ও পরে দামাস্কাসের পতন ঘটে, তারা স্বাধীনতা লাভ করে। তবে আরো মারাত্মক ব্যাপার ছিল তার নিজের রাজ্যেই অসন্তুষ্টি ও অস্থিরতা। দাউদ তার নিজ রাজ্য জুদাকে আনুকূল্য প্রদান করায় তিনি এর পরিণামে ইসরাইল রাজ্যের আনুগত্য প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন। সোলায়মান এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি।

মনে হচ্ছে, তিনি ইসরাইলকে শোষণ করতেন, একে সমান অংশীদার বিবেচনা না করে একে বিজিত ভূখণ্ডের মতো দেখতেন। তিনি তার দেশের উত্তর অংশকে ১২টি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করেছিলেন। প্রতিটির এক মাস করে রাজদরবারের সবকিছু যোগান দিতে এবং বেগার খাটতে বাধ্য করতেন। দক্ষিণের জুদা রাজ্যের জন্য এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।৩৬ অধিকন্তু, লোকজন বেগার শ্রমের বিরুদ্ধে তিক্তভাবে ক্ষুব্ধ ছিল। প্রাচীন দুনিয়ায় বাধ্যতামূলক শ্রম স্বাভাবিক বিষয় ছিল। দাউদও বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে যোগদানের নীতি চালু করেছিলেন। এতে কেউ আপত্তি করেনি। অবশ্য বিশাল নির্মাণ কর্মসূচির জন্য সোলায়মানের বিপুল শ্রমশক্তির প্রয়োজন ছিল। এতে অর্থনীতির ক্ষতি হয়েছিল। কারণ ভবন নির্মাণকাজ উৎপাদনশীল নয়, আবার বেগার শ্রমের ফলে পুরুষদেরকে সম্পদ উৎপাদনের উৎস ভূমি ও নগরী থেকে সরিয়ে নেয়। আরো খারাপ বিষয় হলো, বাধ্যতামূলক শ্রম ছিল সুস্পষ্ট অবিচার। আমাদেরকে বলা হয়েছে, ইসরাইলের ৩০ হাজার লোককে বাধ্যতামূলক শ্রমিক হিসেবে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু জুদা থেকে এ ধরনের ভর্তি করার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।৩৭ ইসরাইলের লোকজন ক্রুদ্ধ হয়ে জেরুসালেম থেকে বের হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। আমরা দেখেছি, প্রাচীন দুনিয়ায় ন্যায়বিচারের মতবাদ কোনো ধার্মিক স্বপ্ন নয়, বরং সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারণার মধ্যেই তা নিহিত ছিল। সামাজিক অস্থিরতার কারণে রাজ্যের পতন ঘটত। প্রজাদের ওপর বিপুল বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থার করণেই ত্রয়োদশ শতকে উগারিতের পতন ঘটেছিল। সোলায়মান তার প্রজাদের প্রতি ন্যায়বিচার না করার কারণেই তার রাজ্য ভেঙে গিয়েছিল। এটি ছিল তার উত্তরসূরিদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। নিজের রাজ্য যে বিপদে রয়েছে, তা সোলায়মান টের পেয়েছিলেন। আমরা দেখতে পাই, জীবনের শেষ বছরগুলোতে তার দাস শ্রমিকদের ইসরাইল কর্মকর্তা জেরোবোয়াম রাজার সাথে সঙ্ঘাতে জড়িয়ে পড়েছেন। আমাদেরকে বলা হচ্ছে, উত্তরাঞ্চলীয় নবীদের একজন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সোলায়মানের রাজ্য দুই টুকরা হয়ে যাবে, জেরোবোয়াম ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলের ১০টি গোত্রকে শাসন করবেন। ৩৮ এতে মনে হচ্ছে, জেরোবোয়াম বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিলেন। সোলায়মান তাকে গুপ্তভাবে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জেরোবোয়াম মিসরে পালিয়ে গিয়ে ফারাও শিশাকের রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাকে দীর্ঘ দিন নির্বাসনে থাকতে হয়নি। কিছু দিনের মধ্যেই প্রায় ৪০ বছর

শাসনকাজ পরিচালনা করে খ্রিস্টপূর্ব ৯৩০ সালের দিকে সোলায়মান পরলোকগমন করেন। তাকে ইর ডেভিডে তার পিতার পাশে সমাহিত করা হয়। তার উত্তরসূরি হন তার ছেলে রেহোবোয়াম। সোলায়মান যে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেছিলেন, তা খুবই দ্রুততার সাথে ইসরাইল ও জুদা রাজ্যের ওপর আঘাত হানে।

জুদা নগরী

রেহোবোয়াম একটি দরিদ্র ও খাপছাড়া রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। সোলায়ামানের শাসন জুদায় স্বাগত জানানো হলেও উত্তরাঞ্চলীয় ইসরাইলে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ তার উচ্চাভিলাষী নির্মাণ কর্মসূচির কারণে এখান থেকে সম্পদ নিংড়ে নিয়েছিল, অথচ এসব থেকে আয় হতো কিঞ্চিত, আবার বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদানের ফলে উৎপাদনশীল শ্রম থেকে বিশাল এলাকাকে বঞ্চিত হতে হতো। রেহোবোয়াম শেচেমে গিয়ে সেখানে তার শাসনের বৈধতার জন্য ইসরাইলের প্রবীণদের সাথে সাক্ষাত করলে তারা বলেন, তিনি যদি তাদের কর ও বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তির বিষয়টি শিখিল করেন, তবেই কেবল তারা তাকে রাজা হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন। এটি ছিল কঠিন সিদ্ধান্ত : কারণ রেহোবোয়াম যদি এই অনুরোধ মঞ্জুর করেন, তবে তাকে তার দাদার রাজকীয় স্বপ্ন পরিত্যাগ করতে হবে, তার রাজসভায় নিম্নতর মর্যাদা গ্রহণ করে নিতে হবে। খুব কম শাসকই এমনটা মেনে নিতে পারেন। ফলে প্রবীণ ও অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ সভাসদদের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করে রেহোবোয়াম তার কম অভিজ্ঞ সহকর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। এসব লোকের মনে হয়েছিল, ইসরাইল থেকে কম কর পাওয়া মানে তাদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পতন ঘটা। রেহোবোয়াম ইসরাইলের প্রবীণদের তাচ্ছিল্যকরভাবে জবাব দেন : 'আমার বাবা তোমাদের শুধু চাবকাতেন,; আমি ধারাল লোহা বসানো চাবুক দিয়ে চাবকাব।' সাথে সাথে প্রবীণেরা অখণ্ড রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে যায়, বেগার খাটা শ্রমিকদের সর্দারকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। রেহোবোয়াম দ্রুত জেরুসালেমে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

এর পর থেকে ইসরাইল ও জুদা তাদের আলাদা পথে চলতে থাকে। জেরোবোয়াম হন ইসরাইলের রাজা, রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন তিরজাকে, রাজকীয় মন্দিরে পরিণত করেন বেথেল ও ড্যানে রাজকীয় উপাসনালয়গুলোকে। ইসরাইলের পরবর্তী রাজা ওমরি (৮৮৫-৭৪) সামারিয়ায় নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এটি হয় এই অঞ্চলের সবচেয়ে আভিজাত্যপূর্ণ ও বিলাসবহুল নগরী। জুদার চেয়ে অনেক বড় ও সম্পদশালী হয় ইসরাইল। এটি ছিল প্রধান প্রধান রাস্তার কাছে, এতে পুরনো নগর-রাষ্ট্রগুলোর বেশির

ভাগ এলাকা সামিল ছিল। বিপরীতে, জুদা রাজ্য ছিল বিচ্ছিন্ন, এখানে সম্পদও ছিল না। এখানে থাকা তৃণভূমি ও পার্বত্য এলাকায় চাষাবাদ করা ছিল কঠিন। স্বাভাবিকভাবেই জুদার রাজা ইসরাইল হারানোর জন্য দুঃখিত ছিলেন, তিনি উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করেন। যদিও বাস্তবে দাউদের অধীনে একীভূত হওয়ার আগের অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল দেশটি। অখণ্ড রাজ্য ভেঙে পড়ার প্রায় ৫০ বছর ধরে ইসরাইল ও জুদা যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও বিশেষভাবে অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল জুদা। কেনানে উপস্থিত নিশ্চিত করার জন্য ফারাও শিশাকের আক্রমণ থেকে রেহোবোয়াম জেরুসালেম রক্ষা করেছিলেন টেম্পলের সম্পদ থেকে বিরাট অংশ দিয়ে। জুদার রাজা আসার (৯১১-৮৭০) সময় ইসরাইলি সেনাবাহিনী জেরুসালেমের পাঁচ মাইল দূরের রামাহয় পৌঁছে গিয়েছিল। এবার রাজা নগরী রক্ষা করেছিলেন দামাস্কাসের আরামাইন রাজ্যের কাছে আবেদন জানিয়ে। আরামাইন রাজ্য তখন পেছনের দিক থেকে ইসরাইল আক্রমণ করেন। এরপর থেকে ইসরাইল দামাস্কাসের সাথে কয়েক দফার রক্তাক্ত ভূখণ্ডগত আক্রমণের মুখে পড়ে, জুদা একাকী পড়ে থাকে।

জুদার লোকজন তখন চার দিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সবাই এ রাজ্যটি উৎখাত করতে সচেষ্ট ছিল। এমন অবস্থায় জুদার লোকজন জায়নের যিহোবার দিকে আরো বেশি করে মুখ ফেরায়। আমরা জানি যে প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের অন্যান্য লোকজনের মতো তারাও তাদের ইসরাইল, মিসর বা পরে দামাস্কাসের শত্রুদের আদি বিশৃঙ্খল শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। সাগর বা মরুভূমির মতো এসব দুনিয়াবি শত্রুও খুব সহজে তাদের রাষ্ট্রের ভঙ্গুর নিরাপত্তা ধ্বংস করে জুদা নামে সৃষ্ট রাষ্ট্রটিকে এমন এক ছোট্ট দুনিয়ায় পরিণত করতে পারত যা ঈশ্বরদের বাসযোগ্য বিশ্ব সৃষ্টির আগে নিষ্ফলা ছিল বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। এটি অলীক কল্পনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা এখনো ওই একই পরিভাষায় কথা বলে থাকি যখন আমরা 'আমাদের দুনিয়াকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শত্রু দখলদারদের 'দুর্বৃত্ত সাম্রাজ্য' হিসেবে অভিহিত করি। আমরা এখনো জীবনকে আলো ও অন্ধকারের শক্তির মধ্যকার সংগ্রাম হিসেবে বিবেচনা করি, 'আমাদের সৃষ্ট সবকিছু শেষ করতে 'বর্বরতা' ফিরে আসতে পারে বলে শঙ্কিত হই। আমাদের নিজস্ব শাস্ত্রাচার রয়েছে- স্মারক অনুষ্ঠান, অর্ঘ নিবেদন, মিছিল-সমাবেশ ইত্যাদি। এগুলো

আবেগময় প্রতিক্রিয়া উস্কে দিতে প্রণীত, অতীতের যুদ্ধকে বর্তমানে এনে দেয়। আমরা প্রাণবন্তভাবে ওই সময়ের স্মরণ করি, যখন 'আমরা' দৃশত বৈরী বিশ্বের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়িয়েছিলাম। আমরা সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আশা, গর্ব, ও নতুন করে প্রত্যয়ে সংকল্পবদ্ধ হই। প্রাচীন জেরুসালেমের লোকজনও একই ধরনের কৌশল গ্রহণ করেছিল। তারা করেছিল কেনানি পৌরাণিক কাহিনীকে নিজেদের করে নিয়ে। তাদের নিজেদের যুদ্ধের দিকে ফিরে না তাকিয়ে সময়ের সূচনায় বিশৃঙ্খলার শক্তির বিরুদ্ধে যিহোবার সংগ্রামকে স্মরণ করতে থাকে তারা। নিকট প্রাচ্যজুড়ে তাদের মন্দিরগুলোতে মারদোক ও বালের মতো যুদ্ধগুলো প্রতি বছর বিপুল অনুষ্ঠানিকতায় উদযাপিত হতো। এগুলো ঐক্য ও অনেক সময় ঐশী জয়ের চমকপ্রদ উল্লাস এবং এই শক্তিকে বর্তমানে সহজলভ্য করার প্রয়াস ছিল এতে। কারণ, ধারণা করা হতো যে কেবল কোনো ঐশী যোদ্ধাই তাদের ওপর নির্ভরশীল নগরীর শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করতে পারেন। প্রাচীন বিশ্বের শাস্ত্রাচারগুলো কেবল স্মরণ অনুষ্ঠানই ছিল না : তারা পৌরাণিক কাহিনীগুলো এমনভাবে তুলে ধরত যে মনে হতো, এগুলো বারবার ঘটতে পারে। এতে করে লোকজন অস্তিত্বের মর্মমূলে শ্বাশত, অদেখা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা পেত, বিশৃঙ্খলার দানবগুলোর বিরুদ্ধে তারা আদি ঐশী বিজয়ে অংশগ্রহণ করত। অন্যভাবে বলা যায়, মন্দির নির্মাণের সময় পছন্দ করার বিষয়টি পরিচিতি হিসেবে বিবেচিত হতো। প্রতীকী নাটকের মাধ্যমে এসব ঐশী যুদ্ধ অনুকরণ করে এই কাজকে বর্তমানে কিংবা আরো যথাযথভাবে বলা যায়, উপাসনাকারীদেরকে মিথের সময়োত্তীর্ণ বিশ্বে নিয়ে আসা হতো। শাস্ত্রাচারগুলো অস্তিত্বের কঠোর বাস্তবতা প্রকাশ করত। এই অস্তিত্ব দৃশ্যত সবসময়ই যন্ত্রণা ও মৃত্যুর ওপর নির্ভর করত, তবে তা এটিও পরিষ্কার করত যে এই সংগ্রাম সবসময়ই সৃষ্টিশীল ফলাফল তৈরি করে। যম ও মোতের সাথে তার নৈতিক যুদ্ধে জয়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর মাউন্ট জফোনে সিংহাসনে বসেছিলেন বাল। ফলে মাউন্ট জফোন চিরদিনের জন্য তার আবাসে পরিণত হয়েছিল। জাফোন থেকে বাল শান্তি, উর্বরতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তার শত্রুরা এগুলো ধ্বংস করতে চেয়েছিল। এই জয় যখন উগারিতে উদযাপিত হতো, রাজা তখন বালের স্থান গ্রহণ করে তার এলাকায় শান্তি, ফলপ্রসূতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের জন্য ঐশী প্রতিচ্ছবির মতো অভিষেক গ্রহণ করতেন। প্রতিটি শরতে বালের

সিংহাসনে আরোহণ ছিল ইথানিনম মাসের উৎসব। এই উৎসব ঐশী শক্তি সৃষ্টি করত, যা আরেক বছরের জন্য উগারিতে সময়ের শুরুর ওই আদি সংগ্রামের সূচনা করত।

আমরা যতটুকু জানি, জেরুসালেমে মন্দির নির্মাণের আগে সৃষ্টা-ঈশ্বর হিসেবে যিহোবাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে সোলায়মানের বলতে গেলে কোনোই আগ্রহই ছিল না। এক্সোডাসের পৌরাণিক কাহিনীতে যিহোবাকে মহাবিশ্ব নয়, জাতি সৃষ্টি করতে দেখানো হয়েছে। কিন্তু মাউন্ট জায়নের ওপর দেবিরে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি সিংহাসনে বসার পর তার মতবাদ তার আগে বাল আল ইলিয়নের উপাসনের অনেক বিষয় গ্রহণ করা হয়। সম্ভবত জাদোকের প্রভাবে জেবুসিত ধারণাগুলো প্রাচীন ইসরাইলি পুরাণে মিশে গিয়েছিল। বালের মতো এখন বলা হতে লাগল, যিহোবাও সমুদ্র দানব লোতানের (তিনি হিব্রুতে হয়ে গিয়েছিলেন 'লেভিয়াথান') বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি বিশৃঙ্খলার আদি পানিকে বশ মানিয়েছিলেন। এ কাজটি না করা হলে পুরো পৃথিবী ভেসে যেত এবং তিনি 'সমুদ্রের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, বাঁধের অন্য দিকে রেখেছিলেন।' মারদোকের মতো তিনিও আরেকটি সাগর দানবকে (নাম ছিল র‍্যাহাব) টুকরা করেন। তিনি এটিকে দুই টুকরা করেছিলেন দুনিয়ার ভিত্তি সৃষ্টির সময়। পরে সহিংস সৃষ্টির এসব পুরাণকাহিনীর স্থলাভিষিক্ত হয় পি'র জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ে আদিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শান্ত ও শান্তিপূর্ণ বর্ণনায়। তবে বাইবেল দেখাচ্ছে, জুদার লোকজনের কাছে এমন কাহিনী যা ছিল তাদের প্রতিবেশীদের আধ্যাত্মিকতার সাথে অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং সঙ্কটের সময় তারা সাথে সাথে 'পৌত্তলিক' পুরাণতত্ত্বে ফিরে যেতে পারত। যুদ্ধ মিথ ছিল ওই পরিস্থিতিতে স্বস্তিদায়ক। কারণ, এতে বলা হচ্ছিল, ধ্বংসের শক্তি প্রবল হলেও শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খলাই জয়লাভ করে। তবে তা সবসময় এমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয় না। ঐশী শক্তিকে যুদ্ধবিক্ষত নগরী জেরুসালেমে আনতে হলে পুরোহিত ও রাজাদের তাদের টেম্পলে বার্ষিক আদি বিজয়কে নিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করতে হতো। তাদের দায়িত্ব হলো বিশ্বকে লালনকারী মহা রহস্যের স্পর্শে জনগণকে রাখা, অস্তিত্বের এড়ানো অযোগ্য সন্ত্রাসকে মোকাবিলা করা এবং ভীতি ও ভয়াবহ মনে হওয়া বিষয়ে যে ইতিবাচক ব্যাপার আছে তা শেখানো। সহিংসতা ও মৃত্যুর ওপর জীবন ও শৃঙ্খলা বিজয় লাভ করবে, খরা আর

নিস্ফলতার পর আসবে উর্বরতা, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার হুমকি ভণ্ডুল হয়ে যাবে, কারণ তাদের মধ্যে আছে ঐশী শক্তি।

জুহার লোকজন কিভাবে পুরোপুরি এই আধ্যাত্মিকতা গ্রহণ করে নিয়েছিল তা দেখা যায় প্রথম দিকের সামে। অনেক সময় তারা উগারিতের পুরনো মিথগুলো বারবার বলত :

যিহোবা মহান, সর্বোচ্চভাবে তার প্রশংসা করা প্রয়োজন :

প্রভু মহান! আমাদের ঈশ্বরের শহরে, তার পবিত্র পর্বতে

লোকেরা নিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রশংসা করে।

ঈশ্বরের পবিত্র শহর একটি মনোরম উচ্চতায় অবস্থিত,

তা সারা পৃথিবীর লোকদের সুখী করে। জায়ন পর্বতই

ঈশ্বরের প্রকৃত পর্বত। এটিই মহান রাজার নগরী।

শহরের রাজপ্রাসাদগুলোর মধ্যে

ঈশ্বর নগরী দুর্গ হিসেবে খ্যাত।

যিহোবা জেরুসালেমের জন্য যুদ্ধ করো, ঠিক যেভাবে বাল উগারিতে তার ঐহিত্যের জন্য লড়াই করেছিলেন। তার উপস্থিতি নগরীকে শত্রুদের বিরুদ্ধে অলঙ্ঘনীয় নিরাপত্তা-সংবলিত এলাকায় পরিণত করেছিল। জেরুসালেমবাসীকে জায়নের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার প্রশংসা করতে বলা হয়েছিল (তার মিনারগুলো গণনা, প্রাচীরগুলোর প্রশংসা করো, প্রাসাদগুলো দেখো।'), ঠিক যেমন উরুকের লোকজনকে গিলগামেশের দুর্গগুলোর প্রশংসা করতে বলা হয়েছিল। পরিদর্শন সফরের পর তারা এই বলে শেষ করত, 'ঈশ্বর এখানে আছেন! সময়ের সূচনায় যিহোবা সবকিছু যথাযথ রাখার জন্য সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন। বিলুপ্তি ও বিশৃঙ্খলার হুমকিকে দূরে রাখার জন্য প্রাচীর আর

নিরাপত্তাব্যবস্থারও একই ধরনের ধর্মীয় মূল্য ছিল। নগরীর পতন কখনোই হবে না : যিহোবা হলেন তার জনগণের দুর্গ, তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে ধনুক হাতে নেবেন, বর্শা নিক্ষেপ করবেন। তাদের আশপাশে যদি পুরো মহাবিশ্ব ভেঙ্গে পড়ে, তবুও তাদের ভয় পাওয়া ঠিক হবে না। কারণ, ঈশ্বরই তাদের আশ্রয়, তাদের শক্তি। যদি সাগরে পর্বতগুলো প্রকম্পিত হয়, পানি যদি ফুঁসে ওঠে, তবুও জুদার লোকজনের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। প্রাচীরের মধ্যে যিহোবা শান্তির তথা সামগ্রিকতা, সম্প্রীতি ও নিরাপত্তার স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করেছেন। জেরুসালেমের প্রার্থনাবিধি লোকজন যিহোবার দুনিয়া সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে প্রাচীন এক্সোডাসের পুরাণকাহিনী দেখতে পেত। তিনি যখন লেভিয়াথান ও রাহাবকে পরাজিত করেন, তখনই পুরো দুনিয়ার রাজা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সত্তায় টিকে ছিলেন। মিসর থেকে লোকজনকে মুক্ত করে সমগ্র মানবজাতির জন্য তিনি তার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন।

সমালোচকেরা সাম থেকে প্রার্থনাবিধি পুনঃগঠনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তবে তাদের আরো বিস্তারিত দাবি সম্ভবত অতিরঞ্জিত। আমরা এই প্রাথমিক সময়ে জেরুসালেম মতাদর্শ সম্পর্কে খুবই সামান্য জানি। কিন্তু তাতেও মনে হচ্ছে, তখন মাউন্ট জায়নে যিহোবার রাজত্বের ওপরই জোর দেওয়া হতো। সম্ভবত সুকোথ ভোজ ছিল রাজা সোলায়মানের টেম্পল উৎসর্গ করার সময় পবিত্র পর্বতে তার সিংহাসন আরোহণ উদযাপন। মোতকে হারানোর পর মাউন্ট জাফোনের ওপর অবস্থিত নিজের প্রাসাদে বালের প্রত্যাবর্তন যেমন ভূমির উর্বরতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল, জায়নে যিহোবাও আশপাশের এলাকার উর্বরতা নিশ্চিত করেছিলেন। আর এটিও এই প্রাচীন কৃষি উৎসবে উদযাপিত হতো। সঙ্গীত, প্রশংসা ও জয়ধ্বনি ও জয়ডঙ্কার মধ্যে অনুভব করা হতো যে যিহোবা দেভিরে তার সিংহাসনে ওঠেছেন।১০ সম্ভবত প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে যিহোবা যখন তার জনগণের মধ্যে আবির্ভূত হতেন, তখন টেম্পলকে পরিপূর্ণ করে থাকা উচ্চশব্দের সরঞ্জাম, কান্টিক চিৎকার ও ধূপের ধোঁয়া মাউন্ট সিনাইয়ের উপরের মানবীয় রূপে আবির্ভাব ঘটনার পুনরাবৃত্তি করত। সম্ভবত গিহন থেকে টেম্পল পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রা হতো। এটি মাউন্ট জায়নে যিহোবার প্রথম সফরের স্মৃতি জাগিয়ে তুলত। এই প্রার্থনাবিধি তার পরিচয় পাওয়া যায়। এতে বলা হয়ে থাকে, তার এত বিপুল শক্তি ছিলেন যে তিনি কেবল

জায়নের রাজাই ছিলেন না, বরং 'পুরো বিশ্বের রাজাধিরাজ ছিলেন। ১২ অন্যান্য দেব-দেবীর ওপর তিনি প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন :

হে পরপর প্রভু, সত্যিই আপনি

পৃথিবীর শাসনকর্তা। দেবতাদের

চেয়ে আপনি অনেক মহৎ।

ইহুদিরা বর্তমান জেরুসালেমে সুকোথ অনুষ্ঠানের জন্য খেজুর শাখা নির্বাচন করে। এটি যদিও এখন মরুভূমিতে ইসরাইলিদের ৪০ বছর নির্বাসিত জীবনযাপন স্মরণে পালিত হলেও অনুষ্ঠানটি এখনো মূল ফসল তোলার উৎসবের সাথে সম্পর্কিত।

ইসরাইলিরা একেশ্বরবাদী ধর্মমত আনুষ্ঠানিকভাবে বিকাশ করার অনেক আগে মাউন্ট জায়নের শাস্ত্রাচার ও আনুষ্ঠানিকতা জুদার লোকজনকে ধারণাগত পর্যায়ে না হলেও আবেগময়ভাবে শেখানো হয়েছিল যে উপাসনা করার জন্য একমাত্র ঈশ্বর হচ্ছেন যিহোবা।

তবে জায়ন মতবাদ কেবল চিৎকার চেঁচামেমিময় উদযাপনই ছিল না। প্রথম দিককার তীর্থযাত্রার সামগুলোতে দেখা যায়, এটি তীব্রভাবে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিল। টেম্পল পরিদর্শন ছিল ঊর্ধ্বে (আলিয়া) গমনের অভিজ্ঞা। তারা যখন হিন্নম উপত্যকায় উঠে সেখান থেকে জেরুসালেমের ঢালু পাহাড়গুলো দিয়ে জায়নের চূড়ার দিকে যেতে থাকত, তখন তারা যিহোবার দর্শন লাভের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে নিত। ১৪ এটি স্রেফ কোনো দৈহিক ঊর্ধ্বে আরোহণ ছিল না, বরং এমন এক স্থানের দিকে 'অন্তর্মুখী গমন' ছিল, যা ভেতরের দুনিয়া মিশে যেত বাইরের দুনিয়ার সাথে। এটি বাড়ি ফেরার অনুভূতি সৃষ্টি করত :

পাখিরা পর্যন্ত আপনার মন্দিরে তাদের

আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। আপনার বেদীর

কাছেই ওরা বাসা বেঁধেছে এবং

ওদের শাবকও আছে।

দাউদের জেরুসালেমে যিহোবার জন্য বাড়ি তৈরির ধারণা প্রথম প্রকাশ করার পর থেকেই টেম্পল-সম্পর্কিত ধারণাটি বিশ্রাম ও স্থায়ী আবাস প্রতিষ্ঠার কল্পনায় উপস্থিত ছিল।১৬ টেম্পল মতাদর্শটি জুদার লোকজনকে বিশ্বের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করেছিল। সৃষ্টি পুরাণতত্ত্বে জোর দিয়ে বলা হচ্ছিল, প্রতিটি জিনিসেরই মহাবিশ্বে তার নির্ধারিত স্থান আছে। সাগরকে শুষ্ক ভূমিকে প্লাবিত করা ঠেকাতে যিহোবা তাকে বেঁধে দিয়েছেন। এখন জায়নে যিহোবার বিশেষ স্থান রয়েছে। তিনি জুদাবাসীদের আবাস নিশ্চিত করার জন্য এটি নির্মাণ করেছেন। পবিত্র জাতি হিসেবে তাদেরও বিশেষভাবে নির্ধারিত স্থান রয়েছে। নগর-প্রাচীরের বাইরে বিনাশক শত্রুরা রয়েছে, তারা অবয়বহীন বিশৃঙ্খলায় তাদের বিশ্বকে হ্রাস করে দিতে পারে। তবে এই সুরক্ষিত স্থানের মধ্যে লোকজন তাদের নিজস্ব দুনিয়া সৃষ্টি করতে পারে। জায়ন টেম্পল যে আনন্দ ও অধিকারের অনুভূতি জাগিয়ে তুলত, তা তাদের আবেগগত ও দৈহিকভাবে বেঁচে থাকাকে যথাযথভাবে তৃপ্ত করে তুলত। টেম্পলের উপস্থিতি কোনো বিষণ্ন কর্তৃব্য ছিল না। সামবাদী যিহোবার দরবারের জন্য 'আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি' করেছেন, তার পুরো গানই ছিল আনন্দের। ১৭ তীর্থযাত্রীরা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতে দেখে নিজেদের মধ্যে শক্তি লাভ করত : তারা তুলনামূলকতা ও অর্থহীনতার সীমাহীন প্রবাহ থেকে মুক্তি অনুভব করতেন। তাদের পুরাণতত্ত্ব যে প্রান্তরে জীবনের কোনো আশা মানুষ করতে পারত না, সেখানে অনেক বছর পরিভ্রমণের কথা বলত। সবকিছুর কেন্দ্রে পরিণত হওয়া টেম্পলে তীর্থযাত্রীরা সর্বোচ্চ মাত্রায় তার অস্তিত্বশীল অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করত। টেম্পলের আঙিনায় একটি দিবস, অন্যত্র হাজার দিনের চেয়ে মূল্যবান মনে হতো।১৮

এসব সত্ত্বেও এর মানে এই নয় যে জেরুসালেমে কেবল একমাত্র ঈশ্বর হিসেবে যিহোবাই উপাসনা লাভ করতেন। ডিউটারোনোমিস্ট ইতিহাসবিদ একটি একক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইসরাইল ও জুদার রাজাদের বিচার করেছেন। তা হলো ভালো রাজা তারাই যারা কেবল যিহোবার উপাসনা প্রচার করেন, প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতাদের মন্দির, উপাসনা স্থান (ব্যামথ) ও

দণ্ডায়মান পাথর (ম্যাতজেভত) গুঁড়িয়ে দেন। আর খারাপ রাজা হলেন তারা যারা ওইসব বিদেশী মতাদর্শকে উৎসাহিত করেন। এর ফলে ডি'র দীর্ঘ ভাষ্য সত্ত্বেও আমরা এই সময়কার জেরুসালেমের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে খুব কমই জানতে পারি। কারণ আমরা রাজার অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানতে পারি না। আর কেবল যিহোবার প্রতি নিষ্ঠাবান রাজাদের কথা বলার সময়ও ডি এই সত্য গোপন করতে পারেননি যে এসব শাসকের অধীনে অন্যান্য মতাদর্শ নগরীতে বিকশিত হওয়া অব্যাহত ছিল। ফলে রাজা যেহোশাফতের (৮৭০-৮৪৮) প্রশংসা করা হয় এই জন্য যে তিনি একমাত্র যিহোবার প্রতিই বিশ্বস্ত ছিলেন। তবে ডি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, অন্যান্য ঈশ্বরের ব্যামথ তখনো সক্রিয় ছিল। অধিকন্তু, জেহোশাফতকে তার ছেলে জেহোরামের সাথে বালের নিবেদিতপ্রাণ উপাসক ইসরাইলের রাজা আহব ও রানি জেজেবেলের মেয়ে প্রিন্সেস আথাইলাহর বিয়ে নিয়ে কোনো সমস্যাতেই পড়েননি। প্রিন্সেস আথাইলাহ তার ফনেশিয়া মতাদর্শ জেরুসালেমে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি নগরীতে তার জন্য একটি মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন। এটিতে দায়িত্ব পালন করতেন সিডোনের পুরোহিত মাত্তান।

জেহোরাম ও আথালিয়াহর বিয়ের ফলে সম্ভবত একটি চুক্তি হয়েছিল। এর ফলে জুদা রাজ্যটি ইসরাইলের সামন্তে পরিণত হয়েছিল। এর পর থেকে জেহোশাফাত ও জেহোরাম উভয়ে দামাস্কাসের বিরুদ্ধে অভিযানে ইসরাইলের পক্ষে থাকতেন। নবম ও অষ্টম শতকে নিকট প্রাচ্যে নতুন সমৃদ্ধি দেখা দেয়। এমনকি জুদার ভাগ্যও উন্নত হয়। কারণ জেহোশাফাত দারুণ জয় পান মোয়াব, আম্মন ও সিয়েরের বিরুদ্ধে। তবে নতুন একটি বিপদের আবির্ভাব ঘটেছিল। আসিরিয়ার (বর্তমান ইরাক) রাজারা তাদের রাজধানী নিনেভেহ থেকে নজিরবিহীন ক্ষমতা ও শক্তিসম্পন্ন একটি সাম্রাজ্য নির্মাণ শুরু করেছিলেন। তাদের প্রধান উচ্চাভিলাষ ছিল ভূমধ্য সাগরীয় উপকূলের দিকে পশ্চিম দিকে তাদের সাম্রাজ্য সম্রাজ্য করা। আসিরিয়ানদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার চেষ্টায় ইসরাইল ও দামাস্কাস একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই বন্ধ করে দিয়ে এবং আনাতোলিয়া ও স্তেপ এলাকার অন্যান্য ছোট রাজ্যকে সাথে নিয়ে জোট গঠন করে। কিন্তু এই জোট ৮৬৩ সালে রিভার ওরোনটেসের কারকার যুদ্ধে পরাজিত হয়। দামাস্কাস ও ইসরাইল উভয়ই

আসারিয়ার সামন্ত হতে বাধ্য হয়। জুদা রাজ্যটি খুব ছোট হওয়ায় এর প্রতি আসিরিয়ানদের নজর পড়েনি। ফলে এটি স্বাধীনই থেকে যায়।

কিন্তু তবুও ওই বছরগুলো জেরুসালেমের জন্য শান্তিপূর্ণ সময় হয়নি। রানি আথালিয়া ৮৪১ সালে তার ছেলের মৃত্যুর পর রাজপ্রতিভূ হওয়ার পর তিনি তার ধারণায় সিংহাসনের আইনসম্মত সব উত্তরাধিকারীকে হত্যার মাধ্যমে দাউদিয় রাজবংশকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। প্রায় ছয় বছর পর টেম্পলের পুরোহিত ও গ্রামীণ অভিজাতেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটি অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করে। তারা আথালিয়ার সদ্যজাত নাতি জেহোয়াশকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করে। এ ছেলেটি হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পেয়ে টেম্পলের মধ্যে অবস্থান করছিল। তারপর তারা আথালিয়াহকে হত্যা করে তার বালের মন্দিরটি ধ্বংস করে দেয়। নগরীটি বহিরাগত শত্রুদের হুমকির মধ্যেও পড়েছিল। দামাস্কাসের রাজা যাতে জেরুসালেম আক্রমণ না করেন, সেজন্য জেহোয়াশ টেম্পলের বিপুল পরিমাণ অর্থ তাকে দিয়েছিলেন। জুদার পরবর্তী রাজা আমাজিয়ার (৭৯৬-৮১) আমলে ইসরাইলি সেনাবাহিনী জেরুসালেমের রাজপ্রাসাদ ও টেম্পল লুণ্ঠন করে, তারা নগর প্রাচীরের কিছু অংশও গুঁড়িয়ে দিয়ে সামারিয়ায় ফিরে যায়। কিন্তু এতেও জায়নের দুর্ভেদ্যতা নিয়ে লোকজনের বিশ্বাসে চিড় ধরেনি। বস্তুত রাজা উজ্জাইহর (৭৮১-৪০) ১৯ আমলে নগরীটির শক্তি ক্রমাগত বাড়তে থাকে। তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই সাফল্য লাভ করেন। ইসরাইলি আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাচীরগুলো মেরামত করা হয়, মিলোর পুরনো দুর্গটির বদলে নগরী ও টেম্পলের মাঝামাঝি স্থানে ওফেল নামে একটি নতুন দুর্গ নির্মাণ করা হয়। জেরুসালেম পরিণত হয় শিল্পকেন্দ্রে, এর জনসংখ্যা বাড়ে। মনে করা হয়ে থাকে, নগরীটি সম্প্রসারিত হয়ে প্রাচীরের বাইরে টারোপোয়েন উপত্যকায় নেমে পড়ে, মাউন্ট জায়নের বিপরীতে ওয়েস্টার্ন হিলেও ওঠে যায়। এই পর্যায়ে আসিরিয়া সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তারা ওই অঞ্চল থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে ইসরাইল রাজ্যটিও সমৃদ্ধির যুগে প্রবেশ করে, কার্যত স্বাধীনতা লাভ করে।

তবে এই প্রবৃদ্ধিই সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। অধিকতর স্পর্শকাতর লোকজন ধনী ও গরিবদের মধ্যকার অগ্রহণযোগ্য বিপুল ব্যবধান সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন ছিলেন।

আর অবিচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরিত হতে উত্তর ও দক্ষিণের উভয় রাজ্যেই নবীদের উত্থান ঘটে। নিকট প্রাচ্যের রাজারা তাদের অভিষেক অনুষ্ঠানে গরিব ও অরক্ষিতদের রক্ষা করার শপথ গ্রহণ করতেন। কিন্তু লোকজন সম্ভবত এই আদর্শ দেখতে পাচ্ছিল না। ইব্রাহিমের মামরেতে তার ঈশ্বরকে আপ্যায়ন করার পর থেকে যিহোবাবাদ ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে পবিত্র সত্তা মানুষের অবয়বে যেমন আত্মপ্রকাশ করতে পারেন, আবার মন্দির ও পবিত্র স্থানগুলোতেও দেখা দিতে পারেন। এখন এই সময়ে (ইতিহাসবিদেরা যেটাকে এক্সিয়াল যুগ বলে থাকেন) সভ্য বিশ্বজুড়ে যেসব নতুন ধর্ম আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, সবই জোর দিয়ে বলতে থাকে, সত্যিকারের বিশ্বাস বাস্তব সমবেদনায় প্রতিফলিত হতে হবে। যিহোবার ধর্মও লোকজনের নতুন প্রয়োজন মেটানোর জন্য বদলে যেতে থাকে। হিব্রু নবীরা সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর জোর দেওয়া শুরু করে দেন। টেম্পলের জাদুকরি শক্তি অর্জনের মতো ধর্মীয় প্রতীক সহজেই এ কাজে ব্যবহৃত হতে পারত, ভ্রান্ত নিরাপত্তা ও স্বস্তির অবসান ঘটাত।

এক্সিয়াল যুগের কোনো নবীই ইসাইয়ার চেয়ে জেরুসালেম টেম্পলের প্রতি বেশি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন না। রাজা উজ্জাইয়ার মৃত্যুর বছরে তথা ৭৪০ সালে ওই ঐশী স্থানটিতে তিনি নবুয়তি ডাক পান। ইসাইয়া ছিলেন রাজপরিবারের অন্যতম সদস্য, তিনি নিশ্চিতভাবেই পুরোহিতের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। কারণ তিনি হেখালে দাঁড়িয়েছিলেন, হলরুমকে ভরে দেওয়া ধূপের ধোঁয়া দেখছিলেন, বিপুল কলেরবে থাকা কাল্টিক চিৎকার-চেঁচামেচি শুনছিলেন। ঠিক ওই সময়েই তিনি হঠাৎ করে টেম্পলের কল্পচিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে এর পেছনে থাকা ভীতিপ্রদ বাস্তবতার মুখে পড়েন। তিনি উপলব্ধি করেন, যিহোবা আর্কের মাধ্যমে প্রতীকী করা তার স্বর্গীয় সিংহাসনে বসে আছেন, তাকে ঘিরে আছে উচ্চমর্যাদার দেবদূতেরা। টেম্পলটি ছিল স্বপ্নাবিভাবের স্থান। এখন ইসাইয়া যে জ্ঞান লাভ করলেন তা অবশিষ্ট দুনিয়ার প্রতি দেভির থেকে বিচ্ছুরিত ঐশী সত্তা আগে কখনো দেখেননি। দেবদূত চিৎকার করে বললেন : ‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র হলো যিহোবার সাবাথ, তার গৌরব পুরো দুনিয়ায় পরিপূর্ণ।’২০

অর্থাৎ ইসাইয়ার স্বপ্নাবিভাবের জন্য টেম্পলটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জায়নের পবিত্র পর্বতটি ছিল পৃথিবীর কেন্দ্র। কারণ এটি এমন স্থান যেখানে নারী-পুরুষকে মুক্তি দিতে নশ্বর দুনিয়ায় ঐশী বাস্তবতার আকস্মিক আবির্ভাব ঘটেছিল। জায়ন মতবাদ যিহোবার সার্বজনীন রাজ্যের জয়গান গাইত। এখন ইসাইয়া এমন দিনের অপেক্ষায় রইলেন যখন 'সব জাতি' 'যিহোবার টেম্পল-পর্বতের দিকে ছুটে চলবে, একে অপরকে জেরুসালেমে আশ্রয় নিতে তাগিদ দিয়ে বলবে : 'এসো, এসো আমরা ইয়াকুবের ঈশ্বরের টেম্পলে যাই। এটি হবে ইডেন উদ্যোনে সার্বজনীন প্রত্যাবর্তন, যেখানে সব সৃষ্টি সম্প্রীতিতে থাকবে মেষ বাস করবে নেকড়ের সাথে, শিশুদের সাথে থাকবে প্যান্থার, বাছুর খেলবে সিংহশাবকের সাথে। ২২ জেরুসালেমের পবিত্র পর্বত নতুন বিশ্বব্যবস্থা দেখবে, মানবতার আকুলভাবে কাম্য সামগ্রিকতার পুনরুদ্ধার ঘটবে। নতুন জেরুসালেম প্রশ্নে ইসাইয়ার প্রত্যাদেশ কখনো বিস্মৃত হয়নি। ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট একজন রাজার তথা মেসাইয়ার জন্য তার আশাবাদ, এই শান্তির যুগের সূচনা হবে মেসাইনিক এই আশায় যে এটি ইব্রাহিমের তিন ধর্মের সবার মধ্যেই একেশ্বরবাদের আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছে। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমরা সবাই জেরুসালেমকে মানব ইতিহাসে চূড়ান্ত হস্তক্ষেপের স্থান হিসেবে দেখে। এখানেই হবে চূড়ান্ত ফয়সালা, সময়ের সমাপ্তিতে হবে চূড়ান্ত যুদ্ধ এবং অনুতপ্ত অবিশ্বাসীরা দলে দলে জেরুসালেমে গিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে দাখিল হবে। এসব দর্শন বর্তমান সময়েও জেরুসালেমের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে।

ইসাইয়ার মন্দিরকেন্দ্রিক ভবিষ্যদ্বাণী পুরো জায়ন মতবাদকে পরীক্ষার মুখে ফেলে দিয়েছিল বলে মনে হয়।

তোমরা কে আমার উদ্দেশে এত বলিদান

করে চলেছ? তোমাদের পাঁঠার বলিতে ও

ষাঁড়, মেঘ ও ছাগলের মেদে আমার অরুচি

ধরে গেছে। আমি সন্তুষ্ট নই। লোকেরা

তোমরা যখন আমার কাছে প্রার্থনা

করতে আসো, তখন তোমরা আমার

উপাসনালয় প্রাঙ্গনের সবকিছু

পদদলিত করো। তোমাদের

এসব করতে কে বলল?

বিশদভাবে থাকা প্রার্থনাবিধি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত হতে পারে যদি না এর সাথে এমন কোনো সহানুভূতি না থাকে যা সর্বোপরি ন্যায়বিচার কামনা করা, · নির্যাতিত, এতিম ও বিধবাদের সহায়তা না করা হয়।২৪ বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী হয়তো ইসাইয়ার রচনা না হলেও সম্পাদকদের মাধ্যমে তার ঐশীবাণীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য এই ধারণা অন্যান্য নবীর মধ্যেও ছিল। উতরের রাজ্যে নবী অ্যামোসও যুক্তি দিতেন যে টেম্পলের শাস্ত্রাচার এক্সোডাসের মূল ধর্মের কোনো অংশ ছিল না। ইসাইয়ার মতো অ্যামোসেরও বেথালের টেম্পলে যিহোবাকে নিয়ে স্বপ্নাবিভাব ছিল। তবে কোনো মতবাদ সৃষ্টির মতো সময় তার ছিল না। তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তিনি এভাবে জানতে চাইতেন : 'ঈশ্বর কি তোমাকে আমার কোরবানি এনে দিয়েছেন কিংবা ৪০ বছরের ঘোরার সময় নৈবেদ্য দিয়েছেন।' যিহোবা আর জয়ধ্বনি বা বাঁশির সুর শুনতে চাচ্ছিলেন না, তিনি অবারিত স্রোতধারার মতো ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছিলেন। ২৫ অ্যামোস জেরুসালেমে তার পবিত্র স্থান থেকে ঈশ্বর গর্জন করছেন বলে কল্পনা করেছিলেন। কারণ আশপাশের দেশগুলোতে অবিচার দেখে তার কাছে মতবাদটি বিদ্রূপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এক্সিয়াল যুগে যিহোবার ধর্ম বদলে যাওয়ায় ন্যায়বিচার ও সহানুভূতি অপরিহার্য গুণে পরিণত হয়েছিল। বলা হয়েছে, এগুলো ছাড়া পবিত্র স্থানে কোরবানির কোনোই মূল্য নেই। জেরুসালেম মতবাদ এই মূল্যবোধও উচ্চকিত করেছে এই ঘোষণা দিয়ে যে যিহোবা সবচেয়ে বেশি চিন্তিত গরিব ও অরক্ষিতদের নিয়ে। জায়ন হওয়া উচিত গরিবদের আশ্রয়কেন্দ্র। আমরা দেখেছি, জেরুসালেমের সত্যিকারের সন্তান

বিবেচনাকারী ইহুদিরা নিজেদের বলত ইভিওনিম তথা গরিব মানুষ। অবশ্য জেরুসালেমে ‘দারিদ্র’ বলতে কেবল বস্তুগত সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকাই বোঝাত না। ‘গরিব’-এর বিপরীত শব্দ ‘ধনী’ ছিল না, তা ছিল ‘গর্বিত।’ জেরুসালেমে লোকজন মানবীয় শক্তি, বিদেশী আনুগত্য বা সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের ওপর নির্ভর করত না, বরং কেবল যিহোবার ওপর ভরসা করত। একমাত্র তিনিই জায়নের দুর্গ রক্ষা করতে পারেন। মানব সেনাবাহিনী ও সুরক্ষিত দুর্গের ওপর নির্ভরশীল থাকাকে ঔদ্ধত্য বোঝাত। ২৭

এখনকার মতো তখনো লোকজন সহানুভূতি প্রকাশের অপেক্ষাকৃত কঠিন কর্তৃব্য পালনের চেয়ে ঐশী স্থানে ধর্মীয় শক্তি ব্যয় করার বিকল্পকেই অগ্রাধিকার দিত। ইসাইয়ার দীর্ঘ নবুয়তি জীবনে এমন অনেক বিপদ দেখা যায় যার উদ্ভব ঘটেছে জেরুসালেম মতাদর্শ থেকে। জুদার রাজা আহজের শাসনকালে (৭৩৬- ১৬) আসিরিয়ানরা আবার নিকট প্রাচ্যে আবির্ভূত হয়। দামাস্কাস ও ইসরাইলের রাজারা আসিরিয়ানদের প্রতিরোধের জন্য রাজা তৃতীয় তিগলাথপিলাসারের নেতৃত্বে নতুন জোট গঠন করেন। রাজা আহাজ এই জোটে যোগ দিতে অস্বীকার করলে ইসরাইল ও দামাস্কাস জেরুসালেম দখল করার জন্য দক্ষিণ দিয়ে এগিয়ে যায়। দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর জন্য আহাজকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন ইসাইয়া। তিনি বলেছিলেন : তার রানি যে সন্তান গর্ভে ধরেছেন, তিনিই দাউদের রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন; তার নাম হবে ইমানু-আল (‘আমাদের সাথে আছেন ঈশ্বর’), কারণ তিনি শান্তির যুগের সূচনা করবেন। এ সময় নারী ও পুরুষেরা আবারা ঐশী ছায়ায় শান্তিতে থাকবে। এই ছেলে বুঝদার বয়সে পৌছার আগে পর্যন্ত দামাস্কাস ও ইসরাইল রাজ্য ধ্বংস হবে; অন্যান্য রাজপুরুষের বিদেশী জোট নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।২৮ আহাজের উচিত কেবল যিহোবার ওপর নির্ভর করে থাকা।

ইসাইয়া ক্ষুব্ধ হলেও তার পরামর্শ অনুসরণ করার ঝুঁকি নিয়ে আগ্রহী ছিলেন না আহাজ। রাজা এর বদলে তিগলাথপিলেসারের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে আসিরিয়ার সামন্তে পরিণত হন। এর পরপরই দামাস্কাস ও ইসরাইল আক্রমণ করে আসারিয়া। সেখান থেকে বিপুলসংখ্যক অধিবাসীকে বহিষ্কার করা হয়। ৭৩৩ সাল নাগাদ সামারিয়াভিত্তিক ছোট নগর-রাষ্ট্রে পরিণত হয় ইসরাইল, একজন পুতুল রাজাকে বসানো হয় সিংহাসনে।

সামন্তদের ওপর নিজের ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার কোনো নীতি ছিল না আসারিয়ার। তবে আহাজ তার নতুন প্রভুর প্রতি মতাদর্শগত আনুগত্য প্রদর্শন করার জন্য নিজেই তেমন কিছু করতে চাইছিলেন। টেম্পলের আঙিনায় বলি দেওয়ার পুরনো বেদির স্থানে আসিরিয়া-ধরনের বেদি বসানো হয়। এরপর থেকে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র-সম্পৃক্ত মতবাদের জন্য জুদাতে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। নিকট প্রাচ্যের অন্যান্য অংশেও এই সময় এসব পূজা শুরু হয়।

আসিরিয়ার সামরিক শক্তি : এই কেন্দ্রস্তম্ভে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭৪৫) সৈন্যরা বর্শা নিক্ষেপের যন্ত্র দিয়ে একটি নগরী অবরোধ করে আছে। তারা তাদের বন্দিদের প্রতি খুবই নির্মম ছিল।

আহাজের জন্য ইসাইয়ার সময় ছিল সামান্যই। তবে রাজা অন্তত তার দেশকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তবে ইসাইয়া যাকে আমানু-আল হিসেবে প্রশংসা করেছিলেন, ওই শিশু সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য নয়। হেজেকিয়া ৭১৬ সালের দিকে তার বাবার স্থলাভিষিক্ত হন। ডি আমাদেরকে অনুমোদনসূচকভাবে বলেন তিনি কেবল যিহোবার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি অন্যান্য ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত সব ব্যামথ (উপাসনালয়) বন্ধ করে দেন, ম্যাতজেভট (পাথরের স্তম্ভ) ভেঙ্গে ফেলেন, জেরুসালেম টেম্পলের হেখালে থাকা ব্রোঞ্জের সাপ গুঁড়িয়ে দেন। ইতিহাসলেখকেরা আমাদের জানাচ্ছেন, এই সংস্কার আন্দোলনে পুরোহিতেরা নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছিলেন, টেম্পলের মধ্যে স্থান নেওয়া বিদেশী ধর্মমতের সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দেন। তিনি আরো বলেন, হেজেখিয়া পাসওভার উদযাপনের জন্য সোলায়মানের টেম্পলে সমবেত হওয়ার জন্য ইসরাইল ও জুদার সব লোককে নির্দেশ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ওই উৎসবটি এত দিন বাড়িতেই উদযাপিত হতো। ২৯ অবশ্য বাস্তবে এই ভাষ্য সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকের আগে টেম্পলে পাসওভার উদযাপিত হতো না। খুব সম্ভবত ইতিহাসলেখক তার নিজেদের সময়কে হেজেকিয়ার মধ্যে নিয়ে গেছেন। এর কারণ হতে পারে, তিনি তার ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহিত ছিলেন। বস্তুত, আমরা জানি না, এই সংস্কারের ঠিক কী উদ্দেশ্য ছিল হেজেকিয়ার। মনে হচ্ছে, এর কোনো স্থায়ী প্রভাব ছিল না। তিনি সম্ভবত তার বাবার

সমন্বয়ধর্মী নীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এর প্রথম ধাপ ছিল আসিরিয়ান প্রাধান্য ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। ইসরাইলের লোকজনকে জেরুসালেমে তলব করার কাহিনী ইঙ্গিত দিচ্ছে, ইসরাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি অখণ্ড রাজত্ব পুনর্জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ইসরাইল তখন আর হুমকি ছিল না। সাবেক শত্রুদের দুর্দশায় জুদায় নিশ্চিতভাবেই আনন্দ বয়ে গিয়েছিল। বিভক্তির পর প্রথমবারের মতো জুদা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অবস্থানে চলে এসেছিল। দাউদের নগরীতে অবশিষ্ট ইসরাইলিদের তলব করার মাধ্যমে হেজেকিয়া সম্ভবত ইসাইয়ার মেসাইনিক দর্শন লালন করছিলেন।

এ ধরনের কোনো আশা যদি থেকেও থাকে, তবে তা ৭২২ সালে পুরোপুরি গুঁড়িয়ে গিয়েছিল আসারিয়ার বিরুদ্ধে ব্যর্থ বিদ্রোহ করার ফলে। পঞ্চম শালমানেসের সামারিয়াকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেন। ইসরাইল রাজ্যকে আসারিয়ার একটি প্রদেশে পরিণত করা হয়, এর নাম রাখা হয় সামেরিনা। ২৭ হাজারের বেশি ইসরাইলিকে আসারিয়ায় বহিষ্কার করা হয়, তাদের কথা আর কখনো শোনা যায়নি। তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয় বেবিলন, কুচনাহ, আরাদ, হামাহ ও সেফোরিয়াম থেকে লোক এনে। এসব লোক তাদের নিজস্ব দেব-দেবীদের ছাড়াও তাদের নতুন দেশের ঈশ্বর যিহোবার উপাসনাও করত। এরপর থেকে কোনো ভৌগোলিক এলাকার নাম বোঝাতে 'ইসরাইল' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হতো না। এটি জুদায় পুরোপুরি কান্টিক পরিভাষা হিসেবে টিকে থাকে। তবে সব ইসরাইলিকে বহিষ্কার করা হয়নি। তারা তাদের পুরনো শহর ও গ্রামগুলোতে থেকে যায় এবং নতুন উপনিবেশকারীদের সহায়তায় তাদের বিধ্বস্ত দেশটি পুনঃগঠন করার চেষ্টা করেছিল। অন্যরা সম্ভবত উদ্বাস্তু হিসেবে জুদা এসে জেরুসালেমের আশপাশে বসবাস করতে থাকে। তারা যেসব ধ্যান-ধারণা সাথে করে নিয়ে এসেছিল, সেগুলো হয়তো কিছু সময় উত্তরে প্রচলিত ছিল ও জেরুসালেমের মতাদর্শে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল।

হয়তো সাবেক ইসরাইল থেকে এ ধরনের বিপুলসংখ্যক লোক আসার কারণেই অষ্টম শতকের শেষ দিকে জেরুসালেম সাবেক আকারের তিন থেকে চার গুণ বৃদ্ধি পায়। দুটি নতুন উপকণ্ঠ নির্মিত হয় : একটি টেম্পলের বিপরীতে ওয়েস্টার্ন হিলের ওপর, যা পরিচিত হয় মিশনেহ বা সেকেন্ড সিটি নামে। অপরটি নির্মিত হয় টাইরোপোয়ন ভ্যালিতে,

নাম হয় ম্যাখতেশ বা দি হ্যালো। নতুন আসারিয়ান রাজা দ্বিতীয় সারগন তার সামন্তদের প্রতি আরো উদার নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে জেরুসালেম বিশেষ সুযোগ ও অর্থনৈতিক সুবিধা পায়। কিন্তু উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের ভাগ্য থেকে শেখার বদলে হেজেকিয়া মনে হয় তার সমৃদ্ধিকে তার মাথার ওপর দিয়ে চলে যেতে দেন। সারগন ৭০৫ সালে মারা যাওয়ার পর জেরুসালেম অসন্তুষ্ট সামন্তদের নতুন জোটের কেন্দ্রে পরিণত হয়। তারা আসারিয়ান শাসন ছুঁড়ে ফেলার আশা করেছিলেন। তার সাথে যোগ দেন টায়ার ও অ্যাশকেলনের রাজারা, মিসরের ফারাও সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। মেসোপটেমিয়ায় আরেকটি জোট দানা বেঁধে ওঠে। এর নেতৃত্ব দেন বেবিলনের রাজা মেরোডাচ-ব্যালাদান। তিনি গুদামঘর ও দুর্গগুলো পরিদর্শনের জন্য জেরুসালেমে দূত পাঠান। হেজেকিয়া যুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। একটি নতুন খাল খনন করে তিনি পানি সরবরাহব্যবস্থা উন্নতি করেন। এটি ছিল ১৭ শ' ফুট লম্বা। এটি গিহন থেকে সিলোয়াম পুল পর্যন্ত পাথুরে এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। এই সরোবর ও সেইসাথে সম্ভবত মিশনেহকে রক্ষার জন্য একটি নতুন নগরপ্রাচীর নির্মাণ করা হয়। তিনি তার সামরিক সামর্থ্যের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে এমন গর্বিত ছিলেন যে তা জেরুসালেমের 'গরিব' চেতনা অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই তার ঔদ্ধত্যের বোকামি বুঝতে পারলেন : আসারিয়ার শক্তিকে প্রতিরোধ করা জেরুসালেমের জন্য ছিল অসম্ভব। বেবিলন ও মেসেপটেমিয়ার অন্যান্য অংশের বিদ্রোহ দমন করা মাত্র নতুন রাজা সেনাচেরিব জেরুসালেমের পথে পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করেন। মিসর কোনো সৈন্য পাঠায়নি, ট্রান্সজর্ডান ও ফনেশিয়া আসারিয়া সেনাবাহিনীর সামনে তাসের ঘরের মতো গুঁড়িয়ে যায়। সবশেষে সেন্নাচেরিবের সৈন্যরা নগরীর বাইরে পৌঁছয়। বিপর্যয় রোখার চেষ্টায় হেজেকিয়া উপহার ও খাজনা পাঠান। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। ইসাইয়ার ছাত্র নবী মিকাহ ভবিষদ্বাণী করেছিলেন, শিগগিরই জেরুসালেম আবর্জনার জঞ্জালে পরিণত হবে, জায়ন হবে চাষা ক্ষেত। কিন্তু ইসাইয়া তখনো জোর দিয়ে বলছিলেন, সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি : জায়নের দুর্গ যিহোবা নগরীকে রক্ষা করবেন। কূটনীতির ওপর ভরসা ও সামরিক প্রস্তুতি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। তবে যিহোবার উপস্থিতিই শত্রুকে তাড়িয়ে দিতে পারে। ৩১ আবারো সব সম্ভাবনার বিপরীতে

ইসাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণী নাটকীয়ভাবে সত্য প্রমাণিত হয়। আমরা জানি না, কী ঘটেছিল। ইতিহাসলেখকেরা কেবল এটুকু লিখেছেন, আসারিয়ান সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে যিহোবা তার 'দেবদূত' পাঠিয়েছিলেন, সেনাচেরিব তার দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছিলেন। ৩২ সবচেয়ে যৌক্তিক ব্যাখ্যা হলো, আসারিয়ানরা প্লেগে বিধ্বস্ত হয়েছিল। অবশ্য জেরুসালেমের কেউ এ ধরনের নীরস তথ্য শুনতে রাজি ছিল না। তারা অলৌকিক ঘটনার মতো করেই এই উদ্ধার কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে। সত্যিই প্রমাণিত হলো, যিহোবা একজন শক্তিশালী যোদ্ধা, তার ধর্মীয় মতবাদের ঘোষণা অনুযায়ীই তিনি তার জনগণকে উদ্ধার করেছেন।

এ অনন্য ঘটনাটি জেরুসালেমের রাজনীতিতে ভয়াবহ প্রভাব ফেলে। আগের বছরগুলোতে রেহোবোয়া ও আশার মতো রাজারা স্বাভাবিক কূটনীতির মাধ্যমে তাদের নগরীকে রক্ষা করেছিলেন। তারা ভিত্তিহীনভাবে জায়নে যিহোবা কাল্ট বিশ্বাস করেননি। বরং তারা শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের ভাণ্ডারে থাকা প্রতিটি অস্ত্র দিয়ে তারা যথাযথভাবে লড়াই করাকে কর্তব্য মনে করেছিলেন। তারা তাদের বিপুল সংগ্রামে যিহোবাকে যুক্ত করেছিলেন। তবে পরের প্রজন্মের জেরুসালেমবাসীরা তাদের নগরীর দুর্ভেদ্যতার বিষয়টি এত গভীরভাবে অনুভব করে যে অলৌকিক হস্তক্ষেপে তারা রক্ষা পাবে বলে বিশ্বাস করতে থাকে। সেনাচেরিব সরে যাওয়ার পর হেজেকাইয়াহ বীর হিসেবে সম্মান লাভ করেন। তবে তার বেপরোয়া নীতি তার দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। আসারিয়ার বর্ষবিবরণীতে দেখা যায়, সেনাচেরিব দাবি করেছেন যে তিনি হেজেকিয়ার সুরক্ষিত ৪৬টি নগরী ও অসংখ্য গ্রাম লুণ্ঠন করেছেন, জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে বহিষ্কার করেছেন, হেজেকিয়া তার প্রায় পুরো এলাকা হারিয়ে ফেলেছেন। জেরুসালেম আবারো ছোট্ট একটি নগর-রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তার ছোট ছেলে মানাসের কাছে এটি ছিল কঠিন উত্তরাধিকার। তিনি ৬৯৮ সালে সিংহাসনে আহরণ করেন, ৫৫ বছর জেরুসালেম শাসন করেন। বাইবেল লেখকদের মতে, জেরুসালেমে তিনিই সবচেয়ে খারাপ রাজা। হেজেকিয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্য তিনি তার বাবার ধর্মীয় নীতি পুরোপুরি বদলে ফেলেন, ওই অঞ্চলের সাথে জুদার বৃহত্তর একীভূতকরণের কাজটি করেন, বিশেষ করে বিপজ্জনক পন্থাটি বর্জন করেন। মানব বলির প্রথা হিন্নম উপত্যকায় চালু ছিল। এটি নৃশংসতার

একটি আভা ছড়িয়ে দিয়েছিল। আশেরাহর একটি প্রতিকৃতি টেম্পলে স্থাপন করা হয়, সম্ভবত দেভিরেও বসানো ছিল। আঙিনায় ঐশী পতিতাদের জন্য বাড়িও নির্মাণ করেন মানেসে। জায়ন এখন আশেরাহর উর্বরতা কাল্টের প্রতি নিবেদিত। অন্যান্য নাক্ষত্রিক দেব-দেবতার বেদিও সেখানে ছিল। ৩৩ এসব পদক্ষেপে সবচেয়ে উদ্দীপ্ত যিহোবাবাদীরা স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়েছিল। তবে কিছু লোক এগুলো গ্রহণ করেছিল। আমরা নবী হোসির ভাষ্য থেকে জানি যে বালের উর্বরতা মতবাদ ৭২২ সালের আগে উত্তরের রাজ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে ২৭০ সালের দিকে যিহোবা ছিলেন জেরুসালেমের ইলিয়ন। আর যেসব নবী এই সিংহাসনচ্যুতির জন্য মারাত্মক শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তারা ধর্মদ্রোহী আখ্যা পায়, ৭০১ সালে গড়পড়তায় অকৃতজ্ঞ হিসেবে অভিহিত হন। মানেসে সম্ভবত বিশ্বাস করতেন যে আসারিয়ার প্রশংসা করা দরকার এবং তার বাবার যিহোবাবাদী নিষ্ঠায় কঠোর হওয়া উচিত নয়। তার দীর্ঘ শাসন ছিল জুদার পুনরুদ্ধারের সময়। হেরেকিয়ার হারানো ভূখণ্ডের কিছু অংশ মানেশেহ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মানেশেহর সবচেয়ে তীব্র সমালোচকেরা ছিলেন ডিউটারোনোমিস্ট সংস্কারকেরা। তারা তার আমলে যিহোবাবাদের নতুন সংস্কারণ আবিষ্কার করেছিল, জায়ন মতবাদের দিকে বিরূপতা প্রকাশ করত। তারা সম্ভবত ৭২২ সালের বিপর্যয়ের পর উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য থেকে জেরুসালেমে এসেছিল। তারা হয়তো আসারিয়ানদের ইসরাইলি পুরনো মন্দিরগুলোর প্রতি বিরূপ ভাব সম্পর্কে অবগত ছিল। হয়তো তারা মনে করত, মানব-সৃষ্ট কোনো উপাসনালয়ে স্বর্গ আর দুনিয়ার মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে না এবং শত্রুদের থেকে লোকজনকে রক্ষা করতে পারে না। এক্সিয়াল যুগে অনেকের কাছে ঐশী সত্তা ছিল ক্রমবর্ধমান হারে দূরের বাস্তবতা। তাদের কাছে স্বর্গ আর দুনিয়ার মধ্যে নতুন একটি দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। ডিউটারোনোমিস্টরা মানুষের তৈরি কোনো ভবনে ঈশ্বর বাস করতে পারে বলে মনে করত না। ডি যখন বাদশাহ সোলায়মানের জেরুসালেম মন্দির উৎসর্গের কথা বর্ণনা করেন, তখন তিনি তা বাদশাহর মুখে শব্দ যোগ করেন, জায়ন মতবাদের ভিত্তিতে লেগে থাকে। সোলায়মান অবিশ্বাস্যভাবে বলেন, ঈশ্বর কি সত্যিই মানুসের সাথে বাস করেন? তোমাকে কেন আসমান আর তাদের নিজস্ব স্বর্গগুলো ধরে

রাখতে পারে না? আমার বানানো এই বাড়িটি কত দুর্বল!৩৪ ঈশ্বর বাস করেন স্বর্গে, কেবল তার 'নাম'- নিজের ছায়া- আমাদের দুনিয়ায় উপস্থাপিত হয়।

ডিউটারোনোমিস্টদের কাছে মনে হয়েছিল জায়ন মতবাদটি খুব বেশিভাবে পুরনো কেনানি পুরানতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল। তারা এমন এক ধর্ম চেয়েছিল যা হবে ইতিহাসভিত্তিক। সেটি প্রতীকী গল্পের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বাস্তবতার ভিত্তিতে হবে। অনেক দিক থেকেই তারা আজকের আধুনিক পাশ্চাত্যের অনেক কাছাকাছি ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মাউন্ট জায়নের ওপর যিহোবার সিংহাসনে কেনান ভূখণ্ড অবস্থান করার ইসরাইলি দাবি তারা বিশ্বাস করত না। এর বদলে তারা ঈশ্বরের সহায়তায় অস্ত্রের শক্তিতে ইসরাইল ভূমিটি জয় করেছে- এমনটা প্রমাণ করতে জওয়ার ঐশী উদ্দীপ্ত কেনান জয়ের গল্প তৈরি করেছিল। তারা জোর দিয়ে বলত, সুক্কুথ উৎসবটি ছিল স্রেফ ফসল তোলার উৎসব; এটি মাউন্ট জায়নে যিহোবার সিংহাসনে আরোহণ উদযাপনের জন্য ছিল না। ৩৫

সর্বোপরি ডিউটারোনোমিস্টরা চেয়েছিল, কেবল ইসরাইলিরাই যেন যিহোবার উপাসনা করে এবং এর বিনিময়ে তারা যেন তাদের অন্য সব ঈশ্বরের প্রতি সমর্থন দেয়। এলিজা ও হোসিয়ার মতো উত্তরের নবীরা দীর্ঘ দিন এই বার্তা প্রচার করেছেন। কিন্তু বাদশাহ সোলায়মানের আমলের পর থেকে জেরুসালেমে সমন্বয়ের ঐতিহ্য প্রচলিত হয়ে আসছিল। ডিউটারোনোমিস্টদের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বলা যায়, মানাসে ছিলেন শেষ অবলম্বন। তারা বিশ্বাস করত, এক্সোডাসের আমল থেকে ইসরাইলিরা কেবল যিহোবার উপাসনা করেছে, যওয়া গ্রন্থের ২৪তম অধ্যায়ে তারা প্রমাণ করেছে, ইসরাইলিরা আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি সংশোধন করে নিয়েছিল। যশুয়ার অভিভাবকত্বে তারা সব বিদেশী ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করে এর বদলে যিহোবাকেই তাদের হৃদয়মন দিয়েছে। তবে ডিউটারোনোমিস্টরা একেশ্বরবাদী ছিল না। তারা অন্যান্য ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত, তবে মনে করত ইসরাইলিদের কেবল যিহোবার উপাসনা করতে বলা হয়েছে। ৩৬

জেরুসালেম টেম্পলের প্রার্থনাবিধির অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি, ইতোমধ্যেই বেশ কিছু লোক এই পর্যায়ে জুদায় চলে এসেছে। জায়ন শাস্ত্রাচার ঘোষণা করছে যে যিহোবা

একই ছিলেন রাজা ও অন্য ঈশ্বরদের চেয়ে শ্রেয়তর। তবে ডিউটারোনোমিস্টদের চোখে জায়ন মতবাদ ছিল ত্রুটিপূর্ণ ও ভ্রান্তিপূর্ণ। তারা মন্দিরগুলো পুরোপুরি বিলুপ্ত করতে চাইছিল না : এগুলো ছিল প্রাচীন বিশ্বের ধর্মগুলোর কেন্দ্রীয় বিষয়। আর এখনকার দুনিয়ায় এগুলো ছাড়া জীবন সম্ভবত কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু এর বদলে তারা প্রস্তাব করে যে ইসরাইলের কেবল একটি পবিত্র স্থান থাকা উচিত। এটি হতে পারে বিদেশী ধ্যান-ধারণা চুপিসারে মতবাদে অনুপ্রবেশ ঠেকানোর কাজে তদারকির জন্য। শুরুতে তাদের মনে হয়তো শেচেম বা বেথেলের কথা ছিল। কিন্তু ৭২২ সালের পর প্রধান পবিত্র স্থানের মর্যাদা পেতে পারে এমন পীঠ হিসেবে জেরুসালেম টেম্পলই একমাত্র প্রধান যিহোবাবাদী উপাসনালয় হিসেবে টিকে ছিল। ফলে সংস্কারকররা অনিচ্ছা সত্ত্বেও একে মেনে নিয়েছিল। তা সত্ত্বেও পবিত্র ভূমিতে এই প্রধান উপাসনালয়ের প্রতি মুসার নজরদারির কথা বর্ণনা করার সময় তারা সতর্কভাবে 'জায়ন' বা 'জেরুসালেম'-এর উল্লেখ এড়িয়ে গেছেন। এর বদলে তারা মুসাকে দিয়ে অস্পষ্টভাবে বলিয়েছেন, 'যে স্থানটিকে তোমার ঈশ্বর যিহোবা তার নামের জন্য বাছাই করেছেন। ৩৭

ডিউটারোনোমিস্টদের আদর্শ মানেশাহের আমলে কার্যকর হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবে তার নাতি যসিয়াহর (৬৪০-৬০৯) আমলে অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের ওই সুযোগ হাতে আসে। সময়টি ছিল সঠিক। নিকট প্রাচ্যজুড়ে লোকজন অস্পষ্টভাবে সচেতন ছিল যে পুরনো ব্যবস্থা বিদায় নিচ্ছে। নতুন বিশাল সাম্রাজ্য আসিয়ার অধীনে বসবাসের অভিজ্ঞতা ও এর উদীয়মান প্রতিদ্বন্দ্বী বেবিলন লোকজনকে আগের যেকোনা সময়ের চেয়ে অনেক বড় বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। প্রযুক্তিগত অগ্রগতিও তাদের পরিবেশের ওপর তাদের আগের চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ দেয়। লোকজন আর তাদের পূর্বপুরুষদের মতো বিশ্বকে দেখতে পারছিল না। ফলে তাদের ধর্মীয় আদর্শও বদলে যাচ্ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও পুরনো পৌত্তলিকতার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। অক্সিয়াল যুগে পুরনো বিশ্বাসের স্থানে তাওবাদ, কনফুসিয়ানবাদ, হিন্দুবাদ, বৌদ্ধবাদ ও সবশেষে গ্রিক যুক্তিবাদ জায়গা করে নিয়েছিল। জুদাতেও একই ধরনের পরিবর্তন সংগঠিত হচ্ছিল। তবে আবহমান কাল বিদায় নেওয়ায় মিসর থেকে মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত লোকজন আদর্শ অতীত নিয়ে স্মৃতিকাতরতায় ভুগত। এটি ছিল এক্সোডাস ও বিচারকদের সময়কালের

ইসরাইলের স্বর্ণযুগের ডিউটারোনোমিস্টদের সংস্করণ। এটি কল্পিত অতীত হলেও বর্তমানের বিভ্রান্তিকর বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল।

এই নস্টালজিয়া অতীতের অংশ হওয়ায় যসিয়াহ সোলায়মানের টেম্পল পুনঃপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিন শ' বছর গত হওয়ায় মন্দিরটির সংস্কার ব্যাপকভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। সংস্কারকাজ চলার সময় প্রধান পুরোহিত হিলকিয়া একটি স্ক্রল আবিষ্কার করেন। এটি সম্ভবত ছিল বুক অব ডিউটারোনোমিস্ট হিসেবে আমরা যে গ্রন্থটি জানি, তার অংশবিশেষ। স্কুলটি যসিয়ার সামনে পাঠ করার সময় তরুণ রাজা একথা ভেবে কষ্ট পেলেন যে ঈশ্বরের দাউদ গৃহ নির্বাচনের ফলে ইসরাইলের ওপর ঈশ্বরের আনুকূল্য নিঃশর্ত নয়। বরং আনুকূল্য নির্ভর করছে মুসার বিধান পালনের ওপর। ৩৮ মাউন্ট জায়নে যিহোবার তার টেম্পলে উপস্থিত থাকাটাই আর পর্যাপ্ত বিবেচিত হলো না। যসিয়ার এই নতুন ধর্মতত্ত্বের ওপর চরম প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করল যে বিধানটি জুদার ধর্মীয় জীবনে প্রধান বিষয় ছিল না। মতবাদটি ও রাজার শাসন, যিহোবার মেসাইয়া, ছিল জুদার রাজনীতির ভিত্তি। এখন তাওরাত, মুসার বিধান হওয়া উচিত দেশের আইন।

যসিয়া নতুন বিশ্বাস অনুযায়ী সংস্কারকাজ শুরু করলেন। আর এ ধরনের অন্য সব সংস্কারের মতো এখানেও অতীততে নতুন করে সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো। প্রথমে জুদার সব প্রবীণকে তলব করা হলো টেম্পলের প্রতি প্রাচীন চুক্তি নবায়নের জন্য। লোকজন অন্যসব বিদেশী ঈশ্বর থেকে সরে গিয়ে কেবল যিহোবার প্রতি নিজেদের প্রতিশ্রুত থাকার সংকল্প ব্যক্ত করল। পরের পদক্ষেপ হলো মতবাদগুলোকে পরিশোধিত করা, ডি'র ভাষ্যে জেরুসালেমে এসব পৌত্তলিক' ধর্মমতের প্লাবন ছিল বলে দেখা যায়। বাল, অ্যারেরাহ ও অন্যান্য নাক্ষত্রিক দেব- দেবীর প্রার্থনার সাথে জড়িত ধর্মীয় বস্তু নগরী থেকে বের করে কিদরন উপত্যকায় পুড়িয়ে ফেলা হয়। টেম্পল থেকেও দেব-স্তম্ভ ও আঙিনায় থাকা অ্যারেরাহর প্রতি নিবেদন করা পবিত্র পতিতাদের বাড়িগুলো উচ্ছেদ করা হয় :

তিনি হিন্নম উপত্যকার অগ্নিকুণ্ড অপবিত্র করেছিলেন যাতে কেউ মোলোচের সম্মানে তার ছেলে বা মেয়েকে আগুনে শোধন করতে না পারে। জুদার রাজারা যিহোবার টেম্পলের

প্রবেশপথে সূর্যের প্রতি নিবেদন করে যে বাড়িগুলো নির্মাণ করেছিলেন সেগুলো তিনি গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন... জুদার রাজারা ছাদের ওপর যেসব বেদী নির্মাণ করেছিলেন, যিহোবার টেম্পলের দুই আঙিনায় মানাসেহ যেগুলো নির্মাণ করেছিলেন, সবই রাজা টেনে নামিয়ে সেখানেই টুকরা টুকরা করে ফেলেন... ইসরাইলের রাজা সোলায়মান মাউন্ট অলিভেসের দক্ষিণে জেরুসালেমের দিকে মুখ করে নির্মাণ করা ব্যামথ, আস্তারতের জন্য সিডোনিয়ান ঘৃণ্য বস্তু, চেমোশের জন্য মোয়াবাইতদের জন্য ঘৃণ্য বস্তু, মিলকমের জন্য নির্মিত আমোনাইত ঘৃণ্য বস্তু অপবিত্র করে করে দেন রাজা। তিনি সব ঐশী স্তম্ভ গুঁড়িয়ে দেন, ঐশী দণ্ডগুলো কেটে ফেলেন, ওইসব স্থান মানুষের হাড় দিয়ে ঢেকে দেন। ৩৯

ধ্বংসের এই তালিকায় উদ্বেগ সৃষ্টিকারী সহিংসতা ছিল। এতে 'পৌত্তলিকার প্রতি ইসরাইলিদের প্রবল ঘৃণার উপাদান ছিল। এগুলো মনে হয় নবী, সাধু পুরুষ ও সামবাদীদের ক্রুদ্ধ ও সহিংস বিতৃষ্ণার মধ্য দিয়ে পূরণ করা হয়েছিল। এর কারণ সম্ভবত এই যে ইসরাইলিরা এসব পুরনো ধর্মীয় প্রতীকের প্রতি এতটাই আকর্ষণ বোধ করত যে তারা শান্তিপূর্ণভাবে এগুলো একদিকে সরিয়ে রাখতে পারছিল না। বুদ্ধ যেভাবে ভারতবর্ষের পুরনো পৌত্তলিকবাদ সংস্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তারা সেখানে হয়নি। 'পৌত্তলিকতা' ধর্মীয় অনুসন্ধানের অংশ ছিল। কারণ ঐশী সত্তা সরাসরি নিজেকে মানবীয় রূপে প্রকাশ করত না। বরং মিথ, বস্তু, ভবন, লোকজন বা মানবীয় আইডিয়া বা মতবাদের মতো নানা কিছুর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করত। ঐশী সত্তার এসব প্রতীক অপর্যাপ্ত হতে বাধ্য। কারণ এগুলো এমন এক বাস্তবতা নির্দেশ করত যা অনির্বচনীয় ও মানুষের ধারণার চেয়েও বড়। তবে ধর্মের ইতিহাস দেখাচ্ছে, লোকজনের পরিবেশ বদলে গেলে পুরনো পবিত্রতাও তাদের হয়ে কাজ করা বন্ধ করে দেয়। ওগুলো আর ঐশী সত্তা প্রকাশ করত না। বস্তুত ওগুলো তখন ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বাধায় পরিণত হয়েছিল। এটিও সম্ভব যে লোকজন পাথর, বৃক্ষ বা মতবাদের মতো প্রতীককেই ঐশী সত্তা হিসেবে ভুল করতে পারে।

স্পষ্টভাবেই মনে হচ্ছে, যসিয়ার সময় জুদায় এ ধরনের ধর্মীয় পরিবর্তনই হয়েছিল। তিন শ' বছর ধরে জেরুসালেমের লোকজন কেনানের অন্যান্য ধর্মীয় প্রতীক থেকে আধ্যাত্মিক

রসদ পেয়েছে। কিন্তু এখন সেগুলো ত্রুটিপূর্ণ মনে হওয়ায় অপঃশক্তি বিবেচিত হলো। পাথর-স্তম্ভের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বাস্তবতাকে অবলোকন করার বদলে যসিয়াহ ও হিলকিয়াহ তাতে কেবল অশ্লীলতাই দেখতে পেলেন। এতে টানাপোড়েন ছিল, পরবর্তীকালের একেশ্বরবাদী ঐতিহ্যগুলোতেও তা দৃশ্যমান হয়েছে। এই প্রত্যাখ্যান একসময় ইসরাইল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকা উত্তরাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে বিশেষ তীব্রতায় প্রকাশ পেয়েছিল। আসিরিয়ার এখন পতন ঘটেছে, সামেরিনা প্রদেশে তার নিয়ন্ত্রণ আর বহাল নেই। যসিয়ার অভিযান ছিল পুনর্জয়ের অংশবিশেষ। তা সম্ভবত ছিল ঐক্যবদ্ধ দাউদ রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। কিন্তু তার সংস্কার ছিল নির্মম ও নৃশংস। যসিয়া বেথেলের প্রাচীন বেদী ধ্বংস করেন। 'ধর্মত্যাগী' জেরোবোয়াম এখানেই ইসরাইলের রাজকীয় মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন। প্রতিহিংসায় যসিয়াহ এর পাথরগুলো খুলে সেগুলো গুঁড়িয়ে দেন। তারপর বেদীটি অপবিত্র করেন কাছের কবরস্থান খুঁড়ে লাশগুলো বের করে সেখানে পুড়িয়ে দিয়ে। তিনি ইসরাইলের অন্যান্য ধর্মীয় স্থানেও একই কাজের পুনরাবৃত্তি করেন : তাদের পুরোহিতদের খুন করেন, তাদের নিজেদের বেদীতেই তাদের হাড়গুলো জ্বালিয়ে দেন। এই নির্দয়তা ও উগ্র অসহিষ্ণুতা অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি ইব্রাহিমের দেখানো সৌজন্যতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। অন্যদের পবিত্র অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কোনো ইঙ্গিত ছিল না। নবীদের জোর দিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছিল সত্যিকারের ধার্মিকতার লিটমাস টেস্ট। এই চেতনার আলোকেই ডিউটারোনোমিস্ট ইতিহাসবিদেরা যওয়ার প্রশংসায় করেছিলেন। তিনি, তাদের দাবি অনুযায়ী, কেনানে তার ঈশ্বরের নামে ইসরাইলি পূর্বপুরুষদের নির্দয়ভাবে গণহত্যা চালিয়েছিলেন। দুঃখজনকভাবে এই চেতনা এরপর থেকে জেরুসালেমের আধ্যাত্মিক পরিবেশের অংশে পরিণত হয়েছিল।

যসিয়ার সংস্কার জায়নের জন্য প্রচারণাও ছিল। তিনি পুরো ইসরাইল ও জুদার জন্য জেরুসালেমে যিহোবার একমাত্র মন্দির নির্মাণ করার করার মাধ্যমে ডিউটারোনোমিস্ট আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এ প্রধান পবিত্র স্থানটি সুরক্ষিত করার জন্য অন্য সব পবিত্র স্থান ধ্বংস ও অপবিত্র করা হয়। যসিয়ার বেথেলের প্রতি বিশেষভাবে কঠোর হওয়ার নেপথ্যে ছিল এই কারণ যে এই রাজকীয় মন্দিরটি জেরুসালেমকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহসী হয়েছিল। উত্তরের পুরোহিতদের হত্যা করা হলেও জুদার পল্লী এলাকার

মন্দিরগুলোর পুরোহিতদের তাদের বিধ্বস্ত মন্দির থেকে সরিয়ে জেরুসালেমে নেওয়া হয়। সেখানে তারা জায়ন পুরোহিতদের নিচের সারিতে অবস্থান পান। জেরুসালেমের মহিমা অনুপ্রাণিত করছিল ধ্বংস, মৃত্যু, অবমাননা ও বাজেয়াপ্তকরণকে। ধর্মমতের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে নবীরা করুণা ও সহানুভূতির কথা প্রচার করলেও যসিয়ার সংস্কার পবিত্র নগরীর সম্মান ও অখণ্ডতাকেই সর্বোচ্চ রাখার চেষ্টা দেখা গেল।

সংস্কার স্থায়ী হয়নি, যদিও যে চেতনার মাধ্যমে তা করা হয়েছিল তা অটুট থেকে গেলেও। ৬০৯ সালে যসিয়া পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস চালান। এ সময় তার দেশে মিসরীয় উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকারী ফারাও দ্বিতীয় নেচোকে আক্রমণ করেন। জুদার ও মিসরীয় সেনাবাহিনী মেগিডোতে মুখোমুখি হয়। যসিয়াহ প্রথম মোকাবিলাতেই নিহত হন। নেচো সাথে সাথেই যসিয়ারহ ছেলে (জুদার অভিজাতদের পছন্দ ছিলেন তিনি) যেহোয়াহাজকে ক্ষমতাচ্যুত করে জুদার নিয়ন্ত্রণ কঠোর করেন তার ভাই জেহোয়াকিমকে ক্ষমতায় বসিয়ে। তবে মিসরীয়রা জেরুসালেমের নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখতে পারেনি। ৬০৫ সালে বেবিলনের রাজা নেবুচাদনেজার আসিরিয়া ও মিসরকে পরাজিত করে নিকট প্রাচ্যের সবচেয়ে পরাক্রান্ত শক্তিতে পরিণত হন। ওই এলাকার অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো জুদাও বেবিলনের সামন্তে পরিণত হয়। প্রথমে মনে হয়েছিল, নতুন সাম্রাজ্যের অধীনে এটি সমৃদ্ধ হবে। জেহোয়াকিম যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হয়ে মিসনেহ উপকণ্ঠে নিজের জন্য একটি জাঁকাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই জেরুসালেমে প্রাণঘাতী উগ্র দেশপ্রেম উপস্থিত হয়। রাজা বেবিলন থেকে বের হয়ে মিসরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। ওই সময় মিসর সেখানে ফিরে আসার চেষ্টা করেছিল। নবীরা পুরনো পন্থায় লোকজনকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছিল যে জায়নে যিহোবার উপস্থিতির ফলে নেবুচাদনেজারের হাত থেকে জেরুসালেম রক্ষা পাবে, ঠিক যেমন সেন্নাচেরিবের বিরুদ্ধে হয়েছিল। এই আত্মঘাতী প্রবণতার বিরুদ্ধে থাকাদের নেতৃত্বে ছিলেন জেরেমিয়া। তিনি ছিলেন যসিয়ার সহকর্মী হিলকিয়ার ছেলে। তিনি লোকজনকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, যিহোবা যেভাবে শিলোহ ধ্বংস করেছিলেন, তিনি সেভাবে জেরুসালেমও ধ্বংস করে দেবেন। এই ব্লাসফেমির জন্য তিনি মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হন। জেরেমিয়া খালাস পেলেও আসন্ন বিপর্যয় সম্পর্কে জেরুসালেমের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে লোকজনকে হুঁশিয়ার

করে দিতে থাকেন। তারা জায়নকে পূজনীয় বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। তারা এটি যিহোবার মন্দির বলে যখন শ্লোগান দিচ্ছিল, তিনি তাদেরকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেন, যিহোবা তাদেরকে রক্ষায় কেবল তখনই আসবেন যখন তারা ভিন দেশী ঈশ্বর থেকে মুখ ফেরাবে, সহানুভূতির বিধান পালন করবে, একে অন্যের সাথে নিরপেক্ষভাবে আচরণ করবে; আগন্তুক, বিধবা ও এতিমদের শোষণ করা বন্ধ করবে।

নেবুচাদনেজা তার বিদ্রোহী সামন্তকে শাস্তি দিতে উপস্থিত হওয়ার আগেই জেহোইকিম মারা যান। তার স্থলাভিষিক্ত হন তার ছেলে জেহোয়াচিন। প্রায় সাথে সাথেই জেরুসালেমকে অবরুদ্ধ করে ফেলে বেবেলনিয়ার সেনাবাহিনী। তিন মাস পর খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৭ সালে আত্মসমর্পণ করে জেরুসালেম। আত্মসমর্পণ করায় কোনো গণহত্যা বা নগরীকে ধ্বংস করা হয়নি। নেবুচাদনেজার নিজে টেম্পল লুণ্ঠন করেই শান্ত থাকেন, তিনি জুদার নেতৃত্বকে বেবিলনে নির্বাসিত করেন। ডিউটারোনোমিস্ট আমাদের বলছেন যে কেবল সবচেয়ে গরিবদেরই পেছনে ফেলে যাওয়া হয়েছিল। রাজা ও তার আমলাদের সাথে ১০ হাজার অভিজাত ব্যক্তি, সামরিক বাহিনী, সব কামার ও ধাতুর কারিগরকে সাথে নেওয়া হয়। নতুন কোনো বিদ্রোহ যাতে মাথাচাড়া না দেয় এবং অস্ত্র তৈরি যাতে সম্ভব না হয়, তা নিশ্চিত করতে এটি ছিল প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোর আদর্শ প্রক্রিয়া। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে লোকজন তখনো তাদের শিক্ষা থেকে কিছুই শেখেনি। নেবুচাদনেজার সিংহাসনে জেহোইচিনের চাচা ও যসিয়ার আরেক ছেলে জেদেকিয়াকে বসান। তিনি তার শাসনের প্রায় আট বছরের সময় আবারো বেবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এবার কোনো করুণা করা হয়নি। জেরুসালেম অবরোধ করে বেবিলনের সেনাবাহিনী। আট মাস ধরে চলে অবরোধ। তারপর খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সালে পতন ঘটে। রাজা ও তার সেনাবাহিনী পালনোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জেরিকোর কাছে ধরা পড়েন। জেদেকিয়াকে অন্ধ করে দেওয়ার আগে তার সামনে তার ছেলেদের হত্যা করা হয়। তারপর তাকে শৃঙ্খলিত করে বেবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বেবিলনের কমান্ডার পরিকল্পিতভাবে নগরী ধ্বংসে নিয়োজিত হন। তিনি সোলায়মানের টেম্পল, রাজপ্রাসাদ, জেরুসালেমের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেন। টেম্পলের সব মূল্যবান আসবাবপত্র বেবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। আশ্চর্য বিষয়, এসবের মধ্যে আর্ক অব কোভেন্যান্টের কোনো উল্লেখ ছিল না। সেটি চির দিনের জন্য

হারিয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকেই এর ভাগ্য সম্পর্কে নানা গুঞ্জন রটে। ৪২ প্রাচীন দুনিয়ায় রাজকীয় মন্দির ধ্বংস ছিল রাষ্ট্র ধ্বংসের সমপরিমাণ ঘটনা। ওই সময়ে ধারণা করা হতো, স্বর্গের সাথে কোনো 'কেন্দ্রের যোগাযোগ না থাকলে কোনো রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। যিহোবা বেবিলনের ঈশ্বর মারদকের হাতে পরাজিত হলেন, জুদা রাষ্ট্র আর থাকল না। ৮২৩ সালে আরো তিনটি পর্যায়ে নির্বাসন ঘটে, এতে কেবল দিনমজুর, গ্রামবাসী ও চাষীরাই নগরীতে থেকে যেতে পেরেছিল।

নির্বাসিতদের মধ্যে জেরেমিয়া ছিলেন না। সম্ভবত তার বেবিলনিয়ান অবস্থানের কারণে তা হয়নি। একবার বিপর্যয় আঘাত হানার পর মহাপ্রলয়বাদী নবী জেরেমিয়া হন তার জনগণের স্বস্তিদাতা। অচেনা ভূমিতে যিহোবার সেবা করা নিখুঁতভাবে সম্ভব। তিনি প্রবাসে লিখেছিলেন : তাদের উচিত বসতি স্থাপন করা, উদ্যান রচনা করা, বাড়ি নির্মাণ করা, নতুন দেশে জীবন শুরু করা। কেউ আর আর্ক মিস করবে না : এর দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল। কেউ এ নিয়ে চিন্তা করবে না, কেউ অনুশোচনা করবে না, আরেকটি তৈরি করবে না। একদিন প্রবাসীরা জেরুসালেম, জুদার শহরগুলো, উচ্চভূমি, নিম্নভূমি ও নেগেভের আশপাশের জেলায় জমি কিনতে ফিরে আসবে।৪৫ টেম্পলের ধ্বংস যিহোবার শেষ বোঝানো হতে পারত। তিনি নগরীকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, তিনি জায়ন দুর্গ নিরাপদ রাখতে পারেন না। জেরুসালেম সত্যিই একটি জনহীন প্রত্যন্ত ভূমিতে পরিণত হলো। বিশৃঙ্খলার শক্তি বিজয়ী হলো, জায়ন ধর্মমতের প্রতিশ্রুতি মোহতে পরিণত হলো। কিন্তু ধ্বংস সত্ত্বেও জেরুসালেম নগরী ধর্মীয় প্রতীকে পরিণত হয়, ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদের সঞ্চার করে।

নির্বাসন ও প্রত্যাবর্তন

জেরুসালেম ও এর টেম্পল ধ্বংস ছিল কোনো কোনো দুর্জ্ঞেয় ধারণায় দুনিয়ার সমাপ্তি। যিহোবা তার নগরী ছেড়ে চলে গেছেন, জেরুসালেম পরিণত হয়েছে এমন বিরাণ পরিত্যক্ত এলাকায়, সৃষ্টির আগে অবয়বহীন যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে এটি যেমন ছিল। নূহের আমলে পুরো দুনিয়াকে ভাসিয়ে দেওয়া বন্যার মতো এই ধ্বংস ছিল একটি সৃষ্টি বিনাশের কাজ। জেরেমিয়া যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেভাবেই জনমানবহীন এলাকায় এমনকি পাখি পর্যন্ত উড়ত না, মনে হতো অভিশাপে মহাবিশ্বের সব ব্যবস্থাই উল্টে গেছে : সূর্য ও চাঁদ আলো দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, পর্বতগুলো কাঁপছে, দুনিয়ার বুকে একটি লোকও দেখা যাচ্ছে না। কবিরা টেম্পলের আঙিনা দিয়ে ছুটে চলা বেবিলনের সৈন্যদের স্মৃতি এবং সিডার প্যানেলগুলো কুঠার দিয়ে কাটার ভয়াবহ বর্ণনা স্মরণ করেছেন। তারা প্রতিহিংসার জন্য লালায়িত ছিল, স্বপ্ন দেখত পাথরে আঘাত লেগে বেবিলিয়ন শিশুদের মাথা গুঁড়িয়ে দিতে। জুদার লোকজন হাস্যম্পদে পরিণত হয় : অইহুদি জাতিগুলো উপহাস করা অবাক করা কোনো বিষয় ছিল না। তারা বিদ্রূপ করে তাদের কাছে জানতে চাইত, তোমাদের ঈশ্বর কোথায়?' টেম্পল না থাকা মানে প্রাচীন বিশ্বে ঐশী সত্তার সাথে যোগাযোগ করার আর কোনো সম্ভাবনা রইল না। যিহোবা অদৃশ্য হয়ে গেছেন, জেরুসালেম পরিণত হয়েছে জঞ্জালে, ঈশ্বরের লোকজন বিদেশ ভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।

নিকট প্রাচ্যে কোনো নগরী যখন ধ্বংস করা হয়, তখন জীবিতদের জন্য প্রথা ছিল ধ্বংসস্তূপে বসে মৃতদের জন্য শোকগাঁথা গাওয়া। এটি ছিল অনেকটা প্রিয় স্বজনদের অন্তেস্ট্রিক্রিয়ায় সুর করে কাঁদার মতো। জুদা ও ইসরাইলের যেসব অধিবাসী পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা সম্ভবত বছরে দুবার তাদের নগরীর জন্য শোক প্রকাশ করত : একটি ভিল অ্যাভ মাসের নবম দিনে, এটি হতো ধ্বংসের বার্ষিকী উপলক্ষে। অপরটি হতো সুক্কথে, টেম্পলকে উৎসর্গ করে। একটি ঘটনায় আমরা জানি যে উত্তরাঞ্চলীয় শেচেম, শিলোহ ও সামারিয়া থেকে ৮০ ব্যক্তি মাথা কামিয়ে, জীর্ণ পোশাক পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীতে এসেছিল। দি বুক অব লেমেন্টেশন্সে সম্ভবত এসব শোকগাঁথাই সংরক্ষণ

করেছে। শোকগাঁথা গাইত প্রবীণেরা, মাটিতে শোকপ্রকাশ করার ভঙ্গিতে বসে। এসব সময় তারা চটের বস্তা গায়ে দিত, কপালে ছাই মাখত। কবিতাগুলো আমাদেরকে ওই স্থানটির জনমানব শূন্যতার একটি বিষাদময় চিত্র দেয় : যে জনবহুল নগরীর রাস্তাগুলোতে ছিল উপাসকদের ভিড়, এখন সেগুলো কেবলই ফাঁকা চত্বরে পরিণত হয়েছে, প্রাচীরগুলো ভেঙ্গে পড়েছে, বিধ্বস্ত দ্বারগুলোতে শেয়ালের বিচরণ। তবে বিলাপ ছিল বিপর্যয়ের মনোস্তাত্ত্বিক প্রভাব উস্কে দেওয়াও। এর মাধ্যমে বেঁচে থাকা লোকজন নিজেদের ধিক্কার দিত। যারা ৫৮৬ সালে মারা গিয়েছিল, তারা ছিল সৌভাগ্যবান : এখন লোকজন খাবারের খোঁজে আবর্জনায় তাদের নোখ দিয়ে আঁচড় কাটে, কোমল-হৃদয়ের নারীরা তাদের নিজেদের সন্তানদের হত্যা পানিতে ফোটায়, সুদর্শন তরুণেরা অন্ধকার মুখে, কঙ্কলসার দেহে বিধ্বস্ত রাস্তাগুলোতে হাঁটে। সর্বোপরি লজ্জার ভয়াবহ অনুভূতি বিরাজ করছিল। পবিত্র নগরী জেরুসালেম পরিণত হয়েছে অপবিত্রে। যারা এই নগরীর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত ছিল, তারা এখন নিন্দায় ব্যস্ত : 'যখন সে গোংগাতে গোংগাতে নিজের মুখ সরিয়ে নিলো তার পোশাক ছিল রজঃস্রাবের রক্তে রঞ্জিত। হতাশার কথা বলার সময়ও তাদের বিলাপ বেবিলনিয়ানদের দায়ী করার মধ্যেই সীমিত থাকেনি। লেখকেরা জানতেন, ইসরাইলের লোকজনের পাপের কারণে যিহোবা এই নগরী ধ্বংস করেছেন।

জেরুসালেম আর বাসযোগ্য ছিল না। নগরীর দক্ষিণ অংশ এতই ধসে পড়েছিল যে সেখানে থাকার মতো অবস্থা ছিল না। সাবেক জুদা রাজ্যের চরম দক্ষিণের ভূমিটি বিধ্বস্ত করেছিল ইদোমিরা। তারাই পরবর্তীকালে ইদুমিয়া রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। ৫৮৬ সালে পেছনে রয়ে যাওয়া জুদাবাসীর বেশির ভাগই বসবাসের জন্য সামেরিনায় পাড়ি জমায় কিংবা জেরুসালেমের উত্তরে মিজপাহ, গিবেয়ন বা বেথেলে চলে যায়। বেবিলনিয়ানরা রাজা যসিয়ার সচিব গেদালিয়াহকে ওই অঞ্চলের গভর্নর হিসেবে বসায়। মিজপাহে অবস্থিত তার বাসভবন থেকে তিনি কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। যেসব বহিষ্কৃত রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে বেবিলনিয়ানরা ভূমি দান করে দেশটি গড়ার চেষ্টা করেছিল। এসব লোক ছিল জুদার সবচেয়ে গরিব ও সবচেয়ে শোষিত অংশ। কিন্তু জুদার সাবেক রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ৫৮২ সালে পুরনো জেরুসালেমের যেসব অফিসার ট্রান্সর্দানিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন তারা ফিরে এসে

দাউদ পরিবারের সদস্য ইসমাইয়ের নেতৃত্বে দেদালিয়া ও তার কয়েকজন সহকর্মীকে হত্যা করে। এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। কারণ ইসমাইল নিজে তৃণমূলের লোকজনের কাছ থেকে সমর্থন লাভ করেননি। তিনি আম্মনে পালিয়ে যান। বেবিলনের ক্রোধ থেকে রক্ষা পেতে আরো কিছু রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় লোক মিসরে পালিয়ে যায়। আমরা পরবর্তী ৫০ বছর পর্যন্ত জেরুসালেম ও জুদার ভাগ্য সম্পর্কে কিছুই জানতে পারি না।

উচ্ছেদের যন্ত্রণা সত্ত্বেও নির্বাসিতদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ সময় ছিল। বেবিলনে তারা নির্যাতিত হতো না, রাজা জেহোইচিন দরবারে থাকতেন, তিনি তার রাজকীয় পদবি বহাল রেখেছিলেন।' নির্বাসিতরা বেবিলনের 'মহা খাল' চেবারের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় কিছু জায়গা বসতি স্থাপন করে। এই খাল দিয়েই ফোরাত থেকে নগরীতে পানি নিয়ে আসা হতো। তারা সম্ভবত বেবিলনের স্থানগুলোর নাম হিব্রুতে অনুবাদ করেছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তেল আবিব নামে পরিচিত এলাকায় বসবাসকারী লোকজন এর নাম দেয় স্প্রিংটাইম হিল। প্রবাসীরা জেরেমিয়ার উপদেশ অনুসরণ করে বেবিলন সমাজের সাথে ভালোভাবে মিশে যায়। তাদেরকে অবাধে মেলামেশা করা, ভূমি কেনা, ব্যবসা করার অধিকার দেওয়া হয়। অনেকে দ্রুত সমৃদ্ধ ও শ্রদ্ধাভাজন বণিকে পরিণত হয়। কেউ কেউ রাজদরবারে দায়িত্ব লাভ করে। ৭২২ সালে বেবিলনে নির্বাসিতদের বংশধরদের কারো কারো সাথেও সম্ভবত তারা যোগ দিয়েছিল। কারণ বহিষ্কৃতদের একজন বাইবেলে ১০টি উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রের সদস্যদের কথা বলেছেন।

বেবিলন ছিল প্রচণ্ড আঘাত ও চ্যালেঞ্জ উভয়টিই। তারা যেসব নগরী থেকে এসেছিল, সেগুলোর তুলনায় বেবিলন ছিল অনেক বেশি জমকালো ও আধুনিক কসমোপলিটান। ৫৫টি মন্দির-সংবলিত বেবিলন ছিল কেনানের প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মের চেয়ে অনেক বেশি জটিল ধর্মীয় জগত। অবশ্য এর কিছু মিথ বিস্ময়করভাবে একই রকম ছিল। মারদুকের হাতে পরাজিত হয়েছিল যিহোবা। এখন তারা বাস করছে তার ভূখণ্ডে, এতে মনে হয়, নির্বাসিতদের অনেকের স্থানীয় বিশ্বাস গ্রহণ করাটা ছিল সহজাত বিষয়। অন্যরা সম্ভবত বেবিলনের দেব-দেবতাদের উপাসনার পাশাপাশি যিহোবার উপাসনাও করত, তাদের

সন্তানদের শামেশলেদিন (ঈশ্বর) শামেশ বিচার করুন!') বা বেলিয়াদাস ('বেল রক্ষা করুন!') নাম রাখত।

ডিউটারোনোমিস্টরা ইসরাইলিদের প্রতি অনুরোধ করত তাদের সন্তানদের ঐশী নির্দেশনা শিক্ষা দিতে (ডিউটারোনোমি ৬:৭)। টেম্পলটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বেবিলনের নির্বাসনে তারা মুসার বিধানে ঈশ্বরকে খুঁজতে শিখে পবিত্র গ্রন্থকে নতুন দেবালয়ে পরিণত করেছিল।

তবে অন্যরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য আঁকড়ে থাকল।

ডিউটারোনোমিস্টরা ৫৮৬ সালের ট্রাজেডির যৌক্তিকতা অবশ্যই উপলব্ধি করে থাকবে : পুরো সময় তারা সঠিক ছিল। জায়ন অপ্রতিরোধ্য বলে বিশ্বাস করতে জুদাবাসীদের উৎসাহ সৃষ্টিকারী পুরনো কেনানি পুরানতত্ত্ব বাস্তবে ছিল মরীচিকা। এর বদলে তারা মুসার বিধানের প্রতি মনোযোগী হতে ও জেরুসালেমের নাম শোনার আগেই ইসরাইলি জনগণের সাথে যিহোবা যে চুক্তি করেছিলেন, তা অনুসরণ করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিল তারা। ওই বিধান বেবিলনের একীভূত হয়ে নির্বাসিতদের পরিচিতি হারানো রোধ করত। এই সময়কালে নির্বাসিতরা বিধিবিধান সঙ্কলিত ও চর্চা করে, আর সেটিই তাদের পৌত্তলিক প্রতিবেশীদের থেকে তাদের আলাদা করে রাখে। তারা তাদের ছেলে সন্তানদের খতনা করায়, সাবাতের দিন কাজ থেকে বিরত থাকে, বিশেষ খাদ্য নিয়ম গ্রহণ করে যা তাদেরকে চুক্তিবদ্ধ জাতি হিসেবে আলাদা করে। তাদের ঈশ্বরের পার্থক্য ও বিভাজনের আলোকে তারা হবে 'পবিত্র জাতি।

অন্যরা পুরনো পুরানতত্ত্বে স্বস্তি অনুভব করে, মনে করতে থাকে যে জায়নের প্রাচীন প্রতীক ও কাহিনীগুলো আরো ভালোভাবে তাদের পরিবেশের কথা বলে। ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, সঙ্কট ও বড় ধরনের পরিবর্তনের সময় লোকজন বিশ্বাসের অনেক বেশি যৌক্তিক আকারের চেয়ে পুরানের অনুরক্ত হতেই অনেক বেশি প্রস্তুত থাকে। মনোস্তাত্ত্বিক আকারে পুরানতত্ত্ব যৌক্তিক ধারার অনেক বেশি গভীরে প্রবেশ করতে পারে, আমাদের সত্তার দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত বিষাদের অস্পষ্ট কারণকে স্পর্শ করতে পারে। আমাদের যুগে

আমরা দেখেছি, নির্বাসন কেবল ঠিকানা পরিবর্তন নয়, বরং তাতে আরো বড় কিছু সম্পৃক্ত থাকে। এটি আধ্যাত্মিক স্থানান্তরও বটে। বিশ্বে তাদের অনন্য স্থানটি হারিয়ে প্রবাসীরা শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়, হঠাৎ করে অচেনা বিশ্বে হারিয়ে গেছে- এমনটা অনুভব করে। একবার যখন 'বাড়ি'র নির্ধারিত অবস্থানটি চলে যায়, তবে নিজস্বতার মৌলিক অভাবে সবসিছুই তুলনামূলক ও লক্ষ্যহীন মনে হতে থাকে। নিজেদের সংস্কৃতি ও পরিচিতির শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হলে লোকজনের মনে হয়, তাদের প্রাণরস শুকিয়ে গেছে, তারা গৌণ হয়ে পড়েছে। এ কারণে ফরাসি নৃবিজ্ঞানী আর পি ট্রিফলস উল্লেখ করেছেন, গ্যাবন পিগমিরা তাদের পৈত্রিক ভূমি ত্যাগ করার পর তাদের মনে হয়েছিল, পুরো মহাবিশ্ব ঝামেলায় পড়ে গেছে। তাদের স্রষ্টা তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, বিশ্ব পরিণত হয়েছে অন্ধকার স্থানে – রাত ও আবার রাত- এবং তাদের নির্বাসন তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মারও উচ্ছেদ ঘটিয়েছে। তারা এখন দূরে অপ্রবেশ্য স্থানে হারিয়ে গিয়ে স্থায়ীভাবে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

তারা কি নিচে, আত্মারা, তারা কি সেখানে আছে?

তারা কি উৎসর্গ দেখতে পান?

আগামীকাল নগ্ন ও শূন্য।

স্রষ্টার আর আমাদের সাথে নেই

তিনি আর আগুনে আমাদের সাথে বসবেন না।'

আবাসভূমি হারানো মানে জীবনকে একমাত্র সমর্থন জোগানো শক্তি স্বর্গের সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলা। ষষ্ঠ শতকে জুদার নির্বাসিতরা এটিই প্রকাশ করেছে এই বলে যে তাদের বিশ্বের সমাপ্তি ঘটেছে।

যারা যিহোবাবাদের প্রতি অনুগত থেকে গিয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য বহাল রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, তারা মারাত্মক সমস্যায় পড়েছিল। নির্বাসিতদের যখন জিজ্ঞাসা করল, 'অচেনা ভূমিতে আমরা কিভাবে যিহোবার ভজন গাইব?১২ তারা তখন কেবল

তাদের গৃহকাতরতাই প্রকাশ করছিল না, বরং সেইসাথে তাদের ধর্মতাত্ত্বিক দোটানাজনিত সমস্যার কথাও উল্লেখ করেছিল। এখনকার ধর্মীয় লোকজন বিশ্বাস করে, দুনিয়ার যেকোনো জায়গায় তথা মাঠ, সুপারমার্কেট, কিংবা চার্চে- সব স্থানেই তারা তাদের ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। কিন্তু প্রাচীন বিশ্বে আমাদের ধরনের প্রার্থনা মোটেই অভিন্ন ছিল না। নির্বাসনে জুদার লোকজন তাদের হাত উঠিয়ে জেরুসালেমের দিকে মুখ ঘুরিয়ে কোরবানির (তখন দেবতার কাছে যাওয়ার এটিই ছিল স্বাভাবিক পথ) বদলে নিয়মনিষ্ঠভাবে যিহোবার প্রশংসা বা তার প্রতি সনির্বন্ধ আকুতি জানাত। ১৩ এই ধরনের প্রার্থনা ছিল মহৎ ধারণা। তবে তা প্রথম বহিষ্কৃতদের মধ্যে অবধারিতভাবে প্রচলিত হয়নি। নির্বাসিতরা এক্সিয়াল যুগের আরো গভীর আধ্যাত্মিকতা শিখিয়েছিল জুদাবাসীদের। ৫৯৭ সালে নির্বাসিতরা যখন প্রথম বেবিলনিয়ায় পৌছাল, তখন তারা সম্ভবত মনে করেছিল, তাদেরকে যিহোবার উপস্থিতি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার আবাস ছিল জায়নে, তারা তার জন্য বেবিলনে কোনো মন্দির নির্মাণ করতে পারছিল না, যেভাবে আমরা চার্চ, সিনাগগ বা মসজিদ নির্মাণ করি। কারণ ডিউটারোনোমিস্ট আদর্শ অনুযায়ী ইসরাইলের জন্য একটিমাত্র বৈধ উপাসনালয় ছিল, আর তা হলো জেরুসালেম। গ্যাবন পিগমিদের মতো এই নির্বাসিতরাও এই অদ্ভূত নগরীতে তাদের স্রষ্টা তাদের সাথে আছেন কিনা তা ভাবত। এ যাবত কাল পর্যন্ত যিহোবার প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত এই স্থান বা এ ধরনের অন্য কোনো স্থানেই তারা সম্প্রদায়গত প্রার্থনার করত। কিন্তু বেবিলনিয়ার যিহোবাবাদী দর্শন স্থান হিসেবে পরিচিত কোনো জায়গা ছিল না।

তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে যিহোবা তেল আবিবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ৫৯৭ সালে বেবিলনে আগত প্রথম ব্যাচের নির্বাসিতদের মধ্যে ছিলেন পুরোহিত এজেকেল। প্রথম পাঁচ বছর তিনি তার বাড়িতে একাকী অবস্থান করেন, আত্মার সাথে কোনো কথা বলেননি। পরে আক্ষরিকভাবেই যিহোবার অবাক করা স্বপ্ন দেখেন। এটি তাকে পুরো সপ্তাহ বিহ্বল করে রাখে। উত্তর থেকে একটি আলোর মেঘ আসতে দেখেছিলেন তিনি। এর মধ্যেই তিনি চারটি দৈব প্রাণীকে একটি বিশাল চ্যারিয়ট নামাতে দেখেন। এসব প্রাণি বেবিলনের প্রাসাদফটকে মুদ্রিত স্বাগত চিহ্নের মতোই ছিল। এজেকেল এই আবির্ভাব বর্ণনা করার সময় স্বাভাবিক শব্দ ও ধারণা বাইরে বের হওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। তিনি যা

দেখেছিলেন তা ছিল ‘সেই পাত্রের ওপরে সিংহাসনের মতো একটা কিছু একটা... সেই সিংহাসনে মানুষের মতো একজনকে বসে থাকতে দেখেছেন।’ প্রবল ঝড়, আগুন আর প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে এজেকেল জানতেন যে তিনি চোখের পলকে যা দেখেছেন তা ছিল ‘যিহোবার গৌরবের মতো দেখতে কোনো কিছু।’ ১৪ ইসাইয়ার মতো এজেকেলও অস্বাভাবিক বাস্তবতার জ্যোতির্বলয় দেখেছিলেন, যা ছিল টেম্পলের প্রতীকের পেছনে। যিহোবার নশ্বর সিংহাসন আর্ক অব কভেন্যান্ট তখনো জেরুসালেমের টেম্পলে ছিল, তবে তার ‘গৌরব’ বেবিলনে এসে পৌঁছেছে। এটি ছিল সত্যিই ‘প্রকাশ’, একটি উন্মোচনকারী। সোলায়মানের টেম্পলে দেভির থেকে হেখালকে আলাদাকারী মহা পর্দা মানব ধারণার দূরতম সীমার প্রতিনিধিত্ব করত। এখন ওই পর্দা একদিকে টেনে আনা হয়েছে। এজেকেল যদিও যিহোবা ও তার গৌরবের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, কিন্তু তার উপস্থিতির প্রকাশকে মানুষের কাছে বোধ্য পবিত্রতার অনির্বাচনীয় বাস্তবতায় পরিণত করেছিল। এই স্বপ্ন প্রাচীনতর ধর্মতত্ত্বকে নতুন করে গড়ে দিয়েছিল। একেবারে প্রাচীন সময়ে ইসরাইল ঈশ্বরকে চলমান হিসেবে দেখেছিল। তিনি দৈবপ্রাণিদের পাখায় ভর করে সিনাই থেকে কেনানে তার লোকজনের কাছে এসেছিলেন। এখন দৈবপ্রাণি তাকে নির্বাসিত লোকজনের কাছে নিয়ে এসেছে। তিনি টেম্পল বা প্রতিশ্রুত ভূমিতে আবদ্ধ নন, যেমন অনেক পৌত্তলিক ঈশ্বর বিশেষ ভূখণ্ডের সাথেই জড়িত থাকেন।

অধিকন্তু যিহোবা এখনো জেরুসালেমে বসবাসকারী জুদাবাসীদের সাথে না থেকে নির্বাসিতদের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এজেকেল ৫৯২ সালের দিকে এই স্বপ্নাবিভাব দেখেছিলেন। এর ছয় বছর আগে নেবুচাদনেজার নগরীটি ধ্বংস করেছিলেন। তবে পরে এক স্বপ্নাবিভাবে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে জেরুসালেম ধ্বংস হওয়ার কারণ হলো, বিপর্যয়ের প্রান্তে থেকেও জুদাবাসীরা তাদের বাড়ি ফিরে তখনো অন্যান্য দেবতার উপাসনা করছিল এবং যিহোবার সাথে করা তাদের চুক্তির কথা ভুলে গিয়েছিল। একদিন তেল আবিবে নিজের বাড়িতে এজেকেল জুদার নির্বাসিত প্রবীণদের সাথে বসা অবস্থায় ‘প্রভু যিহোবার হাত তার ওপর নেমে এসে তাকে আধ্যাত্মিকভাবে জেরুসালেমে নিয়ে গেল। তাকে টেম্পলে নিয়ে যাওয়া হলো, তিনি সেখানে আতঙ্কিতভাবে দেখলেন, লোকজন ঐশী স্থানগুলোতে বিদেশি ঈশ্বরদের সামনে নত হয়ে আছে। তিনি

বলেন, এসব ‘নোংরা প্রথা’ যিহোবাকে তার আবাস থেকে সরে আসতে বাধ্য করেছে। ইজেকেল দেখতে পান যে ঐশী প্রাণিটি তার পাখা বিস্তার করে বিশাল চ্যারিয়ট-সিংহাসনকে চালাতে শুরু করে, ‘যিহোবার গৌরবকে’ জেরুসালেম নগরীর বাইরে নিয়ে গিয়ে মাউন্ট অব অলিভেসের ওপর দিয়ে নগরীর পূর্ব দিকে অদৃশ্য হয়ে যান যিহোবা। তিনি এর বদলে নির্বাসিত সম্প্রদায়ের সামনে আসার সিদ্ধান্ত নেন। এখন যিহোবা আর জায়নে বাস করছেন না, জেরুসালেমের ধ্বংস এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।*

তবে নবীকে যিহোবা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, একদিন তিনি তার নগরীতে ফিরে যাবেন, মাউন্ট অব অলিভেসের একই পথ ধরে চলবেন, মাউন্ট জায়নে আবার তার আবাস প্রতিষ্ঠা করবেন। তখন নতুন এক্সোডাস হবে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নির্বাসিতদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হবে, নতুন এক সৃষ্টির কারণে বিচ্ছিন্ন পতিত ভূমি ‘ইডেনের উদ্যানের মতো’ স্থানে পরিণত হবে। তখন হবে নিরাময় ও একীভূত হওয়ার সময় : জুদা ও ইসরাইল এক দাউদীয় রাজার অধীনে আবার ঐক্যবদ্ধ হবে, যিহোবা তার লোকজনের মধ্যে বাস করবেন।১৬ এটা হবে বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব ও অনাচারের অবসান এবং লোকজন যে মূল সামগ্রিকতার আকাঙ্ক্ষা করে তাতে প্রত্যাবর্তন। এই স্বপ্নাবিভাবের কেন্দ্রে ছিল জেরুসালেম। নেবুচাদনেজারের নগরীটি ধ্বংস করার প্রায় ১৪ বছর পর এজকেল বা তার অন্য কোনো শিষ্য যিহোবা শ্যাম নামের ‘খুবই উঁচু পর্বতের উপর’ একটি নগরীর স্বপ্নাবিভাব স্বপ্নদর্শন করেন : ‘যিহোবা আছেন সেখানে।’ নগরীটি ছিল নশ্বর স্বর্গ। এই স্থানটি পুরনো ধারণায় শান্তি ও উর্বরতাসম্পন্ন। পানির ধারা যেভাবে ইডেন উদ্যানের মধ্য দিয়ে বয়ে চলে এবং নিচের দিকে প্রবাহিত হয়ে বাকি দুনিয়াকে বলবতী করে তোলে, ইজেকেলও নগরীর টেম্পলের নিচ থেকে একটি নদী বের হয়ে পবিত্র স্থান ও আশপাশে জীবন প্রবাহিত হতে দেখেন। এই নদীর তীরজুড়ে এমন সব গাছ জন্মায় যেগুলোর ‘পাতা কখনো শুকায় না, ফল কখনো ঝরে পড়ে না, এসব ফল খেতে ভালো, পাতার রয়েছে ঔষুধি গুণ। নির্বাসিতরা বিচ্ছিন্নতা ও স্থানচ্যুতির বেদনা বরণ করায় তারা যেখানে ছিল বলে কল্পনা করত, সেখানে ফিরে যাওয়ার প্রাচীন পুরানতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

ইজেকেল কেবল অতীতকেই আঁকড়ে ছিলেন না, তিনি ভবিষ্যতের জন্য নতুন স্বপ্নাবিভাবের অবয়বও গড়ে দেন। তিনি যিহোবা শ্যাম নগরীর কথা ভাবার সময় নতুন একটি ঐশী ভূগোল সৃষ্টি করেছিলেন। নগরীর মাঝখানে থাকা টেম্পলটি ছিল বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত সোলায়মানের টেম্পলের প্রতিকৃতি। এর হলরুম (উলাম), কাল্ট হল (হেখাল) ও অভ্যন্তরীণ পবিত্র স্থান (ডেভির) ঐশী সত্তার বিভিন্ন পর্যায়ের বিভাজনের প্রতিনিধিত্ব করত : প্রতিটি জোন ছিল শেষেরটি থেকে বেশি পবিত্র।১৯ প্রাচীন কালের ধারণা অনুযায়ী ঐশী সত্তা কেবল পর্যায়ক্রমে সামনে আসতে পারে, আর সবাইকে ঐশী সত্তার অভ্যন্তরীণ স্তরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো না। এই ধারণাটি এজেকেলের স্বপ্নাবিভাবের প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়েছিল এবং আদর্শ বিশ্ব নিয়ে তার নতুন মানচিত্রের ভিত্তি হয়েছিল। অবশ্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে টেম্পলটি সোলায়মানেরটির চেয়ে ভিন্ন ছিল। রাজার প্রাসাদটি এখন আর টেম্পলের লাগোয়া ছিল না, টেম্পল ভবনরাজি এখন দুটি প্রাচীরঘেরা অংশে বিভক্ত। ২০ যিহোবার ঐশী সত্তা হয়ে পড়ে না-পাক দুনিয়া থেকে আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্কভাবে বিভক্ত। ঈশ্বর পরিণত হন আরো বেশি পরাবাস্তব বাস্তবতা, দুনিয়াবি অস্তিত্বের বাকি অংশ থেকে চরমভাবে আলাদা (কাদশ)। প্রথম বাইবেল লেখক জে কল্পনা করেছেন যিহোবা বন্ধু হিসেবে ইব্রাহিমের পাশে বসে তার সাথে কথা বলেছেন। কিন্তু এক্সিয়াল যুগের মানুষ ইজেকেলের কাছে ঐশী সত্তা ছিলেন মানুষকে ছাপিয়ে যাওয়া বিপুল রহস্য। ঐশী বাস্তবতার অপরিহার্য 'অন্যত্রতা' হলেও এটি ছিল নারী-পুরুষের বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু এবং তাদের জীবন ও শক্তির উৎস- এমন এক বাস্তবতা যা স্বর্গীয় নদীর মাধ্যমে এজেকেলের দর্শনকে প্রতীকীভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। ইজেকেল এখন প্রতিশ্রুত ভূমিকে এমনভাবে বর্ণনা করেন যা তার আঞ্চলিক ভূগোলের সাথে সম্পর্কহীন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জেরুসালেম নগরীর বিপরীতে যিহোবা শ্যাম ছিল ভূমিটির একেবারে কেন্দ্রে। এটি ছিল ইসরাইল ও জুদার যৌথ রাজ্যের এ যাবতকালের চেয়ে অনেক বড়, উত্তরে পালমিয়ার ও পশ্চিমে মিসরের ব্রুক পর্যন্ত বিস্তৃত।২১ ইজেকেল তার আবাসভূমিকে আক্ষরিকভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেননি, বরং তিনি আধ্যাত্মিক বাস্তবতার একটি চিত্র সৃষ্টি করছিলেন। ঐশী শক্তি যিহোবা শ্যাম থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে কয়েকটি ঘনীভূত বৃত্তে (প্রতিটিই তার উৎস থেকে দূরে যাওয়ার সময় হালকা হচ্ছিল) ইসরাইলের ভূমি ও জনগণের দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। টেম্পলটি ছিল বিশ্বের বাস্তবতার কেন্দ্র, পরের

জোনটি ছিল একে ঘিরে রাখা নগরীটি। নগরী ও টেম্পলের চারপাশে ছিল বিশেষ ক্ষেত্র, যেখানে ছিলেন পবিত্র ব্যক্তিরা তথা রাজা, পুরোহিত ও লেভি গোত্রের লোকজন। এই এলাকটি ছিল ইসরাইলের ১২টি গোত্রের বাকিদের অধিকারে থাকা অবশিষ্ট স্থানের চেয়েও পবিত্র। এই পবিত্র স্থানের বাইরে ছিল বাকি বিশ্ব, তা দখলে ছিল বাকি জাতিগুলোর (গোয়িম)।২২ ঈশ্বর যেমন অন্য সব সত্তা থেকে চরমভাবে আলাদা, ইসরাইল ঠিক তেমনই। ঈশ্বরকে ঘিরে থাকা পবিত্র জাতি অবশ্যই তার পবিত্র বিচ্ছিন্নতার অংশ, পৌত্তলিক দুনিয়া থেকে আলাদা বাস করেন। এই ধরনের জীবনের একটি ছবিই নির্বাসনে থাকা অনেকে বেবিলনে নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।

নশ্বর জেরুসালেমের নক্সা হিসেবে ইজেকেল এই স্বপ্নবিভাবের কথা চিন্তা করেছিলেন কিনা তা আমরা জানি না। এটি ছিল স্পষ্টভাবেই স্বর্গরাজ্য : এই পর্যায়ে নগরী, টেম্পল ও বেশির ভাগ এলাকা ছিল বিধ্বস্ত, আবার এসব নির্মিত হওয়ার কোনো আশা ছিল না। ইজিকেলের মডেলটি ধ্যান করার স্থান হিসেবে নক্সা করা হয়ে থাকতে পারে। তার রহস্যজনক স্বাপ্নিক গাইড যখন তাকে এই নতুন মন্দিরটি প্রদর্শন করেনছিলেন, তিনি তাকে জানাননি কিভাবে পরবর্তী টেম্পলটি নির্মাণ করতে হবে। স্বপ্নাবিভাবটি ছিল আরেকটি বিষয় :

হে মানবসন্তান, ইসরাইল পরিবারকে ওই মন্দির সম্পর্কে বলো। তাহলে যখন তারা ওই মন্দিরের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানবে তখন তারা তাদের পাপ সম্পর্কে লজ্জিত হবে। তারা ওই মন্দিরের নক্সা সম্পর্কে জানুক। জানুক কিভাবে তা গড়া যাবে, প্রবেশদ্বার ও প্রস্থানদ্বার কোথায় সে সব এবং মন্দিরের সব নক্সাই জানিয় দাও। ২৩

তারা নির্বাসনে জেরুসালেমের মতো করে নিজেদের মধ্যে যিহোবাকে নিয়ে বাস করতে চাইলে বলা যায়, জুদাবাসী নির্বাসনকে ঐশী জোনে পরিণত করে নিতে হতো। গোয়িমের সাথে কোনো বিপজ্জনক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে পারবে না, মারদুক ও অন্যান্য ভ্রান্ত ঈশ্বরের সাথে দহরম-মহরম চলবে না। ইসরাইল পরিবারকে অবশ্যই নিজেকে ঈশ্বরের, যিনি তাদের মধ্যে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পরিবার হিসেবে তৈরি করে নিতে হবে। এই আদর্শগত মতালম্বী মানচিত্র নিয়ে গভীর ভাবনার মাধ্যমে ইসরাইলিরা প্রকৃতি ও

পবিত্রতার অর্থ জেনেছিল, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি ও বস্তুর তার স্থান রয়েছে। তাদেরকে অবশ্যই তাদের জীবন ও নতুন চিন্তাধারার একটি কেন্দ্র খুঁজে নিতে হবে। এটি বেবিলনে প্রান্তিক হয়ে পড়া নির্বাসিতদের জন্য সান্ত্বনার কারণ হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে তারা তাদের পৌত্তলিক প্রতিবেশীদের চেয়ে, এমনকি মানচিত্রে না-থাকাদের চেয়ে, অনেক বেশি বাস্তবতার কাছাকাছি আছে। উচ্ছেদ হওয়া লোকজনকে এই নতুন ভাষ্য খুঁজে নিতে হয়েছিল, যেখানে তারা সত্যিই গভীরভাবে অস্বস্তি কাটাতে পারে।

আমরা নির্বাসনের শুরুতে 'প্রিস্টলি রাইটিংস' ('পি') পরীক্ষা করার সময় এই পবিত্র জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছুটা পরিষ্কার ধারণা পাব। পি'র পেন্টাটিউক (বাইবেলের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থ) জুড়ে পি'র বক্তব্য দেখা গেলেও বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয় লেভিটিকাস ও নাম্বার্সে। পি পুরোহিতোচিত দৃষ্টিকোণ থেকে ইসরাইলের ইতিহাস নতুন করে লিখেছিলেন। ইজেকেলের সাথে তার অনেক মিল ছিল। মনে রাখতে হবে, ইজেকেলও ছিলেন পুরোহিত। পি যখন মরুভূমিতে ইসরাইলিদের ঘুরে বেড়ানো ও তাদেরকে মাউন্ট সিনাইয়ে ঈশ্বরের দেওয়া বিধান সঙ্কলিত করার কথা বর্ণনা করেন, তখন তিনি পবিত্রতার ক্রমবিভক্ত জোনের একই ধরনের ধারা কল্পনা করেছিলেন। তাবেরন্যাকলের বুনো এলাকায় ইসরাইলি শিবিরের কেন্দ্রে ছিল আর্ক অব কভেন্যান্ট ও যিহোবার 'গৌরব' ধারণ করা তাঁবু মন্দির। এটি ছিল পবিত্রতম এলাকা এবং সর্বোচ্চ পুরোহিত হারুনেরই কেবল 'হলি অব হলিসে' প্রবেশ করার অনুমতি ছিল। শিবিরটিও ছিল পবিত্র। এর মধ্যে ঐশী 'উপস্থিতি' থাকায় একে সব ধরনের দূষণ থেকেও শুদ্ধ রাখতে হতো। শিবিরের বাইরে ছিল মরুভূমির ঈশ্বরহীন এলাকা। পিও যিহোবাকে চলমান ঈশ্বর হিসেবে দেখেছিলেন। বহনযোগ্য মন্দিরে তিনি অব্যাহতভাবে তার লোকজনের সাথে চলতেন। জেরুসালেমের কথা একবারও উল্লেখ করেননি পি। এর আংশিক কারণ ইসরাইলিরা প্রতিশ্রুতি ভূমিতে প্রবেশের কিছুটা আগে এবং রাজা দাউদের নগরীটি দখলের অনেক আগে তার লেখা শেষ হয়েছে। তবে ডিউটারোনোমিস্টদের বিপরীতে পি সম্ভবত যিহোবা তার নাম জুড়ে দেবেন, এমন বিশেষ 'স্থান' কল্পনায় দেখতে পাননি। পি'র স্বপ্নাবিভাবে যিহোবার কোনো নির্দিষ্ট আবাস ছিল না : 'তার 'গৌরব' যাওয়া আসা করে, আর তার 'স্থান' হয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। পির মতে, যিহোবা যখন ইসরাইলে বাস করতে আসেন, তখনই তারা একটি

জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, সঙ্গে থাকা এই 'উপস্থিতি' বিধানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ : তিনি তাওরাত নাজিল করার সময়েই যিহোবাকে তার বহনযোগ্য ট্যাবারন্যাকলকে মাউন্ট সিনাইয়ে মুসার কাছে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এখানেও ছিল পি'র দুর্ভোগের মধ্যেও স্বস্তিদায়ক স্বপ্নাবিভাস : এটি নির্বাসিতদের এই আশ্বাস দেয় যে তারা যেখানেই যাক না কেন, এমনকি নির্বাসনে গেলেও, যিহোবা তাদের মধ্যেই আছেন। তিনি কি ইতোমধ্যেই সিনাইয়ের নিস্ফলা নির্জন এলাকায় তাদের সাথে চলে আসেননি?

জেরুসালেমের পুরোহিতদের সম্ভবত সবসময়ই তাদের নিজস্ব গুপ্ত বিধান ছিল : পির ইতিহাস বর্ণনা ছিল এটি জনপ্রিয় করার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস। কারণ তাদের পুরনো বিশ্ব নেবুচাদনেজারের হাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় নির্বাসিতদেরকে নতুন আরেকটি দুনিয়া নির্মাণ করতে হচ্ছিল। পির স্বপ্নাবিভাবের কেন্দ্রে ছিল সৃষ্টি, তবে তিনি পুরনো যুদ্ধ মিথ আবার সামনে নিয়ে আসেন। এটি মন্দিরগুলোর সাথে প্রবলভাবে সম্পৃক্ত ও ঐশী সত্তার স্থানগুলোর সাথে যুক্ত ছিল। এসব কাহিনীর নির্যাসের দিকে মনোনিবেশন করার বদলে তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলাকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ে পির সৃষ্টি ভাষ্যে যিহোবা সমুদ্র দানব লেভিয়াথানের সাথে প্রাণঘাতী যুদ্ধ ছাড়াই বিশ্বকে নিয়ে এসেছিলেন। এর বদলে তিনি সৃষ্টির আদি অবস্থায় অনেক থেকে একটি উপাদানকে শান্তিপূর্ণভাবে আলাদা করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি দিন থেকে রাতকে, অন্ধকার থেকে আলোকে, শুষ্ক ভূমি থেকে সাগরকে আলাদা করেছিলেন। সীমারেখা টেনে মহাবিশ্বের প্রতিটি উপাদানকে তার নির্দিষ্ট স্থান প্রদান করা হয়। একই ধরনের বিভাজন ও সৃষ্টিব্যবস্থা পি'র বর্ণনায় তাওরাতে পাওয়া যায়। গোশত থেকে দুধকে কিংবা সপ্তাহের বাকি দিনগুলো থেকে সাবাথকে আলাদা করার জন্য ইসরাইলিদের যখন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন তারা সময়ের শুরুতে যিহোবার সৃষ্টিশীল পদক্ষেপের অনুকরণ করছিল। এটি ছিল নতুন ধরনের শাস্ত্রাচার ও ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি। এই ধারণায় টেম্পল বা দীর্ঘ ভজনের দরকার হয় না। বরং নারী ও পুরুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে অকাল্পনিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই তা করতে পারে। ঐশী সৃষ্টিশীলতার শাস্ত্রীয় পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তারা নতুন একটি দুনিয়া নির্মাণ করছিল,

নির্বাসিত জীবনে তাদের বিচ্ছিন্নতা ও আলাদা হয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে শৃঙ্খলায় আনতে চেয়েছিল।

অনেক কম্যান্ডমেন্ট (মিতজভোথ) তাদের সঠিক পথে রাখার সাথে সম্পর্কিত। নৃতত্ত্ববিদ মেরি ডগলাস দেখিয়েছেন, পুরোহিতদের কোডে 'অচ্ছুত' তকমা লাগানো সত্তা ও বস্তুগুলো তাদের যথাযথ শ্রেণি থেকে বের হয়ে এসেছে, তাদের নিজস্ব নয়, এমন এলাকাকে আক্রান্ত করেছে। 'নোংরা' হলো ভুল স্থানে রাখা কিছু জিনিস। এগুলো যিহোবার মন্দিরের কোনো অচেনা ঈশ্বর হতে পারে বা পোশাকে ছত্রাক হতে পারে, এমন কিছুও হতে পারে যা প্রকৃতির দুনিয়ায় ফেলে রাখা হয়েছে এবং মানুষের রাজ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। সবকিছুর মধ্যে মৃত্যু হলো সবচেয়ে বড় অশুদ্ধতা। কারণ এটি সংস্কৃতি ও বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবস্থাপনা করতে আমাদের অক্ষমতার কথাই সবচেয়ে নাটকীয়ভাবে মনে করিয়ে দেয়। ২৪ সুবিন্যস্ত মহাবিশ্বে বসবাস করার মাধ্যমে ইসরাইলিরা ইজেকেলের কল্পনায় থাকা এক দুনিয়া নির্মাণ করেছিল। এই দুনিয়ায় তাদের কেন্দ্রে অবস্থান করেন ঈশ্বর। টেম্পল জেরুসালেমে দাঁড়িয়ে থাকলেও এটি তাদেরকে পবিত্রতায় প্রবেশের সুযোগ দেয়। যিহোবার স্বর্গীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তার সাথে আদম ও হাওয়া যেমন ঘনিষ্ঠতা উপভোগ করতেন, এখন মিতজভোকও তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো। মিতজভোথের মাধ্যমে নির্বাসিত জুদাবাসীরা নতুন একটি পবিত্র স্থান সৃষ্টি করতে পেরেছিল, যা বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার ব্যতিক্রমকে দূরে রাখে। তবে পি স্রেফ শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তার হলিনেস কোড ছিল অন্যান্য মানুষের প্রতি আচরণের সাথে সম্পর্কিত মিতজভোথের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রার্থনার বিধান ও পবিত্র ভূমিতে কৃষির পাশাপাশি নিম্নোক্ত ধরনের কঠোর নির্দেশও ছিল :

তোমরা অবশ্যই চুরি করবে না। তোমরা অবশ্যই লোকদের ঠকাবে না...

বিচারের ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই পক্ষপাতহীন হবে। তোমরা অবশ্যই গরিব মানুষের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাবে না। এবং তোমরা অবশ্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ লোকদেরও বিশেষ সম্মান দেখাবে না...

তোমরা তোমাদের ভাইকে অবশ্যই মনে মনে ঘৃণা করবে না। যদি তোমাদের প্রতিবেশী ভুল করে, তাহলে তার সাথে সে বিষয়ে কথা করো, কিন্তু তাকে ক্ষমা করো; তাহলে তুমি তার দোষের ভাগীদার হবে না। তোমার প্রতি লোকেরা খারাপ ইসরাইলে কিছু করেছে, তা ভুলে যেও; প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করো না। তোমাদের প্রতিবেশীকে নিজেদের মতো করে ভালোবাসো। ২৫

তোমাদের দেশে বাস করা বিদেশীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করবে না। তোমাদের নিজেদের নাগরিকদের মতোই বিদেশীদের প্রতি সমান ব্যবহার করবে। তোমাদের নিজেদের যেমন ভালোবাসো, বিদেশীদের তেমনি ভালোবাসবে। কারণ, একসময় তোমরা মিসরে বিদেশী ছিলেন। ২৬

সামাজিক ন্যায়বিচার সবসময়ই পবিত্র স্থানের প্রতি নিবেদন ও মন্দির শাস্ত্রাচারের সহগামী। শাস্ত্রাচারের মধ্যে ছিল কেনানি মিথ, জায়ন মতবাদ ও নবীদের দৈববাণী। পি আরো বলেন : কেবল ন্যায়বিচার নয়, ভালোবাসাও থাকতে হবে এবং এই সমবেদনা অবশ্যই ইসরাইল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন লোকদের পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে হবে। গোয়িম হয়তো পবিত্রতার ইজেকেলের মানচিত্রে ছিল না, কিন্তু তারা অবশ্যই ইসরাইলের ভালোবাসা ও সামাজিক বিষয়াদির চৌহদ্দির মধ্যেই ছিল।

নির্বাসনে টেম্পলের স্মৃতি আদর্শে পরিণত হয়ে হওয়ায় পুরোহিতেরা নতুন মর্যাদা লাভ করেন। পি ও ইজেকিল উভয়ে সমাজে পুরোহিতদের ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। শুরুতে ইসরাইলে পুরোহিত শ্রেণির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। দাউদ ও সোলায়মান উভয়েই পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতেন। তবে ধীরে ধীরে টেম্পলের আচার-অনুষ্ঠান ও বিধানের ব্যাখ্যার দায়িত্ব লেভি গোত্রের ওপর বর্তেছিল। তারা যাযাবর জীবনে আর্ককে বহন করত বলে ধারণা করা হয়। ইজেকিল এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। লেভিরা টেম্পলে মূর্তি পূজার বিষয়টি পরোক্ষভাবে অনুমোদন করেছিল বলে তাদের সহায়তাকারী ভূমিকায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর থেকে তারা নতুন টেম্পলে কেবল নীচ কায়িক শ্রমের দায়িত্ব পালন করবে। যেমন উৎসর্গের জন্য পশু প্রস্তুত করা, ভজনদলের সদস্যদের সঙ্গ দেওয়া, টেম্পল ফটকে নজরদারি করা। কেবল যেসব

পুরোহিত সরাসরি জাদকের বংশধর, তাদেরকেই টেম্পল ভবনে প্রবেশ করে প্রার্থনাবিধি অনুসরণ করার অনুমতি দেওয়া হয়।২৭ এই বিধিনিষেধ জেরুসালেমে ভবিষ্যতের অনেক বিরোধের কারণ হয়েছিল। আর কঠোর বাস্তবতা হলো, ইসরাইলের বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহ্য অনুসরণ করা হচ্ছিল জাদকের পরিবার জেবুসিতদের মাধ্যমে। পুরোহিত্বের আরো বর্জনশীল প্রকৃতিতে ঈশ্বরের অধিকতর সীমা ছাড়ানো অবস্থানকে প্রতিফলিত করছিল। এতে ঈশ্বরের ঐশী সত্তা ছিল অনভিজ্ঞ ও অবচেতনদের জন্য আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক। পি ও ইজেকিল উভয়েই যিহোবার আশ্রমে পুরোহিতদের আচরণ-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নির্দেশনা দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হেখালে প্রবেশ করার সময় অবশ্যই তাদের পোশাক বদল করতে হতো। কারণ তারা এমন এক পবিত্র এলাকায় যাচ্ছে, যেখানে সর্বোচ্চ মাত্রার শুদ্ধতার প্রয়োজন। দেভিরে কেবল উচ্চ পুরোহিতের প্রবেশাধিকার ছিল, তা হতো বছরে মাত্র একবার। ২৮ নতুন বিধিবিধান ইসরাইলিদের যিহোবার ঐশী সত্তার অনুভূতি বাড়িয়ে দিয়েছিল। এখন তিনি অন্য সব সত্তার থেকে আলাদা, সেইসাথে তার সামনে যাওয়া সম্ভব নয়।

অবাক করা বিষয় হলো, পবিত্রতার এসব বিস্তারিত বর্ণনা, এর স্তোতবাক্য ও পুরোহিত্ব এমন এক সময় বিবর্তিত হচ্ছিল, যখন সেগুলো বাস্তবায়নের কোনো আশাই ছিল না। টেম্পলটি বিধ্বস্ত থাকলেও সবচেয়ে সৃষ্টিশীল নির্বাসিতরা একে পুরোপুরি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে কল্পনা করেছিল, একে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি জটিল সংস্থার পরিকল্পনা করেছিল। ৮ম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাবো, রাব্বিরা ঠিক একই কাজ করেছেন। ফলে জেরুসালেমের ঐশী স্থান ও পবিত্রতা নিয়ে লেখা সবচেয়ে বিস্তারিত ইহুদি গ্রন্থগুলো এমন পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছে, যার লেখার সময় কোনো অস্তিত্ব ছিল না। নির্বাসিত জুদাবাসীদের জন্য ‘জেরুসালেম’ অন্তরে থাকা মূল্যবোধে পরিণত হয়েছিল। এটি হয়েছিল মুক্তির ছবি যা জুদার বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের ভৌত নগরী থেকে অনেক দূরেও অর্জন করা সম্ভব ছিল। প্রায় একইসময় ভারতবর্ষে সিদ্ধার্থ গৌতম, বুদ্ধ নামে পরিচিত, আবিষ্কার করেন যে ধ্যান ও সমবেদনা অনুশীলনের মাধ্যমে চূড়ান্ত বাস্তবতায় প্রবেশ করা সম্ভব : এই আধ্যাত্মিক মাত্রা অর্জনের জন্য মন্দির বা অন্য কোনো ঐশী স্থানে যাওয়ার দরকার নেই। এক্সিয়াল যুগের আধ্যাত্মিকতায় অনেক সময় ঐশী সত্তাকে তার নিজের

গভীরে রেখে প্রতীকী ও অভিজ্ঞতা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। ইজেকিল ও পির লেখালেখি নিয়ে তাদের সমসাময়িকদের ধারণা কী ছিল, সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, তারা আশা করেছিলেন, একদিন টেম্পলটি আবার নির্মাণ করা হবে, তাদের সামনে জেরুসালেম আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। তবে যা সত্য রয়ে গেছে তা হলো, সবশেষে নির্বাসিতদেরকে যখন জেরুসালেমে ফেরার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তখন তাদের বেশির ভাগই বেবিলনে থেকে গিয়েছিল। তারা মনে করেনি যে জেরুসালেমে তাদের শারীরিক উপস্থিতি প্রয়োজনীয়, কারণ তারা জায়নের মূল্যবোধ উপলব্ধি করতে শিখেছিল। জুদাজম বা ইহুদি ধর্ম হিসেবে আমরা যে বিশ্বাসটিকে জানি সেটি জুদাতে নয়, বরং প্রবাসে সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা নেহেমিয়া, ইজরা ও হিলেলের মতো দূতের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল।

ইজেকিল ও পি তাদের ধর্মের নশ্বর প্রতীকগুলোর ঊর্ধ্বে ওঠে তাদের দেখানো শ্বাশত বাস্তবতার দিকে তাকাতে পেরেছিলেন। তাদের কেউ তাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নাবিভাবে সরাসরি জেরুসালেমের কথা উল্লেখ করেননি। আর পি তার বর্ণনার শেষ করেছেন প্রতিশ্রুতি ভূমির দ্বারপ্রান্তে গিয়ে। তাদের স্বপ্নাবিভাব ছিল অনিবার্যভাবে কল্পরাজ্যের এবং তারা আশা করেননি যে তা তাদের জীবদ্দশায় পূরণ করা হবে। জেরুসালেমের প্রতি তাদের মনোভাব সম্ভবত ছিল আজকের পাসওভার ভোজে আগামী বছর জেরুসালেমে!' শব্দগুলো ব্যবহারের মতোই, তারা সবসময় ভবিষ্যতের মেসিয়ানিক যুগের কথা বলত, তবে তা দিয়ে নশ্বর নগরী বোঝাত না। ইজেকিল জায়নে প্রত্যাবর্তনের কল্পনা করার সময় আধ্যাত্মিক রূপান্তরের দিকে তাকিয়েছেন : যিহোবা তার জাতিকে 'একটি নতুন হৃদয়' ও 'একটি নতুন আত্মা' দেবেন। এ দিকে থেকে জেরেমিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে একসময় বিধান আর পাথরের টেবলেটে মুদ্রিত থাকবে না, বরং মানুষের হৃদয়ে গ্রন্থিত থাকবে।২৯ পরিত্রাণের অপেক্ষায় নতুন ইহুদি ধর্মের স্থপতিরা বিশ্বাস করতেন না যে একদিন কেবল রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। তারা বুঝেছিলেন, পরিত্রাণ মানে একটি নতুন টেম্পল ও একটি নতুন নগরীর চেয়ে বেশি : এসব হতে পারে আরো অনেক গভীর স্বাধীনতার প্রতীক।

অবশ্য হঠাৎ মনে হয়েছিল যে রাজনৈতিক মুক্তি ছিল হাতের নাগালে। সত্যিই ধারণা সৃষ্টি হচ্ছিল, জুদাবাসীদের পক্ষে তাদের পিতৃপুরুষদের ভূমিতে ফিরে গিয়ে জেরুসালেম আবার নির্মাণ করা সম্ভব। বেবিলনের লোকজন ক্রমবর্ধমান হারে নেবুচাদনেজারের উত্তরসূরি রাজা ন্যাবোনিদাসের শাসনের প্রতি মোহমুক্তি ঘটেছিল। তারা গভীর আগ্রহ নিয়ে পারস্যের তরুণ রাজা দ্বিতীয় সাইরাসের ক্যারিয়ার প্রত্যক্ষ করছিল। ৫৫০ সালে মিডিয়া রাজ্য জয় করার পর থেকে তিনি নিজের জন্য বিশাল সাম্রাজ্য গড়ছিলেন। ৫৪১ সাল নাগাদ বেবিলন পুরোপুরি সাইরাসের ভূখণ্ডে ঘেরাও হয়ে পড়েছিল। মারদুকের পুরোহিতেরা বিশেষভাবে সাইরাসের প্রপাগান্ডায় মোহিত হয়ে পড়েছিল। কারণ তাদের মনে হচ্ছিল, ন্যাবোনিদাস তাদের ধর্মমতকে অবহেলা করেছিলেন। অন্যদিকে সাইরাস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি সাম্রাজ্যের মন্দিরগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন, দেবতাদের সম্মান করবেন। তিনি বিধ্বস্ত নগরীগুলো পুনঃনির্মাণ করবেন, তার সাম্রাজ্যে সার্বজনীন শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। এই বার্তা নামহীন জুদাবাসী নবীরও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি সাধারণভাবে দ্বিতীয় ইসাইয়া নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সাইরাসকে মেসাইয়া হিসেবে অভিহিত করেছিলেন : জেরুসালেম ও এর টেম্পল পুনঃনির্মাণের বিশেষ দায়িত্বের জন্য তিনি যিহোবাকে তেলসিক্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় ইসাইয়া সহজাতভাবে পুরনো মিথ ও জায়নের প্রার্থনাবিধির আশ্রয় নেন। সাইরাসকে তার হাতিয়ার করে যিহোবা নুতন সৃষ্টি ও নতুন গমনের সূচনা করবেন। তিনি যেভাবে একবার লেভিথান ও রাহাবের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন, এবার তিনি ইসরাইলের বর্তমান শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়ী হবেন। আর জুদার নির্বাসিতরা মরুভূমি (এটি তার দানবীয় শক্তি হারিয়ে ফেলেছে) দিয়ে জায়নে ফিরবে। ৩০

এই প্রত্যাবর্তন পুরো মানবজাতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল : নির্বাসিতদের ফেরা হবে নতুন বিশ্বব্যবস্থার জন্য পথিকৃত। জেরুসালেমে ফিরেই তারা টেম্পল পুনঃনির্মাণ করবে, যিহোবার 'গৌরব' এর পবিত্র পর্বতে ফিরে আসবে। আবারো বলা যায়, যিহোবা 'সব জাতির দৃষ্টির সামনে' তার নিজের নগরীতে আসন গ্রহণ করবেন।৩১ জেরুসালেম প্রার্থনাবিধি দীর্ঘ দিন আগেই ঘোষণা করা হয়েছে, যিহোবা কেবল ইসরাইলের রাজা নন, বরং তিনি পুরো বিশ্বের সম্রাট। এখন সাইরাসের বদৌলতে এটি প্রদর্শনযোগ্য বাস্তবতায় পরিণত হতে যাচ্ছে। অন্যান্য দেবতা আতঙ্কে কাঁপতে লাগল : বেবিলনের গুরুত্বপূর্ণ দুই

দেবতা বেল ও নেবো ভীত-সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়ল, তাদের মূর্তিগুলো বোঝা বহনকারী সাধারণ পশুর পিঠে করে অপমানজনকভাবে সরিয়ে ফেলা হলো। ৩২ যেসব বিদেশী ঈশ্বর যিহোবার ওপর প্রভুত্ব করেছে বলে মনে হয়েছে, তাদের অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করা হলো। এর পর থেকে বিশ্বের সকল জাতির তথা মিসর, কুশ, শেবাকে ইসরাইলের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করা হবে, তাদের শৃঙ্খলিত করে জেরুসালেমে এনে বলতে বাধ্য করা হবে যে :

একমাত্র তুমিই ঈশ্বর, তোমার আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই : আর কোনো ঈশ্বর নেই। ৩৩

জায়ন প্রার্থনাবিধি সবসময়ই জোর দিয়ে বলে যে যিহোবাই গণ্য হওয়ার মতো একমাত্র ঈশ্বর; দ্বিতীয় যিহোবার অন্তঃদৃষ্টি সন্দেহাতীত একেশ্বরবাদের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। এই বিশ্বজয়ের অবস্থা সৃষ্টির জন্য জেরুসালেম আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি গৌরবময় হবে। এটি মূল্যবান পাথরে সাজবে : প্রাচীরে পদ্মরাগমণি, দরজায় ক্রিস্টাল থাকবে, নগর-প্রাচীরগুলোতে লাগানো হবে রত্নপাথর- নগরীর মধ্যে অখণ্ডতা ও পবিত্রতা প্রদর্শন করবে এগুলো। ৩৪

এসব স্বপ্ন বাস্তবায়নের এক ধাপ সামনে অগ্রসর হওয়ার ঘটনা ঘটে ৫৩৯ সালের শরতে। ওই সময় ফোরত নদীর অপিসে বেবিলন বাহিনীকে পরাজিত কর সাইরাসের সেনাবাহিনী। এক মাস পর বেবিলনে প্রবেশ করেন সাইরাস। মারদুকের প্রতিনিধি হিসেবে ইসাগিল টেম্পলে বরণ করে নেওয়া হয় তাকে। সাথে সাথেই তিনি তার ঘোষিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেন। ৫৩৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আগস্টের মধ্যে বেবিলনদের হাতে আটক সব আসারিয়ান ঈশ্বরকে তাদের আদি নগরীতে ফেরত পাঠানো হয়, মন্দিরগুলো নতুন করে নির্মিত হয়। একইসময় সাইরাস এক ডিক্রি জারি করে বললেন যে জেরুসালেমের টেম্পল আবার নির্মিত হবে, নৌকা ও ধর্মীয় আসবাবপত্রগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। সাইরাসের পারস্য সাম্রাজ্য আসারিয়া ও বেবিলনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় পরিচালিত হয়েছিল। অনেক কম ব্যয়ে ও অনেক বেশি কার্যকর হওয়ায় তিনি তার প্রজাদের কিছু স্বায়াত্তশাসন দিয়েছিলেন : এর ফলে কম ক্ষোভ ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়েছিল। যেকোনো রাজার জন্যই ঈশ্বরদের জন্য মন্দির পুনঃনির্মাণ একটি প্রধান কর্তব্য।

সাইরাস সম্ভবত বিশ্বাস করতেন যে তাকে কেবল তার প্রজাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন না, সেইসাথে ঐশী আনুকূল্যও পাবেন।

তিনি ওই বিশ্বাস অনুযায়ী বেবিলনে অভিষেকের কয়েক মাস পর জেরুসালেম থেকে নেবুচাদনেজারের জব্দ করা স্বর্ণ ও রৌপ্যের নৌকাগুলো জুদার জনৈক 'প্রিন্স' (নাসি) শেশবাজারের কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি ৪২,৩৬০ জন জুদাবাসী ও তাদের চাকব-বাকর, দুই শত গায়ক নিয়ে জেরুসালেমের উদ্দেশে রওনা হন। ৩৫ প্রত্যাবর্তনকারী নির্বাসিতরা যদি দ্বিতীয় ইসাইয়া তাদের কানে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেগুলো নিয়ে বেবিলন ত্যাগ করে থাকেন, তবে তারা জুদায় আগনের অল্প সময়ের মধ্যেই কঠোর বাস্তবতায় ফিরে এসেছিলেন। তাদের বেশির ভাগই প্রবাসে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং বেড়ে ওঠেছিল বেবিলনের জাঁকজমক আধুনিকতার মধ্যে। জুদা তাদের কাছে অবশ্যই নিরানন্দ, অপরিচিত স্থান মনে হয়েছিল। সাথে সাথে নতুন টেম্পল নির্মাণ করার প্রশ্নই ছিল না। বিধ্বস্ত স্থানে একটি বিশ্বাসযোগ্য সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা ছিল প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রথম কাজ। তাদের খুব কমই জেরুসালেমে অবস্থান করেছিলেন। স্থানটি তখনো ছিল বিধ্বস্ত। ফলে তাদের বেশির ভাগই জুদা ও সামেরিনার মতো অপেক্ষাকৃত স্বস্তিদায়ক স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল। যারা থেকে গিয়েছিল, তারা সম্ভবত পুরনো নগরীতে বসতি স্থাপন করেছিল, অন্যরা জেরুসালেমের দক্ষিণের গ্রামীণ এলাকায় বাস করতে থাকে। এ স্থানটি ৫৮৬ সাল থেকে বসতিহীন ছিল।

আমরা নির্বাসিত সম্প্রদায় 'গোলা সম্পর্কে পারস্যের রাজা দারিয়াসের রাজত্বের দ্বিতীয় বছর ৫২০ সালের আগে পর্যন্ত কিছুই শুনতে পাই না। এই সময় নাগাদ শেশবাজার আর জুদার গোলার দায়িত্বে ছিলেন না। তার কী হয়েছিল, সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই। ভবন নির্মাণের কাজে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছিল। তবে দারিয়াসের অভিষেক অল্প পর রাজা হেহোয়াচিনের নাতি জেরুবাবেল পুরনো টেম্পলের শেষ প্রধান পুরোহিতের নাতি যশুয়াকে নিয়ে বেবিলনে ফিরে এলে টেম্পল নির্মাণের ব্যাপারে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। জেরুবাবেল জুদা প্রদেশের হাই কমিশনার (পেহা) নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন পারস্য সরকারের প্রতিনিধি, তবে সেইসাথে দাউদ পরিবারের বংশধর। এটি গোলায় নতুন হৃদয়

দান করে। পুরনোটির স্থানে নতুন একটি বেদী নির্মাণের জন্য সব অভিবাসী জেরুসালেমে সমবেত হয়। কাজ শেষ হলে তারা বলি দিতে শুরু করে, সেখানে ঐতিহ্যবাহী উৎসবও পালন করতে থাকে। কিন্তু তারপর আবার নির্মাণকাজে স্থবিরতা নেমে আসে। জেরুসালেমে জীবন তখনো ছিল সংগ্রামমুখর : ফসল উৎপাদন পর্যাপ্ত হয়নি, অর্থনীতির অবস্থা ছিল শোচনীয়। ফলে যখন পর্যাপ্ত খাবারও থাকে না, তখন টেম্পল সম্পর্কে উৎসাহিত হওয়া কঠিন। তবে ৫২০ সালের আগস্টে নবী হ্যাগাই অভিবাসীদের বলেন, তাদের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সবকিছুই ছিল ভুল। টেম্পল নির্মাণ করার কাজ শেষ না হরে ফসল তো ভালো হবে না : যিহোবার আবাস সবসময়ই প্রতিশ্রুত ভূমির উর্বরতার উৎস। নিজেদের জন্য বাড়িঘর নির্মাণ করে যিহোবার আবাসকে বিধ্বস্ত অবস্থায় রেখে তারা কী বোঝাতে চাইছে?৩৬ এতে গতির সঞ্চার হলো, গোলা কাজে ফিরে গেল।

দ্বিতীয় টেম্পলের ভিত্তি অবশেষে স্থাপন করা হলো ৫২০ সালের শরতে। সুকুতের উৎসবে তারা আবার বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। পুরোহিতেরা ঐশী এলাকায় গেলেন, তাদের অনুসরণ করল লেভিরা, তারা সাম পাঠ করছিল, করতাল বাজাচ্ছিল। তবে কিছু লোকের মনে সোলায়মানের জাঁকজমকপূর্ণ টেম্পলের স্মৃতি জাগুগুক ছিল। ফলে সেটির বদলে বর্তমানটির সাদামাটা অবয়ব দেখে তারা কান্নায় ভেঙে পড়ল।৩৭ একেবারে শুরুতে দ্বিতীয় টেম্পল ছিল একটি হতাশা, অনেকের কাছে অ্যান্টিক্লাইমেক্স। মনোবল চাঙ্গা করার চেষ্টা করেছিলেন হ্যাগাই : তিনি তাদের আশ্বাস দেন যে দ্বিতীয় টেম্পলটি পুরনোটির চেয়েও বড় হবে। দ্বিতীয় ইসাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, শিগগিরই যিহোবা দুনিয়া শাসন করবেন। জেরুবাবেল হবেন মেসাইয়া, যিহোবার পক্ষ থেকে পুরো গোয়িম শাসন করবেন।৩৮ হ্যাগাইয়ের সহকর্মী জেচরিয়া এর সাথে একমত হন। তিনি সেই দিনের প্রতীক্ষায় রইলেন যখন জায়নে বাস করার জন্য যিহোবা ফিরে আসবেন, দুই মেসাইয়ার- রাজা জেরুবাবেল ও পুরোহিত যশুয়ার মাধ্যমে তার শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন। জেরুসালেমের প্রাচীরগুলো পুনঃনির্মাণ না করাটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যে যে বিপুলসংখ্যক লোক সেখানে বাস করতে এসেছিল, তাদের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। ৩৯

তবে সবাই একটি উন্মুক্ত নগরীর এই স্বপ্নাবিভাবের সাথে একমত হয়নি। অল্প সময়ের মধ্যেই পুরনো ইসরাইলের উত্তরাঞ্চীয় রাজ্য সামেরিনার লোকজন দেখতে পায়, যিহোবার নতুন টেম্পল নির্মাণকাজ প্রবলভাবে হচ্ছে। তারা জেরুবাবেলের কাছে গিয়ে তাদেরকে কাজ করার সুযোগ দিতে বলে। ইতিহাসলেখক আমাদের বলছেন যে তারা ছিল বিদেশীদের বংশধর। এসব লোক ৭২২ সালে আসারীয়দের মাধ্যমে সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের অনেকে ইসরাইলিও ছিল, ১০ উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রের সদস্য, অন্যরা ছিল জুদাবাসী। ৫৮৬ সালে পেছনে রয়ে যাওয়া লোকদের সন্তান ছিল তারা। সহজাত কারণেই যিহোবাবাদীরা জায়ন পুনর্গঠনে সহযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। জেরুবাবেল অবশ্য মুখের ওপর না করে দিয়েছিলেন। কেবল গোলাই 'আসল' ইসরাইল। সাইরাস কেবল তাদেরকেই টেম্পল পুনঃনির্মাণের দায়িত্ব দিয়েছেন। ফলে এই অন্য যিহোবাবাদীরা ভাই নয়, বরং শত্রু হিসেবে বিবেচিত। সম্মিলিতভাবে তারা আম হা-আরেতজ বা 'ভূমিপুত্র' হিসেবে পরিচিত ছিল। বেবিলনে ইজেকিল ও পি ১২টি গোত্রের সবাইকেই ইসরাইলের সদস্য বিবেচনা করে পবিত্রতার অধিকারী মনে করেছেন। কেবল পৌত্তলিক জাতি গোয়িমকে ঐশী এলাকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাবর্তনকারী নির্বাসিতদের মধ্যে আরো সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করছিল। আম হা-আরেজরা 'আগন্তুক' বিবেচিত হলো। নির্বাসিতরা তাদেরকে হলিনেস কোডে থাকা ব্যবস্থার মতো করে তাদের নগরীতে তাদেরকে স্বাগত জানাল না। পরিণতিতে দেশে শান্তি আসার বদলে নতুন জেরুসালেম পবিত্র ভূমির দাবি নিয়ে নতুন মাত্রার বিরোধের সৃষ্টি হলো। বাইবেল লেখকেরা আমাদের বলছেন, এরপর থেকে আম হা-আরেতজরা 'নির্মাণকাজে আর অগ্রসর না হতে জুদাবাসীদের নিরুৎসাহিত ও ভয় দেখাতে লাগল। ৪১ তারা পারস্য কর্মকর্তাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেছিল। ৪৮৬ সালের দিকে একবার সামেরিনার গভর্নর রাজা জেরজেক্সকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন যে জুদাবাসীরা অনুমতি ছাড়াই জেরুসালেমের প্রাচীর নির্মাণ করছে। প্রাচীন দুনিয়ায় এটি সাধারণত রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিবেচিত হতো। ইকবাতানায় রাজকীয় আর্কাইভে সাইরাসের মূল ডিক্রি আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত কাজ বলপূর্বক বন্ধ করে দেওয়া হলো।

এদিকে দ্বিতীয় টেম্পলের নির্মাণকাজ ধীরে ধীরে চলতে থাকল। আম হা- আরেতজের প্রত্যাখ্যানের পর জেরুবাবেলের কথা আমরা আর শুনতে পাই না। সম্ভবত হ্যাগাই ও জেচারিয়ার মেসাইনিক আশাবাদ পারস্য সরকারকে বিপদসঙ্কেত দিয়েছিল। ৫১৯ সালে রাজা দারিয়াস দেশটি অতিক্রমের সময় তাকে হয়তো অপসারণ করা হয়েছিল। আর কখনো দাউদ পরিবারের কোনো সদস্যকে জুদা প্রদেশের পেহা নিযুক্ত করা হয়নি। এই মেসাইনিক স্বপ্ন সত্ত্বেও অভিবাসীরা ৫১৫ সালের ২৩ আদরে (মার্চে) তাদের টেম্পলটি নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে সফল হয়েছিল। এটি সোলায়মানের টেম্পলের স্থানে নির্মাণ করা হয়েছিল এর ঐশী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্যই। এটি উলাম, হেখাল ও দেভিরের ত্রিপক্ষীয় পরিকল্পনাই আবার সামনে নিয়ে আসে। একটি পাথরের প্রাচীর দিয়ে এটি নগরী থেকে আলাদা করা হয়েছিল। ওই প্রাচীরটি ছিল দ্বিমুখী দরজা। এটি বিভিন্ন অফিস, গুদামঘর ও পুরোহিতদের অ্যাপার্টমেন্টে ঘেরা একটি বাইরের প্রাঙ্গনে নিয়ে যেত। এসব কাঠামো নির্মাণ করা করা হয়েছিল প্রাচীর ঘিরে। আরেকটি প্রাচীর অভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠকে আঙিনা থেকে আলাদা করেছিল। অভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠেই ছিল বলি দেওয়ার বেদী। সেটি ছিল সাদা, অমসৃণ পাথরের। অবশ্য এবার জায়ন নগরীতে কোনো রাজপ্রাসাদ ছিল না। কারণ জুদায় এখন কোনো রাজাই নেই। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, দেভির এখন শূন্য। কোনো আলামত ছাড়াই আর্ক অব কোভেন্যান্ট অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই শূন্যতা যিহোবার ঐশিত্বকে প্রতীকী করেছিল, যাকে কোনো ধরনের মানবীয় চিত্রেই ধারণা করা যেত না। তবে অন্যরা হয়তো অনুভব করত যে এটি এই নতুন টেম্পল থেকে তার দৃশ্যত অনুপস্থিতিই প্রতিফলিত করছে। দ্বিতীয় ইসাইয়ার উচ্ছ্বসিত আশা পূরণ হয়নি। যিহোবার 'গৌরব' নেমে এসে দেভিরে বসবাস করতে থাকছেন কিনা, কেউ তা জানত না। গোয়িমে কোনো নাটকীয় ঐশী বার্তা নাজিল হয়নি, অইহুদি জাতিগুলোকে শৃঙ্খলিত করে জেরুসালেমে নিয়ে আসা হয়নি। পৃথিবী থেকে ঈশ্বরের বিপুল দূরত্বের নতুন একটি অনুভূতি ছিল, দ্বিতীয় টেম্পলের এই প্রথম বছরগুলোতে ঐশী দেবতার এই ভবনে থাকার মূল ধারণাটি ক্রমবর্ধমান হারে অদ্ভূত মনে হতে লাগল :

এ কারণে যিহোবা বলেন :

আকাশ আমার সিংহাসন

আর পৃথিবী হলো আমার পাদানি

তাই তোমরা কি মনে করো আমার জন্য একটা বাড়ি বানাতে পারবে?

না, পারবে না।

তোমরা কি আমার জন্য একটি বিশ্রামস্থল বানাতে পারবে? ৪২

সব লোক খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো করে আশাবাদী থাকত যে যিহোবা তাদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য নেমে আসবেন।

অতীতের মতো জাঁকালো মন্দিরগুলোমে নেমে আসার বদলে যিহোবা এই দিনগুলোতে 'বিনীত ও অনুতপ্ত আত্মায়' মাধ্যমে অনেক বেশি আকৃষ্ট হতেন। প্রথম টেম্পলের মতবাদ ছিল বিশৃঙ্খল, উল্লাসপূর্ণ ও আবেগময়ী। দ্বিতীয় টেম্পলে উপাসনা করার ধারাটি ছিল শান্ত ও সৌম্য। নির্বাসনে থাকার সময় গোলা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের নিজেদের পাপই ছিল জেরুসালেম ধ্বংসের কারণ। ফলে গোলার 'ভগ্ন ও বিধ্বস্ত হৃদয়কে' প্রতিফলিত করেছিল মতবাদটি। এটি বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল যম কিপুরের উৎসব তথা অ্যাটোনমেন্ট দিবসে। এ সময় প্রধান পুরোহিত প্রতীকীভাবে একটি ছাগলের ওপর জাতির সব পাপ চাপিয়ে দিয়ে সেটিকে মরুভূমিতে তাড়িয়ে দিতেন। তবে এটি ইসরাইলকে আবারো ঐশী সত্তার দিকে ধাবিত করে। যম কিপুর ছিল বছরে এক দিন। এ সময় প্রধান পুরোহিত জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে দেভিরে প্রবেশ করতেন। প্রায়শ্চিত্তের উপাদানটি টেম্পল আঙিনায় প্রতিদিনকার দেওয়া বলিতেও দেখা যায়। লোকজন তাদের তাদের 'অপরাধ' বা পাপ মোচনের জন্য সাধ্য অনুযায়ী ষাঁড়, ভেড়া, ছাগল বা কবুতর বলি দিতে নিয়ে আসত। তারা তাদের হাত পশুর মাথায় রাখত যিহোবার প্রতি এর আত্মসমর্পণের প্রতীক প্রকাশ করতে। পশুটিকে হত্যার পর এর একটি অংশ যে ব্যক্তি এটি এনেছে, তাকে দেওয়া হতো। সে তা তার পরিবার ও বন্ধুদের

মধ্যে ভাগ করে দিত। ভূমির ওপর পাপ স্বীকারের ভোজটি ঐশী সত্তার সাথে সম্প্রীতির বিষয়টি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করত।

দ্বিতীয় ইসাইয়া যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেভাবে যিহোবা জায়নে ফিরে না এলেও লোকজন স্বপ্ন দেখতে থাকে যে একদিন তিনি জেরুসালেমে ‘একটি নতুন স্বর্গ ও একটি নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করবেন। পুরনো আশা মরে যায়নি এবং জেরুসালেম ওই চূড়ান্ত পরিত্রাণের এমন এক প্রতীকে পরিণত হয় যেখানে ঈশ্বরের সাথে একীভূত, সমন্বিত ও ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হবে, স্বর্গে প্রত্যাবর্তন ঘটবে। অন্য কোনো নগরীর মতো হবে না নতুন জেরুসালেম : প্রত্যেকে সেখানে দীর্ঘ ও সুখী জীবন যাপন করবে, প্রত্যেকে তার নিজ স্থানে বাস করতে পারবে। নগরীতে কোনো কান্না থাকবে না, অতীতের বেদনা বিস্তৃত হয়ে যাবে। অ-ইহুদিরা নগরীর শান্তি দেখে অবাক হয়ে যাবে। জীবন যেমন হওয়া উচিত, তেমনভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে অন্যদের অনেক বেশি মোহভঙ্গ ঘটেছিল। নগরীতে সামাজিক সমস্যা ছিল। অনেক নবী তা প্রকাশ করছিলেন, অধিবাসীরা তখনো পুরনো পৌত্তলিকতার নিমজ্জিত ছিল। গোলার প্রতি নতুন বর্জনকর মনোভাব নিয়ে উদ্বেগ ছিল ঈশ্বরের নগরী কি সবার জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত নয়, যেভাবে জেচারিয়া বলেছিলেন? সম্ভবত জেরুসালেমের দরজা বিদেশী, পুরোহিতদের ‘অপবিত্র’ বিবেচিত অচ্ছ্যুৎ ও খোজাদের জন্যও খুলে দেওয়া উচিত। যিহোবা ঘোষণা করেছেন, ‘আমার আবাস সব জাতির জন্য উপাসনার স্থান’ : একদিন তিনি এসব বহিরাগতকে নগরীতে নিয়ে এসে তাদেরকে মাউন্ট জায়নে বলি দেওয়ার সুযোগ দেবেন। ৪৬

কিন্তু তারপরও পঞ্চম শতকে জেরুসালেমের জুদাই বা অ-ইহুদিদের ধর্মমতের কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কম। নগরীটি তখনো মোটামুটিভাবে বিধ্বস্ত অবস্থায়, জনহীন ছিল। তাছাড়া ৪৫৮ সালে রাজা জেরজেস সিংহাসনে আহরণের সময় পুরো পারস্য সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়া গোলযোগে জেরুসালেম আরেক দফা ক্ষতির মুখে পড়ে। ৪৪৫ সালে নগরীর দুর্দশার খবর পারস্যের রাজধানী সুসায় পৌঁছে। এতে সেখানে বসবাসরত জুদা সম্প্রদায়ের মধ্যে কষ্টের সঞ্চার ঘটে। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা ছিলেন নেহেমিয়া। তিনি ছিলেন রাজা প্রথম আরটেক্সারেক্সের মদ্য-পরিবেশক।

জেরুসালেমের গোলার বিপর্যস্তকর অবস্থার (এর প্রাচীরগুলো তখনো বিধ্বস্ত ছিল) খবর শুনে তিনি এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে তিনি তার জাতি ও পরিবারের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কয়েক দিন কেঁদেছিলেন। তার মনে হয়েছিল, এই পাপের কারণেই এ ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তখন তিনি জুদা ফিরে গিয়ে তার পূর্বপুরুষদের নগরী পুনর্গঠনের জন্য রাজার কাছে অনুমতি ভিক্ষা করেন। রাজা তাকে অনুমতি দেন। তিনি নেহেমেয়িাকে জুদার পেহা নিযুক্ত করে ওই অঞ্চলের অন্যান্য গভর্নরের জন্য সুপারিশপত্র দেন, যাতে তিনি রাজকীয় উদ্যান থেকে কাঠ ও অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারেন। ৪৭ আরটেক্সাররেক্স সম্ভবত আশা করেছিলেন, নেহেমিয়া জুদার স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। তার মনে হয়েছিল, মিসরের খুব কাছে অবস্থিত জুদা যদি বিশ্বস্ত পারস্য দুর্গ হয়, তবে তা তার সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বাড়াবে।

ইজরার গ্রন্থ ও নেহেমেয়ায় বেশ কিছু অসম্পর্কিত নথি রয়েছে। এক সম্পাদক এ দুটিকে একসাথে সঙ্কলিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, ইজরা ও নেহেমিয়া ছিলেন সমসাময়িক এবং নেহেমিয়ার আগে জেরুসালেমে পৌঁছেছিলেন ইজরা। কিন্তু সুস্পষ্ট প্রমাণে দেখা যায়, ইজরার মিশন ছিল অনেক পারের, সালে রাজা দ্বিতীয় আরটেক্সাররেক্সের আমলে।৪৮ ফলে নেহেমিয়া হয়তো ৪৪৫ সালে সুসা থেকে যাত্রা করেছিলেন। তিনি সম্ভবত তার পদকে ধর্মীয় চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কারণ নিকট প্রাচ্যে দুর্গ সুরক্ষিত করার কাজটি পবিত্র কর্তব্য বিবেচিত হতো। জেরুসালেমে পৌঁছে তিনি তিন দিন ছদ্মবেশে নগরীতে অবস্থান করেন। তারপর একদিন রাতে গোপনে নগরপ্রাচীরগুলো পরিদর্শন করেন ঘোড়ায় চড়ে। তিনি দুর্গপ্রাচীরের ব্যবধান ও পুড়ে যাওয়া দরজাগুলোর ভয়ঙ্কর চিত্র আঁকেন। একপর্যায়ে তিনি তার ঘোড়ার চলার মতো পথও পাননি। ৪৯ পর দিন তিনি প্রবীণদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন, এই লজ্জা ও অমর্যাদার অবসানের জন্য তাদেরকে তাগিদ দেন। পুরো নগরী বিপুলভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। পুরোহিত ও সাধারণ মানুষ পাশাপাশি কাজে নেমে পড়ে, রেকর্ড ৫২ দিনে নগরীর নতুন প্রাচীরগুলোর কাজ শেষ হয়ে যায়। এটি ছিল বিপজ্জনক কাজ। এই সময় নাগাদ আম হা-আরেতজের সাথে সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটেছে, নেহেমিয়াকে

সবসময় স্থানীয় কয়েকজন নৃপতি যেমন সামেরিনার গভর্নর সানবালত, তার অন্যতম কর্মকর্তা তোবিয়া, ইদোমের গর্ভনর গারশেনের সাথে বিবাদ করতে হয়েছে। পরিস্থিতি এতই উত্তপ্ত ছিল যে নির্মাতারা সবসময় আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে থাকত : 'প্রত্যেকে এক হাতে কাজ করার সময় অন্য হাতে অস্ত্র ধরে থাকত।' আর প্রতিটি নির্মাণকর্মী কাজ করার সময় তার পাশে তরবারি বহন করত। ওয়েস্টার্ন হিলের উপর অবস্থিত মিসনেহ উপশহরটি সুরক্ষিত করার কোনো চেষ্টা চালানো হয়নি। নেহেমিয়ার নগরী ছিল স্রেফ ওফেলের ওপর পুরনো ইর দাউদ নিয়ে। বাইবেলের পাঠ থেকে আমরা কিভাবে এটি সংগঠিত হয়েছিল তা জানতে পারি। বাজারগুলো নগরীর পশ্চিম দিকের প্রাচীরজুড়ে বিস্তৃত ছিল, পুরোহিতেরা ও মন্দিরের সেবকরা বাস করত পুরনো ওফেল দুর্গের পাশে অবস্থিত টেম্পলের কাছে। শিল্পী ও কারিগরেরা দক্ষিণ-পূর্ব দিকের কোয়ার্টারে বাস করত। সামরিক বাহিনীর অবস্থান ছিল উত্তর অংশে। এখানেই নগরী ছিল সবচেয়ে অরক্ষিত। নেহেমিয়া একটি দুর্গও নির্মাণ করেছিলেন। সম্ভবত টেম্পলের উত্তর-পূর্ব দিকে, তা হাসমোনিয়ান ও হেরডিয়ান দুর্গে সেটি চাপা পড়েছিল। ৪৪৫ সালের ২৫ ইঁদুলে (সেপ্টেম্বরের শুরুতে) নতুন প্রাচীরগুলো উৎসর্গ করা হয় : লেভি ও আশপাশের গ্রামের অধিবাসীরা দুটি বিশাল গায়কদলে বিভক্ত হয়ে বিপরীত দিক থেকে নতুন প্রাচীরগুলো দিয়ে শোভাযাত্রা বের করে, সাম গায়। এভাবে তারা টেম্পলের আঙিনায় প্রবেশ করে। কয়েক মাইল দূর থেকেও সঙ্গীত ও আনন্দ- চিৎকার শোনা গিয়েছিল।

জেরুসালেমে নতুন আশা নিয়ে এসেছিলেন নেহেমিয়া। তবে তখনো নগরী হিসেবে এটি পূর্ণতা পায়নি। সেখানে নতুন কোনো পরিবার গড়ে ওঠেনি, লোকজন সেখানে সরে আসতে অনীহ ছিল। আম হা-আরেতজ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল সবসময়, নগরীদের নতুন ফটকগুলো পাহারার ব্যবস্থা করতে হতো। নেহেমিয়া লটারির মাধ্যমে প্রতি ১০ জনে একজন করে লোককে নগরীতে সরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন।৫১ এ ক্ষেত্রে যেসব বসতি স্থাপনকারী 'স্বেচ্ছাসেবক' ছিল, তারা ধর্মীয় কাজ করেছিল বলে বিবেচিত হয়। জেরুসালেমে নেহেমিয়ার ১২ বছরের আমলে নগরীটি ধীরে ধীরে প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে মিজপাহকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি জেরুসালেমের পেহার জন্য একটি আবাসিক ভবনও নির্মাণ করেছিলেন। ধীরে ধীরে নগরীটি গোলার জীবনের কেন্দ্রে পরিণত

হয়েছিল। তবে জেরুসালেমেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছিল। কয়েকজন পুরোহিত সানবালাতসহ আম হা-আরেতজের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। এ লোকটি ছিলেন নেহেমিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক বিরোধী। তাকে কয়েকজন অপেক্ষাকৃত সম্পদশালীর লোভও দমন করতে হয়েছিল। এসব লোক ঋণের সুদ দিতে ব্যর্থ গরিবদের ছেলে-মেয়ে ও আঙুর বাগান দখল করে নিয়েছিলেন। ব্যাপক গণ-সমর্থন নিয়ে নেহেমিয়া সুদ গ্রহণ বন্ধ করতে অভিজাত ও কর্মকর্তাদেরকে ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। ৫২ এটি ছিল জেরুসালেমকে আবার গরিব মানুষের আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত করার উদ্যোগ। তবে তাতে সহজাতভাবেই উচ্চ শ্রেণি বিরোধিতা করেছিল। তারা ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিবেশী এলাকায় তাদের মিত্রতা স্থাপন করতে থাকে। এতে দেশে বেশ বড় ধরনের উত্তেজনা দেখা দেয়। সানবালাত, তোবিয়া ও গারশেন বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, নগরী সুরক্ষিত করার কাজটি হচ্ছে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভের উদ্দেশ্য সিদ্ধিমূলক ও প্রধান কাজ।

দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালনের সময়, এটি শুরু হয়েছিল ৪৩২ সালে, নেহেমিয়া স্থানীয় লোকদের বিয়ে করা থেকে গোলার সদস্যদের বিরত রাখার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করেন। সানবালাতের মেয়েকে বিয়ে করা প্রধান পুরোহিত ইলিয়াশিবকে তিনি বহিষ্কার করেন। ইলিয়াশিব সামারিয়ায় গিয়ে বাস করতে থাকেন। সেখানে তিনি সম্ভবত পুরোহিত শ্রেণির অন্য অসন্তুষ্টদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। জেরুসালেমে মিশ্র বিয়ের বিষয়টি ক্রমবর্ধমান হারে বিরোধপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়েছিল। নেহেমিয়ার বিধানের উদ্দেশ্য বিশ শতকের বর্ণবাদী বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য নয় বরং তা ছিল ইজেকিলের মতো নবীদের নির্বাসনকালে যে নতুন ঐশী ভূগোল তৈরি করেছিলেন, সেটি সামাজিক পরিভাষায় প্রকাশ করার প্রয়াস। অর্থাৎ ঈশ্বরের পবিত্র জাতির সাথে মানানসইভাবে গোলাকে অবশ্যই গোয়িম থেকে আলাদাভাবে বাস করতে হবে। বেবিলনে নির্বাসিতরা ইসরাইলে যিহোবার উপস্থিতিকেন্দ্রিক স্বতন্ত্রমণ্ডিত জুদা পরিচিতি সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে সচেতন ছিল। একই কেন্দ্রভিমুখ টানও সামাজিক জীবনে দেখা গেছে। তাওরাত অনুযায়ী ইসরাইলের লোকজন মূল পারিবারিক ইউনিটের বাইরে বিয়ে করতে বাধ্য থাকলেও যতটুকু সম্ভবত ঘনিষ্ঠ স্বজনদের মধ্যে বিয়ে করাটাই অপেক্ষাকৃত ভালো বিবেচিত হতো।

পরিবারের ভেতরে লোকজন গ্রহণযোগ্য বৈবাহিক অংশীদার হিসেবে গ্রহণযোগ্য ছিল, বাইরের লোকজন অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। এসব এককেন্দ্রিক বৃত্তগুলো ইসরাইল সীমান্তে থেমে গিয়েছিল। পবিত্রতার মানচিত্রে অনুপস্থিত থাকা গোয়িম আক্ষরিকভাবে ছিল এলাকার বাইরে। 'বাইরে' বিয়ে করা মানে ঐশী এলাকার বাইরে চলে যাওয়া এবং ঈশ্বরহীন প্রত্যন্ত এলাকায় গমন করা, যেখানে যম কিপুরে বলির পাঁঠাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এটি ছিল ইসরাইলকে 'পবিত্র' ও আলাদা জাতি ও জুদা পরিচিতিসম্পন্ন হিসেবে গঠন করার চেষ্টা। 'বহিরাগত' ও 'আমাদের মতো নয়- এমন লোকদের থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্য ছিল এটি। তবে জুদার ওই গোলায় ওইসব লোককে প্রত্যাখ্যান করতে বলা হয় যারা একসময় ইসরাইলি পরিবারের সদস্য হলেও এখন তাদের ভূমিকা আগন্তুক ও শত্রু।

পঞ্চম শতকে বেবিলনের নির্বাসিতরা একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় সংস্কারে নিয়োজিত হয়েছিল। এটি ইহুদি ধর্মে প্রভাব ফেলে। পরিচিতির প্রশ্নটি তখনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল : নির্বাসিতা তাদের সন্তানদের বেবিলনিয়ান নাম রাখা বন্ধ করে দিয়ে শাবেতাইয়ের মতো নামগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে থাকে। এতে তাদের নতুন ধর্মীয় প্রতীকগুলো প্রতিফলিত হতে থাকে। তাদের ধর্মীয় জীবনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে থাকে তাওরাত, এটি টেম্পলের স্থান অধিকার করে। মিতজভোথ পালন করার মাধ্যমে বেবিলনের জুদাবাসীরা নিজেদেরকে স্বর্গীয় উপস্থিতির ধারক ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের নির্দেশ প্রতিষ্ঠাকারী একটি পবিত্র সম্প্রদায় হিসেবে গঠন করতে পারত। তবে এর মানে হলো, সাধারণ ইহুদিদেরকে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে তাওরাতের জটিল বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এসব বিশেষজ্ঞদের একজন ছিলেন ইজরা। তিনি নিজেকে যিহোবার বিধান নিয়ে গবেষণা, তা অনুশীলন ও ইসরাইলকে তা শেখানো ও প্রথা অবহিত করার কাজে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি সম্ভবত পারস্য রাজদরবারে ইহুদিবিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। ৩৯৮ সালে দ্বিতীয় আরটেক্সেরক্সেস চারটি দায়িত্ব দিয়ে জুদায় পাঠান। মাতৃভূমিতে ফিরতে আগ্রহী একদল ইহুদিও তার সঙ্গী হন। তিনি টেম্পলের জন্য বেবিলনের ইহুদি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে উপহার সাথে নিয়েছিলেন। জুদায় পৌঁছেই তিনি ' [তাদের] ঈশ্বরের বিধানের ভিত্তি সম্পর্কে জুদা ও জেরুসালেমের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।' অবশেষে তিনি

এই বিধান সম্পর্কে লেভ্যান্টের ইহুদিদের নির্দেশনা দেন। অন্য প্রজা জনসাধারণের বিধান এই সময় পর্যালোচনাধীন থাকে। আরটাক্সোক্সেস ইহুদি টেম্পলের মতবাদ সমর্থন করছিলেন। এটিই ছিল জুদা প্রদেশের জীবনযাপনের মূলকেন্দ্র। তাকে নিশ্চিত হতে হয়েছিল যে এটি সাম্রাজ্যের স্বার্থ ও নিরাপত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বেবিলনের আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে ইজরা সম্ভবত তাওরাত ও পারস্য আইনিব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়েছিল। আরটেক্সেরক্সেকে নিশ্চিত হওয়া দরকার ছিল যে এই বিধান জুদায় কাজ করবে। ইজরা জেরুসালেমে তাওরাত জারি করবেনও একে ওই এলাকার সরকারি বিধানে পরিণত করবেন।৫৬

বাইবেলের লেখক ইজরার মিশনকে তার জাতির ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী অবস্থা হিসেবে দেখেছেন। ইজরার জুদায় সফরকে নতুন বহিঃগমন ঢল হিসেবে বর্ণনা করা হয়, ইজরা নিজে দণ্ডদাতা হিসেবে নতুন মুসা হিসেবে অভিহিত হন। তিনি বিপুল সমারোহে জেরুসালেমে পৌঁছে ছিলেন, তবে সেখানকার অবস্থা দেখে আঁতকে ওঠেন : পুরোহিত ও লেভিতরা তখনো আম হা- আরেজতের সাথে গোপনে আঁতাত করে আছে, তখনো বিদেশী স্ত্রী গ্রহণ করছে। জেরুসালেমের লোকজন লজ্জা পেয়েছিল যে রাজার প্রতিনিধি তার চুল ছিঁড়ছেন আর সারা দিনের শোক প্রকাশ করতে রাস্তায় বসে আছেন। তারপর তিনি জেরুসালেমে এক সভায় গোলার সব সদস্যকে তলব করেন : কোনো সদস্য যদি হাজির না হয়, তবে তাকে সমাজচ্যুত করা হবে, তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। নববর্ষের দিনে (সেপ্টেম্বর/অক্টোবর) ওয়াটার গেটের সামনের চত্বরে তাওরাত নিয়ে এসে একটি কাঠের মঞ্চে দাঁড়ান। এ সময় শীর্ষস্থানীয় নাগরিকেরা তার চারপাশে ছিলেন। তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশে বিধান পাঠ করেন, সেইসাথে এসবের ব্যাখ্যাও শোনান। তিনি তাদের সামনে ঠিক কী পাঠ করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো ধারণা নেই : তিনি কি পুরো পেন্টাটেক, ডিউটারোনোমি গ্রন্থ নাকি হলিনেস কোড পাঠ করেছিলেন? বিষয়বস্তু যা-ই হোক না কেন, ইজরার বিধান স্পষ্টভাবেই জনগণকে নাড়া দিয়েছিল। তারা এসব কথা আগে কখনো শোনেনি। তারা এমনভাবে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল যে ইজরাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছিল যে এটি উৎসবের দিন। তিনি তাওরাত থেকে একটি অংশ উচ্চস্বরে পাঠ করেন। তাদের পূর্বপুরুষদের ৪০ বছরের উষর প্রান্তরে থাকার

স্মৃতিতে এতে সুকোথ মাসে বিশেষ প্রকোষ্ঠে বাস করার জন্য ইসরাইলিদের বলা হয়েছিল। তিনি লোকজনকে পাহাড় থেকে মেদি, জলপাই, পাইন ও খেজুর গাছের ডালা আনতে পাঠান। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই জেরুসালেম সবুজ আশ্রয়ে পরিণত হয়, পুরো নগরীতে তা দেখা যেতে থাকে। নতুন উৎসবটি সুকোথের পুরনো জেবুসাইত শাস্ত্রাচারের স্থলাভিষিক্ত হয়। এখন নতুন ব্যাখ্যা এক্সোডাস ঐতিহ্যের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হলো। পরের সাত দিন নগরীতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হলো। প্রতিটি সন্ধ্যায় লোকজন ইজরার বিধানের ব্যাখ্যা শোনার জন্য সমবেত হতো।

পরের সভাটি ছিল আরো সৌম্যভাবে। ৫৮ এটি টেম্পলের সামনের চত্বরে হয়েছিল। লোকজন নগরীতে শীতে প্রবল বর্ষণে ফলে ঠাণ্ডার যে অনুভূতি পায়, তেমনভাবেই কাঁপছিল। ইজরা তাদেরকে তাদের বিদেশী স্ত্রী তাড়িয়ে দিতে বলেন, একেবারে প্রতিটি ঘটনা খতিয়ে দেখতে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। আম হা- আরেতজে যোগদান করার জন্য গোলা থেকে নারী ও শিশুদের সরিয়ে রাখা হয়। ইসরাইলের সদস্যপদ এখন বেবিলনে নির্বাসিত ও তাওরাতের কাছে সমর্পণ করতে প্রস্তুত লোকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এখন জেরুসালেমের সরকারি বিধান হলো তাওরাত। অচ্ছ্যুতে পরিণত হওয়া লোকজনের বিলাপ সম্ভবত ইসাইয়া গ্রন্থে আমাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে :

‘ইসরাইল আমাদের স্বীকার করল না, জেরুসালেম থেকে বের করে দিলো। আম হা- আরেতজ সামেরিনার মাউন্ট গেরিজিমে নিজেদের আলাদা মন্দির তৈরি করল। আজকে সামারিতানরা, তাদের বংশধরেরা এখনো তাদের নিজস্ব ধরনের ইহুদি ধর্ম পালন করে।

ইব্রাহিম আমাদের জানে না।

ইসরাইল আমাদের স্বীকার করে না।

প্রভু, আপনি আমাদের পিতা....

বহু কাল ধরে আমরা সেই লোক ছিলাম যারা আপনার দ্বারা শাসিত ছিলাম না।

যাদের আপনার নামে ডাকা হয়নি।৫৯ এরপর থেকে অন্য লোকজনকে নির্মমভাবে তাড়িয়ে দেওয়াটা জেরুসালেম ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়, এমনকি যদিও তা ইসরাইলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যগুলোর প্রবল পরিপন্থী ছিল। কেউ কেউ হয়তো ধারণা করতে পারে, অনেক লোক এই নতুন প্রবণতার বিরোধিতা করেছিল। তারা সামেরিনার লোকজনের সাথে সব সম্পর্কের অবসান ঘটাতে চায়নি। তারা আশঙ্কা করেছিল, জেরুসালেম পরিণত হবে সংকীর্ণ ও অন্তর্মুখী এবং নগরীটি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু অন্যরা নতুন বিধান প্রবল উৎসাহভরে গ্রহণ করে নেয়। ইজরার পরবর্তী কালের প্রজন্মগুলোর আমলে জেরুসালেমের অবস্থা সম্পর্কে আমরা সামান্যই জানতে পারি। তবে পরবর্তী আট প্রজন্মের মধ্যে বিধানটি জুদার লোকজনের আধ্যাত্মিকতায় টেম্পলের মতোই কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এই দুই পবিত্র মূল্যবোধ বিপদগ্রস্ত হলে জেরুসালেমের জন্য সৃষ্টি করে সঙ্কট। আর তা নগরীর নতুন ইহুদি পরিচিতি প্রায় হারানোর পর্যায়ে নিয়ে যায়।

জুদার অ্যান্টিয়ক

মেসিডোনের আলেক্সান্ডার খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৩ সালের অক্টোবরে ইসাস নদীর তীরে পারস্যের রাজা তৃতীয় দারিয়াসকে পরাজিত করলে জেরুসালেমের ইহুদিরা কষ্ট পেয়েছিল। কারণ তারা দুই শ' বছর ধরে পারস্যের অনুগত সামন্ত ছিল। প্রথম শতকের ইহুদি ইতিহাসবিদ জোসেফাস ফ্ল্যাভিয়াস আমাদের বলছেন, প্রধান পুরোহিত প্রথমে আলেক্সান্ডারের কাছে নতি স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এ কারণে যে তিনি শেষ পারস্য রাজার অনুগত থাকতে সংকল্প ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু একটি স্বপ্নের কারণে তিনি ওই অবস্থান থেকে সরে আসেন। তা হলো আলেক্সান্ডার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার সাম্রাজ্যজুড়ে ইহুদিরা তাদের নিজেদের বিধান অনুসরণ করতে পারবে।' বস্তুত, আলেক্সান্ডার কখনো জেরুসালেম সফর করেছিলেন, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। মেসেডোনিয়ার এ বিজয় জুদার জনজীবনে সত্যিকার অর্থে খুবই সামান্য পরিবর্তন এনেছিল। প্রদেশটির সরকারি বিধান হিসেবে তাওরাত বহাল থাকে, যে পারস্য আইন ছিল, তাই বিরাজ করতে থাকে, পারস্য আমলের প্রশাসনও বহাল ছিল। কিন্তু তারপরও সর্বোচ্চ পুরোহিতের সাথে আলেক্সান্ডারের আচরণ-সম্পর্কিত কিংবদন্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এটি হেলেনবাদের প্রতি ইহুদি প্রতিক্রিয়ার জটিলতা ফুটিয়ে তুলেছে। কিছু ইহুদি সহজাতভাবেই গ্রিক সংস্কৃতির প্রতি সঙ্কুচিত থেকে পুরনো বিধানে আঁকড়ে থাকে, অন্যরা হেলেনবাদকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচনা করে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি বিপুলভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন মনে করে। এই পরস্পরবিরোধী গ্রুপগুলোর মধ্যকার সংগ্রাম প্রায় তিন শ' বছর ধরে জেরুসালেমের ইতিহাসকে আলোড়িত করেছিল।

আলেক্সান্ডারের বিপুল বিজয়ের কয়েক দশক আগেই হেলেনবাদ ধীরে ধীরে নিকট প্রাচ্যে অনুপ্রবেশ করছিল। ধর্মের পুরনো সংস্কৃতি কুঁকড়ে যাচ্ছিল, গ্রিস চেতনায় অনিবার্যভাবে প্রভাব বিস্তার করছিল। কিন্তু জেরুসালেমের ইহুদিদের সাথে গ্রিকদের সরাসরি যোগাযোগ হয়েছিল সম্ভবত খুবই কম। সাধারণত ফোনিশিয়ার উপকূলীয় নগরীগুলোর মাধ্যমে তারা ওই সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিল। এই মধ্যস্ততার মাধ্যমেই আরো পরিচিত পরিভাষায় এই সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো রূপান্তরিত করতে পারত। জেরুসালেম আবারো বিচ্ছিন্ন

এলাকায় অনেক বেশি পশ্চাৎপদ অংশে পরিণত হয়েছিল। এটি কোনো প্রধান বাণিজ্যিক রুটের মধ্যে ছিল না। পেত্রা ও গাজার মতো কাছাকাছি নগরীতে যাত্রাবিরতি করা কাফেলাগুলোর জেরুসালেমে যাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। এটি ছিল গরিব নগরী, শিল্প বিকাশের মতো কোনো খনিজসম্পদ ছিল না। অন্তর্মুখীভাবে এই নগরী মন্দিরটি ও অনুমিত প্রাচীন তাওরাতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জেরুসালেমের ভূমিকা ছিল নগন্য, পাশ্চাত্য থেকে ওই অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করা আধুনিকতার চেয়ে সে অতীতের দিকেই বেশি মনোযোগী ছিল।

তবে ৩২৩ সালের ১৩ জুন বেবিলনে আলেক্সান্ডার দি গ্রেটের মৃত্যুর পর বিরাট পরিবর্তন ঘটে। একমাত্র সম্ভাব্য উত্তরসূরি ছিল এক ছোট ছেলে। সাম্রাজ্য দখলের জন্য প্রায় সাথে সাথে শীর্ষস্থানীয় জেনারেলদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পরের দুই দশকের জন্য আলেক্সান্ডারের জয় করা এলাকাগুলো ছয় উত্তরসূরির যুদ্ধে প্রকম্পিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট অঞ্চল হিসেবে জুদা এশিয়া মাইনর বা সিরিয়া থেকে মিসরগামী সৈন্যবাহিনীর মালামাল, সরঞ্জাম, পরিবার ও ক্রীতদাসদের নিয়ে অব্যাহত এগিয়ে যাওয়ার সময় আক্রান্ত হতো। জেরুসালেম এসব বছরে অন্তত ছয়বার বিজিত হয়, এর অধিবাসীরা বেদনাদায়কভাবে বুঝতে পারে, শান্তিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকার দীর্ঘ সময়টি শেষ হয়ে গেছে। জেরুসালেমের ইহুদিরা হেলেনবাদকে ধ্বংস সৃষ্টিকারী, সহিংস ও সামরিকতন্ত্র হিসেবে মনে করতে থাকে। মেসেডোনিয়ার উত্তরসূরিরা ঔদ্ধত্য বিজয়ী হিসেবে নগরীতে প্রবলভাবে প্রবেশ করেছিল। তারা তাদের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণের দিকে নজর দেয়নি। এই ভয়ঙ্কর বছরগুলোতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী গ্রিক শিল্পকলা, দর্শন, গণতন্ত্র ও সাহিত্য জেরুসালেমের অধিবাসীদের মনে কোনো দাগ কাটতে পারেনি। তারা সম্ভবত গ্রিকদের 'শক্তিশালী ও খারাপ' হিসেবে অভিহিতকারী জনৈক সংস্কৃত লেখকের সাথে একমত ছিল।

জুদা, সামেরিনা, ফোনিসিয়া ও সমগ্র উপকূলীয় এলাকা ৩০১ সালে টলেমি প্রথম সটারের বাহিনীর দখলে চলে যায়। এই 'উত্তরসূরি' সম্প্রতি মিসরে নিজের শক্তিশালী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন। পরের এক শ’ বছরে জেরুসালেম টলেমিদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। উত্তরের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সামরিক নিরপেক্ষ এলাকা হিসেবে সিরিয়া প্রদেশ তাদের দরকার ছিল।

বেশির ভাগ প্রাচীন কালের শাসকের মতো টলেমিরাও স্থানীয় বিষয়াদিতে অতিরিক্ত কোনো হস্তক্ষেপ করত না। অবশ্য অনেক মূলধারার ও কার্যকর ধরনের প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিল তারা। তারা তাদের রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যথেষ্ট নমনীয়তার সাথে প্রাসঙ্গিক বিধান প্রয়োগ করত। প্রদেশটির কিছু অংশ ছিল রাজকীয় ভূমি। এগুলো ছিল রাজকীয় কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ শাসনে। তাছাড়া জোপ্পা ও স্ট্র্যাটোর টাওয়ারে নতুন বন্দর প্রতিষ্ঠা করা হয়, বেথ শান, ফিটোরেরা ও পেলায় নতুন নতুন সামরিক উপনিবেশ গড়ে তোলা হয়। দেশটির বাকি অংশ তার নিজস্ব ব্যাপারগুলো ব্যবস্থাপনা করতে অনেক বেশি স্বাধীন ছিল। ফোনিশিয়ানদের টায়ার, সিডন, ত্রিপলি ও বেবলোকে অনেক স্বাধীনতা ও সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। গ্রিক উপনিবেশিকরা সিরিয়া গিয়ে নিজেদের মতো গণতান্ত্রিক গ্রিক প্রজাতন্ত্রের মতো নগর-রাষ্ট্র গড়ে তোলে। এসব নগরীর মধ্যে ছিল গাজা, শেচেম, ম্যারিসা ও আম্মান। এগুলো কার্যত ছিল স্বায়াত্তশাসিত। গ্রিক সৈন্য, বণিক, উদ্যোক্তারা প্রাচ্যের নতুন নতুন সুযোগ গ্রহণ করতে এসব বসতিতে জড়ো হতে থাকে। স্থানীয় লোকজন গ্রিক ভাষায় লিখতে ও পড়তে পেরে ‘হেলেনিস’ হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের নিম্ন সারিতে প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়া হতো।

পোলিস ছিল ওই অঞ্চলের বেশির ভাগ লোকের পরিচিত ঐতিহ্যের কাছে অপরিচিত বিষয়। হেলেনবাদী সংস্কৃতি ছিল সেক্যুলার। এটি এমন এক বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল যা প্রাসাদ ও মন্দির উভয়টি থেকে নিরপেক্ষ। ঐশীভাবে নিযুক্ত শাসক বা কোনো পুরোহিত এলিটের মাধ্যমে শাসিত না হয়ে পোলিসে সরকার ছিল ধর্ম থেকে আলাদা। জিমনেসিয়াও এসব নতুন গ্রিক নগরীতে আবির্ভূত হয়েছিল। এখানে তরুণদেরকে হেলেনবাদী আদর্শে প্রশিক্ষিত করা হতো। তারা গ্রিক সাহিত্য অধ্যায়ন করত, কঠোর দৈহিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ নিত, একইসাথে দেহ ও মন গঠন করত। জিমনেসন ছিল এমন প্রতিষ্ঠান যা তাদের বিপুল বিস্তৃত সাম্রাজ্যকে একত্রিত রাখার ব্যবস্থা

করত। এর নিজস্ব ধর্মীয় মূল্যবোধ ছিল। অলিম্পিক গেমসের (এতে হারমেস ও হেরাক্লেয়াসের সম্মানে ধর্মীয় উদযাপনের জন্য তরুণরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিত) মতো জিমনেসিয়ারও পৃষ্ঠপোষক ছিল। সাধারণত স্থানীয় লোকজনদেরকে জিমনেসনে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। এটি গ্রিকদের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত ছিল। তবে টলেমিরা বিদেশীদের প্রবেশে সুযোগ দিত। এর ফলেই আলেক্সান্দ্রিয়ার ইহুদিরা জিমনেসনে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়ে গ্রিক ও ইহুদি সংস্কৃতির অনন্য মিথষ্ক্রিয়া অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। গ্রিকরা ছিল বস্তুবাদী ও অনেক সময় জঘন্য খারাপ। তবে স্থানীয়দের অনেকে এই নতুন সংস্কৃতিকে প্রলুব্ধকারী হিসেবে দেখতে পেয়েছিল। অনেকের কাছে এটি ছিল অপ্রতিরোধ্য, ঠিক যেমন বর্তমানে উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেকের কাছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অপ্রতিরোধ্য। এটি ছিল আকর্ষণ সৃষ্টিকারী ও প্রতিরোধকারী, এটি টাবু গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তবে ঠিক এই কারণেই অনেকে এটিকে ব্যাপকভাবে মুক্তি সৃষ্টিকারী মনে হয়েছিল।

প্রথমে এসব নতুন আইডিয়ায় জেরুসালেম প্রভাবিত হয়নি। এটি পোলিস ছিল না, এ কারণে এখানে কোনো জিমনেসিনও ছিল না। অধিবাসীদের বেশির ভাগই যিহোবার নগরীতে হারমেসকে সম্মান জানানোর ধারণায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, তরুণরা নগ্ন হয়ে ব্যায়াম করছে, এমনটা দেখে ভীত হয়ে পড়েছিল। টলেমিদের ব্যাপারে জুদার বড় ধরনের কোনো আগ্রহ ছিল না। ইহুদিরা স্বতন্ত্র ধরনের 'জাতি' (ইথনো) গঠন করেছিল। তারা জেরুসালেমভিত্তিক প্রবীণদের পরিষদ জারুসিয়ার মাধ্যমে শাসিত হতো। 'জাতির' আনুষ্ঠানিক বিধান ছিল তাওরাত। এটি পারস্যদের অধীনে যেমন ছিল, তেমনই থেকে যায়, অর্থাৎ মন্দির রাষ্ট্রটি এর পুরোহিতদের মাধ্যমে শাসিত হতো। টলেমিরা জুদার বিষায়াদি ওপর নজর রাখার জন্য স্থানীয় এজেন্ট (ওকোনোমোস) নিয়োগ করত, অন্তত যুদ্ধের সময় হলেও তারা নগরীতে একটি গ্যারিসন মোতায়েন করত। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, ইহুদিদের নিজেদের মতো করেই চলার সুযোগ দেওয়া হয়। মিসরীয় সরকারের সাথে তাদের সম্পর্কের সংযোগসূত্র ছিল ২০ ট্যালেন্ট করে কর। এটি প্রতিবছরই পরিশোধ করতে হতো।

তবে জেরুসালেমকে যে গ্রিক বিশ্বে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, তা অবধারিতই ছিল। বাকি দেশকেও বদলে দিয়েছিল এটি। দ্বিতীয় টলেমির রাজত্বকালে (২৮২- ৪৬) যোশেফ নামের এক জেরুসালেমবাসী পুরো সিরিয়া প্রদেশের কর সংগ্রহ করার চাকরি জুটিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ২০ বছর ধরে তিনি ছিলেন দেশের অন্যতম ক্ষমতাধর ব্যক্তি। যোশেফ ছিলেন তোবিয়াদ গোত্রের লোক, এবং সম্ভবত তোবিয়ার বংশধর, যিনি নেহেমিয়াকে বেশ ঝামেলায় ফেলেছিলেন। যদি তা-ই হয়ে থাকে, তবে তোবিয়াদরা তাদের জীবন তাওরাতের মাধ্যমে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হোক তা চাইছিল না। তারা তখনো বিদেশীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে চাইত, জেরুসালেম এস্টাবলিশমেন্টের বর্জনশীল মূল্যবোধের মধ্যে দাখিল হতে চাইত না। ট্রান্স জর্দানে আম্মানতিসের তোবাইদ এস্টেটটি টলেমিদের অন্যতম সামরিক উপনিবেশে পরিণত হয়। যোশেফ নিশ্চিতভাবেই গ্রিক বিশ্বে স্বস্তিতে ছিলেন। তিনি জেরুসালেমে হেলেনিদের বিপুল পরিমাণ আর্থিক লেনদেন করতে সক্ষম হয়ে প্রথম ইহুদি ব্যাংকারে পরিণত হয়েছিলেন। তার সহকর্মী অনেক ইহুদি যোশেফের সাফল্যে গর্বিত ছিল। যোশেফাসের উদ্ধৃতিতে স্থান পাওয়া একটি ছোট কাহিনীতে তার জীবন-কথা বলা হয়েছে। এতে তার চতুরতা, প্রতারণা ও উদ্যোক্তা হিসেবে তার দক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছিল। নিজ জাতির লোকজনকে দারিদ্র থেকে উদ্ধার ও টলেমিদের ওই অঞ্চলে নিজে আসা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে তাদের সংশ্লিষ্ট করিয়ে দিতে পারার জন্য লেখক যোশেফের প্রশংসা করেছিলেন।

তোবাইদরা জেরুসালেমে হেলেনবাদের পথিকৃতে পরিণত হয়। তারা তাদের নগরী থেকে পুরনো ঐতিহ্য বিদায় করতে চেয়েছিল। তাদের কাছে এসব ধ্যান- ধারণা অনুপযোগী ও সংকীর্ণ বিবেচিত হয়েছিল। তারা একাই এ কাজ করেনি। গ্রিক সাম্রাজ্যের অনেক লোকই তাদের পূর্বপুরুষদের ধ্যান-ধারণা হঠাৎ করে নির্যাতনমূলক বিবেচনা করে সেগুলো সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। তাদের বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন – যেখানে ওই সীমা, সীমান্তরেখা ও সীমান্ত সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত ও সুনির্দিষ্ট করা ছিল অনিবার্য – হিসেবে দেখার বদলে অনেকেই আরো বড় দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিল। পোলিস ছিল রুদ্ধ দুনিয়া, কিন্তু অনেক গ্রিক এখন নিজেদের কসমোপলিটান হিসেবে বিবেচনা করতে থাকল, তারা নিজেদের মনে করত পুরো মহাবিশ্বের নাগরিক। তাদের দেশকে সবচেয়ে ঐশী মূল্যবোধ, কারণ এটি

তাদেরকে বিশ্বে অনন্য স্থান দিয়েছিল, হিসেবে বিবেচনা না করে গ্রিকরা উপনিবেশিক ও বিশ্ব পর্যটকে পরিণত হয়। আলেক্সান্ডারের বিজয় বিশ্বকে খুলে দিয়েছিল, পোলিসকে ক্ষুদ্র ও অপর্যাপ্ত স্থানে পরিণত করেছিল। যে অসীমতা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে বিশৃঙ্খল ও হুমকিপূর্ণ মনে হয়েছিল, এখন সেটিই উদ্দীপ্ত ও মুক্তি দানকারী মনে হতে লাগল। গ্রিক বিশ্বের ইহুদিরাও এই শিকড়হীনতায় অংশ নিলো, পছন্দনীয় লোকদের সদস্য, সীমাবদ্ধতায় আইনে বাধাগ্রস্ত হওয়ার বদলে মানবতার নাগরিকে পরিণত হতে চাইল। তৃতীয় শতকের শেষ নাগাদ কিছু ইহুদি গ্রিক শিক্ষার মূল বিষয়টি অর্জন করতে শুরু করে, তাদের শিশুদের গ্রিক নাম রাখতে থাকে।

অন্যরা এসব কিছুকে চরম হুমকিপূর্ণ মনে করতে থাকে। তারা টেম্পলকেন্দ্রিক ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে থাকে। বিশেষ করে নিম্নতর শ্রেণিতে, যারা নতুন সমৃদ্ধিতে অংশ নিতে পারছিল না, আগের চেয়েও ঐশী বিধানের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এতে নিশ্চিত করা হয় যে প্রতিটি জিনিসের নিজস্ব স্থান আছে, সমাজে শৃঙ্খলা তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, লোকজন ও উদ্দেশ্য যখন সংশ্লিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকে। রক্ষণশীল ইহুদিরা স্বাভাবিকভাবেই পুরোহিত, তাওরাত ও টেম্পলের অভিভাবকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের নেতা ছিলেন জোদোকবাদী বংশধর পরিবারের পুরোহিতরা। এসব পরিবারের সদস্যরা কিছু সময়ের জন্য জেরুসালেমের প্রধান পুরোহিত হয়েছিল। ওনিয়াদরা নিজেদেরকে গ্রিক আদর্শে আকৃষ্ট করেছিল। তাদের কারো কারো গ্রিক নামও ছিল। তবে তারা পুরনো বিধান ও ঐতিহ্য মেনে চলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। এসবের ওপরই তাদের ক্ষমতা ও সুযোগ- সুবিধা নির্ভরশীল ছিল।

ওই শতকের শেষ দিকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে মেসোপোটেমিয়ার গ্রিক রাজ্য শাসনকারী সেলুসিড রাজবংশের কাছে জেরুসালেম খোয়াতে পারে টলেমিরা। ২১৯ সালে তরুণ, উচ্চাভিলাষী সেলুসিক রাজা তৃতীয় অ্যান্টিয়ওকাস সামারিয়া ও ফোনিশিয়ান উপকূলীয় এলাকা আক্রমণ করেন। তিনি চার বছর এসব এলাকায় নিজের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি টলেমি চতুর্থ ফিলোপাটার তাকে শেষ পর্যন্ত তাড়িয়ে দিতে পারলেও মনে হচ্ছে, তিনি ফিরে এসেছিলেন। কারণ, যোশেফ তাদের প্রধান কর

সংগ্রহকারী হওয়ার পর থেকে টলেমিদের খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছিল তোবিয়াদরা। অন্য দিকে, জেরুসালেমের অধিকতর রক্ষণশীল ইহুদিরা সেলুসিডদের সমর্থন করত, আশা করত যে তারাই দেশটিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তোবিয়াদরা অভ্যন্তরীণ পারিবারিক বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিল। তেজোদীপ্ত উচ্চ পুরোহিত ওনিয়াদ পরিবারের দ্বিতীয় সিমন নগরীতে বেশ প্রভাব অর্জন করেছিলেন, সেলুসিডদের স্বার্থ সমর্থন করতেন। ২০৩ সালে অ্যাটিয়াস আবার দেশটি আক্রমণ করলে ২০১ সালে তার ইহুদি সমর্থকেরা তাকে জেরুসালেমের দুর্গ দখল করতে সাহয়তা করে। অবশ্য টলেমিরা পরের বছর তাদেরকে নগরী থেকে বের করে দেয়। ২০০ সালে জেরুসালেম দীর্ঘ অবরোধের মুখে পড়ে, অ্যান্টিয়স আবারো নগরীটি দখল করার আগে মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ে।

এবার সেলুসিডরা পুরো দেশটি জয় করে। তারা একে কোয়েলে-সিরিয়া ও ফোনিসিয়া প্রদেশ নামে ডাকতে থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ইউনিটের জন্য আবারো ভিন্ন ভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটব্যবস্থা চালু করা হয়। এসব ইউনিটের মধ্যে ছিল গ্রিক ও ফোনিশিয়া নগরী, সামরিক উপনিবেশ, ও রাজকীয় ভূখণ্ড। ইহুদি লেকদের সহায়তায় অ্যান্টিয়াস জুদার মূল্যবোধবিষয়ক বিশেষ সনদ রচনা করেন, জেরুসালেমে তার সমর্থকদের পুরস্কৃত করেন। দ্বিতীয় সিমনকে মূল্যবোধবিষয়ক অংশের প্রধান করা হয়। এর মানে হলো, হেলেনবাদী তোবিয়াদদের বিপরীতে পুরোহিততান্ত্রিক রক্ষণশীল পক্ষ উন্নতি লাভ করে। তাওরাত দেশের আইন হিসেবে বহাল থাকে, ইহুদি সিনেট পরিচালনা সংস্থা হিসেবে বিরাজ করতে থাকে। সনদে টেম্পলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়, এতে ইহুদিদের ঐশী ভূগোল প্রতিফলন ঘটালেও নেহেমিয়া ও ইজরার চেয়ে বেশি বর্জনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। উপাসনালয়ের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করার জন্য জেরুসালেম নগরীকে সব অশুদ্ধতা থেকে মুক্ত করা হয়। নগরীর ফটকগুলোতে জেরুসালেমে 'অশুদ্ধ' প্রাণীর প্রজনন বা জবাই এখন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। পুরোহিতদের মতো করে গোসল না করলে পুরুষ ইহুদিদের টেম্পলের ভেতরের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়া হতো না, এখানেই বলি দেওয়া হতো। পৌত্তলিকদেরও ভেতরের প্রকোষ্ঠে যেতে দেওয়া হতো না। এটি ছিল এমন এক উদ্ভাবন যার কোনো ভিত্তি তাওরাতে ছিল না। তবে এর মাধ্যমে পৌত্তলিক বিশ্বের প্রতি জেরুসালেমের অধিকতর রক্ষণশীল ইহুদিদের বৈরিতার বিষয়টি প্রতিফলিত

হয়। এটি নগরীতে গ্রিক পর্যটকদেরও প্রবলভাবে অভিভূত করে। টেম্পল ভবনগুলো থেকে সাধারণ লোকদের দূরে রাখাকে সহজাত বিষয় হিসেবেই দেখা হয়েছিল। কারণ, অনাদিকাল থেকে থেকেই প্রায় সব টেম্পলেই পুরোহিতদেরই কেবল অভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়া হতো। তবে গ্রিসে পরিশুদ্ধির স্বাভাবিক কৃত্যাচার পালনের পর যে কেউ টেম্পল আঙিনায় প্রবেশ করতে পারত। এখন জেরুসালেমে যাওয়া গ্রিক পরিদর্শকেরা দেখতে পেল, নারী ও শাস্ত্রীয়ভাবে অশুদ্ধ বিবেচিত ইহুদিদের সাথে তাদেরকেও বাইরের আঙিনায় সীমিত রাখা হচ্ছে। তাওরাত অনুসরণ না করায় বিদেশীদের 'অশূচি' ঘোষণা করা হয়েছিল। তাদেরকে পবিত্রতার গণ্ডির বাইরে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানেই থাকতে হতো।

তবে ঐশী চৌহদ্দির মধ্যে থাকা ইহুদিদের জন্য টেম্পল মতবাদ এমন এক স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করত যা জীবন সমৃদ্ধ করার নতুন নির্মলতা ও অনুভূতি এনে দিত। সেলুসিড আমলের প্রথম দিকে জেরুসালেমে লেখালেখিতে নিয়োজিত বেন সিরাহ সিমনের যম কিপ্পুরের অনুষ্ঠান পালনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিশ্বাসীদের ওপর টেম্পল প্রার্থনাবিধির প্রভাব সম্পর্কে কিছু ধারণা দিয়েছেন। বছরে একটি দিন ছিল, যখন পদস্থ পুরোহিতকে বিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে দেভিরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হতো। তিনি বের হওয়ার সময় লোকজনের জন্য বিপুল পবিত্রতা বয়ে আনতেন। সিমনের চারপাশে যে ঐশী জ্যোতি ছিল, তা টেম্পলের ছাদে সূর্যের রশ্মি, দৃষ্টিনন্দন রঙধনু, ফলভারে নত জলপাই গাছ ও স্বর্গের দিকে উঠতে থাকা সাইপ্রেসের সাথে তুলনীয়। বাস্তবতা উচ্চকিত হতো, অভিজ্ঞতা ছিল আরো তীব্র ঐশী সত্তা পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে প্রকাশিত হতো। সিমনের সময় পদস্থ পুরোহিতের অফিসটি সম্পূর্ণ নতুন মর্যাদা পেয়েছিল। এটি জুদা মতবাদের অখণ্ডতার প্রতীকে পরিণত হয়, জেরুসালেমের রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। বেন সিরাহ বিশ্বাস করতেন, পদস্থ পুরোহিত একাই তাওরাতের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা করার কর্তৃত্ব রাখেন। তিনি ছিলেন ধারাবাহিকতার প্রতীক : দাউদ পরিবারের রাজত্ব মাত্র কয়েক প্রজন্ম স্থায়ী হলেও হারুনের পুরোহিত্ব টিকেছিল চির দিন। বর্তমান সময় যিহোবা তার জাতির মন-মগজে এতই সমুচ্চ ও তুরীয় ছিল যে তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। তাওরাত পড়ার সময় হিব্রু ব্যাঞ্জনবর্ণ

ওয়াইএইচডব্লিউএইচ শব্দগুচ্ছ পাওয়া গেলে ইহুদিরা এখন এর বদলে প্রতিশব্দ 'আদোনাই' (প্রভু) বা 'আল ইলিয়ন' (সর্বোচ্চ) উচ্চারণ করত। একমাত্র উচ্চ পুরোহিতই ঐশী নামটি উচ্চারণ করতে পারতেন, আর তাও বছরে একবার যম কিপ্পুরে। জেরুসালেমে নির্মাণকাজের জন্য সিমনের প্রশংসাও করেছেন বেন সিরাহ। তিনি নগরপ্রাচীর ও প্রবেশদ্বার মেরামত করেন। ২০০ সালের অবরোধে এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তিনি টেম্পল মাউন্টের উত্তরে একটি বিশাল জলাধার (সাগরের মতো বিশাল) খনন করেন। এটি বেথ-হেসদা পুল (আরমাইকে 'হাউস অব মারসি') নামে পরিচিত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে রাজার দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হয় নির্মাণকাজ। কিন্তু অ্যান্টিওচুক এসব মেরামতের জন্য পাওনা পরিশোধ করতে রাজি হননি। তিনি স্রেফ নগরীর কর থেকে ভবন নির্মাণের ব্যয় বাদ দেন। ফলে সাইমন এই লঙ্ঘনে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি বলেন, এটি জেরুসালেমের রাজা ও পুরোহিতের কাজ।

বেন সিরাহ ছিলেন রক্ষণশীল। তিনি এখন নগরীতে নীরবে প্রবেশ করা বস্তুবাদের জন্য বিলাপ করছিলেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, গ্রিকদের মতো করে অনেকেই বণিকতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আক্রান্ত হয়েছে। গ্রিকরা তাদের ঘুসের জন্য লেভ্যাটাইনদের দায়ী করলেও বাস্তবে তারা এ বদভ্যাসটি পাশ্চাত্য থেকে নিয়ে এসেছিল। প্রাচীনকালে জায়ন মতবাদে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল, জেরুসালেম হলো গরিবদের আশ্রয়কেন্দ্র। কিন্তু বেন সিরাহ অভিযোগ করলেন, এখন জেরুসালেমবাসী দারিদ্র্যতাকে অবমাননাকর মনে করে, সম্পদের জন্য গরিবদেরকে একবারে ফেলে পদদলিত করা হয়। আর যদিও বেন সিরাহর গ্রিকদের তোষামতকারী ইহুদিদের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেও হেলেনবাদের প্রলোভন থেকে মুক্ত ছিলেন না। তরুণ গ্রিকরা জিমনেসিয়ায় যেভাবে হোমারের রচনাবলী পাঠ করে, জেরুসালেমের তরুণরা কেন সেভাবে মুসার লেখা পড়বে না? এটি ছিল একটি বিপ্লবী পরামর্শ। এরপর থেকে পড়াশোনা না-জানা লোকজন তাওরাতের উদ্ধৃতি মুখস্ত করতে থাকবে, তবে তারা এগুলো পড়তে পারবে, তা প্রত্যাশা করা হয়নি : পুরোহিতেরা তাদের কাছে বিধিবিধান ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু বেন সিরাহ নিজে পুরোহিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন ইহুদি বুদ্ধিজীবী, তিনি বিশ্বাস করতেন, তাওরাত হওয়া উচিত সব পুরুষ ইহুদির উদার শিক্ষার ভিত্তি। ৫০ বছর পর বেন সিরাহর নাতি, তিনি তার গ্রন্থটি গ্রিকে

অনুবাদ করেছিলেন, এ ধরনের শিক্ষা অপরিহার্য বিবেচনা করেছিলেন।' নিকটপ্রাচ্য জুড়ে হেলেনবাদী চ্যালেঞ্জের বিরোধিতাকারী পুরনো ধর্মগুলো গ্রিক বিশ্বের সংস্পর্শে এসে সূক্ষ্মভাবে বদলাতে থাকে। ইহুদি ধর্মও ভিন্ন কিছু ছিল না। বেন সিরাহর মতো ইহুদিরা ইতোমধ্যেই তাদের ঐতিহ্যের আদর্শ হিসেবে গ্রিক শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে রাব্বানিক ইহুদি ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি রাব্বিদের বিকশিত প্রশ্ন ও জবাবের ব্যবস্থাটি সক্রেটিসের শিক্ষা-পদ্ধতির প্রভাব প্রদর্শন করতে থাকে।

তবে অন্য ইহুদিরা আরো অগ্রসর হয় : তারা পুরোপুরি গ্রিক শিক্ষা গ্রহণ করার আশা করতে থাকে। তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে এটি ইহুদি ধর্মের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা জেরুসালেমের রক্ষণশীলদের সাথে সঙ্ঘাতে মেতে ওঠেছিল। বিভক্তির প্রথম লক্ষণটি ফুটে ওঠে ১৮০ সালের দিকে। ওই সময় উচ্চ পুরোহিত দ্বিতীয় ওনিয়াস, দ্বিতীয় সাইমনের ছেলে, অভিযুক্ত হন টেম্পল কোষাগার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার জন্য। রাজা চতুর্থ সেলুকাস সাথে সাথে তার উজিড় হেলিওডোরাসকে অ্যান্টিয়ক থেকে জেরুসালেমে পাঠান অর্থ উদ্ধারের জন্য। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই অর্থ সেলুসিড রাষ্ট্রের। এই পর্যায়ে এই নগরীতে সেলুসিডদের উদ্দীপনা কমে গিয়েছিল। ১৯২ সালে তৃতীয় অ্যান্টিয়ক অগ্রসয়মান রোমান সেনাবাহিনীর হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। রোমান সেনাবাহিনী গ্রিস ও আনাতোলিয়ার বেশির ভাগ দখল করে নেয়। তাকে সিংহাসনে বসার অনুমতি দেওয়া হয় এই শর্তে যে তিনি বিপুল ক্ষতিপূরণ ও বার্ষিক কর দেবেন। তার উত্তরসূরিরা এর ফলে সবসময় অর্থের তীব্র সঙ্কটে ভুগতেন। চতুর্থ সেলুসিড সম্ভবত এই ধারণা পোষণ করতেন যে সনদের ফলে তাকে জেরুসালেম মতবাদের সব ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য হওয়ায় টেম্পলের কোষাগার নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারও আছে তার। তবে তিনি টেম্পলের ব্যাপারে ইহুদি স্পর্শকাতরতার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেননি। এখন এই বিষয়টি প্রথমবারের মতো সামনে এলো। হেলিওডোরাস যখন জেরুসালেমে পৌছে টেম্পলের কোষাগারের অর্থ বাজেয়াপ্ত করতে চাইলেন, তখন লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। অনিয়াস মৃতের মতো ফ্যাকাশে হয়ে পড়লেন, মুর্ছা যাওয়ার মতো কাঁপতে লাগলেন, নারীরা চট পরে রাস্তায় রাস্তায় দৌড়াতে লাগলেন, ছোট মেয়েরা তাদের জানালার সামনে গিয়ে ঐশী সহায়তা

কামনা করতে লাগল। টেম্পলের বিশুদ্ধতা অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছিল। কোষাগারের দিকে যাওয়ার সময় হেলিওডোরাস বাতব্যধিগ্রস্তে মূর্ছা যান। এরপর তিনি সাক্ষী দেন যে তিনি তার নিজের চোখে ইহুদি ঈশ্বরকে দেখেছেন।

এই ঘটনা ছিল একটি মাইলফলক : এর পর থেকে টেম্পলের ওপর যেকোনো ধরনের হামলা জেরুসালেমে দাঙ্গার উস্কানি দেওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি করে। বছরের পর বছর টেম্পল ইহুদি ধর্মের নির্যাস প্রকাশ করে আসছিল। এটি ছিল ইহুদিদের আবেগময় মানচিত্রের কেন্দ্র, তাদের অবরুদ্ধ পরিচিতির কেন্দ্রবিন্দু। এটি জাতির মূল, এর জীবনের উৎস, সৃষ্টিশীলতা ও বেঁচে থাকার উৎস বিবেচিত হচ্ছিল। তাওরাতের নির্দেশনা মেনে চলা ইহুদিদের হৃদয়-মনে টেম্পলটি তখনো কেন্দ্রীমুখী টান দিয়ে যাচ্ছিল। এমনকি বিদেশে থাকা ইহুদিরাও এখন প্রার্থনার সময় জেরুসালেমমুখী হতো। তারা টেম্পলের মহা উৎসবগুলো উদযাপনের জন্য পবিত্র নগরীতে দীর্ঘ তীর্থযাত্রা করতে শুরু করেছিল। সাম, প্রার্থনা ও পবিত্র লেখালেখি ইত্যাদি সবকিছুই তাদেরকে টেম্পলকে দুনিয়াতে স্বর্গ হিসেবে দেখতে উৎসাহিত করেছিল। এটি নিজে ঈশ্বরের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল। একীভূত হওয়ার তাগিদ থাকা বিশ্বে ইহুদিরা স্বতন্ত্র পরিচিতি রক্ষা করেছিল। ফলে টেম্পল ও এর নগরীটি যুদ্ধবিধ্বস্ত বিচ্ছিন্ন একটি এলাকায় পরিণত হয়েছিল। টেম্পল ভবনরাজির কাছাকাছি যেতে দেওয়া হতো না অ-ইহুদিদের, পবিত্রতার যেকোনো ধরনের লঙ্ঘনের চেষ্টা জনগণ ধর্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করত। এটি কোনো যৌক্তিক অবস্থান ছিল না, এটি ছিল সহজাত ও তাৎক্ষণিক দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ প্রতিক্রিয়া।

তবে ১৮০ সালের সঙ্কটটি হেলিওডোরাসের স্ট্রোকের মাধ্যমে অবসান ঘটেনি। পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে যে ওনিয়াস কোনো না কোনোভাবে তার অসুস্থতার জন্য দায়ী ছিলেন, অপবাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাকে সেলুসিডের দরবারে তার যাওয়া দরকার হয়ে পড়ল। তবে তার শত্রুরা যেভাবে চেয়েছিল, তিনি বোকার মতো ঠিক তা-ই করে বসলেন। অ্যান্টিয়কে অবস্থান করার সময় তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাই যশুয়া বা জ্যাসন, তিনি তাকে এই নামেই ডাকতে পছন্দ করতেন, রাজা সেলুকাসের কাছ থেকে আনুকূল্য লাভ করে উচ্চ পুরোহিত্ব পাওয়ার বিনিময়ে বিপুল পরিমাণে ঘুষ প্রদান করেন। সেলুকাস এতে

খুশিমনে রাজি হওয়ামাত্র ওনিয়াস দরবার থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। পরে তিনি খুন হন। তবে উচ্চ পুরোহিত জ্যাসন তার ভাইয়ের মতো রক্ষণশীল ছিলেন না। তার কাছে তাওরাত ছিল অর্থহীন। তিনি চাইতেন তার লোকজন গ্রিক জীবনযাত্রা গ্রহণের মাধ্যমে বৃহত্তর দুনিয়ার স্বাধীনতা উপভোগ করুক। দায়িত্ব গ্রহণ করার অল্প সময় পর রাজা সেলুকাসও নিহত হন। তাকে হত্যা করেছিলেন তার ভাই অ্যান্টিকাস ইপিফানেস। জ্যাসন নতুন রাজাকেও আরো অর্থ ঘুস দিয়ে এর বিনিময়ে ২০০ সালের পুরনো সনদ বাতিল করার আহ্বান জানান। তিনি চাইতেন না জুদা আর তাওরাতভিত্তিক পুরনো আমলের টেম্পল রাজ্য হিসেবে বহাল থাকুক। এর বদলে তিনি আশা করেছিলেন, জেরুসালেম পরিচিত হবে এর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষক অ্যান্টিয়কের মতো পোলিস হিসেবে। সবসময় নগদ অর্থের অভাবে ভুগতে থাকা অ্যান্টিয়াস অর্থ গ্রহণ করে জ্যাসনের কর্মসূচিতে রাজি হন। তিনি আশা করেছিলেন, এতে জুদায় তার কর্তৃত্ব সুসংহত হবে।

কিন্তু জেরুসালেম তো রাতারাতি কোনো পোলিসে পরিণত হতে পারে না। নগরীতে গণতান্ত্রিক আদর্শ আরোপ করার আগে বিপুলসংখ্যক নাগরিককে হেলেনবাদী হতে হবে। আর তা করার আগে প্রয়োজন তাদেরকে গ্রিক সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত করা। অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ হিসেবে জ্যাসন সম্ভবত হেলেনকরণ প্রকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 'অ্যান্টিয়চেনেস'-এর সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা করেছিলেন। জেরুসালেমে একটি জিমনেশিয়াম প্রতিষ্ঠা করা হয়, উস্কানিমূলকভাবে সেটি টেম্পলের খুব কাছাকাছিই স্থাপন করা হয়। এই জিমনেশিয়ামে তরুণ ইহুদিদের হোমার অধ্যায়ন, গ্রিক দর্শন ও সঙ্গীত শেখার সুযোগ ছিল। তারা নগ্ন হয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিত। তবে জেরুসালেম পূর্ণাঙ্গ পোলিসে পরিণত হওয়ার আগে তাওরাত ছিল স্থানীয় বিধান। ফলে জেরুসালেমের জিমনেশিয়ামে হারমেস ও হেরাকলদের সম্মান জানানোর সম্ভাবনা ছিল না। প্রথম ধাপে জ্যাসনের পরিকল্পনাটি ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল। বাইবেলীয় সূত্রগুলোতে আমরা জিমনেশিয়ামের কোনো বিরোধিতা দেখি না। অ্যাথলেটিক অনুশীলন সুষ্ঠুভাবে চলার সময়ই পুরোহিতরা তাতে অংশ নিতে দ্রুত টেম্পল থেকে নেমে আসতেন। পুরোহিত, ভূস্বামী, বণিক, শিল্পী- সবাই হেলেনবাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা সম্ভবত আশা করেছিলেন, আরো উন্মুক্ত সমাজ জেরুসালেমের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। নেহেমিয়া ও ইজরার

বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতির প্রতি সবসময়ই বিরোধিতা ছিল, জেরুসালেমের অনেক ইহুদি বিশ্ব নাগরিকত্বের গ্রিক আদর্শে আকৃষ্ট হয়েছিল। ইহুদি ধর্ম কোনোভাবেই হেলেনিক বিশ্বের সাথে খাপ খাওয়াতে পারবে না- এমনটি তারা মনে করেনি। বিধানদাতা হিসেবে মুসাকে কি তুলনা করা যায় না লিসারগাসের মতো কারো সাথে? তাওরাত কোনোভাবেই সক্রেটিসের মূল্যবোধের মতো ছিল না : উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইব্রাহিম কখনো মতিজভোথকে মান্য করেননি। মামরেতে যিহোবাকে আপ্যায়ন করার সময় তিনি কি একসাথে দুধ আর গোশত খাননি? ইহুদিদের কোনো প্রয়োজন ছিল না উন্মাদের মতো নিজেদের গোয়িমদের থেকে আলাদা করার। প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদের সাথে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিনিময় উপভোগ করার মাধ্যমে ইহুদিরা আদি ঐক্যে ফিরে যেতে পারত, যা বাবেল টাওয়ারের ভবনের পর বিভিন্ন গোত্র ও ধর্মের মধ্যে বিভক্তি এনে মানবজাতিকে বিচ্ছিন্ন করার আগের অবস্থা সৃষ্টি করত। রাজা অ্যান্টিয়কাস ইপিফানেস ১৭৩ সালে জেরুসালেম সফর করেন। তাকে উষ্ণভাবে স্বাগত জানানো হয়। জ্যাসন তাদের নতুন পৃষ্ঠপোষকের সম্মানে রাস্তায় রাস্তায় মশাল শোভাযাত্রায় লোকজনের নেতৃত্ব দেন। সম্ভবত এ ঘটনাতেই জেরুসালেম আনুষ্ঠানিকভাবে পোলিসে পরিণত হয়েছিল। আর এতে বেশির ভাগ লোক খুশি হয়েছিল।

কিন্তু তারপর হেলেনবাদীরা আরো অনেক দূর অগ্রসর হয়। ১৭২ সালে জ্যাসন মেলেনাস নামের এক পুরোহিতকে অ্যান্টিচাসকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকাসহ অ্যান্টিয়ক পাঠান। মেলেনাস বিশ্বাসঘাতকতা করে এ আস্থার সুযোগটি কাজে লাগিয়ে নিজেকে উচ্চ পুরোহিত মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য আরেক দফা ঘুষ প্রদান করেন। আর অ্যান্টিওচাসের দরকার ছিল অর্থের। ফলে মেনেলাস উচ্চ পুরোহিত হিসেবে জেরুসালেমে ফিরে আসেন। জ্যাসন বরখাস্ত হন, তিনি জীবন নিয়ে পালিয়ে যান। তিনি জর্ডানের অপর তীরে আম্মানের কাছে তোবিয়াদ এস্টেটে আশ্রয় লাভ করেন। তবে জনগণ মেনেনাসকে উচ্চ পুরোহিত হিসেবে গ্রহণ করেনি। তিনি পুরোহিত পরিবারের সদস্য হলেও তিনি জাদোক বংশের সদস্য ছিলেন না। ফলে ওই পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হননি। মেনেলাস তার ভুল সংশোধন করার চেষ্টায় অ্যান্টিচাসকে দিতে যে অর্থ দিয়েছিলেন সেটি উসুল করতে টেম্পল কোষাগার লুণ্ঠন করেন। মোহভঙ্গের কারণে জেরুসালেমের অনেক লোক

'অ্যান্টিওচেন'-এর সমাজ ত্যাগ করে। অ্যান্টিওচেন এখন ছোট সংখ্যালঘু গ্রুপে পরিণত হয়ে পুরোপুরি সেলেসিড রাজার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল।

জেরুসালেমের ওয়েস্টার্ন ওয়ালে ইহুদিরা তাদের সিনাগগের জন্য নতুন একটি তাওরাত স্ক্রল নিবেদন করে রেখেছিল। অ্যান্টিচাক ইপিফানেসের নির্যাতনের পর জুদায় বিধানের জন্য নতুন আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল।

হেলেনবাদীরা কিছু খুবই সন্দেহজনক কৌশল গ্রহণ করেছিল। তবে তাদেরকে গ্রিসের সুন্দর জীবন ও বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে আকাঙ্ক্ষী স্বার্থবাদী লোক হিসেবে বিবেচনা করা ভুল হবে। তাদের বেশির ভাগই সম্ভবত অপেক্ষাকৃত বর্জনমুখী ইহুদি ধর্মের আকাঙ্ক্ষার প্রতি বেশ আন্তরিক ছিল। আমাদের আজকের দিনে ইহুদিরা তাদের ঐতিহ্যগুলো সংস্কার করতে চাইছে আধুনিকতাকে গ্রহণ করতে ও বিপুলসংখ্যক অনুসারী আকৃষ্ট করতে। এই হেলেনবাদী সংস্কারকদের প্রধান ব্যর্থতা ছিল এই যে তারা জেরুসালেমের হৃদয় পরিবর্তন সম্পর্কে অ্যান্টিচাসকে পুরোপুরি অবগত রাখেনি। এর ফলে তিনি হয়তো বুঝতে পারেননি, তাদের প্রকল্পটি কতটা অজনপ্রিয় হয়েছে। মেনেলাস গ্রিক নগরীতে জেরুসালেমকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে গেছেন। তিনি জেরুসালেমের নতুন নাম দিয়েছিলেন 'জুদার অ্যান্টিয়ক'। তিনি জিমনেশন, ইফেবেট (এ সংস্থাটি তরুণদের সামরিক, অ্যাথলেট ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে আগ্রহী করে তুলত) ও হেলেনবাদী খেলা উৎসাহিত করতেন। তবে সংস্কার ১৭০ সালে বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। মিসরে রোমানদের মোকাবিলা করতে গিয়ে অ্যান্টিচাস নিহত হয়েছেন মর্মে একটি খবর প্রকাশিত হওয়ার পর জ্যাসন অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করেন। তিনি নগরীতে ঢুকে মেনেলাস ও অ্যান্টিচেনেসকবাদী অন্যদের দুর্গে প্রবেশ করতে বাধ্য করেন। অবশ্য অ্যান্টিয়াস তখনো ভালোমতোই জীবিত ছিলেন। তিনি ক্রোধ নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করেন। এতে জ্যাসন আবার পালাতে বাধ্য হন। অভ্যুত্থানকে তিনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিবেচনা করে তিনি টেম্পল কোষাগার লুণ্ঠন করেন, টেম্পল ভবনগুলোতে বলপূর্বক প্রবেশ করে সোনার বাতিদান, ঝাড়বাতি, পর্দা ও দেভির অপসারণ করেন, সব নৌকা ও যতটা সম্ভব ধুনুচি কেড়ে নেন। সবচেয়ে ঐশী এলাকার মধ্যে তার এসব লঙ্ঘনের ঘটনা

ইহুদিরা কখনো বিস্মৃত হয়নি, ভবিষ্যতে অ্যান্টিচাস ইহুদি জনগণের আদি শত্রু হিসেবে দেখা হয়। জেরুসালেমে এখন পোলিস থেকে ছোট হয়ে স্রেফ একটি সামরিক উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। সিরীয় গ্যারিসনের সমর্থন নিয়ে এর শাসনকাজে নিয়োজিত ছিলেন মেনেলাস। তবে তা নগরীর আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। পরের বছর অ্যানিটচাসকে আরেকটি বাহিনী পাঠতে হয়েছিল। এই বাহিনী সাবাথের দিনে জেরুসালেমে আক্রমণ চালিয়ে নগর-প্রাচীরের অংশবিশেষ ভেঙ্গে ফেলে। সিরীয়রা এরপর নতুন একটি দুর্গ নির্মাণ করে যেখান থেকে টেম্পল এলাকা দেখা যায়। একে বলা হয় অ্যাকরা। এটি জেরুসালেমে সেলুসিড সদরদফতরে পরিণত হয়। কার্যত অ্যাকরা পরিণত হয় আলাদা জেলায়। এখানে বাস করত পৌত্তলিক সৈন্য ও হেলেনবাদী ইহুদিরা। এখানে গ্রিক ঈশ্বরদের উপাসনা করা হতো।

তবে এটিই সবকিছু নয়। সম্ভবত মেনেলাস ও তার অ্যান্টিওচেনেসের আদেশে অ্যান্টিচুস একটি ডিক্রি জারি করেন। এটি ইহুদি উদ্দীপনার ওপর অনিস্বীকার্য প্রভাব ফেলে, অনেক ইহুদির পক্ষে অ-ইহুদি বিশ্বের সাথে খাপ খাওয়ানো আবেগগতভাবে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ ডিক্রিটি ২০০ সালের সনদ বাতিল করে দেয়, জুদায় ইহুদি বিশ্বাসের অনুশীলনকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। এটি ছিল ইতিহাসের প্রথম ধর্মীয় নির্যাতন। এতে সাবাথ বিশ্রাম, খতনা ও বিশুদ্ধতার বিধান পালনের মতো টেম্পলের প্রার্থনাবিধি নিষিদ্ধ করা হয়। ডিক্রি অমান্যকারীকে মৃত্যুদণ্ডের ডিক্রি জারি করা হয। যেসব নারী তাদের ছেলেদের খতনা করাত, তাদেরকে নগরীর চারপাশে ঘোরানো হতো, শিশুদেরকে প্রাচীর দিয়ে উপত্যকার নিচে ছুঁড়ে ফেলা হতো। এক মা তার সাত ছেলের সবার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেন। বিধানের প্রতি তার এমন নিষ্ঠা ছিল যে তিনি তার প্রতিটি সন্তানের মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করেন। পরে তিনি নিজেকে মৃত্যুর মুখে সঁপে দেন। ইলিয়েজার নামের ৯০ বছর বয়স্ক এক লোক শূকরের মাংস খাওয়ার বদলে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাওরাতের জন্য লোকজন একবার মরতে শুরু করলে তা পুরোপুরি নতুন ইহুদি পন্থায় ঐশী বিষয় বলে গণ্য হয়ে যায়।

এই ডিক্রির ফলে টেম্পল মাউন্ট বদলে যায়। অ্যান্টিচুস নগরী ও বাকি অংশের মধ্যে থাকা পবিত্র স্থানের মধ্যকার প্রাচীরগুলো গুঁড়িয়ে দেন। তিনি পরিকল্পিতভাবে তাওরাতে থাকা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন, সেখানে গাছপালা লাগিয়ে গ্রিক-স্টাইলের ঐশী উদ্যানে পরিণত করেন। দুই বছর আগে অ্যান্টিয়চুসের লুণ্ঠন করা টেম্পল ভবনরাজি ফাঁকা ও বিচ্ছিন্ন থাকে। ১৬৭ সালের ২৫ কিসলেভে (ডিসেম্বর) রক্ষণশীল ইহুদিরা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল যে বলি দেওয়ার স্থানের পাশে 'ঘৃণা স্তম্ভ' (সম্ভবত মাতজেভাহ, একটি দণ্ডায়মান পাথর) স্থাপন করা হবে। এর গাছপালা ও উন্মুক্ত বেদীতে পবিত্র স্থানটি এখন পুরনো ব্যামোহর মতো মনে হতে লাগল। বস্তুত ম্যামরে ও মাউন্ট কারমেলে তখনো এ ধরনের উপাসনালয় বিরাজ করছিল। টেম্পল এখন জিউস অলিম্পিয়সের প্রতি নিবেদন করা হলো। তবে এর মানে অনিবার্যভাবে এ কথা বোঝায় না যে ইহুদিদেরকে এখন গ্রিক দেবতাকে উপাসনা করতে বাধ্য করা হচ্ছিল। এই সময়কালে অলিম্পিয়স ছিলেন স্রেফ 'স্বর্গের প্রতিশব্দ। এ এলাকাটি তাই স্বর্গের দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হলো। যিহোবার প্রতি প্রযোজ্য পদবি অন্য যেকোনো সর্বোচ্চ ঈশ্বরের প্রতিই প্রয়োগ করা যেতে পারে।৯

হেলেনবাদিরা সম্ভবত বিশ্বাস করত যে তারা ইব্রাহিমের অপেক্ষাকৃত সহজ ধর্মে ফিরে যাচ্ছে। তারা মনে করত, মুসার তাওরাতের জটিলতা প্রবর্তনের আগে ইব্রাহিম একই ধরনের ধর্মমন্দিরে উপাসনা করতেন। ১০ আমরা পরের অধ্যায়গুলোতে দেখব, অন্যান্য একেশ্বরবাদীদেরও জেরুসালেমে এই আদি ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল। স্বর্গের ঈশ্বরের প্রার্থনার মাধ্যমে তারা সম্ভবত একটি যৌক্তিক মতবাদ সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছিল, যা সব মানুষের কাছে তথা অ্যাকরার গ্রিকদের পাশাপাশি অ্যান্টোচেনের ইহুদের কাছে আকর্ষণীয় হবে। তাদের কর্মসূচি অষ্টাদশ শতকের ইউরোপিয়ান আলোকসম্পাত যুগের ফরাসি দার্শনিকদের সর্বোচ্চ ঈশ্বর মতবাদ থেকে ভিন্ন ছিল না। কিন্তু এসব ধারণা বেশির ভাগ ইহুদির কাছে ছিল চরম জঘন্য। প্রথমবারের মতো মহাপ্রলয়বাদী একটি ধর্মানুরাগ ইহুদি ধর্মে প্রবেশ করে, এতে ইতিহাসের সমাপ্তিতে সত্যনিষ্ঠতার চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করার কথা বলা হয়। পরবর্তীকালে এ ধরনের বিশ্বাস একেশ্বরবাদী তিন ধর্মের (অ্যান্টিওচুস ইপিফ্যানেসের অধীনে জেরুসালেম যেভাবে আক্রান্ত হয়েছিল সেভাবে

সমৃদ্ধিশীল জীবনযাত্রা আক্রমণের শিকার হওয়ার পর) প্রতিটিতেই দৃশ্যমান হয়। গ্রিকদের যৌক্তিক পন্থা ও সেক্যুলার মূল্যবোধ গ্রহণ করার বদলে রহস্যাদঘটনবাদী লেখকেরা দৃঢ়ভাবে পুরনো একেশ্বরবাদী মূল্যবোধের কথা ঘোষণা করেছিলেন। যখন বর্তমান মনে হয় আশাহীন, তখন অনেক ইহুদি মহাবিজয়ের ভবিষ্যতের সংস্করণেই বেশি স্বস্তি অনুভব করে। এসব 'ঐশী' কর্তৃত্ব দিতে তারা প্রায়ই নবী দানিয়েল বা ইউনুসের মতো অতীতের সম্মানিত নবীদের প্রতি আরোপ করত। তারা বলত, এ গোষ্ঠীপতিকে জীবনের শেষে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

শেষ দিনের দৃশ্যপটের যে কল্পনা এসব ভবিষ্যদ্বক্তা করতেন, সেটিই পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়েছে। নানা দিকে ছড়িয়ে পড়া ইসরইলের ১২টি গোত্রকে একত্রিত করে তাদের সবাইকে জেরুসালেমে নিয়ে আসা হবে। তারপর তিনি তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে ভয়ঙ্কর সব যুদ্ধে নিয়ে যাবেন, যা সময়ের শুরুতে হওয়া ঐশী সংগ্রামের স্মৃতিকথা : এবার ইসরাইলের লোকজন বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের প্রতিমূর্তি হিসেবে থাকা তাদের সব শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করবে, অপেক্ষাকৃত ভালো দুনিয়া নির্মাণ করবে। অবশ্য অনেকে যিহোবার ধর্মে গোয়িমদের ধর্মান্তরের প্রতীক্ষায় থাকে। শেষ প্রায়শ্চিত্তের এ ধারণাটি জেরুসালেমে সবসময়ই ছিল। এখন পৌত্তলিক ও ইহুদি দলত্যাগীরা মাউন্ট জায়নকে অপবিত্র করায় দানিয়াল, জুবিলি ও ইউনুস গ্রন্থের মহাপ্রলয়বাদীরা ভবিষ্যতের এমন এক যুগের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যখন নগরীটি পরিশুদ্ধ হবে, ঈশ্বর নতুন একটি টেম্পল নির্মাণ করবেন। গ্রিস সাম্রাজ্যে যখন কোনো স্থানীয় রাজা ছিলেন না, ওই সময় লোকজন এক ইহুদি মেসাইয়ার কল্পনা করত, যে তাদের চূড়ান্ত বিজয়ে নেতৃত্ব দেবেন। এসব স্বপ্নাবিভাব ছিল এমন এক সময়ে ইহুদি পরিচিতির দৃঢ় ঘোষণা যখন তা বিশেষভাবে বিপর্যয়কর বলে মনে হতো। এটি ছিল আশাহীন পরিস্থিতিতে বিশ্বাস বজায় রাখার বিষয়, এবং একটি ছোট সংখ্যালঘুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা নয়। মহাপ্রলয়বাদী ধর্মানুরাগ দ্বিতীয় ও প্রথম শতকের বেশির ভাগ ধর্মীয় আন্দোলনকে পরিব্যপ্ত করেছিল, বেন সিরার মতো সংযত বুদ্ধিজীবী ও সেইসাথে বিপ্লবীদের উদ্দীপ্ত করেছিল। কেবল ইহুদিরাই এই স্বপ্নাবিভাবের জ্বরে আক্রান্ত হয়নি। মিসরের পুরোত্তি, পারস্যের ম্যাজাই ও ভারতের ব্রাহ্মণদের আধ্যাত্মিক কৃতিত্বে বেশ অভিভূত ছিল গ্রিকরা। এরা তাদের নিজস্ব সাধু পুরুষদের চেয়ে

বেশি আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন বলে তারা মনে করত। এটি প্রাচ্যের প্রজা জনসাধারণকে আত্ম-মর্যাদার অতি-প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটি করে দেয়। গ্রিকরা সম্ভবত খুবই চতুর ছিল, তবে তাদের বিস্তারিত কর্মপন্থা ছিল স্রেফ 'ঔদ্ধত্যমূলক' ও 'বীর্যহীন।' তারা ফাঁকা ধারণার' পরিকল্পনা করতে পারত, কার্যকর যুক্তি-তর্ক দিয়ে সেটিকে শানিত করতে পারত, ওই সময়ের সন্ন্যাস পুস্তক তাদের থাকার দাবি করত। তবে 'বাস্তবে গ্রিকদের দর্শন ছিল স্রেফ কথার অর্থহীন আওয়াজ।' নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে এই বক্তব্য ছিল মার্জিত বিজয়ীদের তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে রাখার প্রয়াস।১১

এসব স্বপ্নাবিভাবীদের অনেকে নিজেদেরকে সর্বোচ্চ স্বর্গে উড়ার কথা কল্পনা করত। ঈশ্বরের মন্দিরে বসবাস করার ধারণাটি নিকট প্রাচ্যের অনেক অংশে তার প্রবল ক্ষমতা হারাতে থাকে। দ্বিতীয় ও প্রথম শতকের মিসর ও পারস্যের স্বপ্নবিভাবীরা দুনিয়াবি প্রতীক এড়িয়ে যেতে শুরু করে, সরাসরি ঈশ্বরদের পরাবাস্তব জগতে সফর করতে থাকে। এসব মরমি যাত্রা সময়ের নতুন শিকড়বিহীনতাকেই প্রতিফলিত করছিল। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা আর নির্দিষ্ট কোনো স্থানে প্রোথিত ছিল না। সবাই না হলেও অনেক লোক এ জগতের নয়, বরং ভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক মতপ্রকাশ করে- এমন স্বাধীনতা কামনা করছিল। ইহুদি মরমিবাদীরাও এসব কল্পপ্রবণ উড্ডয়নের কথা ভাবতে শুরু করে। 'অ্যাপোক্যালিপস' শব্দের অর্থ 'পর্দার উন্মোচন।' নবীদের মতো এসব স্বপ্নাবিভাবকারীও দেভিরের পর্দার পেছনের জিনিস দেখার দাবি করত। অর্থাৎ অ্যামোস, ইসাইয়া ও ইজেকিলের মতো তাদের ঈশ্বর দর্শনও ছিল জেরুসালেম ধর্মমতের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। দেভির আবারো আর্ক, পৃথিবীর ঈশ্বরের সিংহাসনে সাথে সম্পৃক্ত হলো। এখন দ্বিতীয় শতকে স্বপ্নাবিভাবকারীরা ঈশ্বরের স্বর্গীয় প্রাসাদে সরাসরি আহরণ ও স্বর্গীয় সিংহাসনের কাছাকাছি যাওয়ার কল্পনা করতে লাগলেন। এসব প্রাথমিক স্বপ্নাবিভাবের একটি বর্ণনা রয়েছে 'ফার্স্ট বুক অব ইউনুসে' (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০)। জেরুসালেমে যাওয়ার বদলে তার দর্শনে তিনি নিজেকে শূন্যে উড়ার মাধ্যমে বাতাসে ভেসে স্বর্গে 'আগুনের মুখ' ও 'সুদর্শন দেবশিশুদের ঘিরে থাকা ঈশ্বরের বিশাল মার্বেল প্রাসাদে যান। এসব কল্পনার অদ্ভূত উড্ডয়ন ছিল না। পরে আমরা পাঠ করব যে ইহুদি মরমিবাদীরা নিজেদেরকে বিশেষ বিদ্যার মাধ্যমে এই অপার্থিব ঊর্ধ্বারোহণের জন্য প্রস্তুত করছেন।

এটি বিশ্বজুড়ে যোগী ও সন্ন্যাসব্রতের মতো ছিল। এই ইহুদি স্বপ্নাবিভাবী উপবাস পালন করতেন, মাথাকে হাঁটু দুটির মাঝে স্থাপন করতেন, মন্ত্র হিসেবে ঈশ্বরের প্রশংসা করে কিছু মৃদু ধ্বনি উচ্চারণ করতেন। এর ফলে এসব আধ্যাত্মিক সাধকেরা, এই মরমিবাদী তার নিজের চোখে সাত পাহাড় [ঐশী স্থান], পাহাড় থেকে পাহাড়ে বিচরণ করতে দেখতেন। অন্য সব সত্যিকারের ধ্যানের মতো এটিই ছিল 'অন্তর্মুখী ঊর্ধ্বাহরণ।'

যদিও এ স্বপ্নবিভাবী অনুভব করতেন যে তিনি ঈশ্বরের প্রাসাদের জাগতিক প্রতিকৃতি এড়িয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তবুও টেম্পল মাউন্ট তখনো ছিল তার ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ। এটি প্রমাণ করে, এর স্থপতিরা জাতির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বাস্তবতার অভিজ্ঞতা অনুভব করেছিল। এটি তাদের অন্তর জগতকে প্রকাশ করত, জেরুসালেম টেম্পলের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তা অব্যাহত ছিল। উপাসনাকারীরা যেমন জেরুসালেমের পবিত্র এলাকা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমেই ঈশ্বরের কাছাকাছি হতে পারত, সেভাবেই ইউনুসও স্বর্গীয় দুনিয়ায় সতর্কভাবে ধাপ করা পর্বগুলোর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে গিয়েছিলেন। প্রথমে তাকে অপবিত্র দুনিয়া ত্যাগ করে ঐশী এলাকায় প্রবেশ করতে হয়েছিল, ঠিক যেমন করে তীর্থযাত্রীরা জেরুসালেমে প্রবেশ করে টেম্পল আঙিনায় যেত। বেশির ভাগকে সেখানেই থামতে হলেও ইউনুসও নিজেকে আধ্যাত্মিক উচ্চ পুরোহিত হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। প্রথমে তাকে দেবশিশুতে পরিপূর্ণ হেখালের মতো একটি বাড়িতে নেওয়া হতো। সবশেষে তাকে আরো বড় প্রাসাদ দ্বিতীয় ধাপে নেওয়া হয়। সেটি ছিল স্বর্গের সমতুল্য দেভির। এখানে তিনি জীবন্ত আগুনের স্রোতে সিংহাসনে 'মহান গৌরবকে তাতে বসে থাকতে দেখেন।' এখানে ইউনুসকে তার জাতির জন্য একটি বার্তা পেতেন! এবং যম কিপুরের উচ্চ পুরোহিতের মতো তিনি 'থর্ন রুম' ত্যাগ করে তার ধর্মাবলম্বী ইহুদিদের জন্য পবিত্রতা বয়ে এনেছিলেন। মধ্যযুগে কাব্বালি মতাদর্শে বিলীন হওয়ার আগে পর্যন্ত এই ধরনের আধ্যাত্মিকতা অব্যাহতভাবে ইহুদিদের চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করত।

অনেক ইহুদি স্বপ্নবিভাব নিয়ে গ্রিকদের বিরোধিতা করেছিল, অন্যরা অস্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিল। সেলুসিডের সৈন্যরা অ্যাকরায় শিবির স্থাপন ও টেম্পল মাউন্ট অপবিত্র করার

পর অধিকতর নিবেদিতপ্রাণ ইহুদিদের অনেকে মনে করতে থাকল যে তারা আর জেরুসালেমে বাস করতে পারবে না। এসব অভিবাসীর মধ্যে ছিল হ্যাসমোনিয়ান পরিবার, বয়োবৃদ্ধ পুরোহিত ম্যাত্তাথিয়াস ও তার পাঁচ ছেলে। তারা মোদিয়েনের গ্রামে আশ্রয় নিলো। তবে রাজকীয় কর্মকর্তারা যখন স্বর্গের ঈশ্বরের নতুন যৌক্তিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে এলেন, তখন ম্যাত্তাথিয়াস ও তার ছেলেরা পাহাড়ে পালিয়ে গেল। তাদের অনুসরণ করেছিল অন্যান্য ধার্মিক ইহুদি। তারা তাদের সব মালামাল পেছনে ফেলে গিয়েছিলেন। তারা 'পাহাড়ে পাহাড়ে বুনো জানোয়ারে মতো বাস করত, অপবিত্রতার স্পর্শ এড়াতে বনের লতাপাতা খেত। ১৪ তারা অ্যান্টিওচুজের ফরমানের কাছে নতি স্বীকারকারী ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্ররোচণা চালত, নতুন গ্রিক বেদীগুলো উল্টে দিত, ছেলে শিশুদের খতনা বাধ্যতামূলক করার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। ১৬৬ কসালে ম্যাত্তিথিয়াস মারা গেলে তার ছেলে জুদাস, ডাক নাম ন্যাকাবিয়াস ('হাতুরি-মাথাওয়ালা'), আন্দোলনটির নেতৃত্ব গ্রহণ করে গ্রিক ও সিরিয়ান সৈন্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেন। সেলুসিডরা মেসোপটেমিয়া দখলে ব্যস্ত থাকায়, সেখানে পার্থিয়ানরা তাদেরকে তাদের অবস্থান থেকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, জুদাসের প্রচারণায় অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করে।১৫ ১৬৪ সাল নাগাদ অ্যান্টিয়চুস তার কুখ্যাত ফরমান প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন, জুদাস জেরুসালেমের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভে সক্ষম হন। অবশ্য তিনি অ্যাকরা থেকে গ্রিক ও অ্যাটিওচেনদের সরিয়ে দিতে পারেননি।

জুদাস ও তার সহকর্মীরা টেম্পলের ভস্মীভূত ফটকগুলো ও মাউন্ট জায়নের ঐশী উপবন দেখে তাদের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে তাদের কষ্ট প্রকাশ করার জন্য সেগুলো প্রদর্শন করেন। তারপর তারা স্থানটি পরিশুদ্ধ করে, টেম্পল ভবনরাজি নতুন করে সাজিয়ে তোলেন, সবশেষে হেখালে সাত শাখাযুক্ত মোমদানির বাতিগুলো প্রজ্জ্বলিত করেন। ২৫ কিসলেভে, তিন বছর আগে এই দিনে সেলুসিডরা পবিত্র স্থানটিকে অপবিত্র করেছিল, টেম্পলটি আবার উৎসর্গ করা হয়।১৬ অনুগতরা টেম্পলের আঙিনা দিয়ে শোভাযাত্রা বের করে। এ সময় তারা সুকোথের মতো খেজুর ও পাতাযুক্ত শাখা বহন করে। সবশেষে তারা ঘোষণা করে যে এই চানুকা উৎসবটি ('উৎসর্গ') পুরো ইহুদি জাতি প্রতি বছর উদযাপন করবে।

ম্যাকাবিদের বিদ্রোহটি সফল হতে পারার কারণ ছিল সেলুসিড শিবিরে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। সিংহাসনের দাবিদার একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনকে স্থাপনার করার মাধ্যমে জুদাস ও তার উত্তরসূরিরা তাদের অবস্থান সুসংহত করকে সক্ষম হয়। ১৬১ সালে রোমের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন জুদাস। এটি নিঃসন্দেহে তার হাতকে শক্তিশালী করে। ১৭ সবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ১৫২ সালের দিকে হ্যাসমোনিয়ান আন্দোলন সরকারি স্বীকৃতি পায়। এ সময় সেলুসিডদের এক প্রার্থী জুদাসের ভাই ও উত্তরসূরি জোনাথনকে ইথনোসের গভর্নর করেন। আরো ভালো কিছু করার প্রত্যাশায় জোনাথনকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী উচ্চ পুরোহিত নিযুক্ত করেন। ১৫২ সালের সুকোথ উৎসবে জোনাথনকে প্রথমবারের মতো পবিত্র পোশাক পরানো হয়, লোকজন এই ঘটনায় সম্ভ্রমে নতজানু হয়। ১৮ ১৪৩ সাল পর্যন্ত জোনাথন ওই পদে ছিলেন। তারপর সেলুসিড সিংহাসনের আরেক প্রার্থী তাকে অপহরণ করে হত্যা করে। তার ভাই সাইমন হ্যাসমোনিয়ান কর্তৃত্ব ঘোষণা আবারো করতে সক্ষম হন। তিনি নিজেকে ইথনোসের শাসক হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন, নতুন সেলুসিড রাজা দ্বিতীয় দেমেত্রিয়াস তাকে উচ্চ পুরোহিত করেন। গ্রিস সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীন হয়ে যায় জুদা। কয়েক শ' বছরের মধ্যে জুদাবাসী পৌত্তলিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়। পরের বছর গ্রিক ও অ্যান্টিয়চেন ইহুদিরা, অ্যাকরা দখলে রাখা গ্রিক ও অ্যান্টিয়চেন ইহুদিরা, সাইমনের কাছে আত্মসমর্পণ করে। দুর্গটি মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। যোশেফাসের মতে, এ কাজটি ছিল খুবই কঠিন। এতে লাগে তিন বছর। এই বিজয় জাতীয় উৎসব হিসেবে উদযাপিত হয়। ১৯

হ্যাসমোনিয়ান বিপ্লব শুরু হয়েছিল জনপ্রিয় বিদ্রোহ হিসেবে। তারা আবেগপূর্ণভাবে সাম্রাজ্যের শক্তি গ্রিক সংস্কৃতির বিরোধিতা করেছিল। তবে সাইমন ও তার উত্তরসূরীদের অধীনে যে রাষ্ট্রটি এসেছিল, তাতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা শুরুতেই বিদ্রোহীদের অসন্তুষ্ট করেছিল। মেনেলাস উচ্চ পুরোহিত্ব নিশ্চিত করলে ইহুদিরা মর্মাহত হয়। কারণ তিনি জাদোক বংশের ছিলেন না। এখন হ্যাসমোনিয়ান শাসকেরা উচ্চ পুরোহিত হলেন। তবে তারা পুরোহিত পরিবারের হলেও কোনোভাবেই জাদোক ছিলেন না। সম্ভবত ইহুদি শাসন ও পৌত্তলিক রাজবংশের কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিকল্প ছিল সামান্যই। হ্যাসমোনিয়ানরা সৈনিক হিসেবে ভালো ছিল, তাদের কূটনৈতিক দক্ষতাও ছিল,

কিন্তু পরমোৎকর্ষের কোনো আদর্শ ছিল না তাদের। সাইমনকে আসলে তার নিজের ছেলেরাই হত্যা করেছিল। যদিও কয়েক শ' বছরের অন্ধকারময়তা ও বিপর্যয়ের পর বেশির ভাগ জুদাবাসী হ্যাসমোনিয়ানদের অর্জনে চরমভাবে গর্বিত ছিল। সাইমনের ছেলে জন হাইক্যানাস (১৩৪-১০৪) যখন আশপাশের কিছু এলাকা জয় করেন, তখন অবশ্যই তাদের মনে হয়েছিল যে রাজা দাউদের গৌরবময় দিন বুঝি ফিরে এসেছে। ১২৫ সালের দিকে সেলুসিডরা তাদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ও পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে হাইক্যানাসের জন্য সামারিয়ার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা কঠিন কিছু ছিল না। তার প্রথম কাজ ছিল শেচেমের কাছে মাউন্ট জেরিজিমে ওয়াইএইচডব্লিউএইচের নামে সামারিতানরা যে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিল, সেটি ভাঙ্গা। দক্ষিণে উদমিয়া পর্যন্ত সীমানা সম্প্রসারণ করেছিলেন জন। তিনি এখানকার বাসিন্দাদের ইহুদি ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ও খতনা গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। অনেক বিপ্লবের মতো বিদ্রোহী জান্তাও যাদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল, তাদের মতোই হয়ে যায়। সেলুসিডদের মতো হ্যাসমোনিয়ানরাও সাম্রাজ্যবাদীতে পরিণত হয়। তারা তাদের প্রজাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি স্পর্শকাতরতাহীনই ছিল।

অধিকন্তু, নিমর্ম হলেও সত্য যে ইথনোরা পুরোপুরি হেলেনকৃত অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। জন হারক্যানাসের অধীনে জেরুসালেম আবারো টেম্পল মাউন্ট দেখা যায়, এমন দুরত্ব পর্যন্ত জেরুসালেম সম্প্রসারিত হয়েছিল। এটি অধিকতর সম্পদশালী ও অভিজাত ও পুরোহিত পরিবারগুলোর বসবাসের স্থানে পরিণত হয়। তারা নিচে ওল্ড ইর ডেভিডে বসবাসকারী অপেক্ষাকৃত গরিব লোকদের চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা বাতাস ও স্বাস্থ্যকর অবস্থা উপভোগ করত। এই পশ্চিম দিকের জেলাটি অনেক বেশি গ্রিক নগরীতে পরিণত হয়েছিল। হ্যাসমোনিয়ান আমলের খুব সামান্য অবশিষ্ট পাওয়া গেছে। তবে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ওয়েস্টার্ন হিলের সর্বোচ্চ পয়েন্টে স্তম্ভ ঘেরা একটি বাজার (অ্যাগোরা) ছিল। হ্যাসমোনিয়ানরা জ্যাসনস জিমনেশিয়াম বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে নগরীর পশ্চিম অংশে ছিল একটি উদ্যান ঘেরা স্থাপনা। এ ধরনের স্থানে সাধারণত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তবে জেরুসালেমে সম্ভবত জনসভার স্থান হিসেবে জায়গাটি ব্যবহৃত হতো। হ্যাসমোনিয়ান স্থাপনাগুলোর মধ্যে বেশ ভালোভাবে টিকে থাকা

একটি সৌধ হচ্ছে কিদরন ভ্যালির বেনে হেজির পরিবারের পুরোহিতের কবর। এটিতে গ্রিক ও প্রাচ্য স্টাইলের চমকপ্রদ সমন্বয় দেখা যায়। সবশেষে আসে ওয়েস্টার্ন হিলের পূর্ব দিকের ঢালের কথা। টেম্পলকে দেখা যায়, এমনভাবে তারা নিজেদের জন্য একটি জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। এটি পুরনো নগরীর সাথে সংযোগকারী টাইরোনোয়ন ভ্যালি পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সেতু দিয়ে টেম্পল মাউন্টের সাথে সংযুক্ত ছিল।

এই হেলেনবাদী বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তখনো অবয়বগত, রাজনৈতিক ও আধ্যাতিকভাবে নগরীতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল টেম্পল। টেম্পলটি বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল রাজা দ্বিতীয় টলেমির সময়ের এক লেখককে। তিনি একটি রোমান্সের পটভূমি হিসেবে টেম্পলকে দেখেছিলেন। নিজেকে তিনি বলতেন অ্যাসিটিয়াস। তিনি মাউন্ট জায়নের ঢালে থাকা ধর্মস্থানটি সম্পর্কে লিখেন যে অ্যাম্পিথিয়েটারের আসনের মতো বাসাবাড়ি ও রাস্তাঘাট ছিল। তিনি হেখালের প্রবেশপথে বিশাল পর্দা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন যেটি যেকোনো দিক থেকেই দরজার মতো দেখতে ছিল। তবে ব্যতিক্রম ছিল কেবল এই যে এটি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঘোরে, পথ দিয়ে বায়ু চলাচল করে। ২১ তিনি টেম্পলের আশপাশের পথের নিচে থাকা জলাধারের ব্যাপক ব্যবস্থার প্রশংসাও করেন। এটি বলি দেওয়া পশুর রক্ত ধুয়ে দিত। তিনি ভূমিতে কান পেতে দাবি করেন যে তিনি নিচে পানির কল কল শব্দ শুনতে পেয়েছেন। সর্বোপরি অ্যারিটিস পুরোহিতদের হাবভাব ও দক্ষতায় অভিভূত হন। তার বর্ণনায় দেখা যায়, তারা বিরামহীনভাবে কাজ করে, পূর্ণ মনোযোগের সাথে একটির পর একটি পশু বলি দিতে থাকেন। পশুগুলোকে এক হাতে তুলে উঁচু করে সেগুলোকে দূরে ফেলতে তাদের প্রয়োজন হয় তাদের ‘শারীরিক শক্তিকে ছাপিয়ে যাওয়ার। ২২ তবে তাদের বেশির ভাগ কাজই খুবই অরুচিকর। অবশ্য কাউকে নির্ধারিত বিরতির পর কাজে ফিরতে বলত না। পুরো কাজ সম্পন্ন হয় একটি শব্দ উচ্চারণ ছাড়াই। টেম্পল আঙিনার নিশ্চলতা অতিপ্রাকৃত। অ্যারিস্টেজ লক্ষ করেছেন, সব স্থানে নীরবতা এত ভয়াবহ যে মনে হতে পারে দুনিয়ায় কেউ নেই। তিনি বলেন, পুরোহিতদের সংখ্যা সাত শ’ হলেও এবং তারা টেম্পলে অনেক পশু সাথে করে নিয়ে এলেও সবকিছুই সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধার সাথে সম্পন্ন করা হয়। ২৩

তবে জুদার সব ইহুদি এই প্রশংসার সাথে একমত ছিল না। তারা সবাই আবেগপূর্ণভাবে টেম্পলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তবে বেশ বড় সংখ্যক লোক মনে করত যে হ্যাসমোনিয়ানরা তাদের শুদ্ধতা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই কঠিন বছরগুলোতে জুদাতে তিনটি উপদলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা মোট জনসংখ্যার দিক থেকে সামান্য হলেও প্রবল প্রভাবশালী ছিল। তাদের ব্যাপকভাবে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ ছিল ভবিষ্যতে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করতে জুদার ইহুদিদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়া। অবশ্য আমরা পরের অধ্যায়ে দেখতে পাব, মাত্র একটি ইস্যুতে তারা তাৎক্ষণিকভাবে একতাবদ্ধ হয়ে পড়ত। তা হলো টেম্পলের পবিত্রতার ওপর কোনো ধরনের হুমকি সৃষ্টি। স্যাদুসিরা ছিল হ্যাসমোনিয়ানদের প্রধান সমর্থক। এই উপদলের সদস্যরা ছিল পুরোহিত ও সম্পদশালী শ্রেণিভুক্ত। তারা ওয়েস্টার্ন হিলের আপার সিটিতে বাস করত। তারা হেলেনবাদীতে পরিণত হয়েছিল, চাইত তাদের পৌত্তলিকদের প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করতে। তবে তারা রাজা, টেম্পল ও এর উপাসনা পদ্ধতি হিসেবে তাদের জাতির এ ধরনের প্রাচীন প্রতীকগুলোর প্রতিও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এই সময়ে নিকট প্রাচ্যের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতো তাদের ইহুদি ধর্মও সেকেলে বলে মনে হচ্ছিল : আদর্শীকৃত অতীতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ছিল তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের সাথে নতুন গ্রিক উদ্দীপনায় তাদের শিকড়কে সম্পর্কিত রাখার পথ। স্যাদুসিরা লিখিত তাওরাতে কোনো ধরনের সংযোজন গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। তারা বিশ্বাস করত যে রাজা দাউদের মতো হ্যাসমোনিয়ানরাও পুরোহিত্বকে রাজতন্ত্রের সাথে মিলিয়ে ফেলেছে। তবে হ্যাসমোনিয়ানদের কারণে অন্য ইহুদিরা সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়েছিল। বুনো প্রান্তরে নতুন নির্বাসনের জন্য তারা ইহুদি সমাজ থেকে নিজেদের পুরোপুরি সরিয়ে নিয়েছিল। টিচার অব রাইটেনাস নামে পরিচিত তাদের নেতা ছিলেন সম্ভবত উচ্চ পুরোহিত। জোনাথনকে ওই পদে নিযুক্ত দেওয়ার সময় তাকে বলপূর্বক অবসর দেওয়া হয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে কেবল কোনো জাদোকবাদীই এই উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, তাই জোনাথন টেম্পলের পবিত্রতা নষ্ট করেছিলেন। তার কয়েকজন অনুসারী, এসেনেস নামে পরিচিত, মৃত সাগরের তীরে কামরানে আশ্রম ধরনের সম্প্রদায়ে বাস করত। অন্যরা ছিল অপেক্ষাকৃত কম চরমপন্থী। তারা জুদার শহর ও নগরীগুলোতে বাস করত, টেম্পলে উপাসনা অব্যাহত রাখে। অবশ্য তাদের এই বিশ্বাস ছিল যে এটি নৈরাশ্যকরভাবে দূষিত

হয়ে পড়েছে। ইসেনেসরা প্রবলভাবে মহাপ্রলয়ে বিশ্বাস করত। তাদের মতে ওই সময় ঈশ্বর পবিত্র নগরী ও তাদের টেম্পল আবার নির্মাণ করবেন। জন হারক্যানাসের শাসনকালে তাদের সদস্য সংখ্যা বেড়ে প্রায় চার হাজার হয়, এসেনে সম্প্রদায় জেরুসালেমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই তিন দলের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ছিল ফারিসিরা। তারা তাওরাতের সঠিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করত। তারাও বিশ্বাস করত যে হ্যাসমোনিয়ন শাসকদের উচিত নয় উচ্চ পুরোহিত্ব গ্রহণ করা। তারা এই বিশ্বাসেও পৌঁছেছিল যে লোকজন এসব খারাপ ইহুদির অধীনের চেয়ে বিদেশী শাসনেই ভালো থাকে। জন হারক্যানাস আমলের শুরুতে জেরুসালেমে ছড়িয়ে পড়া বিদ্রোহের পেছনে ফারিসিরাও থাকতে পারে। এই বিদ্রোহে রাজাকে নির্মমভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।২৪ তারা তার ছেলে আলেক্সান্ডার জ্যানেয়াসের (১০৫-৭৬) শাসনেরও বিরোধিতা করেছিল। তিনি সুকোথের অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করার সময় টেম্পলে রাজার ওপর আক্রমণকারী বিদ্রোহীদের মধ্যেও তারা থাকতে পারে। তারা শোভাযাত্রার সময় সাথে করে আনা লেবুও তার দিকে ছুঁড়ে মারে। এর পরপরই আলেকজান্ডার ছয় হাজার লোককে হত্যা করেন। ২৫ অপর ঘটনায়, আরেক বিদ্রোহে আলেক্সান্ডার আট শ' বিদ্রোহীকে জেরুসালেমে ক্রুশবিদ্ধ করেন, তাদের চোখের সামনে স্ত্রী ও সন্তানদের নির্মমভাবে গলা কেটে লাশগুলো ঝুলিয়ে রাখেন। তিনি তার উপপত্নীদের সাথে ভোজ ও পান উৎসব করার ফাঁকে ফাঁকে নৃশংসতার দিকেও চোখ রাখছিলেন।২৬ এই নৃশংস ঘটনায় সম্ভবত অনেকের কাছে প্রমাণ করে যে বিপুল আশা সৃষ্টিকারী এই রাজারা ছিলেন আসলে আরেকটি হেলেনবাদী স্বৈরতন্ত্রের চেয়েও খারাপ।

আলেকজান্ডার অব্যাহতভাবে নতুন এলাকা জয় করতে থাকেন, জর্ডানের উভয় তীরে সম্প্রসারিত রাজ্য শাসন করতেন তিনি। তিনি নতুন ভূখণ্ড জয় করার সময় অ-ইহুদি অধিবাসীদের ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরকরণের সুযোগ দিতেন। যারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করত না, তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো। তিনি জানতেন যে তার শাসন সার্বজনীনভাবে জনপ্রিয় নয়। তিনি তার মৃত্যুশয্যায় তার স্ত্রী সালোমকে, তিনি তাকে প্রলুব্ধ করেছিলেন, পরামর্শ দিয়ে যান ফারিসিদের ক্ষমতা দিতে। তিনি তাদের প্রভাবের ব্যপ্তি জানতেন, আশা

করেছিলেন যে 'তারা জাতিকে বলপূর্বক তার [স্ত্রীর] অনুকূলে নিয়ে আসতে পারবে।' তার স্ত্রী তা করেছিলেন, কিন্তু তা রাজবংশটিকে রক্ষা করতে পারেনি। খ্রিস্টপূর্ব ৬৭ সালে তার মৃত্যুর পর তার দুই ছেলে দ্বিতীয় হারক্যানাস ও দ্বিতীয় অ্যাস্টিবোবুলাস বিভিন্ন বহিরাগত শক্তির সহায়তায় রাজত্ব ও পুরোহিত্বের জন্য রক্তাক্ত সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। এসব মিত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন অ্যান্টিপ্যাটার। ইদুমিন এ লোকটি আলেক্সান্ডারের অধীনে আঞ্চলিক গভর্নরের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি এখন হারকানাসের সমর্থক হলেন। হারকানাস ও অ্যাসিটোবুলাস রোমান জেনারেল পম্পেইয়ের কাছে আবেদন জানান। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৬৪ সালে অ্যান্টিয়কে এসেছিলেন। তিনি শেষ সেলুসিড রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। ফারিসিরা ও পম্পেইয়ের কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে তাকে তাদের দেশের রাজতন্ত্রও উচ্ছেদের জন্য অনুরোধ করেন। কারণ হিসেবে তারা বলে যে তাদের ধর্মে এ ধরনের ঐতিহ্য নেই।

ভেড়ার শিঙের বাঁশি (শোফার) বাজানোর, ইহুদি নতুন বছরের সূচনায় ওয়েস্টার্ন ওয়ালে রাব্বিরা তা করতেন, উদ্দেশ্য ছিল সম্ভ্রম সৃষ্টি। অনুতাপ ও শেষ দিবসের স্মরণে এ প্রাচীন প্রথাটি সেকেন্ড টেম্পলের সৌম্যতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করত।

জেরুসালেম পরিণত হয় এসব যুধ্যমান উপদলের যুদ্ধক্ষেত্র। দ্বিতীয় অ্যারিস্টোবুলাস ও তার সমর্থকেরা টেম্পলে তাদের প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করে, টাইরোপোয়ান ভেলির উপর থাকা সেতু আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। দ্বিতীয় হারকানাস ও অ্যান্টিপ্যাটারের দখলে ছিল আপার সিটি। তারা তাদের মিত্র হিসেবে রোমান সেনাবাহিনীকে আমন্ত্রণ জানায়। হ্যাসমোনিয়ান প্রাসাদে একটি রোমান সেনাছাউনি স্থাপন করা হয়। পম্পেই নগরীর সবচেয়ে অরক্ষিত স্থানে তথা টেম্পলের উত্তরে তার শিবির সরিয়ে নেন। অ্যারিস্টোবুলাস তিন মাস আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। যোসেফাস আমাদের বলছেন যে রোমান জেনারেল টেম্পল পুরোহিতদের নিবেদিতপ্রাণ অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। টেম্পল আঙিনায় ক্ষেপণাস্ত্র বৃষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই পুরোহিতেরা তাদের বলির পশু নিয়ে আসছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে হারক্যানাসের সৈন্যদের পর রোমান সৈন্যরা প্রতিরক্ষা গুঁড়িয়ে দিয়ে বিপুল সংখ্যায় টেম্পল আঙিনায় প্রবেশ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও

পুরোহিতেরা তাদের কাজ বন্ধ করেননি।২৮ ভয়াবহ তাণ্ডবে ১২ হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হয়, পুরো ইহুদি জাতিকে ভয় দেখানোর জন্য পম্পেই টেম্পল ভবনে প্রবেশ করে হেখাল পর্যন্ত হেঁটে যান, ডেভিরের অন্ধকার পবিত্রতার দিকে তাকান। জনসাধারণের উদ্বেগ প্রশমিত করার জন্য তিনি সাথে সাথে সরে আসেন, স্থানটি বিশুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। তবে দেশে, তারা একে বলত প্যালেস্টিনা,২৯ রোমান দখলদারিত্ব টেম্পলের পবিত্রতা লঙ্ঘনের সাথে শুরু হয়। ইহুদিরা লক্ষ্য করল, নতুন প্রভুরা পবিত্র জিনিসকে অপবিত্র করাকে তারা পরোয়া করে না।

ধ্বংস

পম্পেই তার জয়ের পর পরাজিত হাসমোনিয়ান রাজ্যের ওপর কঠোর শর্তাবলী আরোপ করেন। ইহুদিদেরকে জুদা, ইদুমিয়া, পারেইয়া ও গ্যালিলি শাসন করার সুযোগ দেওয়া হলেও ভবিষ্যতে সামারিয়ার ইহুদিবাদীরা, উপকূলীয় সমভূমি, গ্রিক নগরী, ফনেসিয়ান উপকূল, ডেক্যাপলিসের অ-ইহুদিরা তাদের নিজস্ব বিষয়াদি পরিচালনা করার সুযোগ পায়। যেসব লোক ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত হতে অস্বীকৃতি করে, দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল, তাদেরকে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়। দ্বিতীয় অ্যারিটোবুলাসকে শৃঙ্খলিত করে রোমে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে পম্পেই তার মিত্রদের পুরস্কৃত করেন। অ্যান্টিপ্যাটার সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতেন, তিনি ছিলেন জুদার দায়িত্বে। অবশ্য তাকে দামাস্কাসের রোমান দূতের কাছে রিপোর্ট করতে হতো। দ্বিতীয় হারকানাসকে উচ্চ পুরোহিত করা হয়। এটি হাসমোনিসের প্রতি তখনো সহানুভূতি অনুভব করা লোকজনকে খুশি করে। তবে জেরুসালেম তার রাজনৈতিক মর্যাদার অনেকটাই হারিয়ে ফেলে : পম্পেই এর প্রাচীরগুলোকে মাটিয়ে মিশিয়ে দেন, এটি এখন স্রেফ ভূবেষ্টিত উপ-প্রদেশের রাজধানী হিসেবে টিকে রইল। একে সামারিতানদের নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডের মাধ্যমে গ্যালিলি থেকে আলাদা করা হয়। আর ইহুদি প্রতিবেশীদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়ার কোনো কারণ ছিল না অ- ইহুদিদের।

হ্যাসমোনিনরা তাদের ক্ষমতা আবার জাহির করার প্রয়াস চালায়। একপর্যায়ে অ্যারিস্টোবুলাস সত্যিই তাকে বন্দিকারীদের কাছ থেকে পালিয়ে নিজেকে জেরুসালেমে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তিনি সেখানে আবার প্রাচীরগুলো নির্মাণকাজ শুরু করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ সালে সিরীয় দূত গ্যাবিনাস এই বিদ্রোহ দমন করে অ্যারিস্টোবুলাস ও তার ছেলে আলেক্সান্ডারকে রোমে ফেরত পাঠান। তবে রোমানদের কাছে ফিলিস্তিনের কৌশলগত গুরুত্ব ছিল। তাছাড়া তারা তাদের ইহুদি প্রজাদের অনর্থক ক্ষুব্ধ করতে চাইছিল না। অ্যারিস্টোবুলাসের অন্য সন্তানদের ফিলিস্তিনে থাকার অনুমোদন দেওয়া হয়, হারক্যানাস উচ্চ পুরোহিত পদে বহাল থাকেন, হ্যাসমোনিনরা দেশে প্রবল উপস্থিতি বজায় রাখে। আর অ্যান্টিপ্যাটার তখনো অন্য যে কারো চেয়ে বেশি ক্ষমতাধর ছিলেন। তিনি

ছিলেন বিচক্ষণ শাসক। তাকে ইহুদিরা শ্রদ্ধা করত। যদিও তার পরিবার মাত্র সাম্প্রতিক সময়ে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং ইদুমিনদের মতো জাতিগতভাবে ভিন্ন বিবেচিত হতো। অবশ্য, অ্যান্টিপ্যাটার ও তার ছেলেরা কখনো ভুলে যাননি যে তারা তাদের অবস্থানের জন্য রোমের কাছে ঋণী। তারা সাম্রাজ্যের গোলযোগপূর্ণ রাজনীতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল, পৃষ্ঠপোষকের ক্ষমতা থেকে পতন ঘটলে তারা নিপুণভাবে পক্ষ ত্যাগ করত। ফলে খ্রিস্টপূর্ব ৪৯ সালে জুলিয়াস সিজার যখন পম্পেইকে পরাজিত করেন, তখন অ্যান্টিপ্যাটার দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে আবারো বিজয়ী পক্ষের সাথে থাকেন। সিজার তাকে সমর্থনের পুরস্কার হিসেবে পুরো জুদার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করেন, তাকে জেরুসালেমের প্রাচীরগুলো আবার নির্মাণ করার অনুমতি দেন। জোপ্পা বন্দর ও জেরিল উপত্যকা ইহুদিদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়, অ্যান্টিপ্যাটারের দুই ছেলেকে তার অধীনে টেট্রার্চ (জেলা কমিশনার) করা হয় : হেরড হন গ্যালিলি ও ফাসায়েল হয়েছিলেন জুদার কমিশনার। তারা তাদের বাবার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার উত্তরসূরি হয়েছিলেন। এই গোলযোগপূর্ণ বছরগুলোতে তাদের এটি প্রবলভাবে প্রয়োজন ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ সালের ১৫ মার্চ রোমে মারকাস ব্রুটাস ও গ্যাইয়াস সিজারের নেতৃত্বে সিনেটারদের এক ষড়যন্ত্রে জুলিয়াস সিজার নিহত হন। একই বছর অ্যান্টিপ্যাটর খুন হন তার এক পুরনো শত্রুর হাতে। হেরড ও ফাসায়েল হন সিজারের অনুগত। তবে তারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রোমের ঘটনাবলীর দিকে নজর রাখছিলেন। জুলিয়াস সিজারের নাতির ছেলে ও দত্তক পুত্র অক্টোভিয়ান ও মার্ক অ্যান্টোনিও যখন ব্রুটাস ও সিজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তখন হেরড ও ফাসায়েল প্রয়োজনবোধে আবার পক্ষ বদল করতে প্রস্তুত ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৪২ সালে ফিলিপ্পি যুদ্ধের পর ব্রুটাস ও সিজার পরাজিত হলে ফাসায়েল ও হেরড হয়ে যান মার্ক অ্যান্টোনিওর বন্ধুভাবাপন্ন। মার্ক অ্যান্টোনিও এখন রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের নিয়ন্ত্রণকর্তা। রোম তখন শান্তি ও সমৃদ্ধির নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে, হেরড ও ফাসায়েল এই পৃষ্ঠপোষতা উপভোগ করেন।

অবশ্য তা সত্ত্বেও খ্রিস্টপূর্ব ৪০ সালে রোমানরা সাময়িকভাবে ফিলিস্তিনির নিয়ন্ত্রণ হারায়। এসময় মেসোপটেমিয়ার পার্থিয়ানরা প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করে দেশটি আক্রমণ করে, তাদের প্রতিনিধি হিসেবে জেরুসালেমে হ্যাসমোনিয়ান প্রিন্স অ্যান্টিগোনাসকে স্থলাভিষিক্ত

করে। ফাসায়েলকে কারাগারে নেওয়া হয়, তাকে বন্দি অবস্থায় বিষ পানে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়। তবে হেরড পালিয়ে রোমে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেখানে তিনি ইহুদি হিসেবে সিনেটকে অভিভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করেন, তিনি রোমের পক্ষ থেকে দেশটিকে রক্ষা করতে সক্ষম। সিনেটররা ইহুদিদের হেরড রাজা হিসেবে নামকরণ করে। খ্রিস্টপূর্ব ৩৯ সালে তিনি ফিলিস্তিনে ফিরে যান। তিনি মার্ক অ্যান্টোনিওর সাহায্যে গ্যালিলি দখল করেন, ৩৭ সালে জেরুসালেম অবরোধ করেন। চার মাস পর নৃশংস হত্যাযজ্ঞের পর নগরীটি দখল করতে সক্ষম হন। হাজার হাজার ইহুদিকে সংকীর্ণ রাস্তাগুলোতে হত্যা করা হয়, টেম্পল আঙিনাকে তারা পবিত্র স্থান বিবেচনা করত। হেরডের অনুরোধে অ্যান্টিগোনাস দি হ্যাসমোনিনকে হত্যা করেন মার্ক অ্যান্টোনিও। অবশ্যই এই প্রথমবারের মতো রোমানরা কোনো অনুগত রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দিলো।

ফিলিস্তিনে ইহুদিদের রাজা হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হওয়া মাত্র হেরডের হাতে পুরো নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। রোমানরা যথাযথভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে তার নেতৃত্বে প্রদেশটি নিরাপদ থাকবে। ফলে তারা নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। হেরড নৃশংসভাবে জেরুসালেম দখল করা সত্ত্বেও ইহুদিদের মধ্যে তার সমর্থক ছিল। ফারিসিরাও হ্যাসমোনিনদের বিরোধিতা করে আসছিল, তারাও তার দাবিকে সমর্থন করে। হ্যাসমোনিয়ান প্রিন্সেস মরিয়ামকে বিয়ে করার ব্যাপারেও পূর্বসতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন হেরা। এর ফলে হ্যাসমোনিয়ান সমর্থকদের চোখেও তাকে এক ধরনের বৈধতা দিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩৬ সালে তিনি মরিয়মের ছোট ভাই জোনাথনকে উচ্চ পুরোহিত পদে নিযুক্ত করেন। তবে এই সিদ্ধান্ত ভুল বলে প্রমাণিত হয়। তরুণ হ্যাসমোনিয়ান সুকোথে পবিত্র পোশাক পরলে আবেগে লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়ে, তারা রাস্তায় রাস্তায় তার নামে উল্লাস ধ্বনি দেয়। হেরড সাথে সাথে জোনাথনকে খুন করে তার স্থলাভিষিক্ত করেন তার নিজের নিরাপদ প্রার্থীকে। সারা জীবন হেরড তার শাসনের প্রতি যেকোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ নির্মূল করতে নির্মম ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন প্রতিভাধর রাজা, তার সম্ভাব্য অস্থিতিশীল রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার রাজত্বের একেবারে শেষভাগের আগে জুদায় কোনো ধরনের আন্দোলন হয়নি।

তার ক্ষমতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল এই যে হেরড কোনো ধরনের বিপ্লবে উদ্দীপ্ত করা ছাড়াই নিজের ইচ্ছামতো উচ্চ পুরোহিতদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে সক্ষম ছিলেন। আমরা দেখেছি যে দায়িত্ব প্রবল আবেগের জন্ম দেয়, এর ফলে উচ্চ পুরোহিতেরা সারা জীবনের জন্য পদটি আঁকড়ে ধরে থাকেন। হেরডের অধীনে উচ্চ পুরোহিত রাজনৈতিকভাবে নিযুক্ত হতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরোহিতের পদটি তার ঔজ্জ্বল্য হারায়নি। উচ্চ পুরোহিতেরা কখনো স্রেফ রাজনৈতিক খুঁটি হতেন না। হেরড দেখলেন, উচ্চ পুরোহিতের আনুষ্ঠানিক পোশাক দুর্গে তালাবদ্ধ করে রাখাই দরকার, কেবল বড় বড় উৎসবের সময় তা বের করা হতো। এসব পবিত্র পোশাক পরামাত্র পুরোহিত স্বর্গীয় জ্যোতির্চ্ছটা লাভ করতেন, জনগণের পক্ষ থেকে ওয়াইএইচডব্লিউএইচের কাছে যাওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতেন। এসব পোশাকের নিয়ন্ত্রণ জেরুসালেমে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে অব্যাহত থাকে, কেবল সম্রাটই পুরোহিত শ্রেণির কাছে তাদের স্থায়ী অবমুক্ত ঘটাতেন। যে ব্যক্তি এই পোশাক পরত, তিনি ঐশী শক্তির অধিকারী বলে অনুমিত হতেন, সিংহাসনের প্রতি হুমকি হতে পারতেন।

হেরড নিজে খুবই নিবেদিতপ্রাণ ইহুদি হলেও তা ছিল তার নিজস্ব পন্থায়। তিনি ফিলিস্তিন ও আশপাশের এলাকায় অন্যান্য ধর্মের সমন্বয় সাধন করেও খুশি হতেন। হ্যাসমোনিয়ানদের বিপরীতে তিনি কখনো তার প্রজাদের ধর্মীয় জীবনে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতেন না। তিনি হ্যাসমোনিয়ানদের লোকজনকে ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত করতে বাধ্য করার নীতিকে রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়াপনা মনে করতেন। হেরড তার নিজের রাজ্যের ভেতর ও বাইরে অ-ইহুদি নগরীগুলোতে গ্রিক ও রোমান ঈশ্বরদের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। অক্টোভিয়ান নিজেকে স্বর্গীয় সত্তা হিসেবে ঘোষণা করলে হেরড সামারিয়ায় প্রথম ব্যক্তি হিসেবে তার সম্মানে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিনি এর নতুন নাম দেন সেবাস্টি। এটি ছিল সম্রাটের নতুন পদবি আগাস্টাসের গ্রিক পরিভাষা। এই সময় নাগাদ হেরড আবারো তার আনুগত্য পরিবর্তন করেন, তার পৃষ্ঠপোষক মার্ক অ্যান্টোনিও অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধে অক্টোভিয়ানের কাছে পরাজিত হলে। খ্রিস্টপূর্ব ২২ সালে স্ট্রাটোস টাওয়ারের পুরনো বন্দরের স্থানে আগাস্টাসের সম্মানে সিজারিয়া নগরী নির্মাণ শুরু করেন। নগরীটিতে রোমান দেবদেবীদের সম্মানে অনেক মন্দির, একটি অ্যাম্ফিথিয়েটার,

পিরায়াসের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি পোতাশ্রয় ছিল। এটি ছিল তার পৌত্তলিক প্রজাদের প্রতি একটি উপহার। ফলে ইহুদি রাজা হেরড পৌত্তলিক বিশ্বেও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাকে প্রদান করা শেষ গ্রেকো-রোমান সম্মানগুলোর অন্যতম ছিল তাকে অলিম্পিক গেমসের সভাপতিত্ব করতে দেওয়া।

অবশ্য ইহুদিরা যাতে ক্ষুব্ধ না হয়, সে ব্যাপারেও সমান সতর্ক ছিলেন হেরড, জেরুসালেমে পৌত্তলিক মন্দির নির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন না। তার উচ্চাভিলাষী নির্মাণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে- কোনো ছোট রাজার এ যাবতকালের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব- তিনি পবিত্র নগরীকে পরিবর্তন করে প্রাচ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মেট্রোপলিশে পরিণত করেন। নিরাপত্তার প্রতি সদা সতর্ক হেরডের প্রথম কাজ ছিল একটি বিশাল দুর্গ নির্মাণ। টেম্পল মাউন্টের উত্তরে নগরীর সবচেয়ে নাজুক স্থান তথা নেহেমিয়া দুর্গটির জায়গায় খ্রিস্টপূর্ব ৩৫ সালে নির্মাণযজ্ঞ শুরু করেছিলেন। তখনো মার্ক অ্যান্টোনিওর বন্ধু থাকায় তিনি নতুন দুর্গটির নাম তার পৃষ্ঠপোষকতার আলোকে করেন অ্যান্টোনিয়া। তিনি এটি নির্মাণ করেন ৭৫ ফুট উঁচু বিপজ্জনক ঢালু পাথুরে পাহাড়ের উপর। এর ঢালু পথটি মসৃণ পাথরের স্ল্যাবের হওয়ায় এতে আরোহণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। আয়তক্ষেত্রকার দুর্গটি এর উপর ৬০ ফুট উঠে গিয়েছিল। চার কোণায় ছিল চারটি টাওয়ার। এখানে বিশাল একটি গ্যারিসনের আবাসনের ব্যবস্থা করা যেত। এই দুর্ভেদ্য সামরিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই অ্যান্টোনিয়ায় ছিল প্রাসাদের মতোই বিলাসবহুল সুযোগ-সুবিধা। এর চারপাশে স্ট্রথিন নামে পরিচিত গভীর খাল ছিল। এই খালই দুর্গটিকে উত্তরে নির্মিয়মান নতুন উপকণ্ঠ বেজেথা থেকে আলাদা করে রেখেছিল। এখানে তিনি সম্ভবত জোড়া জলাধার নির্মাণ করেছিলেন। এটি ন্যায়পরায়ণ সাইমনের খনন করা বেথ-হেসদা সরোবরের কাছে এখনো দেখা যায়।

হেরড খ্রিস্টপূর্ব ২৩ সালের আগে জেরুসালেমের প্রকৃত পরিবর্তন শুরু করেননি। তিনি ২৫-২৫ সালের দুর্ভিক্ষের সময় লোকজনকে খাবার ও শস্য সহায়তা প্রদানে তার দক্ষতা প্রমাণের মাধ্যমে ফিলিস্তিনে শ্রদ্ধা অর্জন করে নিয়েছিলেন। অনেক জেরুসালেমবাসী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তবে নগরীটির নির্মাণকাজ শুরু হলে অনেকে নির্মাতা হিসেবে কাজ পেয়েছিল। হেরড ওয়েস্টার্ন হিলের ওপর আপার সিটিতে নিজের জন্য একটি প্রাসাদ

নির্মাণ শুরু করেন। এটি তিনটি টাওয়ারে সুরক্ষিত ছিল। তিনটি টাওয়ারের নামকরণ করা হয় তার ভাই ফাসায়েল, তার প্রিয়তমা স্ত্রী মারিয়াম দি হ্যাসমোনিয়ান ও তার বন্ধু হিপ্পিকাসের নামে। এগুলোর ছিল দৃঢ় ভিত্তি, প্রায় ১৫ মিটার করে উঁচু। সম্ভবত হিপ্পিকাসের ভিত্তি এখনো জেরুসালেম দুর্গ থেকে দেখা যায়। এটি ডেভিড (দাউদ) টাওয়ার নামে পরিচিত। প্রাসাদটিতে দুটি বিশাল ভবন ছিল। একটিকে অক্টোভিয়ানের সম্মানে বলা হতো ক্যাসারিয়াম। এতে পানি উদ্যান ছিল। এখানে গভীর খাল ও জলাধার ছিল। এগুলো ব্রোঞ্জের মূর্তি ও ঝরনায় শোভিত ছিল। হেরড সম্ভবত আপার সিটিকে রাস্তার নেটওয়ার্কে নতুন করে সাজিয়েছিলেন। এতে চলাচল ও নগর পরিকল্পনা সহজতর হয়। এছাড়া আপার সিটিতে একটি থিয়েটার, একটি হিপ্পোড্রোম ছিল। তবে আমরা এসব স্থাপনার সঠিক স্থানটি জানি না। প্রতি পাঁচ বছর পরপর আগাস্টাসের সম্মানে খেলাধুলার আয়োজন করা হতো। এতে কৃতি ক্রীড়াবিদদের সমাগম হতো জেরুসালেমে।

হেরডের আমলে জেরুসালেম পরিণত হয় একটি চমকপ্রদ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নগরীতে। নগরীটি হয় এক লাখ ২০ হাজার স্থায়ী অধিবাসীর আবাসভূমি। তিনি নগর-প্রাচীরগুলো নতুন করে নির্মাণ করেন। তবে সেগুলোর সঠিক স্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। জোসেফাস আমাদের বলছেন, ফার্স্ট ওয়াল ছিল আপার সিটিকে ঘিরে, লোয়ার সিটি ছিল প্রাচীন ইর ডেভিডের স্থানে। সেকেন্ড ওয়াল অতিরিক্ত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি অ্যান্টোনিয়া থেকে হ্যাসমোনিয়ানদের বানানো উত্তরের পুরনো প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত নতুন বাণিজ্যিক এলাকা ঘিরে রেখেছিল।' লোয়ার সিটিতে ছিল অন্যান্য সাধারণ প্রাসাদ। এখানেই ছিল মেসোপোটেমিয়ার আদিয়াবেন রাজপরিবারের অভিজাত সদস্যদের বাসভবন। তারা ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তারা নগর -প্রাচীরের বাইরে বিশাল একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। এটি এখন 'টম্ব অব দি কিংস' নামে পরিচিত। প্রাচীরগুলো চারপাশের পাহাড় আর উপত্যকাগুলোতে সাজানো পাথুরে কবর আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ফলে হলি সিটিতে লাশ সমাহিত করার প্রয়োজন পড়ত না। পাথরের গায়ে গুহার মতো সমাধি নির্মাণ করা হতো। আর তা সুরক্ষিত করা হতো একটি পাথর দিয়ে। এ পাথরটি দিয়েই সমাধিতে প্রবেশের পথটি বন্ধ করা হতো। হেরড আমলের এসব সমাধির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত কবরগুলো দেখতে পাওয়া যায়

কিদরন উপত্যকায় বেনে হেজর পরিবারের সমাধিক্ষেত্রের কাছে। এতে ছিল একটি স্মারক স্তম্ভ ও এর কাছে পাথুরে কবর। এ দুটিকে পরবর্তীকালে তীর্থযাত্রীরা বলত যথাক্রমে 'পিলার অব অ্যাবসালম' ও 'টম্ব অব যেহোশাফাত।

হেরড খ্রিস্টপূর্ব ১৯ সালের দিকে টেম্পলটি পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। লোকজন স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন হলো : রাজা কি বর্তমান ভবনরাজি গুঁড়িয়ে ফেলবেন এবং তারপর দেখতে পাবেন যে কাজ চালাবার মতো তহবিলের অভাবে পড়েছেন: তিনি কি তাওরাতের বিধিনিষেধের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন? হেরডের ভবনরাজি প্রায়ই চমকপ্রদ উদ্ভাবন হিসেবে দেখা যায়। তবে টেম্পলের পরিকল্পনা মুসা ও দাউদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন ঈশ্বর। এখানে মৌলিকত্বের কোনো অবকাশ ছিল না। হেরড সতর্কভাবে লোকজনের ভীতি প্রশমিত করেন। সব সামগ্রী জোগাড় না করে এবং পুরনো ভবনরাজির পুনর্নির্মাণের সতর্ক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মাত্রা নির্ধারণ করার আগে কাজই শুরু করেননি তিনি। সাধারণ মানুষের নিষিদ্ধ এলাকা লঙ্ঘন করতে না পারাটি নিশ্চিত করার জন্য হেরড হাজার হাজার পুরোহিতকে রাজমিস্ত্রি ও কাঠমিস্ত্রি হিসেবে প্রশিক্ষণ দেন। কেবল তারাই হেখাল ও দেভিরের কাজ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। হেরড তার সবচেয়ে সেরা যে নির্মাণকাজটির জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন তাতে নিজে কখনো তাতে প্রবেশ করেননি। নির্মাণ পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয় যে বলির জন্যও একটি দিনও ব্যঘাত ঘটেনি। টেম্পলের নির্মাণকাজ ১৮ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়। সম্ভবত হেরডের ভবনগুলোতে উপাসনা নিরবচ্ছিন্ন ছিল বলেই এর পরিচিতি হয় সেকেন্ড (দ্বিতীয়) টেম্পল (আসলে তা ছিল থার্ড টেম্পল)।

সেকেন্ড টেম্পল নামে পরিচিত হেরড ধর্মস্থানটির আকার বা আয়তন বদলাতে পারতেন না। তবে ভবনগুলো আরো সুন্দর করতে পারতেন। প্রাচীরগুলো শ্বেত মার্বেলে ঢাকা ছিল। মার্বেলগুলো 'সাগরের ঢেউয়ের মতো' লালভ ও নীলাভ শিরায় গাঁথা ছিল। হেখালের দরজাগুলো সোনায় মোড়া ছিল। এসবের উপরে সোনার আঙুরলতা ছড়ানো ছিল। এগুলো থেকে মানুষের সমান লম্বা আঙুরের গুচ্ছ আঁকা ছিল। দরজাগুলো ঢাকা ছিল অমূল্য টকটকে লাল, নীল পর্দা; সূতায় সূর্য, চাঁদ ও গ্রহ-নক্ষত্রের ছবি ছিল।

ওয়েস্টার্ন ওয়াল-টেম্পল প্লাটফর্মের পশ্চিম দিকের সহায়ক প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন রাজা হেরড। অষ্টম শতকে মুসলিমরা যখন প্রাচীরটি পুনঃনির্মাণ করেছিল, তখন তাদের অপেক্ষাকৃত ছোট পাথরগুলো নিচে থাকা হেরডের ব্যবহার করা বিশাল বিশাল স্ল্যাবের সাথে তুলনীয় ছিল না।

টেম্পল ভবনরাজি বেশ ছোট হলেও হেরড টেম্পল প্লাটফর্মটি সম্প্রসারণ করে বিশালত্বের প্রতি তার প্রবল ভালোবাসাকে তৃপ্ত করতে পেরেছিলেন। এটি ছিল বিশাল একটি প্রকল্প, সময় লেগেছিল ৮০ বছর। ফলে এর কাজ শেষ হওয়া দেখে যেতে পারেননি তিনি। তবে কাজ সম্পন্ন করার জন্য তিনি ৮০ হাজার কারিগর নিযুক্ত করেছিলেন। কাজ শেষ হলে দেখা যায়, প্লাটফর্মটি প্রায় ৩৫ একর জায়গাজুড়ে অবস্থিত। এটি ছিল মূল আকারের কয়েক গুণ বড়। প্লাজাটি এখন মাউন্ট জায়নের পর্বত চূড়া থেকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায় একে টিকিয়ে রাখতে বিশাল ভল্ট আর স্তম্ভ দিতে হয়েছিল। নতুন সহায়ক প্রাচীরগুলো সম্পর্কে জোসেফাস লিখেছেন, এগুলো ছিল 'অশ্রুতপূর্ব ধরনের বিশালতম। কোনো কোনো পাথরের ওজন ছিল দুই থেকে পাঁচ টন পর্যন্ত। হেরড তার টেম্পল প্লাটফর্মটি পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত করতে চাননি। ফলে পুরনো পূর্ব দিকের প্রাচীরটি, যা একইসাথে ছিল নগর-প্রাচীরও, বহাল থেকে যায়। এরপর থেকে টেম্পল মাউন্টের ওই এলাকাটি জায়নের উপর প্রথম নির্মাতা সোলায়মানের নির্মাণস্থলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। নতুন নির্মাণের মধ্যে পশ্চিম দিকের সহায়ক প্রাচীর ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ। এটির আয়তন ছিল অ্যান্টোনিয়া থেকে দক্ষিণে পশ্চিম দিকের প্রাচীরের ভূমিতে অবস্থিত লোয়ার মার্কেট পর্যন্ত প্রায় ৫৩০ গজ। এই মার্কেট ছিল পুরোহিতদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকা, পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের কাছে তা ছিল খুবই জনপ্রিয়। প্রাচীরের গায়ে তিন ধারার পাথর দিয়ে এগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। নগর পরিষদ ভবনগুলো ও জাতীয় আর্কাইভ ছিল পশ্চিম প্রাচীরের পাদদেশে। টেম্পল প্লাটফর্মের উপরে বর্তমান হারাম আল-শরিফের পোর্টিকোর মতো করে নির্মাণের বদরে গ্রিক ফ্যাশনের কলামযুক্ত পোর্চে তিন দিক দিয়ে ঘেরা ছিল। প্লাটফর্মটির পুরো দক্ষিণ দিকটি ছিল স্তম্ভ ঘেরা বিশাল এলাকা, অনেকটা রোমান ফোরামের মতো। এটি গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি থেকে আশ্রয় ও ছায়া দিত। রয়্যাল পোর্টিকো ছিল স্যালসবারি ক্যাথেড্রালের সমান, ছয় শ' ফুট লম্বা ও সর্বোচ্চ বিন্দুতে এক

শ' ফুট উঁচু। দক্ষিণ দিকের সহায়ক প্রাচীরের উপরে চকমকে শ্বেত মার্বেলে ঢাকা ছিল। এটি ছিল সমীহ জাগানিয়া দৃশ্য। দূর থেকে টেম্পল মাউন্ট ছিল দর্শনীয় বস্তু। জোসেফাস লিখেছেন, পবিত্র স্থানটির দিকে কেউ তাকাতে চেষ্টা করলে সোনায় প্রতিফলিত সূর্যের আলোকে চোখে আগুনের গোলা হানা দিত, তাকে মুখ সরিয়ে নিতেই হতো।' তিনি আরো লিখেছেন, দূর থেকে যে অংশটি সোনায় মোড়া ছিল না সেই অংশকে মনে হতো সাদা বরফে ঢাকা পর্বত। ফলে এটি ধ্বংস হওয়ার অনেক পরেও রাব্বিরা যখন এই দাবি করতেন, তা বিস্ময়কর ছিল না : 'হেরডের টেম্পল যে দেখেনি, সে তার জীবনে সুন্দর কিছু দেখেনি।

তীর্থযাত্রীরা দুটি দিক দিয়ে টেম্পল আঙিনায় প্রবেশ করতে পারত। তারা হয় রয়্যাল পোর্টিকোতে উঠে যাওয়া বিশাল সিঁড়ি বেয়ে সেখানে যেত কিংবা পশ্চিম দিকের সহায়ক প্রাচীরের পাদদেশে থাকা সড়ক পর্যন্ত বিস্তৃত দুটি সেতু পাড়ি দিয়ে যেত। প্লাটফর্মে গেলেই দর্শকেরা আঙিনার জটিল ব্যবস্থা দেখতে পেত। প্রতিটিই ছিল শেষেরটির চেয়ে পবিত্র। এভাবে পথ চলে দেভিরের চূড়ান্ত পবিত্র স্থানে যাওয়া যেতে। (দেখুন ডায়াগ্রাম)। তীর্থযাত্রীরা প্রথমে 'কোর্ট অব জেনটিলস'-এ প্রবেশ করত। এটি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। এটি একটি রাজসিক স্তম্ভশ্রেণি দিয়ে 'কোর্ট অব ইসরাইলি' (শাস্ত্রীয়ভাবে বিশুদ্ধ পুরুষ ইহুদিদের জন্য) আলাদা ছিল। বিদেশীদের আর আগে না বাড়ার হুঁশিয়ারি সঙ্কেত দেওয়া ছিল। এই হুঁশিয়ারি অমান্যের শাস্তি ছিল মৃত্যুর যন্ত্রণা। প্রতিবন্ধকতার পর ছিল 'কোর্ট অব ওম্যান'। উঁচু গ্যালারিতে জালি দিয়ে ঘেরা এই স্থান থেকে নারীরা বেদির আঙিনায় পশু বলি প্রত্যক্ষ করতে পারত। এর পর আসত 'কোর্ট অব লেভিটেস'। সব শেষে 'কোর্ট অব প্রিস্টস', এতে বলির সবচেয়ে বড় বেদী ছিল।

ভেতরের প্রকোষ্ঠের দিকে এই পর্যায়ক্রমিক যাত্রা তীর্থযাত্রী ও উপাসনাকারীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিত যে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তার পথে আলিয়া (ঊর্ধ্বগমন) করছে। তারা পাক-পবিত্র হতে নানা ধরনের শাস্ত্রাচার পালন করত। এটি তাদের মধ্যে স্বাভাবিক জীবন থেকে কিছুটা আলাদা হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করত। কারণ, তাদের পবিত্র ঈশ্বরের আলাদা জগতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এই সফরের সময় তাদেরকে পুরোহিতদের মতো একই

ধরনের শাস্ত্রীয় শুদ্ধাচার অনুসরণ করতে হতো। বিশেষ করে তাদেরকে মৃত্যুর (এটিই ছিল সবচেয়ে বড় অসূচিতা) যেকোনো ধরনের সংস্পর্শ থেকে পবিত্র হতে হতো। দৈনন্দিন জীবনে এটি এড়ানো অসম্ভব : যে কেউ অসাবধানতাবশত কিছু বোঝার আগেই প্রাচীন কোনো কবরের স্থানে পা ফেলে থাকতে পারে। তবে জীবনের বড় যেকোনো পরিবর্তন, যেমন শিশুর জন্ম ইত্যাদিও অসূচি বিবেচিত হতো। এটিকে নোংরা বা পাপ কাজ বিবেচনা করা হতো, এমন কারণে নয়, বরং এ কারণে যে এ ধরনের পরিবর্তনের আগেই তারা ঈশ্বরের কাছাকাছি যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছিল এবং তীর্থযাত্রীর যেখানে যাওয়ার কথা ছিল সেখান গেলে প্রতীকীভাবে এই অপরিবর্তনীয়তার অংশীদার হতো। তীর্থযাত্রীদেরকে বাড়ি ত্যাগের আগে স্থানীয় পুরোহিত যদি বিশুদ্ধ করে না দিতেন, তবে তাদেরকে টেম্পল মাউন্টে যাওয়ার আগে জেরুসালেমে সাত দিন অপেক্ষা করতে হতো। এই সময়ে তাদেরকে যৌনকাজ থেকে বিরত থাকতে হতো, তৃতীয় ও সপ্তম দিবসে তারা শাস্ত্রীয়ভাবে পরিশুদ্ধ হতে পানি ও ছাইয়ের ছিটা দিত, শাস্ত্রীয়ভাবে গোসল করত। এই বাধ্যতামূলক অপেক্ষা ছিল আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি ও আত্ম-পরিশুদ্ধ হওয়ার সময়। এটি অভ্যন্তরীণ সফরে তীর্থযাত্রীদের স্মরণ করিয়ে দিত যে তারা অবশ্যই চূড়ান্ত বাস্তবতায় 'উঠছে' এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রায় প্রবেশ করছে।

তারা যখন সবশেষে বেদী আঙিনায় যে পশুটিকে বলি দিতে চায়, সেটিকে নিয়ে টেম্পল প্লাটফর্মে উঠত, তখন তীর্থযাত্রীরা মনে করত, তারা অস্তিত্বের আরো তীব্র এলাকায় প্রবেশ করেছে। কোনো না কোনোভাবে এই নিঃসঙ্গ এলাকায় পৌছাতে পারলে বাস্তবতার সামগ্রিকতা অনুভব করা সম্ভব হতো। এই সময়ের মধ্যে টেম্পলের প্রতীকীবাদ মনে হয় বদলে গিয়েছিল : এটি এখন সমগ্র মহাজগতের ক্ষুদ্র প্রতীকিতে পরিণত হয়েছিল। একবার পুরোহিত হিসেবে টেম্পলে দায়িত্ব পালনকারী জোসেফাস এর মহাজাগতিক কল্পনাকে ব্যাখ্যা করেছেন। 'কোর্ট অব দি জেন্টিসল' এখনো আদি সাগর যমের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তা ছিল পবিত্রতার শৃঙ্খলাপূর্ণ বিশ্বের বিপরীতে দণ্ডায়মান। এটি মনের ওপর স্থায়ী চ্যালেঞ্জ ছিল, তা অতিক্রম করতে হতো। অন্য দিকে হেখাল প্রতিনিধিত্ব করত পুরো সৃষ্ট বিশ্বের। এটি প্রতীকীভাবে চারটি উপাদান থাকত। এগুলো হলো 'স্বর্গের পুরো উদ্যান', সাত পৃথিবীর জন্য দণ্ডায়মান মহা বাতিদানের ওপর থাকা বাতি, জুদিয়াকের চিহ্ন

স্মরণ করিয়ে দেওয়া পবিত্র ১২টি রুটি ও বছরের ১২ মাস। ধূপদানির বেদীতে থাকত 'সাগর ও ভূমির (জনবসতিপূর্ণ ও নির্জন এলাকার) ১৩ মসলা। এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসত এবং ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করত। আলেক্সান্দ্রিয়ার ফিলো (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪১ পর্যন্ত), তিনি তীর্থযাত্রী হিসেবে একবার জেরুসালেম এসেছিলেন, এই প্রতীকীবাদের সাথে পরিচিত ছিলেন। প্ল্যাটোবাদী এ লোকটিও উল্লেখ করেছেন, হেখালের আসবাবপত্রে স্বাগীয় ধারণার প্রতিনিধিত্ব করত, ওই আদর্শে তৈরি হতো। ওই আদর্শ ছিল আমাদের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও দেখার ক্ষমতার বাইরে!' অর্থাৎ টেম্পল মাউন্টের পরিকল্পনা ও নক্সা ছিল ঈশ্বরের পথে চলার পরিক্রমা। আপনি সাধারণ নশ্বর দুনিয়া থেকে বিশৃঙ্খলার প্রান্তিক এলাকা, আদি সাগর, গোয়িম অতিক্রম করে ঈশ্বরের সৃষ্ট সুশৃঙ্খল বিশ্বে প্রবেশ করবেন, তবে আপনি এটি দেখবেন ভিন্নভাবে। দুনিয়াটি এখন ঈশ্বরের পথে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। একবার দুনিয়াতে স্বর্গীয় পথে সফর করতে পারলে, উচ্চ পুরোহিত যেভাবে চূড়ান্ত বাস্তবতায় যান হেখাল দিয়ে, পুরো বিশ্বের ভিন্ন অর্থ হয়ে দেখা দেবে। এটি অবশ্যই দেভিরে প্রতীকীভাবে হবে, হেখাল থেকে আরেকটি পর্দা দিয়ে আলাদা থাকবে। দেভির ছিল ফাঁকা, কারণ এটি আমাদের অনুভূতি ও ধারণার ঊর্ধ্বে থাকা কোনো কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে : জোসেফাস আমাদের বলেছেন, 'এখানে একেবারেই কিছু রাখা হতো না। এটি ছিল সবকিছুর ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অলঙ্ঘনীয় ও অদৃশ্যমান।

পবিত্র ঈশ্বরের চরম বিচ্ছিন্নতা এই তথ্যকে গুরুত্ব দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিল যে কেবল পুরোহিতেরাই টেম্পলে পবিত্রতার কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি হতে পারে। জোসেফাস ব্যাখ্যা করেছেন যে উচ্চ পুরোহিতের পোশাকও ছিল মহাজাগতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ : তার জোব্বা স্বর্গ ও পৃথিবীকে প্রতীকীভাবে ফুটিয়ে তোলে, গায়ের উপরের অংশের জামায় থাকে চারটি উপাদান। এটি ছিল যথাযথ। কারণ উচ্চ পুরোহিত কেবল 'পুরো মানবজাতি নয়, বরং প্রকৃতি, পৃথিবী, পানি, বাতাস ও আগুনের' প্রতিনিধি হিসেবে হেখালে পৌরহিত্য করতেন।' তবে যম কিপ্পুরের ওপর দেভিরে প্রবেশ করার সময় উচ্চ পুরোহিত পোশাক বদলিয়ে দেবশিশুদের পোশাক সাদা লিনেনের কাপড় পরে নিতেন। এই পোশাক স্বর্গ ও দুনিয়ার মধ্যে মধ্যস্ততা করত। ঐশী স্থানটি এমন এক অস্তিত্বের শক্তিশালী উপস্থিতি সৃষ্টি

করত যা মানবীয় অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রস্তুতির শাস্ত্রাচার, মাউন্টে আরোহণ, টেম্পল ভবনরাজির আঙিনার স্তরে স্তরে থাকা পবিত্রতার সবই উপাসনাকারীদের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করত যে তারা স্বাভাবিক জীবনে হলেও তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে অস্তিত্বশীল আরেকটি মাত্রায় মোড়া একটি স্থানে প্রবেশ করেছে। মেসোপোটেমিয়ান জিগারাতের উপর থাকা প্লাটফর্মের মতোই ছিল এর পবিত্রতার মাত্রা। তারা টেম্পল মাউন্টের মাত্রাটিকে দেভিরের 'শীর্ষে' থাকা ঐশী এলাকাগামী একটি প্রতীকী ঐশী পর্বতে নিয়ে যেত। টেম্পলের কল্পনা উপাসনাকারীদের এমন এক দৃশ্যপটে নিয়ে যেত যেখানে তারা অস্তিত্বের কেন্দ্রে থাকা নশ্বর দুনিয়ার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারত। যমের ধ্বংসকরী শক্তিসহ জীবনের সামগ্রিকতা দেভিরের গোপন পবিত্রতায় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করত।

হেরডের আমলে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অবশিষ্ট ফিলিস্তিন ও বিভিন্ন স্থান থেকে বেশি তীর্থযাত্রী আকৃষ্ট করত জেরুসালেম। পাসওভারের মহা উৎসব, উইকস পেন্টেকস্টের ফসল তোলার উৎসব ও সুকোথে জেরুসালেমে তিন লাখ থেকে পাঁচ লাখ লোকের সমাবেশ ঘটত।১২ শুদ্ধতার ওপর জোর দেওয়া সত্ত্বেও এসব উৎসব বিষণ্ণতা বা সংযমের কোনো বিষয় ছিল না। তীর্থযাত্রীরা পরিবারগুলোকে একসাথে অবকাশ কাটানোর সুযোগ করে দিত। জেরুসালেমে যাওয়ার দীর্ঘ সফরে তীর্থযাত্রীরা রাতে একসাথে মদ্যপান করতে পারত, কৌতুক বলতে পারত, হাসতে পারত, জনপ্রিয় গান গাইতে পারত। জেরুসালেমে পৌঁছে তারা সত্যিকারের উৎসব মেজাজের সাথে পরিচিত হতো। তীর্থযাত্রীরা নগরীর সিনাগগগুলোতে কিংবা ব্যক্তিগত বাড়িঘরে অবস্থান করতে পারত। অনেকে নগরীর বাইরে পাহাড় ও উপত্যকায় শিবির স্থাপনকে অগ্রাধিকার দিত। তারা জেরুসালেমে ব্যয় করার জন্য বিশেষ তীর্থ কর নিয়ে আসত। এই অর্থ ধার্মিক কাজে ব্যবহার হতো না। তারা তাদের সাথে থাকা অর্থ লাল গোশত, মদ বা অন্য আরো অনেক ভোগে ব্যবহার করতে পারত। এই শিথিল পরিবেশে নতুন বন্ধু জুটত, তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ইহুদি সংহতি জোরদার হতো। দানের বন্ধন ঈশ্বরের বন্ধনের পাশাপাশি শক্তিশালী হতো।'

উৎসবগুলো সহজাতভাবেই ছিল আনন্দ করারও সময়। সুকোতের অষ্টম দিবসের পরিবেশ তখনো ছিল ছুটির আমেজপূর্ণ। লোকজন নগরজুরে গাছপালা ঘেরা স্থানগুলোকে ক্যাম্প খাটাত। পাসওভার ছিল বিশেষভাবে জনপ্রিয় উৎসব। প্রতিটি পরিবার পাসওয়ারের জন্য তৈরি একটি বলির ভেড়া টেম্পলে নিয়ে যেত। ওই দিন রাতে সবাই মিলে এটি দিয়ে উৎসব ভোজ সারত। এটি হতো মিসর থেকে তাদের লোকজনের মুক্তির স্মরণে। বিশেষভাবে প্রাণবন্ত উৎসব ছিল ওয়াটার ড্রয়িংয়ের উৎসব। এটি প্রতীকীভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দুনিয়ার লোকজনকে ঐক্যবদ্ধ করত। ইসরাইলি সৃষ্টিতত্ত্ব এখন পৃথিবীকে পানিতে ঘেরা একটি ক্যাপস্যুল হিসেবে কল্পনা করত। এর উপরের পানিতে ছিল পুরুষ, আর বিপজ্জনক, স্রোতের নিচে থাকা পানিকে কল্পনা করা হতো তিয়ামাতের মতো নারী হিসেবে : তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য চিৎকার করত। জেরুসালেম পৃথিবীর 'কেন্দ্র' হওয়ায় এই স্থানে অস্তিত্বের সব পর্যায় মিলিত হতে পারত। বছরে একবার নিচের দুনিয়ার 'থমকে দেওয়া সত্তা' প্রতীকীভাবে উন্মুক্ত হতো, উপরের ও নিচের পানিরাশি মিশে যেত, আর লোকজন উল্লাসে ফেটে পড়ত। পরবর্তীকালে রাব্বিরা বলছেন যে এই উৎসবের অভিজ্ঞতা যারা নেই সে কখনো তার জীবনে আনন্দ বলে কিছু জানবে না।' এটি আদি বিশৃঙ্খলার শক্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যা আগামী বছরের তেজদীপ্ততা, সৃষ্টিশীলতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে প্রবেশ করার জন্য দরকার ছিল।

হেরডের আমলে ইহুদি আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র হিসেবে বহাল থাকে টেম্পল। তবে কোনো কোনো ইহুদি ঈশ্বরের অনুসন্ধানে অন্যান্য পথও খুঁজকে শুরু করেছিল। আমরা দেখেছি, অনেকে বিশেষ করে বিদেশে থাকারা টেম্পল প্রতীকীর দিকে আধ্যাত্মিক যাত্রা করত টেম্পলকে এড়িয়েই। ইহুদিরা সিনাগগ ও সম্মেলন স্থলগুলোতেও জমায়েত হতো। এসব স্থানে তারা তাওরাত পাঠ করে জেরুসালেম সফর না করেই আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করতে পারত।১৫ এমনকি ফিলিস্তিনেও অনেক ইহুদি বিশ্বাসী সম্প্রদায় ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে। তবে ফারিসিরা তখনো টেম্পলের প্রতি নিবেদিত ছিল। হেরডের আমলে শাম্মাই মতবাদ পৌত্তলিক মতবাদ থেকে অনেক বেশি কঠোরভাবে নিজেদেরকে আলাদা করেছিল। তারা অ-ইহুদিদের সাথে খেত না, গ্রিক ভাষায় কথা বলত না কিংবা পৌত্তলিকদের উপহারও গ্রহণ করত না। টেম্পলের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যই এমন

রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছিল। এটি পৌত্তলিক শাসকদের সমর্থন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত ছিল। তবে শাম্মাইয়ের দেখানো আলাদা সম্প্রদায় প্রাচীন ঐশী ভূগোলও প্রতিফলিত করত। এটি পৌত্তলিকদের পবিত্রতার ঊর্ধ্বে স্থান দিত।

শাম্মাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হিল্লেলও বিশুদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন। তবে তিনিও বদান্যতার গুরুত্বের ওপর জোর দিতেন। হ্যাসমোনিয়ান আমলে সমানুভূতির আদর্শ সম্ভবত হারিয়ে গিয়েছিল। অ্যান্টিচুস ইপিফানেসের দুর্যোগের পর জেরুসালেমের বিশুদ্ধতার ওপর জোর দেওয়া হতে থাকে। জায়ন মতবাদের অনিবার্য সহগামী বিবেচিত সামাজিক উদ্বেগ তেমন গুরুত্ব পাচ্ছিল না। এখন হিল্লেলের ফারিসিরা তাওরাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিতজভোত হিসেবে দান ও ভালোবাসা-দয়ার্তকে গ্রহণ করতে লাগল। এগুলো টেম্পলে বলি দেওয়ার সমপর্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত বিবেচিত হতে লাগল।১৬ কোনো কোনো ফারিসি বিশেষ ভ্রাতৃ সমিতি গঠন করত। এর মাধ্যমে তারা টেম্পল উপাসনার জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত শাস্ত্রীয় শুদ্ধতায় স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ছিল। এটি ছিল তাদের নিজেদের বাসায় ঈশ্বরের উপস্থিতিতে অব্যাহতভাবে বসবাস করার প্রতীকী পন্থা। তারা তাদের টেবিলগুলোকে পুরোহিতদের আঙিনার মহা বেদী হিসেবে পবিত্র বিবেচনা করত। তারা যখন ওই টেবিলে একসাথে খাবার গ্রহণ করত, তাদের একসাথে খাবার গ্রহণ পবিত্র ঘটনা বিবেচিত হতো, মনে করত, যেভাবে বলির পশু দিয়ে খাবার গ্রহণ করত পুরোহিতেরা।১৭ এই ধরনের ধর্মনুরাগ প্রতিটি বাড়িকে মন্দিরে পরিণত করত, সাধারণ বাড়িতেও জেরুসালেমের পবিত্র বাস্তবতা নিয়ে আসত।

একইভাবে হেরড যুগের শেষ দিকে কামরান উপদলও নিজেদের একটি নতুন আধ্যাত্মিক মন্দির হিসেবে সত্যিকারের ইসরাইলি সম্প্রদায় বিবেচনা করত। জেরুসালেমের দূষিত টেম্পলের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও তাদের স্ব-আরোপিত নির্বাসনে তারা সম্প্রদায়গতভাবে পবিত্র মন্দির হিসেবে খাবার ঘরে যেত। তারা টেম্পলের স্থায়ী অধিবাসী পুরোহিতদের মতোই জীবনযাপন করত। খাবার গ্রহণের আগে তারা ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করত, পুরোহিতরা যেভাবে বলি দেওয়া পশুর গোশত আহার করার সময় লিনেনের সাদা কাপড় পরত, তারাও তেমনটি করত। দলবদ্ধ হয়ে প্রার্থনা করাটি

বিবেচিত হতো বলির বিকল্প। তবে এটি কেবল সাময়িক ব্যবস্থা ছিল। এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা এমন একদিনের অপেক্ষায় ছিল যেদিন দুই মেসাইয়ার নেতৃত্বে- একজন পুরোহিত ও অন্যজন সাধারণ লোক- তারা জেরুসালেম মুক্ত করার চূড়ান্ত যুদ্ধে অন্ধকার শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তখন পবিত্র নগরী পুনরুদ্ধার হবে, ঈশ্বর আবার টেম্পল নির্মাণ করবেন। কামরান সম্প্রদায় নিজেদের ইভিওনিম বা গরিব মানুষ হিসেবে অভিহিত করত, তাদের মতে কেবল তারাই ছিল জায়নের সত্যিকারের অধিবাসী। এ স্থানটি সবসময়ই গরিব আর বিনীত লোকদের জন্য স্বর্গ বিবেচিত। তারা এই নতুন জেরুসালেমের অপেক্ষায় থাকার সময় প্রথাগতভাবে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এসব শরিভাষা ও বাগধারা ব্যবহার করত :

আমি তোমাকে স্মরণ করছি যে জায়ন, আশীর্বাদের জন্য;

আমার সব শক্তি দিয়ে, আমি তোমাকে ভালোবাসি;

তোমার স্মৃতি চিরকালের জন্য আশীর্বাদ।১৮

তাওরাতে ইহুদিদের প্রশংসা করা হয়েছিল তাদের সব শক্তি দিয়ে কেবল ওয়াইএইচডব্লিউএইচের প্রতি ভালোবাসার জন্য। তিনিই ছিলেন একমাত্র আশীর্বাদের উৎস, কেবল তার স্মৃতিই ছিল চিরকালের আশীর্বাদ। কামরানের প্রার্থনা-গীতে এসব শব্দগুচ্ছের ব্যবহার ঘটনাক্রমে স্থান পেয়েছে- এমন নয় : এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা ছিল নিখুঁত ও ঈর্ষান্বিত হওয়ার মতো একেশ্বরবাদী। তবে ঐশী সত্তা কখনো নিজেকে সরাসরি মানুষ হিসেবে প্রকাশ করেননি এবং শত শত বছর ধরে জেরুসালেম ছিল এমন এক মূল প্রতীক যা ইহুদিদের অপ্রবেশযোগ্য ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা দিয়েছে। কামরান সম্প্রদায়ের জন্য জায়ন ছিল শান্তি, আশীর্বাদ ও মুক্তি থেকে অবিভাজ্য। এগুলো ছিল ঈশ্বরের অভিজ্ঞতার অখণ্ড অংশ এবং হেরডের অধীনে নশ্বর নগরীর দুঃখজনক অবস্থা সত্ত্বেও এটি তখনো ছিল সবচেয়ে ঐশী ও ধর্মীয় মূল্যবোধের।

তবে কামরান ছিল ইহুদি ধর্মের অনেক বেশি জঙ্গি রূপ, যা ফিলিস্তিনের নাটিতে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল। গ্রেকো-রোমান বিশ্বজুড়ে লোকজন জাতীয়তাবাদী নস্টালজিয়ার সহজাত স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। টেম্পলগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, পুরনো মিথগুলো আবার জীবিত হতে থাকে, বিশেষ করে 'প্রতিরোধ' মটিফগুলো। এতে করে কামরানের মহাপ্রলয়বাদী দর্শনটি যুদ্ধের প্রাচীন কল্পকাহিনী আবার চাঙ্গা করে, যা টেম্পল তথা একটি নগরী ও সঠিক ব্যবস্থা গড়ার ভিত্তি গড়ে দেয়। একইভাবে সাধারণ ইহুদি উপাসনাকারীরা মহা উৎসবগুলোকে জাতি ও আবাসভূমির পবিত্রতা উদযাপনের বিষয় হিসেবে দেখেছে। পাসওভার ছিল জাতীয় মুক্তির উৎসব; ফসল উৎসব উইকস (শাভুথ) ইহুদিদের স্মরণ করিয়ে দিত যে স্থানটি কেবল ওয়াইএইচডব্লিউএচের, রোমের নয়। মরুভূমিতে জাতিটির সময় কাটানোর কথা স্মরণ করিয়ে দিত সুকোথ। এটি টেম্পল উৎসর্গের বার্ষিকী ছিল। এ ধরনের বিপুল সংখ্যায় জাতীয় ধর্মস্থানে তাদের ঈশ্বরের সামনে সমবেত হওয়ার সময় তাদের অনুভূতি ছিল তীব্র, কিন্তু তবুও হের অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক হওয়ায় যে তারা তাদের কথা খ্রিস্টপূর্ব ৪ শতকে তিনি মৃত্যুশয্যায় আছেন- তা শোনার আগে পর্যন্ত প্রকাশ করার সাহস করেনি।

ঘটনাটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। হেরড সম্প্রতি টেম্পল গেটে জুপিটার ও রাজকীয় রোমের প্রতীক একটি স্বর্ণ ঈগল নির্মাণ করেছিলেন। তিনি সীমা লঙ্ঘন করে অনেক বেশি দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। যখন খবর এলো যে হেরড সত্যিই মারা যাচ্ছেন, তখন দুই শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক জুডাস ও ম্যাথিয়াস তাদের ছাত্রদের ইঙ্গিত দেন যে ঈগলকে নামিয়ে আনার এটিই সুবর্ণ সুযোগ। এ ধরনের পদক্ষেপ ছিল খুবই বিপজ্জনক। তবে এটি হলো তাদের পিতৃপুরুষদের তাওরাতের জন্য মৃত্যুবরণ করার মতো গৌরবজনক কাজ! সে অনুযায়ী, তরুণরা রয়্যাল পোর্টিকোর ছাদে উঠে মোটা রশির সাহায্যে তাদের নিচে নামিয়ে আনে। তারপর কুঠার দিয়ে ঈগলটিকে ভূপাতিত করে। তবে কাজটি সময়োচিত হয়নি। মৃত্যুকে উড়িয়ে দিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে বিছানা থেকে উঠে হেরড ওই তরুণ ও তাদের শিক্ষককে মৃত্যুদণ্ড দেন। কয়েক দিন পর তিনি যখন মারা গেলেন, তখন বলা হয়েছিল যে তার মৃত্যু- যন্ত্রণা ছিল এসব পবিত্র 'শহিদের' অভিশাপের শাস্তি। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে এটি ছিল একটি সীমিত প্রতিবাদ। হেরডকে হত্যা করা কিংবা রোমান আধিপত্য

অবসানের বিন্দুমাত্র কোনো চেষ্টা ছিল না এতে। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল টেম্পলকে কলুষিত করার প্রতিবাদ করা। বিষয়টি এখানেই সীমাবদ্ধ রাখা হতো। কোনো শাসক যতক্ষণ পর্যন্ত টেম্পলকে আলাদা করে রাখবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহুদিরা তাকে বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু টেম্পলের প্রতি যেকোনো মহল থেকে কোনো ধরনের হুমকিই সহিংসতা, রক্তপাত ও ভীতিকর প্রত্যাঘাত সৃষ্টি করত।

হেরড খ্রিস্টপূর্ব ২৯ সালে তার প্রিয়তম স্ত্রী মারিয়ামনকে হত্যা করেছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি তার তিন সন্তানকেও হত্যা করেছিলেন। সব ক্ষেত্রেই কারণ ছিল একটিই : তার সন্দেহ হয়েছিল যে তারা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। হেরড তার বেঁচে থাকা তিন সন্তান- আচেলাস, ফিলিপ ও অ্যান্টিপাসকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। তাদেরকে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষমতা দেননি। তাদের মধ্যে কে তার স্থান গ্রহণ করতে পারেন, সে সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি দুটি উইল রেখে গিয়েছিলেন। ফলে তার রাজ্যের ভাগ্য বর্তায় আগাস্টাসের হাতে। তিনি তিন ছেলেকেই রোমে তলব করেন। তবে তাদের যাত্রার প্রাক্কালে তীর্থযাত্রীরা পাসওভার উদযাপনের জন্য বিপুল সংখ্যায় জেরুসালেমে প্রবেশ করছিল। পবিত্র শহিদদের সাম্প্রতিক মৃত্যু নিয়ে আবেগ ছিল প্রবল। স্থানীয় ইহুদিদের কান্না আর বিলাপে ভরে ওঠেছিল জেরুসালেম। তীর্থযাত্রীরা অল্প সময়ের মধ্যেই ক্রোধ, ভয় আর শোকগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। সবশেষে জনতাকে নিয়ন্ত্রণের আর কোনো পথ থাকল না। প্রথম দফার পশু বলির পর্ব শেষ হওয়া মাত্র আচেলাস টেম্পল আঙিনায় তার সৈন্যবাহিনী পাঠান। সেখানে থাকা তিন হাজার লোককে হত্যা করা হয়। আবারো মন্দিরকে অপবিত্র করা হলো। তবে এবার কোনো পৌত্তলিক প্রতীকের মাধ্যমে নয়, বরং ইহুদি সৈন্যরা ইহুদি রক্তপাত ঘটাল। পাঁচ সপ্তাহ পরে আর্চেলাস যখন রোমে ছিলেন, তখন পেন্টেকস্ট ও সাবিনাসেনর তীর্থ উৎসবের সময় জেরুসালেমে আরেকটি দাঙ্গা বাঁধে। এবার সিরিয়া এলাকা থেকে জুদায় একটি বাহিনী পাঠানো হয়। এই বাহিনী জেরুসালেমে অবতরণ করলে স্থানীয় ও তীর্থযাত্রী মিলে হাজার হাজার লোক রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে রোমান সৈন্যদের ওপর হামলা করে। সাবিনাস টেম্পল মাউন্টের পোর্টিকোগুলোতে আগুন ধরিয়েই এই সহিংসতা দমন করতে পেরেছিলেন। এরপর রোমানরা নগরীর প্রাচীরগুলোতে দুই হাজার বিদ্রোহীকে ক্রুশবিদ্ধ করে। ২০

ফিলিস্তিনের অন্যান্য অংশেও গোলযোগ ছিল। এর ফলে সিনেট নিশ্চিতভাবেইই বুঝতে পেরেছিল যে ইহুদিদের রাজা হিসেবে হেরডের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো আর কেউই নেই। আচেলাস জুদায় ফিরে গেলেন কেবল জুদার ইথনার্চ (শাসক) হয়ে; অ্যান্টিপাস ও ফিলিপকে গ্যালিলি, পারায়া ও উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য এলাকার টেট্রারচ (গভর্নর) হিসেবে। তারা ছিলেন সফল জেলা কমিশনার, অনেক বছর তাদের অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু আর্চেলাস ইহুদি ও সামারিতান- উভয়ের প্রতি এত নির্মম নীতি অনুসরণ করতে লাগলেন যে খ্রিস্টপূর্ব ৬ সালে তাকে বরখাস্ত করে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর থেকে জুদা রোমান পারফেক্টদের (আঞ্চলিক গভর্নর) মাধ্যমে শাসিত হতে থাকে। তারা নতুন নগরী সিসারিয়াকে তাদের রাজধানী হিসেবে নির্মাণ করেন। এটি ছিল গোলযোগপূর্ণ জেরুসালেম থেকে নিরাপদ ও বেশ ভালো দূরত্বে। এই রোমান দখলদারিত্বের প্রথম দিনগুলোতে গ্যালিলিতে উত্তেজনা ছিল। তবে এটি কল্পনা করা ভুল হবে যে পুরো ইহুদি ফিলিস্তিন আবেগপূর্ণভাবে রোমের বিরোধিতা করেছিল। এমনটি কখনোই ঘটেনি। হেরডের মৃত্যুর পর কয়েকজন ইহুদি আগাস্টাসের কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল ফিলিস্তিনে একজন রোমান গভর্নর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করতে। বিশেষভাবে ফারিসিরা তখনো যেকোনো ধরনের ইহুদি রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে যাচ্ছিল। ফিলিস্তিনে রোমান দখলদারিত্ব আদর্শ ছিল না, তবে রোম অপেক্ষাকৃত খারাপও ছিল না। বরং অতীতে ইহুদিদের শাসনকারী অন্য অনেক সাম্রাজ্যের চেয়ে বেশ ভালো ছিল। কিছু বাজে ব্যতিক্রম বাদ দিলে বেশির ভাগ রোমান কর্মকর্তা ইহুদিদের ধর্মীয় স্পর্শকাতরতাকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। তারা উচ্চ পুরোহিতের সাথে সহযোগিতা করার চেষ্টা করতেন। উচ্চ পুরোহিতেরা তাদের পক্ষ থেকেও শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তারা ঝামেলা সৃষ্টিকারীদের প্রতি সতর্ক নজর রাখতেন। তবে তারা যাতে দেশদ্রোহিতামূলক কোনো কাজে না জড়ায় সেজন্য নয়, বরং তারা চাচ্ছিলেন না ইহুদিরা অযথা মারা পড়ুক, যেভাবে হেরডের মৃত্যুর পর দাঙ্গায় হয়েছিল। এখন উচ্চ পুরোহিতদের নিয়োগ পুরোপুরি মেধার ভিত্তিতে হতো। ১৮ সালে ক্যাইফাস দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি রোমান আমালে সবচেয়ে সক্ষম উচ্চ পুরোহিত হয়েছিলেন।

তবে এমনকি ক্যাইফাসও ক্রুদ্ধ জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি, যখন ২৬ সালে নতুন প্রিফেক্ট পন্টিয়াস পিলেট আবারো টেম্পলের পবিত্রতা লঙ্ঘন করেন। তিনি অন্ধকারের আড়ালে সিজারের চিত্রশোভিত পতাকা হাতে উস্কানিমূলকভাবে জেরুসালেমে তার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। এসব দেভির থেকে অল্প দূরে শূন্যে অ্যান্টোনিয়ায় তোলা হয়। ইহুদিরা পরের দিন জেগে এই কদর্যতা দেখে তাদের মনে অ্যান্টিচুস ইপিফেনেসের ভীতি জাগে। উত্তেজিত লোকদের একটি দল মিছিল করে ক্যাসেররিয়ায় গিয়ে পিলেতের বাসভবনের সামনে তাঁবু গাড়ে। সাধারণত জুদার ইহুদিরা ভয়াবহ রকমের বিভক্ত ছিল। তাদের পক্ষে একক ফ্রন্ট গড়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু টেম্পলের প্রতি হুমকি তাদের সাথে সাথে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলে। অবশ্য এবারের ঘটনায় সহিংসতা সৃষ্টি করেনি। সম্ভবত ইহুদিরা খ্রিস্টপূর্ব ৪ সালের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। এবার তারা অপ্রতিরোধী প্রতিরোধের আশ্রয় গ্রহণ করে। পিলেত তাদের তলব করার আগে পর্যন্ত তারা তার বাড়ির সামনে পাঁচ দিন ধরে অবস্থান করতে থাকে। তারপর তিনি তাদেরকে ক্যাসেরিয়ার অ্যাম্পিথিয়েটারে ডেকে নিয়ে বলেন যে এখন তিনি তাদেরকে একটি জবাব দিতে প্রস্তুত। জনতা সমবেত হওয়ামাত্র পিলেত তার সৈন্যদের সঙ্কেত দেন। তারা সব দিক থেকে তরবারি মেলে ধরে। পিলেত যদি তাদের চুপ করাতে ভয় দেখানোর কথা ভেবে থাকেন, তবে তিনি বড় ধরনের ভুল করেছিলেন। ইহুদিরা সাথে সাথে মাটিতে পড়ে গিয়ে তাদের গলা থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদতে থাকে যে তাদের আইন লঙ্ঘন করার চেয়ে তাদের মরে যাওয়াই ভালো। পিলেত অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে হার মেনে নিতে হবে। অবমাননাকর পতাকাগুলো অ্যান্টোনিয়া থেকে অপসারণ করা হলো, আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। অবশ্য এই ঘটনা জুদার ইহুদিদের মনে টেম্পলের নিরাপত্তার ব্যাপারে আগের চেয়েও সন্ত্রস্ত্র করে তুলেছিল।

চার বছর পর আবার টেম্পল হুমকির মুখে পড়ল। গাধার পিঠে সওয়ার একটি লোকের নেতৃত্বে একটি ছোট শোভাযাত্রা কিদরন উপত্যকা থেকে নেমে মাউন্ট অব অলিভস হয়ে জেরুসালেমে এসেছিল। তখন 'হোশানাহ!' ও 'আমাদের রক্ষা করো দাউদের পুত্র!' কান্না শোনা যাচ্ছিল। কয়েকজন লোক ডাল কেটে হাত দিয়ে ঘোরায়। খবর রটে যে তরুণ লোকটি গ্যালিলির নাজারেথ থেকে আসা যিশু। তিনি যখন নগরীর কাছে এসেছিলেন, বলা

হয়ে থাকে যিশু কেঁদেছিলেন : জেরুসালেম তাকে গ্রহণ করেনি, অল্প সময়ের মধ্যেই এটি ভীতিপূর্ণ শাস্তির ঘটনায় পরিণত হবে। পবিত্র নাগরীকে তার শত্রুরা ঘিরে ফেলবে, মাটিতে মিশিয়ে দেবে, অধিবাসীদের গলা কাটা হবে। একটি পাথরও দাঁড়িয়ে থাকবে না। তারপর নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করার মতো করেই যিশু নগরীতে প্রবেশ করে সোজা টেম্পলে প্রবেশ করেন। তিনি ছোট দড়ি দিয়ে একটি চাবুক তৈরি করে মুদ্রা বিনিময়কারীদের তাড়িয়ে দেন, কোর্ট অব দি জেনটিলস থেকে বলি দেওয়ার জন্য আনা কবুতর তাড়িয়ে দেন। কিতাবে কি লেখা নেই : আমার গৃহকে বলা হবে ইবাদতখানা?' তিনি দাবি করেন। 'তোমরা একে ডাকাতদের আশ্রয়ে পরিণত করেছ। ২২ এটি ছিল পাসওভারের আগের সপ্তাহ। যিশু টেম্পল আঙিনাগুলোতে অনেকটা সময় প্রচারকাজ করেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে হেরডের বিশাল টেম্পলটি অল্প সময়ের মধ্যেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। 'তোমরা এই বিশাল ভবনরাজি দেখছ?' তিনি তার অনুসারীদের জিজ্ঞাসা করবেন। 'একটি পাথরও অন্যটির পাশে থাকবে না : সবকিছু ধ্বংস করা হবে। ২৩ চার গসপেলের প্রাচীনতমটির গ্রন্থকার মার্ক আমাদের বলছেন যে প্রধান পুরোহিতেরা কোর্ট অব জেনটিলসে যিশুর এসব কর্মকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্র তারা তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিলেন। টেম্পলের প্রতি যেকোনো ধরনের হুমকি, বিশেষ করে জনাকীর্ণ ও আবেগপূর্ণ উৎসব পাসওভারে, সহিংসতার সৃষ্টি করতে পারে। আর এর জের ধরে ভয়ঙ্কর প্রত্যাঘাত ঘটাতে পারে। যিশু ছিলেন এমন এক হুমকি যা ইহুদি জনসাধারণ বরদাস্ত করতে পারত না।

টেম্পলে উস্কানিমূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কী করতে চেয়েছিলেন যিশু? আমরা কেবল অনুমানই করতে পারি। কারণ গসপেলগুলো তেমন তথ্য দিচ্ছে না। যিশু ইতোমধ্যেই গ্যালিলির ছোট ছোট শহর ও পল্লীতে অনুসারী পেয়েছিলেন। তিনি সেখানে আরোগ্যকারী ও ওঝা হিসেবে কাজ করছিলেন। লোকজন তাকে নবী বলত। তবে যিশু নিজেকে মেসাইয়া দাবি করতেন কিনা তা আমরা জানি না। আমাদের উৎসগুলো দ্ব্যর্থবোধক। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ফিলিস্তিন থেকে রোমানদের তাড়িয়ে দিতে তিনি কোনো সেনাবাহিনী গঠন করার চেষ্টা করেননি। কিংবা হেরডের মৃত্যুর পর হবু নেসাইয়া আর যেসব কাজ করতে পারেন বলে মনে হচ্ছিল, সেসবেরও কিছু করেননি। জেচারিয়া

ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মেসাইয়া হবেন বিনীত শাসক, তাদের কাছে গাধায় চড়ে হাজির হবেন। নগরীতে যিশুর শোভাযাত্রা ছিল সম্ভবত একটি প্রদর্শনী। তিনি লোকজনকে জানাতে চাইছিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য জেরুসালেম শাসন করবে গরিবরা, হেরডের মতো সামরিকবাদী রাজা নয়। যিশু স্পষ্টভাবেই বিশ্বাস করতেন যে ওয়াইএইচডব্লিউএইচের দিবসটি আসন্ন। অন্যান্য মহাপ্রলয়বাদী ভবিষ্যদ্রষ্টার মতো তিনিও ইসরাইলে ১২ গোত্রের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, তারা তার ১২ জন শিষ্যের মাধ্যমে শাসিত হবে।২৪ সাধারণভাবে এটিও মনে করা হয়ে থাকে যে ওয়াইএইচডব্লিউএইচের শেষ বিজয়ের পর তিনি জেরুসালেমে নতুন একটি টেম্পল নির্মাণ করবেন, যেখানে সব জাতি উপাসনা করবে। মুদ্রা বিনিময়কারী ও কবুতর-বিক্রেতাদের তাড়িয়ে দেওয়ার সময় যিশু কিন্তু পবিত্র স্থানের বাণিজ্যিক অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিলেন না। এ ধরনের বেচাবিক্রি অনাদিকাল থেকে যেকোনো মন্দির পরিচালনার জন্য অপরিহার্য ছিল। ফলে এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করার কারণ ছিল না। বরং যিশু সম্ভবত আরেকটি নবুয়তি ইঙ্গিত প্রদর্শন করতে চাইছিলেন। তা হলো এই যে হেরডের সুন্দর টেম্পলটির স্থানে মানুষের হাতে নির্মিত নয় এমন একটি তীর্থ স্থান এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সময়টি আসন্ন। যিশুর এই ঘোষণার মধ্যে মৌলিকত্ব বলে কিছু ছিল না। বরং জাতীয় মুক্তির উৎসবের সময় কর্তৃপক্ষ সম্ভবত ভীত হয়ে ছিল যে তারা রোমের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভের উস্কানি দেবেন।

জুদার অন্য যে কারো মতোই যিশুর প্রলয়-সংশ্লিষ্টতা ইঙ্গিতের সাথে পরিচিত ছিলেন ক্যাইফাস। তবে টেম্পল নিয়ে উষ্কানিমূলক কথাবার্তা বলতে দিতে রাজি ছিলেন না। কারণ মাত্র অল্প সময় আগে পিলেতের পরিকল্পিত অবমাননাচেষ্টার ফলে জাতি বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। উৎসবের প্রথম দিনে তিনি যিশুকে গ্রেফতার করেন, তবে তার শিষ্যদের চলে যাওয়ার সুযোগ দেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তিনি তাকে প্রধান কোনো রাজনৈতিক হুমকি বিবেচনা করতেন না। বিচারের সময় যিশু টেম্পল ধ্বংস করার সংকল্প ব্যক্ত করেছিলেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা তাতে একমত না হওয়ায় অভিযোগটি প্রত্যাহার করা হয়। অবশ্য ঈশ্বর অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ক্যাইফাস। কিন্তু ইহুদি বিধান মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কর্তৃত্ব না

থাকায় শাস্তির জন্য পিলেতের কাছে পাঠানো হয় যিশুকে। যিশুকে চাবকান পিলেত। তারপর ক্রুশে বিদ্ধ করে মৃত্যুর শাস্তি দেন। তিনি প্রায়েটোরিয়াম থেকে জেরুসালেমের রাস্তাগুলো দিয়ে গলগোথা (খুলির প্রাসাদ, ল্যাতিনে ক্যালভারিয়াস) নামে অভিহিত নগরীর বাইরের একটি পাহাড় পর্যন্ত ক্রুশটি বয়ে নিতেও তাকে বাধ্য করেন। সেখানে দুই ডাকাতের সাথে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। ক্রুশবিদ্ধ লোকের মৃত্যু ঘটতে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত লাগত। তবে যিশু বেশ দ্রুত মারা যান। সাবাত আসন্ন থাকায় তার বন্ধুরা তাকে সূর্যাস্তের আগেই কবর দিতে উদ্বিগ্ন ছিল। এ কারণে স্যানেদ্রিনের (ইহুদি পরিচালনা সংস্থা) সদস্য আরিমাথিয়ার যোশেফ তাকে নিজের কবরের ভেতরে লাশটি সমাহিত করতে পিলেতের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করেন। এটি ছিল নতুন গুহা-সদৃশ্য সমাধি। গোলগোথার কাছে পাহড়ের ঢালে এগুলো সহজেই খোঁড়া যেত। যিশুকে দ্রুত সমাহিত করা হয়। একটি পাথর সেখানেই রাখা হয়। তার বন্ধুরা সাবাতের পর ফিরে এসে দেহটিকে যথাযথভাবে তৈল সিক্ত করেন।

বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু শিগগিরই গুজব রটে যে যিশু মৃত থেকে জীবিত হয়েছেন। বলা হয়ে থাকে, নারীরা রোববার সকালে সেখানে গিয়ে কবরটিকে ফাঁকা দেখেছেন। তার কয়েকজন শিষ্য ও স্বজনের যিশুকে নিয়ে স্বপ্নাবিভাব ছিল। তারা বলেন, যিশু জীবিত থাকার সময়ের মতো হেঁটেছেন, কথা বলেছেন, খেয়েছেন বলে তারা দেখেছেন। অনেকেই বিশ্বাস করত যে সত্যনিষ্ঠ লোক 'ডে অব দি লর্ড'-এ মৃত থেকে জীবিত হবেন। যিশু কি এই আসন্ন ঘটনার আগেই জীবিত হয়েছিলেন? সম্ভবত তিনি মেসাইয়া, আসন্ন পরিত্রাণের অগ্রদূত? সবশেষে উইকস উৎসবকালে জেরুসালেমের একটি কক্ষে শিষ্যরা একত্রে প্রার্থনা করার সময় তাদের মনে হলো, তাদের ওপর ওয়াইএইচডব্লিউএইচ ভর করেছেন। তাদের বিশ্বাস জন্মাল যে নবীরা যে নতুন যুগের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, অর্থাৎ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে, সেটিরই শুরু হয়েছে। যিশুর উপদলের সদস্যরা এই উপস্থিতি প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হচ্ছে : তারা আরোগ্য লাভের অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করতেন, অদ্ভূত ভাষায় কথা বলতেন, ভবিদ্বাণী করতেন, স্বপ্নাবিভাব লাভ করতেন। যে ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে লজ্জাজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তার মেসাইয়া

হওয়ার আইডিয়াটি ছিল অবাক করা ব্যাপার। কিন্তু গ্রুপটি দ্রুত নতুন নতুন ধর্মান্তরিতকে আকৃষ্ট করে, বিশিষ্ট ফারিসি গামালিয়েলের আদেশে স্যানহেদ্রিন বিশুদ্ধ ইহুদি আন্দোলন হিসেবে শেষ পর্যন্ত একে গ্রহণ করে নেয়।২৫ নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যিশুর শিষ্যরা চিন্তাও করেননি যে তারা নতুন একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করছেন। তারা অব্যাহতভাবে নিবেদিতপ্রাণ ইহুদি হিসেবে জীবনযাপন করে যান, প্রতিদিন দলবেঁধে টেম্পলে উপাসনা করে গেছেন। কামরানের সাম্প্রদায়িকদের অনুকরণে তারা নিজেদের বলতেন ইভিওনিম তথা গরিব। তারা তাদের মালামাল দান করে দিয়ে সম্প্রদায়বদ্ধ জীবনযাপন করতেন, আকাশের পাখিদের, মাঠের লিলি ফুলগুলোকে যেভাবে ঈশ্বর খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, তাদেরও তেমন ব্যবস্থা হবে বলে তারা বিশ্বাস করতেন। ২৬ এটি ছিল আকর্ষণীয় ধর্মানুরাগ, এর প্রশংসা করত অন্য অনেক ইহুদি। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বিশ্বাস করল যে যিশু গৌরবোজ্জ্বলভাবে ফিরে আসবেন, সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে অবশেষে ঈশ্বরের রাজ্য এসে গেছে।

মাউন্ট অব অলিভসের নিচু ঢালুতে অবস্থিত গার্ডেন অব গেথসেমেন, গ্রেফতার হওয়ার আগে কষ্টে এখানে প্রার্থনা করেছিলেন যিশু, ছিল জেরুসালেমের খ্রিস্টানদের প্রথম দিককার অন্যতম পূণ্য স্থান। প্রথম দিকের বেশির ভাগ খ্রিস্টানের কাছে পূণ্য স্থানগুলো ছিল নগর-প্রাচীরের বাইরে।

আন্দোলনটি আশপাশের নগরী ও শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। জেরুসালেম ও লিডডা, জোপ্পা, সিসেরিয়া, গ্যালিলি ও দামাস্কাসে বিশাল জামায়াত বা চার্চ ছিল। এই প্রাথমিক সময়ে জেরুসালেম চার্চের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যিশুর তিন শীর্ষস্থানীয় শিষ্য – পিটার, জেমস ও জন। তারা 'পিলার্স' (স্তম্ভরাজি) নামে পরিচিত ছিলেন। ২৭ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিশুর ভাই জেমস। তিনি জাদিক বা সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি যিশুর জীবদ্দশায় তার অনুসারী ছিলেন না। তবে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর স্বপ্নাবিভাবে যিশুর আবার জীবিত হওয়ার বিষয়টি যারা বলেছিলেন, তাদের অন্যতম ছিলেন জেমস। তিনি ছিলেন চার্চটির অন্যতম নেতা। ৫০ সাল নাগাদ তিনি হন এর নেতা। জেরুসালেমে জেমস শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি আশ্চর্য রকমের কৃচ্ছ্রসাধনা

করতেন, শাস্ত্রীয় শুদ্ধাচারের প্রতি এতই খুঁতখুঁতে ছিলেন যে বলা হয়ে থাকে, তাকে পুরোহিতদের জোব্বা পরতে, পুরোহিতদের আঙিনায় তাকে প্রার্থনা করতে দেওয়া হয়েছিল। ফারিসিদের সাথেও তার সুসম্পর্ক ছিল, কামরান সম্প্রদায়ও তাকে শ্রদ্ধা করত। জেমস দি জাদিক দেখিয়েছেন, জেরুসালেমে ইহুদি ধর্মীয় জীবনের সাথে যিশুর উপদলটি কত ব্যাপকভাবে একীভূত ছিল। তাওরাত ত্যাগ তো দূরের কথা, জেমস ও জেরুসালেম চার্চ প্রতিটি একক মিতজভাহ পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। বিধানের একটি অংশও বর্জন করা হতো না। যিশুর অনুসারীরা কেবল তাওরাতের বিধিনিষেধে আবদ্ধ থাকবে না, বরং বিশুদ্ধ ইহুদিতে পরিণত হওয়ার প্রত্যাশা করত। তাওরাত যদি বলত, 'তোমার হত্যা করা উচিত নয়,' তবে তারা এমনকি রাগান্বিতও হতো না। তাওরাতে যদি বলা হয়ে থাকে, তোমরা ব্যাভিচার করো না, তবে তারা কোনোভাবেই লোলুপ দৃষ্টিতে কোনো নারীর দিকেও তাকাত না।২৮ তাদের কর্তৃব্য ছিল যিশুর ফিরে না আসা পর্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক জীবনযাপন করা, টেম্পলে প্রতিদিন প্রার্থনা করা।

তবে ৩৬ সালের দিকে সম্ভত টেম্পল নিয়ে মূলধারার ইহুদিদের সাথে যিশু আন্দোলনের কয়েকজন সদস্যের সঙ্ঘাত হয়। জেরুসালেম সম্প্রদায় বিদেশের কয়েকজন গ্রিক-ভাষী ইহুদিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এসব লোক জুদাবাসীর মধ্যে কিছু অস্বস্তি সৃষ্টি করে। তাদের নেতা ছিলেন স্টিফেন। এই ক্যারিশমেটিক বক্তার দাওয়াতি কার্যক্রম নগরীতে মহা অপরাধ বিবেচিত হচ্ছিল। যিশুর মতো তাকেও টেনে হিঁচড়ে স্যানহেদ্রিনে নেওয়া হয়, তাওরাত ও টেম্পল পরিপন্থী বক্তব্য রাখার অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে। লুক, তিনিই অ্যাক্টস অব দি অ্যাপসলস-এর গ্রন্থকার বলে ঐতিহ্যগতভাবে বলা হয়ে থাকে, যে বক্তৃতা স্টিফেনের ঠোঁটে তুলে দিয়েছিলেন, সেসবের প্রায় নিশ্চিতভাবেই ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল না। তবে এতে এমন প্রবণতা প্রতিফলিত হয় যা পরে বিচ্ছিন্ন খ্রিস্টান এলাকাগুলোর সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়। এর শিকড় এই প্রাথমিক সঙ্ঘাতের মধ্যেই নিহিত ছিল। স্টিফেনের মধ্যে লুক এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে ঈশ্বর অনেকবারই জেরুসালেমের বাইরে মেসোপোটেমিয়া, হারান, মিসর, মিদিয়ান ও সিনাইয়ে তার জাতির কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। এমনকি সোলায়মান পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বর মনুষ্য-নির্মিত ভবনে বাস করতে পারেন না। স্যানহেদ্রিনকে স্টিফেন এতই ক্ষিপ্ত

করেছিলেন যে তারা নগরীর বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে। তারপর লুক বলেন, তারা বাকি চার্চের ওপর তাদের ক্রোধ ঝাড়েন। তবে দৃশ্যত তা 'পিলার্স' ও যিশুর মূল ফিলিস্তিনি অনুসারীদের প্রতি নয়। সম্ভবত কেবল হেলেনবাদী, গ্রিক-ভাষী ইহুদিদেরকেই নগরী থেকে পালাতে হয়েছিল। তারা প্রথমে গ্রামে এবং তারপর ফনিসিয়া, সাইপ্রাস ও অ্যান্টিয়কে চার্চে আশ্রয় নেয়।

এই অ্যান্টিয়কেই যিশুর অনুসারীদেরকে প্রথমে খ্রিস্টান' হিসেবে অভিহিত করা হয়। কারণ তাদের দৃঢ় ঘোষণা ছিল যিশু ছিলেন খ্রিস্টো, তেলসিক্ত ব্যক্তি, মেসাইয়া।৩২ অ্যান্টোকান খ্রিস্টানদের সাথে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা আরো ৪০ জন ইহুদি যোগ দিয়েছিলেন। তারা শুরুতে প্রবলভাবে খ্রিস্টান আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু দামাস্কাসের চার্চে নির্যাতন চালানোর জন্য ওই স্থান সফর করার সময় সেখানে যিশুর প্রবল শক্তিধর ভাষ্যের কাছে ধর্মান্তরিত হন। তারসাসের পল হন অ্যান্টিয়কের অন্যতম খ্রিস্টান নেতা। জেরুসালেমের পিলার্সের থেকে খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে তার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা ছিল। গত অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম, এই সময়ে গ্রিক বিশ্বের অনেক লোক তাদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যে সাংঘর্ষিক বিষয় খুঁজে পাচ্ছিল। আমরা পলের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে খুবই সামান্য জানি। তবে মনে হয়, তিনি এমন এক লোক ছিলেন, যিনি নতুন কিছুর অনুসন্ধান করছিলেন। তিনি গ্যাম্যালিয়েলের অধীনে তাওরাত অধ্যয়ন করেছিলেন, ফারিসি উপসম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছিলেন। তবে তাওরাতকে তার কাছে তার ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য ধ্বংসকরী বোঝা মনে হয়েছিল। এটি তাকে মুক্তি, শান্তি ও ঈশ্বরের সাথে মিলন এনে দিতে পারছিল না।৩৩ দামাস্কাসের পথে নিজের স্বপ্নাবিভাবে পলের মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল যে পৃথিবীর কাছে ঈশ্বরের মূল ঐশী বাণী হিসেবে তাওরাতের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে যিশুকে। যিশুর মৃত্যু ও পুনর্জন্ম পরিত্রাণের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ইহুদি ও পৌত্তলিক- উভয়েই এখন ব্যাপ্তিজমের (যা পরাবাস্তবভাবে তাদেরকে খ্রিস্টের সাথে একীভূত করে নিত) দলভুক্তমূলক শাস্ত্রাচারের মাধ্যম হিসেবে নতুন ইসরাইলে প্রবেশ করতে পারত। ফলে খ্রিস্টানদেরকে খাদ্য-সম্পর্কিত বিধান পালন করা, নিজেদেরকে গোয়িম থেকে আলাদা করার, খতনার প্রয়োজন নেই। কারণ এগুলা ছিল পুরনো চুক্তির চিহ্ন। এগুলো এখন পেছনে পড়ে গেছে।

যারাই এখন 'খ্রিস্টে' বসবাস করত, তাদের জাতিগত উৎস যাই হোক না কেন, তারা সবাই এখন ঈশ্বরের সন্তান ও ইব্রাহিমের শিশু বলে পরিগণিত হলো।

পলের গসপেলের আবেগময় সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা বিচ্ছিন্ন থাকা ইহুদি বসতিগুলোতে ব্যাপক সাড়া ফেলে। তবে তা যৌক্তিক প্রমাণিত হয়েছিল কিংবা যিশুর জীবন ও মৃত্যুর ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বলে নয়। যিশু সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি আবেদনময়ী হওয়ার কারণ ছিল এই যে এটি ওই সময়ের অন্যান্য গ্রিকো-রোমান বিশ্বের ধর্মীয় ঘটনাবলীর সাথে ব্যাপকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আমেরিকান স্কলার জোনাথন জেড স্মিথ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, প্রাচীনকালের শেষ দিকে আধ্যাত্মিক জগতে পরিবর্তন ঘটিয়ে পুরনো টেম্পল মতবাদকে পরিবর্তন করে মহাবিশ্বকে একটি মানবীয় রূপ দিচ্ছিল :

বহিরাগত, বৈরী শক্তিগুলো থেকে মানুষকে রক্ষাকারী নতুন অবরুদ্ধ এলাকা নগর-প্রাচীর না হয়ে হবে একটি মানব গ্রুপ, একটি ধর্মীয় সংস্থা বা একটি গুপ্ত সংগঠন। বিশৃঙ্খলার প্রত্যাবর্তন কিংবা অপবিত্রকণের হুমকির বদলে শত্রুকে বর্ণনা করা হবে অন্য মানব গোষ্ঠী বা দানব হিসেবে, শয়তান বা মৃত্যুর হুমকি হিসেবে। একটি ঐশী স্থানের বদলে প্রধান কেন্দ্র ও ঐশী সত্তার কাছে প্রবেশের প্রধান অবলম্বন হবে ঐশী মানব।... ৩৪

থেস্যালোস দি ম্যাজিশিয়ানের কাহিনীর মধ্যে মিসরে এই পরিবর্তনের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন স্মিথ। তিনি চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে সিরিয়ার পবিত্র মানুষের মতবাদের দিকে আলোকপাত করেছেন। তবে আমরা ফিলিস্তিনি ইহুদি ধর্মের মধ্যেও ইতোমধ্যে এই প্রবণতা দেখতে পেয়েছি। ফারিসি ও কামরান উপদল তাদের ধর্মীয় সংস্থাকে নতুন মন্দির হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এখন খ্রিস্টানরা টেম্পল থেকে সরে গিয়ে ঐশী মানবের দিকে যাত্রা শুরু করল। তীর্থযাত্রা ও বিশুদ্ধকরণের পুরনো শাস্ত্রাচারের বদলে নতুন খ্রিস্টান শাস্ত্রাচার হয় ধর্মান্তর, দলভুক্তকরণ ও মানুষ যিশুর সাথে শনাক্তকরণ। তাদের মতে যিশুকে যখন ঈশ্বর মৃত থেকে আবার জীবিত করেছিলেন, তখনই তিনি ঐশী মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ৩৫ খ্রিস্টানদের পল শিখিয়েছিলেন যে যিশু হলেন পরিত্রাণের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি কেবল আদি বিশৃঙ্খলা থেকেই তাদেরকে উদ্ধার করেননি, বরং সেইসাথে পাপ ও মৃত্যুর দানবীয় শক্তি থেকেও মুক্ত করেছেন।

এই দৃঢ় ঘোষণা অনেক ইহুদি এবং সেইসাথে ‘পিলার্স’ (বা স্তম্ভ) ও জেরুসালেমে তাদের অনুসারীদের কাছে ঈশ্বর অবমাননা মনে হয়েছিল। কোনো সাধারণ মানুষ ঐশী সংস্পর্শ লাভ করতে পারেন, এমন ধারণা তাদের কাছে কষ্টকর মনে হতে পারে। তবে আমরা দেখেছি, ঐশী সত্তার সবসময়ই নিজেকে নিজের বদলে অন্য কারো মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। খোলা মনে বিবেচনা করলে দেখা যাবে নগরী বা মন্দির মানব স্বর্গীয় সত্তার বাহন হিসেবে একেবারেই বেমানান ছিল। ঐশী সত্তার যেকোনো প্রতীক- তা ভবন, নগরী, সাহিত্য পুস্তক, আইনি বিধান বা মানুষ – যাই হোক না কেন, তা অপর্যাপ্ত হতে বাধ্য। ধর্মীয় অনুসন্ধানের কেন্দ্রে অনিবার্য যে পরস্পরবিরোধী বিষয় ছিল তা হলো পবিত্রতার নিজের ঐশী সত্তার মধ্যে, বাস্তবতার নিরঙ্কুশতার মধ্যে, সাময়িকতার শ্বাশতের মধ্যে উপস্থাপন করা। বস্তুত, ভারতীয় মরমিবাদের অবয়বে খ্রিস্টধর্ম এই পরস্পরবিরোধী পরিত্রাণের অভিঘাত লাভ করেছিল : ঐশী সত্তা তার ভালোবাসা প্রদর্শন করেছিল এবং এর সার্বভৌম স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত হীন অবয়ব গ্রহণ করেছিল।৩৬ প্রকৃত রহস্যময়তা হলো এই যে ঐশী সত্তা সবভাবেই প্রকাশ ঘটাতে পারে। প্রথম দিকের অনেক খ্রিস্টানের কাছে ধর্মান্তর বলতে কী বোঝাত তা দামাস্কাসের রাস্তায় পলের নাটকীয় ধর্মান্তর ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি বিপরীতমুখী পরিবর্তন, তাদের মাথার ওপর পুরনো ঐশী সত্তার পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করেছে, যা অনেকে মুক্তির জন্য খুঁজছিল।

এরপর থেকে খ্রিস্টান ধর্ম কোনো নির্দিষ্ট স্থানে শিকড় গেড়ে থাকবে না। নতুন খ্রিস্টান নায়ক জেরুসালেম টেম্পলের জেমস দি জাদিক নন, তিনি হলেন মুসাফির পল। এই লোক এই দুনিয়ার কোনো নগরীতে আবদ্ধ নন, তিনি স্থায়ীভাবে চলছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জেরুসালেমের সাথে বিচ্ছেদ ছিল বেদনাময়। জেমস যখন দেখতে পেলেন যে অ্যান্টিয়কের খ্রিস্টানেরা কোশার মাংস খাচ্ছে না এবং গোয়িমের সাথে অবাধে বিয়ে-শাদি করছে, তখন পল ও মাতৃ চার্চের মধ্যে তিক্ত সজ্ঘাত ঘটে। একটি সমঝোতা হয়। এর ফলে পলকে পৌত্তলিকদের ধর্মান্তকরণ মিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নবীরা সবসময়ই বলতেন যে মেসিয়ানিক যুগে পৌত্তলিক জাতিগুলো ওয়াইএইচডব্লিউএইচের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে জেরুসালেমে আসবে। পল এখন পিলার্সকে দেখাতে সক্ষম হলেন যে গোয়িম সত্যি সত্যিই তার চার্চগুলোর কাছে আসতে শুরু করে দিয়েছে। তারা ইহুদি

খ্রিস্টানদের মতো পূর্ণ উদ্দীপনা ধারণ করার বিষয়টি প্রকাশ করতেন। ফলে জেমসের জন্য কি যথাযথ হতো তাদেরকে খতনা ও তাওরাত পুরোপুরি অনুসরণ করা নিয়ে অবাস্তব দাবি করে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া? পৌত্তলিক মিশনের স্বায়াত্তশাসনের বিনিময়ে পল প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তার ধর্মান্তরিতরা জেরুসালেমের গরিব তথা ইভিওনিমকে সহায়তা করবে। পল তার মিশনজুড়ে এই সংগ্রহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে জেরুসালেম চার্চকে দিতেন। এটি ছিল ধারাবাহিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। এই পন্থায় তার ধর্মান্তরিতরা ইহুদি ধর্মের প্রতি তাদের আধ্যাত্মিক ঋণের বিষয়টি প্রকাশ করত, প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করত।৩৭ পৌত্তলিকেরা সত্যিই জেরুসালেমে উপহার নিয়ে আসত। ফলে চূড়ান্ত পরিত্রাণ নিশ্চিতভাবেই ছিল হাতের মুঠোয়।

কিন্তু পল যখন সত্যিই ৫৮ সালে উইকস উৎসবে জেরুসালেমে এলেন অর্থ নিয়ে, তখন টেম্পলে তার উপস্থিতি দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল। গোলযোগ সৃষ্টির অভিযোগে রোমানরা তাকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি তার এক অইহুদি ধর্মান্তরিতকে স্তম্ভশ্রেণি ও কোর্টস অব দি ইসরাইলিতে নিয়ে গেছেন।৩৮ খুব সম্ভবত এর মাধ্যমে পল আইন লঙ্ঘন করেননি। কারণ তার অন্যতম পরিচালনা নীতিমালা ছিল ‘সবকিছু সবার জন্য’ এবং লোকজনের ধর্মীয় স্পর্শকাতরতার প্রতি সংবেদনশীলতা প্রদর্শন। যদিও তিনি বিশ্বাস করতেন যে পুরনো প্রতিবন্ধকতাগুলোর অবসান হওয়া উচিত, যাতে পৌত্তলিকেরাও আর ঈশ্বরের রাজ্যে আগন্তুক না থাকে। খ্রিস্টের পুনরুত্থান কেবল তাওরাতই বাতিল করে দেয়নি, গোয়িমকে পবিত্রতার প্রান্তিকে ঠেলে দেওয়ার পুরনো ঐশী ভূগোলের অবসানও ঘটিয়েছিল। পল তার ইফেসিয়ান ধর্মান্তরিতদের বলেছিলেন, ‘যিশু ওই প্রতিবন্ধকতা ভেঙে দিয়েছিন যা [ইহুদি ও পৌত্তলিকদের] আলাদা রাখতে ব্যবহৃত হতো’ এবং এর ফলে ‘তোমরা আর অপরিচিত বা বিদেশী মুসাফির নও; তোরা সব সন্ন্যাসীর মতোই নাগরিক, ঈশ্বরের বাড়ির অংশ।’ বস্তুত, খ্রিস্টানেরা এখন একটি আধ্যাত্মিক মন্দির সৃষ্টি করল এবং ঈশ্বর বাস করেন এমন একটি বাড়ি নির্মাণ করল। একইভাবে কামরান সম্প্রদায়ের লোকজনের প্রতি পলের বিশ্বাস ছিল এই যে ঈশ্বর এখন বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে দুনিয়াতে বাস করেন। প্রাচীন কালের শেষ দিকের অন্যান্য লোকের মতো খ্রিস্টানরাও নশ্বর টেম্পল এড়িয়ে যেতে শুরু করেছিল। তারা অনুভব

করছিল যে তারা ইতোমধ্যেই টেম্পলে প্রতীকভাবে ফুটিয়ে তোলা আধ্যাত্মিক বাস্তবতায়- ‘স্বর্গীয় জেরুসালেম- প্রবেশ করছে। তবে যেসব ইহুদি তখনো বিশ্বাস করত যে মাউন্ট জায়নের ওপর থাকা টেম্পলটি ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার সবচেয়ে নিশ্চিত উপায়, তাদের কাছে এই ধারণা ছিল ঈশ্বর অবমাননা। ফলে ৫৮ সালে টেম্পলে পলের উপস্থিতি হুমকি বিবেচিত হলো, তার আগে যিশু ও স্টিফেনের মতো পলও তার স্বাধীনতা এবং সবশেষে তার জীবনও হারালেন। কারণ তিনি জায়নের পবিত্রতা বিপন্ন করেছেন। পরিণামে অ্যাক্টস অব দি অ্যাপসলসে লুক আমাদের বলেন যে পলকে বন্দি হিসেবে রোমে পাঠানো হয়েছিল। কারণ তিনি দাবি করেছিলেন যে রোমান নাগরিক হিসেবে খোদ সিজারের মাধ্যমে তার বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। অ্যান্টিয়চুস ইপিফেনেসের আমলের ইহুদি সংস্কারকদের মতো প্রাচীন কালের শেষ দিকের শিকড়হীন মানুষের মতো পলও জেরুসালেমের পুত্র না হয়ে বিশ্বের নাগরিক হতে চাইতেন। শেষ পর্যন্ত পলের কী হয়েছিল, তা আমরা জানি না। কিংবদন্তি রয়েছে যে ৬৪ সালে সম্রাট নিরোর নির্যাতনের সময় তিনি মারা গিয়েছিলেন। অবশ্য তার মৃত্যুর অনেক পরে বিচ্ছিন্ন বসতিগুলোতে তার প্রতিষ্ঠিত চার্চগুলো তার খ্রিস্টান দর্শনের প্রতি অটল থাকে। এবং ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের ব্যাপার হলো, একদিন এই পৌত্তলিক খ্রিস্টানেরা জেরুসালেমকে তাদের নিজস্ব বলে দাবি করেছিল।

পিলেতের সময় থেকে ইহুদিরা তাদের টেম্পলের ব্যাপারে আরো বেশি রক্ষণাত্মক হয়ে পড়েছিল। কারণ এর ঐশী সত্তা আবারো বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ৪১ সালে সম্রাট গ্যাইয়াস ক্যালিগুলা নির্দেশ দেন যে তার মূর্তি জেরুসালেমের পবিত্র স্থানটিতে স্থাপন করতে হবে। সিরিয়ায় পোপের দূত পেট্রোনিয়াস এই কঠিন কাজের দায়িত্ব নিয়ে টলেমাইস বন্দরে অবতরণ করলেন। তিনি নগরীর সামনের সমভূমিতে স্ত্রী-সন্তানসহ ‘লাখ লাখ ইহুদির’ মুখোমুখি হলেন। তারা কঠিন আলোচনায় এক ইঞ্চি ছাড় দিতেও চাইল না। এমনকি ক্যালিগুলা এমন হুমকিও দিয়েছিলেন যে তারা প্রতিরোধ অব্যাহত রাখলে তাদের সব লোককে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হবে। আবারো ইহুদিরা অহিংস পন্থার আশ্রয় গ্রহণ কর। তারা তাদের শস্য তুলতে অস্বীকার করল। এর অর্থ হলো, বার্ষিক খাজনা তোলা রোমানদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। অনেকে বিশ্বাস করত যে তাদেরকে রক্ষার জন্য

ঈশ্বর এগিয়ে আসবেন। বস্তুত তিনি তা করেছিলেনও। সম্রাট তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করার আগেই তিনি গুপ্তহত্যার শিকার হন। ৪১

ইহুদিদের সন্তুষ্ট করতে ক্যালিগুলার উত্তরসূরি ক্লাউডিয়াস হেরডের নাতি অ্যাগ্রিপাকে ইহুদি ফিলিস্তিনের রাজা নিযুক্ত করেন। তার সংক্ষিপ্ত শাসনকালে জেরুসালেম সমৃদ্ধ হয়। অ্যাগ্রিপা তাইরোপোয়নের আপার ও লোয়ার মার্কেটগুলোর সম্প্রসারণ করেন। তিনি উত্তরাঞ্চলীয় জেলা বেজেথায় তৃতীয় নগর-প্রাচীর নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। ৪৪ সালে তার মৃত্যু ছিল একটি মারাত্মক আঘাত। তার ছেলে দ্বিতীয় অ্যাগ্রিপা শাসনকাজ চালানোর মতো বয়স্ক ছিলেন না। ফলে ক্লাউডিয়া, জুলায় নতুন রোমান গভর্নর পাঠান। তবে এবার তার মর্যাদা অনেক কমিয়ে প্রসিকিউটার (ব্যবস্থাপক) করা হয়। তরুণ রাজা দ্বিতীয় অ্যাগ্রিপা সরকারের উচ্চ মর্যাদা ফিরে পান। ফিলিস্তিনে অস্থিরতার আভাস ছিল। থিওদাস নামে অভিহিত এক নবী মরুভূমিতে তাকে অনুসরণ করতে চার শ লোককে রাজি করান। তিনি তাদের বোঝান যে ঈশ্বর রোমের শাসন থেকে ইহুদিদেরকে উদ্ধার ও মুক্তি দেবেন। প্রসিকিউটর ফেলিক্সের (৫২-৫৯) আমলে আরেক নবীর আগমন ঘটে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে জেরুসালেম থেকে রোমানদের তাড়িয়ে দেবেন। কোনো নবীই তেমন অনুসারী সংগ্রহ করতে পারেননি। তেমন কোনো কষ্ট ছাড়াই রোমানরা তাদের গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। জাতীয় উৎসবগুলোতে আবেগ তখনো টগবগ করত। কুমানাসের (৪৮-৫২) প্রসিকিউটরশিপের আমলে পাসওভারের সময়ে পোর্টিকোর ছাদে পাহারায় থাকা এক সৈন্য নিচে তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশে কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত করলে হাজার হাজার ইহুদিকে টেম্পল আঙিনাগুলোতে পিষে মারা হয়। এসব গোলযোগ সত্ত্বেও জেরুসালেম বিকশিত হতে থাকে। চরমপন্থীরাও ছিল। রোমান প্রাধান্য অবসানের বেপরোয়া চেষ্টায় তারা পবিত্র নগরীতে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিত। তবে এই সময়কালে রোমের সাথে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৫৯ সালে রাজা দ্বিতীয় অ্যাগ্রিপাকে হ্যাসমোনিয়ান প্রাসাদে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। হেরডের প্রাসাদটি জেরুসালেম সফরের সময় প্রসিকিরেটরের বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। টেম্পলটির নির্মাণকাজ অবশেষে সমাপ্ত হয়। নগরীর রাজপথগুলো পাকা করতে ১৮ হাজার শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। জেরুসালেমকে নির্দিষ্ট স্বায়াত্তশাসন দেওয়া হয় : অ্যাগ্রিপা ও উচ্চ পুরোহিত

যৌথভাবে নগরী চালাতেন। তারা ক্যাসারিয়ার প্রসিকিউটরের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সহযোগিতা করতেন।

তবে ৬০ সালে রোম জুদার গভর্নর হিসেবে আরো কম প্রতিভার গভর্নর নিযুক্ত করতে থাকে। বলা হয়ে থাকে রোমের সাথে সহযোগিতায় নিয়োজিত সবার মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী ইহুদি ডাকাতদের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করতেন অ্যালিবিনাস (৬০-৬২)। আর গেসিয়াস ফ্লোরাস (৬৪-৬৬) এটি অব্যাহত রাখেন। ক্যাসারিয়ায় ইহুদি ও সিরিয়ান অধিবাসীদের মধ্যে দাঙ্গা বেঁধে গেলে ফ্লোরাস দেখতে পেলেন, তার আরো নগদ অর্থের প্রয়োজন। তিনি টেম্পল কোষাগার থেকে অর্থ গ্রহণ করার বিপর্যয়কর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নগরী সাথে সাথে বিস্ফোরিত হয়। রাস্তায় রাস্তায় রোমান গ্রুপগুলোর সাথে লড়াই করতে থাকে। ফ্লোরাস আইন- শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হওয়ার পর নিজেকে প্রত্যাহার করে সিরিয়ার গভর্নর গ্যালিয়াসের কাছ থেকে সহায়তা কামনা করেন। গ্যালিয়াস যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় ফিলিস্তিনে এসে পৌঁছেন। তিনি মাউন্ট স্করপাসে তাঁবু গাড়েন, বেজেথা উপকণ্ঠের দিকে অগ্রসর হন। তবে অজ্ঞাত কোনো কারে তিনি ইমায়সে সরে আসেন। ইহুদিরা তাকে প্রবলভাবে ধাওয়া করে। সেখানে তার বাহিনী পরাজিত হয়, ইহুদিরা পাঁচ হাজারের বেশি রোমান সৈন্যকে হত্যা করে।

এই সঙ্কটের সময় ইহুদিরা তাদের নিজস্ব দ্বন্দ্বে নিয়োজিত ছিল। বিদ্রোহীরা সার্বজনীন সমর্থন পায়নি। পল্লী এলাকার অনেক অভিজাত ব্যক্তি এবং সেইসাথে সেফোরিস ও তাইবেরিয়াসের মতো শহরের অনেক ইহুদিও রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। রোমের শক্তিকে ইহুদিরা হারাতে পারে- এমনটি কল্পনাও করতে পারেনি স্যাডিসিরা। তারা ইহুদি স্বাধীনতার ব্যাপারে তাদের স্বপ্ন পরিত্যাগ করেছিল। রাজনীতির চেয়ে ধর্ম নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন অনেক ফারিসি বুঝতে পারল যে ডায়াপারার ইহুদিরা রোমের বিরুদ্ধে ইহুদি বিদ্রোহের মাধ্যমে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাজা অ্যাগ্রিপা শান্তির ব্যাপারে রাজি হতে বিদ্রোহীদের বোঝাতে চেষ্টা করেন : তারা কি কল্পনা করছে যে তারা গাউল, জার্মান বা গ্রিকদের চেয়ে শক্তিশালী? এসব জাতিও রোমান সাম্রাজ্যের শক্তির কাছে বশ মানতে বাধ্য হয়েছে। জোসেফাস নিজে পক্ষ ত্যাগ করে রোমান দলে যোগ দেন। তিনি

বুঝতে পেরেছিলেন যে বিদ্রোহীরা আত্মহত্যার পথে নেমেছে। কিন্তু একটি নতুন, চরমপন্থী জিলট (ধর্মান্ধদের) দলের উত্থান ঘটে উদারপন্থীদের বিপরীতে। তারা বিশ্বাস করত যে রোম ক্ষয়িষ্ণু, ফলে ইহুদিদের জয়ের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। ম্যাকাবিরা কি বিদেশী নিয়ন্ত্রণ ঝেড়ে ফেলে স্বাধীন ইহুদি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেনি? যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিল, তাদেরকে জায়নের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বিবেচনা করত তারা। তারা তাদেরকে টেম্পল অনুষ্ঠানের অংশ নিতে দিত না। ফিলিস্তিনের ইহুদি জনসাধারণের অতি সামান্য অংশ জিলটদের সমর্থন করেছিল। এমনকি বিদ্রোহীদের নিজেদের মধ্যেও বিভক্তি ছিল। তাদের অনেক চরমপন্থী মৃত সাগর পথে মাসাদার দুর্গে চলে গিয়েছিল। তারা নগরীর যুদ্ধে আর অংশগ্রহণ করেনি। সেসটিয়াস গ্যালাসের পরাজয়ের পর জিলটরা তখনো জেরুসালেমে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। এই পর্যায়ে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে রোমের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য।

সম্ভবত এই পর্যায়ে ইহুদি খ্রিস্টানেরা জেরুসালেম ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাদের চার্চ ও ইহুদি এস্টাবলিশমেন্টের মধ্যে মাঝে মাঝেই টানাপোড়েন দেখা যেত। জেমস দি পিলারের ফাঁসি হয়েছিল, ৬২ সালে জেমস জাদিককে 'আইন ভঙের দায়ে উচ্চ পুরোহিত মৃত্যুদণ্ড দেন। এমনকি ৮০ জন ফারিসি জেমসের পক্ষ থেকে রোমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তার সাথে মৃত্যু বরণ করা সত্ত্বেও তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। জেরুসালেম চার্চের নেতৃত্ব এখন যিশুর কাজিন সামিয়নের হাতে বর্তেছে। তিনি নেতৃত্ব দিয়ে তার সম্প্রদায়কে ট্রান্সজর্ডানের পেলায় নিয়ে যান : যিশু জেরুসালেম ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আর খ্রিস্টানেরা জানত যে নগরীর ধ্বংস আসন্ন। অন্যান্য ইহুদি জয়ের জন্য যুদ্ধ করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিল। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে রোমের এগিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করার সময় তারা গ্যালাসে হানা দেয়। জেরুসালেমে ইহুদি অধিবাসীরা দ্রুত থার্ড ওয়াল নির্মাণ করে। বেজেথায় এটি নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন প্রথম এগ্রিপা।

ইহুদিদের দুর্ভাগ্য হলো, রোম এই ইহুদি বিদ্রোহ দমন করতে তার সবচেয়ে সক্ষম জেনারেলকে পাঠিয়েছিল। ৬৭ সালে ভেসপ্যাসিয়ান ফিলিস্তিনে পৌঁছেন। তিনি গ্যালিলির

প্রতিরোধ পকেটগুলো পরিকল্পিতভাবে পরাজিত করতে থাকেন। ৭০ সালে অবশ্য ভেসপ্যাসিয়ান সম্রাট হয়ে রোমে ফিরে যান। তিনি তার ছেলে টাইটাসকে ইহুদি যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়ে যান। টাইটাস দ্রুততার সাথে ওই বছরের ফেব্রুয়ারিতে জেরুসালেম অবরোধ করেন। মে মাস নাগাদ উত্তরের প্রাচীর ভেঙে নগরীতে ঢুকে পড়েন। এক সপ্তাহ পরে বাজারের কাছে সেকেন্ড ওয়াল গুঁড়িয়ে দেন। এখন লড়াই চলতে থাকল খোদ টেম্পলের চারপাশে। জুলাই মাসের শেষ দিকে রোমানরা অ্যান্টোনিয়া দখল করে, টেম্পল আঙিনায় গোলা ফেলতে শুরু করে। শেষ পশু বলি দেওয়া হয় ৬ আগস্ট। কিন্তু ইহুদিরা তখনো পরাজয় স্বীকার করেনি। জিলটদের অনেকে তখনো বিশ্বাস করে যাচ্ছিল, ঈশ্বর যেহেতু নগরীতে বাস করেন, এর পতন ঘটবে না। এক নবী জোর দিয়ে বলছিলেন, একেবারে অন্তিম মুহূর্তে তিনি অলৌকিকভাবে হস্তক্ষেপ করে তার লোকজন ও তার টেম্পলকে রক্ষা করবেন। ৪২ আর তাই রোমান সৈন্যরা যখন শেষ পর্যন্ত ২৮ আগস্ট টেম্পলের ভেতরের আঙিনায় প্রবেশ করে, তারা সেখানে মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছয় হাজার ইহুদি জিলটকে দেখতে পায়। গ্রিক ইতিহাসবিদ দিও ক্যাসিয়াস (মৃত্যু ২৩০) বলেন, অবিশ্বাস্য সাহসিকতার সাথে ইহুদিরা আত্মরক্ষা করতে থাকে, মনে হচ্ছিল, তাদের টেম্পল রক্ষার জন্য মৃত্যু বরণ করা অনেক সম্মানের বিষয়। একেবারে শেষ পর্যায়েও তারা বিশুদ্ধতার বিধান পালন করছিল, প্রত্যেকে তার যথাযথ স্থানে লড়াই করছিল এবং বিপদ সত্ত্বেও নিষিদ্ধ এলাকাগুলোতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করছিল : 'সাধারণ মানুষ সামনের আঙিনায় লড়াই করছিল, অভিজাতেরা ভেতরের আঙিনায় এবং পুরোহিতেরা টেম্পল ভবন রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। ৪৩ সবশেষে তারা দেখতে পেল, টেম্পলে আগুন ধরে গেছে, আতঙ্কে ভয়ানক শোরগোল শোনা গেল। কেউ কেউ রোমানদের তরবারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ কেউ আগুনে ঝাপ দিলো। তবে টেম্পল হাতছাড়া হয়ে গেলে ইহুদিরা লড়াই ছেড়ে দিলো। তারা আপার সিটি রক্ষা করতে কিংবা কাছের অন্যান্য দুর্গ রক্ষার জন্য চেষ্টাই করল না। কেউ কেউ মরুভূমিতে চলে যেতে অনুরোধ করল এই ক্ষীণ আশায় যে এর ফলে নতুন এক্সোডাস ঘটবে এবং নতুন জাতীয় মুক্তির দেখা দেবে। বাকিরা অসহায়ভাবে দেখল যে টাইটাসের অফিসারেরা টেম্পল ভবনের বাকি অংশগুলো বেশ দক্ষতার সাথে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, যদিও বলা হয়ে থাকে, দেভিরের পশ্চিম দিকের প্রাচীরকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু এখানেই ঐশী উপস্থিতি থাকে বলে মনে করা হয়ে

থাকে, ইহুদিরা এ থেকে কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছিল। তবে তা ছিল অপ্রতুল স্বস্তি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টেম্পল দাঁড়িয়ে ছিল ইহুদি বিশ্বের হৃদয়ে এবং এটি ছিল ইহুদি ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে। আবারো এটি বিধ্বস্ত হলো। তবে এরপর আর কখনো নির্মিত হবে না।

আলিয়া ক্যাপিটোলিনা

এখন টেম্পল মাউন্ট এখন আবর্জনার স্তূপ। ধ্বংস থেকে দেভিরের পশ্চিম প্রাচীর ছাড়া কেবল টেম্পল প্লাটফর্মকে ঠেকা দেওয়া বিশাল প্রাচীরগুলোই রক্ষা পেয়েছিল। টেম্পল ভাঙ্গার কাছ শেষ হলে টাইটাসের সৈন্যরা আপার সিটির রাজসিক বাড়িগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া শুরু করল, হেরডের সুন্দর প্রাসাদটি ভূপাতিত করা হলো। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করেছেন, রোমান সৈন্যরা তাদের কাজ সম্পন্ন করতে খুবই নিষ্ঠাবান আর নির্মম ছিল। বাড়িগুলো ধসিয়ে দেওয়া ও আবর্জনার নিচে চাপা পড়ার পর সেগুলো আর কখনো পরিষ্কার করা হয়নি। টাইরোপোয়েন ভ্যালি পুরোপুরি গুঁড়িয়ে যাওয়া ঘরবাড়ির টুকরা এবং শীতের বৃষ্টির সময় পাহাড় থেকে ঢলে নেমে আসা পাথরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আপার সিটির পশ্চিমের দেয়াল ছাড়া নগর -প্রাচীর পুরোটা মিশিয়ে দেওয়া হয়। পশ্চিম অংশটি টেনথ লিজিয়ন ফ্রেটেনসিসের ক্যাম্প সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হতো। এই বাহিনী এখন হেরডের প্রাসাদের স্থানটি দখল করে ছিল। জেরুসালেমে আর কখনো লোক বসতি হবে, এমনটা বিশ্বাস করতে মুসাফিরদের কষ্ট হতো। আর কোনো বিদ্রোহচেষ্টার ব্যাপারে ইহুদিদের সতর্ক দিয়ে দিচ্ছিলেন সম্রাটেরা। ৭০ বছর পর তারা জুদা ডেভিকটা বা জুদা ক্যাপতা কিংবদন্তি নিয়ে একটি মুদ্রা প্রকাশ করে। তাতে একটি খেজুর গাছের নিচে হাত বাঁধা নিঃসঙ্গ এক ইহুদি নারীকে বসে থাকার ছবি দেখা যায়। সম্রাট ভেসপ্যাসিয়ান (৭০-৭৯), টাইটাস (৭৯-৮১), ডোমিটিয়ান (৮১-৯৬) ও ট্রাজান (৯৮-১১৭)- সবাই রাজা দাউদের বংশধর দাবিকারী প্রতিটি ইহুদিকে আটক ও ফাঁসি দিতে টেনথ লিজিয়নকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে রোমানরা এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ফিলিস্তিন এখন সাম্রাজ্যের পূর্ণ একটি প্রদেশ। অবশ্য শান্তি বজায় রাখতে চেষ্টাকারী রাজা দ্বিতীয় অ্যাগ্রিপাকে তার পদবি বহাল রাখতে ও গ্যালিলি শাসন করার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে বোঝা যাচ্ছিল, তার মৃত্যুর পর তা রোমের নিয়ন্ত্রণে ফিরে ল্যাবে। সব ইহুদি জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তাত্ত্বিকভাবে তা সম্রাটের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। তবে বাস্তবে রোমানরা বেশির ভাগ জমিই সাবেক মালিকদের কর্তৃত্বেই

রেখেছিল। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল, ফিলিস্তিনের বেঁচে যাওয়া প্রায় সব ভূস্বামী বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিল।

এসব ভারসাম্যমূলক পদক্ষেপ সত্ত্বেও রোমান জয় অব্যাহতভাবেই ইহুদিদের জন্য বেদনা ও বিপর্যয়ের উৎসে পরিণত হয়েছিল। অনেক যন্ত্রণাদায়ক পন্থায় তাদেরকে তা মনে করিয়ে দেওয়া হতো। আগে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ইহুদি অর্ধ-শেকেল টেম্পল কর দিত। এখন তা রোমের ক্যাপিটোলিন হিলের উপর স্থাপিত টেম্পল অব জুপিটারকে দান করতে হচ্ছে। ৮১ সালে টাইটাসের জয় উদযাপনের জন্য রোমে একটি চমকপ্রদ বিজয় তোরণ নির্মাণ করা হয়। এতে নিয়ে আসা ঐশী নৌযানগুলোর ছবি আঁকা হয়। এক শ বছর পরও এসব সামগ্রী সাম্রাজ্যের রাজধানীতে গর্বের সাথে প্রদর্শিত হচ্ছিল। রাব্বি ইলেজার বলেন, তিনি টেম্পল ভেইল দেখেছেন। সেটিতে তখনো বলি দেওয়া পশুর রক্ত লেগে ছিল। এছাড়া ছিল 'ওয়াইএইচডব্লিউএইচের ঐশী সত্তা' লেখা উচ্চ পুরোহিতের মাথার ফিতা। জেরুসালেমে টেনথ লিজনের সৈন্যরা এখন অবাধে রাজকীয় ঈগল প্রদর্শন পারত, বিধ্বস্ত রাজপথগুলোতে তাদের ঈশ্বরের প্রতি বলি দিতে পারত। পুল অব বেথ-হেসদার কাছে আরোগ্যদেবী সেরাপিস-অ্যাসলেপিয়াসের মন্দিরও হয়তো তারা নির্মাণ করেছিল।২`

ইহুদি বিশ্বের কেন্দ্র জেরুসালেম এখন রোমান সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটির চেয়ে সামান্য বেশি কিছু মর্যাদাসম্পন্ন। টেনথ লিজিয়ন দীর্ঘ দিন সেখানে তাদের অবস্থানের চিহ্ন সামান্যই রেখে গেছে। কারণ সম্ভবত সৈন্যরা টাইটাসের অনুমতিতে টিকে থাকা হেরডের তিনটি টাওয়ার- হিপিকাস, ফাসায়েল ও মারিয়ামের পাশে কাঠের কুঁড়েঘর ও তাঁবুতে বাস করত। জনমানবহীন নগরীতে বসবাস করার জন্য রোমান সৈন্য ও সিরিয়ান ও গ্রিক বেসামরিক নাগরিকদের নিয়ে আসা হয়েছিল। তবে কিছু ইহুদি রয়ে গিয়েছিল। রোমান ক্যাম্পের, জোসেফাস ভুল করে যেটাকে মাউন্ট জায়ন বলেছিলেন, দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের ওপর কিছু বাড়ি রেখে দেওয়া হয়েছিল। তার লেখালেখির সময় লোকজন ভুলে গিয়েছিল যে মূল ইর ডেভিড ছিল ওফেল পাহাড়ের ওপর। তারা মনে করেছিল, দাউদ বাস করতেন নগরীর অপেক্ষাকৃত উন্নত অংশ আপার সিটিতে। এখানেই তাদের নিজস্ব

রাজা ও অভিজাত ব্যক্তিদের বাসভবন ছিল। এখন এই পশ্চিম পাহাড় মাউন্ট জায়ন নামেই পরিচিত ছিল। মূল পাহাড় থেকে একে আলাদা করতে আমি সাধারণভাবে ব্যবহৃত বিকল্প উচ্চারণ 'মাউন্ট সায়ন' গ্রহণ করার প্রস্তাব করছি। ওই এলাকায় শান্ত অবস্থা ফেরা আসা মাত্র অল্প কিছু ইহুদি মাউন্ট সায়নে বসতি স্থাপন করে। তারা টেম্পল মাউন্টে উপাসনা করতে পারছিল না। কারণ এটি পুরোপুরি অপবিত্র হয়ে পড়েছিল। তবে এই দক্ষিণের পাহাড়ে তারা সাতটি সিনাগগ নির্মাণ করেছিল। আমাদের সূত্র হলেন খ্রিস্টান ইতিহাসবিদ ইউসেবিয়াস অব ক্যাসারিয়া (২৬৪- ৩০) ও ইপিফানিয়াস অব সাইপ্রাস (আনুমানিক ৩১৫-৪০৩)। স্থানীয় ঐতিহ্যগুলোর সহায়তায় তিনি আমাদের জানাচ্ছেন, জেরুসালেম ধ্বংসের পর সিমিয়নের নেতৃত্বে ইহুদি খ্রিস্টানেরা পেলা থেকে ফিরে এসে মাউন্ট সায়নের উপর ইহুদিদের পাশাপাশি বসবাস করতে থাকে। তারা ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়া একটি বাড়িতে মিলিত হতো। বাড়িটি পরে আপার রুম' নামে পরিচিত হয়। এখানে শিষ্যরা খ্রিস্টকে বেঁচে ওঠতে দেখেছিল, 'পবিত্র স্পিরিট' গ্রহণ করেছিল। ইপিফানিয়াস আমাদের বলছেন যে পেলা থেকে ফিরে এসে ইহুদি খ্রিস্টানেরা আপার রুমের আশপাশে বসতি স্থাপন করে। এটি ছিল 'সায়ন নামে পরিচিত নগরীর অংশ। এই অংশকে ধ্বংস থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া সায়ন ও সাতটি সিনাগগ... সন্ন্যাসীদের কক্ষের মতো স্থানের আশপাশেও অনেকে বাস করে।' ইউসেবিয়াস স্পষ্ট করেছেন যে জেরুসালেম চার্চ পুরোপুরি ইহুদিদের বলেই বিবেচিত হচ্ছিল। এটি পরিচালনা করতেন ইহুদি 'বিশপেরা। তারা সায়নে তাদের ইহুদি প্রতিবেশীদের অনেক আদর্শ মেনে চলতেন। পলের ধর্মান্তরিতদের বিপরীতে তারা বিশ্বাস করত না যে যিশু ছিলেন ঐশী সত্তা : সর্বোপরি তাদের অনেকে তাকে চিনত। কারণ তিনি ছিলেন শিশু। তারা তাকে ঈশ্বর হিসেবে দেখেনি। তারা তাকে স্রেফ মানুষ হিসেবে গণ্য করত। তাদের মতে, তিনি মেসাইয়া হতে পারেন। তারা জেরুসালেমে যিশুর সাথে সম্পৃক্ত স্থানগুলোর, বিশেষ করে মাউন্ট অব গলগোথা ও যে স্থানে যিশু মৃত থেকে জীবিত হয়েছিলেন সেই কবরের স্থান, প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত। অনেক ইহুদি তাদের শ্রদ্ধেয় প্রভুদের কবর জিয়ারত করতে পছন্দ করত। যিশুর স্মারক সমাধি তাদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণযোগ্য স্থান ছিল। তাদের অনেকে গলগোথা, প্লেস অব দি স্কাল সম্পর্কে রহস্যময় গুঞ্জনে নিয়োজিত হতে শুরু করেছিল। ইহুদিদের মধ্যে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল যে

আদমকে সোলায়মানের টেম্পলের স্থান মাউন্ট মরিয়ায় কবর দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় শতক নাগাদ ইহুদি খ্রিস্টানেরা বলত যে তিনি গলগোথায় সমাহিত। এটিই আদমের খুলির স্থান। তারা জেরুসালেম সম্পর্কে তাদের নিজস্ব পুরানকাহিনীর বিকাশ ঘটাচ্ছিল। এই ধারণা তাদের এই বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো যে যিশু ছিলেন নতুন আদম। তার মাধ্যমেই মানুষের নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে। এই মর্মান্তিক আমলেই অনেক ইহুদি তাদের চার্চে প্রবেশ করত। সম্ভবত আবার জীবিত হওয়ার ক্রুশবিদ্ধ মেসাইয়া ধারণাটি তাদের পুরনো বিশ্বাস পুনর্জীবনের আশাবাদী হতে তাদেরকে সহায়তা করেছিল।

অন্যরা সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করে। রাব্বিদের লেখালেখি থেকে আমরা দুই ইহুদির কথা শুনি। তারা মাংস ও মদ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কারণ এ দুটি সামগ্রী আর টেম্পলে ঈশ্বরকে নিবেদন করা যাচ্ছিল না। জীবন আর আগের মতো চলছিল না : ইহুদিদেরকে অবশ্যই শোক পালন ও মিতাচার অবলম্বন করার শাস্ত্রাচারের মাধ্যমে তাদের পরিবর্তিত মর্যাদা প্রকাশ করতে হতো। টেম্পল হারানো ছিল ভয়াবহ কষ্টের। ধ্বংসে ৩০ বছর পর 'বুক অব ব্যারুচের' লেখক বলেছেন যে সমগ্র প্রকৃতির উচিত শোক করা : এখন টেম্পল হারিয়ে গেছে, ফলে এখন আর জমিনের ফসল ফলানোর প্রয়োজন নেই, আঙুর ক্ষেত্র আর আঙুর জন্মানোর দরকার নেই, আকাশের উচিত শিশির আটকে রাখা, সূর্যের উচিত রশ্মি ছড়ানো বন্ধ করা :

আবার কেন আলো দেখা যাবে

যখন জায়নের আলো হয়ে গেছে অন্ধকার?

টেম্পলটি দুনিয়ার মূল কেন্দ্র, বশ্বাসের নির্যাসের প্রতিনিধিত্ব করত। এখন জীবনের নেই কোনো তাৎপর্য, নেই মূল্য। মনে হতে পারে, এই অন্ধকার সময়ে অনেক ইহুদি তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। এ কথাটি প্রায়ই জোর দিয়ে বলা হলেও আসলে তা সত্য নয়, ইহুদিদের বিশ্বাস আর তাদের টেম্পলে আবদ্ধ রাখার মতো ছিল না। এমনকি যেসব ইহুদি অন্যান্য উপায়ে ঐশী সত্তাকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল, তারাও বিশ্বাস করছিল

যে জেরুসালেম ও এর পবিত্রতাই তাদের ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। এই বিপর্যয়কর ক্ষতিতে টিকে থাকার জন্য ইহুদিদের তাদের সব সৃষ্টিশীলতার প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে

জেরুসালেম অবরোধের সময় প্রখ্যাত ফারিসি রাব্বি ইয়োহানান বেন জাক্কাই একটি কফিনে করে গোপনে নগরী থেকে পালিয়েছিলেন। আরো অনেক ফারিসির মতো তিনিও জিলটদের বৈপ্লবিক চরমপন্থার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছিলেন। ৭৩ সালে মাসাদার জিলটদের গণ-আত্মহত্যা, তারা রোমের কাছে বশ্যতা শিকারের চেয়ে মৃত্যুকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিল, তার কাছে খুবই অপছন্দের কাজ বলে মনে হয়েছিল। তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংযমের ফলে তিনি ও তার সাথীরাই ছিলেন টেম্পল ধ্বংসের পর বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখা একমাত্র ইহুদি নেতা। রাব্বি ইয়োহানান সম্রাট ভেসপ্যাসিয়ানের কাছে গিয়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তার অনুমতি কামনা করলেন, যাতে ইহুদিরা অধ্যায়ন ও প্রার্থনা করতে পারে : তিনি জোর দিয়ে বলেন, এটি হবে আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, বিপ্লবী চেতনার উর্বরক্ষেত্র নয়। তাকে উপকূলে ইয়াবনেহ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দিয়ে বিদায় করা হলো। সেখানে তিনি ও তার সহকর্মী রাব্বিরা, তাদের অনেকে টেম্পলে পুরোহিত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, নতুন ইহুদি ধর্ম নির্মাণ করতে শুরু করেন। ৫৮৬ সালে ইহুদিরা তাদের টেম্পল হারিয়ে ফেললে তারা তাওরাত অধ্যায়ন করে সান্ত্বনা পেয়েছিল। এখন ইয়াভনে ও ফিলিস্তিন ও বেবিলনে প্রতিষ্ঠিত একই ধরনের অন্যান্য একাডেমিতে তানাইম নামে পরিচিত রাব্বিরা মৌখিক আইনগুলো, যা কয়েক শত বছরের পরিক্রমায় বিকশিত হয়েছিল, সঙ্কলিত করতে শুরু করেন। পরে এই নতুন বিধান সঙ্কলনকে বলা হয়েছিল মিসনা। তারা যেখানেই থাকুক না কেন, এটি পরিণত হয়েছিল নতুন জেরুসালেমের প্রতীক। আর তাতেই ঐশী উপস্থিতি অনুভব করেছিল। রাব্বিরা শিখেছিল যে যখনই একদল ইহুদি একসাথে হয়ে তাওরাত অধ্যায়ন করবে, তখন দুনিয়ায় ঈশ্বরের উপস্থিতি শেখিনা তাদের মধ্যে উপবিষ্ট হবেন। অনেক বিধান টেম্পল শাস্ত্রাচারের সাথে সম্পর্ক রেখে প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই সময়কালে ইহুদিরা এসব বিধান অধ্যয়ন করার সময় হারানো টেম্পলের কল্পিত পুনঃনির্মাণে নিয়োজিত ছিল। এর মাধ্যমে তারা এর কেন্দ্রে ঐশী অনুভূতি পুনরুদ্ধার করেছিল। তানিমরা তাদের সঙ্কলন সম্পূর্ণ করার পর অ্যামোরাইম নামে পরিচিত পরের প্রজন্মের রাব্বিরা তাদের ব্যাখ্যার

ওপর টীকা লিখতে শুরু করে দেন। সবশেষে তালমুদ এসব রাব্বানীয় আলোচনাকে জোরালো করেছিল। এই পরিক্রমায় ইহুদিরা স্থান ও সময়ের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যুক্তি দিতে থাকবে, তাদের তাওরাত নিয়ে আবেগপূর্ণ বিতর্কে মশগুল থাকবে। ইহুদিরা তাদের অধ্যয়নের সময় ঐশী উপস্থিতির ওপর আলোকপাত করেছিল। এই উপস্থিতিকে ঘিরে থাকা প্রতীক টেম্পল প্রাচীরে পরিণত হয়েছিল পঞ্জীভূত ভাষ্য ও ব্যাখ্যার স্তরগুলো।

রাব্বিরা পশু উৎসর্গ করার পুরনো প্রথার বদলে এখন বদান্যতা ও সহানুভূতির ওপর জোর দিয়েছিলেন।

রাব্বি ইয়োহানান বেন জাক্কাই একবার জেরুসালেম ঘুরে এসেছিলেন। তার সাথে ছিলেন রাব্বি যশুয়া। তারা টেম্পলকে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখেছিলেন।

রাব্বি যওয়া বলেছিলেন, 'বলতে কষ্টে বুক ফেটে যায়, এই সেই স্থান যেখানে ইসরাইলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতো, তা ধ্বংস হয়ে গেছে!'

রাব্বি ইয়োহানান বলেন, 'বাছা আমার, দুঃখ পেয়ো না। আমাদের আরেকটি পাপমোচনের ব্যবস্থা আছে, তা এর মতোই কার্যকর। কিন্তু তা কী? তা হলো ভালোবাসা-দয়ার্তত‌া। বিষয়টি এভাবে বলা যায় : 'আমি করুণা চাই, উৎসর্গ নয়।' ৮

জায়ন মতবাদে বাস্তব সহানুভূতি দীর্ঘ দিন ধরেই অনিবার্য পরিপূরক বিবেচনা করা হতো : এখন কেবল বদান্যতাই ইসরাইলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যথেষ্ট হবে বলে মনে হলো। এটি ছিল প্রাচীন দুনিয়ার একটি বিপ্লবী আইডিয়া। কারণ ওই সময় কোনো না কোনো ধরনের বলি ছাড়া ধর্ম প্রায় অকল্পনীয় ছিল। এখন টেম্পল হারিয়ে যাওয়ায় রাব্বিরা তাদের অনুসারী ইহুদিদের তাদের প্রতিবেশীর মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের শিক্ষা দিলেন। অনেকে শিক্ষা দিলেন মিতজভোথ 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসাবে' ছিল 'তাওরাতের মহান নীতি।' কোনো মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধকে খোদ ঈশ্বরকে অস্বীকার করার সমতুল্য বিবেচিত হলো। কারণ ঈশ্বরতো নারী-পুরুষকে তার রূপেই তৈরি

করেছেন। ফলে ইহুদি আইনে খুন কেবল একটি অপরাধই নয়, এটি ধর্মদ্রোহিতা বিবেচিত হলো। সময়ের শুরুতে ঈশ্বর একটি একক মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন এটি শেখাতে যে একটি একক মানুষের জীবন ধ্বংস করার শাস্তি পুরো বিশ্ব ধ্বংস করার শাস্তির সমতুল্য হবে। একইভাবে একটি মানুষের জীবন রক্ষা মানে পুরো দুনিয়া রক্ষা করার সামিল।১১ কাউকে অপদস্থ করা, এমনকি তা যদি হয় কোনো গোয় বা ক্রীতদাস, ঈশ্বরের প্রতিকৃতি ধ্বংস করার সমতুল্য।১২ ইহুদিরা নিশ্চিতভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে অন্যদের সাথে তাদের লেনদেন ঐশী সাক্ষাত। এখন যেহেতু পবিত্র স্থানের সংস্পর্শে আসার সুযোগ আর নেই, তাই ইহুদিদের অবশ্যই মানুষের মধ্যেই তা খুঁজে নিতে হবে। ফারিসিরা সবসময়ই দানের ওপর গুরুত্ব দিত। তবে এখন টেম্পল হারানোর ফলে ঐশী সত্তার আরো বেশি মানবীয় ধারণায় আগের অধ্যায়ে বর্ণিত) পরিবর্তনের গুরুত্বে জোর দিতে সহায়ক হলো।

রাব্বিরা একদিন তাদের টেম্পল আবার পুনঃনির্মিত হওয়ার আশাও ছেড়ে দেননি। শেষবার যখন টেম্পল ধ্বংস করা হয়েছিল, তখন সব প্রতিকূলতার মধ্যেও তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে তারা বিশ্বাস করত যে এ ভবনটির পুনঃনির্মাণের কাজ ঈশ্বরের কাছে ছেড়ে দেওয়াই অনেক বিজ্ঞচিত ও নিরাপদ। কিন্তু তবুও জেরুসালেমের কথা ইহুদিদের ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না। রাব্বিরা ফিলিস্তিন ত্যাগ নিরুৎসাহিত করে বিধান প্রণয়ন করেছিলেন। তারা বলতেন, সকাল ও সন্ধ্যার উৎসর্গের বদলে দিনে তিনবার 'এইটিন বেনেডিকশনস' (১৮ প্রার্থনা) আবৃতি করতে হবে। ইহুদিরা যেখানেই থাকত না কেন, তারা এসব প্রার্থনা আবৃতি করত। তারা সফরে থাকলে তারা বাহন থেকে নেমে জেরুসালেমের দিকে মুখ ফেরাত, কিংবা তাদের হৃদয় বিধ্বস্ত দেভিরের দিকে মুখ করত।১৩ এসব প্রার্থনায় দেখা যায় যে এত কিছু ঘটা সত্ত্বেও জেরুসালেম এখনো ঈশ্বরের আবাস বিবেচিত হচ্ছে :

হে প্রভু আমাদের ঈশ্বর, আপনার জেরুসালেম, আপনার জাতি ও জেরুসালেমের প্রতি, আপনার নগরী ও জায়নের প্রতি, আপনার মহান গৌরবের, স্থায়ী স্থানের প্রতি, এবং আপনার টেম্পলের প্রতি, এবং আপনার আবাসের প্রতি, দাউদ পরিবারের রাজত্বের প্রতি,

সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি আপনার বিপুল করুণা বর্ষণের কথা মনে রাখবেন। আপনি মহাপবিত্র, হে প্রভু আমাদের ঈশ্বর, জেরুসালেমের নির্মাতা।১৪

অনেক রাব্বি কল্পনা করতেন, শেখিনা (ব্যক্তিরূপে ঐশী উপস্থিতি) ঈশ্বরের দূরদর্শিতায় এখনো ধ্বংস থেকে টিকে থাকা দেভিরের পশ্চিম প্রাচীরের পাশে অবস্থান করছেন।১৫ অন্যরা মনে করত, শেখিনা অনিচ্ছাভরে জেরুসালেম ত্যাগ করছেন, একেবারে মন্থর গতিতে : তিন বছর পর্যন্ত তিনি 'মাউন্ট অব অলিভেসে অবস্থান করেছিলেন, দিনে তিনবার কাঁদতেন। ১৬ ইহুদিরা স্মরণ করত যে ইজেকিল স্বপ্নবিভাবে মাউন্ট অব অলিভেসের ঢালু বেয়ে ওয়াইএইচডব্লিউএইচের দ্যুতি ফিরতে দেখেছিলেন। ফলে তারা তাদের পবিত্র নগরীতে ঈশ্বরের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তনের বিশ্বাসের ঘোষণা হিসেবে সেখানে সমবেত হতে ভালোবাসত।

ইহুদিদের অনেকে সান্ত্বনার জন্য আরো দ্রুত মরমিবাদের দিকে ঝুঁকেছিল। এটি ছিল এমন ধরনের আধ্যাত্মিকতা যা রাব্বিরা অনেক সময় অবিশ্বাস করতেন। তবে মরমি সাধকেরা নিজেরা ঈশ্বরের স্বর্গীয় সিংহাসনে আধ্যাত্মিক সফর ও রাব্বানিক ইহুদি ধর্মের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা দেখতে পেত না। বস্তুত, তারা প্রায়ই একাডেমিগুলোর আরো বিশিষ্ট রাব্বিদের কারো কারো সাথে তাদের স্বপ্নবিভাবের কথা বলতেন। টেম্পল হারানোর পর 'সিংহাসন আধ্যাত্মিকতা' সম্পূর্ণ নতুন প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে। হায়, জাগতিক প্রতিকৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে এর স্বর্গীয় আদিরূপ অধ্বংসযোগ্য। ইহুদিরা তখনো স্বর্গরাজ্যে তাদের কল্পিত আলিয়ায় সেখানে পৌঁছাতে পারে। ফলে ২ বারুচের গ্রন্থকার, তিনি টেম্পল ধ্বংস হওয়ার প্রায় ৩০ বছর পর লিখেছেন, জোর দিয়ে বলেছেন যে স্বর্গীয় জেরুসালেম শ্বাশত। এটি সময়ের আগে থেকেই ঈশ্বরের সাথে' আছে এবং 'আমি স্বর্গ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তেই এটি প্রস্তুত হয়েছে।' এটি ঈশ্বরের হাতের তালুতে চির স্থায়ীভাবে এঁটে রয়েছে, একদিন এই স্বর্গীয় বাস্তবতা আরো একবার পৃথিবীতে নেমে আসবে।১৭ পুরনো পবিত্র স্থানে নশ্বর নগরীতে আবারো এটি বাস্তব অবয়ব গ্রহণ করবে, নশ্বর দুনিয়ায় ঈশ্বর তার জাতির মধ্যে বাস করবেন। প্রায় একই সময়ে ৪ ইউনুসের লেখক স্বর্গীয় জেরুসালেমের অবতারের একই স্বপ্নাবিভাবের কথা জানান। দুনিয়াবি জায়ন

দুর্ভোগে পেয়েছে, নারা গেছে; কিন্তু স্বর্গীয় জায়ন এখনো ঈশ্বরের সাথে আছে। একদিন 'এখন অদৃশ্য থাকা নগরীটি দৃশ্যমান হবে।' এই নতুন জেরুসালেম হবে জাগতিক স্বর্গ : এখানে যারা বাস করবে, তারা ঈশ্বরের পূর্ণাঙ্গ সাহচর্য লাভ করবে; পাপ বিলীন হয়ে যাবে, মৃত্যুকে গ্রাস করবে বিজয়। ১৯ ইহুদি বিশ্বের ওপর ৭০ সালে নেমে আসা বিচ্ছেদের যন্ত্রণা, ক্ষতি, বিচ্যুতি দূর হয়ে যাবে, ইডেনের আদি সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

ইহুদি খ্রিস্টানেরাও সিংহাসনের স্বপ্নবিভাব দেখত। ডোমিটিয়ানের শাসনামলে, এ সময় রোমান কর্তৃপক্ষ খ্রিস্টানদের নির্যাতন করত, জন নামের এক ভ্রাম্যমাণ প্রচারকের স্বর্গীয় টেম্পলের স্বপ্নদর্শন করেছিলেন। তাতে তিনি দেখেন যে শহিদরা হয়েছে নতুন পুরোহিত, তারা সাদা পোশাক পরে, সিংহাসনের সামনে অবস্থান করে। তিনি সুকোথের স্বর্গীয় প্রার্থনাবিধির কল্পনা করেছিলেন। তবে তিনি পুরনো মতবাদ থেকে এর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের বিষয়টিও ধরতে পেরেছিলেন। সেকেন্ড টেম্পলের হৃদয়ে সবসময় একটি সম্পূর্ণ শূন্যতাও ছিল : আর্ক হারিয়ে যাওয়ায় দেভির ছিল ফাঁকা। তবে জন দেখলেন, নিজেকে ঈশ্বরের সাথে আধ্যাত্মিকভাবে চিহ্নিত করে খ্রিস্ট স্বর্গীয় সিংহাসনে বসেছেন। এ কারণে তিনি ছিলেন পুরনো জায়ন মতবাদের পূর্ণতা বিধানকারী। যদিও এসব খ্রিস্টান তাদের পাশে থাকা ইহুদিদের আশার সাথে একমত পোষণ করতেন, চূড়ান্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় থাকত। একদিন স্বর্গীয় জেরুসালেম পৃথিবীতে নেমে আসবে। চূড়ান্ত স্বপ্নবিভাবে জন দেখেছিলেন, 'পবিত্র নগরী স্বর্গ থেকে নেমে আসছে। এতে ঈশ্বরের সব উজ্জ্বল জ্যোতি রয়েছে। এই নতুন জেরুসালেমে কোনো টেম্পল থাকবে না, কারণ ওই স্থানটি গ্রহণ করেছেন খ্রিস্ট। ঐশী ব্যক্তিটি এখন 'অধিষ্ঠানের' মূল কেন্দ্র। তবে জেরুসালেম এখনো জনের মতো ইহুদি খ্রিস্টানদের কাছে উদ্দীপ্ত প্রতীক যে তিনি একে ছাড়া ঈশ্বরের চূড়ান্ত মহাপ্রলয় কল্পনা করতে পারেন না। স্বর্গীয় নগরীটি রাজ্য হিসেবে পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য দুনিয়ার ওপর বাস্তব অবয়ব গ্রহণ করবে। সবশেষে জাগতিক স্বর্গ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, জীবনের নদী পুরো দুনিয়ায় আরোগ্য বিধান করতে ঈশ্বরের সিংহাসনের নিচ থেকে বের হয়ে আসবে।১

ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা অনেক দিক থেকেই একইভাবে ঈশ্বরের সান্নিধ্য অর্জন করছিল। তারা যথাক্রমে জেরুসালেম ও যিশুকে ঐশী সত্তার প্রতীক হিসেবে দেখছিল। সিংহাসন মরমিদের অনেকে জেরুসালেম নিয়ে যেভাবে ভাবছিল, খ্রিস্টানেরাও সেভাবেই যিশু সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছিল : তিনি হলেন শুরু থেকে ঈশ্বরের সাথে থাকা ঐশী বাস্তবতার অবতার এবং মানবতার অনুষঙ্গ পাপ, মৃত্যু ও হতাশা থেকে মুক্তিদাতা। কিন্তু এই মিল সত্ত্বেও ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা একে অপরের প্রতি চরমভাবে বৈরী ও আত্মরক্ষামূলক অবস্থায় ছিল। আমরা যতটুকু জানি যে কোনো পৌত্তিলিক খ্রিস্টান মাউন্ট সায়ন বা জেরুসালেমের বিধ্বস্ত নগরীতে বসবাস করছিল না। জন দি প্রিচারের বর্ণিত স্বর্গীয় জেরুসালেমের ব্যাপারে আগ্রহী থাকলেও নশ্বর নগরীর প্রতি আগ্রহী ছিল না। জেরুসালেম ও ইহুদি জনসাধারণ সম্পর্কে খ্রিস্ট ধর্মের পল সংস্করণের অনুসারীরা কী ভাবত তা আমরা ৮০ ও ৯০-এর দশকে লেখা ম্যাথু, লুক ও জনের গসপেলগুলোতে দেখতে পাই।

মজার ব্যাপার হলো, পৌত্তলিক খ্রিস্টান লুকই মূল বিশ্বাসের প্রতি সবচেয়ে বেশি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। তার গসপেল শুরু ও শেষ হয় জেরুসালেমে : এটি শুরু হয় হেখালে জন দি ব্যাপ্টিস্টের বাবা জাচারিয়াসের স্বপ্নাবিভাব দিয়ে, এবং শেষ হয় মাউন্ট অব অলিভস থেকে যিশুকে স্বর্গে আরোহণ প্রত্যক্ষ করে শিষ্যদের জেরুসালেমে ফিরে আসার বর্ণনা দিয়ে। তারা 'পূর্ণ আনন্দে জেরুসালেমে ফিরবে; এবং তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে থাকা টেম্পলের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে থাকতে থাকবে।২২ নিরবচ্ছন্নতা লুকের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক যেমন প্রাচীন কালের শেষ সময়ে অন্যদের কাছে ছিল। উদ্ভাবন ও অভিনব কিছু ছিল সংশয়মূলক। ধর্মীয় লোকজনের কাছে এটি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তাদের বিশ্বাস অতীতের পবিত্রতায় গভীরভাবে প্রোথিত। এ কারণে পলের মতো লুকও জেরুসালেম ও ইহুদি ধর্মের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাননি। যিশু পবিত্র নগরীতে প্রচারকাজ শুরু করতে তার শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখনো সেটি ছিল বিশ্বের কেন্দ্র ও স্থান, যেখানে প্রতিটি নবী অবশ্যই তার নিয়তি পূরণ করতেন। 'অ্যাক্টস অব অপসলসে' লুক তার নায়ক পলকে জেরুসালেমের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল এবং জেমস দি জাদিকের চেয়ে ভিন্ন করে দেখিয়েছেন। তিনি এই প্রাথমিক সময়ের

সহযোগিতাকে অত্যন্ত আদর্শকৃত ছবিতে উপস্থাপন করেছেন, চেষ্টা করেছেন পল ও জেমসের সম্পর্কে যে তিক্ততা দেখা গিয়েছিল, তা লুকিয়ে রাখতে। লুক দেখিয়েছিলেন, যিশুর অনুকরণ করে পল এমনকি জীবনকে বিপন্ন করে হলেও জেরুসালেমের প্রতি বাধ্যবাধকতা ও অনুপ্রেরণা অনুভব করতেন। তবে লুক একইভাবে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, খ্রিস্টানেরা জেরুসালেমে থাকতে পারে না : তাদেরকে অবশ্যই পবিত্র নগরী থেকে গসপেল নিয়ে 'পুরো জুদা ও সামারিয়া থেকে চলে যেতে হবে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে। ২৩ খ্রিস্টানদের জন্য লুকের প্রিয় নাম ছিল 'পথ' : যিশুর অনুসারীরা সবসময় সফরে থাকে, এই দুনিয়ায় তাদের বসবাস করার মতো কোনো নগরী নেই।

অবশ্য ম্যাথু ও জন জেরুসালেম বা ইহুদি জনসাধারণ সম্পর্কে অনেক কম ইতিবাচক ছিলেন। উভয়ে ইহুদি থেকে পলের চার্চে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তাদের লেখালেখিতে খ্রিস্টের প্রকৃতি, জেরুসালেমের মর্যাদার মতো বিষয়ে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে ওই সময়ে বিদ্যমান কিছু বিতর্ক প্রতিফলিত হয়ে থাকতে পারে। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, নশ্বর জায়ন নিয়ে সংশয়ে ছিলেন ম্যাথু। এটি একসময় পবিত্র স্থান হলেও- তিনিই একমাত্র ইভানজেলিস্ট, যিনি একে পবিত্র নগরী হিসেবে অভিহিত করেছেন- এই নগরীর যিশুকে প্রত্যাখ্যান করা, তাকে মৃত্যুর মুখে ফেলার বিষয়টি আগেই অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পেয়ে তিনি এর ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জেরুসালেম পরিণত হয় অপরাধের নগরী। ম্যাথু যখন ৭০ সালে নগরীর ওপর আপতিত বিপর্যয়কে যিশুর ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে অভিহিত করেন, তখন তিনি একে ইতিহাসের সমাপ্তিতে ঘটা বিপর্যয়বাদের সাথে সম্পর্কিত করেন। তিনি জেরুসালেম ধ্বংসকে যিশুর গৌরবময় প্রত্যাবর্তনের সূচনাকারী বিপর্যয় বিবেচনা করেছিলেন। নগরীর বাইরের গলগোথায় যিশু যখন মারা যান, তখন দেভির থেকে হেখালকে বিভক্তকারী 'পর্দা' দুই টুকরা হয়ে গিয়েছিল : পুরনো টেম্পল মতবাদ বাতিল হয়ে গেছে, এখন সবাই- কেবল ইহুদিদের পুরনো পুরোহিত সম্প্রদায়ই নয়- খ্রিস্ট ব্যক্তির ঐশী সত্তায় প্রবেশ করতে পারে। জন এই বিষয়কে আরো জোর দিয়ে তুলে ধরেছেন। এই সময় অন্যদের মতো তিনি জোরালোভাবে বলেন, ঈশ্বরকে আর টেম্পলে পাওয়া যাবে না, তাকে পাওয়া যাবে ঐশী মানবের মধ্যে। জন তার গসপেলের প্রস্তাবনায় দৃঢ়তার সাথে বলেন, যিশু হলেন লোগোস (মূর্ত অবস্থায় উচ্চারিত ঈশ্বরের

বাণী) তথা সময়ের সূচনায় 'ঈশ্বরের সাথে থাকা 'বাণী' এবং পৃথিবী সৃষ্টির সময় উচ্চারিত ঈশ্বরের 'বাণী'। এই স্বর্গীয় বাস্তবতা এখন দুনিয়ায় নেমে এসে মূর্ত রূপ পেয়েছে, মানব জাতির সামনে ঈশ্বরের 'দ্যুতি' প্রকাশ করছে।২৫ জন লিখেছিলেন গ্রিকে। হিব্রু 'শেখিনার' কোনো গ্রিক প্রতিশব্দ ছিল না। অথচ এ শব্দটি দিয়েই ইহুদিরা খোদ ঈশ্বরের চরম ঐশী বাস্তবতা থেকে আলাদা করার ব্যাপারে সচেতন ছিল। অধিকন্তু যিশুকে 'প্রেরিত বার্তা' ও ঈশ্বরের 'দ্যুতি' হিসেবে দেখে জন হয়তো তাকে মানব অবয়বে শেখিনা বিবেচনা করেছিলেন। ২৬

তবে ম্যাথুর মতো জনও ইহুদিদের প্রতি চরমভাবে বৈরী ছিলেন, তাদেরকে খ্রিস্টকে বারবার প্রত্যাখ্যান করতে দেখিয়েছেন। উভয় ইভানজেলিস্ট এর মাধ্যমে ইহুদি লোকজনের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলেন যার পরিণতিতে খ্রিস্টান ইতিহাসের সবচেয়ে লজ্জাজনক কিছু ঘটনা ঘটেছিল। আমরা পরে দেখতে পাব, ক্রমবর্ধমান হারে খ্রিস্টানদের কাছে তাদের আধ্যাত্মিক পূর্বসূরিদের সহ্য করা অসম্ভব মনে হয়েছিল, একেবারে প্রাথমিক সময় থেকেই তাদের নিজস্ব বিশ্বাসের শুদ্ধতাকে ইহুদি ধর্মের পরাজয়ের ওপর নির্ভরশীল হিসেবে দেখছিল। এর ফলে জন ইঙ্গিত দেন যে টেম্পল মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেই যাত্রা শুরু করেছিলেন যিশু। তিনি যিশুকে তার মিশনের শেষে নয়, একেবারে শুরুতেই জেরুসালেমে পাঠিয়েছিলেন, কোর্ট অব দি জেনটিলসে মুদ্রা বিনিময়কারীদের তাড়িয়ে দিতে দেখিয়েছেন। তিনি ইহুদিদের বলেন, 'এই টেম্পল ধ্বংস করে ফেলো, তিন দিনের মধ্যে আমি আবার তা নির্মাণ করব।' জন ব্যাখ্যা করে বলেন, তিনি তার দেহের টেম্পলের কথা বলেছিলেন।২৭ এর পর থেকে লগোসের উত্থিত দেহ এমন স্থান হবে, যেখানে লোকজন ঐশী উপস্থিতি দেখতে পাবে। ফলে একেবারে শুরু থেকেই যিশু ও ইহুদি ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে সজ্ঘাত ছিল এবং টেম্পলের দিন ফুরিয়ে আসছিল। যিশু পরিষ্কার করেছেন যে জেরুসালেম, মাউন্ট জেরিজিম, বেথালের মতো পবিত্র স্থানগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে।২৮ শেখিনা টেম্পল পারিপার্শ্বিকতা থেকে প্রত্যাহৃত হয়েছে। ২৯ এই ঐশী বাণী প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে ইহুদিরা নিজেদেরকে অন্ধকারের শক্তির সাথে মিত্রতা গড়েছে।

খ্রিস্টানেরা নিশ্চিতভাবেই জেরুসালেমের পরবর্তী ঘটনায় ঈশ্বরের হাত রয়েছে বলে ধরে নিয়েছিল। ১১৮ সালে রোমান জেনারেল পাবলিয়াস অ্যালিয়াস হ্যাড্রিয়ানাস সম্রাট হন। তিনি ছিলেন ওই পদে অভিষিক্ত অন্যতম যোগ্য লোক। তার উচ্চাভিলাষ কেবল সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নয়, একে সুসংহত করাও ছিল। হ্যাডিয়ান একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র, একটি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়তে চেয়েছিলেন, যাতে করে বর্ণ ও জাতীয়তা নির্বিশেষে সব নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারবে। তার এই ইচ্ছা প্রচার ও পূরণের জন্য তিনি প্রধান যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা হলো সাম্রাজ্যে রাষ্ট্রীয় সফর। হ্যাড্রিয়ান তার রাজত্বকালের প্রায় অর্ধেক সময় অতিবাহিত করেছে বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ সহকর্মীদের নিয়ে পথে। এর মানে হলো, তিনি পুরো রাজধানী নগরীকে নিয়ে পথ চলে পথচারীদের মোহিত করতে চেয়েছেন। প্রতিটি নগরীতে তিনি আবেদন শুনেছেন, স্থানীয় লোকজনকে উপহার দিয়ে এই আশা করেছেন যে তিনি পেছনে একটি সফল ও শক্তিশালী সরকারের ভাবমূর্তি রেখে যাচ্ছেন। তিনি বিশেষভাবে চাইতেন ভবন বা স্মৃতিসৌধ আকারে তার সফরের স্থায়ী স্মারক রেখে যেতে। এসবের মধ্যে ছিল অ্যাথেন্সে জিউসের মন্দির বা অ্যাথেন্স, অ্যান্টিয়ক, করিনথ ও ক্যাসারিয়ায় নহর। এটি রোমের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধন করত, জনগণের প্রতি সম্রাটের বদান্যতা স্থায়ীভাবে মুদ্রিত থাকত। হ্যাড্রিয়ান ১৩০ সালে জেরুসালেমে এসে সিদ্ধান্ত নিলেন যে জুদার লোকজনের প্রতি তার উপহার হতে পারে একটি নতুন নগর। উদার সম্রাট জেরুসালেমের জঘন্য ধ্বংসাবশেষ ও জনশূন্য সেনা শিবিরের স্থানে একটি আধুনিক মেট্রোপলিশ গড়লেন। নাম দিলেন আলিয়া ক্যাপিটোলিনা। এতে তার নিজের নাম মুদ্রিত থাকল, আবার রোম ক্যাপিটলের পৃষ্ঠপোষক দেবতাদের প্রতিও সম্মান দেখানো হলো।

হ্যাড্রিয়ানের পরিকল্পনা ইহুদি জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করল। আসলে যা ঘটতে যাচ্ছে তা হলো ওয়াইএইচডব্লিউএইচের পবিত্র টেম্পলের স্থান মাউন্ট জায়নে জুপিটারের মন্দির নির্মিত হতে যাচ্ছে। এছাড়া অন্য দেবদেবীদের মন্দিরও সারা নগরী ছেয়ে যাবে। গত কয়েক শ' বছরে 'জেরুসালেম' ও 'জায়ন' সারা বিশ্বে ইহুদিদের পরিচিতির মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এ দুটি শব্দ ঈশ্বরের নামের সাথে অবিভাজ্য। এখন এসব নামের স্থানে পৌত্তলিক সম্রাটের নাম ও তার মূর্তিগুলো স্থান পাবে। ইহুদি জেরুসালেম

ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়েছিল ৬০ বছর ধরে। এখন এটি রাজকীয় শক্তির নির্দেশে চাপা পড়ে যাবে। এটি আর কখনো জেগে ওঠতে পারবে না। জায়ন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে। এখান থেকে জেরুসালেমের লোকজন যুদ্ধ ও ধ্বংসের সাথে পরিচিত হয়েছিল; তারা দুবার বিজয়ী সেনাবাহিনী নগরীকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া দেখেছে, অনেকবার তাদের টেম্পল অপবিত্র হয়েছে, প্রাচীরগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম একটি নির্মাণ প্রকল্প বৈরী কাজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। জেরুসালেমে ভবন সবসময়ই ধর্মীয় তৎপরতা। এটি বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসকে ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু এখন নির্মাণ ও ভবন বিজয়ী সাম্রাজ্যের হাতে অস্ত্রে পরিণত হলো। আলিয়া ক্যাপিটোলিনা মন্দির বাস্তবতা ও এর জনগণের অন্তরাত্মার সামগ্রিকতাকে প্রতীকিভাবে তুলে ধরা ইহুদি জেরুসালেমকে মুছে দেবে। রোমান নগরীর অধীনে এর সবই বিলীন হয়ে যাবে। এই রাজকীয় নির্মাণ কর্মসূচি হবে সৃষ্টি-বিনাসী : বিশৃঙ্খলা ফিরে আসবে। পরাজিত লোকজন তাদের পবিত্র নগরী ও এর প্রিয় মাইলফলকগুলো রাস্তা, সৌধ ও বৈরী শক্তির প্রতীকের নিচে আড়াল হয়ে যাবে এবং তাদের মনে বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার অনুভূতির সৃষ্টি হবে, জেরুসালেমের ইতিহাসে এমন ঘটনা এটিই শেষ নয়।

বার কুচবার আরামাইক ভাষায় লেখা এক চিঠিতে সুকোথের শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য খেজুরের ডাল, মেদিগাছ, লেবু ও উইলো চেয়ে অনুরোধ করেন। খুব সম্ভবত বার কুচবা বিধ্বস্ত টেম্পল মাউন্টে মতবাদটি আবার চালু করার চেষ্টা করেছিলেন।

হ্যাড্রিয়ানের ব্যাপারে স্পষ্টভাবেই বলা যায়, তিনি প্রায় নিশ্চিতভাবেই এই প্রতিক্রিয়া অনুমান করতে পারেননি। তার মনে হয়েছিল, এই ভয়াবহ ধ্বংসস্তুপের মধ্যে একটি আনন্দদায়ক, আধুনিক নগরী কে না পছন্দ করবে? নির্মাণ সৃষ্টি করবে চাকরি, নতুন মেট্রোপলিস সেখানে নিয়ে আসবে সম্পদ। অতীত শত্রুতার অস্বাস্থ্যকর স্মৃতি জাগানিয়া জেরুসালেমের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে নতুন নগরীটি মাথা তুলে দাঁড়ালে তা অবশ্যই ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির স্বার্থে আগের সবকিছুকে ছাপিয়ে যাবে। ইহুদি ও রোমানদেরকে অবশ্যই তাদের অতীতকে পেছনে ফেলে এই অঞ্চলের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য একসাথে কাজ করতে হবে। ইহুদি ধর্মের প্রতি হ্যাড্রিয়ানের কোনো ভালোবাসা ছিল না। এটি তার

কাছে খুবই সেকেলে ধর্ম মনে হয়েছিল। বিশেষ করে ইহুদিদের একগুঁয়েমি সাংস্কৃতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল : তাদেরকে অবশ্যই টেনে- প্রয়োজনে শক্তিপ্রয়োগ করে- আধুনিক বিশ্বে নিয়ে যেতে হবে। প্রগতি ও আধুনিকতার নামে কোনো জাতির পরিচিতির অনুভূতির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জাড়িয়ে থাকা ঐতিহ্যকে ধ্বংসকারী প্রথম শাসক ছিলেন না হ্যাড্রিয়ান। ১৩১ সালে তিনি বেশ কিছু ফরমান জারি করেন। এসবের উদ্দেশ্য ছিল ইহুদিদের তাদের অদ্ভূত রীতিনীতি পরিত্যাগ করে গ্রিকো-রোমান বিশ্বের অন্য সবার সাথে সামঞ্জাস্যপূর্ণ হওয়া। খতনা করা- তার দৃষ্টিতে ছিল বর্বোচিত কাজ- রাব্বিদের উপদেশ, তাওরাতের শিক্ষা, প্রকাশ্যে ইহুদি সভা সবাই নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। ইহুদিদের অস্তিত্বের প্রতি এটি ছিল আরেকটি আঘাত। এসব আদেশ অনুমোদিত হওয়ার পর এমনকি সবচেয়ে উদার রাব্বিও উপলব্ধি করতে পারলেন যে আরেকটি যুদ্ধ অনিবার্য।

এবার ইহুদিরা অপ্রত্যাশিতভাবে বিপদে পড়তে চাইছিল না। তাদের নতুন অভিযান অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে প্রণয়ন করা হয়েছিল, একেবারে ক্ষুদ্রতম বিষয়গুলোর দিকেও নজর রাখা হয়েছিল। সব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার আগে কোনো লড়াই হয়নি। বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সাইমন বার কোসেবা। এই দৃঢ়চেতা, বাস্তববাদী সেনানি সামনাসামনি যুদ্ধ সতর্কভাবে এড়িয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে তার সৈন্যদের পরিচালিত করেন। গ্রামীণ এলাকায় ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য টেনথ লিজিয়ন জেরুসালেম ত্যাগ করা মাত্র বার কোসেবার সৈন্যরা নগরীটি দখল করে। বার কোসেবা তার চাচা ইলিজার (পুরোহিত) সহায়তায় অবশিষ্ট সব পৌত্তলিককে নগরী ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তিনি সম্ভবত টেম্পল মাউন্টে বলির মতবাদও আবার চালু করার চেষ্টা করেছিলেন। মহান রাব্বি আকিভা, সর্বকালের অন্যতম পণ্ডিত ও ওই আমলে তিনিই অন্যতম মরমি সাধক, মেসাইয়া হিসেবে বার কসেবাকে অভিহিত করে তাকে বার কোখবা (তারকার সন্তান) নাম দেন। এই আলোতে বার কোসেবা নিজেকে কী বিবেচনা করতেন, সে ব্যাপারে আমাদের কোনো ধারণা নেই : তিনি সম্ভবত তার অত্যন্ত সফল অভিযান নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা করার সময়ই পেতেন না। তবে জেরুসালেমে মুদ্রিত মুদ্রায় 'রাজপুত্র সাইমন' ও 'পুরোহিত ইলিজার' খোদাই থাকায় ধারণা করা যেতে পারে, তারা

নিজেদেরকে রাজসিক ও পুরোহিতোচিত মেসাইয়া বিবেচনা করতেন। অর্থাৎ জেরুবাবেলের পর জেরুসালেমে তাদেরকে বিবেচনা করা হচ্ছিল যৌথ উদ্ধারকারী। আরেকটি মুদ্রায় খোদিত ছিল 'জেরুসালেমের মুক্তির জন্য' শব্দগুলো। তবে তা ছিল ব্যর্থ। বার কোসেবা ও তার লোকজন তিন বছর পর্যন্ত তাদের বিদ্রোহ ধরে রাখতে পেরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হ্যাডিয়ানকে তার সেরা জেনারেলদের অন্যতম সেক্সটাস জুলিয়াসকে জুদায় পাঠাতে বাধ্য হন। শক্তিশালী রোমের বিরুদ্ধে অনির্দিষ্টকালের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া ক্ষুদ্র ইহুদি সেনাবাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখনো প্রাচীর বা দুর্গবিহীন জেরুসালেম রক্ষা করা ছিল অসম্ভব। রোমানরা পরিকল্পিতভাবে জুদা ও গ্যালিলিতে একটির পর একটি ইহুদি ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করে ফেলছিল। ডিও ক্যাসিয়াস আমাদের বলছেন যে রোমানরা ৫০টি দুর্গ দখল করে, ৯৮৫টি গ্রাম ধ্বংস করে, ৫৮০,০০০ ইহুদি সৈন্যকে হত্যা করে : 'ক্ষুধায়, মহামারীতে, আগুনে কত লোক যে মারা গেছে, তাদের হিসাব কেউ রাখেনি। সবশেষে ১৩৫ সালে বার কোসেবাকে জেরুসালেম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, বেথারে তার শেষ দুর্গে তাকে হত্যা করা হয়। তবে ইহুদিরা রোমানদের ওপর এত ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল ইহুদিরা যে হ্যাড্রিয়ান যখন সিনেটে বিজয় সম্পর্কে অভিহিত করতে যান, তখন তিনি প্রচলিত পরিভাষা 'আমি ভালো আছি, আমার সেনাবাহিনী ভালো আছে' ব্যবহার করতে পারেননি। ৩১ ইহুদিরা আর অবজ্ঞেয়, পরাজিত জাতি বিবেচিত হলো না। এই দ্বিতীয় যুদ্ধে তাদের কর্মকাণ্ড রোমের অনীহ শ্রদ্ধা অর্জন করে।

অবশ্য এটি ইহুদিদের সামান্যই স্বস্তি দিয়েছিল। যুদ্ধের পর ইহুদিদেরকে জেরুসালেম ও সমগ্র জুদায় নিষিদ্ধ করা হয়। মাউন্ট সায়নে থাকা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে হটিয়ে দেওয়া হয়। নগরীর আশপাশে কোনো ইহুদি সম্প্রদায়ের কেউ থাকল না। ফিলিস্তিনের ইহুদিরা এখন গ্যালিলিতে সমবেত হলো : তাইবেরিয়াস ও সেফোরিস হলো তাদের প্রধান নগরী। তারা পবিত্র নগরীকে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্ন করা ও আলিয়া ক্যাপিটোলিনা সৃষ্টির বেদনাদায়ক খবর শুনল। কাজটির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল পোপের দূত রাফাস তিমেয়াসের ওপর। প্রথমে নগরী ও ধ্বংসাবশেষ গুঁড়িয়ে সমান করা হয়েছিল। তারপর নতুন বসতি স্থাপনের জন্য প্রাচীন রোমান শাস্ত্রাচার অনুসরণ করা হয়েছিল।৩২ ইহুদিদের জন্য এটি দৃশ্যত ছিল

মিকার ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ হওয়া : 'মাঠের মতো চষা হবে জায়ন। ৩৩ হ্যাড্রিয়ানের পরবর্তী পরিবর্তন ছিল জনমানবহীন স্থানটিকে আধুনিক হেলেনিক নগরীতে পরিণত করা, যেখানে থাকবে মন্দির, গণ-স্নানাগার, নিম্ফকে (যার আরোগ্য করার ক্ষমতা ছিল বলে ধরা হতো) উৎসর্গ করে একটি চৌবাচ্চা, দুটি বাজার। একটি ফোরাম ছিল নগরীর পূর্ব দিকে, বর্তমানের স্টেফেন্স গেটের কাছে), অপরটি ছিল ওয়েস্টার্ন হিলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে, যা এখন মুরিস্তান স্কয়ার নামে পরিচিত। নগরীর সর্বোচ্চ স্থান সাবেক হেরড প্রাসাদেই অবস্থান করে টেনথ লিজিয়নের শিবির। হ্যাড্রিয়ান কোনো নতুন নগর-প্রাচীর নির্মাণ করেননি, তবে ধারাবাহিক কিছু সৌধ তোরণ নির্মাণ করেন। একটি নির্মাণ করা হয়েছিল বার কসেবার বিরুদ্ধে জয়ের স্মারক হিসেবে নগরীর প্রায় ৪৪০ গজ উত্তরে, অপরটি ছিল আলিয়ার প্রধান প্রবেশপথ। এটি নির্মাণ করা হয়েছিল দামাস্কাস গেটের স্থানে। দুটি ফোরামেও ছিল আরো দুটি তোরণ। পূর্ব দিকের ফোরামের তোরণটি বর্তমান ইচে হোমো আর্চ নামে পরিচিত। কারণ খ্রিস্টানেরা মনে করে, এখানেই যিশুকে জনসাধারণের সামনে প্রদর্শন করেছিলেন পিলেত। তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন : 'নিপাত যাও!'৩৪ আলিয়ার উত্তরে প্রধান প্রবেশপথটি একটি স্তম্ভ-সজ্জিত স্কয়ার ছিল। এতে সম্রাটের একটি মূর্তি ছিল। আলিয়ার প্রধান দুটি রাস্তা (কারডিনেস তথা নগরীর কব্জা নামে পরিচিত) স্কয়ার থেকে বের হয়ে উত্তর দিকের প্রধান প্রবেশপথ পর্যন্ত গিয়েছিল : একটি কারডো (প্রাচীন রোমের নগর পরিকল্পনার অপরিহার্যভাবে থাকা নর্থ-সাউথ স্ট্রিট) বর্তমানের ভ্যালি স্ট্রিটের (তারিক আল-ওয়াদ) রুটের পাশাপাশি এগিয়ে গিয়েছিল। আর কারডো ম্যাক্সিমাস ওয়েস্টার্ন হিলের প্রান্ত ঘেঁসে ছিল। হ্যাড্রিয়ান একটি রাজপথের নেটওয়ার্কও নির্মাণ করেছিলেন। এটি এখনো মোটামুটিভাবে রয়েছে। এটিই বর্তমানের নগরীর চলাচল পথের ভিত্তি হিসেবে রয়ে গেছে।

অবশ্য ইহুদিদের জন্য আরো পীড়াদায়ক বিষয় ছিল ধর্মীয় প্রতীকগুলো। ওয়াইএইচডব্লিউএইচের পবিত্র নগরীতে এগুলো মহাদম্ভে প্রদর্শিত হচ্ছিল। সত্যিকার অর্থে তিন ক্যাপিটোলাইন ঈশ্বর জুটিটার, জুনো ও মিনার্ভার প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছিল আলিয়াকে। তবে ইহুদি যুদ্ধের পর সম্ভবত জুপিটার মন্দিরের জন্য আরো ভালো স্থান হিসেবে পুরনো টেম্পল মাউন্টকে বাছাই করেছিলেন হ্যাড্রিয়ান। হেরডের প্লাটফর্মের ওপর

কোনো পৌত্তলিক মন্দির থাকার কথা কোনো মুসাফিরই উল্লেখ করেননি। তবে তারা সেখানে দুটি মূর্তি দেখার কথা জানিয়েছেন : একটি হ্যাড্রিয়ানের, অপরটি তার উত্তরসূরি অ্যান্টোনিনাস পিয়াসের। জুপিটার টেম্পলটি হয়তো ওয়েস্টার্ন হিলের ওপর আলিয়ার প্রধান বাণিজ্যিক ফোরামের পাশে নির্মাণ করা হয়েছিল। আফ্রিদিতির একটি মন্দিরও নির্মাণ করা হয়েছিল গলগোথা পাহাড়ের কাছে, ওয়েস্টার্ন ফোরামের পাশে। পরবর্তীকালে খ্রিস্টানেরা অভিযোগ করেছিল, হ্যাড্রিয়ান পরিকল্পিতভাবে এই পবিত্র স্থানটির অবমাননা করেছিলেন। তবে খুব সম্ভবত জেরুসালেমে ইহুদি খ্রিস্টানদের গোপন চার্চের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগতই ছিলেন না সম্রাট। সেন্ট জেরোমে (আনুমানিক ৩৪২-৪২০) বিশ্বাস করতেন, এ মন্দিরটি জুপিটারকে উৎসর্গ করা। তবে গলগোথা পাহাড়ের শীর্ষদেশটি আফ্রোদিতির মূর্তি-সংবলিত পবিত্র স্থানের প্লাটফর্মের ওপরে ছিল। জুপিটারের মন্দির কিভাবে দেবীর বিখ্যাত মূর্তির কাছে গেল সে ব্যাখ্যা তিনি দেননি। কারণ নগরীর এই অংশের ভূমি এত অমসৃণ ছিল যে স্থপতিদেরকে প্লাজার জন্য তুলনামূলক ছোট সহায়ক প্রাচীর, টেম্পল মাউন্টে হেরড যেভাবে করেছিলেন, নির্মাণ করে শূন্যস্থান ভরাট করতে হয়েছিল। আলিয়া এখন পুরোপরি পৌত্তলিক, অ-ইহুদি নগরী। অন্য যেকোনো রোমান উপনিবেশ থেকে এর কোনো পার্থক্য নেই। তৃতীয় শতক নাগাদ শহরটি পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয়েছিল। টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণ প্রান্তে বিশাল ভবন ছিল। ২৮৯ সালে টেনথ লিজিয়ন আলিয়া ত্যাগ করলে রোমানরা নতুন একটি নগর-প্রাচীর নির্মাণ করে। নগরীতে ইহুদি প্রাধান্যের বিষয়টি অতীতের ব্যাপার বলে মনে হতে থাকে।

তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এই বছরগুলোতে রোমের সাথে ইহুদিদের সম্পর্কে উন্নতি ঘটে। হ্যাড্রিয়ানের ইহুদিবিরোধী বিধান শিথিল করেন সম্রাট অ্যান্টোনিয়াস পিয়াস (১৩৮-৬১), ইহুদি ধর্মের অনুশীলন আবারো আইনসম্মত হয়। বার কোখবা যুদ্ধ রোমানদের দেখিয়েছিল যে এই অঞ্চল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ তথ্য আছে, এমন সক্ষম লোককে জুদাতে পাঠানো গুরুত্বপূর্ণ। রাব্বিরা অবশ্যই একে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তারা প্রায়ই রোমান দূতের প্রশংসা করতেন।৩৫ গ্যালিলিতে তাদেরকে নতুন ধরনের নেতৃত্ব বিকশিত করার সুযোগ দেওয়া হয়। ১৪০ সালে হিলেলের বংশধর রাব্বি সাইমন ছিলেন ঘোষিত প্যাট্রিয়ার্ক। ধীরে ধীরে তিনি রাজকীয় ক্ষমতা ধারণ করতে লাগলেন, রোমান সাম্রাজ্যের

সব ইহুদির প্রধান হিসেবে মর্যাদা লাভ করলেন। সাইমন রাজা দাউদের বংশধর বলে প্রচলিত থাকায় তিনি রাব্বানিক কর্তৃত্ব নিয়ে প্রাচীনের সাথে আধুনিকতাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। প্যাট্রিয়ার্ক মর্যাদা ইহুদিদের নতুন রাজনৈতিক মাত্রা এনে দেয়, যা জেরুসালেম হারানোর ক্ষতি কিছুটা হলেও পুষিয়ে দেয়। এটি সাইমনের ছেলে প্রথম জুদার (২০০-২০) আমলে সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছে। তিনি 'দি প্রিন্স' নামে পরিচিত ছিলেন, রাজকীয় জাঁকজমকের সাথে বাস করতেন। তিনি সম্রাট মার্কাস আওরেলিয়াস অ্যান্টোনিয়াসের (২০৬-১৭) ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। আওরেলিয়াস অ্যান্টোনিয়াস রোমান বংশোদ্ভূত না হওয়ায় বিদেশিদের অবজ্ঞা করতেন না, জেরুসালেমের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল।

বেশির ভাগ রাব্বির মতো প্যাট্রিয়ার্করাও বিশ্বাস করতেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি মেনে নেওয়া অনিবার্য বিষয়। রাব্বি সাইমিয়ন বেন ইয়োহাইয়ের মতো কিছু চরমপন্থীও ছিলেন। বেন ইয়োহাই ১৬৫ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত রোমান কর্তৃত্ব থেকে পালিয়ে ছিলেন। তবে বেশির ভাগ মেনে নিয়েছিলেন যে ইহুদিদের জন্য জেরুসালেম পুনর্দখল করা ও সেখানে আবার টেম্পল নির্মাণ করার স্বপ্ন লালন করা বিপজ্জনক। ইহুদিদের উচিত হবে ঐশী উদ্যোগের জন্য অপেক্ষা করা। রাব্বি সাইমিয়ন বেন ইলিজার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন, 'যদি শিশুরা তোমাকে বলে, ঈশ্বর টেম্পল নির্মাণ করবেন, তবে তাদের কথা শুনবে না।৩৬ এই দায়িত্ব মেসাইয়ার জন্য সংরক্ষিত। এর বদলে রাব্বিরা ইহুদি আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য অন্যান্য স্থানের দিকে নজর দিলেন। ফারিসিদের অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত করে তারা ভাবলেন যে বাড়িটি কোনো কোনো দিক থেকে টেম্পলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তারা পারিবারিক আবাসকে মিকদাশ মাত ('ছোট ধর্মস্থান') অভিহিত করলেন : বেদীর স্থানে রাখা হলো পারিবারিক টেবিল, বলির কান্টের জায়গায় স্থান হলো পারিবারিক খাবারের। অনেক দিক থেকে সিনাগগ ছিল টেম্পলের স্মৃতি জাগানিয়া স্থাপনা। ভবনটি নিজে থেকে ছিল পবিত্রতার উপাদান, বিলুপ্ত জেরুসালেম ধর্মস্থানের মতো এরও পবিত্র স্থানের পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে কেবল নির্দিষ্ট লোকজনকেই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হতো। টেম্পলের মতো এখানে নারীদের নিজস্ব স্থান ছিল। যেখানে বলি দেওয়া হতো সেটি ছিল অপেক্ষাকৃত পবিত্র। তারপর আসত

বিমাহ (পাঠ ডেস্ক) ও সবশেষে তাওরাতের স্ক্রলগুলো রাখার আর্ক তথা নতুন হলি অব হলিস। ফলে লোকজন ধাপে ধাপে মূল ধর্মস্থানের দিকে তখনো যেতে পারত। বিমাহ সাধারণ উচ্চতর স্তরে স্থাপন করা হতো, যাতে এটি প্রতীকী পবিত্র পর্বতে পরিণত হয় : যখন জমায়েতের কোনো লোককে তাওরাত পাঠের জন্য ডাকা হতো, তিনি তখনো মঞ্চে আরোহণের সময় আলিয়া (ঊর্ধ্বে ওঠা) করছেন বলে মনে করতেন। রাব্বিদের অধীনে সাবাথও নতুন করে শুরু পায়। সাবাথ দিবসের বিশ্রাম এখন আগামী বিশ্বের পূর্বাস্বাদন (সপ্তাহে এক দিন) অর্জনের জন্য হতো। ফলে ইহুদিরা অস্তিত্বের আরেক মাত্রায় প্রবেশ করতে পারত। সাবাত অস্থায়ী মন্দিরে পরিণত হলো। এখানে ইহুদিরা পবিত্র স্থানের বদলে পবিত্র সময়ে তাদের ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে পারত।

৭০ সালে জেরুসালেম ধ্বংসের পর ইহুদি বাড়ি হারানো টেম্পলের স্থলাভিষিক্ত হয়। পাসওভারে ইহুদিরা ঐতিহ্যবাহী পন্থায় ভেড়া বলি দিতে পারত না, তারা পারিবারিক খাবার গ্রহণের মাধ্যমে মিসরে তাদের মুক্তি উদযাপন করত। এসময় সাদা পোশাক পরে পুরোহিত হিসেবে বাবা দায়িত্ব পালন করতেন, টেবিলটি পরিণত হতো নতুন বেদীতে, মোমবাতিদানিকে স্মরণ করা হতো টেম্পল মেনোরাহ হিসেবে।

এখন জেরুসালেম ইহুদিদের জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে পড়েছে। টেম্পল হারিয়ে গেছে। ফলে রাব্বিদেরকে ঐশী উপস্থিতি সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি তৈরি করতে হয়েছে। ঈশ্বর মানব-নির্মিত ভবনে বাস করার মানে কী হতে পারে? তিনি কি অন্য কোথাও থাকেন না? রাব্বিরা প্রায়ই দেভিরে ঐশী উপস্থিতিকে সাগরের সাথে তুলনা করতেন। তারা বলতেন, সাগর একটি গুহাকে পুরোপুরি পরিপূর্ণ করে ফেলতে পারে সামগ্রিকভাবে সাগরের পানির পরিমাণ না কমিয়েই। অন্যভাবেও বলা যায়, তারা বারবার দৃঢ়তার সাথে বলতেন যে ঈশ্বর হচ্ছেন বিশ্বের প্রাসাদ, তবে বিশ্ব তার স্থান নয়। তার বিশালত্ব ভৌগোলিক বিশ্বের মাধ্যমে সংযত নয়। বরং ঈশ্বরই পৃথিবীকে ধারণ করেন। রাব্বিদের কেউ কেউ এমন কথাও বলতেন যে টেম্পল হারানোর ফলে শেখিনা জেরুসালেম থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বেবিলনে নির্বাসনে এই বিশ্বাস হয়েছিল যে ওয়াইএইচডব্লিউএইচ টেম্পল ত্যাগ করে প্রবাসে তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। ৩৮ এখন রাব্বিরা জোর দিয়ে বললেন যে ইহুদি

ইতিহাসজুড়ে শেখিনা কখনো ইসরাইল ত্যাগ করেননি, তবে তারা যেখানেই গেছে, সেখানেই তিনি গেছেন : মিসরে, বেবিলনে। পরে ৫৩৯ সালে তিনি ফিরে এসে ছিলেন। ৩৯ এখন শেখিনা আবার নির্বাসনে ইহুদিদের সাথে গেছেন। ইহুদিরা যেখানে একসাথে তাওরাত পাঠ করত, শেখিনা সেখানে গেছেন। এটি এক সিনাগগ থেকে আরেক সিনাগগে যান, ইহুদিরা যেখানেই শেমা আবৃতি করে, সেখানকার দরজাতেই দাঁড়িয়ে থাকেন। বস্তুত, ইসরাইলের সাথে ঈশ্বরের উপস্থিতি ইহুদি জনসাধারণকে বাকি বিশ্বের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করেছিল। প্রাচীন কালে জায়নে ওয়াইএইচডব্লিউএইচের টেম্পলটি ছিল বিশ্বের উর্বরতা ও শৃঙ্খলার একটি উৎস। এখন এই অনুষ্ঠান পালন করত ইহুদিরা। রাব্বিরা যুক্তি দিতেন : '[ইসরাইলে ঈশ্বরের উপস্থিতি] কি বৃষ্টি নেমে আসার জন্য ছিল না, কিংবা তা কি সূর্য রশ্মির জন্য ছিল না?' তবে সবসময় সমাজবদ্ধ হয়ে থাকার ওপর জোর দেওয়া হতো। ঈশ্বরের উপস্থিতি নির্ভর করত জনসাধারণের ঐক্য ও বদান্যতার ওপর। দুই বা তিনজন ইসরাইলি তাওরাত পাঠ করার সময় একত্রিত হওয়ার অনুভূতি লাভ করত; ১০ জন একত্রিত হয়ে কোরাম গঠন না করা পর্যন্ত প্রার্থনা বৈধ হতো না; ইহুদিরা যদি 'এক কণ্ঠে, এক মনে, এক সুরে' প্রার্থনা করে তবে শেখিনা তাদের মধ্যে চলে আসবেন; তা না করলে এটি দেবশিশুদের সমবেত প্রার্থনা শোনার জন্য স্বর্গে আরোহণ করে। ৪২

বেবিলনে নির্বাসনের সময় ইহুদিদের পবিত্র ভূমিতে ফেরার কোনো সম্ভাবনা না থাকার সময়টিতে ঐশী ভূগোল যেভাবে বিবর্তিত হয়েছিল, ঠিক সেভাবে নগরীটি অপবিত্র হওয়ার পর এবং টেম্পলটি ধ্বংস হওয়ার অনেক পরে জেরুসালেমের পবিত্রতার প্রশংসা করতেন রাব্বিরা। তারা তখনো বিশ্বের ইহুদি মানচিত্রের কেন্দ্রে রাখত জায়ন ও দেভিরকে :

পবিত্রতার ১০টি মাত্রা ছিল : অন্যান্য ভূমির চেয়ে ইসরাইলের ভূমি বেশি পবিত্র... ইসরাইল ভূমির প্রাচীরবদ্ধ নগরীগুলো এখনো অনেক পবিত্র ... প্রাচীরের মধ্যে জেরুসালেম এখনো অনেক পবিত্র... নারীদের প্রার্থনা করার স্থানটি এখনো অনেক বেশি পবিত্র... ইসরাইলিদের প্রার্থনার স্থানটি এখনো অনেক বেশি পবিত্র... হেখাল এখনো অনেক বেশি পবিত্র... বেদীর আশপাশের এলাকাটি এখনো অনেক বেশি পবিত্র... দেভির

এখনো অনেক বেশি পবিত্র, কারণ সেখানে যম কিপুরে উচ্চ পুরোহিত ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারে না।

রাব্বিরা তখনো জেরুসালেম সম্পর্কে কথা বলে যেতেন, এমনকি ভবনটির কোনো অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও : বাস্তবতা পরিণত হয়েছে প্রতীকীতে- পৃথিবীতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব- শ্বাশত, অবশ্য তখনো চিন্তাযোগ্য বিষয়। পবিত্রতার প্রতিটি স্তর ছিল শেষেরটির চেয়ে অনেক বেশি পবিত্র, উপাসনাকারীরা ধীরে ধীরে পবিত্রতার হলি অব হলিসে পৌঁছে যেতেন। লোকজনের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। সাবেক নির্বাসনের মতো এই আধ্যাত্মিক ভূগোলের কোনো বাস্তব প্রাসঙ্গিকতা না থাকলেও এটি ছিল একটি মণ্ডল, একটি ভাবনার বিষয়। রাব্বিরা এখন জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, পরিত্রাণের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে মাউন্ট জায়নে : সৃষ্টির প্রথম দিনে আদি পানিরাশি সেখানে গিয়েছিল; আদম এর ধূলা থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন; কাবিল ও হাবিল সেখানেই তাদের কোরবানি দিয়েছিলেন, মহাপ্লাবনের পর নূহও তাই করেছিলেন। টেম্পল মাউন্টেই ইব্রাহিমের খতনা হয়েছিল, এখানেই ইসহাককে কোরবানি দিতে চেয়েছিলেন ইব্রাহিম, এখানেই মেলচিজেদেকের সাথে তার সাক্ষাত ঘটেছিল; সবশেষে জায়ন থেকেই মেসাইয়া নতুন যুগের ঘোষণা করবেন, বিশ্বকে মুক্ত করবেন।৪৪ রাব্বিরা ঐতিহাসিক তত্ত্বে আগ্রহী ছিলেন না। মাউন্ট জায়ন নয়, মাউন্ট আরারাতে নূহের কিস্তি প্রথম স্পর্শ করেছিল, এমনটা শুনেও তারা অস্বস্তি অনুভব করতেন না বা মেলচিজেদেকের সাথে ইব্রাহিমের সাক্ষাতের স্থানটি ছিল এন রোগেল- তা জেনেও তারা তাদের অবস্থানে অবিচল থাকতেন। জেরুসলেম ছিল পৃথিবীতে পাপমুক্তির জন্য ঈশ্বরের উপস্থিতিময় স্থান। এই বিবেচনায় পৃথিবীকে রক্ষা করার সব ঘটনা অবশ্যই সেখানে ঘটতে হতো। এখন নিষিদ্ধ নগরীতে পরিণত হওয়ায় জেরুসালেম আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক কার্যকর উৎকৃষ্ট প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। আলিয়ার বাস্তব অবস্থা যা-ই হোক না কেন, আধ্যাত্মিক বাস্তবতা ছিল টেম্পল, নগরীর প্রতিকৃতি ছিল শ্বাশত। আমরা দেখতে পাব, কয়েক শ' বছর ধরে জেরুসালেম ইহুদিদের জন্য নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কিংবা টেম্পল মাউন্ট ভিন দেশিদের হাতে থাকা সত্ত্বেও তারা পবিত্রতার ১০ স্তরের ধ্যান করা অব্যাহত রেখেছিল।

এটি পরিণত হয় একটি মডেলে, যা ঈশ্বর কিভাবে মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করে তা কল্পনা করতে সহায়ক হয়, এটি তাদের অন্তর-বিশ্বের মানচিত্রে পরিণত হয়।

তা সত্ত্বেও তৃতীয় শতকের শুরুতে কিছু ইহুদি নশ্বর জেরুসালেমের সাথে যোগাযোগ নতুন করে শুরু করে। আইনের পুস্তকগুলোতে তখনো বিধিনিষেধ থাকলেও সম্রাট মার্কাস অ্যান্টোনিয়াসের সহানুভূতির কারণে রোমানরা আগের মতো কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করত না। প্রথমে কিছু ইহুদি সাধারণ মানের রোমানদের এলাকা হয়ে সেখানে যাওয়া শুরু করে। সাইমন অব কামত্রা নামের এক গাধাচালককে তার কাজের অংশ হিসেবে তাকে প্রায়ই টেম্পল মাউন্ট অতিক্রম করতে হতো। তিনি রাব্বিদের কাছে জানতে চাইতেন : ধ্বংসস্তূপ দেখার সময় প্রতিবারই কি তাকে জামা ছিঁড়তে হবে? তারপর রাব্বি মেইর তার পাঁচ বা ছয় ছাত্রকে আলিয়ায় বসবাসের অনুমতি দিলেন। অবশ্য এই ছোট্ট সম্প্রদায়টি মাত্র কয়েক বছর সেখানে ছিল। ৪৬ ২২০ সালে প্যাট্রিয়ার্ক প্রথম জুদার মৃত্যুর পর থেকে জেরুসালেমে কোনো ইহুদি স্থায়ীভাবে বাস করত না। কিন্তু তারপরও তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইহুদিদের মাউন্ট অব অলিভেসে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো, দূর থেকে টেম্পলের জন্য শোক প্রকাশ করার সুযোগ মিলত। এর কিছু সময় পরে- আমরা জানি না ঠিক কখন- ইহুদি মাস ইভের নবম দিনে তথা টেম্পল ধ্বংসের বার্ষিকীতে তাদেরকে বিধ্বস্ত টেম্পল মাউন্ট পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো। কায়রো জেনিজায় পাওয়া এক নথি অনুযায়ী, তীর্থযাত্রীরা খালি পায়ে মাউন্ট অব অলিভেসে উঠত, ধ্বংস্তূপের দিকে তাকাত, তাদের পোশাক ছিঁড়ে ফেলত, চিৎকার করে বলত : ‘এই তীর্থস্থান ধ্বংস হয়ে গেছে!’ তারপর তারা আলিয়ায় যেত, টেম্পল প্লাটফর্ম পর্যন্ত উঠত, ‘টেম্পল ও ইসরাইল পরিবারের জন্য’ কাঁদত। এই কষ্টদায়ক শাস্ত্রাচারগুলো পুরনো আনন্দদায়ক তীর্থযাত্রা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কারণ ইহুদিরা এখন ঐশী উপস্থিতির বদলে নির্জনতা ও শূন্যতার মুখে পড়ত। তবুও টেম্পল মাউন্টের বার্ষিক অনুষ্ঠান তাদেরকে তাদের দুঃখ মোচনের সহায়তা করত, এর মুখোমুখি করত, অন্য দিকে যেতে সহায়তা করত। অনুষ্ঠান শেষ হতো শুকরিয়া জ্ঞাপনমূলক প্রার্থনা করে। তারপর তীর্থযাত্রীরা নগরীর সব দরজা চক্কর দিত, সব কোণে যেত, এর মিনারগুলো গুণত’, ঠিক যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষেরা টেম্পল দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় যেসব কাজ

করত। এসব দরজা রোমানরা নির্মাণ করেছে, তা নিয়ে তারা ভীত হতো না। এটি ছিল হতাশা থেকে আশার পথে প্রতীকি যাত্রার আনুষ্ঠানিকতা। নগরীটি নিজেদের থাকার সময়কার মতো করে একে চক্কর দিয়ে তীর্থযাত্রীরা চূড়ান্ত মেসাইনিক মুক্তি পেত : 'আগামী বছর জেরুসালেমে!'

বার কোখবা যুদ্ধের পর ইহুদি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও আলিয়া থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। কারণ তাদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা যা-ই হোক না কেন, খতনা করা ইহুদিদের মতো নিষেধাজ্ঞা তাদের ওপরও প্রযোজ্য ছিল। তবে হ্যাড্রিয়ানের আমদানি করা গ্রিক ও সিরিয়ান উপনিবেশকারীর মধ্যে কিছু সংখ্যক খ্রিস্টানও ছিল। কারণ এরপর আলিয়ায় আমরা একটি পুরোপুরি পৌত্তলিক চার্চের কথা শুনতে পাই।৪৮ এসব অ-ইহুদি খ্রিস্টান মাউন্ট সায়নের 'আপার রুমে' বাস করে। চার্চটি ছিল আলিয়ার কেন্দ্রস্থলের বাইরে। ফলে হ্যাড্রিয়ানের ঠিকাদারেরা তাদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখত। এটি ছিল সাধারণ সাদামাটা বাড়ি : তখনো রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টান ধর্ম অনুমোদিত ছিল না এবং সত্যি সত্যিই কর্তৃপক্ষ তাদেরকে নির্যাতন করত। খ্রিস্টানদেরকে তাদের নিজস্ব উপাসনা-স্থান নির্মাণ করতে দেওয়া হতো না। তবে তারা আপার রুমে তাদের ওই বাড়িটিকে বলত 'মাদার অব দি চার্চেস', কারণ এখান থেকেই খ্রিস্টধর্মের সূচনা হয়েছে। অ-ইহুদি খ্রিস্টানেরা একটি সিংহাসনও রাখত। তারা বিশ্বাস করত যে এর মালিক ছিলেন জেরুসালেমের প্রথম 'বিশপ' জেমস দি জাদিক। অবশ্য আলিয়ায় খ্রিস্টানদের খুব বেশি সংখ্যক 'পবিত্র স্থান' ছিল না। যিশু যে নগরীকে চিনতেন, সেটি এখন হ্যাড্রিয়ানের নতুন শহরের আড়ালে বিস্মৃত হয়ে গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গলগোথা এখন আফ্রিদিতির টেম্পলে চাপা পড়ে গেছে, খ্রিস্টানা সেখানে উপাসনা করতে যেতে চাইত না। তবে ইউসেবিয়াস আমাদের বলছেন, মুসাফিরদের সেখানে স্থানটি 'দেখানো হতো।'৪৯ সারদিসের বিশপ মেলিটো ১৬০ সালে ফিলিস্তিন সফরের সময় এমনটা দেখেছেন। তিনি তার লোকজনকে বাড়ি ফিরতে বলে জানিয়েছিলেন, গলগোথা এখন নগরীর মাঝখানে অবস্থিত। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যিশুর আমলে গলগাথা ছিল প্রাচীরের বাইরে। তবে এখন চাপা পড়া পাহাড়-চূড়াটি আলিয়ার প্রধান ফোরামের পাশেই অবস্থিত।

তীর্থযাত্রী হিসেবে খুব বেশি সংখ্যক খ্রিস্টান ফিলিস্তিনে আসত না। ইউসেবিয়াস যদিও বলেছেন, 'সারা দুনিয়া থেকে লোকজন' জেরুসালেম সফর করতে আসত,৫১ কিন্তু তবুও তিনি মাত্র চার তীর্থযাত্রীর নাম বলতে পেরেছেন। এদের একজন হলেন মেলিটো। আলিয়া নগরীর ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। এটি 'এখন মূল্যহীন, এর জেরুসালেমের উপরে থাকায়।৫২ মেলিটো ভক্তিতে নয়, বরং গবেষণার কাজে জেরুসালেম এসেছিলেন। তিনি দেশটির ভৌগোলিক অবস্থা গবেষণা করার মাধ্যমে বাইবেল অধ্যয়ন করার আশায় ছিলেন। বুক অব রেভেলেশনে জনের বর্ণনার আলোকে পৌত্তলিক খ্রিস্টানেরা স্বর্গীয় জেরুসালেমের প্রতিই প্রধানত আগ্রহী ছিল। দ্বিতীয় শতকে এ গ্রন্থটিই অন্য যেকোনো খ্রিস্টান পুস্তকের চেয়ে বেশি পঠিত হতো। তারা নতুন জেরুসালেমের দিকে তাকাত, যা সময়ের শেষে পৃথিবীতে নেমে আসবে, এর নশ্বর প্রতিলিপিকে বদলে দেবে। ৩ তবে কেউই আলিয়া সফরের ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিল না। ইউসেবিয়াস ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে লিখেছেন : তিনি চেয়েছিলেন খ্রিস্টান ধর্মকে আইনসম্মত করতে। তিনি সম্ভবত তার বিশ্বাসের সার্বজনীন আবেদন প্রদর্শন করার জন্য তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা নিয়ে অতিরঞ্জন করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে জেরুসালেম খ্রিস্টানদের জন্য প্রধান তীর্থক্ষেত্র ছিল, এমন কোনো প্রমাণ নেই। বস্তুত, অ-ইহুদি খ্রিস্টানেরা ম্যাথু ও জনের গসপেলগুলোর সাথে একমত হওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করত। জেরুসালেম এখন 'অপরাধ নগরী'। কারণ সে খ্রিস্টকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যিশু বলেছিলেন, ভবিষ্যতের লোকজন জেরুসালেমের মতো পবিত্র স্থানগুলোতে সমবেত হবে না। তারা বরং আত্মা ও সত্যে তার উপাসনা করবে। উপাসনালয় ও পবিত্র পর্বতগুলোর প্রতি ভক্তি ছিল পৌত্তলিক ও ইহুদি ধর্মের বৈশিষ্ট্য। খ্রিস্টানেরা উভয় ধর্মকে ছাড়িয়ে যেতে সচেতন ছিল।

খ্রিস্টান মানচিত্রে জেরুসালেমের বিশেষ কোনো মর্যাদা ছিল না। ক্যাসারিয়ার বিশপ ছিলেন ফিলিস্তিনের প্রধান প্রেলেত। তিনি আলিয়ার বিশপ ছিলেন না। প্রখ্যাত খ্রিস্টান পণ্ডিত অরিজেন ২৩৪ সালে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করার সময় ক্যাসারিয়ায় তার একাডেমি ও লাইব্রেরি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দেশটি সফর করার সময় মেলিটোর মতো তারও বাইবেলে বর্ণিত স্থানগুলোর প্রতিই মূলত আগ্রহ প্রদর্শন

করেছিলেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই কেবল ভৌগোলিক স্থান সফর করে আধ্যাত্মিক সংস্পর্শ লাভ করার প্রত্যাশা করতেন না। অবশ্য তিনি এর সম্পৃক্ততাগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবল পৌত্তলিকেরাই কোনো ধর্মস্থানে ঈশ্বরকে কামনা করে, তারা মনে করে, দেবদেবতারা 'বিশেষ স্থানে বাস' করে।৫৪ যিশুর জন্মস্থান বেথলেহেমের মতো স্থানগুলো সফর করার সময় গামলা (যা দৃশ্যত সংরক্ষিত ছিল) দেখা ছিল আগ্রহের ব্যাপার। কারণ এতে প্রমাণিত হতো যে গসপেলের কাহিনী সত্য। তবে অরিজেন ছিলেন প্লেটোবাদী। তার দৃষ্টিতে খ্রিস্টানদের উচিত বাস্তব দৃশ্যমান দুনিয়া থেকে নিজেদের মুক্ত করে পুরোপুরি আধ্যাত্মিক ঈশ্বর কামনা করা। জাগতিক স্থানগুলোকে আঁকড়ে না ধরে তাদের উচিত নশ্বর নগরীর স্থানে স্বর্গীয় নগরী কামনা করা। '৫৫

জেরুসালেম নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক কোনো মতাদর্শ না থাকলেও আলিয়ার স্থানীয় খ্রিস্টানেরা যিশুর সাথে সম্পর্কিত নগরীর বাইরের স্থানগুলো সফর করতে পছন্দ করত। ইউসেবিয়াস আমাদের বলছেন, তারা প্রায়ই মাউন্ট অব অলিভেসে চূড়ায় উঠতেন (এখান থেকেই যিশু স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, কিদরন উপত্যকার গার্ডেন অব গেথসেমানে (এখান গ্রেফতার হওয়ার আগে যন্ত্রণায় প্রার্থনা করেছিলেন যিশু), জর্ডান নদী (এখানে জন দি ব্যাপ্টিস্ট তাকে ব্যাপ্টাইজ করেছিলেন)।৫৬ গ্রেকো- রোমান বিশ্বে গ্রোত্তো (গুহা) বিশেষ পূণ্যস্থান বিবেচিত হতো। আলিয়ার খ্রিস্টানেরাও দুটি গুহা জিয়ারত করত। প্রথমটি ছিল বেথলেহেমে। এখানেই যিশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়টি ছিল মাউন্ট অব অলিভেস। এখানেই কিশোর খ্রিস্ট দূত জনের সামনে হাজির হয়েছিলেন। মানুষ যিশুকে স্মরণ করার জন্য খ্রিস্টানেরা এসব গুহায় যেত না। অবশ্য তা সত্ত্বেও যিশুর মানব জীবনের প্রতি তাদের সামান্য আগ্রহ ছিল। গুহাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো সেগুলোর অলৌকিক মর্যাদা ছিল : উভয়টিরই মূর্ত লোগোস দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ করেছিল।

তবে মাউন্ট অলিভেসের গুহাটি অতিরিক্ত তাৎপর্য সৃষ্টি করেছিল। বলা হয়ে থাকে, এখানেই যিশু তার শিষ্যদেরকে আসন্ন জেরুসালেম ধ্বংস ও মহাপ্রলয় দিবসের নির্দেশনা দিয়েছিলেন।৫৮ মাউন্ট অব অলিভেস থেকে হারানো টেম্পলের জন্য ইহুদিদের শোক প্রকাশ করতে দেখে খ্রিস্টানেরা বিদ্রুপ করত। অরিজেন এসব অনুষ্ঠানকে পীড়াদায়ক ও

ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন, ইহুদিদের দুর্দশা হলো গসপেলগুলোর সত্যতার আরেকটি প্রমাণ। প্রাচীন কালের শেষ দিকে নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী ও উদ্দীপ্ত দেব-বাণী ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ইহুদি টেম্পলের ধ্বংস সম্পর্কে যিশুর নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী অরিজেনের পৌত্তলিক বিরূপতাকে অভিভূত করবে- এমনটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। তারা যিশুকে প্রত্যাখ্যান করার পর থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন, ইহুদিদের গর্ব করার সব প্রতিষ্ঠান, তথা টেম্পলের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান, বলির বেদী ও শাস্ত্রাচার, উচ্চ পুরোহিতদের পোশাক, সবই ধ্বংস হয়ে গেছে।৫৯ এটি ছিল ব্যাপক তৃপ্তি। আলিয়ার খ্রিস্টানেরা দৃশ্যত মাউন্ট অলিভেসে তাদের নিজস্ব পাল্টা অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেছিল। ইউসেবিয়াস বলেছেন, তারা ওই গুহা পর্যন্ত যেতে পছন্দ করতেন 'নগরীটি দখল ও বিধ্বস্ত করা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে। নিচে বিধ্বস্ত টেম্পল প্লাটফর্মের (বিজয়ী সম্রাটদের মূর্তিসহ) দিকে তাকিয়ে, তারা ইহুদি ধর্মের পরাজয় ও তাদের নিজের ধর্মের টিকে থাকার কথা ভাবতেন। ওই সময় ফিলিস্তিনের খুব বেশি লোক খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ না করলেও সাম্রাজ্যের বাকি অংশে বিপুল সাফল্য পেয়েছিল। রোমান আলিয়ায় তারা ধ্যান করার সময় যে তথ্য প্রতিফলিত হতো তা এই যে এটি 'অপরাধ নগরীর' ধ্বংসাবশেষের ওপর নির্মিত হয়েছে। তাদের কাছে নিজস্ব ধর্মের সত্যতার প্রমাণ দৃশ্যমান হতো। অবশ্য তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে উদ্বেগ ছিল। রাব্বিদের মতো যিশু ও পলও দান ও ভালোবাসা-বদান্যতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। বস্তুত যিশু এত দূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন যে খ্রিস্টানদের উচিত তাদের শত্রুদেরও ভালোবাসা। কিন্তু তৃতীয় শতকের এসব খ্রিস্টান তাদের আগে নগরীতে বসবাসকারী ইহুদিদের করুণ ভাগ্য নিয়ে চিন্তা করে নিষ্ঠুর আত্মতৃপ্তির আনন্দ উপভোগ করত। একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো সবসময়ই এই ধারণায় উপনীত হয় যে জেরুসালেমের পূর্বেকার দখলকারীরা পবিত্র নগরী হিসেবে একে শ্রদ্ধা করত। তাদের নিজেদের আমলটি প্রায়ই এই সত্যের প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল। আলিয়ার খ্রিস্টানেরা শুরুতে সফল হয়নি বলেই মনে হয়েছে। যেখানে খ্রিস্ট মারা গেছেন, আবার জেগে ওঠেছিলেন, সেই নগরীতে বাস করার বিষয়টি তখন তাদের মহৎ আদর্শ হিসেবে উদ্দীপ্ত করত না। ইউসেবিয়াস ৩১৩ সালে ক্যাসারিয়ার বিশপ হয়েছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের খ্রিস্টানদের জন্য এই দিনটি বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। অরিজেনের মতো ইউসেবিয়াসও ছিলেন প্লেটোবাদী। ধর্মস্থান বা পবিত্র জায়গার প্রতি তার কোনো আগ্রহ

ছিল না। তার দৃষ্টিতে খ্রিস্টান ধর্ম এসব সেকেলে ধ্যান-ধারণা পেছনে ফেলে এসেছে। খ্রিস্টানদের কাছে ফিলিস্তিন সম্পর্কে বিশেষ কিছু নয় বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন : 'এটি কোনোভাবেই [বাকি দুনিয়ার] চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। আলিয়া ছিল স্রেফ 'অপরাধ নগরী' : এটি শ্রদ্ধা পাওয়ার অনুপযুক্ত। তবে ইহুদি ধর্মের মৃত্যুকে প্রতীকীভাবে প্রকাশ করতেই কেবল এটি খ্রিস্টানদের কাছে সহায়ক হতে পারে। এই সময়ের দিকে খুব কম লোকই এই নগরীর মূল নাম স্মরণ করতে পারত। এমনকি ইউসেবিয়াস নিজেও সবসময় একে বলতেন আলিয়া। বেশির ভাগ অ-ইহুদি- খ্রিস্টানের মতো তার কাছেও 'জেরুসালেম' মানে ছিল ঐশী জায়ন, যা সম্পূর্ণভাবে এই দুনিয়া-বহির্ভূত কোনো বাস্তবতা। ৩১২ সালে কনস্টানটাইন মিলভিয়ান ব্রিজের যুদ্ধে তার রাজকীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাক্সেনটিয়াসকে পরাজিত করেন। তিনি তার এই জয়ের কৃতিত্ব দেন খ্রিস্টানদের ঈশ্বরকে। ৩১৩ সালে ইউসেবিয়াসের রাজ্যাভিষেকের সময় কনস্টানটাইন ঘোষণা কনে, খ্রিস্ট ধর্ম হবে রোম সাম্রাজ্যের অন্যতম রাজধর্ম। নির্যাতিত, প্রান্তিক, নিঃস্ব অবস্থা, রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন ও পবিত্র কোনো নগরী না থাকা অবস্থা থেকে খ্রিস্টানেরা এখন একটি নশ্বর মাত্রা লাভ করতে শুরু করল। এই ঘটনা এখন খ্রিস্টানদেরকে 'আলিয়া' দেখার দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্তভাবে বদলে দিয়েছিল।

নতুন জেরুসালেম

কনস্টানটাইন মিলভিয়ান ব্রিজে জয়ের পর পশ্চিমাংশের সম্রাট হন। ৩২৩ সালে তিনি পূর্ব দিকের প্রদেশগুলোর সম্রাট লিসিনিয়াসকে হারিয়ে রোমান বিশ্বের একক শাসকে পরিণত হলেন। একেবারে অপরিচিত অবস্থান থেকে বিস্ময়কর উত্থানের জন্য কনস্টানটাইন সবসময় খ্রিস্টানদের ঈশ্বরকে কৃতিত্ব দিতেন। বিশ্বাসটির ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে অতি সামান্য জানলেও এবং তার ব্যাপ্তিজম তার মৃত্যুশয্যার আগে পর্যন্ত না হলেও তিনি চার্চের প্রতি সবসময় অনুগত ছিলেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন, একবার খ্রিস্টধর্ম আইনসম্মত হলে এটি তার বিপুল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের ঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হবে। ওই সময় ফিলিস্তিনের মোট জনসংখ্যার অতি সামান্য অংশ ছিল খ্রিস্টান। তবে তৃতীয় শতক নাগাদ খ্রিস্টধর্ম সাম্রাজ্যের অন্যতম ধর্মে পরিণত হয়, বৃহত্তম অংশই এই ধর্মের অনুসারীতে পরিণত হয়। ২৩৫ সাল নাগাদ ধর্মটি বিশ্বাসের একক পরিচালনায় একটি ‘মহা চার্চ’ হিসেবে গর্ব করার মতো অবস্থানে চলে আসে। ধর্মটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোকজনকে আকৃষ্ট করা শুরু করে। এসব লোক এই উৎসগতভাবে সেমিটিক ধর্মটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন, যাতে বৃহত্তর গ্রেকো-রোমান বিশ্ব তা বুঝতে পারে। নির্যাতনের সময় চার্চ একটি কার্যকর প্রশাসনে বিবর্তিত হয়েছিল, যা নিজেই ছিল সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এটি ছিল বহু-সাংস্কৃতিক, ক্যাথলিক, আন্তর্জাতিক ও বিশ্ববিস্তৃত এবং আমলাতন্ত্রকে পরিচালনা করতে সক্ষম। এখন কনস্টানটাইন চার্চকে ‘অনুমোদিত ধর্ম’ হিসেবে ঘোষণা করার ফলে খ্রিস্টানরা গোপন অবস্থা থেকে বের হয়ে প্রকাশ্য জীবনে স্বতন্ত্র ভূমিকা রাখতে থাকে। কনস্টানটাইন ধর্মটির ক্ষমতা ও দক্ষতা নিরঙ্কুশ শক্তিতে পরিণত করতে পারবেন বলে আশাবাদী ছিলেন।

তিনি অবশ্য অন্যান্য ধর্মের বিনিময়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেননি। কনস্টানটাইন ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি জানতেন, তার পৌত্তলিক প্রজাদের বিরূপতা প্রতিরোধ করার সামর্থ্য তার নেই। তিনি পন্টিফেস ম্যাক্সিমাস পদবি বজায় রাখেন, সাম্রাজ্যের পুরনো বলি প্রথাও অব্যাহত থাকে। কনস্টানটাইন নতুন খ্রিস্টান রোমের ব্যাপারে তার স্বপ্নাবিভাব প্রকাশ শুরু করতে একটি উপায় উদ্ভাবন করেন। তা হলো বিপুল নির্মাণ কর্মসূচি। সেন্ট পিটার

দি অ্যাপসলের জন্য রোমান সম্রাটদের স্মৃতিসৌধের মতো করে রোমে খ্রিস্টান শহিদদের কবরে সমাধি নির্মাণ করেন। এসব নতুন চার্চ ভবন প্রাচীন মন্দিরগুলোর মতো ছিল না। প্রাচীন মন্দিরগুলোতে যেখানে মহাবিশ্বের প্রতীকগুলো ফুটিয়ে তোলা হতো, সেখানে নবনির্মিত মুক্ত চার্চটি উৎসবমুখর গণউপাসনায় বিবর্তিত হয়। তবে এসব অট্টালিকার সূচনা ঘটেছিল রোমের পৌত্তলিক প্রতীকের পাশাপাশি। এতে দেখানো হয়েছিল, খ্রিস্টধর্ম দুনিয়াতে তার স্থান নিতে শুরু করেছে। অবশ্য রোমে কেন্দ্রীয় স্থানগুলো আগেই পৌত্তলিক ভবনরাজিতে দখল হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে কনস্টানটাইনের শহিদি ইমারত প্রান্তিক এলাকাগুলোতে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে বসফোরাসের তীরে তিনি নিজের জন্য যে নতুন রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন, তাতে এ ধরনের কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। কনস্টানটিনোপল হয়েছিল পুরোপুরি খ্রিস্টান নগরী। এখানে ক্রস প্রদর্শিত হতো গৌরবে, কেন্দ্রীয়ভাবে ও বাইবেলের বীরদের ভাস্কর্য এর চত্বরগুলোতে শোভা বাড়াত। তবে কনস্টানটিনোপলের কোনো ইতিহাস ছিল না : প্রতীকের শক্তিতে প্রায় জাদুকরি বিশ্বাসী সম্রাট জানতেন খ্রিস্টান সাম্রাজ্যকে তার ধারাবাহিকতা প্রদর্শন করতে হলে প্রাচীন কালের শেষ সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত একটি শ্রদ্ধাভাজন অতীতের সাথে তার শিকড় অবশ্যই দেখাতে হবে।

কনস্টানটাইনের রাজত্বের প্রথম দিকে তার অন্যতম উৎসাহী সমর্থক ছিলেন ক্যাসারিয়ার বিশপ ইউসেবিয়াস। মিলভিয়ান ব্রিজের পর ইউসেবিয়াস সম্রাটকে মুসা হিসেবে সম্বোধন করেন, মুসা যেভাবে মিসরীয়দের ধ্বংস করেছিলেন, একইভাবেই এই সম্রাট শেষ করেছেন ম্যাক্সেনটিয়াসকে। তিনি কনস্টানটাইনকে গোষ্ঠীপতিদের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী দ্বিতীয় ইব্রাহিম হিসেবেও অভিহিত করেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কোনো টেম্পল ছিল না, তাদের কাছে পূর্ণাঙ্গ তাওরাত ছিল না।` ইউসেবিয়াস উল্লেখ করেন, তারা যেখানেই ছিলেন সেখানেই উদ্দীপনা ও সত্যের সাথে ঈশ্বরের উপাসনা করেছেন। ইউসেবিয়াস বিধ্বস্ত টেম্পল মাউন্টের কথা ভাবতে ওই অঞ্চলের অন্যান্য খ্রিস্টানের মতো মাউন্ট অব অলিভেসে দাঁড়াতেন। তিনি ভয়াবহ বিদ্রুপে দেখেন যে আলিয়ার নাগরিকেরা টেম্পলের পাথরগুলো লুণ্ঠন করে তাদের পৌত্তলিক মন্দির ও থিয়েটার তৈরি করেছে। টেম্পলের ভাগ্য সুস্পষ্ট প্রমাণ যে ঈশ্বর আর চটকদার

ধরনের কৃত্রিম শাস্ত্রাচার চান না। তিনি তাদের কাছে যিশুর প্রচারিত মন্দির বা পবিত্র স্থানগুলোর ওপর নির্ভরশীলতাহীন আধ্যাত্মিক ধর্ম অনুসরণ করাতে চেয়েছিলেন। অরিজেনের মতো ইউসেবিয়াসেরও ঐশী ভূগোলের জন্য সময় ছিল না। ঈশ্বর তাদের কাছে আসবেন না যারা তাকে 'প্রাণহীন বস্তু ও বিষণ্ণ গুহায়' তাকে কামনা করে, বরং যাদের আত্মা পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার ও যৌক্তিক মানসিকতা নিয়ে প্রস্তুত' তাদের কাছে তিনি আসবেন। মুসার বিধানে বিশ্বাসীদের একটি একক পবিত্র স্থানে ছুটে যাওয়া প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু ইউসেবিয়াস কল্পনা করেছেন যে যিশু বলেছেন :

আমি, সবাইকে স্বাধীনতা দিচ্ছি, পৃথিবীর কোনো কোণায়, কিংবা পর্বতমালায়, কিংবা হাতে বানানো মন্দিরে ঈশ্বরকে না-খোঁজার স্বাধীনতা দিচ্ছি। বরং প্রত্যেককে বলছি তার ঘরে উপাসনা করতে, তার প্রশংসা করতে। ৬

তিনি লোকজনকে ইব্রাহিমের আদি ধর্ম শেখানোর জন্য এসেছিলেন, যা ছিল অযৌক্তিক পুরানশাস্ত্র ও ইন্দ্রীয়গত কল্পিত মূর্তি থেকে মুক্ত।

পর্যাপ্ত সন্তুষ্টি নিয়ে ইউরেবিয়াস মাউন্ট সায়ন উপকণ্ঠে তাকিয়ে সমসাময়িক অন্য সবার মতো কল্পনা করেছিলেন যে এটি হলো বাইবেলের জায়ন। এখন গবেষণা ও শিক্ষার কেন্দ্র হওয়ার বদলে মাউন্ট সায়ন স্রেফ 'দেশের বাকি অংশের মতো একটি রোমান খামারে পরিণত হয়ে আছে। সত্যিই সেখানে আমি নিজের চোখে সেখানে বলদ দিয়ে চাষাবাদ ও পবিত্র স্থানে বীজ বপণ করতে দেখেছি।' বিধ্বস্ত ও জনশূন্য 'জায়নের বর্তমান অবস্থা প্রমাণ করে যে ঈশ্বর সত্যিই নগরীটি পরিত্যাগ করেছেন। অবশ্য এই তথ্যও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ইউসেবিয়াস কখনো উল্লেখ করেননি যে মাউন্ট সায়ন আলিয়ার খ্রিস্টান কেন্দ্র। চতুর্থ শতকের শুরুতে স্থানীয় খ্রিস্টানেরা যুক্তি দিতে শুরু করে যে 'মাদার অব দি চার্চেস'-এর মতো আলিয়ার আধ্যাত্মিক মর্যাদা কোনো ঐশী সত্তার সম্পৃক্ততা না থাকা ক্যাস্যারিয়ার চেয়ে বড় হওয়া উচিত। জেমস দি জাদিকের সিংহাসন প্রদর্শন করার পাশাপাশি তারা মাউন্ট সায়নের উপরে কিছু ধ্বংসাবশেষকে বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ আলামত হিসেবে শনাক্ত করতে শুরু করে। এসবের মধ্যে ছিল একটি পুরনো বাড়ি। এটিকে ক্যাইফাসের বাড়ি বলে মনে করা হতে লাগল। আরেকটি ছিল রাজা দাউদের

প্রাসাদ। সেখানে থাকা একটি স্তম্ভকে মনে করা হতে লাগল যে এখানে যিশুকে চাবকিয়েছিলেন পিলেত। অবশ্য ইউসেবিয়াস এসব বিষয় অগ্রাহ্য করেছিলেন। বাইবেলের স্থান-নামবিষয়ক তার গাইড ওনোম্যাসতিকনে তিনি উল্লেখ করেছেন, ফিলিস্তিনের ভূগোল গসপেলগুলোর নির্ভুলতা 'প্রমাণ' করে : ইভানজেলিস্টরা যেভাবে বলেছেন, শহর ও গ্রামগুলো ঠিক সেভাবেই আছে। কিন্তু ইউসেবিয়াস কখনো বলেননি যে মাউন্ট সায়নের স্থানগুলো খ্রিস্টের জীবনের প্রমাণ বা প্রত্যক্ষদর্শী। ইতিহাসবিদ হিসেবে তিনি হয়তো যথাযথভাবেই এসব স্থানের নির্ভুলতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন। তবে তিনি সচেতন ছিলেন যে আলিয়ার বিশপ মাকারিয়স এসব স্থানকে ইউসেবিয়াসের ক্যাসারিয়ার বদলে ফিলিস্তিনকে আলিয়া দি মেট্রোপলিটান বানানোর অভিযানের সমর্থনে ব্যবহার করছেন।

ক্যাসারিয়া ও আলিয়ার মধ্যকার সঙ্ঘাত ৩১৮ সালে প্রকাশ্যে চলে আসে। এই সময় মতবাদগত বিতর্কে ইউসেবিয়াস ও মাকারিয়স তাদেরকে বিপরীত শিবিরে দেখতে পেয়েছিলেন। এই বিরোধে পুরো চার্চই বিভক্ত হয়ে যাওয়ার হুমকি সৃষ্টি করেছিল। আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্যারিশমেটিক প্রেসবাইটার অ্যারিয়াস বাইবেলের বক্তব্য থেকে যুক্তি তুলে ধরে জোরালোভাবে বলেন যে মূর্তিমান লোগোস যিশু কিন্তু গড় দি ফাদারের মতো ঐশী সত্তা নন, তবে তবে সময়ের সূচনার আগেই ঈশ্বর তাকে সৃষ্টি করেছেন।' অ্যারিয়াস খ্রিস্টের ঐশিত্ব অস্বীকার করেননি। তিনি তাকে যিশুকে 'শক্তিশালী ঈশ্বর' ও 'সত্যিকার ঈশ্বর' হিসেবে অভিহিত করলেও তিনি মনে করেননি যে তিনি প্রকৃতিগতভাবে ঐশী। গড দি ফাদার নিখুঁত আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে যিশুর ওপর ঐশিত্ব আরোপ করেছেন। যিশু নিজে বলেছেন, তার পিতা তার চেয়ে বড়। অ্যারিয়াসের আইডিয়াগুলো নতুন না হলেও ওই সময় নিশ্চিতভাবেই ধর্মচ্যুত বলে বিবেচিত হয়েছিল। মহান অরিজেনেরও যিশু সম্পর্কে একই ধারণা ছিল। খ্রিস্টানেরা দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্বাস করে আসছিল যে যিশু ছিলেন ঈশ্বর। তবে এ দিয়ে আসলে কী বোঝানো হচ্ছে, তা নিয়ে তাদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল না। যিশু যদি ঐশী সত্তা হন, তবে বাস্তবে ঈশ্বর কি দুজন হন না? একজন স্রেফ মানুষকে উপাসনা করা কি পৌত্তলিকতা নয়? অ্যারিয়াস তার পূর্বসূরিদের চেয়ে ধর্মতত্ত্ব চেয়ে পরিষ্কার ও জোরালোভাবে প্রকাশ করতে পারলেও (বিশপদের অনেকেও একই

ধারণা পোষণ করতেন) বিরোধের শুরুতে স্পষ্ট ছিল না যে অ্যারিয়াস কেন ও কোথায় ভুল করছেন।

অ্যারিয়াসের বিরোধিতা করেন তার আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ ও বিশপের মেধাবী তরুণ সহকারী অ্যাথানাসিয়াস। তিনি যুক্তি দেন যে লোগোস হলো ঈশ্বর, ঠিক যেভাবে গড দি ফাদার হলেন ঈশ্বর। তিনি ও ঈশ্বর একই প্রকৃতিসম্পন্ন, তাকে জন্ম দেওয়া হয়নি বা সৃষ্টি করা হয়নি। লোগোস স্রেফ সৃষ্টি, আদি বা একেবারে শূন্য থেকে পিতা হিসেবে অভিহিত, হলে কিভাবে তিনি মৃত্যু ও বিলুপ্তি থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেন? একমাত্র একক সত্তা, যিনি বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, তারাই আছে একে রক্ষা করার শক্তি। ফলে রক্ত-মাংসে গঠিত যিশু অবশ্যই পিতার মতোই অনিবার্যভাবে ঐশী সত্তা। তার মৃত্যু ও পরে আবার বেঁচে ওঠা ছিল পাপ ও মৃত্যু থেকে মানুষকে উদ্ধার করা এবং এখন খ্রিস্টের, ঈশ্বর- মানব, সাথে একীভূত হয়ে নারী ও পুরুষেরাও ঐশী সত্তা হতে পারে।

সঙ্ঘাতের উত্তাপ বাড়তে থাকে, বিশপেরা কোনো না কোনো পক্ষ নিতে বাধ্য হন। ফিলিস্তিনে মাকারিয়সের পক্ষ নেন অ্যাথানাসিয়াস, অ্যারিয়াসের সাথে থাকেন ইউসেবিয়াস। ইউসেবিয়াসের ধর্মতত্ত্বের সাথে অ্যারিয়াস তার নিজের মতের কিছুটা মিল পেয়েছিলেন। তবে মনে রাখতে হবে, এই অবস্থান গ্রহণের সময় ইউসেবিয়াস চার্চের সরকারি মতবাদের সুস্পষ্ট বিরোধী ছিলেন না। তখনো খ্রিস্টের ব্যক্তি ও প্রকৃতি নিয়ে কোনো ধরনের গোঁড়ামিপূর্ণ শিক্ষা ছিল না। ইউসেবিয়াস ছিলেন তার প্রজন্মের অন্যতম খ্রিস্টান বুদ্ধিজীবী। খ্রিস্টের আগমনকে নাটকীয় ও অনন্য হিসেবে দেখেছিলেন অ্যাথানাসিয়াস। তবে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে ইউসেবিয়াসের ব্যাখ্যা ছিল অতীতের ধারাবাহিকতার সাথে সম্পর্কিত। অ্যাথানাসিয়াস লোগোসের অবতারকে বিশ্ব ইতিহাসের সম্পূর্ণ নজিরবিহীন ঘটনা হিসেবে দেখেছেন। তার মতে, একেবারে নজিরবিহীনভাবে ঐশী সত্তা নশ্বর মণ্ডলে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ফলে যিশু ছিলেন একক ও একমাত্র ঈশ্বরের প্রকাশ। ইউসেবিয়াস এই ধারণায় বিশ্বাস করতেন না। তার দৃষ্টিতে ঈশ্বর আগেও মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। লোগোস মামরেতে মানুষের অবয়বে ইব্রাহিমের কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন; মুসা ও যশুয়ার কাছেও ঐশী সত্তার একই ধরনের প্রকাশ

ঘটেছিল। অর্থাৎ লোগোস নাজারেথের যিশুর মাধ্যমে স্রেফ ধরাধামে ফিরে এসেছিলেন।' মূর্তপ্রকাশ কোনো অনন্য ঘটনা নয়, বরং অতীতের আত্মপ্রকাশের ধারাবাহিকতা। মানুষের কাছে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে প্রকাশ করা একটি চলমান প্রক্রিয়া।

যিশুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে বিশ্বের পাপমোচনের বিষয়টিকেই দেখেছিলেন অ্যাথানাসিয়াস। ইউসেবিয়াস বিষয়টিকে এ দৃষ্টিতে দেখেননি; নিশ্চিতভাবেই যিশু আমাদের রক্ষা করেছেন, তবে তার প্রথম কাজ ছিল বিশ্বে ঈশ্বরকে প্রকটিত করা। যিশু ছিলেন দুনিয়াতে ঈশ্বরের প্রকাশ : তার দিকে তাকিয়ে মানবজাতি অদৃশ্য, বর্ণনা-অযোগ্য ঈশ্বর দেখতে কেমন ছিলেন সে সম্পর্কে কছু ধারণা পেতে পারত। যিশুর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের অনিবার্য আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সম্পর্কে খ্রিস্টানদের মনে করিয়ে দেওয়া। শতাব্দীর পরিক্রমায় নারী ও পুরুষেরা ইব্রাহিমের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা ভুলে গিয়েছিল, তাওরাত ও টেম্পলের মতো দৃশ্যমান প্রতীকের মতো কিছুতে বিশ্বাস করার কলুষতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এ কারণে আমাদের উচিত হবে খ্রিস্টের মানবিকতার দিকে নজর দেওয়া : ইউসেবিয়াস একবার সম্রাটের বোন কনস্টানটিয়ার, তিনি বোকার মতো তার কাছে যিশুর একটি ছবি চেয়েছিলেন, কাছে কঠোর ভাষায় একটি চিঠি লিখেছিলেন। খ্রিস্টানদের উচিত স্বর্গীয় লোগোসের ঐশী নির্যাসের দিকে চর্মচোখ দিয়ে তাকানো। লোগোসের দুনিয়াতে অবস্থানের পর সে আধ্যাত্মিক জগতে ফিরে গেছে, খ্রিস্টানদের উচিত সেখানে তাকে অনুসরণ করা। যিশুর স্থায়ী মূল্যের সংশ্লিষ্টতা নশ্বর নগরীতে ইহুদিদের মতো করে সংশ্লিষ্ট করা ন্যায়ভ্রষ্টতা ও অযৌক্তিক। খ্রিস্টানেরা অব্যাহতভাবে কাথারসিস বা বিশুদ্ধকরণে নিয়োজিত থাকবে। তারা অবশ্যই আরো আধ্যাত্মিকভাবে কিতাব পাঠ করতে শিখবে, ঐতিহাসিক ঘটনাটির সাথে থাকা সময়হীন সত্যের দিকে তাকাবে। অর্থাৎ যিশুর পুনরুত্থান অ্যাথানাসিয়াসের কথিত নাটকীয়, আকস্মিক কাজ ছিল না; এটি স্রেফ অবিনশ্বরের প্রকাশ ছিল যা মানব প্রকৃতির জন্য স্বাভাবিক ছিল।

এগুলো সুস্পষ্টভাবেই ছিল অনির্ণেয় বিষয়, কোনোভাবেই প্রমাণ করা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিরোধ চার্চকে বিভক্ত করার হুমকি সৃষ্টি করেছিল। এটি কনস্টানটাইনকে ক্রুদ্ধ করতে লাগল। তিনি ধর্মতত্ত্ব বুঝতেন না, তবে এসব খুঁটিনাটি

বিষয় নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক তর্ক করে দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করতে পারে বলে বিবেচিত প্রতিষ্ঠানকে বিভক্ত করতে দিতে চাইছিলেন না। ৩২৫ সালের শুরুতে অ্যাথানাসিয়াসের দল তার সমর্থন লাভ করে, 'অ্যারিয়ান' নেতাদের সমাজচ্যুত করে ঘোষণা ইস্যু করা হয়। কনস্টানটাইন বিষয়টি চিরদিনের তো চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে চার্চের যাজককে তলব করেন। এর ফলে যা ঘটল তা হলো এই যে ওই সময় ৬৫ বছর বয়স্ক ও চার্চের অন্যতম প্রখ্যাত বিশপ ইউসেবিয়াস কাউন্সিলে অংশ নিতে মে মাসে নিক্যাইয়ায় পৌঁছে দেখতে পেলেন যে তাকে ধর্মচ্যুত করা হয়েছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মাকারিয়স অবশ্য জয়ী পক্ষে থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন তার অবস্থান খুবই শক্তিশালী। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তার সহকর্মীদের কাছে অসহনীয় ছিল যে মাদার অব চার্চেস, আলিয়ার বিশপকে ক্যাসারিয়ার ধর্মচ্যুত বিশপের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করা হবে।

নিক্যাইয়া কাউন্সিল অ্যাথানাসিয়াসের ধারণা অনুযায়ী একটি ধর্মবিশ্বাস ইস্যু করে। তবে তা চার্চে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। বেশির ভাগ বিশপই অ্যাথানাসিয়াস ও অ্যারিয়াসের মতবাদের মাঝামাঝি দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। তারা সম্ভবত উভয়ের ধারণাকেই চরম ও খামখেয়ালিপূর্ণ মনে করতেন। সম্রাটের চাপে অ্যারিয়ানের দুই সাহসী সমর্থক ছাড়া সব বিশপই শান্তির স্বার্থে মতবাদে সই করেন। তবে এরপর তারা আগের মতোই তাদের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস প্রচার করতে থাকেন। অধিকন্তু তারা একগুঁয়েভাবে ধর্মভ্রষ্টতা গ্রহণ করেননি। নিক্যাইয়া ছিল চার্চের প্রথম খ্রিস্টজগতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্মেলন। অবশ্য এর অধ্যাদেশগুলোকে 'অভ্রান্ত' হিসেবে অভিহিত করেনি। বিশপেরা বোধগম্যভাবেই অনুভব করেছিলেন, তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি শ্রুত হয়নি। এর ফলে অ্যারিয়ানের বিতর্ক আরো ৬০ বছর ধরে অব্যাহত থাকে। মতবাদে সই করা যাজকদের একজন ছিলেন ইউসেবিয়াস। তবে কাউন্সিলের পর তিনি সাথে সাথেই অ্যাথানাসিয়ানের 'অনুমোদিত বিশ্বাসের' বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেন। তিনি থিওফ্যানি নামের গবেষণা গ্রন্থের মাধ্যমে, এতে যিশু সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলেন এবং তিনি সবসময় কনস্টানটাইনকে সমর্থন করতেন বলে, সম্রাটের আস্থাভাজন হতে সমর্থ্য হন। নিক্যাইয়ার দুই বছর পর ৩২৭ সালে ইউসেবিয়াসের মধ্যপন্থী দলটি সমানে চলে আসে, অ্যারিয়াসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

নিক্যাইয়া কাউন্সিল ধর্মতাত্ত্বিক বাস্তবনীতির ওপর সামান্য প্রভাব ফেললেও তা জেরুসালেমের ইতিহাসের ওপর প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রথমত, মাকারিয়স তার অবস্থানগত সুযোগটি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন : কাউন্সিলের সপ্তম অনুশাসনে বলা হয়েছিল যে 'প্রথা ও প্রাচীন ঐতিহ্য' ঘোষণা করছে যে আলিয়ার বিশপ চার্চের সম্মানজনক অবস্থান ধারণ করবেন, যদিও তিনি এখনো ক্যাসারিয়া মেট্রোপালিটান বিশপের অধীনস্ত। মাকারিয়স যা কিছু চেয়েছিলেন, তার সব না পেলেও সম্ভবত নিক্যাইয়াতেই তিনি এমন একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছিলেন যা কাউন্সিলের সতর্কভাবে গৃহীত বক্তব্যগুলোর চেয়ে আলিয়ার মর্যাদার ওপর অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছিল এবং অনীহ বিশপদের সই করা মতবাদের চেয়ে অ্যাথানাসিয়াসের ধর্মতত্ত্বের চূড়ান্ত জয় নিশ্চিত করতে অনেক বেশি সহায়ক হয়েছিল। আফ্রিদিতির মন্দির ভেঙ্গে ফেলে তার নিচে চাপা পড়া খ্রিস্টের সমাধি খুঁড়ে বের করার জন্য কনস্টানটাইনের অনুমতি চেয়েছিলেন মাকারিয়স।

এই প্রস্তাব কনস্টানটাইনের কাছে সাথে সাথে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন পৌত্তলিক, পবিত্র স্থানগুলোর প্রতি ইউসেবিয়াসের প্রবল তাচ্ছিল্যের সাথে একমত হচ্ছিলেন না। তিনি নিজে ফিলিস্তিন সফর করতে চেয়েছিলেন। তার শাশুড়ি ইউক্রোপিয়া ইতোমধ্যেই বাইবেল-ভূমিতে সফর শুরু করে দিয়েছেন। কনস্টানটাইন আরো জানতেন, ঐতিহাসিক অনুরণন দিতে হলে তার খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের প্রয়োজন প্রতীক ও স্মৃতিসৌধ। তবে মাকারিয়সের এই বিশেষ পরিকল্পনাটিতে বড় ধরনের ঝুঁকিও ছিল। আলিয়ার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা ছিল পৌত্তলিক। তারা তাদের বিশিষ্ট মন্দিরগুলোর ধ্বংস হওয়ার বিষয়টি সহজে মেনে নেবে না। কেবল রাজকীয় সমর্থন পেলেই তারা খননকাজে সম্মতি দিতে পারে। অবশ্য হ্যাড্রিয়ানের ঠিকাদারেরা আফ্রিদিতির মন্দির বানানোর কাজটি করেছিলেন দুই শ' বছর আগে। খ্রিস্টানেরা কিভাবে নিশ্চিত হলো যে গলগাথা ও কবরটি ওই মন্দিরের নিচেই আছে? অকারণে কারণে মন্দির ধ্বংস হলে পৌত্তলিকরা বোধগম্য কারণেই ক্ষুব্ধ হবে। সম্রাট ও চার্চ উভয়েই অগ্রহণযোগ্য লজ্জায় পড়বে। খননকাজে যদি কিছুই পাওয়া না যায়, তবে তা রাজকীয় খ্রিস্টধর্মের মর্মমূলে উদ্বেগজনক শূন্যতা সৃষ্টি করবে।

তা সত্ত্বেও কনস্টানটাইন অনুমতি দিলেন, মাকারিয়সের তদারকিতে কাউন্সিলের পরপরই খননকাজ শুরু হলো। একইসাথে দুটি স্থানে খননকাজ শুরু হলো। প্রথমত কনস্টানটাইন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আলিয়ার প্রধান রাস্তা কারডো ম্যাক্সিমাসের পাশে একটি প্রার্থনা ভবন নির্মাণ করতে হবে। এটি ছিল প্রস্তাবিত গলগোথার কয়েক গজ পূর্ব দিকে। এটি ছিল সহজবোধ্য প্রকল্প। কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়াই দ্রুতগতিতে নির্মাণকাজ এগিয়ে চলল। দ্বিতীয় কাজটি ছিল অনেক বেশি কষ্টসাধ্য। আফ্রিদিতির মন্দির ভেঙ্গে ফেলতে হবে, সহায়ক প্লাটফর্মটি গুঁড়িয়ে দিতে হবে, ভূমি সমান করতে হবে। এই বিপুল নির্মাণযজ্ঞে দ্বিগুণ ধর্মীয় মাত্রা ছিল। প্রথমত, খ্রিস্টানেরা পৌত্তলিক নগরীর নিচে খুঁড়ছে তাদের বিশ্বাসের ঐতিহাসিক শিকড়ের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য। যন্ত্রণাভোগের সময় পৌত্তলিক এস্টাবলিশমেন্টের তীব্র ঘৃণায় খ্রিস্টানদের মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল, বিশ্ব তাদের বিরুদ্ধে। ফলে তারা পরাবাস্তব ধর্মতত্ত্ব সৃষ্টি করেছিল। তারা নিশ্চিত ছিল যে মাটির নিচে তাদের স্থায়ী কোনো নগরী নেই। কিন্তু কনস্টানটাইন সিংহাসন লাভ করায় তারা বড় ধরনের পরিবর্তন দেখতে পেয়েছিল। তারা অনুভব করতে শুরু করেছিল যে যাই হোক না কেন, এই দুনিয়ায় তাদের কিছু আছে। পবিত্র প্রত্নতত্ত্বের এই কাজ তাদের বিশ্বাসের অবয়বগত শিকড় উন্মোচন করবে, তাদেরকে এসব প্রাচীন ভিত্তির ওপর আক্ষরিক অর্থেই নির্মাণে সক্ষমতা দেবে। এই প্রক্রিয়ায় একটি নতুন খ্রিস্টান পরিচিতিও নির্মিত হচ্ছিল। এই ভবন নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল তুলনামূলক কম ইতিবাচক। নতুন খ্রিস্টধর্মের সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত ছিল পৌত্তলিকতাবাদের ধ্বংস। আফ্রিদিতির মন্দির ধ্বংসের সাথে তা সহজেই ফুটে ওঠেছে। গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজটি শাস্ত্রীয় শুদ্ধিকরণের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের ভিত্তিতে হয়েছিল। পৌত্তলিকতা ছিল 'নোংরা' : মন্দিরটির প্রতিটি শেষ চিহ্ন একেবারে বিলীন করা হয়েছিল, সব আবর্জনা নগরীর বাইরে ফেলা হয়েছিল, এমনকি নিচের মাটি পর্যন্ত 'অনেক দূরের স্থানে ফেলা হয়েছিল। কারণ 'এটি নোংরা পৌত্তলিক উপাসনার ফলে দূষিত হয়ে পড়েছে।[১২] খ্রিস্টধর্মের নতুন জন্ম পৌত্তলিক ধর্মের নির্মূল ও ক্ষতি করার সাথে জড়িত ছিল। পৌত্তলিকদের ধর্মীয় স্থানে নিচ থেকেই এর জন্ম হয়েছে।

খননকাজ চলতে থাকার সময় মাকারিয়স ও তার সহকর্মীরা নিশ্চিতভাবেই কিছু খারাপ সময় কাটিয়েছিলেন : তারা জানতেন যে তাদেরকে কিছু খুঁজে বের করতেই হবে। বিশাল আবিষ্কারের আগে তাদের দুটি বছর পার করতে হয়েছে। পুরনো মন্দির প্লাটফর্মের নিচ থেকে একটি পাথরের কবর আবিষ্কার করা হলো। সাথে সাথে একে খ্রিস্টের সেপালচার হিসেবে ঘোষিত হলো। এমনকি ইউসেবিয়াসের এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার নিশ্চিত যুক্তি থাকলেও তিনি এই ধ্বংসাবশেষের প্রামাণ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন না। আবিষ্কারটি প্রবলভাবে অনুমিত হলেও এটি খ্রিস্টবিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। ইউসেবিয়াস ঘটনাটিকে 'সকল প্রত্যাশার বিপরীত' হিসেবে অভিহিত করলেন, কনস্টানটাইনের মনে হলো, এটি 'সব বিস্ময়কে ছাপিয়ে গেছে। এই আশ্চর্য গ্রহণযোগ্যতার একটি কারণ হতে পারে এই যে কল্পলোক পর্যায়ের কিছু ঘটার জন্য অভ্যন্তরীণ মাত্রার সাথে এটি ব্যাপকভাবে সম্পর্কিত ছিল। তিন শ' বছর আগে যিশু কবর থেকে ওঠেছিলেন। এখন কবরটি নিজেই ওঠেছে তার সময়োত্তীর্ণ সমাধি থেকে, ঠিক যেভাবে খ্রিস্টানেরা তাদের বিশ্বাসের অপ্রত্যাশিত পুনর্জাগরণ প্রত্যক্ষ করছে।

পাথুরে কবরটি পাওয়া গিয়েছিল একটি প্রাচীন ভাগাড় থেকে। হ্যাড্রিয়ানের নির্মাতারা এটি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। এখন আশপাশের পাহাড়ি এলাকা থেকে এটিকে এমনভাবে আলাদা করা হবে যাতে গুহাটিকে ঘিরে রাখা পাথরের বস্তুটি অটুট থাকে। তারপর সম্রাটের বৃত্তাকার শহিদগাহ নির্মাণের স্থান হিসেবে পরিষ্কার করার জন্য প্রায় ৩৮ গজ ব্যাসের একটি বৃত্তাকার স্থান কেটে নেওয়া হলো। এর মানে হলো, হাতকুঠারের সাহায্যে প্রায় ১৬,৫০০ কিউবিক ফুট পাথর তুলতে হয়েছিল ভবনটির ব্লক তৈরির জন্য। এটি ছিল বিশাল কর্মযজ্ঞ। এটির নাম হয়েছিল অ্যানাসতাসিস বা রিসারেকশন। তবে কনস্টানটাইনের মৃত্যুর অনেক বছর পর এর কাজ শেষ হয়েছিল। ভূমি প্রস্তুতির সময় কয়েক বছর পর্যন্ত কবরটি খোলা স্থানে খাড়া পাহাড়ে রাখা হয়েছিল। তারা কবরটি বের করার সময় শ্রমিকেরা আরেকটি আবিষ্কার করে, যেটিকে গলগোথার পাথুরে ঢিবি হিসেবে চিহ্নিত হয়। বর্তমানে এ পাহাড়টির প্রায় পুরোপরি হলি সেচালচার চার্চের গলগোথা চ্যাপেলের আবদ্ধ থাকায় এটি ওই সময় কেমন ছিল, তা কল্পনা করা কঠিন। ১৯৬১ সালের খননকাজে দেখা যায়, 'গলগোথা' ছিল প্রায় ১০ মিটার উঁচু পাথরের খাড়া ব্লক।

এটি সম্ভবত আবর্জনা ফেলার জায়গার কোণায় দাঁড়িয়েছিল। এর ভিত্তিতে ছিল একটি গুহা, যা সম্ভবত যিশুর আমলের অনেক আগেই একটি কবর ছিল। এই পাথরের স্তম্ভটি কি কিদরন ভ্যালিতে পাওয়া স্মারক পাথরের মতোই? যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার সময় আশপাশের মাটি জড়ো করে ঢিবি তৈরি করা হয়েছিল। এতে করে পাথরটিকে মাথার খুলির উপরিভাগের মতো দেখাত। এ কারণেই পাহাড়টির নাম হয়েছিল গলগোথা : প্লেস অব দি স্কাল (খুলির স্থান)।

খননকাজের ফলে একটি নয়, বরং দুটি পবিত্র স্থান সামনে এসেছিল : যে পাহাড়টিতে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল এবং যে কবরে তাকে সমাহিত করা হয়েছিল। এদিকে কনস্টানটাইনের গির্জা (ব্যাসিলিকা) প্রায় সমাপ্ত হয়ে আসছিল। কনস্টানটাইন চেয়েছিলেন, এ চার্চটি যেন বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর হয়। শ্রেষ্ঠ স্থাপনা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সম্ভব সব খরচ করা হয়েছে। এর ব্যয়ভার বহন করেছেন পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর গভর্নরেরা। অবশ্য জায়গা কম থাকায় ব্যাসিলিকাটি ছিল বেশ ছোট : এটি ৪৪ বাই ৩০ গজের চেয়ে বড় করা যায়নি। এর মূল অংশ পাঁচটি। একটি গলগোথা পাহাড়সহ, কবরের সবচেয়ে কাছে পশ্চিম প্রান্তে অর্ধবৃত্তকার কোণে এর সমাপ্তি ঘটেছে। এসব ঘটনা চমকপ্রদ বিবেচনা করে লিখে রেখেছিলেন কেবল ইউসেবিয়াস। তার কাছে ব্যাসিলিকাটি ছিল অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান। বর্ণিল মার্বেলের স্ল্যাবে ও মসৃণ পাথরে এর ভেতর ও বাইরে ছিল সুসজ্জিত। অভ্যন্তরভাগ ‘কাঠামোবদ্ধ কারুকাজ, সীমাহীন এক মহাসাগর। পুরো ব্যাসিলিকা সোনার মোড়া থাকায় তা আলোতে চমকাত।১৪ সেন্ট কনস্টানটাইন ব্যাসিলিকা সাধারণভাবে ম্যারটিরিয়াম নামে পরিচিত চিল। কারণ এটি খ্রিস্টের পুনরুত্থান ও স্মারকের ‘সাক্ষী’ ছিল।

বর্তমানে বিশাল ধর্মীয় স্থানটি হলি সেপালচার চার্চেল মধ্যে গলগোথার পাহাড়ের বাকি অংশ ঢেকে ফেলেছে। এই স্মৃতিসামগ্রী আবিষ্কারের ফলে খ্রিস্টানেরা সম্পূর্ণ নতুন পথে খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধকরণের দিকে মনোনিবেশন করতে সক্ষম হয়।

এর ফলে এটি জটিল স্থানও ছিল। নতুন হলি অব হলিসে পরিণত হওয়া এ নতুন কবরটিক পুরনো ইহুদি টেম্পলের মতো করেই ধাপে ধাপে উপাসনাকারীদের সামনে

উপস্থাপন করা হতো। (দেখুন ডায়াগ্রাম।) আগত লোকজন পৌত্তলিক আলিয়ার কেন্দ্রস্থল কারডো ম্যাক্সিমাস থেকে ম্যারটিরিয়ামে প্রবেশ করতে পারত। এর তিনটি দরজা সামান্য খোলা থাকত, যাতে আগন্তুকেরা চার্চের জাঁকজমকের আভাস পেয়ে ভেতরে প্রবেশের তাগিদ অনুভব করতে পারে। ব্যাসিলিকায় প্রবেশের আগে তাদেরকে একটি আঙিনা দিয়ে হাঁটতে হতো। এটি ছিল এক ধাপ অগ্রসর হওয়া। ব্যাসিলিকার সব পশ্চিম দিকের দরজাটি কবরের সামনে থাকা বিশাল আঙিনার দিকে নিয়ে যেত। তীর্থযাত্রীদের সঙ্কুলানের ব্যবস্থা ছিল এখানে। খ্রিস্টকে এক নারী প্রথম যেখানে জেগে ওঠতে দেখেছিলেন, সেখানে ওই ঘটনার স্মরণে একটি উদ্যান গড়া হয়। কনস্টানটাইন রোমান আলিয়ার প্রধান কেন্দ্রের অবস্থান গ্রহণ করে একে খ্রিস্টান পবিত্র স্থানে রূপান্তরিত করেন। তিনি আলিয়া ফোরামের পাশে নতুন এক জেরুসালেম নির্মাণ করেন। এই সময়ের আগে পর্যন্ত বেশির ভাগ অ-ইহুদি খ্রিস্টানের আধ্যাত্মিক মানচিত্রে ছিল না, নগরীতেও চার্চটি ছিল প্রাচীরের বাইরে মাউন্ট সায়নের বসতিহীন উপকণ্ঠে প্রান্তিক অবস্থানে। এখন কনস্টানটাইন তার সাম্রাজ্যের নতুন বিশ্বাসের কেন্দ্রিতা প্রদর্শন করলেন। এটি যে ইঙ্গিত দিচ্ছিল তা সাথে সাথেই খ্রিস্টান মানসচোখে ধরা পড়েছিল। কবরটি আবিষ্কৃত হওয়া ও প্রাণবন্ত ব্যাসিলিকা সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে খ্রিস্টানেরা স্থানটির ব্যাপারে তাদের নিজস্ব পুরানকাহিনী বিবর্তিত করতে থাকে। এই কাহিনী তাদের আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রে স্থান পায়। তারা পুরনো ইহুদি-খ্রিস্টান ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে বলতে থাকে, আদম সমাহিত হয়েছিলেন গলগোথায়। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা এই বিশ্বাসে উপনীত হয় যে ইব্রাহিম এখানেই ইসহাককে কোরবানি দিতে চেয়েছিলেন। পুরনো ইহুদি টেম্পল যে ধরনের বিশ্বাস ও কিংবদন্তি উদ্দীপ্ত করেছিল, নতুন খ্রিস্টান পবিত্র স্থানটিও একই কাজ করতে শুরু করে। এটি পরিণত হয় প্রতীকী ‘কেন্দ্র।’ এখানে ঐশী শক্তি অনন্য উপায়ে মানুষের নাজুক দুনিয়াকে স্পর্শ করে যায়। এটি মানুষের নতুন সূচনার, ইব্রাহিমি ধর্মের পূর্ণাঙ্গতা ও খ্রিস্টান ইতিহাসের নতুন যুগের প্রতিনিধিত্ব করছিল।

খ্রিস্টানেরা তারপরও ভেবেছিল যে তারা এ ধরনের ধর্মানুরাগের ঊর্ধ্বে। তারা গর্ব করে ঘোষণা করত যে তাদের ধর্মটি পুরোপুরি আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, এটি উপাসনালয় বা পবিত্র স্থানের ওপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু কবর আবিষ্কারের প্রতি তাদের চমকিত প্রতিক্রিয়ায়

প্রমাণিত হয় যে ঐশী ভূগোলের মিথ মানব-মনে গভীরভাবে গেঁথে রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ কোনো প্রতীকের সাথে একটি আকস্মিক প্রচণ্ড ধাক্কা বা অপ্রত্যাশিত পুনর্মিলন, বিশেষ করে যখন লোকজন প্রবল নির্যাতনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সময়টি অতিবাহিত হওয়ার পর, পবিত্র স্থানের প্রতি উদ্দীপনাকে নতুন করে সঞ্চারিত করতে পারে। এটি মনে করা কখনো নিরাপদ নয় যে আমরা এই আদি মিথ থেকে বের হয়ে এসেছি : এমনকি ২০ শতকের সেক্যুলার, বৈজ্ঞানিক বিশ্বেও আমরা তাদের আবেদন থেকে সুরক্ষিত নই, যেমন আজকের জেরুসালেমে আমরা দেখতে পাই। নতুন করে সামনে আসা কবরের দিকে তাকিয়ে খ্রিস্টানেরা তাদের শিকড় অনুভব করতে পারল, তারা প্রথমবারের মতো কোনো একটি ভৌগোলিক স্থানে তাদের শিকড় নিহিত রয়েছে বলে বুঝতে পারল, নশ্বর দুনিয়ায় একটি বাড়ি নির্মাণ করল এবং এই পবিত্র স্থানের সাথে সেটিকে সম্পৃক্ত করল। অতীতের সাথে এই উপশম প্রদানকারী সংযোগ তাদেরকে রোমান আলিয়ার কেন্দ্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করল। তারা এখন তাদের প্রান্তিক অবস্থান ত্যাগ করে দুনিয়াতে সম্পূর্ণ নতুন স্থান গ্রহণ করল।

ইউসেবিয়াসের চেয়ে অন্য কেউই পবিত্র জায়গার পূর্ণাঙ্গ ধারণার প্রতি বেশি বিরোধিতা করেনি। কিন্তু কবরটি আবিষ্কার সম্ভবত তার সত্তাকেও স্পর্শ করে গিয়েছিল। ফলে তিনি তার সাবেক বিশ্বাসের কিছু কিছু অংশ বদলে ফেলতে বাধ্য হলেন। এখন তিনি আবার কনস্টানটাইনের আনুকূল্য ফিরে পেয়েছেন। তার দায়িত্ব হলো এসব অবাক করা ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান করা। তিনি দেখতে পেলেন, এই পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের প্রভাব নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে এমনসব পুরাণতত্ত্বের আশ্রয় তাকে নিতে হচ্ছে যেগুলো তিনি এত দিন অগ্রাহ্য করে আসছিলেন। এর তাৎপর্য তিনি যুক্তি দিতে ব্যাখ্যা করতে পারছিলেন না। তবে কেবল পুরনো কল্পকথার মাধ্যমেই হৃদয়-মনের গভীরতর অবস্থান তুলে ধরা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল। কবরটি ছিল মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের প্রকাশ : একটি অবয়ব, যা আগে গোপন ও অপ্রবেশযোগ্য ছিল, সেটিই প্রকাশ্যে এসেছে। এটি খ্রিস্টের পুনরুত্থানের অলৌকিক ঘটনাটি আবার সামনে নিয়ে আসে। ইউসেবিয়াসের কাছে এ ঘটনাটি অন্ধকার শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় হিসেবে ধরা দিয়েছে। আর তা পুরনো যুদ্ধ মিথ নিয়ে প্রচলিত ধারণা থেকে ভিন্নও ছিল না। লাইফ অব কনস্টানটাইনে তিনি

লিখেছেন, 'সবচেয়ে পবিত্র গুহাটি আবার তার প্রাণবন্ততার সত্যিকারের যথার্থ প্রতীকটি লাভ করেছে। কারণ অন্ধকারে নেমে আবার আলোতে এসে আড়ালে থাকা আশ্চর্য ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে আসা লোকদের অজ্ঞানতা দূর করেছে। ১৫ আফ্রিদিতির মন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়া ছিল শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয়। কারণ এটি 'আফ্রিদিতি নামে পরিচিত একটি অশুদ্ধ দানবের আস্তানা, প্রাণহীন মূর্তিদের অন্ধকার স্থান ছিল।' এখানে ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ড হতো, 'অপবিত্র ও অভিশপ্ত বেদীগুলোতে পাপাচারপূর্ণ নৈবদ্য দেওয়া হতো।' তবে এই নোংরা পরিশুদ্ধ করার লক্ষ্যে মানুষের অন্তরে আলোকস্ফূরণ ঘটানো আলোর ঈশ্বর কনস্টানটাইনকে উদ্দীপ্ত করেছেন। 'তার আদেশ দেওয়ামাত্র প্রতারণার কৌশল উচ্চ স্থান থেকে ভূপতিত হয়, ভুল স্থানে বাস করতে থাকা মূর্তি ও দানবেরা সবাই নিক্ষিপ্ত ও বিধ্বস্ত হয়।'৬ কবরটি পুরো খ্রিস্টান অভিজ্ঞতা নতুন করে সাজিয়ে দেয়। কারণ এর আবিষ্কার একইভাবে ছিল ঐশী বার্তা, পুনরুত্থান, আলোর শক্তির বিজয়। এখন থেকে ইউসেবিয়াস পুনরুত্থানকে আরো শান্ত পরিভাষায় দেখেছেন। এখন তিনি অ্যাথানাসিয়াসের ধর্মতত্ত্ব থেকে কিছু নাটক এখানে প্রয়োগ করতে শুরু করেন।

সম্ভবত রক অব গলগোথার ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না ইউসেবিয়াস। তিনি কখনো এর উল্লেখ করেননি। তবে অতি সম্প্রতি পাথুরে পাহাড়ি এলাকা থেকে খুঁড়ে বের করা গুহাটি দেখে তিনি প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়েছিলেন। তিনি এর নিঃসঙ্গতায় অবাক হয়ে গিয়েছিলেন- সমতল মাটিতে একাকী দাঁড়িয়ে আছে এবং সত্য কথা হলো, সেখানে কখনো অন্য কোনো দেহ রাখা হয়নি।১৭ এটি খ্রিস্টের জয়ের অনন্য প্রতীক। কবরটির দিকে তাকানোর সময় ইউসেবিয়াসের কাছে সম্পূর্ণ নতুনভাবে খ্রিস্টের জীবনের ঘটনাবলী প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। যদি আমাদের সামনে ঘটমান স্থানের ছবি মনে মনে না আঁকতাম, তবে কোনো বিস্তারিত বিবরণ স্মরণ করা কঠিন হতো। এই স্থানকে এমনভাবে অতীত ও বর্তমানের মধ্যকার শূন্যতা পূরণকারী হিসেবে বিবেচনা করেন যা কেবল লোকশ্রুতিতে সম্ভব ছিল না। ইউসেবিয়াস স্বীকার করেন যে কবরটির দেখা সব কথার চেয়ে বেশি জোরে কথা বলে।'১৮ অন্যান্য খ্রিস্টান এর মাধ্যমে অ্যাথানাসিয়াসের অবতারভিত্তিক ধর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ঐশী সত্তাকে যিশুর মনুষ্য চরিত্রের মাধ্যমে দেখার

বদলে, যেভাবে ইউসেবিয়াস পরামর্শ দিয়েছিলেন, তারা তার মানব-প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত স্থান দেখতে ও স্পর্শ করতে চেয়েছিল এবং দেখেছিল যে মানুষ যিশু বিশ্বের সাথে ঈশ্বরের সংযোগের শক্তিশালী প্রতীক।

ইউসেবিয়াস অবশ্য তার অভিমতগুলো পুরোপুরি বদলে ফেলেননি। তিনি অব্যাহতভাবে নগরীকে আলিয়া হিসেবেই অভিহিত করতে থাকেন : এই পৌত্তলিক মেট্রোপলিশের কিছুই পবিত্র নয়। এটি চিন্তা করা কেবল 'নীচতাই নয়, বরং অধার্মিকতাও যে 'অত্যাধিক নীচতা ও সংকীর্ণতার সীমা ছিল' ছিল।' 'জেরুসালেম' নামটি কেবল কবর ও ওয়েস্টার্ন হিলের ওপর কনস্টানটাইনের নতুন ভবনরাজির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। বাকি নগরী আগের মতোই ঈশ্বরবিদ্বেষী ও অপরাধী ছিল। ইউসেবিয়াস কনস্টানটাইন কমপ্লেক্সকে যথাযথভাবে নতুন জেরুসালেম হিসেবে অভিহিত করতেন, কারণ এটি 'নির্মিত হয়েছিল পুরনোটির বিপরীতে। ২০ এটি খ্রিস্টের অভিশপ্ত পুরনো ইহুদি নগরী থেকে চরমভাবে ভিন্ন ছিল। বস্তুত, নতুন জেরুসালেম খ্রিস্টানদের সামনে ইহুদি ধর্মের পরাজয় চিন্তা করার আরেকটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এনে দেয়। ওয়েস্টার্ন হিলের অন্যতম সর্বোচ্চ বিন্দুতে অবস্থিত ম্যারটিরিয়ামটি অপবিত্র হয়ে পড়া টেম্পল মাউন্টকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এটি নতুন ধর্মটির জনপ্রিয়তাকেই ফুটিয়ে তুলছিল। এই ধর্মটি এখন রাজকীয় সমর্থন পাচ্ছিল, আর ইহুদি ধর্ম পুরো আলিয়ার মানচিত্র থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। এই দিক থেকে নতুন জেরুসালেমের প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ইউসেবিয়াসের সাবেক বিশ্বাসগুলোই জোরদার করছিলেন। খ্রিস্টধর্ম এখন গোপন স্থান থেকে বের হয়ে নশ্বর দুনিয়ায় তার শিকড় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। এটি এখন সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি স্থান করে নিতে সক্ষম, সম্পূর্ণ নতুন পরিচিতি লাভ করতে সমর্থ। এই প্রক্রিয়ায় নতুন জেরুসালেম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে এই নতুন খ্রিস্টান বিশ্বাস ছিল পুরনো ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলোর বিধ্বংসী প্রত্যাখ্যান, এটি আলিয়ায় অনিবার্য বিষয়ে পরিণত হয়। নতুন জেরুসালেম এর পূর্বসূরিদের 'বিপরীতে নির্মিত' হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠা ছিল পৌত্তলিক ধর্মের সহিংস উচ্ছেদ, অপেক্ষাকৃত পুরনো ঐতিহ্যগুলোর গুঁড়িয়ে দেওয়া ও ইহুদি ধর্মের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অবজ্ঞা প্রদর্শন। খ্রিস্টানেরা নিশ্চিত করেছিল যে তারা সেখানে ক্ষমতায় থাকাকালে জেরুসালেমে আর কখনো ইহুদিদের বসবাসের অনুমতি দেওয়া হবে না।

রাজকীয় আইন গ্রন্থে পুরনো নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে। খ্রিস্ট ধর্ম নির্যাতন থেকে মুক্ত হলেও এটি তখনো ছিল যুদ্ধংদেহী ও আত্মরক্ষামূলক। তারা তখনো তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবিলা ও বিধ্বংসী বিরোধিতামূলক মনোভাব গ্রহণ করে আছে। নির্যাতন সবসময় এর শিকারদেরকে সহানুভূতিশীল করে না। একেবারে শুরু থেকে নতুন জেরুসালেম যেভাবে অন্যদের বাদ দেওয়া ও কালিমালেপন করছিল, তা ছিল যিশুর সহানুভূতিশীল মূল্যবোধ থেকে অনেক দূরে।

ইউসেবিয়াস অব্যাহতভাবে আলিয়াকে ইহুদি ও পৌত্তলিকদের হাতে চূড়ান্ত মাত্রায় দূষিত বিবেচনা করছিলেন। তিনি মাউন্ট সায়নের নতুন 'পবিত্র স্থানগুলোকেও' অগ্রাহ্য করছিলেন। তিনি সম্ভবত কনস্টানটাইনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এসব স্থাপনায় রাজকীয় তহবিল মঞ্জুর না করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব স্থাপনা ছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী মাকারিয়সের জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ : আলিয়ার বিশপ কবরটি আবিষ্কার করার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে একটি ক্যু করে ফেলেছিলেন। কিন্তু পরের বছরগুলোতে ইউসেবিয়াস নিশ্চিত করতে সক্ষম হন যে তার ধর্মতত্ত্বও ফিলিস্তিনের খ্রিস্টকরণ প্রতিফলিত করে। ফলে কনস্টানটাইনের শাশুড়ি ইউক্রোপিয়া যখন দেশটি সফর করেন, তখন নগরবাসী হিসেবে ইউসেবিয়াসই প্রায় নিশ্চিতভাবে তাকে নগরীটি পরিদর্শন করানোর সম্মান লাভ করেছিলেন। হেবরনের কছে মামরেতে তিনি ইব্রাহিম যেখানে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন, ঠিক সেখানেই সন্দেহজনক উপাসনার দিকে রাজকীয় অতিথির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইউসেবিয়াসের কাছে ইব্রাহিম ছিলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার পবিত্র ওক কাছের স্থানটিতে ইহুদি, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিকদের উৎসবের দৃশ্যে তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রতি বছর ফিলিস্তিন, ফোনেশিয়া ও আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন বার্ষিক মেলা ও জৌলুষময় ভোজে অংশ নিতে আসত। এতে সবাই ভূমিকা রাখত : ইহুদি, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিকেরা ঈশ্বর বা সবার ঈশ্বর জিওস অলিম্পিয়সের কাছে প্রার্থনা করত। তারা অ্যাঞ্জেলদের আহ্বান করত, মদের তর্পণ করত, ধূপ জ্বালাত, পৌত্তলিকেরা ষাঁড় বা ভেড়া বলি দিত। এটি ছিল শোভনীয় বিষয়। লোকজন উৎসবের জন্য তাদের সেরা পোশাক পরত। কোনো ধরনের লাম্পট্য বা মাতলামি ছিল না। তবে সমগ্র খ্রিস্ট জগতের ঐক্যমূলক এই সমাবেশের প্রতি নজর দেওয়ার সময় ছিল না ইউসেবিয়াসের। তার কাছে

একে মনে হয়েছিল মিথ্যা ধর্মের সাথে অপবিত্র সামঞ্জস্যতা বিধান করা। তিনি নিশ্চিত করতে চাইছিলেন যে ইউড্রোপিয়া যেন এই উৎসব সম্পর্কে কনস্টানটাইনকে এমনভাবে অবগত করেন যাতে মাকারিয়স ঝামেলায় পড়েন। মামরের অবস্থান মাকারিয়সের বিশপীয় এলাকার মধ্যে থাকায় কনস্টানটাইন তাকে কড়া চিঠি লিখে এসব ‘অপবিত্র নোংরা’ অনুমোদন করার জন্য তাকে তিরস্কার করেন। চিঠিটি প্রমাণ করে যে ইউসেবিয়াসের ধর্মতত্ত্বে ইতোমধ্যেই কনস্টানটাইন প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। এই মামরেতেই লোগোসের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; ‘এখানে পবিত্র আইন এর সূচনাতেই পালিত হয়েছিল; এখানে ত্রাতা দুই অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে ইব্রাহিমের কাছে প্রথম সাক্ষাত করেছিলেন।১ ইউসেবিয়াসের উল্লেখ করা দ্বিতীয় ইব্রাহিম এই সম্রাট ইব্রাহিমের বেদী, কূপ ও ওক বৃক্ষের পাশে একটি নতুন ব্যাসিলা প্রতিষ্ঠা করা হলো।

কনস্টানটাইন নিজে ফিলিস্তিন সফর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অ্যারিয়ানের সঙ্ঘাত উচ্চ শব্দে অব্যাহতভাবে কনস্টানটিনোপলে বিরাজ করতে থাকায় তিনি তা পারেননি। এর বদলে তিনি তার মা, বিধবা সম্রাজ্ঞী হেলেনা আগাস্তাকে পাঠান। পবিত্র ভূমিতে হেলেনার ‘তীর্থযাত্রা’ খ্রিস্টান কিংবদন্তিকে উজ্জ্বল করে তার ব্যক্তিগত ধর্মানুরাগে। তবে ৩২৬ সালে সম্রাজ্ঞীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সফর ছিল একটি রাষ্ট্রীয় শোভাযাত্রা, যা শেষ হয়েছিল জেরুসালেমের বিপুল সমৃদ্ধি দিয়ে। হ্যাড্রিয়ানের মতো কনস্টানটাইনও রোমান সাম্রাজ্য নিয়ে তার বিশেষ ধারণা প্রচার করার জন্য সফরকে ব্যবহার করেছিলেন। বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী ও তার বিশাল সহযাত্রীদের খ্রিস্টান পবিত্র স্থানগুলো পরিদর্শন ছিল কনস্টানটাইনের খ্রিস্টান রোমের শক্তিশালী প্রতীক। হ্যাড্রিয়ান তার সফরকালে মন্দির, স্টেডিয়া, জলাধার নির্মাণ করেছিলেন : আলিয়া ক্যাপিটোলিনা ছিল ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি তার উপহার। এখন হেলেনা নতুন নতুন চার্চ দান করতে লাগলেন। ম্যারটিরিয়াম পরিকল্পনা ও কবর খনন করার সময় তিনি পৌঁছেছিলেন। ৩২৭ সালে কবরটি আবিষ্কার করার সময়ও তিনি হয়তো সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবারো বলা যায়, ইউসেবিয়াসের চাকরি সম্ভবত ছিল হেলেনাকে ফিলিস্তিন দেখানো। তিনি সম্ভবত সম্রাজ্ঞীর নির্মিত চার্চ দুটির স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। দুটি গুহার ব্যাপারে তিনি সবসময়ই উৎসাহী ছিলেন। একটি হলো খ্রিস্টের জন্মস্থান বেথলেহেমে এবং অপরটি মূর্তিমান লোগোসের আত্মপ্রকাশের স্থান

মাউন্ট অলিভেসে। গুহা দুটি যিশুর মিশনের রহস্য উদ্ঘাটনের প্রকৃতি বিবেচিত হতো তার কাছে। হেলেনা নিজে অ্যারিয়ানের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি হয়তো ইউসেবিয়াসের মতবাদের প্রতি সাড়া দিয়ে থাকতে পারেন। যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, বিধবা সম্রাজ্ঞী এ দুটি গুহাকে পবিত্র করতে দুটি নতুন ব্যাসিলিক উদ্বোধন করেছিলেন। ইউসেবিয়াস সম্ভবত বেথলেহেমে একটি পবিত্র স্থান প্রতিষ্ঠা করতে পেরে খুশি হয়েছিলেন। ন্যাটিভিটিতে নতুন ব্যাসিলিকা আলিয়া ও নতুন জেরুসালেম থেকে খ্রিস্টানদের দৃষ্টি সরিয়ে নেবে। মাউন্ট অলিভসের ব্যাসিলিকাটি নগরীর জঁমকালো দৃশ্যপট এনে দেয়। কনস্টানটাইনের ভবন কমপ্লেক্সের মতো ইলেয়না ও বেথলেহেম- উভয় স্থানের ব্যাসিলিকা প্রকৃত 'পবিত্র স্থান থেকে আলাদা ছিল। মাউন্ট অলিভেসে সিঁড়িটি ব্যাসিলিকা থেকে পবিত্র গুহায় নেমে এসেছিল যাতে তীর্থযাত্রীরা গির্জার অনুষ্ঠানে কোনো বিঘ্ন ঘটানো ছাড়াই পবিত্র স্থানটি পরিদর্শন করতে পারে। অন্য দিকে স্থাপত্যটি নিশ্চিত করেছিল যে উপাসনাকারীরা ধাপে ধাপে অভ্যন্তরের পবিত্র স্থানের দিকে যাবে যাতে তারা তাদের হৃদয়-মনে পরিবর্তন আনার জন্য সময় পায়।

হেলেনার সফর অল্প সময়ের মধ্যেই কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল। পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে খ্রিস্টানেরা বিশ্বাস করতে চাইত যে কনস্টানটাইন ও মাকারিয়স নয়, বরং তিনিই গলগোথার খননকাজের তদারকিতে ছিলেন। আরো বলা হয়ে থাকে, যিশু যে ক্রুশে মারা গিয়েছিলেন, সেটি তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। হেলেনার ফিলস্তিন সফর নিয়ে ইউসেবিয়াস যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে তার 'ট্রু ক্রস' পাওয়ার কথা উল্লেখ নেই। সমসাময়িক অন্য কোনো বিবরণীতেও আমরা এই প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কথা দেখি না। তবে ৩৯০ সাল নাগাদ ক্রুশটি জেরুসালেম দৃশ্যপটের অংশে পরিণত হয়েছিল, প্রাচীন সামগ্রীটির অংশবিশেষ খ্রিস্টান বিশ্বজুড়ে বিতরণ করা হয়েছিল। এটি ৩২৫-২৭ সময়কালের খননকাজের কোনো একপর্যায়ে পাওয়া গিয়েছিল। আর এই আবিষ্কারে হেলেনার সম্পৃক্ত থাকাও অসম্ভব নয়। চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে খ্রিস্টানেরা ক্রুশবিদ্ধকরণের ঘটনাকে আলাদা বিষয় হিসেবে খুব বেশি আলোচনায় আনত না। এটি পুনরুত্থানের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। খ্রিস্টের মৃত্যু ও তার কবর থেকে উত্থান একক রহস্যের দুটি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তবে জেরুসালেমে

উপাসনার অভিজ্ঞতা খ্রিস্টানদেরকে ক্রুশবিদ্ধকরণের ওপর গুরুত্ব দিতে খ্রিস্টানদের শিক্ষা দিয়েছিল। এছাড়া আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখব যে খ্রিস্টের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু খ্রিস্টান কল্পনাশক্তির পুরোভাগে চলে আসে। চূড়ান্ত পর্যায়ে লোকজন কবর আবিষ্কারের কথা মনে রাখবে না। অথচ হেলেনার ট্রু ক্রস আবিষ্কারের কিংবদন্তির চেয়ে এটি হবে আরো বেশি বিখ্যাত ঘটনা।

গলগোথা খননকাজের আগে জেরুসালেমে কোনো তীর্থযাত্রা হতো না। অথচ কবরটি আবিষ্কার হওয়ামাত্র সমগ্র রোমান সাম্রাজ্য থেকে, এমনকি সুদূর পাশ্চাত্য থেকে তীর্থযাত্রীরা আসতে শুরু করে। এ-বিষয়ক প্রথম ভাষ্যটি আসে বদুর এক পর্যটকের কাছ থেকে। তার বিশাল সফর কিছুটা সহজ হয়েছিল এখন রাজকীয় রাজধানী কনস্টানটিনোপলের সাথে সংযোগকারী সামরিক রাস্তাগুলোর মাধ্যমে। তীর্থযাত্রা নিশ্চিতভাবেই ছিল বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। তবে ওই তীর্থযাত্রীর পথ- পরিক্রমণ সম্পর্কে সংযম অবলম্বন করার ফলে তার অনুভূতি সম্পর্কে কু পাওয়া যায় সামান্য : এটি স্রেফ বাইবেলের স্থানগুলোর ক্যাটালগ ও এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোর বর্ণনা। তীর্থযাত্রী চরমভাবে একমনা ছিলেন। তিনি প্রাচীন কালের কালজয়ী নিদের্শনগুলো দেখার জন্য বিরতি নেননি, পুরোপুরি বাইবেলে উল্লেখিত স্থানগুলোতে পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছেন। তার গাইডরা ছিল সম্ভবত ইহুদি। কারণ তার পরিদর্শন করা অনেক স্থান খ্রিস্টানদের বর্তমানে অভিহিত ‘ওল্ড টেস্টমেন্টে পাওয়া যায়। তিনি যেসব লোক-কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলো কেবল ইহুদি ঐতিহ্যেই পরিচিত। তীর্থযাত্রা তখনো আদর্শ খ্রিস্টান ধর্মভক্তি হিসেবে পরিচিত। প্রাথমিক কালের তীর্থযাত্রা সম্ভবত ফিলিস্তিনের ইহুদি বাসিন্দাদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। পরে খ্রিস্টানেরা তাদের অবস্থান মজবুত করেছিল। ওই তীর্থযাত্রী যিশুর জাগতিক জীবনের ব্যাপারে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তিনি অবশ্যই গ্যালিলি অতিক্রম করেছিলেন। কিন্তু নাজারেথ বা ক্যাপোরনাম সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেননি। এর বদলে তিনি সরাসরি জেরুসালেমে গিয়ে প্রথমেই টেম্পল মাউন্টের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। তবে পুল অব বেথ-হেসদায় তখনো বিকশিত হতে থাকা পৌত্তলিক আরোগ্য ধর্মমত উল্লেখ করার জন্য কিছু বিরতি দিয়েছেন।

দি পিলগ্রিমস হলো ৭০ সালের পর টেম্পল মাউন্টের প্রথম ভাষ্য। সময়ের পরিক্রমায় এটি আরো ভুতুরে, ভয়ঙ্কর স্থানে পরিণত হয়েছিল। ওই তীর্থযাত্রী আমাদের জানাচ্ছেন যে এখানে থাকা একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে শয়তানদের শাস্তি দিতেন রাজা সোলায়মান। আর খোদ টেম্পলের স্থানে নবী জাকারিয়ার রক্তের দাগ ছিল। তিনি রাজা যেহোয়াশের নির্যাতনের সময় নিহত হয়েছিলেন।২২ ইহুদি সৈনিকদের পেরেকের চিহ্ন তখনো দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। বিধ্বস্ত প্লাটফর্মটি ইহুদি লোকজনের সহিংসতা ও ধর্মত্যাগের সাথে সম্পর্কিত বলে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ছিল। ওই তীর্থযাত্রা ইহুদি শোকের আনুষ্ঠানিকতার বর্ণনা দিয়েছেন। তা তখনো অ্যাভের নবম দিনে পালিত হতো। তিনি বলেছেন, হ্যাড্রিয়ানের দুটি মূর্তি থেকে খুব বেশি দূরে এমন স্থানে 'একটি ছিদ্রযুক্ত পাথর' [ল্যাপিস পারফুসাস] ছিল। এখানে ইহুদিরা প্রতি বছর আসত, এতে তেলসিক্ত করত, নিজেরা বিলাপ করত, পোশাক ছিঁড়ত, তারপর চলে যেত।২৩ এই পাথরের কথা কেবল ওই তীর্থযাত্রীই উল্লেখ করেছেন। তিনি কি হেরডের প্লাটফর্মের ওপরে থাকা টিলার উপরিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন, যা এখন মুসলিম ডোম অব দি রককে উজ্জ্বল করেছে? এটি কি বাইবেলে উল্লেখ না থাকা কোনো পাথর, যা রাব্বিদের উল্লেখ করা ডেভিরের ফাউন্ডেশন পাথরের (ইভেন শেটিয়াহ) সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে শুরু হয়েছিল? নাকি এ পাথরটি স্রেফ বিধ্বস্ত ইট-সুরকির নাটকীয় কোনো অংশবিশেষ? এটি অসম্ভব নয় যে ওই তীর্থযাত্রী নিজে তার বর্ণিত ইহুদি অনুষ্ঠানগুলো না দেখেই সে সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছেন।

তবে খ্রিস্টানেরা তাদের বলে কল্পনা করা স্থানটিতে উপনিবেশ স্থাপন করা শুরু করে দিয়েছিল। ওই তীর্থযাত্রী একটি ভবনশৃঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। এটি প্লাটফর্মের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তখনো দাঁড়িয়েছিল। এটিকে তিনি 'টেম্পলের চূড়া' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এখানেই যিশুকে প্রলুব্ধ করেছিল শয়তান।২৪ এই টাওয়ারের একটি কক্ষে বসেই সোলায়মান বুক অব উইজডম লিখেছিলেন বলে কথিত রয়েছে। তবে তীর্থযাত্রীর সময় সেটি জেমস দি জাদিকের শহিদ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল। টেম্পল মাউন্ট থেকে ওই তীর্থযাত্রী সিলম পুল দিয়ে আলিয়ার খ্রিস্টান এলাকায় যান। মাউন্ট সায়নে তাকে ক্যাইফাসের বাড়ি, যিশুকে যেখানে প্রহার করা হয়েছিল, সেই স্তম্ভ ও

'দাউদের প্রাসাদ' দেখানো হয়। তিনি একটি 'সিনাগগ' দেখার কথাও জানিয়েছেন। এটি এই এলাকায় ইহুদিদের বাস করার সময় থেকে বিধ্বস্ত হয়ে আছে। কিন্তু ওই তীর্থযাত্রী আপার রুমের বাড়িটির কথা উল্লেখ করে থাকতে পারেন। ২৫ নগরকেন্দ্রে প্রবেশ করা মাত্র তিনি টাইরোপোয়েন ভ্যালিতে ধ্বংসাবশেষ দেখেন। তার মনে হয়েছিল এটি প্রায়েটোরিয়াম, যেখানে যিশুর বিচার করেছিলেন পিলেত। তারপর তিনি গলগোথার দিকে অগ্রসর হন। কনস্টানটাইনের ব্যাসিলিকার নির্মাণকাজ তখনো চলছিল : 'গলগোথার ছোট্ট পাহাড়ে প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল' এবং কবরটি (ক্রিপতা) এখনো উন্মুক্ত দাঁড়িয়ে আছে।২৬ ওই তীর্থযাত্রী নতুন জেরুসালেম দেখতে পেয়ে আবেগ লুকাতে পারেননি। পবিত্র ভূমির নাগাল পাওয়ার জন্য যে বিপুল প্রয়াস তিনি চালিয়েছেন তা মুগ্ধ হওয়ার মতো। স্থানটি পরিচিত বিশ্বের অন্যান্য স্থানের খ্রিস্টানদের আকৃষ্ট করতে চম্বুকের মতো কাজ করতে শুরু করেছিল।

গলগোথায় কনস্টানটাইনের ব্যাসিলিকার কাজ চূড়ান্তভাবে শেষ হয় ৩৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে। পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর সব বিশপীয় এলাকার বিশপদেরকে গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় কর্মকর্তাদের সাথে একত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে উৎসর্গ অনুষ্ঠানে আলিয়ায় তলব করা হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর কনস্টানটাইন নতুন জেরুসালেম আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র বলে ঘোষণার মাধ্যমে সিজার পদে তার অভিষেকের ত্রয়োদশ বার্ষিকী উদযাপনের উদ্যোগ নেন। প্রথমবারের মতো ম্যারটিরিয়ামে বিশিষ্ট তীর্থযাত্রীরা সমবেত হয়। আলিয়ায় তখনো খ্রিস্টানরা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। নতুন জেরুসালেম স্রেফ পৌত্তলিক নগরীতে একটি ছোট ছিটমহল মাত্র, অন্য সব নতুন পবিত্র স্থান সত্যিকার অর্থে নগরীপ্রাচীরের বাইরে ছিল। তবে উৎসর্গ অনুষ্ঠানটি রাজকীয় অনুষ্ঠান হিসেবে ঘোষিত হয়, পরিষ্কার হয়ে যায় যে রোমের আসন্ন ধর্ম হচ্ছে খ্রিস্টধর্ম।

ইউসেবিয়াস ছিলেন ওই দিনটি প্রচারকারী অনেক বিশপের একজন। তিনি তার ধর্মতত্ত্ব প্রচারের জন্য দিনটিকে ব্যবহার করেছিলেন। খুবই চতুরভঅবে তিনি অনুষ্ঠানে হাজির হতে অসমর্থ্য অনুপস্থিত সম্রাটকে সংশয়মুক্ত করেন যে আলিয়ায় না আসার কারণেই তার খ্রিস্টান বিশ্বাস অসম্পূর্ণ, বিষয়টি এমন নয়। লোগোস নতুন জেরুসালেমের মতো করে

খুব সহজেই কনস্টানটিনোপলে তার কাছে যেতে পারে। তিনি তার ধর্মীয় বক্তৃতার পুরোটায় জোর দিয়ে বলেন যে লোগোস দুনিয়াতে নেমে আসে বস্তুগত বিশ্ব থেকে মানুষকে সরিয়ে নিতে। অ্যাথানেসিয়াসকে স্রেফ বরখাস্ত করে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইউসেবিয়াস বিশ্বাস করতেন, তার উদার দলটি বিজয়ী হয়েছে। কবরটি সন্দেহাতীতভাবে পবিত্র স্থান ছিল, এর ছিল প্রবল আবেগময় শক্তি। তবে খ্রিস্টানদের কোনোভাবেই এই দেহাবশেষকে পূজা করা বা এটিকে মূর্তি হিসেবে গণ্য করতে পারবে না। তাদেরকে অবশ্যই সবসময় আধ্যাত্মিক বাস্তবতার বাইরে যাওয়ার জন্য নশ্বর প্রতীকগুলোর মাধ্যমে তাকাতে হবে।

তবে ইউসেবিয়াস এখন বুড়ো মানুষ। ৩১৩ সালে তিনি যখন ক্যাসারিয়ার বিশপ হয়েছিলেন তখনই খ্রিস্টান ধর্ম ও জেরুসালেম সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি মানদণ্ডে পরিণত হলেও তারপর থেকে খ্রিস্টানদের জীবনযাত্রা চরমভাবে বদলে গিয়েছিল। একটি পুরো প্রজন্ম এমন এক বিশ্বে বেড়ে ওঠেছিল যেখানে খ্রিস্টানেরা আর নির্যাতিত হচ্ছিল না, সবসময় খ্রিস্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের প্রত্যাশায় থাকত না। তারা রোমান সাম্রাজ্যকে নিজেদের দেশ মনে করত। এটি অনিবার্যভাবে তাদের ধর্মীয় উপলব্ধি বদলে ফেলেছিল। তারা আসমান থেকে নেমে আসা কিছুর জন্য সীমাহীন চাপে থাকার বদলে দুনিয়াতেই ঈশ্বরকে খুঁজতে চাইত। তারা ইউসেবিয়াসের পুরোপুরি আধ্যাত্মিক মতবাদের চেয়ে অ্যাথানেসিয়াসের মূর্তিমান ধর্মতত্ত্বকে অনেক বেশি উপযোগী বিবেচনা করত। তখনো অনেকে অ্যারিয়াস ও ইউসেবিয়াসের খ্রিস্টধর্মকে অগ্রাধিকার দিলেও নিক্যাইয়ার মতবাদগুলোর প্রতি

সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল। ইউসেবিয়াস ৩৪০ সালে পরলোকগমন করেন। ক্যাসারিয়ার বিশপ হিসেবে তার উত্তরসূরি হন অ্যারিয়ানের অনুসারী। তবে অ্যাথানেসিয়ানের ভক্ত ম্যাক্সিমাস আলিয়ার বিশপ হিসেবে মাকারিয়াসকে স্থলাভিষিক্ত করেন। তার প্রথম কাজ ছিল মাউন্ট সায়নের উপর আপার রুমের পাশে একটি চার্চ নির্মাণ। তিনি কোনো রাজকীয় মঞ্জুরি পাননি, তাকে নিজেই তহবিল যোগার করতে হয়েছিল। ফলে কনস্টানটাইনের জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপনার তুলনায় তারটি ছিল খুবই সাদামাটা। তবে

সায়নের ব্যাসিলিকা ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশ্বাস করা হতো যে যিশু এখানেই তার শিষ্যদের কাছে লাস্ট সাপার (শেষ নৈশভোজ) সেরেছিলেন, আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছিলেন এবং পুনরুত্থানের পর আবির্ভূত হয়েছিলেন। অধিকন্তু এখানেই পবিত্র আত্মা (হলি স্পিরিট) আদি প্রচারকদের ওপর নেমে এসেছিল। ফলে আপার রুম ছিল চার্চের জন্মস্থান, অন্য সব চার্চের 'মা'।

এটি নিশ্চিতভাবেই ছিল সিরিলের দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি ৩৪৯ সালে আলিয়ার বিশপ হয়েছিলেন। তিনি তার ধর্মীয় বক্তৃতায় সাবলীলভাবে জেরুসালেমের প্রতি তার ভক্তি বর্ণনা করতেন। তিনি দাবি করতেন যে পেন্টেকস্টের উৎসবে পবিত্র আত্মা 'জেরুসালেমের এই নগরীর এখানে নেমে আসে। ফলে চার্চটিকে 'অন্য সবকিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।' আলিয়ার বিশপেরা অব্যাহতভাবে ফিলিস্তিনের চার্চটির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রচার চালাতেন। সাইরিল ছিলেন নতুন প্রজন্মের খ্রিস্টানদের একজন। কবরটি যখন খুঁড়ে বের করা হয়, তখন তার বয়স হিল পাঁচ বছর। ফলে জেরুসালেমকে 'পবিত্র নগরী' হিসেবে অভিহিত করতে তার কোনো সমস্যা ছিল না। খ্রিস্টের পৃথিবীতে নেমে বেথলেহেমে রক্ত-মাংসের রূপ নিয়েছিলেন, তিনি গলগোথার উপর বিশ্বকে উদ্ধার করেন, মাউন্ট অলিভেস থেকে স্বর্গে আরোহণ করেন, আপার রুমে শিষ্যদের প্রতি পবিত্র আত্মা অবতরণ করান। এই নগরী যখন বিশ্বের পাপমুক্তি প্রত্যক্ষ করেছে, তখন কিভাবে তা পবিত্র না হয়ে থাকতে পারে। ক্রুশবিদ্ধকরণের কারণে নগরীটি অপরাধী নয় : ক্রশ কোনো লজ্জা বা অপমান নয়, বরং জেরুসালেমের 'গৌরব' ও 'মুকুট'।২৮ ইউসেবিয়াস চাইতেন ক্রসকে অগ্রাহ্য করতে। কিন্তু সাইরিল যিশুর দৈহিক মৃত্যুকে এর নিজ অধিকারবলেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে দেখেছিলেন। ক্রসটি ছিল পাপমুক্তির ভিত্তি, আমাদের বিশ্বাসের নির্যাস, পাপের অবসান। টেম্পলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ঈশ্বর, নগরীকে নয়। তিনি জেরুসালেমকে নয়, কেবল ইহুদিদের নিন্দা করতেন। এই নতুন ইতিবাচক ধর্মতত্ত্ব এখনো পুরনো প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকারকে ধারণ করে একে নতুন জটিলতায় ফেলেছিল। সাইরিলের কাছে জেরুসালেম কোনো অপরাধী নগরী ছিল না : তিনি নগরী থেকে অপরাধের বোঝা দূর করে তা পুরোপুরি ইহুদিদের কাঁধে চাপিয়ে দেন।

ইউসেবিয়াসের বিপরীতে সাইরিল বিশ্বাস করতেন যে খ্রিস্টের মানবতার ধর্মীয় মূল্য রয়েছে। এটি অবজ্ঞা করার কিংবা লোগোসের আধ্যাত্মিক নির্যাস কামনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। কায়া ধারণ করে ঈশ্বর স্বেচ্ছায় ও স্থায়ীভাবে নিজেকে মানবজাতির সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। মানুষ হিসেবে যিশুর ভাবমূর্তি আমাদের প্রতি ঈশ্বরের শ্বাশত অবস্থান প্রকাশ করেছে। বস্তুগত দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করার কোনো প্রয়োজন নেই; আপনি ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য সত্যিই একে ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ সাইরাল বিশ্বাস করতেন যে জেরুসালেমের পবিত্র স্থানগুলো, তিনি কখনো একে আলিয়া বলেননি, খ্রিস্টানদেরকে ঐশী সত্তার সংস্পর্শে নিয়ে আসতে পারে। অনেক স্থানে ঈশ্বর আমাদের দুনিয়াকে স্পর্শ করতে পারে। ফলে এগুলোর আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে। এগুলো তাদের ও যিশুর জীবনের মধ্যকার সময়ের প্রতিবন্ধকতা না হলেও স্থানের বাধা ভেঙে খ্রিস্টানদেরকে ঈশ্বরের সাথে যোগসূত্র সৃষ্টি করেছিল। সাইরিল 'আমরা এখন যে নগরীতে বাস করছিল সেখানেই ঘটা ঘটনাগুলোর ওপর জোর দিতে পছন্দ করতেন। ২৯ পেন্টেকস্টোকে আত্মার নেমে আসার ঘটনা ঘটেছিল তিন শ' বছর আগে। তবে অন্য দিক থেকে বলা যায়, এটি জেরুসালেমে 'আমাদের মধ্যে' ঘটেছিল।

৩০ খ্রিস্টানেরা যখন যিশুর স্পর্শযুক্ত বস্তুগুলোর- ক্রুশ, কবর, তারা ঠিক যে স্থানে দাঁড়াত- সংস্পর্শে আসত, তারা অনুপস্থিত খ্রিস্টের বছরগুলো অতিক্রম করে যেতে পারত। সাইরিল বলতেন, 'অন্যরা কেবল শোনে, কিন্তু আমরা দেখি ও স্পর্শ করি। ৩১ যিশুর পদাঙ্ক আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করে, তিনি যেসব স্থানে হাঁটাহাটি করতেন, সেসব স্থানে চলাফেরা করে তীর্থযাত্রীদের কাছে যিশুর জীবনের সুদূর অতীতের ঘটনাগুলো বর্তমান বাস্তবতায় পরিণত হতো। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, খ্রিস্ট একক স্থানে সীমিত ছিলেন না; খ্রিস্টানেরা বিশ্বের যেকোনো স্থানে তার উপস্থিতি অনুভব করত। তবে পবিত্র স্থানগুলো সফর তাদেরকে এমন এক স্থানে দাঁড়ানোর সক্ষমতা দিত যা ঐশী উপস্থিতি তখনো ধারণ করে ছিল

নতুন জেরুসালেম নিশ্চিতভাবেই ইহুদিদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক ছিল। উগ্র একটি ছোট গ্রুপ হয়তো পবিত্র ভূমিতে এই খ্রিস্টান ভবন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল।৩২ সম্ভবত

অবিশ্বাস্য ছিল যে ইহুদি ধর্মের একটি অকুলীন ও ধর্মচ্যুত রূপ এখন রাজকীয় সমর্থন পাবে। তারা আলিয়া ক্যাপিটোলিনায় নির্মাণ প্রতিরোধে মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সম্রাটদের কয়েকজনের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করার পর থেকে এবং কনস্টানটাইনের আগে পর্যন্ত এমন হওয়া অসম্ভব ছিল না যে রোমানরা একদিন তাদেরকে টেম্পলটি পুনঃনির্মাণের অনুমতি দেবে। তবে এসব নতুন খ্রিস্টান ভবনগুলো জেরুসালেমের ভেতরে ও আশপাশে হওয়ায় এই বাস্তবতা সৃষ্টি করেছিল যে অসম্ভব না হলেও ভবিষ্যতের সম্রাট জেরুসালেমকে ইহুদি জনগণের কাছে ফেরত দেবেন। কনস্টানটাইন এমনকি ইহুদি সংখ্যাগরিষ্ঠতাপূর্ণ গ্যালিলিতে একটি নির্মাণ প্রকল্প সূচনা করেছিলেন। এছাড়া সেফোরিস, তাইবেরিয়াস, ক্যাপারনাম ও নাজারেথে মিশনারি আগ্রাসন চালানো হয়েছিল। অনেক ইহুদি চরম হতাশায় ভুগত; অন্যরা মেসাইয়ার অপেক্ষায় থাকত। অবশ্য বেশির ভাগ রাব্বি মধ্যপন্থার প্রচার অব্যাহত রেখেছিলেন। তারা অতীতে রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টার সময় ইহুদি জাতির ওপর নেমে আসা বিপর্যয়ের বিষয়টি লোকজনকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। খ্রিস্টধর্মের প্রতি এই অদ্ভূত রাজকীয় অগ্রাধিকার স্রেফ সাময়িক উৎসাহ হতে পারে।

সাইরিলের খ্রিস্টান-সম্পর্কিত ধর্মতত্ত্ব জেরুসালেমে অর্থোডক্স ভক্তি প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানেও তা অটুট রয়েছে। জেরুসালেম আর অপরাধী নগরী হিসেবে থাকল না : ক্রুশ এখন খ্রিস্টান পবিত্র নগরীর 'গৌরব' ও 'মুকুট' বিবেচিত হতে লাগল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও খ্রিস্টান সম্রাটদের অধীনে ইহুদিদের অবস্থান অব্যাহতভাবে খারাপ হতে থাকে। কনস্টানটাইন নিজে ইহুদি লোকজনকে নির্যাতন করার জন্য নতুন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তবে ৩৩৭ সালে তার মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরিরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে আন্তঃবিবাহ নিষিদ্ধ করে নতুন আইন জারি করেন, ইহুদিদের দাসের মালিক হওয়া নিষিদ্ধ করেন। ইহুদিদের বিচ্ছিন্ন করা ও ইহুদি শিল্পকে পঙ্গু করার লক্ষ্যে এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। ৩৫১ সালে সেফোরিস, তাইবেরিয়াস ও লিড্ডার ইহুদিরা বিদ্রোহ করে। তবে রোমানরা তাদের মানবিকভাবে দমন করে। ৩৫৩ সালে দ্বিতীয় কনস্টানটিয়াস নতুন আইন করে খ্রিস্টানদের ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত হওয়া নিষিদ্ধ

করেন, ইহুদিদের 'বর্বর', 'ঘৃণ্য' ও 'ঈশ্বর অবমাননা' হিসেবে অভিহিত করে সম্রাটের সরকারি আইন গ্রন্থের সূচনা করেন।৩৪ যিশু ভালোবাসা ও ক্ষমার ধর্ম প্রচার করেছিলেন। কিন্তু এখন খ্রিস্টানেরা ক্ষমতায় এসে ইহুদিদেরকে সমাজের শত্রু হিসেবে কলঙ্কিত করে উপস্থাপন করে, তাদেরকে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেয়, একসময় খ্রিস্টানেরা যেমন অচ্ছ্যুত ছিল, তেমন অবস্থায় পরিণত করে।

ইহুদিদের অবস্থান নিরাশায় ভরা বলে মনে হলো। খ্রিস্টানেরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের আলোকে নিজেদের উপযুক্ত করে নিলো, নিজদেরকে নতুন ইসরাইল হিসেবে অভিহিত করল, রাজকীয় তহবিলপুষ্ট নির্মাণ কর্মসূচির মাধ্যমে ইহুদি পবিত্র নগরী নিজেদের করে নিতে থাকল। খ্রিস্টানদের সাথে বিতর্ককালে এক ইহুদি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমাদের সবকিছু তোমরা নিয়ে সেগুলোকে তোমাদের করছ কেন?'৩৫ তারপর হঠাৎ করেই পরিত্রাণ হাতের মুঠোয় বলে মনে হলো। ৩৬১ সালে দ্বিতীয় কনস্টানটিয়াস মারা যান, তার উত্তরসূরি হন তার ভাতিজা জুলিয়ান।

জুলিয়ান খ্রিস্টান হিসেবে বেড়ে ওঠেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত নতুন ধর্মটির প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন। তার মতে নতুন ধর্মটি রোমের সবচেয়ে পবিত্র ঐতিহ্যগুলোর প্রতি অনিষ্টকর। সাম্রাজ্যকে সঙ্ঘবদ্ধ করার শক্তি হিসেবে খ্রিস্টধর্মের ব্যাপারে কনস্টানটাইনের দর্শনটির প্রতি চরমভাবে বৈরী হয়ে তিনি এখন আবেগপূর্ণভাবে পুরনো পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। তিনি একা ছিলেন না। পৌত্তলিকতাবাদ তখনো সজীব ছিল, শক্তিশালী ছিল, পঞ্চম শতক পর্যন্ত সাম্রাজ্যজুড়ে বিকশিত হওয়া অব্যাহত রেখেছিল। পুরনো দেবদেবী ও প্রাচীন শাস্ত্রাচারের প্রতি ভালোবাসায় থাকা অনেকের কাছে জুলিয়ানের মতোই মনে হয়েছে যে পবিত্র ঐতিহ্যগুলোর প্রতি খ্রিস্টধর্ম প্রকাশ্যভাবে দূষণ সৃষ্টিকারী। পুরনো ঈশ্বরেরা যথাযথ সম্মান না পেলে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলেও ব্যাপকভাবে উদ্বেগ ছিল। তাই পুরনো বলি প্রথা ও পবিত্র বিধিবিধান অবশ্যই পালন করা উচিত বলে তারা মনে করত। অধিকন্তু, পৌত্তলিকেরা যিশুর প্রতি খ্রিস্টান বিশ্বাসে মনোকষ্ট পেত। যে লোকটি লজ্জাজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে তাকে ঐশী সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা পবিত্রতা-সম্পর্কিত তাদের নিজস্ব ধারণার সাথে চূড়ান্ত রকমের

সাংঘর্ষিক ছিল। ফলে নতুন সম্রাট যখন তাদের পিতৃপুরুষদের প্রাচীন ধর্মটি রোমান বিশ্বে এর যথাযথ স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা করলেন, তখন তিনি তার প্রজাদের মধ্যে থাকা বিপুল আগ্রহী সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে পেরেছিলেন। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে ইহুদিরা প্রথমে মনে করেছিল, এই পৌত্তলিক শাসকের কাছ থেকে তাদের সামান্যই পাওয়ার আছে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে জেরুসালেমের ব্যাপারে জুলিয়ানের বিপ্লবী পরিকল্পনা রয়েছে।

খ্রিস্টান পবিত্র নগরী

সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের- তাইবেরিয়াসের প্যাট্রিয়ার্ক এলাকা থেকে নয় বলেই মনে হচ্ছে- ইহুদি প্রতিনিধিদল ৩৬৩ সালের ১৯ জুলাই অ্যান্টিয়কে পৌঁছে সম্রাট জুলিয়ানের সাথে সাক্ষাত করার জন্য। সাম্রাজ্যের ব্যাপারে জুলিয়ানের মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে তাদেরকে তলব করা হয়েছিল। তিনি নতুন বেমানান খ্রিস্ট ধর্মটির স্থানে সমগ্র সাম্রাজ্যে বলি দান প্রথা উদযাপিত হতে দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, ওই বলি হবে ইহুদি ধর্মগ্রন্থে যাকে এক ঈশ্বর, সর্বোচ্চ সত্তা ইত্যাদি বলে ডাকা হয় তার নামে, যাকে অনেক সময় জিউস, হেলিয়াস বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হিসেবেও অভিহিত করা হয়। রোমের পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস হিসেবে জুলিয়ান ইতোমধ্যেই প্রতিটি অঞ্চলে খ্রিস্টান বিশপদের বিরোধিতা করার জন্য পৌত্তলিক পুরোহিত নিয়োগ করেছিলেন। যেসব শহরে কখনো খ্রিস্টধর্ম গৃহীত হয়নি সেসব এলাকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। তাছাড়া সরকারি অফিস থেকে খ্রিস্টানদের ধীরে ধীরে অপসারণ করা হলো। সম্রাট ইহুদি ধর্মের কিছু বিষয় নাকচ করলেও তাদের প্রাচীন বিশ্বাসের প্রতি ইহুদি বিশ্বস্ত থাকার জন্য প্রশংসা করেন। তার শিক্ষক ল্যাবিলিকাস তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে বলির সহযোগে করা না হলে কোনো প্রার্থনাই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে না। ইহুদিরা অবশ্য তখন তাদের পূর্বপুরুষদের শাস্ত্রীয় আচরণটি পালন করতে পারছিল না। এটিই সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। কারণ সাম্রাজ্যের কল্যাণ নির্ভর করছে ঈশ্বরের সমর্থনের ওপর।

এই প্রেক্ষাপটে ইহুদি প্রবীণেরা জুলিয়ানের সামনে সমাবেত হলে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, মুসার বিধান অনুযায়ী তারা কেন ঈশ্বরের কাছে বলি দেয় না। তিনি কারণটি ভালোভাবেই জানতেন। তবে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছিলেন যাতে ইহুদিরাই তাদের ধর্মমতটি আবার শুরু করার জন্য অনুরোধ করে। প্রবীণেরা যথাযথভাবেই জবাব দিলেন : ‘পবিত্র নগরীর বাইরে বলি দেওয়ার অনুমতি নেই আমাদের বিধানে। আমরা এখন তা কিভাবে করব? আমাদেরকে নগরীতে পুনঃবাসিত করুন, টেম্পল ও বেদী পুনঃগঠন করুন, আমরা প্রাচীন কালের মতো বলি দেব।’ বেশি না হলেও অন্তত ঠিক এটুকুই চেয়েছিলেন জুলিয়ান। কারণ ইহুদি ধর্মের পরাজয় খ্রিস্টানদের

গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণ করে বলে খ্রিস্টানেরা যে দাবি করে তার প্রতি এটি হবে তিক্ত আঘাত। এবার প্রবীণদেরকে সম্রাট বললেন : 'আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের টেম্পল প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বোচ্চ প্রয়াস চালব।' সভার পরপরই জুলিয়ান প্যাট্রিয়াক দ্বিতীয় হিলেল ও সাম্রাজ্যের সব ইহুদিকে লিখেন, জেরুসালেম আবার ইহুদি নগরী হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন : 'আমি আমার ব্যয়ে পবিত্র নগরী জেরুসালেম পুনঃনির্মাণ করব, একে জনবসতিপূর্ণ করব, যা আপনারা অনেক বছর ধরে দেখার ইচ্ছাপ্রকাশ করে আসছেন।

ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো। রাস্তায় রাস্তায় শোফার ফোঁকা হলো, মনে হলো শিগগিরই মেসাইয়া এসে যাচ্ছেন। খ্রিস্টানদের প্রতি দুর্বিনীত হয়ে ওঠল অনেক ইহুদি। কারণ অনেক দিন খ্রিস্টানেরা তাদের ওপর খবরদারি চালিয়েছে। ইহুদি জনতা জেরুসালেমে পৌছাতে শুরু করল, দুই শ বছরের মধ্যে এই প্রথমবার নগরীর রাজপথে তাদের দলে দলে দেখা যেতে লাগল। অনেকে নতুন টেম্পলের জন্য চাঁদা পাঠাতে লাগল। টেম্পল মাউন্টের বিধ্বস্ত বারান্দায় একটি অস্থায়ী সিনাগগ বানানো হলো। জুলিয়ান হয়তো খ্রিস্টান অধিবাসীদের বলে থাকবেন যে তারা যেন ইহুদিদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়। তিনি তার পণ্ডিত্য বন্ধু অ্যালিপিয়াসকে টেম্পল নির্মাণকাজ তদারকিতে নিয়োগ করলেন, নির্মাণসামগ্রী জড়ো হতে লাগল। বিশেষ রৌপ্য যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা হলো, কারণ বেদী নির্মাণে লোহা ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। ৩৬৩ সালের ৫ মার্চ জুলিয়ান ও তার সেনাবাহিনী পারস্যের উদ্দেশ যাত্রা করলেন। সম্রাট তার পৌত্তলিক দর্শনের সত্যতা এই অভিযানের মাধ্যমে সেখানে প্রমাণ করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ফেরার পথে তিনি তার বিজয় উৎসবের অংশ হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে টেম্পলকে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসর্গ করবেন। সম্রাট রওনা হওয়ার পর ইহুদি শ্রমিকেরা পুরনো টেম্পলের ভিত্তি বের করার কাজ শুরু করে, আবর্জনা, জঞ্জালের স্তূপ পরিষ্কার করতে থাকে। এপ্রিল ও মে মাসজুড়ে কাজ চলতে থাকে। গ্যালিলির প্যাট্রিয়ার্ক ও রাব্বিরা উদ্যোগটি নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। তখন তাদের মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যে মেসাইয়াই কেবল টেম্পলটি আবার নির্মাণ করতে পারেন : কোনো মূর্তিপূজকের নির্মিত টেম্পল কিভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট হতে পারে? আর জুলিয়ান যদি পারস্য থেকে ফিরে না আসেন তবে কী হবে?

এখন পবিত্র নগরীর প্রতি খ্রিস্টানদের দাবি পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে যে রাজকীয় নির্মাণ কর্মসূচি চলছে, তা নিয়ে তাদেরই ভাবার পালা। ৫০ বছর ধরে চার্চের শক্তি দৃশ্যত বেড়েই চলেছিল। কিন্তু জুলিয়ানের ধর্ম ত্যাগ খ্রিস্টানদের দেখিয়ে দিয়েছে, তারা সত্যিই কতটা অরক্ষিত। পুরনো পৌত্তলিক ধর্ম তখনো বিকশিত হচ্ছিল, অনেক বছর ধরে চার্চের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ পঞ্জিভূত হয়ে ওঠেছিল। জুলিয়ানের ফরমান প্রকাশিত হওয়ার পর পানেয়াস ও সেবাস্তেতে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সত্যিই দাঙ্গায় মত্ত হয়েছিল পৌত্তলিকরা। পুরনো ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জুলিয়ানের পরিকল্পনা কোনো অবাস্তব স্বপ্ন ছিল না এবং খ্রিস্টানেরা তা জানত। টেম্পল মাউন্টের কাজ শুরু করার দিনটিতে জেরুসালেমের খ্রিস্টানেরা ম্যারটারিয়ামে সমবেত হয়ে এই বিপর্যয় রুখে দিতে ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা করতে লাগল। তারপর তারা শোভাযাত্রা করে মাউন্ট অলিভেসে গিয়ে ইহুদি সাম গাইল। তারা একে নিজেদের করে নিয়েছিল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে খ্রিস্টানেরা যে স্থান থেকে ইহুদিদের পরাজয়ের কথা ভেবেছে, এখন সেখান থেকেই তারা ভীতবিহ্বলভাবে টেম্পল প্লাটফর্মে উদ্দীপ্ত তৎপরতা দেখল। তারা তাদের চার্চের উত্থানের সাথে ইহুদি ধর্মের পতনকে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে নিচে ইহুদি কারিগরদের কাজকে খ্রিস্টান বিশ্বাসের আবরণকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে বলে মনে করল। অবশ্য বিশপ সাইরিল তাদেরকে আশাহত না হতে অনুরোধ করল : তিনি দৃঢ়বিশ্বাসে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে নতুন টেম্পল কখনো নির্মিত হবে না।

সাইরিলের ভবিষ্যদ্বাণী দৃশ্যত ২৭ মে সত্যে প্রমাণিত হলো। ভূমিকম্পে পুরো নগরী কেঁপে ওঠল। খ্রিস্টানেরা একে ঐশী প্রতিশোধ বলে মনে হলো। প্লাটফর্মের নিচের ভল্টগুলোতে আগুন লেগে যায়। ভূগর্ভস্থ কুঠুরিগুলোতে জমে থাকা গ্যাস বিস্ফোরিত হয়ে সেখানে জমানো ভবননির্মাণের সামগ্রীতে আগুন ধরে যায়। অ্যালিপিসের সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাটি থেকে বিশাল বিশাল 'আগুনের বল' (গ্লোবি ফ্লেমেরাম) বিস্ফোরিত হয়, অনেক কারিগর আহত হয়। এই সময়ে জুলিয়ান দজলা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তিনি তার নৌকার সেতু পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তার সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ ছিল না। ফলে অ্যালিপিয়াস সম্ভবত এই বিপর্যয়ের পর রণাঙ্গন থেকে নতুন খবর না

আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পর জুলিয়ান যুদ্ধে নিহত হন, জোভিয়ান নামের এক খ্রিস্টান নিজেকে নতুন সম্রাট ঘোষণা করেন।

এই 'অলৌকিক' ঘটনার পর খ্রিস্টানেরা তাদের উল্লাস গোপন করার কোনো চেষ্টা করেনি : মাউন্ট অলিভস থেকে গলগোথা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিশাল ক্রুশ আকাশে দেখা যাওয়ার কথা ওঠল। অনেকে এমন দাবিও করল যে জেরুসালেমে অনেক পৌত্তলিক ও ইহুদির পোশাকে রহস্যজনকভাবে ক্রুশ দেখা গেছে। এই চরম উলট-পালটে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মধ্যে বৈরিতাই কেবল আরো তীব্র হয়েছে। জোভিয়ান আবার জেরুসালেম ও এর আশপাশের এলাকায় ইহুদিদের নিষিদ্ধ করেন। তারা যখন অ্যাভ মাসের ৯ তারিখে টেম্পলে এলো শোক জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে, তখন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে নতুন কষ্ট পরিষ্কারভাবে দেখা গিয়েছিল। রাব্বি বেরাকিয়া লিখেছেন, 'তারা নীরবে এলো, নীরবেই চলে গেল। তারা কাঁদতে কাঁদতে এসে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিলো। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও নগরীর চার দিকে শোভাযাত্রার মতো অনুষ্ঠান দিয়ে তা শেষ হলো না। খ্রিস্টানেরা এসব শাস্ত্রাচারকে নতুন অনাচার বিবেচনা করেছিল। বাইবেল বিশেষজ্ঞ জেরমে এই 'দুর্দশাগ্রস্ত ইতর লোকজনকে টেম্পল মাউন্ট পর্যন্ত এগিয়ে যেতে দেখেছেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে তাদের নিস্তেজ দেহ ও ছেড়া পোশাক ছিল তাদের ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সুস্পষ্ট চিহ্ন। ইহুদিরা সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য' নয় বলে তিনি সমাপ্তি টেনেছেন। যিশু ও পল উভয়েই সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে দানশীলতাকে যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সেই শিক্ষার প্রতি খুব কমই নজর দিয়েছেন বলে তার কথাতেই বোঝা যাচ্ছে। জেরোমেকে ক্রুদ্ধ করে চতুর্থ শতকের শেষ নাগাদ ইহুদিরা দৃশ্যত তাদের অবস্থান পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল। তারা তখনো দাবি করে আসছিল যে প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হবে। তারা আস্থার সাথে জেরুসালেমের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছিল 'প্রভুর ধর্মস্থান পুনঃনির্মিত হবে।' সময়ের শেষ ভাগে মেসাইয়া আসবেন, স্বর্ণ ও রত্নসম্ভার দিয়ে নগরী পুনঃনির্মাণ করবেন।

খ্রিস্টানেরা ভুলে যায়নি যে তারা তাদের পবিত্র নগরীটি প্রায় হারাতে বসেছিল। আর তাদের ক্ষমতায় থাকাটা নিশ্চিত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা উচিত হবে না। ফলে তারা সাধারণভাবে ফিলিস্তিনে ও বিশেষভাবে জেরুসালেমে প্রবল খ্রিস্টান উপস্থিতি প্রতিষ্ঠায়

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো, যাতে কোনোভাবেই আবার তাদের উৎখাত করা না যায়। খ্রিস্টানেরা ধীরে ধীরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে শুরু করায় নগরীর চরিত্র বদলে যেতে থাকে। ৩৯০ সাল নাগাদ নগরী সন্ন্যাসী ও নানে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, বিপুলসংখ্যায় বিদেশী পর্যটকেরা জেরুসালেমে আসছিল। পর্যটকেরা দেশে ফিরে গিয়ে পবিত্র নগরী ও এর মুগ্ধকর উপাসনাপদ্ধতির সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিত। অনেকে আবার স্থায়ীভাবে জেরুসালেমে থেকে যেত। জেরোমে ছিলে। চতুর্থ শতকের শেষ দিকে পাশ্চাত্য থেকে আসা নতুন অভিবাসীদের মাত্র একজন : তাদের অনেকে আসতেন তীর্থযাত্রী হিসেবে, অন্যরা ছিল জার্মান ও হুন। তারা ইউরোপের রোমান সাম্রাজ্য থেকে সরে আসতে শুরু করেছিল। উদ্দীপ্ত স্প্যানিশ খ্রিস্টান প্রথম থিওদোসিয়াস ৩৭৯ সালে সম্রাট হওয়ার পর পাশ্চাত্য থেকে এই ঢল আরো বাড়ে। তিনি ৩৮০ সালের ২৪ নভেম্বর কনস্টানটিনোপলে পৌছেন ধার্মিক স্প্যানিয়ার্ডদের সাথে নিয়ে। এসব লোক তার আগ্রাসী গোঁড়ামি বাস্তবায়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। থিওদোসিয়াস ৩৮১ সালে রোমান সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্মমত হিসেবে নাইসেন খ্রিস্টধর্মকে ঘোষণা করার মাধ্যমে অ্যারিয়ান বিতর্কের অবসান ঘটা। ১০ বছর পর তিনি সব ধরনের পৌত্তলিক বলি প্রায় নিষিদ্ধ করেন, পুরনো মন্দির ও ধর্মস্থান বন্ধ করে দেন। রাজদরবারে সম্রাজ্ঞী আলিয়া ফ্লাসিলাসহ অনেক নারী ইতোমধ্যেই রোমে পৌত্তলিক ধর্মস্থানে হামলা চালিয়ে ও শহিদদের সম্মানে জাঁকজমকপূর্ণ চার্চ নির্মাণ করার মাধ্যমে স্বতন্ত্র পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। এখন তারা প্রাচ্যে এই জঙ্গি খ্রিস্টধর্ম নিয়ে গেলেন।

জেরুসালেমে থিওদোসিয়াস আমলের খ্রিস্টানদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মাউন্ট অলিভেসের উপরে থাকা হোস্টেলটি। থিওদোসিয়াসের সিংহাসনে আরোহণের বছর ৩৭৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন জেরোমের পুরনো বন্ধু রুফিনাস ও স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত অভিজাত নারী মেলেনিয়া। স্বামীর মৃত্যু পর তিনি সন্ন্যাসব্রত বেছে নিয়ে প্রতাপশালী খ্রিস্টান পণ্ডিত হয়েছিলেন। সন্তানেরা নিজেরা নিজেদের দেখভালের মতো বয়সে পৌঁছার পর তিনি ইউরোপ ত্যাগ করে মিসর ও লেভেন্টের নতুন মঠগুলো সফর করে জেরুসালেমে এসে নিজস্ব মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। মাউন্ট অলিভেসে নারী ও পুরুষেরা প্রার্থনা ও অনুশোচনামূলক জীবন অতিবাহিত করতে পারত, শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। এখানে তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়

ও আতিথিয়তা প্রদান করা হতো। মেলেনিয়া ও রুফিনাস নগরীর জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তাদের সন্ন্যাসী ও নানেরা উপাসনাপদ্ধতিতে উন্নতি বিধান, পাশ্চাত্য থেকে আসা তীর্থযাত্রীদের- তারা উপাসনায় ব্যবহৃত গ্রিক বুঝত না আবার স্থানীয় অনুবাদকদের আরামিকও বোধগম্য হতো না- জন্য দোভাষীর ভূমিকায় পালন করত। মেলেনিয়া ও রুফিনাস উভয়ে ছিলেন আবেগময়ী নিসেন খ্রিস্টান, তারা কনস্টানটিনোপোলের রাজদরবার ও বিদেশের সন্ন্যাসী আন্দোলনগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন।

জেরোমে ও তার বন্ধু পলা ৩৮৫ সালে জেরুসালেমে তীর্থযাত্রা করার সময় মেলেনিয়া হোস্টেলেই অবস্থান করেছিলেন। তারা বেথলেহেমে তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের মডেলে পরিণত হয়েছিলেন। প্রথমে জেরোমে আকাশছোঁয়া প্রশংসা করেছিলেন মেলেনিয়ার। কিন্তু তিনি ছিলেন খিটখিটে স্বভাবের লোক। খ্রিস্টান দানশীল জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ধর্মতত্ত্ব বিবাদের কারণে মেলেনিয়ার সাথে কঠিন দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। এরপর জেরোমে আর কখনো মাউন্ট অলিভেসের এস্টাবলিশমেন্ট সম্পর্কে একটি ভালো কথা ও বলেননি। তিনি এখানকার আয়েসি জীবনযাত্রার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন। এটি তার কাছে ক্রোয়েসাসের সম্পদের কথা স্মরণ করিয়ে দিত।' তিনি মেলেনিয়ার সম্প্রদায়ের মার্জিত জীবনযাত্রা, কসমোপলিটান পরিবেশ ও রাজদরবারের সাথে সম্পর্ক রাখার সমালোচনা করেন। তার যুক্তি ছিল, জেরুসালেমের পৌত্তলিক কর্মব্যস্ততার চেয়ে সন্ন্যাসী জীবনের জন্য বেথলেহেমের 'নির্জনতা' অনেক বেশি উপযোগী। তার কাছে জেরুসালেম হলো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, গ্যারিসন, পতিতা, অভিনেতা, ভাঁড় ও নগরীতে সাধারণভাবে পাওয়া যায় এমন সবকিছুসহ একটি জনাকীর্ণ নগরী। বেথলেহেম সম্প্রদায় ছিল অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ ও অন্তর্মুখী। সেখানকার লোকজনই ছিল জেরোমের প্রধান প্রশংসাকারী। অনেক বছর পর্যন্ত তিনি মেলেনিয়ার বিরুদ্ধে তিক্ত প্রচারণা চালান। তবে মেলেনিয়ার খ্যাতি পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার অনুকরণীয় চরিত্রে তীর্থযাত্রীরা অব্যাহতভাবে উদ্দীপ্ত হতো।

এদের একজন ছিলেন পোয়েমেনিয়া। তিনি ছিলেন রাজপরিবারের সদস্য। তিনিও ৩৯০ সালে জেরুসালেমে আসার আগে উত্তর মিসরের মঠগুলো সফর করেছিলেন। খ্রিস্টের স্বর্গে আরোহণের স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য জেরুসালেমে তিনি মাউন্ট অলিভেসের শীর্ষে একটি চার্চ নির্মাণ করেন। পোয়েমেনিয়ার চার্চটি টিকে থাকেনি। এটির পাশে ছিল স্কাইলাইনে আধিপত্য বিস্তার করা একটি বিশাল, চকচকে ক্রুশ। এটি ছিল গোলাকার চার্চ, পাশের একটি পাথর সম্পর্কে তীর্থযাত্রীদের বিশ্বাস ছিল যে এতে তারা খ্রিস্টের পায়ের চিহ্ন দেখতে পান। কাছাকাছি আরো অনেক ভবন দেখা যেতে থাকে। কিদরন ভ্যালির এক প্রান্তে ভার্জিন ম্যারির কবরের পাশে একটি চার্চ নির্মাণ করা হয়েছিল। ভ্যালির অপর প্রান্তে অন্য সন্ন্যাসীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বেনে হেজির কবরটি ছিল জেমস দি জাদিকের কবর। তারা এটিকে চার্চে রূপান্তরিত করেন। ৩৯০ সালের দিকে গার্ডেন অব গেথসেম্যানের স্থানে রাজসিক একটি চার্চ নির্মাণ করা হয়। থিওদোসিয়ান খ্রিস্টধর্ম ধর্মীয় স্থানগুলোর ওপর বিপুল গুরুত্ব দিত, এসব চার্চ জেরুসালেম সামনে নতুন নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি করত। নগরীর পৌত্তলিকেরা এখন ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্বব্যঞ্জক হওয়া খ্রিস্টান উপস্থিতির মুখোমুখি হতে লাগল। নতুন নতুন চার্চ প্রাচীরগুলোর ভেতরে ও বাইরে আত্মপ্রকাশ ও সম্প্রসারিত হতে লাগল।

খ্রিস্টানেরাও তাদের প্রধান উৎসবের দিনগুলোতে নগরীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করত। ওই সময় বিপুলসংখ্যক মানুষ চার্চগুলো থেকে ঢলের মতো রাস্তায় নেমে এসে পুরো জেরুসালেম চক্কর দিত, গ্রাম এলাকা প্রদক্ষিণ করত। খ্রিস্টধর্ম এখন আর গোপন ধর্ম নয় : লোকজনকে আর ইউচারিস্ট উদযাপনের জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে একে অপরের বাড়ি গিয়ে সাক্ষাত করতে হয় না। তারা তাদের নিজস্ব গণ-উপাসনা পদ্ধতি বিকাশ ঘটায়। রোমে তারা শহিদদের কবরগুলোর পাশে সমবেত হতে অভ্যস্ত হয়েছে, তাদের আবেগ ও মৃত্যুর বর্ণনা শুনে তারা জোরে কান্না আর চিৎকারে মেতে ওঠে। তারা বিশপকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা করে এক চার্চ থেকে অপর চার্চে যায়, পুরনো পৌত্তলিক রাজধানীর ওপর তাদের নিজস্ব ভৌগোলিক ভাষ্য আরোপ করে। জেরুসালেমে একই ধরনের ঘটনা ঘটছিল। সেটি পৌত্তলিক আলিয়া থেকে খ্রিস্টান পবিত্র নগরীতে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছিল। আমরা এটি দেখি ইগেরিয়ার লেখালেখিতে। এই ধর্মপ্রাণ স্প্যানিশ তীর্থযাত্রী

৩৮১ সালে কনস্টানটিনোপল থেকে জেরুসালেমে এসেছিলেন। ওই সময়েই বিশপরা কাউন্সিলে জড়ো হয়েছিলেন। এই কাউন্সিলেই অবতারবিষয়ক অ্যাথানাসিয়াসের মতবাদ চার্চের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। ১২ইজেরিয়া ধর্মস্থানের প্রতি থিওদোসিয়ান উদ্দীপনার প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। তিনি নিকটপ্রাচ্যের বিশাল এলাকা সফর করেন, সুদূরের মেসোপটেমিয়ার মতো স্থানেও গিয়েছিলেন, বাইবেলকে 'ব্লু গাইড' হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি ও তার সফরসঙ্গীরা যেখানেই কোনো পবিত্র স্থানের সন্ধান পেতেন, সেখানেই 'ওই স্থানবিষয়ক' ধর্মগ্রন্থ থেকে যথার্থ বাক্য পাঠ করতেন। তার বর্ণনায় বারবার 'ওই স্থানবিষয়ক' পরিভাষাটি এসেছে। ইজেরিয়া ছিলেন বর্দুর বাকসংযম তীর্থযাত্রীর চেয়ে অনেক বেশি উচ্ছ্বাসপ্রবণ : বেশির ভাগ খ্রিস্টান যেসব স্থান দেখে কেবল কল্পনা করতে পারত, তিনি সেখানে নিশ্চিতভাবেই রোমাঞ্চিত হতেন। বাইবেল তার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছিল। সাইরিল যেমনটা বলেছেন, অলৌকিক ঘটনা বা ঈশ্বরের মূর্ত হওয়ার কোনো স্থানের নৈকট্য এসব দূরের ঘটনাকে আরো কাছে নিয়ে আসে, বাইবেল পাঠ পুরনো ধর্মীয় আচারের পুনরাবৃত্তি হয়ে যা অতীতকে বর্তমান বাস্তবতায় পরিণত করে। এই নতুন খ্রিস্টান শাস্ত্রাচার ও পুরনো টেম্পল মতবাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল কেবল এটুকুই যে পুরনো টেম্পল মতবাদে আদিম সময়ের পৌরাণিক ঘটনাগুলোর কথা স্মরণ করা হতো, আর নিউ টেস্টামেন্টের ঘটনাগুলো ছিল তুলনামূলক সাম্প্রতিক অতীতের বিষয়।

ইগেরিয়া জেরুসালেমে পৌছামাত্র এই পবিত্র স্থান-দর্শন ধারণাটি যিশুর জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পবিত্র ঘটনাবলীতে আনুষ্ঠানিক উপাসনায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। পুরো খ্রিস্টান সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট স্থানের উপযোগী করে তৈরি পরিকল্পিত শোভাযাত্রায় অংশ নিতে থাকে। এগেরিয়া গলগোথায় আঙিনাগুলো পূর্ণ হয়ে রাস্তা ছাপিয়ে যাওয়া লোকজনের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। ১৪ সেপ্টেম্বর নগরী মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও মিসরের সন্ন্যাসী ও নানদের দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। তারা এসেছিল এনকেইনিয়ার আট দিন উদযাপন করতে। কনস্টানটাইনের নতুন জেরুসালেম ও হেলেনার আসল ক্রুশ আবিষ্কারের প্রতি নিবেদন করে আয়োজন করা হতো এই উৎসবের। এনকেইনিয়াও সোলায়মানের ইহুদি টেম্পল উৎসর্গ করার অনুষ্ঠান সুক্কুথের সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ

ছিল। খ্রিস্টানেরা একে তাদের এনকেইনিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী বিবেচনা করে আরো গৌরবজনক ঘটনা মনে করেছিল। তীর্থযাত্রীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা ভালো থাকতে হতো : জেরুসালেমে উপাসনা উদযাপনে কেবল সুমোহন সুরে ভজন গওয়া বা যাদকের বক্তৃতা শোনার মধ্যেই সীমিত ছিল না। অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের পায়ের ওপর কয়েক দিন ও কয়েক রাত ভর করে থাকতে হতো, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটতে হতো। তারা 'ক্রিসমাস উইক' উদযাপন করতেন। এটি শুরু হতো ৬ জানুয়ারি বেথলেহেম থেকে জেরুসালেম পর্যন্ত প্রতিদিন সৌম্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। তারা ভোর হওয়ার আগে পর্যন্ত সদ্য সম্পূর্ণ হওয়া অ্যানাস্তাসিস রোতানদা দিয়ে এখন ঘিরে থাকা কবরের কাছে পৌঁছাত না, সেখানে ভারা চার ঘণ্টার ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত হওয়ার আগে অল্প একটু বিশ্রাম নিত। পাম সানডের বিকেলে লোকজন ধর্মীয় উপাসনার জন্য মাউন্ট অলিভেসের ওপর থাকা ইলেওনা ব্যাসিলায় উপস্থিত হতো। এরপর ঢালু বেয়ে নেমে কিদরন ভ্যালি দিয়ে নগরীতে ফিরে আসত। বিশপ সাইরিল একটি গাধার পিঠে চড়ে শোভাযাত্রার পেছনে থাকতেন, ঠিক যেভাবে যিশু উপস্থিত হয়েছিলেন জেরুসালেমে। এসময় শিশুরা খেজুর ও জলপাই শাখা দোলাত, সমবেত সঙ্গীত গাইত, প্রায়ই উচ্চশব্দে বলত : 'তাদের ওপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, যারা প্রভুর নামে এখানে এসেছে।' ইগেরিয়া আমাদের বলছেন যে শোভাযাত্রাটি ধীরে ধীরে এগুত, ফলে লোকজনকে উদ্বেগে থাকতে হতো না, অ্যানাস্তাসিসে পৌছাতে পৌছাতে গভীর রাত হয়ে যেত। পেন্টেকস্ট ছিল বিশেষভাবে কষ্টসাধ্য উৎসব। সাধারণ সানডে ইউচারিস্টের পর সাইরিল 'ইসপো লোকো'র আত্মার অবতরণ উদযাপন করতে সায়ন ব্যাসিলিকায় শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিতেন, তবে অনুষ্ঠান সেখানেই সীমিত থাকত না, লোকজন বিকেল বেলা অ্যাসসেনশনের স্মরণে মাউন্ট অলিভেসের শীর্ষে হাঁটাহাঁটি করত। এরপর তারা ধীরে ধীরে ও সংযতভাবে নগরীতে ফিরে আসত, সান্ধ্যকালীন প্রার্থনার (কনস্টানটাইনের ম্যারটিরিয়ামের সান্ধ্যকালীন সার্ভিস) জন্য ইলেওনা ব্যাসিলিকায় থামত। সবশেষে হলি সায়নের ব্যাসিলিকায় মধ্যরাতের প্রার্থনা করত।

এসব উদযাপন নিশ্চিতভাবেই খ্রিস্টান অভিজ্ঞতা বদলে দিয়েছিল। এখন থেকে যিশুর জাগতিক জীবনের ব্যক্তিগত ঘটনাবলীর প্রতি আগ্রহ ছিল সামান্য। যিশুর মৃত্যু ও

পুনরুত্থান একটি একক ঐশী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। মনে করা হতে থাকে যে মানব-সত্তায় প্রকাশিত এই অতিপ্রাকৃত ঘটনা লোগোসের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে ফিরে গেছে। তবে এই সময় সন্ন্যাসী, নান, পাদ্রি, সাধারণ মানুষ ও জেরুসালেমের তীর্থযাত্রীরা কিছু বিশেষ সময়ের জন্য সুনির্দিষ্ট ঘটনাবলীর ওপর নজর দিতে উৎসাহিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইস্টারের আগের সপ্তাহে তারা যিশুর পদাঙ্ক অনুসরণ করত, যিশুর সাথে জুদাসের বিশ্বাসঘাতকতা, তার শেষ নৈশভোজ, তার গ্রেফতারবিষয়ক গসপেলের ভাষ্যে থাকা প্রাসঙ্গিক স্থানগুলো পাঠ করত। এটি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী আবেগময় অভিজ্ঞতা। ইগেরিয়া আমাদের বলছেন যে জনতা যখন গেথসেম্যানে চার্চে যিশুর গ্রেফতারের কাহিনী শুনত, তখন 'সেখানে লোকজনের মধ্যে কান্নার সাথে এমন গোঙানি ও আর্তনাদ শোনা যেত যে প্রায় পুরো নগরীতে কাতরধ্বনি শোনা যেত। ১৩ মানুষ যিশুর প্রতি নতুন সহানুভূতি দেখা গিয়েছিল, লোকজন তার সাথে দুর্ভোগের অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে বাঁচতে শিখেছিল, দিনে দিনে তারা এই বেদনা তার কাছে কী ছিল তা ক্রমবর্ধমান হারে উপলব্ধি করতে শিখেছিল। ইউসেবিয়া খ্রিস্টানদের বলেছিলেন দুনিয়াতে তার সংক্ষিপ্ত বসবাসের সময় সাময়িকভাবে লোগোসের সাথে তার দৈহিক যে অবয়ব গ্রহণ করেছিলেন, তা ধারণ না করতে। তবে জেরুসালেম উপাসনা তা পুরোপুরি বদলে দেয়। খ্রিস্টানেরা এখন খ্রিস্টের মানব প্রকৃতিতে মনোনিবেশন করেছে। কনস্টানটাইন নতুন জেরুসালেম প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই গলগোথার পাথরটি ছিল কবরটির কাছে দাঁড়ানো : পাথরটি ও সেইসাথে অ্যানাস্তাসিসের আশপাশের স্থানে প্রতিটি দিন আলাদা প্রার্থনা হতো। ফলে লোকজন ক্রুশবিদ্ধকরণ নিয়ে ধ্যান করতে অভ্যস্ত হওয়ার বিষয়টি সুদূরের ঘটনা হিসেবে মনে করে নিয়েছিল। গুড ফ্রাইডেতে পাথরের পেছনে থাকা ছোট চ্যাপেলে একজন একজন করে বিশ্বাসী এগিয়ে গিয়ে সত্যিকারের ক্রসের ভগ্নাবশেষে চুমু খেত। ইউসেবিয়াস কখনো ক্রুশবিদ্ধকরণের ওপর খুব বেশি জোর দেননি, তবে এই মানসিক চাঞ্চল্য উদ্রেককারী উৎসবগুলো খ্রিস্টের মৃত্যুর মানব প্রভাব বিবেচনা করতে এবং মৃত্যুর জন্য মূর্ত হওয়ার অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করতে খ্রিস্টানদের বাধ্য করত।

হলি সেপালচার চার্চের ছাদের উপর থাকা ইথিওপিয়ান মঠের দেয়ালের বিপরীতে শোভাযাত্রার ক্রুশগুলো স্তূপ করে রাখা হতো। চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টানেরা যিশুর পদাঙ্ক

অনুসরণ করে জেরুসালেমের রাস্তাগুলো দিয়ে শোভাযাত্রা বের করত। ফলে অবতারের অর্থ-সম্পর্কিত বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করত।

চলার পথে পড়া কোনো কিছু আর দূরে সরিয়ে দেওয়ার বস্তু বিবেচিত হতো না; খ্রিস্টানেরা একে ঐশী কিছু তাদের সামনে উপস্থিতি বলে মনে করতে শুরু করেছিল। তীর্থযাত্রীরা পুরোপুরি স্পর্শগ্রাহী আধ্যাত্মিকতা বিকাশ ঘটাচ্ছিল। একসময় যিশুর ছোঁয়া পেয়েছিল, এমন পাথরগুলো স্পর্শ করতে, চুমু খেতে, অবলেহন করতে চাইত তারা। জেরোমের শিষ্য পলা যখন কবরে এসেছিলেন, তখন তিনি ইস্টার সানডে সকালে গুহা থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরটিতে চুমু খেয়েছিলেন। তারপর 'ভয়াবহ তৃষ্ণার্থ কোনো লোক দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পানির কাছে এসে যা করেন, ঠিক একইভাবে যিশু যেখানে শুয়েছিলেন, সেই স্থানটি পলা অবলেহন করেন।১৪ পলার সমসাময়িক নোলার পলিনাস ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : 'জেরুসালেমের প্রতি লোকজনের আকৃষ্ট হওয়ার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল যিশু যেখানে মূর্তভাবে উপস্থিত ছিলেন, ওইসব স্থান দেখা ও স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা। বিশ্বের অন্যান্য অংশে শহিদদের হাড়, যাতে তাদের পবিত্রতা সংশ্লিষ্ট থাকত, স্পর্শ করে ঐশী শক্তির সংস্পর্শ লাভ করত। মহান কাপ্পাডোসিয়ান ধর্মতাত্ত্বিক নিসার গ্রেগরি (৩৩৮-৯৫) উল্লেখ করেছেন, 'তারা চোখ, মুখ, কান ও সব ইন্দ্রিয় সক্রিয় করে। ১৬ ঈশ্বরই মানবীয় আকার ধারণ করেছেন মনে করে খ্রিস্টানেরা এখন ঐশী সত্তার দৈহিক স্পর্শ লাভ ও আশীর্বাদ সঞ্চালন করতে সক্ষম হতে শুরু করেছিল। গ্রেগরি নিজে ফিলিস্তিন সফর করেছেন। তীর্থযাত্রার নতুন ফ্যাশন সম্পর্কে তিনি সন্দিহান থাকলেও তিনি স্বীকার করেছেন যে জেরুসালেমের পবিত্র স্থানগুলো ছিল ভিন্ন। তারা 'খোদ জীবনের পদাঙ্গ লাভ করেছে।১৭ ঈশ্বর ফিলিস্তিনে নিজে আলামত রেখে গেছেন, ঠিক যেভাবে সুগন্ধী ব্যবহারকারী কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলেও সেখানে ঘ্রাণ দীর্ঘ সময় থাকে। তীর্থযাত্রীরা এই সময় সাথে করে পবিত্র স্থানগুলোর পাথর, মাটি বা সেখানে জ্বালানো বাতির তেল দেশে নিয়ে যেত। এক বিশেষভাবে উন্মাদ তীর্থযাত্রী সত্যি সত্যি গুড ফ্রাইডেতে ট্রু ক্রুশে' চুমু খাওয়ার সময় এ থেকে কিছু অংশ কামড়ে নিয়েছিল। লোকজন জেরুসালেমের ঐশী উপস্থিতিকে তাদের নিজ শহরে সক্রিয় ও সহজলভ্য করে তুলতে চেয়েছিল।

খ্রিস্টান প্রত্নতত্ত্ব গলগোথায় ব্যাপক খনন কার্যক্রম শুরু করেছিল। এখন ফিলিস্তিনের অন্যান্য অংশেও নতুন নতুন খননে সন্ন্যাসীদের দেহ ও বাইবেলের নায়কেরা বের হয়ে আসতে লাগলেন। যোশেফ দি প্যাট্রিয়াকের দেহ হিসেবে যেটাকে মনে করা হলো সেটি শেচেম, এখন নেয়াপোলিশ নামে পরিচিত, স্থানের কবর থেকে তোলা হয়েছিল। লাশটি কনস্টানটিনোপলে স্থানান্তর করা হলো। জেরোমে জানিয়েছেন, নবী স্যামুয়েলের হাড়গোড় যখন ফিলিস্তিন থেকে রাজকীয় রাজধানীতে নেওয়া হচ্ছিল, তখন রাস্তায় রাস্তায় লোকজন লাইন ধরে দাঁড়িয়েছিল; তাদের মনে হয়েছিল, খোদ নবী উপস্থিত রয়েছেন।১৮ পবিত্র হাড়গোড়ের এসব দখল ছিল নতুন খ্রিস্টান নগরী কনস্টানটিনোপলকে পবিত্র অতীতের সাথে সম্পর্কিত করার চেষ্টা। অন্যথায় সেই অতীত থেকে এই নগরী বঞ্চিত থাকত। আবার তা ইহুদি ইতিহাসকেও সংশোধনের চেষ্টা ছিল : চার্চ যদি তার দাবি অনুযায়ী নতুন ইসরাইল হয়ে থাকে, তবে ওল্ড কভেন্যান্টের এসব সন্ন্যাসীর দুরাচারী ইহুদিদের নগরীর চেয়ে খ্রিস্টান ভূখণ্ডের আবাসভূমিতেই থাকা অনেক বেশি যৌক্তিক। ৪১৫ সালে ইস্টার্ন সম্রাট দ্বিতীয় থিওদোসিয়াস প্রকাশ্যে ইহুদি প্যাট্রিয়ার্ক দ্বিতীয় গামালিয়েলকে তিরস্কার করে তার কাছ থেকে রোমান পদবি (প্রায়েফেকটাস প্রায়েটোরিও) কেড়ে নেন। সম্রাট এর মাধ্যমে এমন এক প্রক্রিয়ার সূচনা করেন যার পরিণতিতে ৪২৯ সালে প্যাটিয়ার্ক পদটিরই অবসান ঘটে। এর জের ধরে ইহুদি ধর্মের অনিবার্য পতন ত্বরান্বিত করবে বলে চার্চের কর্মকর্তারা বিশ্বাস করতেন। ১৯

এরপর ৪৫ সালে এক যাজক আরেকটি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিস্কার করেন। এটি ইহুদি প্যাট্রিয়ার্কের নিদারুণ লজ্জার সাথে সম্পর্কিত ছিল। উপকূলীয় সমভূমি কেফার গামালা গ্রামের যাজক লসিয়ান স্বপ্নে দেখেছিলেন যে সেন্ট পলের শিক্ষক রাব্বি প্রথম গামালিয়েল স্বপ্নে তার সামনে হাজির হয়েছেন। মহান ফারিসি তাকে বলেন যে তিনি গোপনে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ইহুদিদের ভয়ে তা গোপন করেছিলেন। প্রথম খ্রিস্টান শহিদ স্টেফেনকে যখন তাওরাত ও টেম্পলের ওপর আক্রমণের জন্য জেরুসালেমের প্রাচীরের বাইরে হত্যা করা হয়, তখন গামালিয়েল লাশটি গ্রহণ করে গামালায় তার এস্টেটে কবর দিয়েছিলেন। পরে ওই কবরের পাশে তিনি নিজেও সমাধিস্থ হন। আরো পরে রাতে গোপনে যিশুর সাথে একবার সাক্ষাতকারী তরুণ ইহুদি

নিকোদেমাসও সেখানে সমাহিত হন। স্বপ্ন দেখার পর দিন লসিয়ান কিছু অনুসন্ধান করে হিব্রু খোদাইলিপিসহ তিনটি কবর আবিষ্কার করেন। স্বপ্নে রাব্বি যেমনটি বলেছিলেন, এর সাথে তা একেবারে মিলে গেল। সাথে সাথেই তিনি তার আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা তার বিশপকে জানান।

এই ঘটনার সময় লিড্ডার কাছে (বর্তমানে একে বলা হয় ডায়য়োসপলিস) চার্চ কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন জেরুসালেমের বিশপ জন। তিনি ব্রিটিশ সন্ন্যাসী পেলেজিয়াসের ভাগ্য নির্ধারণে বসেছিলেন। এ লোকটি আদি পাপের মতবাদ অস্বীকার করে জেরুসালেমের পাশ্চাত্য খ্রিস্টানদের কলঙ্কিত করছিলেন। অবশ্য জন নিজে পেলেজিয়াসের ধর্মতত্ত্বে তেমন ক্ষতিকর কিছু দেখতে পাননি। কিন্তু লসিয়ানের খবর শোনামাত্র তিনি সেবাস্তে ও জেরিকোর বিশপদের নিয়ে তড়িঘড়ি করে কেফার গামালায় যাত্রা করলেন। স্টেফেনের কবর খোলামাত্র মিষ্টি সুগন্ধে পুরো এলাকা ভরে গেল। লসিয়ান এ ব্যাপারে বলেছেন, 'আমাদের কাছে মনে হলো, আমরা স্বর্গে আছি।২০ শহিদদের কবরগুলোর ব্যাপারে এটি ছিল সাধারণ অভিজ্ঞতা। বতর্মানে স্বর্গে থাকা সন্ন্যাসীটির দেহ এই দুনিয়া ও পরবর্তী দুনিয়ার মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে। স্থানটি এর ফলে পবিত্রতার নতুন 'কেন্দ্রে' পরিণত হলো, যা পবিত্রতার রাজ্যে উপাসনাকারীদের নিয়ে যেতে সক্ষম এবং তাদেরবে ঈশ্বরের শক্তি ও আরোগ্যকারী উপস্থিতি দিতে পারে। ইউরোপে শহিদদের কবরে বিশ্বাসীরা পবিত্রতার স্পর্শযোগ্য অলৌকিক আভায় শান্তি পেত। শহিদদের আবেগময় কাহিনী জোরে জোরে পাঠ করার সময় ওই পবিত্র আভা উপাসনালয় পরিপূর্ণ থাকত, বাতাস সুগন্ধীতে মৌ মৌ করত, ঐশী প্রভাব লাভে ধন্য হয়ে লোকজন চিৎকার করে কাঁদত।২১ এখন সমগ্র ফিলিস্তিন থেকে লোকজন কেফার গামালায় আসতে শুরু করল, ৭৩ জন অসুস্থ লোক সুস্থ হয়ে গেল।

অবশ্য কেফার গামালাকে তীর্থযাত্রার কেন্দ্রে পরিণত হতে দেওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না জনের। তিনি বরং তার নিজের অবস্থান জোরদার করতে এই অলৌকিক আবিষ্কারকে ব্যবহার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। পূর্বসূরীদের মতো তিনিও জেরুসালেমের মর্যাদা বাড়াতে চাইছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি সব চার্চের মা হিসেবে মাউন্ট সায়নের ওপর সম্প্রতি

ব্যাসিলিকাটি পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। এখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, স্টেফেন এই নতুন ব্যাসিলিকায় সমাহিত হবেন, এটিই সঠিক ব্যাপার। তিনি তখন চার্চটিতে ডেকন হিসেবে কাজ করছিলেন। ২৬ ডিসেম্বর হাড়গোড় মাউন্ট সায়নে নিয়ে আসা হলো। অবশ্য খ্রিস্টানদের কাছে আরোগ্য ও ঐশী উপস্থিতি নিয়ে আসা এই আবিষ্কার ছিল ইহুদি ধর্মের প্রতি 'অনিবার্যভাবেই অনিষ্টকর। স্টিফেনের মারা যাওয়ার কারণ তিনি তাওরাত ও টেম্পলের ওপর আক্রমণ করেছিলেন; তিনি ইহুদিদের শিকার। মহান রাব্বি গ্যামালিয়েলের আবিষ্কার, পূর্বপুরুষ ও বর্তমান প্যাট্রিয়ার্কের একই নাম, প্যাট্রিয়ার্ক পদের ইহুদি সততা ক্ষতিগ্রস্ত করার গোপন খ্রিস্টান প্রয়াস ছিল। তখনো খ্রিস্টান বৃদ্ধি বিবেচনা করা হতো বর্তমান বিশ্বাসের প্রত্যাখ্যানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিষয় হিসেবে।

দ্বিতীয় থিওদোসিয়াসের দরবার ছিল তপস্যা চর্চার আবেগে আপ্লুত। বস্তুত, এটি ছিল মঠের মতো। সম্রাটের বোন পলচেরিয়া উৎসর্গ করা পবিত্র কুমারী হিসেবে এখানে বাস করতেন। অনিবার্যভাবে এ আমলটি জেরুসালেমের ভেতরে ও আশপাশের আশ্রমের পুনরুত্থান দেখেছিল। জেরোমের বৈরিতা মেলেনিয়া ও রুফিনাসের জন্য পবিত্র নগরীকে এত বিষাক্ত করে ফেলেছিল যে তারা ৩৯৯ সালে ইউরোপে ফিরে যেতে বাধ্য হন। অবশ্য মেলেনিয়ার নগরী ত্যাগ করার পেছনে পারিবারিক বিবেচনাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে ৪১৭ সালে তার নাতনি, সাধারণভাবে ছোট মেলেনিয়া নামে পরিচিত, স্বামী পিয়নিয়াসকে নিয়ে জেরুসালেমে আসেন। তারা ১৮০ জন সন্ন্যাসী ও নানের জন্য মাউন্ট অলিভেসে একটি নতুন দ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মেলেনিয়া পোমেনিয়ার চার্চের পাশে একটি শহিদগাহ, পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রীর উপাসনালয় নির্মাণ করেছিলেন। ২০ বছর পর ইবেরিয়া রাজ্যের জনৈক রাজপুরুষ পিটার, ২২ তিনি কনস্টানটিনোপলের রাজদরবারে বাস করছিলেন, তথাকথিত দাউদ টাওয়ারে একটি আশ্রম নির্মাণের জন্য জেরুসালেম আসেন। দাউদ টাওয়ার আসলে ছিল হেরড টাওয়ার হিপ্পিকাসের অংশবিশেষ। তিনি মাউন্ট অলিভেসে মেলেনিয়ার শহিদিগাহে তার জন্য পুরাতাত্ত্বিক উপহার নিয়ে আসেন।

জেরুসালেমের পবিত্রতার মাধ্যমে এই সুন্দর তবে পতিত অঞ্চল জুদা মরুভূমিতে উপনিবেশ গড়ার জন্য খ্রিস্টান বিশ্বের সব অংশ থেকে সন্ন্যাসীরা আসতে শুরু করেছিল। প্রথম দিকে আগত সন্ন্যাস পথিকৃতদের অন্যতম ছিলেন আর্মেনিয়ার সন্ন্যাসী ইথিমিনাস (মৃত্যু ৪৭৮)। তিনি মাসাদা ও বেথলেহেমের দর্শনীয় স্থানগুলোতে প্রায় ১৫টি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাকে তার সমসাময়িকেরা দ্বিতীয় আদম বিবেচনা করত : তার ক্যারিয়ার মানবতার জন্য নতুন যুগের সূচনা করেছিল বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে।২৩ তাদের আশ্রমগুলোতে সন্ন্যাসীরা বাগান করতেন, ফলের গাছ লাগাতেন, মরুভূমিকে বিকশিত করে তুলতেন, এই ভৌতিক রাজ্যকে ঈশ্বরের জন্য পুনরুদ্ধার করতেন। আর এর মাধ্যমে প্রতিটি বসতি হতো একটি নতুন ইডেন, একটি নতুন সূচনা। এখানে সন্ন্যাসীরা প্রথম আদমের মতো ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতায় স্বর্গীয় জীবনে বাস করতে পারতেন। আশ্রমগুলো তাই ছিল নতুন ধরনের পবিত্র স্থান, অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে খ্রিস্টান অভিযান। এখানে লোকজন বলত যে সন্ন্যাস জীবন এমন এক আদি সম্প্রীতি ও সামগ্রিকতায় ফিরিয়ে নিতে পারে যার জন্য মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে। অল্প সময়ের মধ্যেই ল্যাতিন, পারসিক, ভারতীয়, ইথিওপিয়ান ও আর্মেনিয়ানরা দল বেঁধে জুদার আশ্রমগুলোতে ভিড় করতে থাকে। ইথিমিনাসের অন্যতম প্রভাবশালী শিষ্য ছিলেন সাবাস (৪৩৯-৫৩১)। কাপ্পাডোসিয়ান এই লোক পরিকল্পিতভাবে জুদায় বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পবিত্র স্থানগুলোর সান্নিধ্য থাকায়। সব পবিত্র স্থানের মতো তার আশ্রমও স্বপ্নাবিভাবে ঈশ্বর দেখিয়ে দিয়েছিলেন। পাঁচ বছর পর্যন্ত সাবাস একাকী জেরুসালেম থেকে ৯ মাইল দক্ষিণের একটি উঁচু খাড়া পাহাড়ে (এখান থেকে ব্রুক কিদরন দেখা যেত) বাস করতেন। তারপর শিষ্যরা তার সাথে যোগ দিতে থাকে, তারা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা গুহায় বাস করতেন। পরে ধীরে ধীরে এলাকাটি মরুভূমির মধ্যে নতুন একটি আশ্রম নগরীতে পরিণত হয়। সেক্স, ঘুম, খাবার ও সামাজিক মতবিনিময়ের মতো স্বাভাবিক প্রয়োজনগুলো প্রত্যাখ্যান করে একাকী বাস করে এসব সন্নাসী বিশ্বাস করতেন যে প্রথম আদমকে ঈশ্বর যে শক্তি দিয়েছিলেন, তারাও নিজেদের জন্য তা আবিষ্কার করতে পারবেন। এ কারণে তারা পতনের প্রভাব রুখে দিয়ে ঈশ্বরের স্বকীয় পবিত্রচিত্ততা অনুসরণ করতেন। অবশ্য সাবাসের আরেকটি লক্ষ্য ছিল। তার জীবনীকার বলেছেন, 'মহিমাময় ইসাইয়ার এ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করার জন্য [মরুভূমিকে] উপনিবেশ বানানো ছিল তার একটি

অনিবার্য লক্ষ্য।২৪ দ্বিতীয় ইসাইয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে মরুভূমি ফুলে ফুলে ভরে নতুন ইডেনে পরিণত হবে : এখন সাবাস ও তার সন্ন্যাসীরা বিশ্বাস করতেন যে এসব পবিত্র বসতি নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী করা চূড়ান্ত পরিত্রাণকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে আসবে। তবে আগে যেখানে বলা হতো, এই পরিত্রাণ পাবে ইহুদিরা, এখন বলা হতে লাগল যে তা পাবে খ্রিস্টানেরা।

খ্রিস্টান জেরুসালেমের বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের মতো নতুন সন্ন্যাস উদ্যোগও সহজাতভাবেই ইহুদিদের প্রতি বৈরী ছিল। ৪৩৮ সালে দ্বিতীয় থিওদোসিয়াসের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী ইউদোকিয়ার তীর্থযাত্রার সময় এটি মর্মান্তিভাবে দেখা গিয়েছিল। ইউদোকিয়া ছিলেন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান : তিনি ছিলেন অ্যাথেন্সের বিখ্যাত এক দার্শনিকের মেয়ে, নিজেও ছিলেন জ্ঞানী নারী। বুদ্ধিমতী ধর্মান্তরিত এই সম্রাজ্ঞী দৃশ্যত ইহুদি ধর্মের প্রতি খ্রিস্টানদের সহজাত বিরূপতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। এ কারণেই সম্ভবত তিনি ইভের নবম দিন ছাড়া অন্য দিনগুলোতে টেম্পল মাউন্টে প্রার্থনা করতে ইহুদিদের অনুমতি দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এটি অনেক খ্রিস্টানকে আতঙ্কিত করেছিল। অবশ্য ইউদোকিয়ার উচ্চ মর্যাদার কারণে তাদের পক্ষে প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল না। সম্রাজ্ঞীর অবাক করা ফরমান অনেক ইহুদিকে আসন্ন মুক্তির আশার সঞ্চার করে : বলা হয়ে থাকে বিভিন্ন দেশে থাকা ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চিঠি প্রচার করে তাদেরকে সুকোথ উৎসব উদযাপন করার জন্য জেরুসালেমে আসতে তাগিদ দেওয়া হয় যাতে সেখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। ২৫ সুকোথের সময়ই কাকতালীয়ভাবে সম্রাজ্ঞীর ফিলিস্তিন সফর ঘটে। উৎসবের প্রথম দিন ইউদোকিয়ার বেথলেহেমে থাকার দিন ইহুদিরা বিপুলসংখ্যায় টেম্পল মাউন্টে জমায়েত হয়।

তবে কেবল তারাই ছিল না। ইহুদি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতার জন্য আলোচিত সিরিয়ান সন্ন্যাসী বার সাওমাও সুকোথের জন্য জেরুসালেমে হাজির হন। তিনি সতর্কতা অবলম্বন করে নিরীহ ভাব নিয়ে একটি মঠে অবস্থান করেন। তবে অন্য সন্ন্যাসীরা টেম্পল প্লাটফর্মের ওপর ওঁত পেতে ছিল ইহুদিদের আগমনের জন্য। কয়েক শ' বছরের মধ্যে এই প্রথম ইহুদিরা খেজুর গাছের ডাল দোলাতে দোলাতে বিধ্বস্ত দরবারের দিকে অগ্রসর

হচ্ছিল। বার সাওমার জীবনীকার আমাদের বলেন, হঠাৎ করেই অদ্ভুতভাবে পাথর-বর্ষণ করে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়, স্বর্গ থেকে বৃষ্টির মতো ইহুদির ওপর পাথর নেমে আসতে থাকে। মাউন্টেই অনেক ইহুদি নিহত হয়, অন্যরা পালাতে গিয়ে মারা পড়ে, তাদের লাশে নগরীর রাস্তা আর আশপাশের এলাকা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তবে জীবিতরা দ্রুত পরিস্থিতি সামলে নেয়। তারা বার সাওমার ১৮ জন শিষ্যকে আটক করে তাদের নিয়ে বেথলেহেমে যায়। তাদের হাতে তখনো ছিল খেজুর শাখা, ইউদোকিয়ার সামনে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের জন্য। সম্রাজ্ঞী মারাত্মক বিপদ দেখলেন। সন্ন্যাসীরা মরুভূমির আশ্রমগুলো থেকে ছুটে এলো। অল্প সময়ের মধ্যেই জেরুসালেম ও বেথলেহেমের রাস্তাগুলো ক্রুদ্ধ আশ্রম-দাঙ্গাবাজদের ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তারা স্পষ্ট করে জানায়, ইউদোকিয়া যদি বন্দিদের শাস্তি দেন, তবে তারা তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবেন। ছয় দিন পর রাজকীয় প্রতিনিধি ক্যাসারিয়া থেকে আসেন। তিনি জেরুসালেমে প্রবেশ করতে ভয় পান। তাকে বার সাওমার উপস্থিতিতে বন্দিদের পরীক্ষা করতে অনুমতি দেওয়া হয়। একটি আপসরফা হয়। গভর্নরের তদন্তকারীরা এই খবর নিয়ে আসেন যে ওই ভয়াল রাতে যেসব ইহুদি নিহত হয়েছিল, তাদের মৃত্যু হয়েছিল স্বাভাবিকভাবে। বার সওমা রাস্তায় রাস্তায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন : ক্রুশের বিপুল বিজয় ঘটেছে!' জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে, বার সাওমাকে উল্লসিত লোকজন মাউন্ট সায়নে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে ব্যাসিলিকায় বিজয় উৎসব করা হয়।

ইউদোকিয়ার সফর অবশ্য বেশ ইতিবাচকভাবে শেষ হয়েছিল। ৪৩৯ সালের ১৫ মে তিনি সেন্ট স্টিফেনের সম্মানে একটি ছোট উপাসনালয় উৎসর্গ করেন। স্থানটি ছিল নগরীর উত্তর গেটের বাইরে। এখানেই সেন্ট স্পিফেনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। পর দিন তিনি মাউন্ট অলিভেসের উপর মেলেনিয়ার ম্যারটিরিয়ামে সন্ন্যাসীর একটি পবিত্র বস্তু নিয়ে যান। এরপর তিনি কনস্টানটিনোপলে ফিরে যান। সেখানে তার মিশ্র অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি ফিলিস্তিনে সুখী ছিলেন। এরপর ৪৪৪ সালে রাজপরিবারের সাথে তার মতানৈক্য হলে, বিশেষ করে সম্রাজ্ঞীর ধার্মিক বোন পলচেরিয়ার সাথে বিবাদে জড়ানোর পর তাকে জেরুসালেমে নির্বাসন দেওয়া হয়। উচ্চ মর্যাদার কারণে তিনি ফিলিস্তিনের শাসকে পরিণত হন। জেরুসালেম ও আশপাশের এলাকায়

তিনি বেশ কয়েকটি নতুন চার্চ ও সেবাসদন নির্মাণ করেন : একটি ছিল সিলোয়াম পুলে, এখানে যিশু এক অন্ধ ব্যক্তিকে সুস্থ করেছিলেন, একটি ছিল মাউন্ট সায়নে সাইফাসের অনুমিত বাসভবনে সেন্ট পিটারের সম্মানে, একটি ছিল হলি উইজডোমের সম্মানে, যেটিকে ভুলবশত টেম্পল মাউন্টের পশ্চিমে টাইরোপোয়ন ভ্যালির পিলেতের প্রায়েটারিয়ামের স্থানে বলে মনে করা হতো। ইউদোকিয়া টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণ- পূর্ব কোণে, 'টেম্পলের পিন্যাকলের নিচে নিজের জন্যও একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। পরে এই বাসভবনটি ছয় শ' নানের কনভেন্টে পরিণত হয়েছিল। তিনি জেরুসালেমের জন্য একটি নতুন নগর -প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন বলেও জনশ্রুতি রয়েছে। এটি নগরের সীমা দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত করে ওফেল ও মাউন্ট সায়নের ওপর পুরনো ইর ডেভিডকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।২৬

জেরুসালেম শাসন করার সময় ইউদোকিয়া ব্যক্তি ও খ্রিস্টের প্রকৃতিবিষয়ক চলমান মতবাদগত বিরোধেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। ৪৩১ সালে ইফেসাস কাউন্সিল কনস্টানটিনোপলের প্যাট্রিয়াক নেস্টোরিয়াসের উপেক্ষার নিন্দা করে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে যিশুর দুটি প্রকৃতি রয়েছে, মানবীয় ও ঐশী : মেরি ছিলেন না থিওটোকোস তথা ঈশ্বর-ধারক, বরং তিনি ছিলেন কেবল মানুষ যিশুর মা। কাউন্সিলের পর উত্তর সিরিয়ার নেস্টোরিয়াসের সমর্থকেরা আলাদা হয়ে তাদের নিজস্ব চার্চ প্রতিষ্ঠা করে। নানা কারণে বাকি খ্রিস্টানেরা সরকারি নিসেন অর্থোডক্সির প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। কনস্টানটিনোপলের কাছাকাছি এক মঠের প্রবীণ অধ্যক্ষ ইউতিচেস অন্য পথ ধরলেন। তিনি জোর দিয়ে বলতে থাকলেন যে যিশুর মাত্র একটি প্রকৃতিই ছিল (মন ফিসিস)। এটি ঐশী লোগোস, যিনি ভার্জিন ম্যারির মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেন, ক্রুশে মারা যান। এটি অর্থোডক্সকে আঘাত করে। কারণ 'মনোফাইসিতরা', তারা নিজেদের এমন দাবিই করত, দৃশ্যত যিশুর মানবীয় অবস্থাটি দেখতে ভুলেই গিয়েছিল, খ্রিস্টের সামগ্রিক ঐশী তত্ত্বে বিশ্বাস করত। সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসরের অনেক বিশপ ও সন্ন্যাসী কনস্টানটিনোপল থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা হিসেবে মনোফাইসিবাদের পক্ষে সমর্থন দিলো। তারাও আলাদা চার্চ গঠন করল। জেরুসালেম এখন তাদের প্রতিনিধিত্ব করত কপ্ট, ইথিওপিয়ান, আর্মেনিয়ান ও সিরিয়ান জ্যাকোবিতরা। তারা কেবল জাতীয় স্বাধীনতাই সমর্থন করছিল

না, সেইসাথে প্রধান ধর্মীয় প্রশ্নেরও সমাধান করছিল : সীমা অতিক্রমকারী ঐশী সত্তা কিভাবে মানুষের দুনিয়ার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে? প্রাচীন কালে লোকজন মনে করত, মন্দিরগুলো ঐশী সত্তার সাথে সংযোগ স্থাপন করে। অবশ্য খ্রিস্টানেরা অবাক করা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে ঈশ্বর স্থায়ীভাবে ঈশ্বর- মানব যিশুর ব্যক্তিতে মানুষের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করেছিলেন। এই জটিলতা অবসানের জন্য বিভিন্ন খ্রিস্ট তত্ত্বও সামনে এসেছিল।

ইউদোকিয়া, আংশিকভাবে পলচেরিয়া ও রাজপরিবারের সাথে তার বিবাদের জের ধরে, জেরুসালেমে মনোফাইসিতদের সমর্থন করেন। নগরীর বিশপ জুভেনালও একই কাজ করেন। রোমের বিশপ পোপ লিও দি গ্রেট তাকে তিরস্কার করেন। তিনি অভিযোগ করেন, পবিত্র স্থানগুলোর অভিভাবক জুভেনালের জন্য নীতিগর্হিত কাজ এই যে তিনি এমন এক মতবাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যা খ্রিস্টের মানব সত্তাকে অস্বীকার করে। যিশুর প্রধান শিষ্য সেন্ট পিটারের উত্তরসূরি হিসেবে রোমের বিশপ ব্যাপকভাবে চার্চের প্রধান কর্মকর্তা (প্রিলেত) বিবেচিত হতেন। লিও এখন অবতারবাদের পেছনে তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করলেন। একটি সরকারি 'বৃহৎ' গ্রন্থে তিনি যুক্তি দিলেন যে গসপেলগুলোতে যিশুর মানবীয় ও ঐশী সত্তার সহাবস্থানের ওপর অব্যাহতভাবে জোর দিয়েছে। তিনি দাবি করলেন, জেরুসালেমের পবিত্র স্থানগুলো ছিল এই 'অকাট্য প্রমাণ' যে ঈশ্বর নিজে বস্তুগত দুনিয়ায় যোগ দিয়েছেন। এক শ' বছর ধরে এসব পবিত্র স্থানে খ্রিস্টানদের অভিজ্ঞতা অবিতর্কিতভাবে প্রমাণ করে আসছে যে বস্তুগত সামগ্রী মূর্ত লোগোস পবিত্রতার সাথে লোকজনকে শক্তির সংযোগ সাধন করে। এগুলো যিশুর মানবীয় রূপের দৈহিক বাস্তবতার কথাই সাবলীলভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। লিও গ্রন্থটি ৪৫১ সালে এশিয়া মাইনরের চালসেডনে পলচেরিয়ার তলব করা চার্চ সম্মেলনের ধর্মগ্রন্থের ব্যবস্থা করে। এই কাউন্সিলে বিশপ জুভেনাল দল বদল করে অর্থোডক্স শিবিরে যোগ যে পুরস্কারটি লাভ করেন তা মাকারিয়সের সময় থেকে জেরুসালেমের বিশপেরা কামনা করে আসছিলেন। জেরুসালেমের বিশপীয় এলাকার কর্তা হলেন প্যাট্রিয়ার্ক। এর মাধ্যমে তিনি ক্যাসারিয়া, বেথ শা ও পেত্রা এলাকার বিশপদের ওপর অগ্রগণ্যতা লাভ করলেন।

ইউদোকিয়া ও জেরুসালেমের খ্রিস্টানেরা জুভেনালের পক্ষ ত্যাগের খবর শুনে সহজাতভাবেই প্রতারিত হয়েছেন মনে করলেন। তারা মনোফাইসিত থিওদোসিয়াসকে তাদের নতুন বিশপ নিযুক্ত করলেন। ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসীদের দল জুদার আশ্রমগুলো থেকে জেরুসালেমে ধেয়ে আসতে থাকে। ফলে এক সৈন্যের পাহারায় প্যাট্রিয়ার্ক জুভেনাল গোপনে বাড়ি ফেরেন। তারপর তিনি মরুভূমিতে পালিয়ে যান, সেখানে কামরানে পশ্চিমে রুবরায় তিনি লুকিয়ে বাস করতে থাকলেন। তবে চার্চের বিভ্রান্তি ইউদোকিয়াকে বিভ্রান্তিতে ফেলল। ৪৫৭ সালে বিশপ থিওদোসিয়া মারা গেলে তিনি প্রখ্যাত সিরিয়ান সন্ন্যাসী সিমিয়ন স্টালাইটের কাছে পরামর্শ কামনা করলেন। তিনি তাকে আর্মেনিয়ান সন্ন্যাসী নেতা ইউথিমিয়াসের পরামর্শ নিতে বললেন। তার শিক্ষায় ইউদোকিয়া এতই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে তিনি অর্থোডক্স মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করে ফেললেন। অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্ক অ্যাসতাসিয়া নিযুক্ত হয়েছিলেন জুভেনালের স্থানে। তিনি অ্যানাসতাসিসের কাছে তার জন্য ইউদোকিয়ার নির্মিত নতুন প্রাসাদে বাস করতে ওঠলেন। ইউদোকিয়ার শেষ প্রকল্প ছিল একটি চার্চ ও সেন্ট স্টিফেনের জন্য আশ্রম নির্মাণ। এটি ৪৩৯ সালে তার উৎসর্গ করা সাধারণ উপাসনালয়ের স্থানে হয়েছিল। শহিদের হাড়গোড় ৪৬০ সালের ১৫ জুন নিয়ে আসা হয়। চার মাস পর ইউরোদিকিয়া মারা যান। তাকে চার্চে সমাহিত করা হয়।

জেরুসালেম এখন নিসেন অর্থোডক্সির কেন্দ্র। তবে অন্যান্য চার্চ তখনো মতবাদগত সঙ্ঘাতে জর্জরিত। কারণ পূর্বাঞ্চলের অনেক খ্রিস্টান অহেতুক আপস বিবেচনা করত চ্যালসেডনকে। তারা রাজদরবারের মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ ছিল। পরবর্তী সম্রাটেরা, জেনো (৪৭৪-৯১) ও অ্যানাস্তাসিয়াস (৪৯১-৫১৮), এসব ক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের শঙ্কা ছিল এতে সাম্রাজ্য ভেঙে যেতে পারে। অন্যান্য গ্রুপও বায়জান্টাইন দরবারের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। ৪৮৫ সালে সামারাতিয়ানরা কনস্টানটিনোপল থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজেদের একজনকে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় : সম্রাট জেনো নির্দয়ভাবে তাদের বিদ্রোহ দমন করেন। জেনো মাউন্ট জেরিজিমে তাদের উৎসর্গ করার স্থানটি অপবিত্র করে সেখানে মেরি থিওতোকোসের সম্মানে একটি বিজয় চার্চ নির্মাণ করেন।

খ্রিস্টান সম্রাটদের গৃহীত নির্যাতনমূলক পদক্ষেপের ফলে তাদের বিপুলসংখ্যক প্রজা ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছিল। এটি চূড়ান্তভাবে সাম্রাজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সম্রাট জাস্টিনিয়ান (৫২৭-৬৫) ছিলেন চালসেডোনিয়ান অর্থোডক্সির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর কোনো কোনোটিতে মনোফাইসিতবাদকে দমন করার তার প্রয়াসের ফলে পুরো এলাকার লোকজনই অসন্তুষ্ট হয়। সাম্রাজ্যকে সমর্থন করা তিনি ইহুদিদের জন্য অসম্ভব করে তোলেন। জাস্টিনিয়ানের অর্থোডক্সি ইহুদি ধর্মকে ধ্বংস করা বাধ্যতামূলক বিবেচনা করে। তিনি যেসব ফরমান জারি করেন তা সাম্রাজ্যে অনুমোদিত ধর্ম হিসেবে ইহুদি ধর্মকে স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করে। ইহুদিদের বেসামরিক ও সামরিক পদে নিষিদ্ধ করা হয়, এমনকি তাইবেরিয়াস ও সেফোরিসের মতো যেসব নগরীতে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, ওই সব অঞ্চলেও তাদের ওই পদগুলোতে নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। সিনাগগগুলোতে হিব্রুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়, ইস্টারের আগে পাসওভারের দিন এলে তাদেরকে ঠিক তারিখে উৎসবটি পালন করতে দেওয়া হতো না। ইহুদিরা অবাধ্যই থাকে। সম্ভবত এই সময়ে নির্মিত গ্যালিলির বেথ আলফ সিনাগগটি জেরুসালেমের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যাহত আশাই প্রতিফলিত করে। মোসাইক ফ্লোরটি টেম্পল মাউন্টের সাথে সম্পর্কিত ঐতিহ্যের আলোকে ইসহাককে বাঁধা হিসেবে আঁকা হয়। মেনোরা, খেজুর শাখা ও সুকোথের (এই উৎসবটিকে অনেক ইহুদি মেসাইয়ার সাথে সম্পর্কিত করেছিল) লেবু-জাতীয় ফলসহ টেম্পলে ব্যবহৃত ধর্মীয় মতবাদের সাথে সম্পর্কিত সরঞ্জামও এখানে ছিল।

ভিন্ন মতালম্বী গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে জাস্টিনিয়ানের আক্রমণাত্মক নীতির ফলেও জেরুসালেম ও এর আশপাশে ভবন নির্মাণ কার্যক্রম চলে। তিনি মাউন্ট জেরিজিমের ওপর জেনোর বিজয় চার্চ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, বেথলেহেমে হেলেনার ন্যাটিভিটি ব্যাসিলিকা পুনঃনির্মাণ করেন। এটি সামারিতিয়ানদের বিদ্রোহে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। জেরুসালেমে তার সবচেয়ে চমকপ্রদ ভবন ছিল ওয়েস্টার্ন হিলের দক্ষিণ ঢালের ওপর মেরি থিওতোকোসের নতুন চার্চ। চার্চটি মনোফাইসাইট সম্রাট অ্যানাস্তাসিয়াসের রাজত্বকালে সন্ন্যাসী সাবাস ও প্যাট্রিয়ার্ক ইলিয়াসের অর্থোডক্সির স্মৃতিসৌধ হিসেবে গড়ার পরিকল্পনা ছিল। স্থানীয়ভাবে নিয়া নামে পরিচিত কমপ্লেক্সটি প্রকৌশলগত দিক থেকে ছিল চমকপ্রদ। এর আকার ও

অনুপাতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছিলেন। আর পাহাড়ে পর্যাপ্ত স্থান না থাকায় চার্চটি, মঠ ও তিন হাজার অসুস্থ লোককে সেবা দিতে তৈরি সেবাসদনের সুরক্ষা দিকে বিশাল বিশাল ভল্ট নির্মাণ করেছিলেন। জেরুসালেমে নেয়া ছিল অনন্য। কারণ এটি খ্রিস্ট ও প্রথম দিকের চার্চের মতো খ্রিস্টের জীবনের কোনো একটি ঘটনা ও একটি মতবাদকে ফুটিয়ে তুলেছিল। তবে এটি নগরীর খ্রিস্টানদের হৃদয় জয় করতে পারেনি কখনো। ৭৪৬ সালের ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হওয়ার পর তারা এটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। অবশ্য জাস্টিনিয়ানের আমলে জেরুসালেমের মোসাইক মানচিত্রে এটি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এটি ১৮৮৪ সালে বর্তমানের জর্ডানের মাদাবার একটি চার্চে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

মাদাবা মোসাইক মানচিত্রে দুটি সম্প্রসারিত কলাম ও নগরীর পশ্চিম দিকের সহায়ক প্রাচীর এবং সেইসাথে পিলেতের সম্ভাব্য প্রায়েটোরিয়ামের স্থানে হলি সায়ন ও ইউদোকিয়ার হলি উইজডম চার্চের ব্যাসিলিকাও দেখা যায়। মানচিত্রে খ্রিস্টান বিশ্বের ঐশী ভূগোল প্রতিফলিত করে। ২৮ এটি কনস্টানটাইনের আমলে তৈরি হয়েছিল। ফিলিস্তিন পবিত্র ভূমি হিসেবে চিত্রিত হয়েছিল : মানচিত্রটিতে কেবল বাইবেলের স্থানগুলোই চিহ্নিত ছিল না, বরং সেইসাথে নতুন নতুন ভবন, স্মৃতিসৌধ ও আশ্রমও প্রদর্শন করছিল। এগুলোই দেশটিকে পবিত্র স্থানে পরিণত করেছিল। 'পবিত্র নগরী জেরুসালেম' কিংবদন্তি ছাপযুক্ত জেরুসালেম ছিল মানচিত্রটির কেন্দ্রে। এখন এটি খ্রিস্টান বিশ্বের কেন্দ্রে আলো ছড়াচ্ছে। কবরটি আবিষ্কারের আগে খ্রিস্টানেরা মাটির নগরী হিসেবে এর গুরুত্ব হ্রাস এবং স্বর্গীয় জেরুসালেমের দিকে মনোনিবেশন করেছিল। চতুর্থ শতক নাগাদ তারা খ্রিস্টান কল্পশক্তিতে নিমজ্জিত হয়। আমরা রোমের সেন্ট পুদেনজিয়ানা চার্চের মোজাইকে তা দেখি। এতে দেখা যায়, খ্রিস্টা স্বর্গে তার শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছেন : তার পেছনে গলগোথায় কনস্টানটিনোপলের নতুন ভবন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। জেরুসালেম এর ফলে পবিত্র খ্রিস্টান নগরীতে পরিণত হলো। অবশ্য সবসময় তা দানশীলতার নগরী ছিল না। প্রায়ই নগরীর পবিত্র চরিত্রটির সাথে বিধ্বংসী খ্রিস্টান সংগ্রাম, ক্ষমতার খেলা ও প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বাসকে দমন জড়িত থাকত।

জাস্টিনিয়ান ও জেনো খ্রিস্টান অর্থোডক্সির ক্ষমতা সম্পর্কে একটি জোরালো অবস্থান প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তারা উভয়েই মেরি থিওতোকোসের সম্মানে চার্চ নির্মাণ করেছিলেন। নবজাতক খ্রিস্টকে ধরে রাখা ঈশ্বরের মাতার ছবি অর্থোডক্সির স্লোগানে পরিণত হয়েছিল। কারণ এটি অবতার মতবাদের আপাতবিরোধী মূল সত্য প্রকাশ করেছিল : এটি দেখিয়েছিল যে বিশ্বের প্রতি ভালোবাসার কারণে লোগোস শৈশবের চরম নাজুকতাকে গ্রহণ করেছিল। মেরি ও তার ছেলের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যকার কমনীয়তা মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের প্রায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভালোবাসা প্রকাশ করছিল :

তুমি তোমার ডান বাহু বিস্তৃত করো হে থিওটোকোস, তুমি তাকে গ্রহণ করো এবং তোমার বাম হাতে তাকে স্থাপন করো। তুমি তোমার গলদেশ বাঁকা করে তোমার কেশ তার ওপর পড়তে দাও... সে তার হাত বাড়িয়ে তোমার স্তন গ্রহণ করবে, মান্নার চেয়েও মিষ্টি দুগ্ধ সে তার মুখে টেনে নেবে।২৯

একইভাবে খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা মূর্ত লোগোসের একসময় স্পর্শ করা পাথর ও কাঠকে আদর করত, চুমু খেত এই ধরনের স্পর্শগ্রাহ্য আধ্যাত্মিকতা দেখাচ্ছে কিভাবে অবতারবাদ ও জেরুসালেম মতবাদ খ্রিস্টানদেরকে অতিন্দ্রেয়তার মাধ্যম হিসেবে যৌন ভালোবাসা প্রদর্শন করতে সক্ষম করেছিল। তবে দুঃখজনকভাবে এ ধরনের ঘটনা কখনো খ্রিস্টান ঐতিহ্যে আসেনি। এটিও মর্মান্তিক ব্যাপার যে ঐশী কোমলতা খ্রিস্টানদেরকে তাদের ধর্মালম্বী অন্যদের জন্য বৃহত্তর ভালোবাসা ও সহানুভূতি উদ্দীপ্ত করতে পারেনি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে লোগোসের নাজুকতার ধর্মানুরাগ দৃশ্যত জেরুসালেমের কিছু খ্রিস্টান অধিবাসীকে ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ লাভে তাদের নিজস্ব অহমকেন্দ্রিক লালসাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি।

মাদাবা মোজাইক মানচিত্রের একটি টুকরায় জাস্টিনিয়ানের সময়কার খ্রিস্টান জেরুসালেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা ছিল। দুটি কার্ডাইন, হ্যাড্রিয়ানের নির্মিত ও এখানে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, এখনো পুরনো নগরীর প্রধান জনবহুল এলাকা।

অবশ্য আধ্যাত্মিকতার শারীরিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক তীর্থযাত্রীকে প্রবল ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এনে দেয়। মনোফাইসিতবাদের সাথে আগেকার ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও এটি নিসেন অর্থোডক্সির সহজাত কেন্দ্রে পরিণত করে জেরুসালেমকে। ৫১১ সালে সম্রাট অ্যানাস্তাসিয়াস জেরুসালেম চার্চে একজন মনোফাইসিত প্যাট্রিয়ার্ক চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে সন্ন্যাসী সাবাস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন যে পবিত্র নগরীতে বাস করার অভিজ্ঞতা তীর্থযাত্রী ও লোকজনের জন্য খ্রিস্টের মানবিক বিষয়টি অবমূল্যায়ন করা অসম্ভব করে তোলে : আমরা, জেরুসালেমের অধিবাসীরা প্রতি দিন আমাদের হাতগুলো এসব পবিত্র স্থানের মাধ্যমে সত্যকে স্পর্শ করি, যেখানে আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তার রহস্য রয়েছে। পবিত্র স্থানগুলোর কোনো কোনোটিতে যিশু দৈহিক চিহ্ন রেখে গিয়েছিলেন বলে মনে করা হতো : তিনি আক্ষরিকভাবেই এমন ছাপ দিয়ে গেছেন, যা তার উপস্থিতি কোনোভাবেই ভোলা সম্ভব নয়। তার পদাঙ্ক অ্যাসেনশন চার্চের পাথরে ও ইউদোকিয়ার হলি উইজডোম চার্চের একটি পাথরে দেখা যেত। পিলেতের সামনে দাঁড়ানোর সময় হলি উইজডোম চার্চে রাখা পাথরটিতে তার পায়ের ছাপ পড়েছিল বলে বলা হতো। পাশ্চাত্যের জনৈক তীর্থযাত্রী থিওদাসিয়াস ৫৩০ সালে জেরুসালেম সফ করে মাউন্ট সায়নের স্তম্ভে যিশুর দেহ অঙ্কিত দেখেছিলেন।

তাকে চাবুক মারার সময় তিনি পাথরটিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এতে করে তার দুই হাত, বাহু, আঙুলগুলোর দাগ মোমের মতো লেগে যায় এবং বর্তমান সময়েও তা দেখা যায়। সেখানে অবস্থানের পুরো সময়ে তার চিবুক, নাক, চোখের ছাপ পড়ে এতে। ৩২

পাথর আঁকড়ে ধরে ঈশ্বরের স্থায়ীভাবে মানুষকে গ্রহণ ও বস্তুগত বিশ্বকে ব্যক্তিগতভাবে মেনে নেওয়ার স্থায়ী ছাপ দিয়ে গেছেন। নশ্বর নগরী জেরুসালেমে যিশুর গৃহীত ব্যবস্থার কারণে এখন ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত। ৫৭০ সালের দিকে জেরুসালেম সফরকারী পিয়াসেনজার থেকে আগত তীর্থযাত্রী অ্যাটোনিনাসের মতে, এখানকার প্রতিটি শিশিরের রয়েছে আরোগ্য দানের ক্ষমতা। খ্রিস্টানেরা অ্যাসক্লেপিয়াস ধর্মমতের পুরনো স্থান সিলোয়াম পুল ও বেথ-হেসদা পুলে গোসল করত। অবশ্য বেথ-হেসদায় এখন ভার্জিন

ম্যারির নেটিভিটির সম্মানে একটি চার্চ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব আরোগ্য দানকারী পানিতে অনেক আরোগ্য লাভকারী প্রভাবিত হয়েছে।

পবিত্র স্থানগুলো ছিল আইকনের মতো। এগুলো স্বর্গীয় বিশ্বের সাথে আরেকটি যোগসূত্র প্রদানকারী হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করেছিল। যিশু বা সন্ন্যাসীদের আক্ষরিকভাবে চিত্রিত করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না আইকনে। অন্য যেকোনো ধর্মীয় প্রতীকের মতো এটিও ছিল পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বকারী স্বর্গীয় সত্তার সাথে রহস্যময়ভাবে সম্পর্কিত কিছু একটা। অষ্টম শতকের সন্ন্যাসী স্টুডিওর থিওডোর বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : প্রতিটি কৃত্রিম ছবি... নিজে থেকে প্রদর্শিত, অনুকরণের মাধ্যমে, এর মডেলের আকারে... মডেল হলো ছবি, একের মধ্যে অন্যটি।'৩৪ একইভাবে না হয়ে বরং যেসব তীর্থযাত্রী নগরীজুড়ে বিশাল বিশাল শোভাযাত্রার সময় খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে তাকে 'অনুকরণ করত, ওই মুহূর্তের খোদ লোগোসের সাথে তারা 'জীবন্ত আইকনে' পরিণত হতো। ফলে পবিত্র স্থানগুলো কেবল স্মারকচিহ্নই ছিল না, বরং স্বর্গের দুনিয়াবি প্রতিকৃতি বিবেচিত হতো। এই সময়কালের এক তীর্থযাত্রীর দুই হাতলযুক্ত বিশেষ রোমান ফ্লাস্কে গলগোথা পাথরটি দেখা যায়। ছবির উপরিভাগে দ্বিতীয় থিওদোসিয়াসের দান করা একটি রত্ন-সংবলিত ক্রুশের ছবি রয়েছে। আর পাথরটি থেকে চারটি চার স্বর্গীয় নদীর প্রবাহিত হতেও দেখা যায়। তীর্থযাত্রীরা গলগোথা সফর করার সময় তাদেরকে সময়ের সূচনায় ঈশ্বর যেখানে আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন, সেই স্থানটি দেখানো হতো। গলগোথাকে ইডেন উদ্যানের স্থান বিবেচনা করা হতো। এটি এমন এক প্রতীকে পরিণত হয়েছিল যা তীর্থযাত্রীদের স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের অভিজ্ঞতা দিত। আমরা ধর্মীয় অনুসন্ধানের গুরুত্বপূর্ণ মটিফে এ বিষয়টি দেখতে পাই। বর্তমান সময়ের পর্যটকেরা যেভাবে ঐতিহাসিক স্থান সফর করে, তীর্থযাত্রীরা সেভাবে গলগোথায় যেত না : পৃথিবীর বুকে খ্রিস্টের জীবনের দুনিয়াবি স্মারকচিহ্নগুলো তাদেরকে অপার্থিব সত্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিত। এটি কিছু সময়ের জন্য মানব যন্ত্রণার মূলে থাকা বিচ্ছেদ ও হারানোর অনুভূতির উপশম ঘটাত এবং তাদের 'প্রকৃত' অবস্থা অনুভব করার অখণ্ডতা ও সামগ্রিকতার ঘনিষ্ঠ হওয়ার অনুভূতি দিত।

খ্রিস্টান জেরুসালেমের সৃষ্টি নগরীর পবিত্র কেন্দ্র পুরোপুরি স্থানান্তরিত করেছিল। আগে এই কেন্দ্র ছিল মাউন্ট জায়ন ও টেম্পল মাউন্ট। বর্দুর তীর্থযাত্রী জেরুসালেম সফরের সময় সেখান থেকে তার সফর শুরু করে নবতর খ্রিস্টান উপাসনালয়গুলোর দিকে অগ্রসর হয়েছেন। ষষ্ঠ শতক নাগাদ খ্রিস্টানেরা টেম্পল প্লাটফর্মের দিকে তাকানোর গরজই অনুভব করত না। আগে যেসব ঘটনা ঘটত মাউন্ট জায়নে, এই সময় সেগুলো ঘটছিল নতুন জেরুসালেম গলগোথায়। বর্দুর তীর্থযাত্রী টেম্পল মাউন্টে জেচারিয়ার খুনের স্থানটিতে গেছেন, রাস্তায় রক্তের ছাপ দেখেছেন। এখন তীর্থযাত্রীদের কনস্টানটাইনের ম্যারটিরিয়ামের যেখানে জেচারিয়াকে হত্যা করা হয়েছিল, ওই বেদী দেখানো হয়। যে বেদীতে ইসহাককে বেঁধেছিলেন ইব্রাহিম এবং যেখানে মেলচিজেদেক উৎসর্গ করেছিলেন, এই দুই ঘটনা আগে জায়নের সাথে সম্পর্কিতি ছিল, সেগুলো গলগোথার কাছে প্রদর্শিত হতো। এছাড়া একটি শিংও ছিল। এতে থাকা তেল দাউদ ও সোলায়মানকে অভিষিক্ত করা হয়েছিল। আর ছিল সোলায়মানের মোহরযুক্ত আংটি। ৩৫ এই পরিবর্তন ছিল ইহুদি ঐতিহ্যের আরেকটি খ্রিস্টান আত্মসাৎ। অবশ্য এর মাধ্যমে এই প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে যে নতুন জেরুসালেমের পবিত্রতা এতই শক্তিধর ছিল যে এটি পুরনো জেরুসালেমের ঐতিহ্যগুলো নিজের পক্ষপুটে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছে।

অবশ্য পবিত্র নগরীর শক্তি এর দুনিয়াবি শত্রুদের কোণঠাসা করতে পারেনি। বায়েজন্টাইন সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে ভেতরেই বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, এর প্রজারা কনস্টানটিনোপল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ৬১০ সালে পারস্যের রাজা দ্বিতীয় খসরু মনে করলেন, বায়েজান্টাইন এলাকায় হামলা চালানোর এটিই উপযুক্ত সময়। তিনি সাম্রাজ্যটিকে টুকরা করার কাজ শুরু করলেন। ৬১১ সালে অ্যান্টিয়কের পতন হলো, দুই বছর পর সিরিয়ার অবস্থাও একই হলো। ৬১৪ সালে পারসিক জেনারেল শাহরবাজ আক্রমণ করলেন ফিলিস্তিন। তিনি পুরো এলাকায় সহিংসতা ছড়িয়ে দিলেন, চার্চগুলোতে অগ্নিসংযোগ করলেন। রোমান শাসনের চেয়ে পারসিক শাসন সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত সুখস্মৃতি থাকা ফিলিস্তিনের ইহুদিরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলো। ৬১৪ সালের ১৫ এপ্রিল পারস্য সেনাবাহিনী জেরুসালেম প্রাচীরের বাইরে পৌছে গেল। প্যাট্রিয়াক জ্যাচারিয়াস নগরীর আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত থাকলেও একদল তরুণ খ্রিস্টান তা করতে

দিতে অস্বীকৃতি জানাল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বর কোনো অলৌকিক ঘটনার সাহায্যে তাদের রক্ষা করবেন। অবরোধ তিন সপ্তাহ স্থায়ী হলো। এ সময় পারসিকরা পরিকল্পিতভাবে নগরীর বাইরে থাকা চার্চগুলোর সবই ধ্বংস করতে লাগল। এমনকি সেন্ট স্টিফেন্স চার্চ, ইলেয়না ব্যাসিলিকা ও অ্যাসেনশন চার্চও বাদ পড়ল না। মে মাসের শেষ দিকে নৃশংস গণহত্যার মধ্যে জেরুসালেমের পতন ঘটল। স্ন্যাসী অ্যান্টিচাস স্ট্র্যাটেগোস প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে পারসিকরা বুনো শূকরের মতো গর্জন করতে করতে নগরীর ভেতরে ছুটে এসে যাকে সামনে পেয়েছে, তাকেই হত্যা করেছে : এমনকি নারী ও শিশুদের পর্যন্ত রেহাই দেওয়া হয়নি। তার অনুমান যে ৬৬,৫৫ জন খ্রিস্টান মারা গেছে, নগরী লুণ্ঠিত হয়েছে, ম্যারটিরিয়ামসসহ সব চার্চে অগ্নিসংযোগ কর হয়। বেঁচে থাকা লোকজনকে বেঁধে রাখা হয়। এদের মধ্যে যারা দক্ষ বা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, প্যাট্রিয়ার্ক জ্যাচারিয়াসসহ তাদেরকে নির্বাসন দেওয়া হয়।

নির্বাসিতরা মাউন্ট অলিভেসের শীর্ষে পৌঁছে পেছন ফিরে জ্বলতে থাকা নগরী দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। তারা তাদের পশুগুলোকে প্রহার করে মাথার ওপর ধুলা উড়িয়ে ঠিক যেভাবে ইহুদিদের শোক শাস্ত্রাচার পালন অনুষ্ঠানকে ঘৃণা করত, তারই অনুকরণ করল। জ্যাচারয়াস তাদেরকে শান্ত করতে চাইলেন। তিনি খ্রিস্টান পবিত্র নগরীর জন্য তীব্র শোক প্রকাশ করলেন, যা এখন ঈশ্বরের ধারণা ও অভিজ্ঞতা থেকে অবিভাজ্যে পরিণত হয়েছে :

ও জায়ন, আমাকে ভুলে যেও না, আমি তোমার দাস, আর তোমার স্রষ্টাও তোমাকে হয়তো ভুলবে না। আর আমি যদি তোমাকে ভুলি, হে জেরুসালেম, আমার হাত অবশ করে দিও। আমি তোমাকে স্মরণ না করলে আমার জিহ্বা আমার মুখের ছাদ থেকে আলাদা করে দিও... আমি তোমাকে ভক্তি করে হে জায়ন। আর যে তোমাতে বাস করে, তাকেও ভক্তি করি। ৩৬

খ্রিস্টানেরা জেরুসালেমের ব্যাপারে ইহুদিদের চেয়ে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। এখন তাদের নির্বাসনের পালার সময় তারা স্বাভাবিকভাবেই পবিত্র নগরীতে তাদের পূর্বসূরিদের পদক্ষেপ ও সামগুলোর দিকে নজর ফিরিয়েছিল। আর ইহুদিদের মতো তারা একইসাথে ঈশ্বর ও জায়নের কথা বলেছিল। নির্বাসিতরা সাথে করে ট্রু ক্রুশ’

ও ম্যারটিরিয়ামে রাখা খ্রিস্ট প্যাশনের অন্যান্য সরঞ্জাম সাথে নিয়েছিল। এসবের মধ্যে ছিল যিশুর দেহে বিদ্ধ বর্শা, লাস্ট সাপারে ব্যবহৃত বলে কথিত স্পঞ্জ ও পাথরের পেয়ালা। তারা এগুলো পারস্যের রানি মেরিয়ামের কাছে দিয়ে দেয়। তিনি ছিলেন নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান।

অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য পারসিকদের জেরুসালেম ত্যাগ করতে হয়েছিল। এ সময় নগরীর দায়িত্বভার ফিলিস্তিনে তাদের মিত্র ইহুদিদের হাতে দিয়ে যায়। মেসাইনিক আশা তুঙ্গে ওঠল : স্বপ্নবিভাবীরা মেসাইয়ার আসন্ন ভূমি পরিশুদ্ধকরণ ও টেম্পল পুনঃনির্মাণের কথা তুললেন। সমসাময়িক অনেকে এই সময়ের মধ্যে মাউন্টে আবার বলি শুরু হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাদের মতে, সুকোথের সময় আবার বুথ নির্মাণ করা হয়েছিল, বিধ্বস্ত নগরদ্বারগুলোতে আবারো প্রার্থনা করা হয়।৩৭ তবে ৬১৬ সাল নাগাদ পারসিকরা ফিরে আসে ফিলিস্তিনে। তারা নগরীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। তারা এখন বুঝতে পারল, দেশকে শান্ত করতে হলে তাদেরকে খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের কিছু ছাড় দিতে হবে। পারস্য সমর্থন প্রত্যাহারের অর্থ হলো ইহুদি জাতির জন্য জেরুসালেম পুনঃপ্রতিষ্ঠার বাস্তববাদী যেকোনো আশার অবসান।

বায়জান্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস ৬২২ সালে পারস্যের বিরুদ্ধে আবার আক্রমণ শুরু করেন। ছয় বছর ধরে পারস্য ভূখণ্ডে অভিযান চালিয়ে অবশেষে তিনি তেসিফোনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছান। এক প্রাসাদ অভ্যুত্থানে দ্বিতীয় খসরু নিহত হন। পারস্য ও বায়জান্টাইন সন্ধি করল, উভয় শক্তি একে অপরের ভূখণ্ড থেকে সরে গেল। তবে দুই শক্তি দীর্ঘ দিন একে অপরের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় সত্যিকার অর্থে আর আগের অবস্থায় ফিরে আসেনি। তা সত্ত্বেও জেরুসালেমের খ্রিস্টানেরা ছিল উৎফুল্ল। ৬২৯ সালের ২১ মার্চ জমকালো শোভাযাত্রা নিয়ে হেরাক্লিয়াস জেরুসালেমে প্রবেশ করেন। তার সাথে ছিল ট্রু ক্রুশ। সম্ভবত তার বিজয়ীবেশে প্রবেশের সম্মানে টেম্পল মাউন্টের পূর্ব দিকের সহায়ক প্রাচীরের কাছে 'সোনালি তোরণ' (গোল্ডেন গেট) নির্মাণ করা হয়েছিল। সম্রাট নগরীতে অ্যানাস্তাসিস পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে ক্রুশটিকে এর ন্যায্য স্থানে ফিরিয়ে দেন। ৬১৪ সালে কবরের পাশে থাকা ম্যারটিরিয়াম ও রোতানদা উপাসনালয় উভয়টিই ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছিল। তবে ভবন দুটি তখনো দাঁড়িয়েছিল। জুদা মরুভূমির সন্ন্যাসী মদেসতোস এসব মেরামতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জ্যাচারিয়াস নির্বাসনকালে মারা যাওয়ায় হেরাক্লিয়াস মদেসতোসকেই তার সেবার স্বীকৃতি হিসেবে জেরুসালেমের প্যাট্রিয়ার্ক নিযুক্ত করেন। পারসিকদের সাথে সহযোগিতাকারী ইহুদিদের হেরাক্লিয়াস ক্ষমা করে একটি ফরমান জারি করেন। এতে খ্রিস্টানেরা ক্ষুব্ধ হয়। তখন তাদেরকে খুশি করার জন্য আগের অবস্থান থেকে তাকে সরে আসতে হয়েছিল। আরেকটি ফরমান জারি করে আবারো জেরুসালেমে ইহুদিদের নিষিদ্ধ করা হলো। পারস্য শাসনকালে খ্রিস্টানদের হত্যা করা বা চার্চ জ্বালানোর সাথে জড়িত বলে অভিযুক্ত কয়েকজন ইহুদিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। বাকিরা পারস্য, মিসর বা মরুভূমিতে পালিয়ে গেল। যারা গ্যালিলিতে রয়ে গিয়েছিল, তাদের জন্য প্রকাশ্যে শামা আবৃতি করা নিষিদ্ধ করা হলো। তাছাড়া সপ্তাহে এক দিনের বেশি সিনাগগে প্রার্থনা করাও নিষিদ্ধ হলো। ৬৩৪ সালে হেরাক্লিয়াস তার সাম্রাজ্যের সব ইহুদিকে ব্যাপ্তাইজ করার নির্দেশ দিলেন। আবারো এক খ্রিস্টান সম্রাট তার ইহুদি প্রজাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তিন বছর পর তার সাম্রাজ্য যখন আবারো প্রাণঘাতী বিপর্যয়ে পড়েছিল, তখন তিনি তাদের সমর্থন পাওয়া অসম্ভব বলে দেখতে পেলেন।

খ্রিস্টানেরা ছিল প্রবলভাবে খুশি। মুরতাদ জুলিয়ানের রাজত্বের পরের অবস্থার মতো আবারো খ্রিস্টানেরা তাদের পবিত্র নগরী তাদের জন্য মেরামত করতে পেরেছিল। এবার তারা একে আর হারাতে দেবে না। উদ্দীপ্ত অর্থোডক্স সন্ন্যাসী সফ্রোনিয়াস ৬৩৩ সালে জেরুসালেমের প্যাট্রিয়ার্ক হয়েছিলেন। তিনি নগরীর প্রতি তার ভালোবাসা বর্ণনা করে দুটি কবিতা লিখেছিলেন। তিনি নিজেকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দৌড়ে পাথরগুলোতে চুমু খাওয়া, প্যাসনের স্থানগুলোতে কান্না করতে থাকা লোক হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। সফ্রোনিয়াসের কাছে কবরটি দুনিয়াবি স্বর্গের প্রতিনিধিত্ব করছিল :

হে আলোদায়ী কবর, তুমি হলে শ্বাশত জীবনের মহাসাগর এবং মরজগতের সত্যিকারের নদী। আমি পুরোপুরি নুয়ে বিশ্বের পবিত্র কেন্দ্রের পাথরটিতে চুমু খাব, যেখানে বৃক্ষটি আছে, যেটি আদমের বৃক্ষের অভিশাপ বহন করছে... প্রশংসা জায়নের, বিশ্বের জঁমকালো

সূর্য। আমি দিবা-রাত্রি এটি কামনা করি, আর্তচিৎকার করি। ৩৮ জেরুসালেমে বাস করার অভিজ্ঞতা খ্রিস্টানদের পূর্ণমাত্রায় ঐশী ভূগোলে তাড়িত করেছিল। একসময় যেটিকে তারা ঘৃণা করত, তেমন পুরানতত্ত্বের আশ্রয়ই তারা নিয়েছিল। তারা এখন জেরুসালেমকে দেখে পৃথিবীর কেন্দ্র, জীবনের উৎস, উর্বরতা, পরিত্রাণ ও আলোকসম্পাত হিসেবে। এখন তারা নগরীর জন্য এত বিপুল সংখ্যায় মারা যাওয়ার কারণ হলো এটি তাদের কাছে আগের চেয়েও প্রিয় মনে হয়েছিল। খ্রিস্টান সম্রাটের কাছে জেরুসালেমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঈশ্বরের কাজ বিবেচিত হলো। তবে ৬৩২ সালে সোফ্রোনিয়াস প্যাট্রিয়ার্ক হওয়ার এক বছর আগে যে নবী আগ্রহ নিয়ে জেরুসালেমের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী লক্ষ্য করছিলেন, তিনি ইয়াসরিব নামের আরব বসতিতে ইন্তিকাল করলেন। পাঁচ বছর পর তার বন্ধু ও অনুসারীদের সেনাবাহিনী জেরুসালেম প্রাচীরের বাইরে এসে পৌঁছাল।

বায়তুল মোকাদ্দাস

হিজাজের মক্কার নতুন নবী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ৬১০ সালে যখন তার প্রথম ওহি লাভ করেন, তখন বিশ্বাস করেননি যে তিনি একটি নতুন বিশ্ব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন। ওই বছরই রাজা দ্বিতীয় খসরু বায়েজান্টাইন এলাকা আক্রমণ করেছিলেন। সততার জন্য বিখ্যাত মক্কার বণিক মুহাম্মদ (সা.) নগরীর আধ্যাত্মিক পঙ্কিলতা নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন। মক্কা তখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি বস্তুগত সমৃদ্ধি ভোগ করছিল। কিন্তু এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে পুরনো অনেক গোত্রীয় মূল্যবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পুরনো আমলের রীতিনীতির আলোকে সমাজের দুর্বলতর সদস্যদের পরিচর্যা করার বদলে লোকজন তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়ে পড়েছিল। অনেকে পুরনো পৌত্তলিকতার ব্যাপারে অস্পষ্টভাবে অসন্তুষ্ট ছিল। তখন তারা আধুনিক বিশ্বে প্রবেশ করতে থাকার প্রেক্ষাপটে ওই পৌত্তলিকতা তখন আর পর্যাপ্ত বিবেচিত হচ্ছিল না। ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হতো আরব দেবমণ্ডলের সর্বোচ্চ ঈশ্বর ছিলেন আল্লাহ, এই নামের অর্থ স্রেফ 'ঈশ্বর', বস্তুত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপাস্য দেবতা। অবশ্য আরবরা যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টানের সংস্পর্শে এসেছিল, তারা তাদেরকে প্রায়ই কটাক্ষ করত। কারণ ঈশ্বর তাদের কাছে তাদের নিজস্ব কোনো ওহি বা নবী পাঠাননি।

এসব চিরকালের মতো বদলে গেল ৬১০ সালের রমজান মাসে। এক ঐশী উপস্থিতি ও তার ঠোঁট থেকে ঐশী উদ্দীপ্ত গ্রন্থের শব্দ বের হতে দেখে সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়েছিলেন মুহাম্মদ (সা.)। পরের ২২ বছর ধরে মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর কাছ থেকে অব্যাহতভাবে ওহি পেতে থাকলেন। পরে তার অনুসারীরা এসব ওহি কোরআন নামে পরিচিত আরবি পাণ্ডুলিপি হিসেবে সঙ্কলন করেন। অবশেষে ঈশ্বর আরবদের কাছে তাদের নিজস্ব ভাষাতে কথা বললেন, তাদেরকে সত্যিকারের বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সামিল করলেন। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) তার ওহিকে নতুন কিছু বিবেচনা করেননি। তার কাছে যে ওহি নাজিল হয়েছে তা আসলে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপাস্য এক ঈশ্বরের পুরনো ধর্ম। এটি মক্কার লোকজনকে ঈশ্বরের কাছে তাদের পুরনো জীবন নিঃশর্ত সমর্পণের (ইসলাম) আহ্বান জানায়। তারা

আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করলে ন্যায়সঙ্গত ও পরিচ্ছন্ন সমাজ নির্মাণ করে তারা সমৃদ্ধ হবে, অস্তিত্বের জন্য মৌলিক বিবেচিত ঐশী বিধানের আলোকে সম্প্রীতিতে থাকবে।

অর্থাৎ ইসলাম অচেনা কোনো কিছুর কাছে বশ্যতা স্বীকারের বিষয় ছিল না। কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, এটি ব্যাপকভাবে সহজাত কাজ। কিভাবে জীবনযাপন করা উচিত, তা জানানোর জন্য ঈশ্বর দুনিয়ার বুকে থাকা সব লোকের কাছে নবী ও রাসুল পাঠিয়েছেন। এই ঐশী নির্দেশনার কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমেই কেবল লোকজন তাদের মানব সম্ভাবনা পূরণ করতে পারে। ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহ (কুফুর) করা হবে অস্বাভাবিক, অকৃতজ্ঞ ও ন্যায়ভ্রষ্টকাজ। কারণ এটি হবে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। এটি কেবল ব্যক্তি ও সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা ও বিঘ্নতা সৃষ্টি করতে পারে। অন্য দিকে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করা মুসলিম তার জীবনকে সম্প্রীতি, উদ্দেশ্যপূর্ণ ও নির্দেশনাপূর্ণ দেখতে পাবে। কারণ সবকিছু যেভাবে চলছে, সেও সে অনুযায়ী চলছে। অর্থাৎ সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ যখন নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই নিখুঁত অবস্থায় ফেরে মুসলিমরা।

অর্থাৎ ইসলামের সামগ্রিকতাকে বিবেচনা করা যেতে পারে সম্পূর্ণতাকে অনুসন্ধান করার তথা মানুষের হারানো বেহেশতে ফিরে যাওয়া প্রয়াস হিসেবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে পবিত্র কোরআন বা এর নবী সম্পর্কে উদ্ভট বা পলায়নপর প্রবৃত্তিপূর্ণ কিছু নেই। মুহাম্মদ (সা.) কেবল আধ্যাত্মিক প্রতিভাধরই ছিলেন না, তার রাজনৈতিক মেধাও ছিল তীক্ষ্ণ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ খুবই স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যক্তিগত সম্পদ পঞ্জীভূত করা অন্যায়, সম্পদ সবার সাথে ভাগাভাগি করা ভালো কাজ। প্রথম ধর্মীয় কর্তব্য হলো এমন এক সমাজ সৃষ্টি করা যেখানে গরিব ও দুর্বলেরা সম্মানজনক আচরণ পাবে। হিব্রু নবীদের মতো মুহাম্মদ (সা.) বাস্তব সহানুভূতির প্রধান কর্তব্যের দিকে নজর দিয়েছেন : গরিব, এতিম, বিধবা, নির্যাতিতদের পরিচর্যা করা মুসলিমদের মুখ্য দায়িত্ব। পবিত্র কোরআন এক গুচ্ছ জটিল ধর্মীয় মতাবাদের কাছে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অনুগত হতে বলে না। বস্তুত, কেউ কোনোভাবেই প্রমাণ করতে পারবে না, এমন ধর্মতাত্ত্বিক কল্পনার দিকে পবিত্র কোরআন একেবারেই সময় ক্ষেপণ করেনি। অন্য দিকে ইহুদি ধর্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠার চেয়ে নৈতিক নির্দেশনার মধ্যে ঈশ্বরের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়।

পবিত্র কোরআনের বার্তা ওই সময়েই (মনে করা হয়ে থাকে) মক্কার সাথে প্রাসঙ্গিক ছিল। পুঁজিবাদী বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতিতে তখন মুহাম্মদের (সা.) কোরাইশ গোত্রের সদস্যরা সম্পদের জন্য অনেক বেশি নাজুক হয়ে পড়ে গিয়েছিল। পবিত্র কোরআনের প্রতি সাড়া দেওয়া প্রথম সময়ের অনেকে ছিলেন ক্রীতদাস, নারী ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির লোক, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত গরিব ও কম সফল গোত্রগুলোর সদস্য। মক্কার এস্টাবলিশমেন্টের অবশ্য বিদ্যমান অবস্থা পরিবর্তন করার কোনো ইচ্ছা ছিল না। মুহাম্মদ (সা.) যখন ঐতিহ্যবাহী দেবতাদের পূজা করতে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে নির্দেশ দিলেন, তখন ওই সমাজের সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তাদের কাছে এটিকে তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও আরবের প্রাচীন পবিত্রতা থেকে বিচ্যুতি বিবেচিত হয়েছিল। মক্কার অভিজাতেরা ছোট মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন চালালে ৬২২ সালে তারা মুহাম্মদ (সা.) মক্কা ত্যাগ করে প্রায় ৭০টি পরিবার নিয়ে প্রায় ২৫০ মাইল উত্তরে ইয়াসরিবে চলে যেতে বাধ্য হন। এই হিজরত (অভিবাসন) মুসলিম সাল গণনার সূচনা করে। কারণ এই পর্যায়ে মুহাম্মদ (সা.) তার আদর্শ পুরোপুরি বাস্তবে প্রয়োগ করতে ও প্রথম উম্মাহ (সমাজ) গঠন করতে সক্ষম হন। এই সম্প্রদায়ের সমাজব্যবস্থা ও আধ্যাত্মিকতা পবিত্র কোরআনের আলোকে গাঁথা ছিল।

পরের ১০ বছর ছিল মুসলিমদের জন্য বিপজ্জনক ও ভীতিকর। ক্রমবর্ধমান উম্মাহ অব্যাহতভাবে বিলীন হয়ে যাওয়ার শঙ্কায় ছিল। হিজরত ছিল একটি বড় ধরনের ধাক্কা, এমনকি ঈশ্বর অবমাননাকর কাজও। নিজেদের গোত্র পরিত্যাগ করে মুসলিমরা আরবের অন্যতম ঐশী মূল্যবোধ রক্তের বন্ধন লঙ্ঘন করেছিল। তারা বিশ্বে তাদের সত্যিকারের স্থানটি থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেদেরকে এমন চরম বৈরী বিশ্বে দিকভ্রান্ত অবস্থায় নিক্ষেপ করেছিল, যেখানে গোত্রীয় গ্রুপের সমর্থন ছাড়া ব্যক্তি সাধারণভাবে বাঁচতে পারত না। উম্মাহ মক্কার শক্তিশালী নগরীটির সাথে টানা যুদ্ধের হুমকির মধ্যে পড়ে যায়। উম্মাহকে ইয়াসরিবের কিছু ইহুদি ও পৌত্তলিকের তীব্র বিরোধিতাও মোকাবিলা করতে হয়েছিল। এসব ইহুদি ও পৌত্তলিক রক্তের বন্ধনের ভিত্তিতে নয়, বরং আদর্শভিত্তিক এই বিপ্লবী সমাজে যোগ দিতে চায়নি। কিছু ইহুদি ও পৌত্তলিক মুহাম্মদকে (সা.) হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আবার অনেকে মক্কার সাথে যোগসাজশ করে উম্মাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা

করছিল। তারা সফল হলে মুসলিমরা সবাই নিশ্চিতভাবেই মক্কার ভয়াবহ প্রতিহিংসায় নিহত হতো। মৃত্যু ও গণহত্যা ঘটত। মক্কার বিরুদ্ধে মরিয়া লড়াইয়ে মুসলিমরা তাদের জীবন হারাচ্ছিল। তারা তাদের টিকে থাকার সংগ্রামে ইয়াসরিবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোত্রগুলোর তিনটিকে বসতি থেকে বহিষ্কার করে কিংবা একেবারে শেষ করে দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত গোত্রীয় সহিংসতা ও প্রতিহিংসার অপ্রতিরোধ্য চক্রের অবসান ঘটিয়ে নবী আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। একটির পর একটি গোত্র মুহাম্মদের (সা.) উম্মাহয় যোগ দেয়, এবং শেষ পর্যন্ত ৬৩০ সালে এমনকি গর্বিত নগরী মক্কাও মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য তার দরজা খুলে দেয়। মুহাম্মদ (সা.) রক্তপাত ছাড়াই তার নিজ শহর দখল করে নেন।

ইসলাম হলো শান্তি ও ঐক্যের ধর্ম। ইসরাইল-অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেইতায় মুসলিমরা একে অন্যের হাতে চুমু খাচ্ছে। নবী মুহাম্মদের (সা.) সময় থেকে এটি উম্মাহর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পদ্ধতি হিসেবে প্রচলিত রয়েছে।

ইসলামের জন্ম সহিংস হলেও পবিত্র কোরআনের আদর্শ সম্প্রীতি ও ঐক্যের। ইসলাম শব্দটির মূল হচ্ছে সালাম (শান্তি)। পবিত্র কোরআনের মহান আদর্শ হলো তৌহিদ বা (এক হওয়া)। ব্যক্তি মুসলিমরা তাদের জীবনকে এমনভাবে বিন্যস্ত করবে যেখানে আল্লাহই হবেন তাদের সর্বোচ্চ বিষয় : তারা এই ব্যক্তিগত একীকরণ অর্জন করতে পারলে আল্লাহর সাথে মিলনের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। পুরো মানব সমাজকে এই ঐক্য ও ভারসাম্য অর্জন করতে হবে, তার সব কার্যক্রম ঐশী সত্তার সুরক্ষায় থাকতে হবে। মুসলিমদেরকে তাই আল্লাহর দেখানো আদি পূর্ণাঙ্গতার দিকে মানুষ ও প্রাকৃতিক জগতের সবকিছুকে চালিত করার জন্য বিরামহীন জিহাদে (সংগ্রামে) নিয়োজিত থাকতে হবে। আর এর ধারাবাহিকতায় ধর্মের মধ্যে কোনো বিভক্তিকর সাম্প্রদায়িকতা থাকতে পারবে না। শুরুতে মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বাস করতেন যে ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা একই বিশ্বাসের অধিকারী। তিনি দুঃখের সাথে আবিষ্কার করলেন যে কোনোভাবেই প্রমাণ করা যায় না, এমন মতবাদগত বিষয়াদি নিয়ে তারা বিবাদে নিয়োজিত। ইয়াসরিবের বেশির ভাগ ইহুদি তাকে সত্য নবী হিসেবে স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করলে এবং মুসলিমদের সামনে তাদের

দরজা বন্ধ করে দিলে, তা ছিল তার জন্য চরম বেদনাদায়ক বিষয়। এরপর পবিত্র কোরআন মুসলিমদেরকে মূলে তথা ইব্রাহিমের বিশুদ্ধ ধর্মে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলো। কারণ ইব্রাহিম তাওরাত বা গসপেলের আগের আমলের লোক হওয়ায় তিনি ইহুদি বা খ্রিস্টান কোনোটিই ছিলেন না। তিনি স্রেফ ছিলেন মুসলিম। তিনি আল্লাহর কাছে তার জীবনকে সমর্পণ করেছিলেন। ইয়াসরিবের অধিকতর বন্ধুপ্রতীম ইহুদিদের কাছ থেকে মুহাম্মদ (সা.) শিখেছিলেন যে আরবরা মনে করে তারা ইব্রাহিমের ছেলে ইসমাইলের বংশধর : তারাও নিজেদের ইব্রাহিমের সন্তান ভাবতে পারে, যেমন মনে করে ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা।

তবে মুহাম্মদ (সা.) এও বিশ্বাস করেছিলেন যে সব ইহুদি বা খ্রিস্টান এই বর্জনশীল সাম্প্রদায়িকতায় আবদ্ধ নয়। তিনি নিজে ইহুদিদের বিরুদ্ধে মরিয়া সংগ্রামে নিয়োজিত হলেও জোর দিয়ে তার অনুসারীদের বলেছেন, তাদেরকে অবশ্যই আগেকার কিতাবের অনুসারী তথা আহলে কিতাবিদের সম্মান করতে হবে:

তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া কিতাবিদের সাথে বিতর্ক করো না, তবে তাদের সাথে করতে পারো, যারা তাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী। এবং বলো, 'আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

পবিত্র কোরআনে বারবার জোর দিয়ে বলেছে যে মুহাম্মদের (সা.) ওহি আগের নবী তথা আদম, নূহ, ইব্রাহিম, ইসহাক, ইসমাইল, যব, মুসা, দাউদ, সোলায়মান ও ঈশার শিক্ষা বাতিল করেনি। পবিত্র কোরআন একটিমাত্র বার্তা বারবার বলেছে ও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে আল্লাহই সব জাতিকে পাঠিয়েছেন। মানবীয় সব ব্যবস্থাকে ছাপিয়ে যাওয়া আল্লাহর বদলে কোনো মতবাদ বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া পৌত্তলিকতা। ইব্রাহিমের মূল বিশ্বাসে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে মুসলিমেরা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয় বরং আল্লাহকেই তাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

মানুষের ধর্মীয় অনুসন্ধানের এই অনিবার্য ঐক্যের এই স্বপ্নাবিভাব জেরুসালেমে মুসলিম নীতিতে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। পূর্বসূরিদের চেয়ে মুসলিমদের অনেক ভিন্ন ঐশী ভূগোল ছিল। সবকিছুই আল্লাহর কাছ থেকে আসায় সবকিছুই ছিল ভালো। ফলে ইহুদি ধর্মের মতো পবিত্র' ও 'অপবিত্রের' মধ্যে অনিবার্য কোনো দ্বি-বিভাজন ছিল না। উম্মাহর লক্ষ্য হলো ঐশী সত্তা ও মানুষ, ভেতর ও বাইরের দুনিয়ার মধ্যে এমন একীকরণ ও ভারসাম্যের ব্যবস্থা করা যা এ ধরনের বিভাজনকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে। 'ভালোর' বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা অন্তর্নিহিত 'পাপী' বলে কিছু নেই, 'শয়তানি' রাজ্য বলেও কিছু নেই। এমনকি শেষ দিনে শয়তানকেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সবকিছুই পবিত্র ও এর ঐশী সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করতে হবে। ফলে সব স্থানই ঐশী, কোনো স্থান অন্য স্থানের চেয়ে বেশি পবিত্র নয়। তারপরও ইসলাম বাস্তববাদী বিশ্বাস হওয়ায় মুহাম্মদের (সা.) জানা ছিল যে কোনো কিছুর দিকে নিবদ্ধ থাকতে হলে প্রতীকের প্রয়োজন। প্রাথমিক বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় মুসলিমেরা তিনটি স্থানকে বিশ্বের ঐশী কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করতে শিখেছিল।

এসবের মধ্যে প্রথমটি হলো মক্কা। নগরীর কেন্দ্রস্থলে কিউব-আকৃতির গ্রানাইটের একটি উপাসনালয় ছিল। সুপ্রাচীন এই স্থাপনাটি কাবা নামে পরিচিত ছিল। এটিকে আরবের সবচেয়ে পবিত্র স্থান হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হতো। প্রতি বছর সমগ্র উপদ্বীপ থেকে গোত্রগুলো কষ্টসাধ্য ও জটিল হজ অনুষ্ঠান পালন করতে সমবেত হতো। পৌত্তলিকদের পাশাপাশি খ্রিস্টান আরবেরাও হজে শরিক হতো। মুহাম্মদের (সা.) সময় নাগাদ কাবা উৎসর্গ করা ছিল নাবাতিয়ান দেবতা হুবলের নামে। এর চারপাশ পরিবেষ্টিত ছিল আরব দেবমণ্ডলের নানা মূর্তিতে। তবে শুরুতে এটি পরম স্রষ্টা আল্লাহর ইবাদতগাহ হিসেবে পরিচিত ছিল। বেশির ভাগ ঐশী স্থানের মতো কাবাকেও পৃথিবীর কেন্দ্রে দণ্ডায়মান বলে মনে করা হতো : বেহেশতের দরজা সরাসরি এর ঠিক ওপরে বলে বিবেচিত হতো। ফলে এটিই ছিল ওই স্থান যেখান থেকে ঐশী বিশ্ব নিজেও দুনিয়ায় প্রবেশ করতে পারত। কাবার প্রাচীরে গাঁথা ছিল একটি কালো পাথর। একসময় আকাশ থেকে পড়া এই ধূমকেতুর টুকরাটি বেহেশত ও দুনিয়ার মধ্যে সংযোগ সাধন করেছিল। জেরুসালেমের হেরডের টেম্পলের মতো মক্কার পবিত্রতা (হারাম) বাস্তবতার সামগ্রিতা

প্রতিনিধিত্ব করত, এবং স্বকীয়তার প্রতিনিধিত্ব করত কাবা। বাক্স- আকৃতির উপাসনালয়টি পৃথিবীকেও প্রতীকীভাবে ফুটিয়ে তুলত, এর চার কোণ একটি কেন্দ্রীয় স্থান থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরণ ঘটাত। উপাসনাকারীরা মাঝামাঝি গতিতে, পাস জিমনেটিকের মতোই, সূর্যের দিক অনুসরণ করে সাতবার কাবাঘর তওয়াফ করত। তারা এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের ছন্দ ও গতির সাথে প্রতীকীভাবে নিজেদের স্থাপন করত, সঠিক দিক ও সঠিক পথ গ্রহণ করত। প্রায় সব সংস্কৃতিতেই বৃত্ত হলো উৎকর্ষতা ও শ্বাশততার প্রতীক। এসব তওয়াফের মাধ্যমে আরবরা দুনিয়াবি বাস্তবতা থেকে ঐশী সামগ্রিতার অনুভূতিতে প্রবেশ করত। তাওয়াফ ছিল ধ্যানশীল অনুশীলন : গতিশীল মহাবিশ্বের স্থির, ছোট বিন্দুকে চক্কর দিয়ে তীর্থযাত্রীরা নিজেদের অবস্থান জানত, তাদের নিজদের কেন্দ্র ও অগ্রাধিকারগুলো খুঁজে নিত। বর্তমানে হাজিরা মনে করে যে অন্যান্য হাজির সাথে তওয়াফ করার মাধ্যমে জাতির একজনে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে তারা অহংকে মিশিয়ে অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কাবার পবিত্রতা ২০ মাইল ব্যাসার্ধ পর্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। এই পবিত্র স্থানে সব ধরনের সহিংসতা নিষিদ্ধ। ফলে এটি ছিল বিরামহীন উপজাতীয় লড়াই থেকে আশ্রয়স্থান। মক্কার বাণিজ্যিক সফলতার কারণ ছিল এটি। আরবরা নিশ্চিন্তমনে সেখানে মিলিত হতে পারত, শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা ছাড়াই ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারত।

কাবার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ততা অনুভব করতেন মুহাম্মদ (সা.)। তিনি হারামে ইবাদত করতে পছন্দ করতেন, সেখানে পবিত্র কোরআন তেলায়াত করতেন, তাওয়াফ করতেন। তিনি সম্ভবত প্রাক-ইসলামি আরবে প্রচলিত কিংবদন্তিটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে প্রথম মানুষ আদম এই ঐশী স্থানে আদি উপাসনালয় নির্মাণ করেছিলেন। অর্থাৎ এটি হলো সমগ্র বিশ্বে আল্লাহর সম্মানে নির্মিত প্রথম উপাসনালয়। মক্কার হারাম ইডেন উদ্যানের স্থান। এখানেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, পশু-পাখির নাম দিয়েছিলেন, ফেরেশতাদের সম্মান লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ হারানো বেহেশতের প্রতিনিধিত্ব করত মক্কা। এই পবিত্র স্থানে ঐতিহ্যবাহী ইবাদত করার মাধ্যমে ক্ষণিকের জন্য সেই বেহেশতে প্রবেশ করা যায়। ইবাদতগাহটি পরে আদমের ছেলে শিশ, মহাপ্লাবনের পর নূহ এবং ইব্রাহিম ও ইসমাইল পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। সবশেষে এটি পুনঃনির্মাণ করেছিলেন মক্কার

কোরাইশ গোত্রের পূর্বপুরুষ কুশে বিন কিলাব। বর্তমানের সাথে অতীতকে, মানুষের সাথে ঐশী সত্তাকে, বহির্বিশ্বের সাথে অন্তঃবিশ্বকে সংযুক্তকারী স্থাপনা হলো কাবা।

কিন্তু তবুও মুহাম্মদ (সা.) তার প্রথম ধর্মান্তরিতদেরকে অন্তরের ইসলামের বাহ্যিক প্রকাশ হিসেবে আল্লাহর সামনে নামাজ পড়ার সময় কাবার বদলে জেরুসালেমের দিকে সিজদা করতে বলেছিলেন। কাবা এখন মূর্তির কারণে দূষিত হয়ে পড়েছে। ফলে মুসলিমদেরকে এখন এক আল্লাহর উপাসক ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। কিবলা (নামাজের দিক) তাদের গোত্রীয় চেতনা থেকে সামগ্রিক মানবতার আদি বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টিই তুলে ধরেছিল। এটি আহলে কিতাবিদের সাথে সংহতি ও ধারাবাহিকতার ব্যাপারে মুহাম্মদের (সা.) অনুভূতিও প্রকাশ করেছে। ৬২৪ সালের জানুয়ারিতে যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে ইয়াসরিবের বেশির ভাগ ইহুদি মুহাম্মদকে (সা.) কখনোই গ্রহণ করবে না, তখন উম্মাহ অপেক্ষাকৃত পুরনো বিশ্বাসগুলো থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র ঘোষণা করল। মুহাম্মদ (সা.) জামায়াতে নামাজ পড়ার সময় জেরুসালেম থেকে মুখ ফিরিয়ে মক্কায় দিকে নামাজ পড়লেন। এই কিবলা পরিবর্তনের ঘটনাকে মুহাম্মদের (সা.) অন্যতম সৃষ্টিশীল ইচ্ছাপ্রকাশ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিবাদমান নানা গ্রুপে বিভক্ত হওয়ার আগে ইব্রাহিমের যে আদি বিশ্বাস প্রচলিত ছিল তাতে মুসলিমদের প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিতময় ছিল এটি। এটি ছিল ঐক্য খুঁজে পাওয়ার একটি প্রয়াস, যা সত্যিকারের মুসলিম ইব্রাহিমের পুনঃনির্মিত আদি ইবাদতগাহের প্রতিনিধিত্ব করত। কাবার সাথে ইহুদি বা খ্রিস্টানদের কোনো সম্পৃক্ততা না থাকায় মুসলিমরা কৌশলে ঘোষণা করল যে তারা খোদ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠিত ধর্মের কাছে নতি স্বীকার করবে না :

যারা দ্বীন সম্পর্কে নানা মতের সৃষ্টি করে করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো দায়িত্ব তোমাদের নয়...

বলো, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন... ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ও তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

বলো, 'আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতগুলোর প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্যেই।

কিবলা পরিবর্তনের ঘটনাটি ইয়াসরিবে হিজরতকারী প্রবাসী মক্কার মুসলিমদের জন্য সান্ত্বনাদায়কও ছিল। এটি তাদের বাস্তুচ্যুত হওয়ার অনুভূতি উপশম ঘটায়, প্রতীকীভাবে বাড়ির ঐশী সম্পৃক্ততার প্রতি তাদেরকে প্রতীকীভাবে চালিত করে।

মুহাম্মদ (সা.) ৬৩০ সালে যখন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তার প্রথম কাজ ছিল মূর্তিগুলো গুঁড়িয়ে ও হুবলের কুশপুত্তলিকা অপসারণ করে কাবাকে পরিশুদ্ধ করা। দুই বছর পর মৃত্যুর আগে তিনি পুরনো পৌত্তলিক হজ অনুষ্ঠান পালন করে সেটিকে নতুন, একেশ্বরবাদী ব্যাখ্যা দেন। এগুলো এখন আবারো জনমানবহীন প্রান্তরে ইব্রাহিমের পরিত্যাগ করা হাজেরা ও ইসমাইলের অভিজ্ঞতার প্রতীকে পরিণত হলো। মক্কা মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্র স্থান হিসেবে বহাল থাকল, হারাম পরিণত হলো ইসলামি ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রতীকী প্রকাশ। পবিত্র কোরআন সবসময় মুসলিমদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে 'নিদর্শন' ও 'প্রতীকের' (আয়াত) আলোকেই আমরা কেবল আল্লাহর কথা বলতে পারি। পবিত্র কোরআনের প্রতিটি পংক্তিকে বলা হয় আয়াত বা উপমা। আর বেহেশত, শেষ বিচার ইত্যাদিও নিদর্শন। কারণ আল্লাহ ও তার সৃষ্টি কেবল আলঙ্কারপূর্ণ অবয়বেই মানুষ প্রকাশ করতে পারে। ফলে মুসলিমরা প্রতীকীভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, আদিম ঐশী স্থান মক্কার পবিত্রতাকে ইসলামি স্বপ্নবিভাবের সামগ্রিক গতিশীলতা প্রতিফলনকারী বলে বিবেচনা করতে পারত। এক আল্লাহ ও এক ধর্ম যেমন অনেক অবয়বে প্রকাশিত হতে পারে, ঠিক সেভাবেই একটি পবিত্র স্থান মক্কাও বহুত্বকে প্রকাশ করতে পারে। এর পরে আত্মপ্রকাশ করা ইসলামি বিশ্বের অন্য সব পবিত্র স্থান তাদের পবিত্রতা লাভ করেছিল মক্কা থেকে এবং সেগুলো এই কেন্দ্রীয় পবিত্রতার সম্প্রসারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে মহাবিশ্বও আল্লাহর একটি আয়াত এবং একইভাবে তার উপস্থিতি প্রকাশ করে। ইসলামি বিশ্বের অন্য সব ইবাদতখানাও এ কারণে পবিত্রতার সমরূপ প্রতীক মক্কার মডেলে হয় : এটি হবে তৌহিদের প্রকাশ, মহাবিশ্বের মিলনকেন্দ্র ও একীকরণের স্থান।

অন্য যেসব সবচেয়ে পবিত্র স্থান রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো জেরুসালেম। মুসলিমরা কখনো ভোলেনি যে আহলে কিতাবের পবিত্র নগরী তাদের প্রথম কিবলা। এই নগরী এমন এক প্রতীক যা তাদেরকে স্বতন্ত্র ইসলামি পরিচিতি গঠন করতে, তাদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের পৌত্তলিক প্রথা থেকে সরিয়ে একটি নতুন ধর্মীয় পরিবারে পরিণত করতে সহায়তা করেছিল। জেরুসালেম এই বিচ্ছিন্নতার বেদনাদায়ক প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সবসময় মুসলিমদের আধ্যাত্মিক দৃশ্যপটে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এটি ইসলামি ধারাবাহিকতার অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা স্বীকার করুক বা না করুক আহলে কিতাবের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। মুসলিমেরা এই নগরীকে বলবে মাদিনাত বায়তুল মোকাদ্দিস বা 'সিটি অব দি টেম্পল'। এটি দীর্ঘ দিন ধরে ছিল তাদের একেশ্বরবাদী পূর্বসূরীদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। মহান নবী দাউদ ও সোলায়মান এখানে ইবাদত করেছেন, এই স্থান শাসন করেছেন : সোলায়মান একটি পবিত্র মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। নগরীটি ঈশাসহ (যিশু) আরো কয়েকজন পবিত্রতম নবীর সাথেও সম্পৃক্ত, মুসলিমেরা তাদের অত্যন্ত সম্মান করে। অবশ্য মুসলিমেরা বিশ্বাস করে না যে যিশু ছিলেন ঈশ্বর।

পরবর্তীকালে মুসলিমেরা দাবি করেছিল যে নবী মুহাম্মদও (সা.) জেরুসালেম সফর করেছিলেন। আল্লাহ এক রাতে মক্কা থেকে অলৌকিকভাবে ওই যাত্রার বর্ণনা করেছেন :

পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তার বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন উপাসনার অলঙ্ঘনীয় ঘর [মসজিদুল হারাম] থেকে দূরের মসজিদে মসজিদুল আকসা], যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

মসজিদুল হারাম নিশ্চিতভাবেই কাবা, কিন্তু জেরুসালেমের সাথে দূরের মসজিদের কোনো সংযোগের কথা পবিত্র কোরআনে নেই। তবে সম্ভবত মুহাম্মদের (সা.) কয়েক প্রজন্ম পরে মুসলিমেরা এটি শনাক্ত করেছিল। তারা বলে, হিজরতের আগে ৬২০ সালের দিকে এক রাতে মুহাম্মদ কাবায় ইবাদত করার সময় জিবরাইল ফেরেশতা তাকে জেরুসালেম নিয়ে যান। তারা বোরাক নামে পাখাযুক্ত ঘোড়ায় উড়ে ওই রাতে টেম্পল মাউন্টে অবতরণ

করেন। সেখানে মুহাম্মদের (সা.) পূর্বসূরি বিপুলসংখ্যক নবী তাকে স্বাগত জানান। এরপর জিব্রাইল ও মুহাম্মদ (সা.) টেম্পল মাউন্ট থেকে খোদার সিংহাসন পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মইয়ে (আল-মিরাজ) করে সাত আসমান পাড়ি দেন। প্রতিটি ঐশী মণ্ডলে একেক নবী- আদম, ঈশা, জন দি ব্যাপ্টিস্ট, ইউসুফ, ইউনুস, হারুন, মুসা ও সবশেষে ইব্রাহিম- স্বাগত জানান। সেখানে মুহাম্মদ (সা.) চূড়ান্ত ওহি লাভ করেন, এই ওহি মানবীয় উপলব্ধি সীমার বাইরে নিয়ে যায় তাকে। তার সর্বোচ্চ আসমানে আরোহণ ইসলামের চূড়ান্ত কাজ হিসেবে বিবেচিত। এটি ছিল সব সৃষ্টির উৎসের কাছে ফিরে যাওয়া। মুহাম্মদের (সা.) নৈশ সফর (আল-ইসরা) ও আরোহণ (আল-মিরাজ) সুস্পষ্টভাবেই ইহুদি মরমিসাধকদের 'থ্রন ভিশনের' স্মৃতিবাহী। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি অপেক্ষাকৃত পুরনো বিশ্বাসগুলোর সাথে ধারাবাহিকতা ও সংহতির মুসলিম বিশ্বাসের নিদর্শন। কাবা থেকে মুসলিমদের নবীর টেম্পল মাউন্টের যাওয়ার ঘটনাটি মক্কার পবিত্রতা জেরুসালেমে তথা আল মসজিদ আল-আকসায় ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ও প্রকাশ করে। দুই নগরীর মধ্যে ঐশীভাবে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে ইসলামি বিশ্বে জেরুসালেম হলো স্রেফ তৃতীয়-সর্বোচ্চ পবিত্র স্থান। দ্বিতীয়টি ছিল প্রথম উম্মাহর বাসস্থান ইয়াসরিব। মুসলিমেরা এই নগরীকে বলে মদিনা তথা 'নগরী'। মুহাম্মদ (সা.) তার ছোট্ট ধর্মান্তরিত গ্রুপটিকে মদিনায় নিয়ে যাওয়ার সময় আদি পবিত্র স্থান মক্কার ঐশ্বিতা এই নতুন নগরীতে আরোপ করেছিলেন। মৃত্যুর পর মুহাম্মদ (সা.) মুসলিমদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা লাভ করেন 'পূর্ণাঙ্গ মানুষ' হিসেবে : তিনি ঐশী সত্তা ছিলেন না। যিশুর প্রতি যেভাবে দেবত্ব আরোপ করেছিল সে ধরনের কিছু তার ওপর আরোপ করতে মুহাম্মদ (সা.) ক্লান্তিহীনভাবে বারণ করেছিলেন। তবে ঐশী সত্তা না হলেও তার বিশ্বাস, সদগুণ, আল্লাহর কাছে সমর্পণ এত সর্বাত্মকরণে ছিল যে তিনি তার নিজ ব্যক্তিত্বে বেহেশত ও দুনিয়ার মধ্যে জীবন্ত সংযোগ (কুতুব) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অর্থাৎ মুসলিমেরা পবিত্র স্থানের প্রাচীন নিদর্শনের সাথে পবিত্র মানুষের অধিকতর সাম্প্রতিক ধর্মমতের সমন্বয় সাধন করেছিল। মানুষ ও সেইসাথে স্থানও আসমান ও দুনিয়ার মধ্যে সংযোগ সাধন করতে পারে। তবে নবীর বাড়ি মদিনা, আরো বিশেষভাবে মুহাম্মদের (সা.) কবরটি (এখানেই তার উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত ছিল) বেহেশতের পৃথিবীকে স্পর্শ

করার স্থানে পরিণত হয়। মদিনাও পবিত্র স্থান। কারণ উম্মাহ অস্তিত্ব লাভ করেছিল এখানেই। তৌহিদের অভিন্ন মূলনীতিতে সব ভবিষ্যত ইসলামি নগরী ও রাষ্ট্র মদিনার আদি পবিত্রতায় সামিল হয়। মদিনা পরিণত হয় আল্লাহর শাসনে মানবজীবনের সামগ্রিকতাকে আনার প্রয়াসের নিদর্শন।

একইভাবে ইসলামি বিশ্বে নির্মিত ভবিষ্যতের সব মসজিদও হয় মদিনায় মুহাম্মদের (সা.) নির্মিত প্রথম সাদামাটা মসজিদের মডেলে। অগোছাল এই ভবনটি প্রাথমিক ইসলামি আদর্শের কৃচ্ছ্র ও সরলতা প্রকাশ করেছিল। তিনটি গাছের কাণ্ড ছাদকে ঠেকিয়ে রেখেছিল, একটি পাথর নামাজের দিক কিবলার চিহ্ন নির্দেশক ছিল। খোতবা দেওয়ার জন্য মুহাম্মদ (সা.) একটি চৌকিতে দাঁড়াতেন। এসবই অর্থাৎ ছাদকে ঠেস দেওয়ার জন্য কয়েকটি স্তম্ভ, মিরহাব, মক্কার দিক নির্দেশক কুলুঙ্গি, খোতবার জন্য মিম্বার পরবর্তীকালের মসজিদের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়। মদিনার মসজিদটির মতো করে একটি আঙিনাও রাখার ব্যবস্থা করা হয় এসব মসজিদে। এই আঙিনা প্রথম উম্মাহর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মুহাম্মদ (সা.) ও তার স্ত্রীরা এই আঙিনার চার দিকে তৈরি ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্ট বা কুঁড়ে ঘরে বাস করতেন। নগরীর গরিব মানুষেরা সাহায্য, খাবার ও পরিচর্যার জন্য এখানে জমায়েত হতে পারত। আঙিনায় অনুষ্ঠিত জনসমাগমগুলোতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়াদির সাথে ধর্মীয় বিষয় নিয়েও আলোচনা হতো। একইভাবে বর্তমান সময়েও মুসলিম সম্প্রদায়ের সব ধরনের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে মসজিদ ভূমিকা পালন করছে। এটি কেবল ধর্মীয় কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

আর পবিত্রতাকে অনিবার্যভাবেই ইহজগত থেকে আলাদা বিবেচনাকারী ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছে এটি প্রায়ই বিস্ময়কর, এমনকি দুঃখজনকও মনে হয়। তারা কল্পনা করে, মুসলিমেরা যেহেতু মসজিদে তাদের বন্ধুদের সাথে খোশগল্প করে কিংবা রাজনৈতিক সভাসমাবেশ করে পবিত্রতাকে ‘ব্যবহার’ করে, কাজেই তারা তাদের মসজিদ ও প্রার্থনার স্থানগুলোকে সত্যিকার অর্থে ঐশী বিবেচনা করে না। কিন্তু আসলে ঐশী সত্তা-সম্পর্কিত ইসলামি ধারণা নিয়ে ভ্রান্ত চিন্তার কারণেই এমনটা মনে হয় তাদের। ইসলামে ঐশী সত্তাকে আসলে বিচ্ছিন্ন কিছু (জেরুসালেমের কাদ্দশ) বিবেচনা করা হয় না, বরং

এমন কিছু বোঝায় যা সমগ্র জীবনকে উদ্দীপ্ত করে। মুহাম্মদ (সা.) মসজিদের আঙিনায় তার স্ত্রীদের জন্য ঘর বানিয়ে দেখালেন যে যৌনজীবন, ঐশী সত্তা ও গৃহস্থালী জীবন- বাস্তবিকই ও অত্যাবশ্যকভাবে- পূর্ণাঙ্গতা এনে দিতে পারে। একইভাবে রাজনীতি, সমৃদ্ধি ও সমাজজীবনের সুবিন্যাস অবশ্যই পবিত্রতার আওতাধীন ও আল্লাহর শাসনের অধীনে আনতে হবে। ইসলামে পবিত্রতাকে তাই বর্জনকর না ভেবে বরং অন্তর্ভুক্তিমূলক বিবেচনা করা হতো। মদিনার খ্রিস্টানদেরকে মসজিদে প্রার্থনা করতে দেওয়া হতো। এটি ছিল গসপেলের সাথে ইসলামি ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার প্রকাশ। মসজিদের বহুমুখী কার্যক্রম ছিল তাই তৌহিদের প্রকাশ, মানবজীবনের সামগ্রিক পরিসরকে ধর্মীয় পরিধির মধ্যে নিয়ে আসা। অধিকন্তু, সব স্থানই সহজাতভাবে পবিত্র হওয়ায় মসজিদকে এর আশপাশের এলাকা থেকে বেড়া দিয়ে আলাদা করার দরকার হতো না। বলা হয়ে থাকে নবী বলেছেন : 'দুনিয়াকে গালাগাল করো না, কারণ দুনিয়া হলো আল্লাহ।' আর পবিত্র কোরআন অব্যাহতভাবে আয়াতের মতো করেই দুনিয়ার সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলাকে বিবেচনা করতে বলেছে। এ কারণে গাছপালা, যা টেম্পল মাউন্টে নিষিদ্ধ ছিল, মুসলিম উপাসনালয়ে উৎসাহিত করা হয়। আঙিনায় থাকবে ঝরনা, আর মসজিদ হতে হবে পুরোপুরি আলোতে উদ্ভাসিত; পাখিরা জুমার নামাজের সময় সেখানে উড়তে পারবে। দুনিয়াকে বাইরে না রেখে মসজিদের ভেতরে আমন্ত্রণ জানানো হবে। মদিনার মূলনীতি ইসলামি বিশ্বের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান জেরুসালেমেও দৃশ্যমান হয়েছিল।

মুহাম্মদ (সা.) ৬৩২ সালের ৬ জুন ইন্তিকাল করেন। তিনি প্রায় পুরো আরবকে তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তবে আরব উপদ্বীপে গোত্রীয় যুদ্ধ এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে তার মৃত্যুর পর উম্মাহ ভেঙে পড়ার প্রকৃত বিপদে পড়েছিল। মদিনার সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ অনেক গোত্র তার ধর্মের সাথে না হয়ে নবীর সাথে অনেক বেশি সম্পৃক্ত ছিল। ফলে তার মৃত্যুর পর তারা

তার উত্তরসূরি (খলিফা) আবু বকরের সাথে থাকার গরজ অনুভব করল না বা ইসলামি কোষাগারে ধর্মীয় কর (জাকাত) দিতে চাইল না। স্থানীয় 'নবীরা' মুহাম্মদের (সা.) প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চেয়ে উম্মাহ থেকে বের হয়ে গেলেন। আবু বকরকে বিদ্রোহী আসাদ,

তামিম, গাতাফান ও হানিফা গোত্রের বিরুদ্ধে নির্মম অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিল। বিদ্রোহ দমন করার পরপরই আবু বকর সম্ভবত উম্মাহর দুর্দমনীয় শক্তিগুলোকে বাইরের শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে উম্মাহর অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা দূর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ঘটনা যাই হোক না কেন, ৬৩৩ সাল নাগাদ মুসলিম সেনাবাহিনী পারস্য, সিরিয়া ও ইরাকে নতুন নতুন অভিযান শুরু করে। ৬৩৪ সালে আবু বকর ইন্তিকাল করার সময় একটি আরব সেনাবাহিনী বাহরাইন থেকে পারসিকদের বিতাড়িত করে, আরেকটি বাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে গাজা জয় করে।

প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এসব যুদ্ধ ধর্মীয় প্রণোদনাপূর্ণ ছিল না : পবিত্র কোরআনে ইসলামের জন্য বিশ্ব জয় করতে হবে এমন কর্তব্যের কথা বিশ্বাস করতে মুসলিমদের উৎসাহিত করেনি। অবশ্য এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে মুহাম্মদ (সা.) তার জীবনের শেষ দিকে আরো আরবকে উম্মাহয় সামিল করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ৬৩০ সালে তিনি আরব উপদ্বীপে উত্তর অঞ্চলে সামরিক অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অবশ্য এই পর্যায়ে খ্রিস্টান ধর্মের মতো মিশনারি ধর্ম ছিল না ইসলাম। বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করলে মুহাম্মদ (সা.) প্রত্যাশা করতেন না যে ইহুদি বা খ্রিস্টানেরা ইসলামে ধর্মান্তরিত হোক। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে তারা তাদের নিজস্ব বৈধ ওহি পেয়েছে। প্রাথমিক দিনগুলোতে মুসলিমেরা ইসলামকে বিবেচনা করত ইসমাইলের বংশধর আরবদের জন্য দেওয়া একটি ধর্ম, ঠিক যেমন ইয়াকুবের বংশধরদেরকে দেওয়া হয়েছিল ইহুদি ধর্ম। ইসলামে ধর্মান্তরিত বেদুইনেরা সাথে সাথে অস্ত্রের জোরে অনীহ বিশ্বে নতুন ধর্ম চাপিয়ে দিতে আরবের বাইরে ছুটে গিয়েছিল বলে পুরনো ধারণাটি আধুনিক ইতিহাসবিদেরা পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছেন। বেশির ভাগ মুসলিম জেনারেলের সম্ভবত অনেক বেশি দুনিয়াবি উদ্দেশ্য ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আরব বিশুষ্ক তৃণপ্রধান বৃক্ষহীন প্রান্তরের যাযাবরেরা আরো উর্বরা ভূমি ও আরো ভালো পশু চারণভূমির সন্ধানে উপদ্বীপ থেকে ছুটে বের হতে চেয়েছে। তখন পর্যন্ত দুটি পরাশক্তি বায়েজান্টাইন ও পারস্যের সেনাবাহিনী তাদের নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছিল। তবে ক্ষমতার শূন্যতার সুযোগে ৬৩৩ সালে মুসলিমেরা তাদের বৈদেশিক অভিযান শুরু করে। একে অপরের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ করে করে পারস্য ও বায়েজান্টাইন উভয়েই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। দুই সাম্রাজ্যের কিছু সৈন্য

ছিল আরব। তারা আক্রমণকারীদের সাথে জাতিগত বন্ধন অনুভব করে মুসলিম সেনাবাহিনী যোগ দিয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আরব সীমান্তে থাকা ঘাসান গোত্রটি দীর্ঘ দিন ধরে ছিল কনস্টানটিনোপলের অনুগত। তাদের দায়িত্ব ছিল আরব যাযাবরদের কোণঠাসা করে রাখা। কিন্তু বায়েজন্টাইনরা সম্প্রতি ভর্তুকি প্রত্যাহার করায় তারা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল। তারা ধর্মীয় কারণে নয়, বরং আরব সংহতির অস্পষ্ট অনুভূতিতে পক্ষ ত্যাগ করে উম্মাহর সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। সিরিয়া ও ইরাকে থাকা আরামাইক ও সেমিটিক উপাদানগুলো হয় আরব অভিযানের ব্যাপারে উদাসীন ছিল কিংবা এতে উৎসাহিত ছিল। আমরা বায়েজান্টাইন সাম্রাজ্যে দেখেছি, খ্রিস্টান সম্রাটদের নির্যাতনমূলক নীতির ফলে মনোফাইসিত মুরতাদরা ও বিশাল ইহুদি জনসাধারণ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তারা বায়েজন্টাইনদের সমর্থন করতে ইচ্ছুক ছিল না। ফিলিস্তিনে ইহুদিরা বিশেষভাবে মুসলিমদের স্বাগত জানিয়েছিল। এসব জটিল কারণে মুসলিম সেনাবাহিনী তুলনামূলক সহজে পুরনো সাম্রাজ্য দুটির বেশ বড় পরিমাণ ভূখণ্ড জয় করতে পেরেছিল।

আবু বকরের মৃত্যুর পর নবীর সবচেয়ে সংযমী ও আবেগপ্রবণ সাহাবা খলিফা উমর পারস্য ও বায়েজান্টাইন উভয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখেন। মুসলিমেরা বেশ ধনী হতে শুরু করলেও উমর কিন্তু মুহাম্মদের (সা.) মতোই সাদামাটা জীবনযাপন অব্যাহত রাখেন। তিনি সবসময় একটি পুরনো তালি দেওয়া উলের জোব্বা পরতেন, অন্য সব সৈনিকের মতো নিজের বোঝা নিজে বইতেন এবং জোর দিয়ে বলতেন যে তার অফিসারদেরও একইভাবে চলতে হবে। অর্থাৎ ফিলিস্তিনে ইসলাম এসেছিল কর্মশক্তিসম্পন্ন বিশ্বাস হিসেবে, ধর্মটির প্রথম উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে। অন্য দিকে বায়েজান্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস তার অনেক প্রজাকে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বিষণ্নতায় অসুস্থ, আধ্যাত্মিক সঙ্কটে জর্জরিত। তিনি আশঙ্কা করতেন, মুসলিম অভিযান হলো ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির নিদর্শন। আরব সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনে তাদের অভিযান অব্যাহত রাখে। ৬৩৬ সালের ২০ আগস্ট ইয়ারমুকের যুদ্ধে বায়েজান্টাইন সৈন্যদের পরাজিত করে মুসলিমরা। যুদ্ধের মধ্যেই ঘাসানিরা বায়েজান্টাইন পক্ষ ত্যাগ করে তাদের আরব ভাইদের সাথে যোগ দেয়। ইহুদিদের সহায়তায় দেশের বাকি অংশ দখল করতে

থাকে মুসলিমেরা। হেরাক্লিয়াস কেবল একটু দম নিয়ে জেরুসালেমে প্রবেশ করে ট্রু ক্রুশ' নিয়ে চির দিনের জন্য সিরিয়া ত্যাগ করেন। ৬৩৭ সালের জুলাই নাগাদ মুসলিম সেনাবাহিনী জেরুসালেমের প্রাচীরগুলোর বাইরে তাঁবু স্থাপন করে।

প্যাট্রিয়ার্ক সফ্রোনিয়াস বায়েজান্টাইন গ্যারিসনের সহায়তায় সাহসিকতার সাথে নগরীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থার আয়োজন করেন। কিন্তু ৬৩৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় খ্রিস্টানেরা। প্রচলিত রয়েছে যে প্যাটিয়ার্ক খলিফা উমর ছাড়া অন্য কারো হাতে পবিত্র নগরী হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। অন্যতম একটি প্রাচীন মুসলিম উৎস দাবি করেছে, উমর ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি পরে কোনো একসময় জেরুসালেম সফর করেন। তবে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ এখনো বিশ্বাস করেন যে উমরই নগরীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ওই সময় সিরিয়ায় ছিলেন। প্রাথমিক ইসলামে জেরুসালেমের মর্যাদার কারণে তিনিই এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় সভাপতিত্ব করতে চাইবেন, এমনটাই স্বাভাবিক। প্রচলিত ভাষ্যে বলা হয়, সফ্রোনিয়াস ঘোড়ায় চড়ে নগরীর বাইরে গিয়েছিলেন উমরের সাথে সাক্ষাত করতে। তারপর তিনি উমরকে সসম্মানে দিয়ে জেরুসালেমে নিয়ে এসেছিলেন। উমর নিশ্চিতভাবেই জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরা বায়েজান্টাইনদের মধ্যে মানানসই ছিলেন না। কারণ তিনি তার স্বাভাবিক জীর্ণ পোশাক পরে সাদা উটে চড়ে নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। এমনকি তিনি এই অনুষ্ঠানের জন্যও পোশাক পরিবর্তন করতে রাজি হননি। কয়েকজন খ্রিস্টান পর্যবেক্ষকের মনে হয়েছিল যে খলিফা আসরে কপট লোক। তারা সম্ভবত অস্বস্তিকরভাবে অবগত ছিল যে মুসলিম খলিফা তাদের নিজস্ব কর্মকর্তারদের চেয়ে অনেক বেশি করে পবিত্র দারিদ্র্যতার খ্রিস্টান আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন।

উমর জেরুসালেমের আগের যেকোনো বিজয়ীর, সম্ভবত ব্যতিক্রম ছিলেন রাজা দাউদ, চেয়ে অনেক বেশি সহানুভূতিসূচক একেশ্বরবাদী আদর্শ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নগরীর দীর্ঘ ও অসংখ্য মর্মান্তিক ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ও রক্তপাতহীন বিজয়ে সভাপতিত্ব করেন। খ্রিস্টানেরা আত্মসমর্পণ করার পর কোনো হত্যাকাণ্ড, সম্পত্তির ধ্বংস হয়নি, প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মীয় নিদর্শনে অগ্নিসংযোগ করা হয়নি,

কোনো বহিষ্কার বা সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ হয়নি, অধিবাসীদের বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়নি। নগরীর পূর্ববর্তী অধিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন যদি একেশ্বরবাদী শক্তির পূর্ণাঙ্গ প্রকাশক হয়ে থাকে, তবে বলতে হবে জেরুসালেমে ইসলাম তার দীর্ঘ শাসনকাল ঠিক সেভাবেই শুরু করেছিল।

উমর পবিত্র স্থানগুলো দেখতে চাইলে সফ্রোনিয়াস তাকে সোজা অ্যানাস্তাসিসে নিয়ে গেলেন। বস্তুত এই জটিল জাকালো ভবনগুলো ছিল যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্মারক। ফলে তা খলিফাকে খুশি করেনি। পবিত্র কোরআন ঈশাকে (যিশু) অন্যতম মহান নবী হিসেবে সম্মান করে। তবে বিশ্বাস করে না যে তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যিশুর বিপরীতে মুহাম্মদ (সা.) তার জীবদ্দশায় চোখ ধাঁধানো সাফল্য পেয়েছিলেন। আর মুসলিমদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে আল্লাহ কোনো নবীকে এ ধরনের লজ্জাজনকভাবে মৃত্যু অনুমোদন করবেন। আরবরা দৃশ্যত নিকট প্রাচ্যের অনেক এলাকায় প্রচলিত ডসেটিস্ত ও ম্যানিচেন আদর্শ গ্রহণ করেছিল। এতে বলা হতো, যিশুকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি মারা গেছেন। আর ক্রুশটি ছিল অপঃছায়া, কুহেলিকা সৃষ্টি করা হয়েছিল এর মাধ্যমে। বরং ইউনুস ও ইলিজার মতো ঈশাকেও তার জীবনের শেষ প্রান্তে বিজয়ীবেশে বেহেশতে চলে গিয়েছিলেন। পরে মুসলিমরা খ্রিস্টান বিশ্বাসকে নিন্দা করতে অ্যানাস্তাসিসকে আল-কিয়ামাহর (পুনরুত্থান) বদলে বলেছিল আল কুমামাহ ('গোবরের স্তূপ')। অবশ্য উমর এ ধরনের কোনো উগ্রতা প্রকাশ করেননি, এমনকি গুরুত্বপূর্ণ একটি সামরিক জয়ের উত্তেজনা সত্ত্বেও। তার কবরের পাশে দাঁড়ানোর সময় নামাজের সময় হয়ে গেল। সফ্রোনিয়াস খলিফাকে সেখানেই নামাজ আদায় করতে বলেন। উমর তা সৌজন্যতার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি কনস্টানটাইনের ম্যাটিরিয়ামে নামাজ পড়লেন না। এর বদলে তিনি বাইরে গিয়ে কারডো ম্যাক্সিমাসের ব্যস্ত রাস্তার পাশে নামাজ আদায় করেন। তিনি প্যাট্রিয়ার্কের কাছে বলেন, তার খ্রিস্টান উপাসনালয়ের ভেতরে নামাজ না পড়ার কারণ হলো, বায়তুল মোকাদ্দিসে খলিফার নামাজ পড়ার স্মৃতিকে ধরে রাখতে ইসলামি ইবাদাতগাহে পরিণত করার জন্য মুসলিমরা এসব স্থান বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারে। উমর সাথে সাথে একটি সনদ লিখে ম্যারটিরিয়ামের সিঁড়িতে নামাজ পড়া কিংবা সেখানে মসজিদ নির্মাণে মুসলিমদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পরে তিনি নেয়ায়

নামাজ পড়েন। তিনি এখানেও স্থাপনাটি খ্রিস্টানদের হাতে বহাল থাকা নিশ্চিত করতে সতর্কতা অবলম্বন করেন।

,

তবে খ্রিস্টানদের সম্পত্তি দখল না করেই একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গা প্রয়োজন ছিল মুসলিমদের। তারা সোলায়মানের টেম্পলটিও দেখার জন্য উতলা ছিল। ঐতিহ্যবাদী আল-ওয়ালিদ ইবনে মুসলিমের মতে সফ্রোনিয়াস চেয়েছিলেন ‘দাউদের মসজিদ’ হিসেবে ম্যারটিরিয়াম ও হলি সায়নের ব্যাসিলিকা দিয়ে দিতে। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি উমর ও তার সহযাত্রীদেরকে টেম্পল মাউন্টে নিয়ে যান। পারস্য দখলদারিত্বের সময় থেকেই, ওই সময় ইহুদিরা প্লাটফর্মে আবার উপাসনা শুরু করেছিল, খ্রিস্টানরা স্থানটিকে নগরীর আবর্জনা ফেলার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করছিল। মুসলিম ইতিহাসবিদ মুজির উদ্দিন জানান, টেম্পলের পুরনো বিধ্বস্ত ফটকগুলোতে পৌঁছানোর পর উমর আবর্জনা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন, ‘পবিত্র ইবাদতগাহের পুরোটাই [আবর্জনা] সয়লাব হয়ে গিয়েছিল, ফটকগুলোর সিঁড়িতে এত জমে গিয়েছিল যে ফটক খোলার জন্য পিছিয়ে রাস্তায় নেমে আসতে হয়েছিল। সবমিলিয়ে এত আবর্জনা যে মনে হচ্ছিল, প্রবেশপথের ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল তা।’ প্লাটফর্ম পর্যন্ত যাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল হাত আর হাঁটু ব্যবহার করে হামাগুড়ি দেওয়া। সফ্রোনিয়াস প্রথমে গেলেন, তারপর তার পেছন পেছন অনেক কষ্টে গেলেন মুসলিমেরা। শীর্ষে পৌঁছে মুসলিমেরা নিশ্চয় বিশাল ও পরিত্যক্ত সম্প্রসারিত হেরড প্লাটফর্মের দিকে কষ্টের সাথে তাকিয়েছিল। তখনো সেটি ইট-সুড়কি আর আবর্জনায় ভরা ছিল। সুদূর আরব পর্যন্ত যে পবিত্র স্থানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, সেটির এমন দুরাবস্থা দেখার কষ্ট কখনো বিস্মৃতির আড়ালে যায়নি: মুসলিমেরা দাবি করে, টেম্পল মাউন্টের প্রতি খ্রিস্টানদের গর্হিত আচরণের কারণেই তারা বদলা দিনতে আনাস্তাসিস আল-কামামাহকে ‘গোবরের স্তুপ’ বলে ডাকে।

উমর মনে হয় না পরবর্তীকালে ইসলামি ধর্মানুরাগে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এ স্থানটি যাচাই-বাছাই করার জন্য কোনো সময় ব্যয় করেছিলেন। পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেই তিনি আবর্জনা আর জঞ্জাল মুঠো মুঠো করে তার জোব্বায় তুলে নিয়ে নগর-প্রাচীরের

বাইরে হিন্নম ভ্যালিতে নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথে তার সহকর্মীরাও একই কাজে নিয়োজিত হন। ১২ বিশুদ্ধকরণের এই কাজ কনস্টানটাইনের অধীনে গলগোথা খননকাজের সাথে অমিল ছিল না। আবারো সদ্য দুর্দান্ত বিজয় লাভকারী একটি ধর্ম জেরুসালেমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আগের দখলকারদের অধার্মিকতা খুঁড়ে বের করেছিল ধর্মটির ভিত্তির সাথে ভৌত সংযোগ স্থাপন করার জন্য।

জেরুসালেমে মুসলিমদের আগমন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। হিজরতে প্রথম মুসলিম ধর্মান্তরিতরা বেদনার সাথে তাদের বাড়িঘর ও সবচেয়ে পবিত্র স্থানগুলো থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছিল। এখন আরব সেনাবাহিনী এমন এক বিশ্বে নিজেদের প্রবেশ করাতে শুরু করল যা ছিল আরবে পরিচিত তার রুচি ও সংস্কৃতিতে একেবারেই নতুন, তার সভ্যতার গণ্ডির সম্পূর্ণ বাইরে। তাদেরকে তাই তাদের নতুন বিশ্বাসকে প্রবলভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকা পুরাতাত্ত্বিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐহিত্যগুলোকে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। ইসলামি সেনাবাহিনী স্থায়ীভাবে এগিয়ে চলছিল তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। তবে এখন তারা বায়তুল মুকাদ্দিসের তথা মহান কয়েকজন নবীর আবাসভূমি ও তাদের প্রথম কিবলার মালিক। এটি ছিল এক ধরনের বাড়ি ফেরা, তাদের ধর্ম-পিতাদের নগরীতে দৈহিকভাবে 'প্রত্যাবর্তন'। ইসলাম এখন এসব প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে এমনভাবে অবয়বগতভাবে নিজেকে স্থাপন করতে পারে যা পবিত্র কোরআনের স্বপ্নাবিভাবের ধারাবাহিকতা ও সামগ্রিকতা প্রতীকীভাবে ফুটে ওঠে। বিশ্বকে পবিত্র করার মিশনে মুসলিমদেরও কর্তব্য রয়েছে একটি স্থানকে আবার পবিত্র করার, যা ভয়াবহভাবে অপবিত্র হয়ে গেছে।

প্লাটফর্মটি পরিষ্কার হওয়ামাত্র ইসলামে ধর্মান্তরিত ও ইসরাইলিয়াত (আমরা তাকে বলতে পারি 'ইহুদি স্টাডিজে' বিশেষজ্ঞ) ইহুদি কাব ইবনে আহবারকে তলব করেন। ইহুদিদের পূর্বপুরুষদের কাছে পবিত্র স্থানটি সম্পর্কে জানার জন্য মুসলিমদেরকে ইহুদিদের সাথে পরামর্শ করাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। ইহুদি ও মুসলিম উভয় সূত্রই স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, মাউন্টটির পুনরুদ্ধারে ইহুদিরা অংশগ্রহণ করেছিল। বলা হয়ে থাকে, তাইবেরিয়াস থেকে আসা একদল রাব্বিকে নিয়ে উমর জেরুসালেম ঘুরেছিলেন। দশম

শতকের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আবু জাফর আত- তাবারি বলেন, দাউদ, সোলায়মান ও টেম্পল-সম্পর্কিত কাহিনী থাকা পবিত্র কোরআনের ১৭ ও ১৮ তম সুরা তিলায়াত করতে করতে কাবের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন উমর। তারপর মাউন্টের কোন স্থানটি নামাজের জন্য সর্বোত্তম তা বলতে বলেন কাবকে। কাব টিলা (পাথর) বা রকটির উত্তরের একটি স্থান দেখিয়ে দেন। ধারণা করা হয় (প্রায় নিশ্চিতভাবেই তা ছিল ভ্রান্ত) যে এটি ছিল দেভিরের স্থান। মুসলিমেরা যদি সেখানে নামাজ পড়ে তবে নিশ্চিতভাবেই তারা মক্কা ও ইহুদি হলি অব হলিস উভয়টির সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারবে। ১৩ এটি নিশ্চিতভাবেই কিংবদন্তি। কারণ রকের (টিলা) প্রতি মুসলিমদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র ৫০ বছর আগে। তবে কাহিনীটি প্রকাশ করছে, অপেক্ষাকৃত পুরনো বিশ্বাসগুলোর ইসলামি স্বাধীনতার নীতিমালা ধারণ করেছিল মুসলিমেরা। কাবের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে উমর প্লাটফর্মের দক্ষিণ প্রান্তে তার মসজিদ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেটি ছিল হেরডের রয়্যাল পর্টিকো। এখানেই বর্তমান আল- আকসা দাঁড়িয়ে আছে। এখানে কেবল নামাজ পড়ার সময় মুসলিমেরা মক্কার দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। উমরের মসজিদটি ছিল প্রাথমিক যুগের সংযমী আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাদামাটা কাঠের ভবন। প্রথম যে ব্যক্তি এ মসজিদটি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন খ্রিস্টান তীর্থযাত্রী আরকাফ। তিনি ৬৭০ সালে জেরুসালেম সফর করে জমকালো টেম্পলের সম্পূর্ণ বিপরীত স্থাপনা হিসেবে অভিহিত করেছেন : 'স্যারাসেনরা এখন প্রায়ই চার দেয়ালের ইবাদতগৃহ নির্মাণ করে। তারা এগুলো তৈরি করে সাদাসিধাভাবে। এটি তৈরি করা হয়েছে ধ্বংস্তুপের অবশিষ্টাংশের ওপর বোর্ড ও বিমের ওপর। তবে এটি ছিল বিশাল। এখানে তিন হাজার লোক নামাজ আদায় করতে পারত। এই সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলের আরব গোত্রগুলো ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তারা জুমার নামাজ আদায়ের জন্য উমরের মসজিদে সমবেত হতো।

নগরীর খ্রিস্টানদের কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়নি। বস্তুত অষ্টম শতকের আগে পর্যন্ত ধর্মান্তরিত উৎসাহিত করা হতো না। তাবারি উমর ও জেরুসালেমের খ্রিস্টানদের মধ্যে একটি সমঝোতার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়,

এটি সত্য ছিল না, তবে এটি নির্ভুলভাবে বিজিত লোকজনের ব্যাপারে মুসলিমনীতি প্রকাশ করে।

[উমর] তাদের প্রতিটি ব্যক্তির ও তাদের সম্পত্তির নিরাপত্তা মঞ্জুর করেন : তাদের চার্চগুলো, তাদের ক্রুশগুলোর, অসুস্থ ও স্বাস্থ্যবান লোকদের প্রতি, তাদে ধর্মের সব লোকের প্রতি। তাদের চার্চগুলোতে আমরা মুসলিম সৈন্যদের মোতায়েন করব না। আমরা তাদের চার্চগুলো ধ্বংস করব না, সেখানে থাকা তাদের মালামাল, সম্পত্তি, ক্রুশ বা অন্য কোনো কিছুরই ক্ষতি করব না। আমরা তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করার জন্য জেরুসালেমের লোকজনকে বাধ্য করব না, তাদেরকে কোনো ধরনের ক্ষতি করব না।১৫

ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রজার মতো ফিলিস্তিনের ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা জিম্মি (সুরক্ষিত সংখ্যালঘু) হয়। তাদেরকে আত্মরক্ষার সব উপায় ত্যাগ করতে হয়েছিল, অস্ত্রও ধারণ করতে পারত না। এর বদলে মুসলিমরা জিজিয়ার পরিশোধকারী জিম্মিদের সামরিক সুরক্ষা দিত। জেরুসালেমে সম্ভবত প্রতিটি পরিবারকে বছরে এক দিনার করে দিতে হতো। বাইরে থেকে ইসলামি সাম্রাজ্যে প্রবেশ করলে খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের এক দিনার করে দিতে হতো, যাতে তাদের অবস্থানকালে তারা জিম্মিতে পরিণত হতে পারে। ১৬ জিম্মিব্যবস্থা নিখুঁত ছিল না। পরে ইসলামি আইন কিছু পরিবর্তন করে আরো অপমানজনক বিধান করা হয় : জিম্মিরা অনুমতি ছাড়া নির্মাণ করতে পারবে না; তাদের উপাসনার স্থানগুলো কোনোভাবেই মসজিদের চেয়ে উঁচু হতে পারবে না; জিজিয়া প্রদানের সময় তাদেরকে অবনত হতে হবে; ঘোড়ার পিঠে চড়া নিষিদ্ধ থাকবে; আলাদা পরিচিতিসূচক পোশাক পরতে হবে। অবশ্য এসব বিধিনিষেধ কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হতো না। এই ব্যবস্থা জিম্মিদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিলেও সাম্য দেয়নি : তাদেরকে মুসলিমদের প্রজা হয়ে মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছে। তবে এর ফলে বিভিন্ন বিশ্বাসের লোকজন তুলনামূলক সম্প্রীতির সাথে সহাবস্থান করতে পেরেছিল, সামগ্রিকভাবে প্রজা সাধারণের সাথে সৌজন্যতা আইনগতভাবে আচরণ করা হতো। এটি ছিল বায়েজান্টাইন আইনের বিপুল অগ্রগতি। বায়েজান্টাইন আইনে মনোফাইসিত, সামারিতান ও ইহুদিদের মতো সংখ্যালঘুদের ক্রমবর্ধমান হারে নির্যাতন করা হতো।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই নেস্টোরিয়ান ও মনোফাইসিত খ্রিস্টানদের মুসলিমদের স্বাগত জানিয়েছিল এবং বায়েজান্টাইনদের চেয়ে ইসলামকে বেশি পছন্দ করেছিল। দ্বাদশ শতকের ইতিহাসবিদ মাইকেল দি সিরিয়ান লিখিছেন, 'তারা ধর্মের ব্যাপারে জানতে চায় না, মুরতাদ ও দুষ্ট জাতি গ্রিকদের মতো ধর্মের কারণে কাউকে নির্যাতন করে না।' অর্থোডক্স খ্রিস্টানদেরকে সমন্বয় সাধন করার জন্য অনেক বেশি কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল। উমরকে টেম্পল মাউন্টে দাঁড়াতে দেখে সফ্রোনিয়াস কেঁদেছিলেন। তার নবী দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী 'জনমানবশূন্যতার ঘৃণার' কথা স্মরণ হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ভগ্ন হৃদয়ে তিনি মারা গিয়েছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। অনেক খ্রিস্টান মহাপ্রলয়ী কল্পনাবিলাসে থাকত। তারা ভাবত, কোনো গ্রিক সম্রাট জেরুসালেম মুক্ত করে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত করে দেবেন। ১৮ জেরুসালেমের খ্রিস্টানেরা এখন নিজেদেরকে কনস্টানটিনোপল থেকে বিচ্ছিন্ন দেখতে পেল। কনস্টানটিনোপল তাদের ব্যাপারটি পুরোপুরি ভুলে গেল। ৬৯১ সালের আগে পর্যন্ত সফ্রোনিয়াসের স্থানে আর কোনো প্যাট্রিয়ার্ক নিয়োগ করা হয়নি। তাদেরকে টেম্পল মাউন্টের পরিবর্তন দেখতে হচ্ছিল। এটির অপবিত্রকরণ তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অনেকে সম্ভবত মনোস্তাত্ত্বিক অস্বীকারকরণ নীতির আশ্রয় নিতে চাইছিল : আরকাফের মতো খ্রিস্টান তীর্থযাত্রী তাদের পবিত্র নগরীতে মুসলিমদের উপস্থিতির কথা খুব কম উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত খ্রিস্টনেরা অবচেতনভাবে বিশ্বাস করত, তারা 'স্যারাসেনদের' অগ্রাহ্য করতে পারলে তাদের অস্তিত্ব থাকবে না।১৯ এটি করা তাদের জন্য কঠিন ছিল না। নগরীতে খ্রিস্টানেরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রেখেছিল, এমনকি মুসলিমেরাও স্বীকার করত যে জেরুসালেম অনেকটাই জিম্মিদের নগরী। খ্রিস্টানদের পবিত্র স্থানগুলোর প্রায় সবই ওয়েস্টার্ন হিলকে কেন্দ্র করে ছিল। এটি পুরোপুরি খ্রিস্টান এলাকায় রয়ে যায়। মুসলিম বিজয়ীরা শহরের ওই অংশে বসতি স্থাপন করেনি, এমনকি যদিও তাদের হারামের পাদদেশে থাকা তাদের মহল্লাগুলোর চেয়ে খ্রিস্টানদের ওই এলাকা ছিল অনেক শীতল ও স্বাস্থ্যকর। মুসলিমদেরও ওইসব চার্চে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। চার্চগুলোর বেশির ভাগই ছিল মাউন্ট অলিভেস ও কিদরন ভ্যালিতে। বিশেষ করে অ্যাসেনশন চার্চ ও ভার্জিন টম্ব উভয়টিই ছিল স্মারক স্থান ও ঘটনা, মুসলিমেরা এসবকে শ্রদ্ধা করত। খ্রিস্টানদেরকে অবাধে তাদের চার্চ নির্মাণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া হতো। বস্তুত সপ্তম ও অষ্টম

শতকে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে অনেক চার্চ নির্মিত হয়েছিল। খ্রিস্টানদেরকে তখনো তাদের শোভাযাত্রা ও উপাসনা করতে দেওয়া হতো। একমাত্র যে স্থানে মুসলিমরা বিপুল সংখ্যায় সমবেত হতো, তা হলো তাদের হারাম। আর এই পুরনো টেম্পল ও এ স্থানটি খ্রিস্টান উপাসনাব্যবস্থায় কোনোই ভূমিকা পালন করত না।

বিজয়ের পরপরই সফ্রোনিয়াসের সাথে উমর একমত হন যে ইহুদিদেরকে জেরুসালেমে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হবে না। কোনো নতুন নগরী জয়ের পর উমর সাধারণত স্থিতিবস্থা বজায় রাখতেন। ইহুদিরাও জেরুসালেম ও এর আশপাশের এলাকায় দীর্ঘ দিন নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য পরে ইহুদিদের নিষিদ্ধ রাখার ব্যবস্থাটি বাতিল করা হয়। দাউদের নগরীতে ইহুদিদের বসবাস করার ইহুদিদের অধিকার অস্বীকার করার কোনো যুক্তিসম্মত কারণ পাওয়া যায়নি। জেরুসালেমে বসবাস করার জন্য উমর তাইবেরিয়াস থেকে ৭০টি ইহুদি পরিবারকে আমন্ত্রণ জানান। তাদেরকে হারামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সিলয়াম পুলের পাশ্ববর্তী এলাকায় বাস করতে বলা হয়। ৬১৪ সালে পারস্য বিজয়ের সময় এ এলাকাটি বিধ্বস্ত হয়েছিল, তখনো জঞ্জাল আর আবর্জনায় ভরা ছিল। ইহুদিরা এলাকাটি পরিষ্কার করে নেয়, পুরনো পাথরগুলোতে নতুন বাড়ি তৈরিতে ব্যবহার করে। তাদেরকে একটি সিনাগগ নির্মাণ করারও অনুমতি দেওয়া হয়। 'দি কেভ' নামের এ সিনাগগটি ছিল হেরডের পশ্চিম দিকের সহায়ক প্রাচীরের কাছে, সম্ভবত প্লাটফর্মের খিলানের নিচে।২১ কোনো কোনো সূত্র জানায়, ইহুদিদেরকে খোদ প্লাটফর্মেই প্রার্থনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, ঠিক যেভাবে মদিনার মসজিদে খ্রিস্টানদেরকে উপাসনা করতে দেওয়া হয়েছিল। কিছু জিম্মিকে (ইহুদি ও খ্রিস্টান) হারামের প্রহরী ও সেবক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। বিনিময়ে তাদেরকে জিজিয়া থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল।২২ ইহুদিরা সম্ভবত এই কাজে নিয়োজিত হতে ইচ্ছুক ছিল। কারণ মুসলিম বিজয় তাদেরকে নতুন আশা দিয়েছিল। বায়েজান্টাইন সম্রাটেরা ইহুদি ধর্ম নিষিদ্ধ করেছিলেন, হেরাক্লিয়াস একপর্যায়ে ইহুদিদেরকে ব্যাপ্তাইজ হতে বাধ্য করছিলেন। তারা পারস্যের আমলে যেভাবে সহায়তা করেছিল, মুসলিমদেরও সেভাবে সহায়তা করতে আগ্রহী ছিল, বিশেষ করে একেশ্বরবাদের এ নতুন সংস্করণটি খ্রিস্ট ধর্মের চেয়ে ইহুদি ধর্মের কাছাকাছি ছিল। সম্ভবত অনেকে বিশ্বাস করত যে ইসলাম হলো স্রেফ সত্য বিশ্বাসের ইসমাইলিয়াতে

ধর্মান্তরিত হওয়ার একটি পর্যায় মাত্র। মুসলিমেরা কেবল বায়জান্টিয়াম নির্যাতন থেকেই তাদেরকে মুক্ত করেনি, সেইসাথে তাদের পবিত্র নগরীতে স্থায়ীভাবে বাস করার অনুমতিও দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই বিপরীত অবস্থাটি কিছু মহাপ্রলয়বাদী স্বপ্নকে উদ্দীপ্ত করেছিল, বিশেষ করে মুসলিমেরা টেম্পল মাউন্ট পবিত্র করার চেষ্টা করায়। তারা কি মেসাইয়ার নতুন ও চূড়ান্ত টেম্পল নির্মাণের প্রস্তুতিপর্ব সারছে? সপ্তম শতকের শেষ দিকে একটি হিব্রু কবিতায় আরবদেরকে মেসাইয়ার অগ্রদূত হিসেবে প্রশংসা করা হয়েছে। এতে ইহুদি নির্বাসিতদের একত্রিত করা ও টেম্পল পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। ২৩ এমনকি মেসাইয়া যখন আবির্ভূত হতে ব্যর্থ হলেন, তখনো জেরুসালেমে ইসলামি শাসনের ব্যাপারে ইহুদিরা অব্যাহতভাবে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করত। একাদশ শতকে লিখিত একটি চিঠিতে জেরুসালেমের রাব্বিরা 'ইসমাইলের রাজ্যকে' ফিলিস্তিন জয়ের সুযোগ দিয়ে তাদের জনগণের প্রতি ঈশ্বরের 'করুণা' প্রদর্শনের কথা স্মরণ করেছেন। তারা স্মরণ করে খুশি হয় যে মুসলিমেরা যখন জেরুসালেমে আসে তখন ইসরাইলের সন্তানেরা তাদের সাথে ছিল; তারা টেম্পলের স্থানটি তাদেরকে দেখিয়ে দেয় এবং তারা এই দিনটি পর্যন্ত তাদের সাথে বাস করছে।'২৪

মুসলিমদের ফিলিস্তিন জয়ের অর্থ দেশটি রাতারাতি হিজাজের আরবদের হয়ে যায়নি। জাতিগতভাবে ফিলিস্তিনি জনগণ আগের মতো মিশ্রই ছিল। নতুন ভূখণ্ডে মুসলিম বিজয়ীদের বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তারা তখনো ক্ষুদ্র সামরিক জাতি হিসেবে রয়ে গিয়েছিল, তারা স্থানীয় জনগণের থেকে আলাদা হয়ে বিশেষ সামরিক কম্পাউন্ডে বাস করত। কিছু জেনারেলকে এস্টেট নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে তা কেবল কারো নিয়ন্ত্রণে নয়, এমন এলাকায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, জেরুসালেমে মুসলিমেরা শহরে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যপ্রদ অংশে বসতি স্থাপনের কোনো চেষ্টা করেনি। তারা বরং ইহুদি মহল্লার পাশে তাদের হারাম এলাকায় বাস করছিল। জেরুসালেম একটি মুসলিম পবিত্র এলাকা-সংবলিত খ্রিস্টান-প্রধান নগরীই রয়ে গিয়েছিল। একবার মুহাম্মদ (সা.) বলেছিলেন, যে আরবিতে কথা বলবে, সে আরব, যেভাবে গ্রিক ভাষাভাষীদের হেলেনি বলা হতো। সময়ের পরিক্রমায় অধিবাসীরা আরবিকেই তাদের প্রধান ভাষা

হিসেবে গ্রহণ করে। আর এর ফলেই আমরা তাদের বংশধরদের (মুসলিম ও খ্রিস্টান) বলি আরব।

মুসলিমেরা ফিলিস্তিনে তাদের নিজস্ব প্রশাসন চালু করার সময় তারা পুরনো বায়েজান্টাইন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিল। এতে দেশটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা ছিল। এখন জেরুসালেম অন্তর্ভুক্ত হলো জান্দ ফিলাস্তিনের। এতে সামিল ছিল জুদা ও সামারিয়ার উপকূলীয় সমভূমি। জান্দ উরদুনে ছিল গ্যালিলি ও পেরাইয়ের পশ্চিম অংশ। আর জান্দ দিমাশক ছিল মোয়াব ও ইদম নিয়ে। আরবেরা জেরুসালেমকে বায়তুল মুকাদ্দিস বা 'আলিয়া' বলা অব্যাহত রাখে। নগরীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় যেসব প্রতিভাধর লোককে তারা এই নগরী শাসনের জন্য নিযুক্ত করেছে তাদের দেখে। পরবর্তী সময়ের খলিফা মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান পুরো সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের (আরবরা একে বলত আস-শ্যাম) গভর্নর হন। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম অফিসার উওয়াইমির ইবনে সাদকে জান্দ ফিলাস্তিনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জিম্মিদের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণের জন্য তার সুখ্যাতি ছিল। পবিত্র কোরআনের শীর্ষ পাঁচ বিশেষজ্ঞের অন্যতম উবায়দা ইবনে আস-সামিত হন জেরুসালেমের প্রথম কাজি (ইসলামি বিচারপতি)। ফাইরুজ আল-দাইলামি ও শাদ্দাদ ইবনে আউসের মতো মহানবীর প্রখ্যাত সাহাবাদের আকৃষ্ট করে নগরীর পবিত্রতা।

শুভ সূচনার পর ৬৪৪ সালে এক পারসিক যুদ্ধবন্দির হাতে উমর নিহত হলে ইসলামি সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার বিপদে পড়েছিল। ধর্মের অন্যতম দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, এটি প্রায়ই তার সবচেয়ে মূল্যবান আদর্শগুলোই পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। এ কারণেই ভালোবাসার ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম জেরুসালেমে প্রায়ই নিজেকে ঘৃণা আর বিদ্বেষে প্রকাশ করেছে। আর এখন ঐক্য ও একীভূত করার বিশ্বাস ইসলামও অনৈক্য ও বিভেদের শিকার হলো। উম্মাহর নেতৃত্ব নিয়ে মুহাম্মদের (সা.) মৃত্যুর পর থেকেই খলিফা ও নবীর পরিবারের মধ্যে উত্তেজনা ছিল। শেষ পর্যন্ত এই সঙ্ঘাত সুন্নি/শিয়া ভাঙনের সৃষ্টি করে। উমরের স্থলাভিষিক্ত হন উসমান ইবনে আফফান। তিনি ছিলেন নবীর সাহাবা ও অভিজাত উমাইয়া গোত্রের সদস্য। জেরুসালেমে তার প্রধান অবদান ছিল নগরীর গরিব মানুষের জন্য সিলোয়াম পুলে বিশাল একটি গণউদ্যান নির্মাণ করে দান করে দেওয়া। উসমান

ধার্মিক হলেও অকার্যকর নেতা ছিলেন। ৬৫৬ সালে একদল লোকের হাতে তিনি নিহত হন। তারা নবীর ঘনিষ্ঠতম জীবিত পুরুষ স্বজন আলী ইবনে তালিবকে চতুর্থ খলিফা ঘোষণা করেন। সাথে সাথে আলী ও শ্যামের শাসক ও বর্তমানে উমাইয়া গোত্রের শাসক মুয়াবিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মুয়াবিয়া জোর দিয়ে বললেন, উসমানের হত্যাকারীদের শাস্তির জন্য তার হাতে তুলে দিতেই হবে। ৬৬১ সালে নতুন একটি ধর্মান্ধ গ্রুপের জনৈক সদস্যের হাতে আলী নিহত হওয়ার আগে পর্যন্ত যুদ্ধ চলতেই থাকে। ছয় মাস পর জেরুসালেমে নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন মুয়াবিয়া। মুয়াবিয়া ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা। এ রাজবংশটি প্রায় এক শ' বছর ইসলামি সাম্রাজ্য শাসন করে।

মুয়াবিয়া সাথে সথে সাম্রাজ্যের রাজধানী মদিনা থেকে দামেস্কে সরিয়ে নেন। এর মানে এই নয় যে তিনি পুরনো ধর্মীয় আদর্শ পরিত্যাগ করেছেন, অবশ্য এমনটাই অনেক সময় বলা হয়ে থাকে। মুসলিমেরা এখন পূর্বে খোরাসান থেকে বর্তমানে উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত একটি সাম্রাজ্য শাসন করছে। উমাইয়া আমলের শেষ দিকে ইসলামি সাম্রাজ্য জিব্রাল্টার থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, রাজধানী ছিল অনেক বেশি কেন্দ্রীয় ও মুসলিমেরা তাদের জয় করা ভূখণ্ডগুলোতে নিজেদের পুরোপুরি একীভূত করে নিয়েছিল। বিশ্বকে পবিত্র করার মুসলিম মিশনও ছিল এতে : মুসলিমদের অবশ্যই সামনে অগ্রসর হতে হবে, দেশের পবিত্র স্থানগুলোতে আঁকড়ে ধরে না থেকে সাম্রাজ্যের বাইরে আল্লাহর পবিত্রতা ছড়িয়ে দিতে হবে। রাজধানী দামাস্কাসে সরিয়ে নেওয়াটা জেরুসালেমের জন্য কল্যাণকর হয়েছিল। জেরুসালেম এখন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি থেকে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছিল। মুয়াবিয়া প্রায় ২০ বছর আস-শ্যামের গভর্নর ছিলেন। তিনি জেরুসালেমকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন। তিনি ফিলিস্তিনে গেলে নগরীতে যেতেনই। এমনকি একবার সেখানে তাকে হত্যা করার চেষ্টা সত্ত্বেও নগরীতে যাওয়া থেকে বিরত থাকেননি। মুসলিমেরা বায়তুল মুকাদ্দিস নিয়ে তার প্রশংসাবাক্য সংগ্রহ করে রেখেছে। এতে দেখা যায়, মুসলিমেরা জিম্মিদের কাছ থেকে জেরুসালেমের লোকঐতিহ্য আত্মস্ত করেছিল। নগরী ছিল এমন স্থান যেখানে কিয়ামতের দিনে লোকজন আবার জন্ম নিয়ে সমবেত হবে।' এটি এমন এক স্থান, যেখানে বসবাস করলে লোকজন পবিত্র হয়ে যায়। আর সমগ্র আস-শ্যাম হলো

'আল্লাহর পছন্দের ভূমি, যেখান থেকে আল্লাহ তার দাসদের পরিচালনা করবেন।' একবার হারামে খুতবা দেওয়ার সময় খলিফা বলেন, 'আল্লাহ বিশ্বের অন্য যেকোনো স্থানের চেয়ে এই মসজিদের দুই দেয়ালের মাঝখানের স্থানকে বেশি ভালোবাসেন।'২৫ সেখানে বসবাসরত মুসলিমেরা মক্কা থেকে অনেক দূরে বাস করলেও জেরুসালেম হারামের মধ্যে এর পবিত্রতা উপভোগ করতে পারত।

মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যে আরো বিবাদের সৃষ্টি হয়। অনেক মুসলিমই তার ছেলে ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ৬৮০ সালে আলীর ছেলে ও নবীর নাতি আল- হোসাইন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তাকে তার অতি ক্ষুদ্র দলের সাথে ইরাকের কারবালায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এরপর থেকে শিয়াদের কাছে কারবালা পবিত্র নগরীতে পরিণত হয়। শিয়ারা বিশ্বাস করত, উম্মাহ পরিচালিত হওয়া উচিত মুহাম্মদের (সা.) বংশধরদের দিয়ে। কারবালার পবিত্রতা সত্ত্বেও শিয়ারা এখনো মুহাম্মদ (সা.) ও আলীর বংশধর তাদের ইমামদের (নেতা) প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রতিটি ইমাম তার প্রজন্মের কাছে কুতুব বিবেচিত। পূর্ণাঙ্গ মানব মুহাম্মদের (সা.) পবিত্রতা লাভ করে তিনি মুসলিমদের সরাসরি বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ দিতে পারেন।

উমাইয়াদের বিরুদ্ধে ৬৮৩ সালে আরেকটি বিদ্রোহ ঘটে। এসময় খলিফা ইয়াজিদ মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আল-জুবায়ের নিজেকে খলিফা ঘোষণা করে পবিত্র নগরী মক্কা দখল করে নেন। তিনি ৬৯২ সাল পর্যন্ত সেখানে ক্ষমতায় থাকলেও সমগ্র উম্মাহর সমর্থন লাভ করতে পারেননি। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর মারওয়ান (৬৮৪-৮৫) ও তার ছেলে আবদুল মালিক (৬৮৫-৭০৫) সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসর এবং তারপর সাম্রাজ্যের বাকি অংশে উমাইয়া ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আবদুল মালিক ছিলেন বিশেষভাবে সক্ষম শাসক। নতুন আরব প্রশাসনে পুরনো বায়েজান্টাইন ও পারস্য ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করেন তিনি। ধর্মতাত্ত্বিক আদর্শে একটি কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র গঠন করেন তিনি।

খলিফা আবদুল মালিকের নির্মিত ডোম অব দি রক (কুব্বাতুস সাখরা) সম্পূর্ণ হয় ৬৯১ সালে। টেম্পল মাউন্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সেখানে প্রথম প্রধান ইসলামি ভবন নির্মাণের মাধ্যমে মুসলিমরা তাদের প্রত্যয় ঘোষণা করল যে তাদের নতুন বিশ্বাস অপেক্ষাকৃত পুরনো ঐতিহ্যগুলোর পবিত্রতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

শান্তি ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরপরই খলিফা আবদুল মালিক জেরুসালেমের দিকে নজর দেন। অন্য সব উমাইয়ার মতো তিনিও ছিলেন জেরুসালেমের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। তিনি সাম্প্রতিক গোলযোগে ক্ষতিগ্রস্ত নগরীর প্রাচীর ও প্রবেশদ্বারগুলো মেরামত করেন। তিনি আলিয়ার গভর্নরের জন্য বাসভবন দার ইমামা নির্মাণ করেন। এটি ছিল হারামের কাছে। তবে নগরীর প্রতি আবদুল মালিকের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল সন্দেহাতীতভাবে ডোম অব দি রক বা কুব্বাতুস সাখরা। ৬৮৮ সালে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। ইসলামের নিজস্ব একাধিক পবিত্র স্থান ছিল; এর অনন্য শক্তি ও সৌন্দর্যের একটি আরবি ধর্মগ্রন্থও রয়েছে। তবে ইসলামের মহান কোনো সৌধ ছিল না। আবার জেরুসালেম ছিল এমন এক নগরী যেখানে চমকপ্রদ অনেক চার্চে ভর্তি। মুসলিমেরা এতে অস্বস্তি অনুভব করত। তারা খ্রিস্টানদের কিছু দেখাতে চেয়েছিল। হারামে থাকা তাদের সাদামাটা কাঠের মসজিদটির প্রতি উন্নাসিকতা-সংবলিত আরকাফের প্রতিক্রিয়া যদি খ্রিস্টান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, তবে তাদেরও প্রকাশের প্রবল দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে। দশম শতকে জেরুসালেমের ইতিহাসবিদ মোকাদাসি উল্লেখ করেছেন যে আস-শ্যামের সব চার্চ এত 'সুন্দর' এবং 'ডোম অব কামামা' এত মহান ও চমকপ্রদ যে আবদুল মালিক ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে 'এটি মুসলিমদের মনকে ধাঁধিয়ে দেবে।' তারা এমন একটি সৌধ বানাতে চাইল যা হবে 'বিশ্বে অনন্য ও বিস্ময়কর।২৬ এ কারণে আবদুল মালিক ডিক্রি জারি করলেন যে ওয়েস্টার্ন হিলের ডোম অব আনাস্তাসিস ও মাউন্ট অলিভেসের অনন্যসাধারণ অ্যাসেনসন চার্চকে (এটি রাতে উদ্ভাসিত হতো, এত উজ্জ্বলভাবে দীপ্তমান হতো যে এটিই পরিণত হয়েছিল জেরুসালেমের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু) চ্যালেঞ্জ করে নতুন ডোম নির্মাণ করা হবে। ২৭ নতুন মুসলিম স্থাপনাটি যাতে একই ধরনের দীপ্তমান হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আবদুল মালিক বায়েজান্টাইন থেকে কারিগর ও স্থপতি নিয়োগ করেন। নির্মাণকাজের দায়িত্বে থাকা তিনজনের দুজন ছিলেন খ্রিস্টান।

২৮ জিম্মিদের থেকে এই সুবিধা গ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রথম মহান মুসলিম উপাসনালয়টি সন্দেহাতীতভাবে ইসলামি বার্তা বহন করত।

খলিফা তার ডোম নির্মাণের জন্য এমন একটি টিলা বেছে নিয়েছিলেন যা প্লাটফর্মের উত্তর প্রান্তের দিকে হেরডিয়ান ফুটপাথ থেকে ছাড়িয়ে গেছে। সম্মান জানাতে তিনি কেন বাইবেল বা পবিত্র কোরআনের কোথায় উল্লেখ না থাকা এ টিলাকে বেছে নিয়েছিলেন? পরে মুসলিমেরা বিশ্বাস করেছিল যে মিরাজের সময় মুহাম্মদ (সা.) এ টিলা থেকেই বেহেশতে গিয়েছিলেন এবং এর নিচে থাকা ছোট গুহায় তিনি নামাজ পড়েছিলেন। তবে ৬৮৮ সালে এ ঘটনাটি সুনির্দিষ্টভাবে জেরুসালেমের সাথে সম্পর্কিত ছিল না। আবদুল মালিক যদি নবীর মিরাজ যাত্রার সাথে এই সৌধের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন, তবে তিনি নিশ্চিতভাবেই স্থাপনাটির কোথাও যথাযথ কোরআনিক আয়াত খোদাই করে রাখতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। টিলাটির প্রতি ভক্তির সূচনা কোথা থেকে তা তিনি জানতেন না। বদুর তীর্থযাত্রীটি ইহুদিদের টেম্পল মাউন্টের 'প্রবিষ্ঠ পাথরকে' তেলসিক্ত করতে দেখেছেন। তবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে সেটি ছিল ওই টিলাটি। দ্বিতীয় শতকে মিসনাতে 'ভিত্তি পাথরের (ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান) কথা বলা হয়েছে। এটি দাউদ ও সোলায়মানের আমল থেকে আর্কের পাশে ছিল। কিন্তু রাব্বিরা আমাদের বলছেন না যে পাথরটি এখনো হেরডের টেম্পলের কোনো স্থানে আছে কিনা। এমনকি তারা বিধ্বস্ত টেম্পল মাউন্টের ওপর থাকা টিলা বা রকের সাথেও একে গুলিয়ে ফেলছেন না। খুব সম্ভবত, ইহুদি ও মুসলিম উভয়ই ধরে নিয়েছিল যে রকটি টেম্পলের হলি অব হলিসের স্থানটি চিহ্নিত করে। অবশ্য বর্তমান সময়ের গবেষকেরা একমত যে তথ্যটি সত্য নয়। ২৯ যদি সেটিই হতো, তারা স্বাভাবিকভাবেই রকটিকে 'পৃথিবীর কেন্দ্র' হিসেবে তথা বেহেশতে প্রবেশের পথ হিসেবেই দেখা হতো। ডোম অব দি রক নির্মাণের পর ইহুদি ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনই রক সম্পর্কে কিংবদন্তি সৃষ্টি করে। এর ফলে ইহুদি কল্পনা হয়তো মুসলিম ইবাদতগাহকে উদ্দীপ্ত করে থাকতে পারে। ইহুদি ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনই রককে পৃথিবীর কেন্দ্র, ইডেন উদ্যানের প্রবেশপথ ও উর্বরতার উৎস টেম্পলের ভিত্তি বিবেচনা করত। একেশ্বরবাদী পবিত্র স্থানের সাথে এগুলোর সবই

ছিল কাল্পনিক সম্পৃক্ততা। একেবারে শুরুর সময় থেকেই মুসলিমেরা মনে করত, নতুন ইবাদতগাহে সফর করা হলে তারা বেহেশতে আদি সম্প্রীতিতে ফিরে যেতে পারবে।

অনেক বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে আবদুল মালিক নিজে থেকে স্থানটি পছন্দ করেননি। তাদের তত্ত্ব হলো, পারস্য দখলদারিত্বের সময় ইহুদিরা মাউন্টের ওপর তাদের টেম্পল নির্মাণকাজ শুরু করেছিল। হেরাক্লিয়াসের নগরীটি ফের জয় করার পর তিনি পারস্য ও ইহুদি ধর্মের বিরুদ্ধে খ্রিস্ট ধর্মের বিপুল বিজয় উদযাপনের লক্ষ্যে একটি অষ্টাকোণি বিজয় চার্চ নির্মাণ করেছিলেন। এর ভিত্তি স্থাপিত হলেও আরবরা ফিলিস্তিন আক্রমণ করলে তাদের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত করতে হয়েছিল। ৬৮৮ সালে ডোম অব দি রকের কাজ শুরু হলে এসব বায়েজান্টাইন ভিত্তির ওপরই আবদুল মালিক নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইসলামি বিশ্বে অনন্য একটি ভবন নিয়ে এটিকে বিতর্কিত তত্ত্বই বলা যায়। ডোম অব দি রক কিন্তু মসজিদ নয়। এটি কিবলার দিক নির্দেশ করে কোনো চিহ্ন নেই, নামাজ পড়ার কোনো জায়গাও এখানে নেই। বরং রকটি কেন্দ্রীয় অবস্থান গ্রহণ করেছে, এর চারপাশে ৪০টি স্তম্ভ দিয়ে দুটি বৃত্তকার হাঁটার পথ করা হয়েছে। ডোম অব দি রক একটি উপাসনালয়, একটি স্মারকচিহ্ন। অবশ্য এটি জেরুসালেমের অস্বাভাবিক কোনো ভবন নয়। এর চারপাশে রয়েছে বিখ্যাত সব চার্চ। এগুলো সবাই উজ্জ্বল টিলা (রক) আর গুহা : অনাস্তাসিস রোতানদা গুহা-কবরের পাশে; ম্যারিটিরিয়ামে রয়েছে গলগোথা রক; ন্যাটিভিটি চার্চ হলো খ্রিস্টের জন্মস্থানের ওপর; অ্যাসেনসন চার্চটি যিশুর পায়ের ছাপবিশিষ্ট টিলাকে ঘিরে নির্মিত। এসব স্থানের সবগুলোই অবতারের স্মরণে তৈরি। এই প্রেক্ষাপটে আবদুল মালিকের চমকপ্রদ নতুন ভবনটি আগের ওইসব ক প্রত্যাখ্যান করে মাথা উঁচু করেছে।

ডোমের ভেতরে আর্চগুলোর ওপর প্রধান খোদাইলিপিগুলোতে থাকা কোরআনের আয়াতগুলোতে অনন্যভাবে ঈশ্বরের সন্তান থাকার ধারণাটি অস্বীকার করা হয়েছে। এতে 'গসপেলের অনুসারীদের' উদ্দেশ করে তাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক বক্তব্যের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে :

মরিয়ম-তনয় ঈসা মসিহ আল্লাহর রাসুল এবং তার বাণী যা তিনি মরিয়মের কাছে প্রেরণ করিয়েছিলেন ও তার আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলে ঈমান আনো এবং বলো না তিন। নিবৃত্ত হও, এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ তো একমাত্র ইলাহ, তার সন্তান হবে- তিনি এর অনেক ঊর্ধ্বে। ৩১

জেরুসালেমে মুসলিমেরা ছিল সংখ্যালঘু। খ্রিস্টান সংখ্যাগুরুরা সম্ভবত তাদের বিজয়ীদের তাচ্ছিল্য করত, তাদেরকে মনে করত আদিম বর্বর। তবে ডোম অব রক জেরুসালেমের সবচেয়ে প্রাচীন পবিত্র স্থান থেকে রাজসিকভাবে মাথা উঁচু করে নাটকীয়ভাবে জোরালোভাবে ঘোষণা করছিল যে ইসলামের আগমন ঘটেছে, এখানে সে এসেছে থাকার জন্য। এটি খ্রিস্টানদেরকে তাদের বিশ্বাস সংশোধন করার জন্য ও ইব্রাহিমের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে ফেরার জন্য কর্তৃত্বব্যঞ্জকভাবে আহ্বান জানাচ্ছিল। ৩২

ইহুদিরা অবশ্যই এই খোদাইলিপি অনুমোদন করেছিল। তাদের সবাই তাদের টেম্পল মাউন্টের ওপর এই মুসলিম ভবনের কর্ম-পরিকল্পনায় হতবিহ্বলভাবে তাকিয়েছিল তা নয়। ৭৫০ সালের দিকে 'দি মিস্টরিয়াস অব দি রাব্বি সিমেয়ন বেন ইয়োহাই'-এর ইহুদি লেখক ভবনটিকে মেসাইনিক যুগের সূচনাপর্ব হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি মুসলিম খলিফাকে ইসরাইলের প্রেমিক' হিসেবে প্রশংসা করে বলেছিলেন, তিনি 'বিধ্বস্ত জায়ন ও বিধ্বস্ত টেম্পল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন।' তিনি মাউন্ট মরিয়াহ ছিদ্র করে একে সমান করে টেম্পল রকের [ইভেন শেতিয়াহ} ওপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন।৩৩ তবে ডোম অব দি রক ইহুদিদের প্রতিও বার্তা ছিল। এটি তাদের টেম্পলের (যা নির্মিত হয়েছিল যেখানে ইব্রাহিম তার ছেলেকে কোরবানি দিয়েছিলেন) স্থানটি দখল করেছিল। এখন ইসমাইলের সন্তানেরা এই পবিত্র স্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। ইহুদিরাই কেবল ইব্রাহিমের সন্তান নয়, তাদের মনে রাখা উচিত যে তিনি না ছিলেন ইহুদি বা না ছিলেন খ্রিস্টান, বরং তিনি ছিলেন মুসলিম।

এই সম্ভাবনাও প্রবলভাবে রয়েছে যে ডোম ব দি রকের মুসলিম পরিচিতি ঘোষণা করার চেয়ে অন্য একটি উদ্দেশ্যও ছিল। তা হলো, মক্কা থেকে হজ সরিয়ে নেওয়া। উল্লেখ্য, তখনো মক্কা ছিল ইবনে আল-জুবায়ের হাতে। এই তত্ত্ব প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন নবম

শতকের ইতিহাসবিদ ইয়াকুবি। তিনি আমাদের বলছেন যে বৃত্তাকার হাঁটার পথটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল তাওয়াফ করার জন্য : ‘কাবার চার দিকে তাওয়াফ করার মতো করে লোকজনও [রকের] চার পাশে ঘুরতে শুরু করেছিল।৩৪ এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। তাওয়াফের জটিল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য যে পরিমাণ জায়গার দরকার হয়, ডোম অব দি রকে তা ছিল না। তাছাড়া মক্কার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কিছু নির্মাণের লক্ষ্য যদি খলিফার থাকত তবে তিনি কাবার স্রেফ নকল করেই কাজ সারতে পারতেন, এমন জটিল ও বিশাল ডোমের নক্সা করার কাজ না করলেও চলত। অন্য কোনো সমসাময়িক ইতিহাসবিদ খলিফার এ ধরনের ঈশ্বর-অবমাননামূলক প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেননি। কারণ ওই ধরনের প্রকল্পে পুরো মুসলিমবিশ্ব কষ্ট পেত। অন্য দিকে আবদুল মালিক মক্কা ও কাবার প্রতি গভীরতম ধর্মানুরাগ প্রদর্শন করতেন। ইয়াকুবি প্রবলভাবে উমাইয়াদের বিরোধিতা করতেন। ফলে এই তত্ত্বকে নিছক প্রপাগান্ডা হিসেবে খারিজ করা যেতে পারে।

ডোম অব দি রকের অভ্যন্তর ভাগ। রক ও বৃত্তাকার ডোম সামগ্রিকতা ও পরিপূর্ণতার আধ্যাত্মিক আবেশ প্রতীকীভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

ডোম অব দি রককে যদি জিম্মিদের বিরুদ্ধে বিজয় ঘোষণার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হতো, তবে এটি কখনো মুসলিম জনসাধারণের হৃদয় জয় করতে পারত না। বরং, এটি পরবর্তীকালে সব মুসলিম ইবাদতগাহের বিশেষ উদাহরণে পরিণত হয়। তীর্থযাত্রী ও ইবাদতকারীরা এই ভবনে প্রবেশ করে দেখতে পেত যে এটি নিখুঁতভাবে এমন পথকে প্রতীকীভাবে ফুটিয়ে তুলেছে যা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এই পথে প্রবেশ করতে হবে। ৩৫ এ কারণে নক্সাটি হয়তো ইসলামি মরমিবাদ তথা সুফিদের নতুন আধ্যাত্মিকতাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। এই সুফিরা একেবারে সূচনা থেকে জেরুসালেমে বাস করতে শুরু করেছিল। আমরা ইসলামে প্রতীকীবাদের গুরুত্ব দেখি। আল্লাহ যেহেতু তুলনীয় নন, তাই মুসলিমরা তাদের উপাসনার স্থানে মূর্ত চিত্রকলা নিষিদ্ধ করে। তবে জ্যামিতির নক্সা ও আকার অনুমোদিত হয়। কারণ তা কল্পনায় আদর্শ দুনিয়াকে প্রতিফলিত করে। নক্সা আর আকারগুলো অস্তিত্বের এমন অন্তর্নিহিত কাঠামোর ইঙ্গিত করে যা আল্লাহর সাথে

সামঞ্জস্যতা বিধান করার জন্য, শান্তি ও ঐক্য খোঁজার জন্য তাদেরকে সাধনা করতে হবে। মক্কার হারামে বর্গাকার কাবাঘর তাওয়াফ করার দিকে চালিত করার মাধ্যমে দুনিয়া থেকে শ্বাশতের সফরকে প্রতিফলিত করে। জেরুসালেমের ইবাদতগাহে একই ধরনের রীতি রয়েছে। রক ও এর গুহাটি দুনিয়া, উৎস ও অনুসন্ধানের সূচনা বিন্দুকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরে। মুসলিমদের মনে হয়েছে, অষ্টাকোণে পরিবেষ্টিত থাকাটা বর্গের অপরিবর্তনীয় ধারণা থেকে এক ধাপ পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ। ফলে এটি সামগ্রিকতা, পূর্ণাঙ্গতা ও শ্বাশতের দিকে যাত্রার সূচনা ইঙ্গিত করে, ডোমের পূর্ণাঙ্গ বৃত্তে এরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়া ডোম নিজেই বেহেশতে ঊর্ধ্বারোহণে শক্তিশালী প্রতীকে পরিণত হয়েছে। তবে এটি তৌহিদের পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্যও প্রতিফলিত করে : আকাশের অসীমতায় দিকে পৌঁছে যাওয়ার এর বহির্ভাগ এর অন্তর্ভাগ মাত্রার নিখুঁত প্রতিফলন। এটি একক সামগ্রিকের দুটি অর্ধ হিসেবে ঐশী সত্তা ও মানুষ, ভেতর ও বাইরের দুনিয়াকে একে অন্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান ও পরিপূরক হওয়াটা ফুটিয়ে তোলে। ইবাদতগাহটির প্রতিটি রঙও একটি বার্তা বহন করে। ইসলামি শিল্পকলায় নীল হলো আকাশের রঙ। এটি বোঝায় অসীমতা। আর স্বর্ণ হলো জ্ঞানের রঙ। পবিত্র কোরআন হলো এর অন্তর্নিহিত শক্তি। মুসলিমেরা এর মাধ্যমে আল্লাহকে বুঝতে পারে।

মুসলিমদের প্রথম কিবলার স্থানেই ডোম অব দি রক নির্মিত হয়েছিল। স্থানটি আধ্যাত্মিক ‘কেন্দ্র’ হিসেবে পরিচিত ছিল। রকের নিচে থাকা গুহাটি সম্পর্কে মুসলিমেরা বলে যে এখানে ইব্রাহিম, দাউদ, সোলায়মান ও আলিজা নামাজ পড়েছিলেন। অনেকে রকে ইউনুসের পায়ের ছাপ দেখতে পায়। তারা বিশ্বাস করে যে এখান থেকেই তিনি বেহেশতে গিয়েছিলেন। যে কয়েকটি স্থানে বেহেশত ও দুনিয়া মিলিত হয়েছে, এটি তার অন্যতম। এই বিশ্বাসের ফলে মুসলিমেরা আল্লাহর পথে তাদের যাত্রা শুরু করতে সহায়তা লাভ করে। আর আবদুল মালিকের ইবাদতগাহর প্রতীকীবাদ চূড়ান্ত বাস্তবতার দিকে ফেরার প্রক্রিয়ার কথা বলে, এটি এমন আরোহণপথ যা একইসাথে, সুফিদের আবিষ্কার করা, অবতরণের স্থানও। আমরা দেখছি যে টেম্পলের স্থাপত্যটি টেম্পল ভবন ধ্বংসের অনেক

পরে ইহুদি চেতনা প্রকাশ করে যাচ্ছে। এখন ইসলামি স্থাপত্যের প্রথম বড় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ডোম অব দি রকও মুসলিমদের আধ্যাত্মিক মানচিত্রে পরিণত হলো।

এ মৌলিক নক্সাটি পরবর্তীকালে বেহেশত ও দুনিয়ার মধ্যে সংযোগসূত্র বিবেচিত কুতুব হিসেবে শ্রদ্ধাভাজন নারী বা পুরুষের সমাধিসৌধে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। অন্য দিকে ডোম অব দি রকও মক্কার মৌলিক প্রতীকীবাদকে অনুকরণ করে। মক্কার পরিবর্তক হিসেবে ডোমের নক্সা করা হয়েছিল বলে ইয়াকুবির কাহিনীটি প্রায় নিশ্চিতভাবেই ভ্রান্ত। তবে এটি অন্তত এই দুটির মধ্যে সম্পর্ক থাকার মুসলিম অনুভূতি প্রকাশ করে। মুসলিম ইতিহাসের একেবারে সূচনায় প্রথম কিবলাটি কিছু সময়ের জন্য কাবার প্রতিস্থাপক ছিল। উভয় স্থানকে ইডেন উদ্যান, পৃথিবী কেন্দ্র বিবেচিত হচ্ছিল। উভয়টিই আদম ও ইব্রাহিম ও তার ছেলের কোরবানির সাথে সম্পর্কিত ছিল। মিথ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের স্থাপত্যে মক্কার মূল পবিত্রতার অনুকরণ কোনো হীনম্মন্যতামূলক ছিল না। এটি নিজেই ছিল ঐক্যের সাথে, সব কিছুকে উৎসের সাথে সম্পর্কিত করে মূল পূর্ণাঙ্গতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামের প্রতীক।

জেরুসালেমের পবিত্রতা নিয়ে সপ্তম শতকের শেষ নাগাদ ইসলামি বিশ্বে প্রচারিত হতে শুরু করা নতুন নতুন প্রথায় এটি পরিষ্কার হয়ে যায়। এসব প্রথার অনেকগুলো নিশ্চিতভাবেই ছিল ইসরাইলিয়াতে প্রভাবিত। ইহুদিরা সবসময়ই টেম্পলকে বিশ্বের উর্বরতার উৎস হিসেবে কল্পনা করত। এখন মুসলিমেরা ঘোষণা করল যে ‘সব মিঠা পানির উৎস হয়েছে রকের নিচ থেকে।’ শেষ বিচার হবে জেরুসালেমে, আল্লাহ সেখানে গগ ও মাগগকে পরাজিত করবেন; হাশরের দিনে পবিত্র নগরীতে মৃতরা জীবিত হয়ে সমবেত হবে। জেরুসালেমে ইন্তেকাল করাটা ছিল বিশেষ রহমতের ব্যাপার : ‘যিনি জেরুসালেমকে ইন্তেকাল করার জন্য বাছাই করে নেবেন, তিনি বেহেশতে ইন্তেকাল করেছেন বলে বিবেচিত হবেন।’ সব নবী সেখানে সমাহিত হতে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। এমনকি ইন্তেকালের আগে ‘আদম নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে তাকে জেরুসালেমে কবর দিতে হবে।’ বলা হয়ে থাকে যে মুহাম্মদের (সা.) বন্ধুরা চাইতেন তাদের লাশ যেন সমাহিত করতে সব নবীর বিশ্রাম স্থল ও পুনরুত্থানের স্থান

জেরুসালেমে নিয়ে যাওয়া হয়। জেরুসালেম ছিল সব সাধু-দরবেশ ও পবিত্র বস্তুর স্বাভাবিক সমাপ্তি : শেষ দিনে খোদ কাবাকে জেরুসালেমে নিয়ে আসা হবে। পুনরাবৃত্তিমূলক এই মিথে মুসলিম কল্পনাশক্তিতে দুটির গভীরভাবে মিশে যাওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে। ৩৬

খলিফা প্রথম আল-ওয়ালিদ ৭০৫ সালে আবদুল মালিকের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি হারামের পবিত্রতা ও রাজকীয়তা জোরদার করা অব্যাহত রাখেন। ৭০৯ সালে তিনি উমরের সাদামাটা ভবনের স্থলে বর্তমান আল-আকসা নামের একটি নতুন মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। ডোম অব দি রকের বিপরীতে এ মসজিদটি বারবার বিধ্বস্ত হয়েছে, আবার নির্মাণ করা হয়েছে, বদলানো হয়েছে। আল- ওয়ালিদের মসজিদটি নির্মাণের পরপরই ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে যায়, খুব সামান্য টিকে ছিল। আমরা জানি যে এর মার্বেল হাঁটার পথ ছিল, স্তম্ভ ছিল। পরে এটি খুবই দীর্ঘ ও সংকীর্ণ বলে সমালোচিত হয়েছিল। হেরডের সহায়ক প্রাচীর সংস্কার করে ওপরের দিকে সম্প্রসারণ করেন খলিফা। অবশ্য তিনি হেরডের পাথরগুলোর বিশাল আকারের সাথে তাল মেলাতে পারেননি। প্লাটফর্মের প্রাচীরগুলোর চারপাশে খলিফা সমব্যবধানে সমশ্রেণী নির্মাণ করেন। এগুলো বর্তমানের মতো ছিল না। সবশেষে হারামের অতি কাছাকাছি থাকা পুরনো আবাসিক এলাকাগুলো কয়েকটি চমৎকার রাজকীয় ভবনের জায়গার জন্য পরিষ্কার করা হয়। প্লাটফর্মের দক্ষিণ প্রান্তের দরজাগুলো নতুন করে নির্মাণ করা হয়, সরকারি ভবনগুলো তোলা হয়। সবচেয়ে দর্শনীয়টি ছিল দোতলা সমান উঁচু বিশাল এক প্রাসাদ। এর কক্ষগুলো মধ্য আঙিনার পাশে কক্ষগুলো ছিল। উপরের ভবনটি সেতু দিয়ে হারামের সাথে সংযুক্ত ছিল। এটি দিয়ে নতুন মসজিদে যাওয়া যেত। আরো কিছু সমশ্রেণীর স্তম্ভ ছিল পশ্চিমের সহায়ক দেয়ালজুড়ে পশ্চিম ও উত্তর দিকে সম্প্রসারিত হয়। তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি হোস্টেল, হাম্মামখানা, একটি ব্যারাক ও অন্যান্য কাঠামো ছিল। সবশেষে রাস্তা থেকে হারামের পুরনো হেরডিয়ান সেতুটি আজ স্ট্রিট অব চেইন (তারিক আল-সিলসিলা) নামে পরিচিত। এটি পুনঃনির্মিত হয়। এটি উমাইয়াদের নির্মিত বৃহত্তম ভবন কমপ্লেক্স : আল-ওয়ালিদের ইচ্ছা কি ছিল ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে জেরুসালেমের রাজধানী গড়ার? ৩৭

নিশ্চিতভাবে আল-ওয়ালিদের ছেলে সোলায়মান (৭১৫-১৭) গভীরভাবে জেরুসালেমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মুজির উদ্দিন বলেন, তিনি 'জেরুসালেমে বাস করার পরিকল্পনা করেছিলেন, একে তার রাজধানী করেছিলেন, সেখানে বিপুল সম্পদ ও অনেক জনসংখ্যা জড়ো করেছিলেন। ৩৮ সোলায়মানকে রাজধানীতে খলিফা ঘোষণা করা হলেও আনুগত্যের বায়াত নিতে প্রতিনিধিদেরকে বায়তুল মোকাদ্দিসে আসতে হয়েছিল। নবী সোলায়মানের নামে নাম থাকা খলিফা সোলায়মান লোকজনকে ডোম অব দি রকের কাছে একটি গম্বুজবিশিষ্ট ভবনের নিচে বসে টেম্পল মাউন্টে লোকজনকে সাক্ষাত দিতে পছন্দ করতেন। স্থানটি একটি কার্পেট, কুশন ও ডিভানে সজ্জিত ছিল। অবশ্য জেরুসালেমকে রাজধানী করার তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। একটি বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হওয়ার মতো স্থান ছিল না জেরুসালেম। বিষয়টি বুঝতে পেরে সোলায়মান লিড্ডার কাছে নতুন নগরী হিসেবে রামলেকে গড়ে তোলেন। এটি হয় জান্দ ফিলাস্তিনের প্রশাসনিক রাজধানী। এর ফলে জেরুসালেমের অনেক ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি উপকূলে চলে যায়। ব্যাপকভাবে খ্রিস্টান প্রাধান্যপূর্ণ একটি নগরীকে রাজধানী নগরী করা উমাইয়াদের পক্ষে সম্ভবত অসম্ভব ছিল। তবে এর মানে এই নয় যে তারা জেরুসালেমকে মূল্যায়ন করত না, যদিও অনেকে এই দাবি করত। একেবারে শুরু থেকে মুসলিমেরা তাদের রাজধানীকে তাদের পবিত্রতম স্থানগুলো থেকে দূরে রাখার ঝোঁক প্রকাশ করত। মক্কা জয়ের পর মুহাম্মদ (সা.) তার রাজধানী মদিনা থেকে সেখানে সরিয়ে নেননি। অথচ তিনি তার অনুসারীদের মধ্যে কোনো ধরনের সংশয় রাখেননি যে মক্কাই অধিকতর পবিত্র স্থান। প্রথম খলিফারাও তাদের রাজধানী মদিনাতে রাখেন। জেরুসালেমের বদলে রামলেকে পছন্দ করার মধ্যে ও একই চিত্র দেখা যায়। এমনকি জেরুসালেমের পবিত্রতার ব্যাপারে সংশয়হীন ইহুদিরা পর্যন্ত রামলেতে বসবাস করাকে অগ্রাধিকার দেয় : নতুন নগরীতে ইহুদি সম্প্রদায় সবসময়ই জেরুসালেমের চেয়ে অনেক বড় ছিল। অষ্টম শতকের মাঝামাঝিতে সাম্রাজ্য ঝামেলায় পড়ে। ৭৪৪ সালে খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ নিহত হন। তার ছেলে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে জান্দ ফিলাস্তিন ও জান্দ উরদুন উভয় গোত্রই বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ দমন করার অনেক পরও জিম্মিদের প্রতি তার সহিষ্ণু নীতির বিরোধিতা করে যায় তারা। ইয়াজিদের উত্তরসূরী দ্বিতীয় মারওয়ানের বিরুদ্ধে আস-শ্যামে বিদ্রোহ অব্যাহত থাকে। এর ধারাবাহিকতায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জেরুসালেম, হিমস, দামাস্কাস ও অন্যান্য

নগরীর প্রাচীরগুলো ধ্বংস করা হয়। ৭৪৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর একটি ভূমিকম্প আঘাত হানলে নগরী এর চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডোম অব দি রকের পূর্ব ও পশ্চিম দিক ধসে পড়ে। এছাড়া আল-ওয়ালিদ মসজিদ, উমাইয়া প্রাসাদ ও জাস্টিনিয়ানের নেয়া চার্চেরও একই অবস্থা হয়। হারামের কাছাকাছি বসবাসকারী অনেক মুসলিম নিহত হয়। আফটারশকের ভয়ে অনেক অধিবাসী প্রায় ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত পাহাড়গুলোতে বাস করতে থাকে। ভূমিকম্পটি উমাইয়া রাজবংশের রাজনৈতিক পতনের সূচনা করে। মুহাম্মদের (সা.) চাচা আব্বাসের বংশধরেরা দীর্ঘ দিন ধরে ট্রান্সজর্দানের হুমায়মায় তাদের ঘাঁটিতে উমাইয়াদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছিল। ৭৪৯ সালে তাদের সাথে যোগ দেয় খোরাসানের আবু মুসলিম। তিনি খিলাফতের সব বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন। জানুয়ারিতে খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান দজলা নদীর পূর্ব দিকে জাব নদীতে তার চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করেন। এরপরপরই ফিলিস্তিনের অ্যান্টিপাট্রিসে অবশিষ্ট উমাইয়াদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। আবু আল-আব্বাস হন প্রথম আব্বাসি খলিফা। তবে তারা তাদের রাজধানী নতুন নগরী বাগদাদে সরিয়ে নেন। এটি জেরুসালেমের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে।

আল-কুদস

মুসলিমেরা এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় যার ফলে প্রথমবারের মতো জেরুসালেমে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমেরা একসাথে বসবাস করতে পেরেছিল। ইহুদিরা বেবিলনের নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর একেশ্বরবাদীরা নগরীর এমন স্বপ্নাবির্ভাব নির্মাণ করে যা এর ঐশী সত্তা বহিরাগতদের বর্জন করার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। অবশ্য, ঐশী সত্তার ব্যাপারে মুসলিমদের অনেক বেশি অন্তর্ভুক্তমূলক ধারণা ছিল। তা হলো ইব্রাহিমের তিন ধর্মের সহাবস্থান, প্রতিটি ধর্মেরই নিজস্ব পরিধি বজায় রেখে তার নিজস্ব বিশেষ উপাসনালয়ে প্রার্থনা করতে পারা। এই ধারণায় এক আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করা যথাযথভাবে নির্দেশিত সব ধর্মের ধারাবাহিকতা ও সম্প্রীতির ব্যাপারে মুসলিমদের দর্শন প্রতিফলিত হয়। তিন ধর্মের সবার কাছে পবিত্র বিবেচিত নগরীতে একসাথে বসবাসের অভিজ্ঞতা একেশ্বরবাদীদেরকে একে অপরকে আরো ভালোভাবে বোঝার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা হয়নি। পরিস্থিতির মধ্যে সহজাত টানাপোড়েন ছিল। ছয় শত বছরের বেশি সময় ধরে বিশেষ করে জেরুসালেমের মর্যাদা নিয়ে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে উত্তেজনা ছিল। প্রত্যেকেই বিশ্বাস করত যে অন্যরা ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রয়েছে। ফলে পবিত্র নগরীতে পাশাপাশি বসবাস করেও পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেনি। অনেক মুসলিমও পবিত্র কোরআনের সার্বজনীন দর্শন পরিত্যাগ করতে শুরু করে ইসলামকে একমাত্র সত্য বিশ্বাস হিসেবে ঘোষণা করে। সুফি ও দার্শনিকেরা সর্বাত্মকভাবে তাদের ভিন্ন পন্থায় পুরনো আদর্শ জোরালোভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মুসলিম ধরে নিতে চেষ্টা করছিল যে পুরনো বিশ্বাসগুলোকে অপসারণ করে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল ইসলাম। একেশ্বরবাদ একবার যদি এমন বর্জনশীল ঘোষণা দেয়, তবে সহাবস্থান খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতিটি বিশ্বাস যদি ধরে নেয় যে সে এবং একমাত্র সেই ঠিক, তবে একই দাবি করা অন্যান্য ধর্মের নৈকট্য এমন অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে, যা সহ্য করা খুবই কঠিন। তিনটি ধর্মের প্রতিটিই স্বতন্ত্র্য পরিচিতি ও সহজাত শ্রেষ্ঠত্ব জোরালোভাবে ঘোষণা করার চেষ্টা করায় আব্বাসি শাসনকালে বায়তুল মুকাদ্দিসে উত্তেজনা বাড়ে।

নগীর বর্ধিত উদ্বিগ্নতা সৃষ্টির আরেকটি কারণ ছিল খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে সরিয়ে নেওয়া। বাগদাদ ৭৬২ সালে ইসলামি সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানীতে পরিণত হয়। আব্বাসি খলিফাদের জন্য জেরুসালেম তখনো প্রতীকী গুরুত্ব ছিল। তবে পূর্বসূরীদের মতো আস-শাম ও বায়তুল মুকাদ্দিসে ঢালাওভাবে ব্যয় করার ও এর প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। উমাইয়া শাসনের সাথে জেরুসালেমের খুব বেশি সম্পৃক্ততা ছিল। উমাইয়া খলিফারা নিয়মিতভাবে পবিত্র নগরী সফর করতেন, নগরীর সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন তারা। কিন্তু আব্বাসীয়রা ছিলেন সুদূরের সেলিব্রেটি। তাদের কেউ যখন জেরুসালেম সফর করতেন, সেটা হতো বিরাট ঘটনা। তবে প্রথম খলিফারা তাদের বৈধতার প্রতীক হিসেবে জেরুসালেম সফর প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করতেন। আর ৭৫৭ সালে খলিফা আল-মনসুর অবশেষে যখন তার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন, তখন তিনি হজ থেকে ফেরার পথে জেরুসালেম সফর করেন। নগরী ছিল দুর্দাশাগ্রস্ত। ৭৪৭ সালের ভূমিকম্পের পর হারাম ও উমাইয়া প্রাসাদ তখনো বিধ্বস্ত ছিল। মুসলিমেরা তাকে হারামের দক্ষিণ প্রান্তে থাকা আল-ওয়ালিদের মসজিদটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে বললে তিনি স্রেফ এ জবাবই দেন যে তার কাছে টাকা নেই। তবে তিনি ডোম অব দি রকে থাকা স্বর্ণ ও রৌপ্য গলিয়ে মেরামতের খরচ মেটানোর পরামর্শ দেন। আব্বাসিরা হারামকে অবহেলা না করলেও উমাইয়াদের মতো উদারভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেনি। মসজিদটি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরপরই ৭৭১ সালে আরেকটি ভূমিকম্পে সেটি ভেঙ্গে পড়ে। খলিফা আল-মাহদি খলিফা (৭৭৫- ৮৫) হওয়ার পর মসজিদটি পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণ করার আদেশ দেন। এ সময় সব প্রাদেশিক গভর্নর ও স্থানীয় সেনা ছাউনিগুলোর কমান্ডারকে ব্যয় পরিশোধ করতে বলেন। পুরনো মসজিদের চেয়ে নতুনটি অনেক বেশি টেকসই ছিল। মোকাদ্দাসি ৭৮৫ সালে জেরুসালেমের বর্ণনা লিখেছিলেন, তখনো মসজিদটি টিকে ছিল। তখন এর একটি সুন্দর গম্বুজ ছিল, যা আগের চেয়ে অনেক প্রশস্ত : উমাইয়া ভবনের অবশিষ্ট অংশটি 'নতুনটির মধ্যে সুন্দর বিন্দুর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

মসজিদটিকে এখন বলা হয় আল-মসজিদ আল-আকসা, 'প্রত্যন্ত মসজিদ' : এটিকে পবিত্র কোরআনে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখিত মুহাম্মদের (সা.) মিরাজের ঘটনার সাথে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হতে থাকে। নবীর জেরুসালেমে স্বপ্নাবিভাবী অভিজ্ঞতার প্রথম পূর্ণ বিবরণ

দেখা যায় মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের (মৃত্যু ৭৬৭) লেখা জীবনীতে। এতে বার্তাবাহক ফেরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে মুহাম্মদের (সা.) মক্কা থেকে টেম্পল মাউন্টে যাওয়ার বিস্তারিত ভাষ্য রয়েছে। তিনি সেখান থেকে সাত আসমান পাড়ি দিয়ে ঐশী আরশে পৌছান। অনেক মুসলিম আক্ষরিকভাবে কাহিনীটি ব্যাখ্যা করে বিশ্বাস করতে থাকে যে মুহাম্মদ (সা.) দৈহিকভাবে জেরুসালেম গিয়েছিলেন, সশরীরে বেহেশতে আরোহণ করেছিলেন। নবীর প্রিয় স্ত্রী আয়েশাসহ অন্যরা সবসময় জোর দিয়ে বলেছেন যে এটি ছিল পুরোপুরি আধ্যাত্মিক বিষয়। আল্লাহর কাছে যাওয়ার এই উদ্যোগের সাথে সালেমকে সম্পৃক্ত করা মুসলিমদের জন্য ছিল সহজাত ব্যাপার। ৬৯১ সালে ডোম অব দি রক নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর থেকে হারাম হয়ে পড়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আধ্যাত্মিক আরোহণের শক্তিশালী ছবি। সুফিরা অপ্রতিরোধ্যভাবে বায়তুল মুকাদ্দিসের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রায় এই সময়ই আকসা মসজিদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই পর্যায়ে প্রখ্যাত নারী মরমি সাধক রাবি আল-আদাবিয়া নগরীতে ইন্তিকাল করলে তাকে ডোম দেখা যায়, এমন স্থান মাউন্ট অলিভেসে করব দেওয়া হয়। সুফিবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে আদহামও বসবাস করার জন্য খোরাসান থেকে জেরুসালেমে চলে আসেন। সুফিরা ইসলামি আধ্যাত্মিকতার অন্তরাত্মার মাত্রা অনুসন্ধান করার জন্য মুসলিমদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তাদের মরমি সাধনার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিল আদি ঐক্যে ফিরে যাওয়া এবং মুহাম্মদের (সা.) ইশরা ও মিরাজ তাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মডেলে পরিণত হয়। তারা দেখে ছিলেন, ঐশী আরশের সামনে মুহাম্মদ (সা.) ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তবে এই ফানা (আত্মবিলোপসাধন) ছিল সম্প্রসারিত ও পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষের সামগ্রিক স্থায়ী সত্তায় (বাকা) পৌছার স্রেফ সূচনা পর্ব।

সুফিরা হারামের আশপাশে ভিড় জমাতে লাগলেন : অনেকে এমনকি প্লাটফর্মের কিনারায় ভাবেষ্টিত বারান্দাগুলোতে বাস করতে থাকলেন, যাতে তারা মুহাম্মদ (সা.) যেখান থেকে ঊর্ধ্বগমন করেছিলেন, সেই ডোম অব দি রকের প্রতীকতা নিয়ে ধ্যান করতে পারেন। তাদের উপস্থিতি জেরুসালেমে কল্যাণকর প্রভাব পড়েছিল। কারণ সুফিরা অন্যান্য ধর্মের মূল্য সম্পর্কে অনবদ্য প্রশংসা করতেন। ইসলামি আইন বিকাশকারী আলেম ও মুফতিরা ইসলামকে অন্যদের থেকে বর্জনশীল ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করতে চাইলেও সুফিরা

পবিত্র কোরআনের সার্বজনীনতার প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকতেন। সুফি মরমিবাদীদের জন্য বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার যে তারা ইহুদি, খ্রিস্টান বা মুসলিম হিসেবে নয়, এবং মসজিদ, সিনাগগ, চার্চ বা মন্দিরে কিংবা বাড়িতে একই অবস্থায় ধ্যানে মগ্ন হতে পারে। কারণ ফানায় তারা অহং বিনাশ করে মনুষ্য-সৃষ্ট ভিন্নতার ঊর্ধ্বে ওঠতে পারেন। সব মুসলিম এই মরমি উচ্চতায় উঠতে না পারলেও তারা ছিলেন সুফি দর্শনে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। সাম্রাজ্যের অনেক অংশে সুফিবাদ প্রভাবশালী ইসলামি ধর্মানুরাগে পরিণত হয়। অবশ্য প্রাথমিক সময়ে এটি বেশ প্রান্তিক ও সন্দেহজক বিবেচিত হতো।

এখন মুহাম্মদ যেহেতু জেরুসালেম সফর করেছেন বলে মনে করা হলো, তখন নগরীটি দ্বিগুণ পবিত্র হয়ে গেল। স্থানটি সবসময়ই পৃথিবীর আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে টেম্পল নগরী হিসেবে শ্রদ্ধা করা হতো। কিন্তু এখন এর সাথে পূর্ণাঙ্গ মানব নবীর সাথেও সম্পৃক্ত হয়ে পড়ল। মক্কা থেকে জেরুসালেমে তার আধ্যাত্মিক সফর (আল-ইসরা) দুটি পবিত্র স্থানের মধ্যে সংযোগ জোরদার করল। মুহাম্মদ (সা.) তার নিজস্ব ব্যক্তিতে মক্কার আদি পবিত্রতা জেরুসালেমের সুদূরের মসজিদে পৌঁছে দিয়েছেন। মক্কা ও মদিনার মতো জেরুসালেমের পবিত্রতাও পরিপূর্ণ মানবের উপস্থিতিতে বেড়ে গেছে। মুহাম্মদ (সা.) বেহেশত ও দুনিয়ার মধ্যে নতুন সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছেন। মুহাম্মদের (সা.) মিরাজের কাহিনী বিষয়টি পুরোপুরি পরিষ্কার করে দিয়েছে। এই সময় নাগাদ মুসলিমেরা নবীর জীবনকে খোদার মানবীয় রূপে প্রকাশ হিসেবে দেখতে শুরু করেছিল। নিশ্চিতভাবেই তিনি ঐশী সত্তা ছিলেন না, তবে তার ক্যারিয়ার ছিল আয়াত তথা পৃথিবীতে আল্লাহর কার্যক্রম এবং আল্লাহর কাছে পূর্ণাঙ্গ মানুষের আত্মসমর্পণের নিদর্শন। অষ্টম ও নবম শতকে বিদ্বজনেরা মুহাম্মদের (সা.) হাদিস ও রীতিনীতি (সুন্নাহ) সংগ্রহ সঙ্কলনের কাজ শুরু করেছিলেন। এগুলো ইসলামি আইনের (শরিয়াহ) ও প্রতিটি মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনের ভিত্তি গড়ে দেয়। সুন্নাহ মুহাম্মদের (সা.) কথা বলা, খাওয়া, গোসল করা, ভালোবাসা, ইবাদত করার বিষয়গুলোতে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে তাকে অনুকরণ করতে শেখায় যাতে তারা তার পরিপূর্ণ ইসলামে অংশ নিতে পারে। প্রতিরূপের প্রতীকী কাজটি মুসলিমদের সাথে শ্বাশত আদিরূপ মুহাম্মদের (সা.) সংযোগ সাধন করে। তিনি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, কারণ আল্লাহর ইচ্ছাই ছিল তা।

একজন মুসলিম আল্লাহর কথা কোরআন অধ্যায়ন করছেন আল আকসা মসজিদে। এই অধ্যায়নের মাধ্যমে মুসলিমেরা ঐশী সত্তার সাথে সংযোগ সাধন করে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতম পর্যায়েও কিভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা যায়, তা শেখে।

জেরুসালেমের হারাম থেকে সর্বোচ্চ আসমানে মিরাজ করার কাহিনীতে আল্লাহর কাছে মুহাম্মদের (সা.) পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ঘটনাটি যে অলঙ্কারপূর্ণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তেমন ভাষ্য আছে খুব কমই। মুসলিমদের কাছে এটি ছিল প্রত্যাবর্তনের সহজাত ছবি। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, সব মানুষকেই অস্তিত্বের উৎসে ফিরে যেতে হবে। ফলে জেরুসালেমে ইবাদত করতে আসা মুসলিমেরা নবীর আধ্যাত্মিক সফরে অংশগ্রহণ করার মতো করে ইসরা ও মিরাজের বাহ্যিক ঘটনাগুলো অনুকরণের প্রতীকীমূলকভাবে বিবর্ধিত করেছিল।

তারা এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করার তার আন্তর প্রবণতার কোনো না কোনো মাত্রার কাছাকাছি হওয়ার আশা করে। হারাম নিয়ে তাদের নতুন সুন্নাহ জেরুসালেমের আশপাশে যিশুর পদাঙ্ক অনুসরণকারী খ্রিস্টানদের ধর্মীয় শোভাযাত্রার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। অষ্টম ও নবম শতকে (আমরা নিশ্চিত নই, ঠিক কখন ঘটেছিল) হারামে ছোট ছোট কয়েকটি ইবাদতগাহ ও ক্ষুদ্র উপাসনালয় আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। (দেখুন মানচিত্র।) ডোম অব রকের ঠিক উত্তরে ছিল নবীর গম্বুজ (ডোম অব দি প্রফেট) ও জিব্রাইলের মঞ্জিল (স্টেশন অব জিবরিল)।৩ স্বর্ণ মই (আল-মিরাজ) দিয়ে উপরে যাওয়ার আগে মুহাম্মদ (সা.) ও জিবরাইল ফেরেশতা অন্য নবীদের সাথে কোথায় নামাজ পড়েছিলেন, এসব ছোট ইবাদতগাহ সেই স্থানগুলো চিহ্নিত করেছিল। কাছেই ছিল মিরাজ গম্বুজ (ডোম অব দি মিরাজ)। এখান থেকে নবী আসমানি সিংহাসনের দিকে উপরে উঠা শুরু করেছিলেন। মুসলিমেরা হারামের দক্ষিণ তোরণেও ইবাদত করতে পছন্দ করত। কারণ ওই স্থানটি নবীর তোরণ নামে পরিচিত ছিল। বলা হয়ে থাকে, এখান দিয়েই মুহাম্মদ (সা.) জিবরাইল ফেরেশতার আগে আগে হেঁটে নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। এ সময় সূর্যের মতো তীব্র আলো অন্ধকার সরিয়ে দিয়েছিল। তারপর তারা হারামের দক্ষিণ-

পশ্চিম কোণের একটি স্থানে গিয়েছিলেন। মক্কা থেকে সফর করার পর এখানেই মুহাম্মদের (সা.) ঐশী ঘোড়া বোরাক বেঁধেছিলেন।

হারামের বিভিন্ন ইবাদতগাহ অন্যান্য নবীর উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানেও আমরা সুফি প্রভাব দেখতে পাই। জেরুসালেমে মুসলিম জিয়ারতকারীদের তাদের আগে নগরীতে বসবাসকারী, ইবাদতকারী, দুর্ভোগ সহ্যকারী পবিত্র মানুষদের প্রতি সম্মান জানানো শেখানো হতো। বলা হয়ে থাকে, ডোম অব রকের পূর্ব দিকে থাকা ডোম অব দি চেইন এমন এক স্থান যেখানে রাজা দাউদ বিচার করতেন ইসরাইল সন্তানদের। তিনি গোপন মিথ্যা শনাক্ত করতে আলোর একটি বিশেষ শিকল তৈরি করেছিলেন। হারামের দক্ষিণ দিকে ছিল সোলায়মানের সিংহাসন। এখানে রাজা সোলায়মান টেম্পল নির্মাণ শেষ করে নামাজ পড়েছিলেন। হারামের কয়েকটি তোরণের সাথে ইহুদি ইতিহাসের সম্পৃক্ততা ছিল : ইসরাইলিরা আর্কটি নিয়ে এসেছিল বাব আল-আকিনা (ডিভাইন প্রেজেন্স বা ঐশী উপস্থিতি) দিয়ে, তারা যম কিপুরের ওপর বাব হিত্তায় (গেট অব রেপেনট্যান্স বা অনুতপ্ত তোরণ) ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল। অবশ্য জেরুসালেম ঈশার (যিশু) নগরীও ছিল। তার জন্ম ও শৈশব সম্পর্কে অনেক গল্প বলেছে পবিত্র কোরআন। এতে বলা হয়েছে, মরিয়ম (মেরি) যখন অন্তঃসত্তা ছিলেন তখন জন দি ব্যাপ্তিস্তের বাবা জাকারিয়া তার যত্ন নিতেন। আর তার খাবার আসত অলৌকিকভাবে। তিনি যখন শিশু ছিলেন, তখন ঈশা তার দোলনা থেকে আশ্চর্যভাবে কথা বলতেন। এটি নিঃসন্দেহে তার নবুয়তির প্রাথমিক আয়াত। এখন হারামে মুসলিম জিয়ারতকারীরা প্লাটফর্মের উত্তর-পূর্ব কোণে ওরাকল অব জাকারিয়া ও হাঁটার পথে দুটি খিলানে থাকা দুটি ইবাদতগাহে ইবাদত করতেন। এ দুটি স্থান ছিল মিরহাব মরিয়ম (ওরাটর অব ম্যারি) ও মিহদ ঈশা (ক্রেডল অব জেসাস)। সবশেষে মুসলিমরা কিনারা থেকে ওয়াদি জাহান্নাম (ভ্যালি অব হিন্নম) ও মাউন্ট অব অলিভেসের দিকে তাকাত। তাদের কাছে স্থান দুটি ছিল শেষ বিচার ও পুনরুত্থানের স্থান। তারা হারামের পূর্ব দিকের 'গোল্ডেন গেট'কে বলত বাব আল-রাহমা (গেট অব মার্সি)। এটি পবিত্র কোরআনে রহমত ও গজবের মধ্যে বিভক্ত সৃষ্টি করত। বিচারের পর হারাম পরিণত হবে বেহেশতে আর ওয়াদি জাহান্নাম হবে দোজখে। তোরণের কক্ষগুলোতে

সুফিরা একটি মসজিদসহ খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে তারা আসন্ন সমাপ্তির জন্য ধ্যান করতে পারতেন।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯) ছিলেন জেরুসালেম সফরের জন্য তাগিদ অনুভব না করা প্রথম আব্বাসি খলিফা। এমনকি তিনি হজ থেকে ফেরার পথে অনেকবার সিরিয়া সফর করলেও কখনো সেখানে যাননি। ঘৃণিত উমাইয়াদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র নগরীটির থেকে আব্বাসিরা নিজেদের মুক্ত থাকতে শুরু করতে শুরু করেছিল। বাগদাদে হারুন-অর-রশিদের রাজদরবার ছিল কিংবদন্তিময় জাঁকজমকপূর্ণ। সেখানে বিপুল সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ছিল। কিন্তু বাস্তবে খিলাফতের পতন শুরু হয়ে গিয়েছিল : হারুন-অর-রশিদ ইরাকের বাইরে তার শাসন কার্যকরভাবে আরোপ করতে সক্ষম ছিলেন না, স্থানীয় কমান্ডাররা সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারা সাধারণভাবে খলিফার নামে শাসন করলেও কার্যত স্বাধীনতা উপভোগ করতেন। এই পর্যায়ে ফিলিস্তিন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিকভাবে পতনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। উমাইয়াদের আমলে দেশটি সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছিল। কিন্তু এখন আব্বাসিরা অঞ্চলটি শোষণ করতে শুরু করে সম্পদ ও সমৃদ্ধি কেড়ে নিতে থাকে। একটি প্লেগও বিপুলসংখ্যক লোককে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। বেদুইনরা গ্রাম এলাকায় হানা দিতে থাকে, শহর ও গ্রামগুলো লুণ্ঠন করতে থাকে, ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে তাদের নিজস্ব গোত্রীয় যুদ্ধ চালাতে থাকে। উমাইয়াদের আমলে বেদুইনরা খিলাফতের জন্য লড়াই করত, এখন তারা দেশের জন্য অভিশাপে পরিণত হলো। এই অস্থিরতার ফলে জেরুসালেমে স্থানীয় মুসলিমেরা ও খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রকাশ্য উত্তেজনার প্রথম নিদর্শন দেখা যায়। বেদুইনরা জুদার মঠগুলোতে আক্রমণ করে, ওয়েস্টার্ন হিলের খ্রিস্টানেরা বুঝতে পারে যে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত মুসলিমেরা তাদের প্রাচুর্যে অসন্তুষ্ট। তাদের চার্চগুলো বিপুল সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করত, কঠিন অবস্থায় মুসলিমরা খ্রিস্টান সম্পদের বিবরণ শুনে ক্ষুব্ধ হতো।

জেরুসালেমের জনসাধারণের কাছে হারুন-অর-রশিদ ছিলেন সুদূরের ও অজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তবে পশ্চিম ইউরোপের খ্রিস্টানদের কাছে তিনি ছিলেন সহৃদয় সম্মানীয় ব্যক্তি। তাদের সম্রাটেরও তিনি অত্যন্ত কদর করে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ৮০০ সালের ক্রিসমাস

দিবসে পোপ তৃতীয় লিও পাশ্চাত্যের হলি রোমান সম্রাট ফ্রাঙ্কদের রাজা চালর্সকে মুকুট পরান। অভিষেক অনুষ্ঠানে জেরুসালেমের সন্ন্যাসীরা উপস্থিত ছিলেন। বায়েজান্টাইনরা চালর্সের উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। এক নিরক্ষর বর্বরকে রাজকীয় পোশাক পরার ধারণায় আতঙ্কিত হয়েছিলেন তারা। চার্লসকে তার মিত্র লাভের জন্য আরো অনেক দূর তাকাতে হয়েছিল। পাশ্চাত্যের লোকজন আবারো একজন সম্রাটকে পেয়ে রোমাঞ্চিত হয়েছিল। মনে হচ্ছিল রোম পতনের পর ইউরোপের ওপর যে অস্পষ্টতা আর অন্ধকার নেমে এসেছিল, তা অবশেষে কাটতে শুরু করেছে। তারা চার্লসকে 'শার্লেমেন' ও 'চার্লস দি গ্রেট' নামে ডাকতে শুরু করল। তাদের কাছে তিনি নির্বাচিত জাতির রাজা বিবেচিত হলেন। আচেনে অবস্থিত তার রাজধানী হলো নিউ জেরুসালেম, সেখানে তার সিংহাসনটি ছিল রাজা সোলায়মানের সিংহাসনের আদলে। সহজাতভাবেই তারা নতুন পাশ্চাত্য পরিচিতি কামনা করেছিল। ইউরোপের লোকজন জেরুসালেমের পবিত্র নগরীর দিকে ছুটল। খ্রিস্টের কবর আবিষ্কারের পর এখন আবার দীর্ঘ ও কষ্টকর তীর্থযাত্রায় উদ্বুদ্ধ হলো তারা। খলিফা হারুন-অর-রশিদের সাথে ইতোমধ্যেই উপহার বিনিময় করেছিলেন শার্লেমেন। আর জেরুসালেমের প্যাট্রিয়ার্ক তাকে অ্যানাস্তাসিসের প্রত্নতাত্ত্বিক উপহার ও চাবি পাঠিয়েছিলেন। খলিফা সম্ভবত নতুন বিদেশী মিত্র পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। তিনি চার্লসকে অ্যানাস্তাসিসের বিপরীতে জেরুসালেমে একটি সরাইখানা নির্মাণের অনুমতি দিলেন। এতে একটি চার্চ ও একটি জাঁকজমকপূর্ণ লাইব্রেরিও ছিল। চার্লস তীর্থযাত্রীদের জন্য কিদরন ভ্যালিতে ১২টি কক্ষ-সংবলিত একটি ভবন প্রতিষ্ঠা করেন। এতে খামার, আঙর বাগান ও একটি বাণিজ্যিক সবজি খামার ছিল। জেরুসালেমে নতুন সম্রাটের একটি ঘাঁটি হলো : তার নতুন সাম্রাজ্যের শিকড় দুনিয়ার কেন্দ্রে ছিল বলে বলা হয়ে থাকে।

বাস্তবে মৃত্যুর পর চার্লসের সাম্রাজ্য টিকে না থাকলেও ইউরোপের লোকজন কখনো তার সংক্ষিপ্ত রেনেসাঁ কিংবা জেরুসালেমের সাথে তার সংযোগের কথা ভোলেনি। পরবর্তীকালের ইতিহাসবিদ ও ইতিহাসলেখকেরা দাবি করেছেন, চার্লসের প্রতি খলিফা এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তাকে পুরো পবিত্র ভূমি দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অন্যরা বলে, তিনি চার্লসকে জেরুসালেমের খ্রিস্টানদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের

সজ্ঞানতায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে হারুন-অর- রশিদ তাকে ফিলিস্তিন দিতে না পারলেও তাকে অ্যানাস্তাসিসের মালিকানা দিয়েছিলেন। ফলে এই পবিত্র স্থানটিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এটি ছিল এমন এক বিশ্বাস যা তিন শ' বছর পর ক্রুসেডের আমলে ভয়াবহভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। ওই সময় পাশ্চাত্য আরো স্থায়ীভাবে পুনর্জীবন অর্জন করেছিল। তবে এসব রাজকীয় স্বপ্নের কিছু কিছু জেরুসালেমে চার্লসের নতুন প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য আসা ইউরোপিয়ান সন্ন্যাসী, পুরোহিত ও নানেরা প্রকাশ করতেন। ৮০৭ সালে ন্যাটিভিটি চার্চে গ্রিক ও ল্যাতিনদের মধ্যে দাঙ্গা বেঁধে যায়। নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা বিকাশকারী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানেরা একে অপরের প্রতি মতবাদগত সহজাত বিরূপতা পোষণ করত। এতে করে খ্রিস্টান বিশ্বের পবিত্রতম একটি স্থানে সহিংসতার সৃষ্টি হয়। এটি ছিল জেরুসালেমের দীর্ঘ ও লজ্জাজনক বিরোধিতার সূচনা।

মুসলিমদের কাছে ওয়েস্টার্ন হিলের ওপর নতুন ল্যাতিন ভবনগুলো জেরুসালেমের খ্রিস্টানদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও সম্পদের ব্যাপকতাই প্রকাশ করেছিল। তাদের নিজদের খলিফা দৃশত্য পবিত্র নগরীকে অবহেলা করতে থাকলেও খ্রিস্টান রাজারা সেখানে তাদের অবস্থান মজবুত করার জন্য মুক্ত হাতে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকছে না। সিরিয়ান মনোফাইসিত সম্প্রদায় জ্যাকোবাইতরাও হারামের ঠিক উত্তরে মেরি ম্যাগদালেনকে নিবেদন করে নতুন একটি মঠ নির্মাণ করল। তখন ছিল ফিলিস্তিনের ভয়াবহ সময়। ৮০৯ থেকে ৮১৩ পর্যন্ত সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ ছিল। হারুন-অর-রশিদের দুই ছেলে উত্তরাধিকার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। খলিফা আল-মামুনের সিংহাসন আরোহণের মধ্য দিয়ে এর নিষ্পত্তি হওয়ার পর আবার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে ডোম অব অ্যানাস্তাসিস মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর পঙ্গপালের আক্রমণ ঘটে। এত গ্রামীণ এলাকায় বিপর্যয় ঘটে, পরিণামে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হারামের আশপাশের মুসলিম অধ্যুষিত মহল্লাগুলো ছিল শহরের অধিকতর অস্বাস্থ্যকর এলাকা। তারা কয়েক সপ্তাহের জন্য জেরুসালেম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তারা ফিরে এসে দেখল যে প্যাট্রিয়ার্ক টমাস সুযোগটি লুফে নিয়ে অ্যানাস্তাসিস ডোম মেরামত করে ফেলেছেন। এটি এখন ডোম অব রকের মতোই বড়। এতে তারা প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়। নগরীর মুসলিম অধিবাসীরা

তিক্তভাবে রাজকীয় কমান্ডারের কাছে অভিযোগ করে যে খ্রিস্টানেরা ইসলামি আইন লঙ্ঘন করেছে। ওই আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, জিম্মিরা মসজিদ কিংবা উম্মাহর অন্যান্য ঐশী ভবনের চেয়ে বড় বা সমান কোনো উপাসনালয় স্থাপন করতে পারবে না।

এটি ছিল উদ্বেগজনক নতুন ঘটনা। এই ধরনের সমস্যা জেরুসালেমে অব্যাহতভাবে ঘটতে থাকে। অনেক দিন ধরেই নগরীতে নির্মাণ ছিল আদর্শগত অস্ত্র। হ্যাড্রিয়ানের আমল থেকে নির্মাণের অর্থ ছিল আগের মালিকদের মালিকদের মুছে ফেলার প্রবণতা। এখন ভবনগুলো জেরুসালেমের সম্প্রদায়গুলোর কাছে অন্যদের প্রতি তাদের বৈরিতা প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত হলো। মুসলিমরা সবসময়ই বায়তুল মোকাদ্দাসে খ্রিস্টানদের চমকপ্রদ চার্চগুলো নিয়ে নার্ভাস ছিল। তবে উমাইয়া আমলে খলিফারা ইসলামি জেরুসালেম ও সার্বিকভাবে দেশের জন্য অর্থ ঢালতে ইচ্ছুক থাকায় তাদের পক্ষে তা হজম করা অনেক সহজ ছিল। এখন তারা অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত থাকায়, খলিফার কাছ থেকে পরিত্যক্ত হওয়ায় মুসলিমদের কাছে অ্যানাস্তাসিস ডোম অসহ্যকর মনে হলো। ইসলাম আত্মবিশ্বাসী ধর্ম হিসেবে ফিলিস্তিনে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছিল। ধর্মীয় ভবনগুলো আগে অলৌকিক সামগ্রী হলেও নতুন নিরাপত্তাহীনতার কারণে এখন সেগুলো মুসলিমদের নিজস্ব বিপন্ন পরিচিতির প্রতীকে পরিণত হলো। খ্রিস্টানেরাও প্রায় নিশ্চিত ছিল যে তাদের নিজস্ব ডোমের সম্প্রসারণ ছিল নগরীতে তাদের শক্তি ও অবস্থানের আগ্রাসী মনোভাবের প্রকাশ। ইসলাম হয়তো তাদেরকে জয় করেছে, কিন্তু তারা দীর্ঘ সময় নিকৃষ্টতর অধীনস্থ হয়ে থাকেনি।

সবশেষে একটি সমঝোতা হলো। প্যাট্রিয়ার্ক প্রহার থেকে রক্ষা পেতে সক্ষম হয়েছিলেন অভিযোগকারীদের এ কথা বলে যে নতুন ডোমটি পুরনোটির চেয়ে যে বড় তা যেন তারা প্রমাণ করে। এক মুসলিমই তাকে এই চালাকি শিখিয়ে দিয়েছিল। এর বিনিময়ে ওই মুসলিম পরিবারটি পরের ৫০ বছর প্যাট্রিয়াক অফিস থেকে নিয়মিত ভাতা পেয়েছিল। খলিফা আল-মামুন মুসলিম অনুভূতিকে মূল্যায়ন করে হারামে নতুন নির্মাণের আদেশ জারি করেছিলেন। প্লাটফর্মের পূর্ব ও উত্তর তোরণগুলো নির্মাণ করা হয়, ডোম অব দি রক একেবারে ঢেলে সাজানো হয়। আল-মামুন প্রধান খোদাইলিপি থেকে উমাইয়া বংশের

আবদুল মালিকের নাম মুছে ফেলার সুযোগটিও গ্রহণ করে সেখানে তার নিজের নাম স্থাপন করেন। অবশ্য তারিখ পরিবর্তন না করার বুদ্ধিটি তার ছিল। ৮৩২ সালে খলিফা 'আল-কুদস' (মহা পবিত্র, জেরুসালেমের নতুন মুসলিম নাম) শব্দ-সংবলিত নতুন মুদ্রা ইস্যু করেন।

তবে মুসলিমদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরাতে খ্রিস্টানেরা তাদের ধর্মীয় প্রতীকগুলো অব্যাহতভাবে ব্যবহার করতে থাকে। নবম শতকে আমরা প্রথমবারের মতো ইস্টার সানডের আগের সন্ধ্যায় অ্যানাস্তাসিসের হলি ফায়ার (পবিত্র আগুন) বার্ষিক অনুষ্ঠানের কথা শুনি। জনতা প্রত্যাশা নিয়ে রোতানদা ও ম্যারটিরিয়ামে সমবেত হতো। দুটিই থাকত পুরোপুরি অন্ধকার। কবরের পেছন থেকে স্বাভাবিক সন্ধ্যা প্রার্থনা আওড়াতেন প্যাট্রিয়ার্ক। তারপর হঠাৎ করে অনেকটা স্বর্গ থেকে নেমে আসার মতো করে একটি পরিষ্কার সাদা শিখা উপাসনালয়ে আত্মপ্রকাশ করত। উত্তেজিত, চাপা নীরবতায় অপেক্ষমান সমবেত জনতা উচ্চ শব্দে চরম উল্লাসে ফেটে পড়ত। তারা সর্বোচ্চ শক্তিতে পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করত, বাতাসে তাদের ক্রুশ দোলাত, আনন্দে চিৎকার করত। প্যাট্রিয়ার্ক শিখাটি মুসলিম গভর্নরের কাছে হস্তান্তর করতেন। তিনি সবসময় ওই অনুষ্ঠানে হাজির থাকতেন। তারপর তা দেওয়া হতো জনতার কাছে। তারা সেখান থেকে নিজ নিজ মোমবাতি ধরাত। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত, পবিত্র আগুনটি তাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় রাস্তায় চিৎকার করতে করতে বলত 'ক্রুশের ধর্ম তাড়াতাড়ি চলো!' অনুষ্ঠানটিতে মুসলিমেরা বিরক্ত হতো বলে মনে হচ্ছে। এই প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিমেরাই অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত আমাদের তথ্যের প্রধান উৎস। প্রতি বছর খলিফার কাছে একটি প্রতিবেদন পাঠাতেন গভর্নর। ৯৪৭ সালের এক ঘটনায় বাগদাদের কর্মকর্তারা সত্যিই এই অনুষ্ঠান বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তারা প্যাট্রিয়ার্ককে 'জাদুর তন্ত্রমন্ত্রের' জন্য প্যাট্রিয়ার্ককে তিরষ্কার করেন। তারা দাবি করেন 'আপনি পুরো সিরিয়া আপনার খ্রিস্টান ধর্ম দিয়ে ভরে দিয়েছেন, আপনি আমাদের প্রথা ধ্বংস করেছেন।' মুসলিমেরা আপাত দৃষ্টিতে 'অলৌকিক' মনে হওয়া এ ঘটনাকে ঘৃণ্য কৌশল হিসেবে উড়িয়ে দিয়েছিল। এটি কিভাবে হতো, তা নিয়ে প্রত্যেকেরই নিজস্ব তত্ত্ব ছিল। তবে এতে কিছুই নেই বলে তারা নিজেদের পুরোপরি আশ্বস্ত করতে পারছিল না। তারা জনতার বন্ধনহীন উল্লাসে আতঙ্কিত হয়েছিল। মুজির

উদ্দিনের মতে, তাদের 'বিভীষিকা আতঙ্কে গা কাঁপা শুরু হয়ে যায়।' ইসলামের সৌম্য উপাসনাব্যবস্থায় এর সাথে তুলনীয় কিছুই ছিল না। এই কয়েক ঘণ্টার তুমুল কোলাহলপূর্ণ অনুষ্ঠান জেরুসালেমে মুসলিম উপস্থিতি ঢেকে ফেলছে বলে মনে হতো। আর এই কঠিন সময়ে মুসলিমরা তাতে উদ্বিগ্ন হতো। প্রতি বছর খ্রিস্টানেরা তাদের বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাইত, মুসলিমেরা এই প্রদর্শনী পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করতে পারত না।

আব্বাসি শক্তির পতনের অর্থ ছিল ফিলিস্তিনে শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাজ- কর্তৃপক্ষের জন্য ক্রমবর্ধমান হারে কঠিন হয়ে দাঁড়ানো। ৮৪১ সালে জেরুসালেমের সব অধিবাসী (ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমেরা) কৃষক বিদ্রোহের সময় আতঙ্কে নগর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এই বিদ্রোহের নেতা তামিম আবু হার্ব উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি করেছিলেন। তিনি ও তার অনুসারীরা নগরী লুণ্ঠন করেছিল, মসজিদ ও চার্চগুলোতে হামলা করেছিল। প্যাট্রিয়ার্ক বিপুল পরিমাণ অর্থ ঘুষ দেওয়ায় পুরোপুরি ধ্বংস হওয়া থেকে আনাস্তাসিস রক্ষা পেয়েছিল। ৮৬৮ সালে স্বস্তির সৃষ্টি হলো স্থানীয় তুর্কি কমান্ডার আহমদ ইবনে তুলুনের মিসরের ক্ষমতা দখল করে সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। মিসর তখন সিরিয়া ও ফিলিস্তিনও নিয়ন্ত্রণ করত। তিনি আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, অর্থনীতির উন্নতি ঘটে, বাণিজ্য বিকশিত হয়। ইবনে তুলুন বিশেষ করে জিম্মিদের প্রতি উদার ছিলেন। তিনি জেরুসালেমে একজন খ্রিস্টান গভর্নর নিয়োগ করেন, ক্ষতিগ্রস্ত ও ভেঙ্গে পড়া চার্চগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জেরুসালেমে ইহুদিদের একটি নতুন উপদলকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও অনুমোদন দেন।

দানিয়েল আল-কুমুসি ৮৮০ সালের দিকে ছোট একদল সহযোগী নিয়ে খোরাসান থেকে জেরুসালেমে অভিবাসন করেছিলেন। তারা ছিল কারাইতেসের গুপ্ত উপদলের সদস্য। এই ইহুদিরা তালমুদ প্রত্যাখ্যান করেছিল, পুরোপুরি বাইবেলের ওপর ভিত্তি করে তাদের জীবনযাপন করত। অবশ্য, জেরুসালেমে পৌছার পরপরই দানিয়েল একটি সম্পূর্ণ নতুন মেসাইনিক মাত্রা দেন কারাইবাদকে। ফিলিস্তিনে তিনি কামরান উপদলের হাতে থাকা নথিপত্রের সান্নিধ্যে লাভ করেন। এ উপদলটি সম্প্রতি বেদুইনদের একটি কুকুরের খুঁড়ে বের করা একটি পাণ্ডুলিপিটির মালিক ছিল। দানিয়েল নবম শতকের এসব ডেড সি স্কুল

দেখে নিশ্চিত হন যে ইহুদিদের প্রবাস জীবন অল্প সময়ের মধ্যেই অবসান ঘটবে। ইহুদিরা যদি প্রবাসে তাদের স্বস্তির ঘরবাড়ি ত্যাগ করে পর্যাপ্ত সংখ্যায় জেরুসালেমে বসতি স্থাপন করে, তবে তারা মেসাইয়ার আগমন ত্বরান্বিত করতে পারে। সারা দুনিয়া থেকে খ্রিস্টান ও মুসলিমেরা জেরুসালেমে আসতে পারলে ইহুদিরা কেন পারবে না? প্রবাসে থাকা প্রতিটি ইহুদি সম্প্রদায় যেন অন্তত পাঁচজন করে বসতি স্থাপনাকারীকে পবিত্র নগরীতে পাঠায়। দানিয়েলের শিষ্য সাহল ইবনে মাসলিয়া জেরুসালেমের একটি মর্মভেদী ছবি আঁকেন, যাতে নগরীকে এর সত্যিকারের সন্তানদের জন্য আকুলতা প্রকাশ করতে দেখা যায়। নরগীটি অবহেলা করা খোদ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করার প্রায় সমান : 'পবিত্র নগরীতে সমবেত হন, তোমার ভাইদের সাথে একত্রিত হও, তোমার উপস্থিতি একটি জাতি গড়ে ওঠবে, যা স্বর্গের পিতার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে বহাল নেই।

দানিয়েল ও সাহলের প্রপাগান্ডায় ফলে কারাইতরা জেরুসালেমে আসতে শুরু করে। ইবনে তুলুন তাদেরকে নগরীর বাইরে ওফেলের পূর্ব ঢালে আলাদা মহল্লা প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেন। কারাইতরা খাদ্য ও পবিত্রতার ব্যাপারে তালমুদের আইন পালন করত না। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদিদের মতো তারা রাব্বিদের কর্তৃত্ব গ্রহণ করত না, 'রাব্বানিয়াত' অনুসরণ করত না। তারা কৃচ্ছ্রসাধন করত, যা ইহুদি ধর্মে ছিল অস্বাভাবিক। চামড়ার তৈরি পোশাক পরত তারা, গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকত। মাউন্ট অলিভেসে তারা নিজেদের জন্য একটি পনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইহুদিরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এভের নবম দিনে বিধ্বস্ত টেম্পলের ওপর কাঁদত, তবে কারাইতরা দুঃখকে জীবনযাত্রার অংশে পরিণত করেছিল। তারা নগর ফটকগুলোতে নিয়মিত প্রার্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করত। এসময় তারা হিব্রু, পারসি ও আরবিতে 'নিঃসঙ্গতার' জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করত। তারা বিশ্বাস করত যে জায়নের বিলাপকারীরা, তারা এমনটিই বলত, মেসাইয়াকে পাঠাতে ও পুরোপুরি ইহুদি নগরী হিসেবে জেরুসালেম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ঈশ্বরকে বাধ্য করবে। রাব্বানিয়াতরা এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিকে আড়চোখে তাকাতেন। তারা সব ধরনের মেসাইনবাদ নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। কারণ মেসাইনবাদ অনেকবার ইহুদি জীবনে মর্মান্তিক ও অগ্রহণযোগ্য ক্ষতি ডেকে এনেছিল। তারা বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর তার নিজের সুসময়ে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করবেন, সেটিকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করা

ঈশ্বর অবমাননার সামিল। বস্তুত মেসাইয়াকে আনার আশায় জেরুসালেমে আলিয়া না করতে ইহুদিদের নিষেধ করেছিলেন অনেক রাব্বি।

তুলুনীয় শাসন শেষ হয় ৯০৪ সালে। এ সময় আব্বাসিরা আবার ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। তবে তারা দীর্ঘ সময় তা ধরে রাখতে পারেনি। মধ্য এশিয়ার তুর্কি মুহাম্মদ ইবনে তুঘ ৯৩৫ সালে মিসর, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাগদাদের খলিফাকে ন্যূনতম অধীনতা স্বীকার করে শাসনকাজ চালাতেন। তবে কার্যত তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। তিনি ও তার উত্তরসূরিরা এশিয়ার রাজকীয় পদবি ইখশিদ পদবি গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে আরো কিছু রাজবংশের উত্থান ঘটে। এর ফলে প্রায়ই ক্ষমতার দাবিদার প্রতিযোগী রাজবংশগুলোর বিরামহীন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় ফিলিস্তিন। পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে বায়েজান্টাইমের গ্রিক সম্রাটেরা মুসলিম সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ১০ম শতকে বায়েজান্টাইনরা সিলিসিয়া, তারসাস ও সাইপ্রাস ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করে সত্য বিশ্বাসের জন্য জেরুসালেম পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

এসব গ্রিক বিজয় অনিবার্যভাবে জেরুসালেমে মুসলিম-খ্রিস্টান সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটায়। সাধারণভাবে মুসলিমেরা আল-কুদসে খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নিতে পেরেছিল। হলি ফায়ারের মতো বিষয়াদিকে কেন্দ্র করে মাঝে মাঝেই ঝামেলা হতো, তা অস্বস্তিতে পরিণত হতো। তবে তারা নগরীতে খ্রিস্টানদের দাবি স্বীকার করত, ধরে নিত যে আল-কুদসে খ্রিস্টান উপস্থিতি সবসময়ই থাকবে। বায়েজান্টিয়ামের সাথে তার যুদ্ধের সর্বোচ্চ সময়ে ইখশিদ খ্রিস্টান সম্রাটকে স্মরণ করিয়ে দেন যে জেরুসালেম উভয় ধর্মের জন্যই পবিত্র। এটি

ঐশী ভূমি। এখানে আছে আল-আকসা মসজিদ ও খ্রিস্টান প্যাট্রিয়ার্ক। ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা সেখানে তীর্থ করে, এখানেই মেসাইয়া ও তার মা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই হলো সেই স্থান যেখানে দুটি সেপালচার পাওয়া গেছে।

মুসলিমেরা সেক্যুলার পন্থায় খ্রিস্টান উৎসবগুলোতে অংশ নিত। এনকাইনিয়ায় তারা আঙুর উৎসবের সূচনা উদযাপন করত। সেন্ট জর্জের উৎসব ছিল নতুন বীজ বপণের দিন। সেন্ট বারবারার উৎসব বর্ষা মওসুমের সূচনা ঘটত। মুসলিমেরা মেনে নিয়েছিল যে খ্রিস্টানেরা সেখানে থাকবে। তবে গ্রিকরা যখন পবিত্র যুদ্ধ শুরু করে, জেরুসালেমকে মুক্ত করার যুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে থাকে, তখন উত্তেজনা অসহ্যকর হয়ে পড়ে। ৯৩৮ সালে খ্রিস্টানদের পাম সানডে শোভাযাত্রার সময় তাদের ওপর আক্রমণ চালায়, মুসলিমেরা ম্যারটিরিয়ামের ফটকগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে। আনাস্তাসিস ও গলগোথা চ্যাপেল উভয়টিই ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৯৬৬ সালে আরেক দফা বায়েজান্টান বিজয়ের পর প্যাট্রিয়ার্ক চতুর্থ জন জেরুসালেম পুনঃজয়ের জন্য সাথে সাথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সম্রাটের প্রতি আহ্বান জানান। মুসলিম ও ইহুদিরা তখনই অ্যানাস্তাসিসে হামলা চালায়, ম্যারটিরিয়ামের ছাদে আগুন ধরিয়ে দেয়, হলি সায়নের ব্যাসিলিকা লুট করে। দাঙ্গার সময় তেলের পিপায় লুকিয়ে ছিলেন প্যাট্রিয়ার্ক। তাকে সেখান থেকে টেনে বের করে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

ইখশিদ এসব বৈরিতা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। সম্রাটের কাছে জন তার অবিজ্ঞচিত আবেদন জানানোর পরপরই প্যাট্রিয়ার্ককে রক্ষার জন্য কায়রোতে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন ইখশিদ। এরপর ইখশিদ চার্চের ক্ষতির জন্য সম্রাটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তিনি তার নিজের তহবিল থেকে সেগুলো পুনঃনির্মাণের প্রস্তাব দেন। সম্রাট কাঠখোট্টাভাবে প্রত্যাখ্যান করেন : তিনি নিজেই পবিত্র নগরী পুনঃনির্মাণ করবেন এবং তা করবেন তরবারি দিয়ে। এটি ছিল বিষাক্ত চক্র : গ্রিক বিজয়গুলো খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে প্রত্যাখ্যাতের সৃষ্টি হয়, এই 'নির্যাতন' কেবল বায়েজান্টাইন পবিত্র যুদ্ধ প্রয়াসের ইন্ধন দেয়।[১২] ফলে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমেরা আল-কুদসের ব্যাপারে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে চলে যায় : তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে গ্রিক বিজয়ের ক্ষেত্রে খ্রিস্টানেরা উমর যেভাবে অধিবাসীদের সাথে সহৃদতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাদের সাথে সে রকম করা হবে। প্রথমবারের মতো তারা হারামের বাইরে তাকাতে শুরু করে, আনাস্তাসিসের কাছে ওয়েস্টার্ন হিলের ওপর একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করে। এটি খলিফা উমরের প্রতি নিবেদন করা হয়। খ্রিস্টান জেরুসালেমে এটিই ছিল প্রথম মুসলিম ভবন। খ্রিস্টানদের

পবিত্রতম স্থানের কাছে উস্কানিমূলকভাবে অবস্থিত এ মসজিদটি খ্রিস্টানদের স্মরণ করিয়ে দেয় কারা জেরুসালেমের প্রকৃত শাসক এবং, সম্ভবত, মুসলিমদেরও আনাস্তাসিসের প্রতি উমরের উদার আচরণ (যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা বিন্দুমাত্র দেখা যাচ্ছিল না) করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

ইখশিদদের ফিলিস্তিন থেকে বের করে দেয়, প্রথমে কারমাতি নামের শিয়া গ্রুপ, এবং তারপর তিউনিশিয়ার শিয়া ফাতেমিরা। তারা ৯৭০ সালের মে মাসে রামলে জয় করেছিল। পরের ১৩ বছর ফিলিস্তিনের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত হয় ফাতেমি, কারমাতি, বেদুইন ও আরব সৈন্যরা অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযান চালাতে থাকলে। শেষ পর্যন্ত ফাতিমিরা ৯৮৩ সালে তাদের নিজস্ব প্রতিদ্বন্দ্বী শিয়া খিলাফতকে প্রতিষ্ঠা করে তাদের রাজধানী কাইরোয়ান থেকে কায়রোতে সরিয়ে আনে। দেশে অস্বস্তিকর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আরব গোত্রগুলো প্রায়ই বিদ্রোহ করত, তবে ইহুদিরা ফাতেমিদের আকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিল। বায়েজান্টিয়ামের সাথে খলিফা সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি সই করেন, আনাস্তাসিস ও ম্যারটিরিয়াম পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। ম্যারটিরিয়াম ৯৬৬ সাল থেকে ছাদহীন ছিল। এই চুক্তি খ্রিস্টানদের আরো শক্তিশালী মর্যাদা এনে দেয়, নগরীর উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

অবশ্য তলে তলে অস্বস্তি থেকেই যায়। স্থানীয় ভূগোলবিদ মুকাদ্দাসি ৯৮৫ সালে জেরুসালেমের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি জেরুসালেমকে জিম্মিদের নগরী হিসেবে অভিহিত করেন : সব জায়গায় ইহুদি আর খ্রিস্টানেরা রয়েছে উচ্চতর স্থানে।১৩ জেরুসালেমে খ্রিস্টানেরা ছিল সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী : তারা ইহুদিদের চেয়ে অনেক বেশি ধনী ছিল, মুসরিমদের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত ছিল। মুকাদ্দাসি তার নগরী নিয়ে গর্বিত ছিলেন। মুসলিম বিশ্বের কোথাও ডোম অব দি রকের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো ভবন ছিল না; জলবায়ু ছিল নিখুঁত, বাজারগুলো পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরভাবে গোছানো, আঙুর প্রচুর, অধিবাসীরা গুণে অনন্য। জেরুসালেমে একটিও বেশ্যালয় পাওয়া যাবে না, কোনো অন্ধকারাচ্ছন্নতা নেই। তবে মুকাদ্দাসি পুরোপুরি উজ্জ্বল ছবি আঁকতে পারেননি। হাম্মামখানাগুলা ছিল নোংরা, খাদ্য ছিল ব্যয়বহুল, কর ছিল বেশি, খ্রিস্টানেরা ছিল রূঢ়।

তিনি বিশেষভাবে জেরুসালেমের বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপনার পতনে উদ্বিগ্ন হয়েছেন। এই পর্যায় পর্যন্ত ইসলামি আইনশাস্ত্রের অন্যতম মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা আস-শাফির মতো মহান মুসলিম বিদ্বজ্জনেরা নগরীর পবিত্রতায় আকৃষ্ট হয়ে জেরুসালেম সফরে আসতেন। এখন শিয়া ফাতেমিরা ক্ষমতায় ছিল। ফলে সুন্নি বিশ্ব থেকে সফরকারীদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ বোধগম্য। ফাতেমিরা শিয়া আদর্শ প্রচার করার জন্য একটি স্টাডি সেন্টার (দার আলিম) প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারা পুরো ইসলামি বিশ্ব জয় করার স্বপ্ন দেখছিল, সম্ভবত সুন্নাহর গণশিক্ষা হ্রাস করতে চেয়েছিল। মুকাদ্দাসি ফাতিমি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। প্রতিটি ফটকে পাহারা ছিল, বাণিজ্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। সর্বোপরি বিদ্বজ্জনিত বিতর্কের অভাব ছিল। নগরীতে খুব কম খ্যাতিমান আলেম ছিলেন : 'ফকিহদের কাছে কেউ যায় না, পণ্ডিত ব্যক্তিরা আর খ্যাতিমান নন; ক্লাস হয় না বলে স্কুলগুলো ফাঁকা থাকে।' কথা সত্য, তবে জ্ঞান চর্চা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি : কোরআন পাঠকদের নগরীতে পাঠচক্র ছিল, আল আকসা মসজিদে হানাফি মাজহাবের স্টাডি গ্রুপ ছিল, সুফিরা তাদের খানকাহগুলোতে মিলিত হতেন। তবে পবিত্র কোরআনকে সবচেয়ে আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করার রক্ষণশীল ও রক্ষণাত্মক এই প্রবণতা সম্ভবত ছিল মুকাদ্দাসি যেটিকে শিয়াদের বিশেষ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া।' মুকাদ্দাসি অনেক সফর করেছেন, ইসলামি বিশ্বের অন্যান্য অংশে প্রচলিত থাকলে সহজে দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময়ে প্রথাটি তিনি তার নিজ শহরে দেখেননি।

ফাতেমি খলিফা আল-আজিজ ৯৯৬ সালের অক্টোবরে কায়রোতে ইন্তিকাল করেন। তার উত্তরসূরী হন তার ছেলে আল-হাকিম। তিনি ছিলেন ধার্মিক, কঠোর নীতিপরায়ণ। তিনি সামাজিক ন্যায়বিচারের শিয়া আদর্শের প্রতি আবেগপূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। অবশ্য তিনি ছিলেন বদরাগী। প্রচণ্ড ক্রোধে ও নির্দয়তায় ফেটে পড়তেন। তার মা ছিলেন খ্রিস্টান। সম্ভবত সাংঘর্ষিক পরিচিতি থেকে খলিফার অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমে খ্রিস্টানদের প্রতি খলিফার স্পষ্ট সহানুভূতি জেরুসালেমের খ্রিস্টানদের জন্য শুভসঙ্কেত বিবেচিত হলো। আল- হাকিম তার মামা ওরেসটেসকে প্যাট্রিয়ার্ক নিয়োগ করেন। মনে হচ্ছিল, তিনি সেখানে ওই সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চান। ১০০১ সালে তিনি বায়েজান্টিয়ামের সম্রাট দ্বিতীয় বার্সিলের সাথে আরেকটি

যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেন। এটি তার সমসাময়িকদের বেশ মুগ্ধ করেছিল। এতে মনে হচ্ছিল, ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্ম বন্ধুত্ব ও শান্তির নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে।

তারপর ১০০৩ সালে অপ্রত্যাশিতভাবে ফুসতাতে অবস্থিত সেন্ট মার্কের চার্চটি ধ্বংস করার নির্দেশ দেন খলিফা। তার দাবি মতে, এটি অনুমোদনহীনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, এবং নিশ্চিতভাবেই ইসলামি বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ওই স্থানে আল- হাকিম আল-রাশিদা মসজিদ নির্মাণ করেন। আর নির্মাণের সময় তা এত সম্প্রসারণ করেন যে তা কাছাকাছি থাকা ইহুদি ও খ্রিস্টান কবরস্থানও ঢাকা পড়ে যায়। এর পর তিনি ফরমান জারি করে মিসরে খ্রিস্টানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন, ক্রুশ জ্বালিয়ে দেন, চার্চগুলোর ছাদে ছোট ছোট মসজিদ নির্মাণ করেন। ফিলিস্তিনে গোলযোগের গুজবেও খলিফা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বলা হয়ে থাকে যে সেখানে সাম্প্রতিক বেদুইন হামলার পেছনে খ্রিস্টান ও বায়েজান্টাইনরা ছিল। এটি পূর্ণ মাত্রায় বিপ্লব সৃষ্টির হুমকি ত্বরান্বিত করেছিল। এক ইস্টারে সবকিছু চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাল। এ সময় খলিফা লক্ষ্য করলেন যে কপ্টিক খ্রিস্টানদের একটি বিরাট গ্রুপ 'বিপুল ও আক্রমণাত্মক প্রদর্শনী' সহযোগে জেরুসালেম রওনা হয়েছে। তাদেরকে মক্কাগামী হাজিদের মতো দেখাচ্ছে। কী ঘটছে এবং অ্যানাস্তাসিস চার্চের অপরিমেয় সম্পদ সম্পর্কে যা শুনেছেন সে সম্পর্কে তিনি শিয়া প্রপাগান্ডাবাদী কুতেকিন আল- আদুদির কাছে জানতে চান। ইস্টারে সর্বোচ্চ মর্যাদার খ্রিস্টানরা প্রার্থনা করার জন্য সেখানে যেতেন। এমনকি বায়েজান্টাইন সম্রাটেরাও ছদ্মবেশে জেরুসালেম সফর করেন বলে জনশ্রুতি ছিল। 'তারা বিপুল পরিমাণে রৌপ্য, আনুষ্ঠানিক পরিচ্ছেদ, রঙিন কাপড় ও নক্সা করা পোশাক বহন করেন... এবং দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণে সামগ্রী জড়ো হয়েছে।১৬ খ্রিস্টানদের সম্পর্কে সব গোপন ঈর্ষা, বিদেশে তাদের শক্তিশালী যোগাযোগের শঙ্কা এবং মুসলিম বিশ্বাসের প্রতি খ্রিস্টান চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে উদ্বেগ এখন প্রকট আকার ধারণ করেছিল। সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো, খলিফাকে আল-আদুদি বলেছিলেন যে হলি ফায়ার অনুষ্ঠানটি [মুসলিমদের] অভিভূত করার, তাদের হৃদয়-মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির' একটি কৌশল।১৭

আল-হাকিমের বিভ্রান্ত হৃদয়ে এই ভাষ্য নিশ্চিতভাবেই আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। ১০০৯ সালে খলিফা কনস্টানটাইনের অ্যানাস্তাসিস ও ম্যারটিরিয়াম উভয়টি মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এমনকি চার্চ ও চ্যাপেলগুলোর ভিত্তি পর্যন্ত উপড়ে ফেলার হুকুম জারি করেন। রামলের ফাতেমি গভর্নর তীব্র বেগে এই কাজে নামেন। গলগোথার সব ভবন গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। রক্ষা পায় কেবল রোতানদার কিছু অংশ। এ ব্যাপারে খ্রিস্টান ইতিহাসবিদ ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ বলেন, কারণ হলো 'গুঁড়িয়ে দেওয়া খুবই কঠিন প্রমাণিত হয়েছিল। এসব ভগ্নাংশ টিকে ছিল এবং বর্তমান ভবনে তা একীভূত করা হয়েছিল। কবরটি, এর উপাসনালয়টি এবং গলগোথার পাথরটি হাতকুঠার ও হাতুরি দিয়ে টুকরা টুকরা করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য ইয়াহিয়া ইঙ্গিত দিয়েছেন, কবরের ছোট একটি টুকরা পেছনে রয়ে গিয়েছিল। পাথরটির বাকি সব অংশ নগরীর বাইরে ফেলা হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে অন্য কোনো মুসলিম শাসকই এ ধরনের কাজ কখনো করেননি। এমনকি খলিফার মুসলিম প্রজারা পর্যন্ত এতে অস্বস্তিতে ভুগেছে। পরবর্তী নতুন বিধানে জিম্মিদেরকে উম্মাহ থেকে আলাদা করার ব্যবস্থা প্রবর্তন ও তাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা বাধ্যতামূলক করা হয়। খ্রিস্টানদেরকে তাদের গলায় ভারী ক্রুশ ও ইহুদিদেরকে কাঠের বড় ব্লক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়। ১০১১ সালে একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের সময় ইহুদিদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা হয়। জেরুসালেমের সিনাগগটি অপবিত্র করা হয়, এর অলগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। অনেক জিম্মিকে ইসলাম গ্রহণ করতে সন্ত্রস্ত্র করা হয়, অন্যরা অটল থাকে। অবশ্য অনেক খ্রিস্টান বায়েজান্টিয়াম সীমান্তে পালিয়ে যাওয়ার বিকল্প গ্রহণ করেছিল।

খলিফার মানসিক বৈকল্য থেকে এরপর যারা দুর্ভোগে পড়েছিল তারা হলো মুসলিমেরা। ১০১৬ সালে আল-হাকিম ঘোষণা করেন যে তিনি ঐশী সত্তার অবতার, মানব জাতির কাছে নতুন ওহি নাজিল করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। এটি ইসলামি বিশ্বজুড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কায়রোতে দাঙ্গা দেখা দেয়। খ্রিস্টানদের চেয়ে মুসলিমেরা অনিবার্যভাবেই এই ঈশ্বর অবমাননায় অনেক বেশি ক্রুদ্ধ হয়েছিল। ফলে তাদের ওপর নেমে আসে আল-হাকিমের ক্রোধ। ১০১৭ সালে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে ফরমান বাতিল করা হয়, তাদের সম্পত্তি ফেরত দেওয়া হয়। অন্য দিকে রমজান মাসে রোজা রাখা কিংবা হজ করা

মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। এই নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতন করা হয়। খলিফা সম্ভবত তার নিজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে এসব সহিংসতা ঘটনার মধ্য দিয়ে এগুতে থাকেন : দাঙ্গার সময় বেখেয়ালে কায়রোর রাজপথ দিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকলে ক্রুদ্ধ দাঙ্গাবাজদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। ২০১২ সালে এক রাতে একাকী ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমিতে চলে যান, আর কখনো তাকে দেখা যায়নি।

উন্মাদ খলিফা খ্রিস্টান জেরুসালেমকে ধ্বংস করে গিয়েছিলেন : কবর ও গলগোথা টিলায় রয়ে যাওয়া অংশের ওপর কোনোভাবে একটি নতুন উপাসনালয় নির্মাণ করা হয়। ১০২৩ সালে আল-হাকিমের বোন সিত্ত আল-মুলক জেরুসালেমের অবস্থা অবহিত করার জন্য প্যাট্রিয়ার্ক নাইসফোরাসকে কনস্টানটিনোপলে পাঠান। কিন্তু পরের বছর বেদুইনদের জারাহ গোত্র আবারো ফাতেমিদের ওপর চড়াও হয়। তারা ফিলিস্তিনের রাস্তাগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, পরিকল্পিতভাবে গ্রাম এলাকা লুণ্ঠন করতে থাকে। জেরুসালেমের অবস্থা এত খারাপ ছিল যে নির্মাণের কোনো চিন্তাই করা যেত না। ইহুদিদের অবস্থা ছিল বিশেষভাবে গুরুতর। ১০ম শতক নাগাদ জেরুসালেমের ইহুদি সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা কিছুটা বাড়ে। এর কারণ ছিল ৯৪০-এর দশকে বাগদাদ ও উত্তর আফ্রিকায় সৃষ্ট গোলযোগ থেকে রক্ষা পেতে ইহুদি উদ্বাস্তুরা ফিলিস্তিনে আশ্রয় নিয়েছিল। অবশ্য বেশির ভাগ নতুন অভিবাসী রামলে বা তাইবেরিয়াসে বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাদের একজন লিখেছিলেন যে জেরুসালেম শহর হলো ‘অভিশপ্ত... এখানে খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান হয় অনেক দূর থেকে, জীবিকার উপায় সীমিত। এখানে অনেকে ধনী এসে দারিদ্র-পীড়িত ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৯ খ্রিস্টানেরা ছিল সবচেয়ে বিত্তবান ও মর্যাদাবান অবস্থানে : ইহুদিরা ব্যাংকার, রংরেজ ও চামড়া প্রক্রিয়ার কাজ করত, যদিও কাজ করার সুযোগ ছিল কম। এতসব সমস্যা সত্ত্বেও ১০ম শতকে তাইবেরিয়াস থেকে ইহুদিরা জেরুসালেমে একটি পরিচালনা সংস্থা চালাত। ফলে জেরুসালেম আবারো ফিলিস্তিনি ইহুদিদের প্রশাসনিক রাজধানীতে পরিণত হয়। আল-হাকিমের অধীনে তারা দুর্ভোগে থাকলেও ইহুদিরা ফাতেমি সরকারের প্রতি কঠোর সমর্থক রয়ে যায়। ১০২৪ সালে বেদুইন বিদ্রোহের সময় তাদের আনুগত্যের জন্য তাদের ওপর নির্দয় করারোপ করা হয়। ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় অনেক ইহুদিকে কারাবরণ করতে হয়। বুভুক্ষা ও চরম

দারিদ্রতা ছিল। অনেক ইহুদি মারা যায়। বাকিরা ‘কপর্দহীন, নগ্ন, বিমর্ষ ও গরিব’ হয়ে পড়েছিল বলে লিখেছেন পরিচালনা পরিষদের প্রধান বা গোয়ান সলোমন হা-কন। তিনি লিখেছেন, ‘এক লোকের বাড়িতেই কিছু ছিল না, এমনকি তার নিজের পোশাক বা গৃহস্থালি সামগ্রীও নয়। ‘২১ দুর্ভোগ অব্যাহত থাকে। ফিলিস্তিনে আরেকটি বেদুইন হামলা হয় উত্তর দিক থেকে। ফাতেমি খলিফা আল-জাহির ১০২৯ সালের আগে দেশটির নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারেননি। নিজের অবস্থান জোরদার করার জন্য তিনি বায়জান্টিয়ামের সাথে নতুন চুক্তি করেন, অ্যানাস্তাসিস পুনঃনির্মাণ অনুমোদন করার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রায় ১০০ বছরের মধ্যে ১০৩০ সালটি ছিল প্রথম শান্তিপূর্ণ বছর। তুর্কি গভর্নর আল-দিজবিরি সাথে সাথে বিধ্বস্ত দেশটিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে দেন।

মুসলিমেরাও জেরুসালেমে তাদের নিজস্ব পুনঃগঠনের কাজ করেছিল। ১০১৭ সালে ডোম অব দি রক ধসে পড়ে। সম্ভবত তহবিল সংগ্রহ অভিযানের অংশ হিসেবে খ্যাতিমান মুসলিম পণ্ডিত আল-ওয়াসিতি জেরুসালেমের প্রশংসাসূচক ঐতিহ্যবাহী রচনা সঙ্কলন ফাজায়েল আল-কুদস প্রথম প্রকাশ করেন। ফলে উমাইয়া আমল থেকে ইসলামি বিশ্বে প্রচারিত হতে থাকা জেরুসালেমের প্রশংসাসূচক নবী, খলিফা ও দরবেশ-আউলিয়াদের বাণী এক খণ্ডে পড়ার সুযোগ হলো। পবিত্র নগরীতে ব্যাপক উত্তেজনা ছিল, অতি সম্প্রতি আল-হাকিমের নির্যাতন বিপর্যয়ের ফলে তিনটি ধর্মের সবাইকে রক্ষণাত্মক করে ফেলেছিল। তবে আল-ওয়াসিতির সঙ্কলনটি ছিল একীভূত করার পুরনো মুসলিম আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত। ইসরাইলিয়াত ও অন্যান্য স্থান থেকে উদ্ধৃত করা অনেক বাণী জেরুসালেমে ঈশা নবীর উপস্থিতির কথা স্মরণ করা হয়। আল-কুদস তখনো ইব্রাহিমের সব সন্তানের জন্য পবিত্র বলে স্বীকৃত ছিল। কিভাবে মক্কা ও মদিনার সাথে সৃষ্টিশীলভাবে জেরুসালেম অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গেছে, তাও এতে দেখা গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আল-ওয়াসিতি নবীর নিচের হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন:

দুনিয়ায় কোনো কিছু সৃষ্টির এক হাজার বছর আগে আল্লাহ মক্কা নগরীকে মর্যাদাসম্পন্ন করেছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন ও ফেরেশতাদের দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। তারপর তিনি

একে মদিনার সাথে এবং মদিনাকে জেরুসালেমের সাথে সংযুক্ত করেছিলেন। এবং এরও এক হাজার বছর পর তিনি একটি একক প্রয়াসে [বাকি দুনিয়া] সৃষ্টি করেছিলেন।২২

শেষ দিনে বেহেশত নববধূর মতো জেরুসালেমে প্রতিষ্ঠিত হবে, কাবা ও কৃষ্ণ পাথর মক্কা থেকে আল-কুদসে আসবে, যা হবে সমগ্র মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত গন্তব্য। ২৩ বস্তুত, স্থানীয় লোকগাঁথায় দুই নগরী মক্কা ও জেরুসালেম আগেই বাস্তবভাবে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। মক্কায় হজের মাসে হাজিরা যখন আরাফাতের ময়দানে দাঁড়াতেন, তখন বলা হয়ে থাকে যে কাবার কাছে অবস্থিত পবিত্র জমজম কূপের পানি আসত মাটির নিচ দিয়ে সিলোয়াম সরোবর থেকে থেকে। ওই রাতে জেরুসালেমের মুসলিমেরা সেখানে বিশেষ উৎসবের আয়োজন করত। জেরুসালেমের পবিত্রতা এসেছে মক্কার আদি পবিত্রতা থেকে-এই বিশ্বাস প্রচারের জন্য মনোমুগ্ধকর কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল। দুইয়ের মিলনের এ প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করবে কিয়ামতের দিনে। ওই সময় সব শ্বাশতার জন্য মক্কার পবিত্রতা হস্তান্তরিত হবে আল-কুদসে। চূড়ান্ত একীকরণ হওয়ার পর দুনিয়ায় হয়ে যাবে বেহেশত।

স্থানীয় লোকজনের স্থির বিশ্বাস ছিল যে মক্কা ও জেরুসালেম একই পবিত্রতা ধারণ করে। সম্ভবত একাদশ শতকের প্রথম দিকে মক্কায় গিয়ে হজ করতে না-পারা মুসলিমেরা হজের দিনগুলোতে জেরুসালেমে সমবেত হতো। যে রাতে হাজিরা মক্কার ঠিক বাইরে আরাফাতের ময়দানে রাত্রি জাগরণ করত, তখন এলাকাবাসী ও জেরুসালেমবাসী লোকজন হারামের প্লাটফর্ম ও মক্কার দিকে মুখ করা আল-আকসা মসজিদে সমবেত হতো। তারা সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকত, আরাফাতের ময়দানের মতো করেই উচ্চ কণ্ঠে ইবাদত-বন্দেগি করত। হজের শেষ দিন ঈদ-উল-আজহার সময় তারা হারামে প্রথাগত কোরবানি করত, এই কাজও তারা করত মক্কায় উপস্থিত থাকার মতো করে। অনেক হাজি তাদের হজযাত্রায় জেরুসালেম জিয়ারতও রাখতেন। হজের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য যে ধরনের পোশাক পরা হতো, জেরুসালেম জেয়ারতের সময়ও তা করত তারা। তবে অনেক মুসলিম একে বিদআত মনে করে আপত্তি করত। এমন হাদিসও প্রচলিত ছিল যেখানে নবী আসলে জেরুসালেম না যাওয়ার জন্য তার অনুসারীদের

বলেছেন। তবে আল- কুদসের প্রতি উচ্ছ্বসিত ভক্তি প্রদর্শন নিয়ে কোনো কোনো মহল ভুরু কুঁচকালেও সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বিশ্বাস ছিল যে এটি হলো ইসলামের তিন পবিত্র নগরীর একটি। মুহাম্মদ (সা.) এই বিখ্যাত হাদিসে বলেছেন : ‘তুমি কেবল তিনটি মসজিদে সফর করতে পারো। একটি হলো হারাম মসজিদ [মক্কায়], আমার মসজিদ [মদিনায়] ও আকসা মসজিদ।’

এখন প্রতি শুক্রবার বিকেলে হারামে বিপুলসংখ্যক মুসলিম সমবেত হয়। তবে কেবল হজের মাসে নয়, জামায়াতে নামাজের জন্য।

খলিফা আল-জহিরের তাগাদায় গভর্নর আল-দিজবিরি দ্রুততার সাথে ডোম অব দি রক পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছিলেন। হারামের প্রতি খলিফার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ওই সময় ডোমের ভার বহনের জন্য যে কাঠের বিমগুলো লাগানো হয়েছিল, তা বর্তমান সময়েও আছে। অবশ্য এর পর আবারো বিপর্যয় আঘাত হানে। ১০৩৩ সালের ৫ ডিসেম্বর আরেকটি ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে ফিলিস্তিনে। সৌভাগ্যবশত এটি হয় সূর্য ডোবার আগে। ফলে বেশি লোক তাদের ঘরের ভেতরে ছিল না। ওই দিনগুলোতে কোনো লোক ঘরের ভেতর যেতে সাহস পেত না, লোকজন নগরীর আশপাশের পাহাড়ি এলাকায় তাঁবু খাঁটিয়ে রাত্রিযাপন করত। একটি সামগ্রিক নতুন ভবন পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল। হারামের সহায়ক প্রাচীরগুলো মেরামতের প্রয়োজন পড়ে, আল-জহির নতুন নগর-প্রাচীর নির্মাণ শুরু করার নির্দেশ দেন। এ প্রকল্পটি শেষ হতে এক প্রজন্মের বেশি সময় লাগে। এই ভূমিকম্পে আল আকসা মসজিদ ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। গম্বুজের উত্তরে চলাচলের ১৫টি পথের সবই ধসে পড়েছিল। নির্মাণকাজ সাথে সাথে শুরু হয়, ১০৪৭ সালে পারসিক পর্যটক নাসির-ই-খসরু জেরুসালেম সফরের সময় নতুন মসজিদের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। মসজিদটি এখন অনেক সংকীর্ণ হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পথগুলোর স্থানে সাতটি খিলান দিয়ে একটি চক্রকার অংশ নির্মাণ করা হয়। নাসির সুন্দর সুন্দর কার্পেট, মার্বেলের পতাকা, ২৮০টি মার্বেলের স্তম্ভ ও ডোমের ওপর বর্ণাঢ্য এনামেল কারুকাজের প্রশংসা করেছেন।

একাদশ শতকের মধ্যভাগে জেরুসালেম দৃঢ় পুনরুদ্ধার করে ফেলেছিল বলে মনে হয়। নাসির বলেছেন, নগরীতে প্রায় ২০ হাজার পরিবার বাস করে। এতে ধারণা করা হয়, নগরীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় এক লাখ। তিনি নগরীর চমৎকার বাজার ও উঁচু ভবনরাজিতে অভিভূত হয়েছেন। প্রতিটি শিল্পের নিজস্ব সুক (বাজার) ছিল, শহরে ছিল অনেক কুশলী কারিগর। দ্রব্যসামগ্রী ছিল প্রাচুর্যপূর্ণ ও সস্তা। নাসির একটি বিশাল হাসপাতাল, বিশাল মাদরাসার কথা বলেছেন। এখানে চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখানো হতো। এছাড়া মসজিদের পাশে সুফিদের দুটি খানকাহ ছিল। এখানে তারা বাস করতেন ইবাদত করতেন। সুফিদের একটি জামাত হারামের উত্তর দেয়ালের পাশে ফাঁকা স্থানে উপাসনালয় বানিয়ে নিয়েছিল। নাসির হারাম প্লাটফর্মে থাকা উপাসনালয় ও ছোট উপাসনা-কুঠুরীগুলোতে ধ্যানমগ্নভাবে আসা-যাওয়া করতেন, এক 'মঞ্জিল' থেকে আরেকটিতে যেতেন, দোয়া-দরুদ পাঠ করতেন, নবীদের মহান সংগ্রামের কথা ভাবতেন। তিনি কল্পনার চোখে দেখেছেন, নবী মুহাম্মদ (সা.) তার মিরাজের আগে রকের পাশে প্রার্থনা করেছেন, এর ওপর হাত রেখেছেন যাতে রকটি জেগে ওঠে তার সাথে সাক্ষাত করতে পারে। এতে করেই নিচের গুহাটি সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অন্য নবীদের সাথে একত্রিত হয়েছেন, গেট অব রিপেনট্যান্সে বিশেষ করে রাজা দাউদের কথা ভেবেছেন, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। যিশুর দোলনায় (ক্রেডল অব জেসাস) তিনি সিজদায় অবনত হয়েছেন। খ্রিস্টান পবিত্র স্থানগুলোর মতো নবীরা প্রত্যক্ষ ছাপ রেখে গেছেন। নাসির নিবিষ্ট মনে সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় মার্বেল স্তম্ভগুলোর আঁকড়ে ধরার সময় (যেভাবেই হোক সতর্কভাবে) মরিয়মের রেখে যাওয়া চিহ্নের কথা ভেবেছেন। বলা হয়ে থাকে, ইব্রাহিম ও ইসহাকের পায়ের ছাপ রকে দেখা যেতে পারে।

নাসির নতুন অ্যানাস্তাসিস চার্চও পরিদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্রাট ৯ম মনোমারচাসের তহবিলে ১০৪৮ সালে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। নাসির এটিকে চরম সুন্দর হিসেবে দেখেছিলেন, যিশু, অন্যান্য নবী, হাশরের ময়দানকে নিবেদন করে এর পেইন্টিং ও মোজাইকে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কারণ উপাসনালয়ে চিত্রকলার সাথে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। নতুন চার্চটি ছিল কনস্টানিয়ানের ভবন থেকে খুবই ভিন্ন। ম্যারটিরিয়াম আবার বানানোর কোনো চেষ্টাই হয়নি। স্থানটি এখন পাথর, ভাঙ্গা স্তম্ভে বোঝাই,

ব্যাসিলিকাটি যেখানে ছিল, তা এখন ইট-সুড়কিতে পূর্ণ। কবরটির পাশে নতুন চার্চটি নির্মিত হয়েছিল আল-হাকিমের ধ্বংসকারী দলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া রোতানদার অবশিষ্ট অংশের ওপর। মোনোমারচাসের নতুন ভবনটি সাবেক রোমান স্মৃতিসৌধকে বদলে দিয়েছিল। নির্মাতারা একটি উপরের তলা ও একটি অর্ধবৃত্তকার গৃহকোণ নির্মাণ করে একটি বড় খিলানের সাথে যোগ করেন। (ডায়াগ্রাম দেখুন।) অ্যানাস্তাসিসের সামনে সবসময়ই একটি আঙিনা ছিল। এখন এটি সম্প্রসারিত করে উত্তর-পূর্ব কোণায় গলগোথার বাকি অংশকে এবং পেছনে আদমের চ্যাপেলকে অন্তর্ভুক্ত করে। নতুন চ্যাপেলগুলো সেন্ট জন, ট্রিনিটিকে নিবেদন করা হয় এবং সেন্ট জেমসকে ব্যাপ্তাইজকরণ অংশের সাথে যুক্ত করা হয়। আর আঙিনার গলগোথার অংশকে প্যাসেনের বিভিন্ন ঘটনার সাথে যুক্ত করা হয়।

নতুন চার্চ সফরের সময় কোনো উত্তেজনা অনুভব করেননি নাসির। তিনি বাধাহীনভাবে হাঁটতে পেরেছিলেন এবং নিশ্চিতভাবেই ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ঈশার মতো পরিচিত নবীদের ছবি দেখে নিজস্ব পরিবেশে অবস্থান করছেন বলে অনুভব করেছেন। তবে গত শতকে খ্রিস্টানেরা যে যন্ত্রণা ও ধ্বংসের মুখে পড়েছিল, তা তারা ভুলতে পারেনি, তারা তখনো অরক্ষিত থাকার অনুভূতিতে ভুগছিল। ১০৫৫ সালে নগর প্রাচীর নির্মাণের সময় গভর্নর খ্রিস্টানদের বলেন যে নগরীতে তাদের নিজস্ব অংশের প্রাচীরের ব্যয়ভার তাদেরকেই বহন করতে হবে। তাদের কাছে আর কোনো উপায় না থাকায় তারা ৯ম কনস্টানটাইনের শরণাপন্ন হয়। তিনি পবিত্র নগরীর জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করার এ সুযোগটি আগ্রহ নিয়ে লুফে নেন। খলিফার সাথে আলোচনার পর সমঝোতা হলো যে কনস্টানটাইন নগরীর যে অংশের প্রাচীর নির্মাণ করার ব্যয়ভার বহন করবেন, সেখানে কেবল খ্রিস্টানেরা বাস করবে। ফলে ১০৬৩ সাল নাগাদ জেরুসালেমের খ্রিস্টানরা নিজস্ব বিশেষ মহল্লা পেল। এই প্রাচীর উত্তর দ্বার থেকে নগরীর পশ্চিম দ্বার পর্যন্ত নগরদুর্গ থেকে বাইরের দিকে ছিল। অভ্যন্তরীণভাবে সীমানা প্রাচীরটি নগরদুর্গের পেছনের মোড় পর্যন্ত পুরনো কার্ডো ম্যাক্সিমাসজুড়ে বিস্তৃত ছিল। ৯ম কনস্টানটাইনের কল্যাণে তাদের এখন 'প্যাট্রিয়ার্ক ছাড়া অন্য কোনো প্রভুর বিচারের মুখে পড়তে হতো না।'২৪ বায়েজান্টাইনরা এক ধরনের সুরক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ খ্রিস্টান ছিটমহলটি

মুসলিম নগরী থেকে আলাদা হয়ে এক বিদেশী শক্তির সমর্থনপুষ্ট ছিল। বর্তমানে ‘প্যাট্রিয়ার্কস কোয়ার্টার’ নামে পরিচিত ভবনটি ছিল সেন্ট জন দি আলমনারের হসপিটাল। এটি ইতালির আমালফির লোকজনের মাধ্যমে শার্লেমেনের পুরনো সরাইখানাটি নির্মাণের সময় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের লোকজন ‘অন্ধকার যুগের’ বিশৃঙ্খলা থেকে উদ্ধার পাওয়ার আরেকটি চেষ্টা করেছিল। ইতালির নগরগুলোর বণিকেরা প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য শুরু করেছিল। আর আমালফিতানরা ফাতেমিদের বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ফলে তারা ইতালির বেনেডিকটিন সন্ন্যাসীদের জন্য একটি মঠ নির্মাণের জন্য সহজেই খলিফার কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে যায়। এখানে তাদের নগরী থেকে আসা তীর্থযাত্রীদের বাস করার ব্যবস্থা করা হলো।

জেরুসালেমের অন্য নবাগতরা ছিল আর্মেনিয়ানরা। ইউরোপিয়ানদের মতো তারাও চতুর্থ শতক থেকে পবিত্র নগরী সফর করতে আসছিল। তাদের অনেকে সন্ন্যাসী ও সাধু পুরুষ হিসেবে অবস্থান করছিল। এখন তারা মাউন্ট সায়নে নতুন চার্চ কিনে নিলো। এটি ১০৩০-এর দশকে জর্জিয়ান সন্ন্যাসী প্রোচোর নির্মাণ শুরু করেছিলেন। একইসময় নগর প্রাচীরের বাইরে ক্রুশ মনাস্টেরিও নির্মাণ করছিলেন তিনি। আর্মেনিয়ানরা প্রায় ৪০ বছর পর জর্জিয়ানদের কাছ থেকে সায়ন চার্চটি সংগ্রহ করেছিল। তারা এটিকে ক্যাথেড্রালে পরিণত করেছিল। এটি সেন্ট জেমসের (বা ‘সার্প হ্যাগপ’, তিনি আর্মেনিয়ান ভাষায় এই নামেই ডাকতেন) প্রতি নিবেদন করেছিলেন। এর প্রধান উপাসনালয়, কিলকাতির, ছিল হেড জেমস দি ‘পিলার’ তথা যিশুর শিষ্যের মাথা। ৪২ সালে জেরুসালেমে তার শিরোশ্ছেদ করা হয়েছিল। উঁচু বেদির নিচে ছিল জেমস দি জাদিকের কবর। তিনি ছিলেন জেরুসালেমের প্রথম ‘বিশপ’। মাউন্ট সায়নে অনেক দিন খ্রিস্টানেরা তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত। নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার পর আর্মেনিয়ানরা ধীরে ধীরে তাদের প্যাট্রিয়ার্কের জন্য একটি কনভেন্ট এবং পাদ্রি, বিশপ ও গির্জার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত সেন্ট জেমস ব্রাদারহুডের নির্মাণকাজ শুরু করেছিল। কয়েক শ’ বছরের মধ্যে আর্মেনিয়ান প্যাট্রিয়ার্করা ধৈর্য ধরে কনভেন্ট ভবনগুলোর আশপাশের জমি ও বাড়িঘর কিনে ফেলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় সব এলাকাই তাদের হয়ে যায়। আর্মেনিয়ান তীর্থযাত্রীরা জেরুসালেমে থাকার সিদ্ধান্ত নিলে তাদেরকে নির্মাণাধীন আর্মেনিয়ান মহল্লায়

কোনো বাড়িতে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হতো। তারা ব্রাদারহুডের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থায়ী সেক্যুলার সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তারা কাঘাকাতসি (জেরুসালেমের অধিবাসী) নামে পরিচিত হয়। তারা নিজেদের হিসেবে নগরীকে গ্রহণ করে। তাদের ধর্মপল্লীর চার্চের জন্য তারা তারা কনভেন্টের কেন্দ্রের কাছে হলি আর্চানজেলের চ্যাপেলকে বরাদ্দ করে। এটি আনাসের বাড়ির স্থান ছিল বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। এ লোকটি যিশুকে মৃত্যুদণ্ড দিতে সাইয়াফাসকে সহায়তা করেছিলেন। এর আঙিনায় একটি প্রাচীন জলপাই গাছ ছিল। এই গাছের সাথেই যিশুকে বাঁধা হয়েছিল বলে বলা হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে কাঘাকাতসি একটি বড় আকারের ও আলাদা সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। আর্মেনিয়ানরা মনোফাইসিত হলেও তারা গ্রিক অর্থোডক্স ও ল্যাতিন ক্যাথলিক ছিল না। তারা ধর্মান্তরিতদের গ্রহণ করত না। ফলে তারা জাতিগতভাবে স্বতন্ত্রই থেকে যায়। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে কাঘাকাতসির সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। আর্মেনিয়ান মহল্লা ছিল জেরুসালেমের পুরো নগরীর এক দশমাংশের সমান।

একাদশ শতক নাগাদ জেরুসালেমে দল বেঁধে বেশি বেশি তীর্থযাত্রী আসছিল। পশ্চিম ইউরোপ থেকে আগমনের বিষয়টি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে তীর্থযাত্রা উৎসাহিত করত বারগান্ডির অ্যাবে অব ক্লুনির সংস্কারশীল সন্ন্যাসীরা। সত্যিকারের খ্রিস্টান মূল্যবোধ সাধারণ মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে তারা এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। বারগুনডিয়ান ইতিহাসলেখক রাউল গ্লাবারের মতে, ১০০০ সহস্রাব্দে অভিজাত, ও সাধারণ মানুষের মধ্যে রাস্তায় নামার 'অপরিমেয় মাত্রায়' আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল, তারা জেরুসালেমে যেতে ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ : তারা এসেছিল ইতালি, গাউল, হাঙ্গেরি ও জার্মানি থেকে। মহাপ্রলয়ের ধারণায় তারা ব্যাপকভাবে উজ্জীবিত হয়েছিল। ২৫ লোকজন সেই রোমান আমলের শেষ দিকের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো স্মরণ করত। ওইসব ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হতো, মহাপ্রলয়ের আগে পাশ্চাত্যের এক সম্রাট জেরুসালেমে মুকুট পরবেন, সেখানে খ্রিস্টবিরোধীর সাথে লড়াই করবেন। 'দি বুক অব রেভেলেশন'-এ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে শয়তানের বিরুদ্ধে খ্রিস্টের বিজয়ের ১০০০ বছর পর এই চূড়ান্ত যুদ্ধ হবে। ২৬ ফলে ১০০০ সালে সেকেন্ড কামিং প্রত্যক্ষ করার জন্য তীর্থযাত্রীরা জেরুসালেমে ভিড় করতে লাগল। কারাইতিসদের মতো তারাও সম্ভবত বিশ্বাস করত যে পবিত্র নগরীতে তাদের

উপস্থিতি ঈশ্বরকে নিউ জেরুসালেমে নেমে এসে আরো ভালো বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করবে। তবে মহাপ্রলয় না হওয়ায় লোকজন মনে করতে শুরু করল যে সালটি হয়তো হবে আরো যৌক্তিক তারিখ ক্রুশবিদ্ধকরণের হাজারতম বার্ষিকীতে তথা ১০৩৩। ওই বছর ইউরোপে প্রবল দুর্ভিক্ষ হয়। গ্ল্যাবের আমাদের জানাচ্ছেন যে অনেক লোকের মনে ধারণার সৃষ্টি হলো যে এই বিপর্যয় শেষ দিবসের সূচনা। ওই সময়ে সমাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রেণি কৃষকেরা প্রথমে এবং সবশেষে ধনী অভিজাতেরা 'জেরুসালেমের স্যাভিয়র্স টম্বের দিকে ছুটতে শুরু করল।' গ্ল্যাবের নিশ্চিত ছিলেন যে পবিত্র নগরী এর আগে কখনো জনসাধারণের এমন চাপ অনুভব করেনি এবং তীর্থযাত্রীরা নিশ্চিত ছিলেন যে এই 'এই পূর্বাভাস হতভাগ্য খ্রিস্টবিরোধীর আগমন ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই খ্রিস্টবিরোধী নিশ্চিতভাবেই দুনিয়ার সমাপ্তি আসন্ন হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।'২৭ মুক্তির প্রতীক জেরুসালেমের প্রতি বর্বরতা ও বিশৃঙ্খলার দীর্ঘ সময় থেকে বের হয়ে লোকজন সংগ্রাম করতে থাকায় পশ্চিম ইউরোপের খ্রিস্টানদের মধ্যে মরিয়া ভাব ছিল।

একেবারেই আলাদা ছিল ১০৬৪ সালে মহান পাশ্চাত্য তীর্থযাত্রা। বামবার্গের বিশপ আর্নল্ডের নেতৃত্বে এসব তীর্থযাত্রী 'পবিত্র দারিদ্র্যে' সফর করছিলেন না। ইউরোপের জীবন উন্নত হয়েছিল। জার্মান সম্ভ্রান্ত অমাত্যরা তাদের সম্পদ ও শ্রেষ্ঠত্ব গর্ব করে প্রদর্শন করছিল, তাতে হঠকারিতাও ছিল। বেদুইন গোত্রগুলো সবসময় তীর্থযাত্রীদের দলগুলোর অপেক্ষায় থাকত। তারা জানত যে একেবারে দীনহীন ব্যক্তিও তাদের জীর্ণ জোব্বার নিচে সোনার টুকরা সেলাই করে লুকিয়ে রাখতে পারে। আর জার্মান তীর্থযাত্রীদের জাঁকজমক ছিল উন্মুক্ত প্রলোভন : গোত্রগুলো তীর্থযাত্রীদের আক্রমণ করল। তারা পবিত্র নগরী প্রায় চোখে দেখা দূরত্বে বিপুল সংখ্যায় মারা গেল। প্রায় প্রতি ৩০ বছর পরপর ইউরোপ থেকে বিশাল তীর্থযাত্রী আসত। শতাব্দী কাছাকাছি চলে আসায় এ ধরনের পাশ্চাত্য অভিযানের আরেকটি সময় চলে আসে। তবে ১০৯৯ সালে পবিত্র নগরীতে আগত তীর্থযাত্রীরা সাথে করে একটি করে তরবারিও নিয়ে এসেছিল। তারা কেবল নিজেদের রক্ষা করতে নয়, লড়াই করতে ও হত্যা করতেও প্রস্তুত ছিল।

ইহুদি তীর্থযাত্রী ও বসতি স্থাপনকারীরাও জেরুসালেমে আলিয়া করতে উদ্দীপ্ত ছিল। তারাও অনেক সময় খ্রিস্টানদের মতো দেশে দুর্যোগে তাড়িত থাকত। ১০৫০-এর দশকে যাযাবর বর্বরেরা কাইরুয়ানে হামলা করলে ইহুদি ও মুসলিম উভয়েই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে ফিলিস্তিনে অভিবাসন করে। স্পেনের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পেতে আরেক ধরনের অভিবাসীর আগমন ঘটে। এসব ইহুদিকে পাশ্চাত্যের লোকজন 'মাগরেবি' বলে ডাকত। তারা পবিত্র নগরীতে বসতি স্থাপন করলেও সেখানকার কঠিন অবস্থা ইসলামি বিশ্বের অন্য প্রান্তে তাদের বাড়িঘরের প্রতি তাদের গৃহকাতরতা প্রকাশ পেত। যোসেফ হা-কোন বলেছেন, জেরুসালেমের ইহুদিরা হলো 'খাদকদের খাদ্য... ঔদ্ধত্যের কাছে নিঃশেষিত... গরিব, দুস্থ, পিষ্ট ও বন্ধক হয়ে যাওয়া'। খ্রিস্টান ও মুসলিমদের উপস্থিত ছিল অসহ্যকর। জীবনটি যদি খুব খারাপ না হতো তবে তীর্থযাত্রার সময় ইহুদিদেরকে 'ইদমের [খ্রিস্টান] জনতার গোলমাল' এবং 'পাঁচবার মিথ্যা কথা [মোয়াজ্জিনের] শুনতে হতো, যা কখনো বন্ধ হতো না।২৮ জেরুসালেম সম্প্রদায় পুরোপুরি ফুসতাত ও রামলে থেকে দানের ওপর নির্ভর করত। ফলে সেখানে কোনো প্লেগ বা খরা দেখা দিলে তাদেরকে ক্ষুধায় থাকতে হতো।

এসব কাঠিন্য সত্ত্বেও ইহুদি তীর্থযাত্রীরা অব্যাহতভাবে জেরুসালেমে তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখছিল, বিশেষ করে তিশরি মাসে তারা সেখানে সুকোথ উদযাপন করতে চাইত। ওই সময়টাতে তারা খোরাসানের মতো অনেক দূর থেকেও আসত। এই মেসাইনিক উৎসবের জন্য তারা নিজস্ব শাস্ত্রাচার উদ্ভাবন করেছিল। প্রথমে তীর্থযাত্রী ও অধিবাসীরা নগর প্রাচীরগুলো চক্কর দিত, আগের মতোই হারামের ফটকগুলোতে প্রার্থনা করত, মাউন্ট অলিভেসে আরোহণ করার সময় সাম গাইত। গাওন (ইহুদি ধর্মীয় নেতা) সোলোমন বেন জুদা লিখেছেন, তারা 'ছুটির দিনগুলোতে ঈশ্বরের টেম্পলের, ঐশী উপস্থিতির স্থান, তার শক্তি ও তার পা রাখার জায়গায়, দিকে মুখ করে দাঁড়াত। ২৯ টেম্পল মাউন্ট মুসলিম উপাসনালয়ে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় বিষণ্নতা ভর করলেও মাউন্ট অব অলিভেসে বিপুল ইহুদি সমাবেশ হতো উৎসবমুখর ও আনন্দময়। ইহুদিরা একে অন্যকে উষ্ণভাবে শুভেচ্ছা জানাত, আবেগে জড়িয়ে ধরত। তারা পর্বতে একটি বিশাল পাথরের পাশে সমবেত হতে পছন্দ করত। তারা তাতে থাকা একটি চিহ্নকে মনে করত যে জেরুসালেম ত্যাগ করার

সময় সেখানে শেখিনা বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এখানে জেরুসালেমের গাওন তার বার্ষিক বক্তব্য রাখতেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই সমাবেশের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের ওপর একটি সাম্প্রদায়িক বৈরিতার ছায়া ভর করে : গাওন একটি তাওরাতের স্ক্রল বের করে শান্তভাবে কারাইতেসদের ধর্মচ্যুত করতেন। কারাইতেসের ক্যাম্পটি হতো পর্বতের অন্য দিকে রাব্বানিয়াতদের শিবিরের বিপরীতে। এই ধর্মচ্যুতি প্রায় সবসময়ই মারাত্মক বিবাদের সৃষ্টি করত, এমনকি মারামারিও হতো। শান্তিপূর্ণ মানুষ গাওন সোলোমন চেয়েছিলেন এই প্রথা বাতিল করতে। মুসলিম কর্তৃপক্ষও ধর্মচ্যুতির ঘোষণা বাদ দিতে বলত। তারা জোর দিয়ে বলত, রাব্বানিয়াত ও কারাইতেস উভয়ের তাদের রুচি অনুযায়ী বিশ্বাস অনুসরণের অধিকার রয়েছে।

জেরুসালেমের ফাতেমি দখলদারিত্ব নগরীর জন্য মিশ্র আশীর্বাদ বয়ে এনেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই অধিবাসীরা উত্তর দিক থেকে নতুন শত্রুর মুখে পড়তে হলো। ১০৫৫ সালে সম্প্রতি সুন্নি ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী তুর্কি গোত্রগুলো আব্বাসি খলিফা ও সুন্নাহর নামে উত্তর সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করল। তারা ছিল প্রতিভাধর প্রশাসক ও চৌকষ সৈনিক। এসব অভিযানে সেলজুক বংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এ কারণে এসব তুর্কোম্যানকে ('অভিজাত তুর্কি') অনেক সময়ই সেলজুক নামে অভিহিত করা হতো। অবশ্য তাদের সব নেতাই এই বংশের সদস্য ছিল না। ১০৭১ সালে তুর্কি নেতা আলপ এশিয়ান আর্মেনিয়ার মানজিকার্টে বায়েজান্টাইন প্রতিরক্ষা লাইন গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। তুর্কিরা অল্প সময়ের মধ্যেই এশিয়ার বেশির ভাগ স্থান দখল করে নেয়। এদিকে আতসিজ ইবনে ইবাক শিয়াদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। তিনি ফিলিস্তিন আক্রমণ করেন, রামলে দখল করে জেরুসালেমে অবরোধ করেন। নগরী ১০৭৩ সালের জুনে আত্মসমর্পণ করে, অধিবাসীরা বিজয়ীদের সংযমে আশ্চর্য হয়ে যায়। আতসিজ জেরুসালেমের সব অধিবাসীর জন্য ক্ষমা ঘোষণা করেন। তিনি তার লোকজনকে কাউকে স্পর্শ না করতে, নগরীর বিপুল সম্পদ লুণ্ঠন না করার নির্দেশ দেন। তিনি এমনকি চার্চ ও মসজিদগুলো রক্ষায় প্রহরী পর্যন্ত নিয়োগ করেছিলেন। তুর্কি, সুদানি ও বার্বারদের নিয়ে গঠিত ফাতেমি সেনাবাহিনী নগরীতেই রয়ে যায়। তুর্কিরা যোগ দেয় সেলজুকদের সাথে, অন্যরা বেসরকারি নাগরিক হিসেবে অবস্থান করতে থাকে।

তুর্কি দখলদারিত্ব মানে জেরুসালেম এখন সুন্নি পরিমণ্ডলে ফিরে গেল। আলেমেরা জেরুসালেমে ফিরতে শুরু করলেন। ফাতেমি শাসনে বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে মুক্তি পেয়ে নবজাগরণ সৃষ্টি হলো নগরীতে তুর্কোম্যান শাসন নগরীতে সমৃদ্ধি বয়ে আনল। ১০৮৯ সালে একটি নতুন মসজিদ নির্মিত হলো, চার মাজহাবের দুটি- শাফি ও হানাফি- নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হলো। তুর্কিরা বাথ-হেসদা পুলের পাশে অবস্থিত ভার্জিন মেরির জন্মস্থান স্মরণে নির্মিত চার্চটিকে পুনঃনির্মাণ করে একে শাফি মাদরাসায় রূপান্তরিত করে। শেখ নাসর আল-মাকদিসির নেতৃত্ব নগরীতে আবার হাদিস ও ফিকাহ চর্চায় সমৃদ্ধি আসে। মুজির উদ্দিন আল-কুদসে শিক্ষা প্রদানের জন্য আগমনকারী প্রখ্যাত আলেমদের তালিকা দিয়েছেন। এদের মধ্যে ছিলেন আন্দালুসিয়া থেকে আগত মহান ফকিহ আল-তারতুশি ও আবুল-ফাতহ নাসির। ১০৯৫ সালে প্রখ্যাত সুন্নি চিন্তাবিদ আবু হামিদ আল-গাজ্জালি জেরুসালেমে আসেন ইবাদত-বন্দেগি ও ধ্যান করতে। তিনি মার্সি গেটের ওপরে ছোট একটি খানকায় বাস করতেন। এখানে তিনি সুফি চর্চা করতেন। জেরুসালেমেই তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ দি রিভাইবাল অব দি রিলিজিয়াস সায়েন্সস (ইলাহিয়া উলুম আদ-দিন) লিখেছিলেন। আমরা চতুর্দশ অধ্যায়ে দেখতে পাব যে সংস্কার করা সুন্নাহর রূপরেখায় পরিণত হয়েছিল এই গ্রন্থ। প্রায় একই সময় স্প্যানিশ পর্যটক আবু বকর ইবনে আল-আরাবি জেরুসালেম সফর করেছিলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভবে এখানে তিন বছর অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি দুটি ফিকাহ মক্তব দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান দুটিতে বিতর্ক ও আলোচনার পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো, যা আল-আন্দালুসে অপরিচিত ছিল। তিনি মুসলিম ও জিম্মি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যকার সংলাপে অভিভূত ছিলেন। এতে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমেরা একসাথে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন।

নগরীতে টানাপোড়েন ছিল। ১০৭৭ সালে আতসিজের মিসর অভিযানের সময় জেরুসালেমের ফাতেমিপন্থী গ্রুপগুলো বিদ্রোহ করে। কাজি সব তুর্কি নারী ও শিশুদের বন্দি করে নগরদুর্গে আটকে রাখেন। তিনি তুর্কি সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করেন। এবার যখন আতসিজ নগর-প্রাচীরের বাইরে এলেন, তখন কোনো দয়া দেখাননি। নগরী আত্মসমর্পণ করলে তার সৈন্যরা প্রায় তিন হাজার অধিবাসীকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে। কেবল হারামে

আশ্রয় গ্রহণকারীরাই রক্ষা পেয়েছিল। অবশ্য প্যাট্রিয়ার্কের মহল্লায় থাকা খ্রিস্টানেরা নিরাপদ ছিল। ফাতেমিদের প্রতি সবসময় অনুগত থাকা ইহুদিদের জন্য পরিস্থিতি তেমন সুবিধাজনক হয়নি। তারা সম্ভবত তুলুনীয় আমলেও খ্রিস্টানদের মতো একই ধরনের পৃষ্ঠপোষকতাও পায়নি। তারা তুর্কোম্যান শাসনকে বিপর্যয়ের কাল হিসেবে অভিহিত করেছে, ব্যাপক ধ্বংস ও তাণ্ডবে কথা বলেছে, ফসল জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা লিখেছে, উপাসনালয় ধ্বংস, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসের কথা জানিয়েছে। ইহুদি ইয়েশিভা এই সময়েই জেরুসালেম থেকে টায়ারে চলে যায়। ফাতেমি শাসনকে সমর্থনকারী শীর্ষস্থানীয় মুসলিমদেরকেও দেশটি ছাড়তে বাধ্য করা হয়। অবশ্য বেশির ভাগ লোকই সম্ভবত এই সহিংস গোলযোগ থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ইবনে আল-আরাবি একটি ছোট বিদ্রোহের সময় লোকজন তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম যেভাবে পরিচালনা করে তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। একজন বিদ্রোহী নগরদুর্গে প্রবেশ করলে গভর্নরের তীরন্দাজরা তার প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে, সৈনিকেরা দুই দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে। এ ধরনের কোনো ঘটনা আল- আন্দালুসে ঘটলে পুরো নগরীতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ত, দোকানপাট বন্ধ হয়ে যেত, স্বাভাবিক জীবন পুরোপুরি বিঘ্ন ঘটত। অথচ ইবনে আল-আরাবি অবাক হয়ে দেখতে পেলেন, তুলনামূলক ছোট এই শহরে জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবে চলছে :

এসব গোলযোগের কারণে কোনো বাজার বন্ধ হয়নি, সহিংসতা সৃষ্টি করে কোনো সাধারণ মানুষ এতে অংশ নেয়নি, কোনো দরবেশ আকসা মসজিদ ত্যাগ করেননি, কোনো আলোচনা স্থগিত হয়নি। ৩০

.

জেরুসালেমের অধিবাসীরা আগের দুই শ' বছরে এত বেশি সহিংস প্রতিহিংসামূলক ঘটনার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল যে তারা এ ধরনের তুলনামূলক ছোটখাট সঙ্ঘাতের প্রতি খুবই উদাসীন হয়ে পড়েছিল। মাঝে মধ্যে ঘটা এসব ঘটনা সত্ত্বেও তুর্কোম্যান শাসনকালে জেরুসালেম সমৃদ্ধ হয়েছিল, ফিলিস্তিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে পরিণত হয়েছিল। ১০৩৩ সালের ভূমিকম্পের পর আর কখনো আগের অবস্থায় ফেরেনি রামলে। তবে এখন

জেরুসালেমের নতুন প্রাচীর হয়েছে, সংস্কার করা ভবনরাজিতে মুগ্ধতা অর্জন করেছে। এখানে এখন সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক জীবন রয়েছে, এটি আন্তর্জাতিক নগরীতে পরিণত হয়েছে। সারা দুনিয়া থেকে এখন বছরে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এখানে আসে। এমনকি আল-আরাবি যদিও এখানকার সম্প্রীতি উপভোগ করছিলেন। কিন্তু তবুও একটি বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছিল। আর জেরুসালেমও এ বিপদটিকে স্বাভাবিক উদাসিনতার সাথে এড়িয়ে যেতে পারছিল না। ফাতেমিরা ফিলিস্তিন ত্যাগ করেনি। ১০৯৮ সালের আগস্টে শিয়া খলিফা আল-আফজাল ছয় মাস অবরোধের পর নগরী দখল করে নেন। এটি ফাতেমি সমর্থকদের জন্য আনন্দ বয়ে আনে। কিন্তু এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ১০৯৯ সালের জুনে ইউরোপ থেকে খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা জেরুসালেমের পাহাড়গুলোর বাইরে এসে পৌঁছে যায়। তাদের চোখে যখন প্রথমবারের মতো পবিত্র নগরী ধরা দেয়, তখন পুরো সেনাবাহিনী ভয়ঙ্কর ভাবাবেশে প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছিল। সৈন্যরা কাঁদল, প্রচণ্ড শব্দে চিৎকার করল। পবিত্র নগরীতে সোনালি ডোম অব দি রককে তাদের পবিত্র নগরীতে রাজকীয় প্রাধান্য বিস্তার করে থাকতে দেখে তারা ক্রোধমিশ্রিত উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। তারপর ক্রুসেডার সেনাবাহিনী জেরুসালেম প্রাচীরের বাইরে অবস্থান নিলো। গেস্তা ফ্রাকোরামের এক অজ্ঞাতনামা লেখক বলেছেন, তারা উল্লাস করছিল, উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। তারা নগরী অবরোধ করল।

ক্রুসেড

বায়েজান্টাইনরা ১০৭১ সালের মানজিকার্ট যুদ্ধের পর সেলজুকদের কাছে প্রায় পুরো এশিয়া মাইনর খুইয়ে ইসলামকে কার্যত তাদের দরজার সামনে দেখতে পেল। কিন্তু তবুও তুর্কোম্যানদের শক্তি ম্লান হয়ে আসছিল, সম্রাট প্রথম আলেক্সিয়াস কমনেনাসের কাছে মনে হলো যে গুটিকতেক ঝটিকা অভিযানই তাদেরকে একেবারে চিরতরে থামিয়ে দেওয়া সম্ভব। ১০৯৫ সালে তিনি পোপ দ্বিতীয় আরবানের কাছে সামরিক সহায়তা কামনা করলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে আগে তার হয়ে লড়াই করা কয়েকটি নরম্যান ভাড়াটে সৈনিক দল পাঠানো হতে পারে। অবশ্য পোপের আরো বড় উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ছিল। ওই বছরের শেষ দিকে তিনি ক্লেরমতেঁ ইউরোপের পুরোহিত, নাইট ও গরিব মানুষদের উদ্দেশে বক্তৃতা করে মুক্তির পবিত্র যুদ্ধের কথা আহ্বান জানালেন। তিনি নাইটদেরকে ইউরোপকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া একে অপরের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যহীন সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধ বন্ধ করে এর বদলে ২০ বছর ধরে মুসলিম তুর্কিদের অধীনে থাকা আনাতোলিয়ায় তাদের খ্রিস্টান ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে কাতর মিনতি করলেন। তারা তাদের ভাইদের পৌত্তলিকদের জোয়াল থেকে মুক্ত করা মাত্র তারা ইসলামের কবল থেকে খ্রিস্টের কবরকে মুক্ত করতে জেরুসালেম রওনা হয়ে যাবে। ইউরোপে ঈশ্বরের শান্তি ও নিকটপ্রাচ্যে ঈশ্বরের যুদ্ধ জারি হবে। আরবান ওই বক্তৃতায় সত্যিই কী কী বলেছিলেন, তার সমসাময়িক কোনো রেকর্ড আমাদের কাছে নেই। পরে এই অভিযান প্রথম ক্রুসেড হিসেবে পরিচিত হয়েছিল। তবে নিশ্চিতভাবেই মনে হচ্ছে যে তিনি এই অভিযানকে সশস্ত্র তীর্থযাত্রা বিবেচনা করেছিলেন। একাদশ শতকে পবিত্র নগরীতে বিপুলসংখ্যক তীর্থযাত্রী নিয়ে হওয়া আরো যে তিনটি অভিযান হয়েছিল, এটিও তেমন হবে বলে তার মনে হয়েছিল | এরপর তীর্থযাত্রীদের অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এবার পোপ তাদেরকে তরবারি দিলেন। বক্তৃতা শেষ করলে আরবান উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনি পেলেন। বিপুল জনতা এক কণ্ঠে স্লোগান তুলল, ‘ডেনস হক ভল্ট!’ : ‘ঈশ্বরের ইচ্ছা এটি।’

সাড়া ছিল নজিরবিহীন, ব্যাপক ও তাৎক্ষণিক। লোকরঞ্জক প্রচারকেরা তার বক্তব্য ছড়িয়ে দিলো। ১০৯৬ সালের বসন্তে প্রায় ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত পাঁচটি সেনাবাহিনী এবং সেইসাথে অযোদ্ধা কৃষকদের দল ও স্ত্রী ও পরিবারসহ তীর্থযাত্রীরা জেরুসালেমের পথে রওনা হলো। তাদের বেশির ভাগই পূর্ব ইউরোপ দিয়ে বিপজ্জনক পথে চলার সময় মারা যায়। শরৎকাল নাগাদ তাদের সাথে যোগ দেয় প্রায় এক লাখ লোক ও পুরোহিতদের একটি দল নিয়ে গঠিত আরো পাঁচটি সেনাবাহিনী। প্রথম দলটি কনস্টানটিনোপলের দিকে চলার সময় প্রিন্সেস আনা কমনেনার কাছে মনে হয়েছিল 'পুরো পাশ্চাত্য এবং আড্রিয়াটিক সাগর ছাড়িয়ে হেরাক্লিয়াসের স্তম্ভগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের বেশির ভাগ এলাকা স্থানচ্যুত হয়ে সবকিছু নিয়ে দুর্দান্ত বেগে শক্ত পিণ্ডের মতো এশিয়ায় নেমে আসছে।' সম্রাট প্রচলিত সামরিক সহায়তা কামনা করেছিলেন, কিন্তু দেখতে পেলেন যে তার উদ্দীপনার ফলে যা ঘটছে, সেটিকে বলা যেতে পারে বর্বর আক্রমণ। অন্ধকার যুগ থেকে পাশ্চাত্য বেরিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে ক্রুসেড ছিল নতুন পাশ্চাত্যের প্রথম সহযোগিতামূলক উদ্যোগ। এতে পুরোহিত ও বিশপ, অভিজাত ও কৃষক- সব শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব ছিল। তারা সবাই জেরুসালেমের আবেগে আচ্ছন্ন ছিল। ক্রুসেডাররা কেবল মাটি আর সম্পদ চেয়েছিল- বিষয়টি এমন নয়। ক্রুসেড ছিল ভয়ানক, ভীতিকর, বিপজ্জনক ও ব্যয়বহুল। বেশির ভাগ ক্রুসেডার তাদের সবকিছু হারিয়ে বাড়ি ফিরেছিল, স্রেফ বেঁচে থাকার জন্য তাদের সর্বাত্মক আদর্শবাদের প্রয়োজন হয়েছিল। ক্রুসেড আদর্শ সংজ্ঞায়িত করা খুব সহজ নয়। কারণ এসব তীর্থযাত্রী তাদের অভিযান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করত। উচ্চতর পুরোহিতের হয়তো আরবানের পাশ্চাত্য চার্চের শক্তি ও মর্যাদা বাড়ানোর লক্ষ্যে মুক্তির পবিত্র যুদ্ধের আদর্শ ছিল। অনেক নাইট একে তাদের সামন্ত প্রভুর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যেভাবে লড়াই করেছিলেন ঠিক সেভাবেই যিশুর পৈত্রিক সম্পত্তি জেরুসালেমের জন্য লড়াই করাকে তাদের কর্তব্য মনে করতেন। অপেক্ষাকৃত গরিব ক্রুসেডারেরা সম্ভবত নতুন জেরুসালেমের মহাপ্রলয়বাদী স্বপ্নে উদ্দীপ্ত হয়েছিল। তবে জেরুসালেম ছিল প্রধান বিষয়। আরবান যদি খ্রিস্টের সমাধির কথা উল্লেখ না করতেন, তবে তার একই ধরনের সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ।

তবে এই আদর্শবাদের একটি অন্ধকার অন্তর্নিহিত দিক ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায় যে খ্রিস্টের বিজয় মানে অন্যদের মৃত্যু ও ধ্বংস। ১০৯৬ সালের বসন্তে জার্মান ক্রুসেডারদের একটি দল রাইন নদীর তীরবর্তী স্পেয়ার, ওয়ার্মস ও মেইঞ্জের ইহুদি সম্প্রদায়গুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এটি নিশ্চিতভাবেই পোপের উদ্দেশ্য ছিল না। তবে মুসলিম সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানে না, তাদের বিরুদ্ধে এসব ক্রুসেডার লড়াই করতে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দেবে, অথচ যারা আসলেই খ্রিস্টকে হত্যা করেছিল (অন্তত ক্রুসেডাররা তাই বিশ্বাস করত) তারা এখনো জীবিত থেকে তাদের একেবারে দোড়গোড়ায় বাস করতে থাকবে তা অদ্ভূতই মনে হতে পারে। এগুলো ছিল ইউরোপের প্রথম পূর্ণ-মাত্রার প্রথম (সঙ্ঘবদ্ধ হত্যাকাণ্ড)। এরপর থেকে যখনই নতুন ক্রুসেডারের কথা যখনই প্রচারিত হয়েছিল, তখনই এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। এতে করে খ্রিস্টান জেরুসালেমের প্রলোভন সেমিটিকবাদবিরোধিতাকে ইউরোপের দুরারোগ্য রোগে পরিণত করেছিল।

আর ১০৯৬ সালের শরতে রওনা হওয়া ক্রুসেড সেনাবাহিনী ছিল তাদের পূর্বসূরিদের চেয়ে অনেক বেশি সুশৃঙ্খল। তারা মোড় ঘুরে ইহুদিদের দিকে ফেরেনি। বেশির ভাগই সুশৃঙ্খলভাবে কনস্টানটিনোপল পৌঁছেছিল। সেখানে তারা শপথ গ্রহণ করল যে তারা আগে বায়েজান্টিয়ামের মালিকানায় থাকা সব ভূখণ্ড বিশ্বস্তভাবে ফিরিয়ে দেবে। অবশ্য ঘটনাপ্রবাহে প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের অনেকের প্রতিশ্রুতি পূরণের কোনো ইচ্ছা ছিল না। সেলজুকদের আক্রমণ করার এটিই ছিল উপযুক্ত সময় : তাদের আগের সংহতি পরিণত হয়েছিল উপদলীয় সঙ্ঘাতে, আমিরেরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। ক্রুসেডাররা শুভ সূচনা করল। নিক্যাইয়া ও ডোরিলায়ামে তারা বিপুল জয় পেল। তবে তা ছিল দীর্ঘ যাত্রা। খাদ্য ছিল দুর্লভ, তুর্কিরা পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছিল। জেরুসালেমে পৌঁছাতে ক্রুসেডারদের তিনটি অকল্পনীয় কঠিন বছর লেগেছিল। অ্যান্টিয়কে পৌঁছার পর ১০৯৭-৯৮ সালের কঠিন শীতে তারা শক্তিশালী দুর্গে সুরক্ষিত নগরীটি অবরোধ করল। অবরোধের পরিক্রমায় প্রতি সাতজনের একজন ক্ষুধা মারা গিয়েছিল, সেনাবাহিনীর অর্ধেক ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ক্রুসেডাররাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল। ১০৯৯ সালে শেষ পর্যন্ত তারা যখন জেরুসালেমের প্রাচীরগুলোর

সামনে দাঁড়াল, তারা তখন নিকটপ্রাচ্যের মানচিত্র বদলে ফেলেছে। তারা এশিয়া মাইনরে সেলজুক ঘাঁটি ধ্বংস করে ফেলেছে, পাশ্চাত্যের শাসকদের পরিচালিত দুটি নতুন রাজ্য সৃষ্টি করেছে : একটি ছিল অ্যান্টিয়কে, যা ছিল ট্যারেনটিনোর নরম্যান বোহেমান্ডের অধীনে, অপরটি ছিল আর্মেনিয়ান এডেসা, বলোঙের ব্যান্ডউইন এটি শাসন করতেন। অবশ্য জয়গুলো ছিল কঠিন লড়াইয়ের ফসল। এসব লৌহমুষ্টির যোদ্ধাদের ভয়ঙ্কর দুর্নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। অ্যান্টিয়কে নরমাংস ভোজনের কলুষিত গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। আর ইউরোপের বর্বর খ্রিস্টানরা পরিচিত হয়ে ওঠেছিল চরম নির্মম ও তাদের ধর্মীয় উগ্রতায় উন্মাদ হিসেবে। জেরুসালেমের অনেক গ্রিক অর্থোডক্স ও মনোফাইসিত খ্রিস্টান এসব ভয়ঙ্কর কাহিনীতে সতর্ক হয়ে মিসরে পালিয়ে গিয়েছিল। যারা রয়ে গিয়েছিল এবং সেইসাথে ল্যাতিন খ্রিস্টানদেরকে (তারা যে ক্রুসেডারদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, তা সন্দেহ করার যৌক্তিক কারণ ছিল) মুসলিম গভর্নররেরা তাদেরকে নগরী থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। নগরী ও আশপাশের এলাকা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অবরোধের সময় ক্রুসেডারদের কাছে চরম মূল্যবান বিবেচিত হয়েছিল।

ক্রুসেডারা নেতারা প্রাচীরগুলোর চারপাশে তাদের সৈন্যদের মোতায়েন করেছিলেন। রবার্ট দি নরম্যানকে মোতায়েন করা হয়েছিল উত্তরের বিধ্বস্ত সেন্ট স্টিফেন চার্চের কাছে; ফ্ল্যানডার্সের রবার্ট ও সেন্ট পলের হিউকে নগরীর উত্তর- পশ্চিম দিকে; বোলনের গডফ্রে, ট্রানক্রেড ও সেন্ট জিলেসের রেমন্ড তাঁবু গাড়লেন নগরদুর্গের বিপরীতে। আরেকটি সেনাবাহিনী মাউন্ট অলিভসে মোতায়েন করা হয়েছিল পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ শানানোর জন্য। তারপর রেমন্ড তার প্রভেনক্যাল সৈন্যদের নিয়ে মাউন্ট সায়নের ওপর প্রাচীরগুলোর বাইরে থাকা পবিত্র স্থানগুলো রক্ষার জন্য সরিয়ে নিলেন। তারা প্রাচ্যের পাথুরে দুর্গ অবরোধে অভ্যস্ত ছিল না। এসব নগরী ছিল ইউরোপের বেশির ভাগ শহরের চেয়ে অনেক বড়। তাছাড়া অবরোধ ইঞ্জিন বানানোর মতো সামগ্রীর অভাবও ছিল তাদের। তারপর জেনোয়ার একটি বহর জাফায় অবতরণ করল। তারা এর মাস্তুল, দড়ি, হুকগুলো খুলে নিয়ে দুটি টাওয়ার বা ‘বেলফ্রে’ বানাতে সক্ষম হলো। এগুলো চাকায় চালনা করে প্রাচীর পর্যন্ত নেওয়া যেত। এ যন্ত্রটি মুসলিমদের কাছে অপরিচিত ছিল। শেষ পর্যন্ত ১০৯৯ সালের ১৫ জুলাই গডফ্রের সেনাবাহিনীর এক সৈন্য এই দুই টাওয়ারের কোনো

একটির মাধ্যমে নগরীতে ঢুকে পড়তে সক্ষম হলো। বাকি ক্রুসেডারেরা তাকে অনুসরণ করতে সক্ষম হলো। নগর রক্ষায় নিয়োজিত মুসলিম ও ইহুদিদেরকে মহাপ্রলয়ের প্রতিশোধপরায়ণ দেবদূতদের মতো করে হত্যা করা হতে লাগল।

প্রায় তিন দিন ধরে ক্রুসেডাররা সঙ্ঘবদ্ধভাবে জেরুসালেমের প্রায় ৩০ হাজার লোকের ওপর গণহত্যা চালাল। গেস্তা ফ্রানকোরাম সমর্থনসূচকভাবে বলেছেন, 'তারা চোখের সামনে পড়া সব স্যারাসেন [মুসলিম] ও তুর্কিকে হত্যা করেছিল। নারী বা পুরুষ- সবাইকে তারা হত্যা করেছিল।২ আকসার ছাদে নিরাপদ মনে করে আশ্রয় নেওয়া ১০ হাজার মুসলিমের সবাইকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ইহুদিদেরকে তাদের সিনাগগে আটকিয়ে তরবারি চালানো হয়। বলতে গেলে কেউই বেঁচে থাকেনি। একইসময় সেনাবাহিনী চ্যাপলিন চারথ্রেসের ফুলচার বলেন, তারা ঠাণ্ডা মাথায় সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল। 'কেউ কোনো বাড়িতে প্রবেশ করলে, সেটি ধনী বা গরিব যারই হোক না কেন, অন্য কোনো ফ্রাঙ্ক তাকে চ্যালেঞ্জ করত না। সে কোনো বাড়ি বা প্রাসাদ যাই দখল করুক না কেন, সেটি তার হয়ে যেত।' রাস্তাগুলো আক্ষরিক অর্থেই রক্তে ভেসে গিয়েছিল। মাথা, হাত আর পায়ের স্তূপ দেখা যাচ্ছিল,' বলেন প্রভেনক্যাল প্রত্যক্ষদর্শী অ্যাগুইলেসের রেমন্ড। তার মধ্যে লজ্জার কোনো অনুভূতি দেখা যায়নি : গণহত্যা ছিল খ্রিস্টধর্মের মহাবিজয়ের আলামত, বিশেষ করে হারামের ওপর :

আমি যদি সত্য কথা বলি, তবে তা আপনার বিশ্বাসের শক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে। কেবল এটুকুই বলাই যথেষ্ট হবে যে টেম্পলে ও সোলায়মানের বারান্দায় লোকজনের হাঁটু পর্যন্ত ও ঘোড়ার খুরগুলো রক্তে ডুবে গিয়েছিল। বস্তুত, ঈশ্বরের ন্যায়সঙ্গত ও আড়ম্বরপূর্ণ বিচার ছিল যে এ স্থানটি অবিশ্বাসীদের রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, কারণ এটি তাদের ঈশ্বর অবমাননায় দীর্ঘ দিন ধরে দুর্ভোগে ছিল।৪

মুসলিম ও ইহুদিদেরকে অনিষ্টকর প্রাণির মতো জেরুসালেম থেকে নির্মূল করে দেওয়া হয়।

শেষ পর্যন্ত হত্যা করার জন্য কাউকে পাওয়া গেল না। ক্রুসেডাররা নিজেদের ধৌত করে অ্যানাস্তাসিসের দিতে অগ্রসর হলো, চোখে-মুখে আনন্দের উল্লাস নিয়ে ভজন গাইছিল। খ্রিস্টের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে তারা 'অফিস অব দি রিসারেকশন' গাইল, এর উপাসনা পদ্ধতি নতুন যুগের ভোরের সূচনা করেছে বলে মনে হলো। রেমন্ড এ নিয়ে লিখেছেন :

আমি বলব, এই দিন ভবিষ্যতের সব যুগের জন্য বিখ্যাত হবে। কারণ এটি আমাদের শ্রম ও বেদনাকে আনন্দ ও উল্লাসে পরিণত করেছে; আমি বলব, এ দিনটি সমগ্র খ্রিস্ট ধর্মের যৌক্তিকতা, পৌত্তলিকতাবাদের বিপর্যয়, বিশ্বাসের নতুন জাগরণের চিহ্ন হয়ে থাকবে। 'এ দিনটি প্রভু সৃষ্টি করেছেন, এসো আমরা আনন্দ করি, আমরা খুশি হই কারণ এই দিনে ঈশ্বর তার জাতির কাছে প্রকাশ করেছেন তাদের আশীর্বাদপুষ্ট করেছেন।৫

এই দৃষ্টিভঙ্গি অল্প সময়ের মধ্যে ইউরোপের এস্টাবলিশমেন্ট গ্রহণ করে নিয়েছিল। তারা সম্ভবত প্রথমে গণহত্যার খবরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ক্রুসেড ছিল সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এমন মহাবিজয় যাতে তাদেরকে বিশ্বাস করতে হয়েছিল যে এটি ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদধন্য ছিল। ১০ বছরের মধ্যে তিন জ্ঞানী সন্ন্যাসী- নগেন্টের গুইবার্ট, রবার্ট দি মঙ্ক, বরগুইলির ব্যান্ডরিক- প্রথম ক্রুসেডের ইতিহাস রচনা করেন। এতে ক্রুসেডারদের যুধ্যমান ধর্মানুরাগকে পুরোপুরি অনুমোদন করা হয়েছিল। এই সময় থেকে মুসলিমদেরকে তুলনামূলক সহানুভূতিহীনভাবে বিবেচনা করা হতে লাগল। পাশ্চাত্যে তাদেরকে 'বীভৎস ও ঘৃণ্য জাতি', 'ঈশ্বরের কাছে পুরোপুরি অজ্ঞাত' ও কেবল 'চিরতরে নির্মূলের উপযোগী হিসেবে দেখা হতে লাগল। ক্রুসেড পরিণত হলো ঈশ্বরের কর্ম হিসেবে, যেভাবে মিসর থেকে ইসরাইলিদের এক্সোডোস ছিল। ফ্রাঙ্করা এখন ঈশ্বরের নতুন মনোনীত জাতিতে পরিণত হলো : ইহুদিদের হারানো বৃত্তি গ্রহণ করল।' রবার্ট দি মঙ্ক অবাক করা দাবি করলেন যে ক্রুসেডারদের জেরুসালেম জয় ক্রুশবিদ্ধকরণের পর বিশ্ব ইতিহাসের সেরা ঘটনা।'৮ অল্প সময়ের মধ্যে খ্রিস্টবিরোধী ধারণা জেরুসালেমে এসে পড়ে, শেষ দিনের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।৯

তবে ক্রুসেডাররা আর যাই হোক না কেন, বাস্তবধর্মী ছিল। এসব পরম বিজয় উদযাপনের আগেই নগরীকে পরিষ্কার করতে হয়েছিল তাদের। টায়ারের উইলিয়াম বলছেন, লাশগুলো

পরম দক্ষতায় পোড়ানো হয়েছিল, যাতে ক্রুসেডাররা কর্তিত অঙ্গ-প্রতঙ্গে না-মাড়িয়ে আরো বেশি আস্থার সাথে পবিত্র স্থানগুলোতে যেতে পারে। তবে বাস্তবে কাজটি ছিল বিপুল শ্রমসাধ্য। পাঁচ মাস পরও নগরীতে লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। চারত্রেসের ফুলচার ওই বছর ক্রিসমাস উদযাপনের জন্য যখন জেরুসালেমে আসেন, তখন তিনি আতঙ্কিত হয়েছিলেন :

ওহ, নগরীর ভেতর-বাইরে সব দিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে। নগরী দখলের সময় আমাদের হাতে নিহত স্যারাসেনদের লাশগুলো এখনো পচছে, সেখানে তাদের হত্যা করা হয়েছিল, সেখানেই তাদের লাশ রয়ে গেছে।১১

.

ক্রুসেডারেরা সমৃদ্ধ ও জনবহুল নগরী জেরুসালেমকে রাতারাতি দুর্গন্ধযুক্ত শব দাহ করার শশ্মশানে পরিণত করেছিল। গণহত্যার তিন দিন পর ক্রুসেডাররা যখন বাজার বসিয়েছিল, তখনো রাস্তায় রাস্তায় পচতে থাকা লাশের স্তূপ ছিল। তাদের পায়ের নিচে থাকা তাদের জঘন্য কর্মের প্রমাণ প্রকট থাকা সত্ত্বেও মহা উৎসব আর উল্লাসে তারা তাদের লুটের মালামাল বিক্রি করছিল। পূর্বসূরিদের ঐশী অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো যদি জেরুসালেমের কোনো একেশ্বরবাদী বিজয়ের সততার পরীক্ষা হিসেবে গণ্য হয়, তবে ক্রুসেডাররা অবশ্যই যেকোনো তালিকায় সবার নিচে থাকবে।

তারা বিজয়-পরবর্তী বিষয় নিয়ে ভাবেনি, নগরীটি কিভাবে পরিচালনা করা হবে সে ব্যাপারেও তাদের কোনো ধারণা ছিল না। ধর্মবেত্তারা বিশ্বাস করতেন, পবিত্র নগরীটি ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী কোনো প্যাট্রিয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত। নাইটরা চাইতেন, তাদের কেউ শাসন করুক। আবার ক্রুসেডারদের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তারকারী গরিব লোকজন শুরু থেকেই নতুন জেরুসালেমের প্রত্যাশা করেছিল। তারা প্রচলিত কোনো ধরনের সরকারই যাতে একেবারে না থাকে, তাই কামনা করত। আপস হতে বেশ সময় নেয়। অবরোধের সময় মুসলিমেরা গ্রিক অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্ককে বহিষ্কার করায় ক্রুসেডারেরা নরম্যান্ডির রবার্টের চ্যাপলান রোহেসের আরনাফকে ওই পদে নিযুক্ত করে।

অর্থাৎ একজন গ্রিকের স্থলাভিষিক্ত হলো একজন ল্যাতিন। তারপর তারা বোলনের গডফ্রেকে তাদের নেতা নিযুক্ত করে। এ তরুণ লোকটির বুদ্ধিমত্তা না থাকলেও ছিলেন ধার্মিক, বিপুল দৈহিক সাহস ধারণ করতেন। গডফ্রে ঘোষণা করলেন যে তিনি সোনার মুকুট পরবেন না, কারণ তার ত্রাণকর্তা কাঁটার মুকুট পরেছিলেন। তিনি পদবি গ্রহণ করলেন 'অ্যাডভোকেট অব দি হলি সেপালচার। নগরীটি শাসিত হতো প্যাট্রিয়ার্কের মাধ্যমে। তবে গডফ্রে তাকে সামরিক সুরক্ষা (অ্যাডভোকেটিয়া) প্রদান করতেন। কয়েক মাস পর পিসার আর্চবিশপ দাইমবার্ট পোপের সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে জেরুসালেমে আসেন। তিনি সাথে সাথে আরনাফকে বরখাস্ত করে নিজেকে প্যাট্রিয়ার্ক ঘোষণা করে গ্রিক, জ্যাকোবাইট, নেস্টোরিয়ান, জর্জিয়ান ও আর্মেনিয়ানসহ স্থানীয় সব খ্রিস্টানকে অ্যানাস্তাসিস ও জেরুসালেমের অন্য সব চার্চ থেকে বিতাড়িত করেন। পোপ আরবান প্রাচ্যের খ্রিস্টানদের সহায়তা করার ম্যান্ডেট দিয়েছিলেন ক্রুসেডারদের। এখন তারা পবিত্র নগরীতে তাদের পূর্বসূরিদের অসহিষ্ণুতা বাড়িয়ে তাদের একই ধর্মে বিশ্বাসীদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত করল। ১১০০ সালের ইস্টার সানডেতে গডফ্রে এই শর্তে প্যাট্রিয়ার্ক দাইমবার্টকে দাউদ টাওয়ার ও জেরুসালেমের অন্য সব কিছুসহ জেরুসালেম নগরী' প্রদান করলেন যে অ্যাডভোকেট রাজ্যটির জন্য আরো ভূমি জয় করলে তিনি নগরীকে ব্যবহার করতে পারবেন।

ক্রুসেডারদের জন্য এটি ছিল সবচেয়ে কঠিন কাজ। জেরুসালেম জয় করার অর্থ চার্চের জন্য পুরো ফিলিস্তিন মুক্ত করা ছিল না। ফাতেমিরা তখনো উপকূলীয় নগরীগুলোসহ দেশটির অনেক অংশ নিয়ন্ত্রণ করছিল। পিসার নৌবহরের সহায়তায় ফাতেমি ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালাতে শুরু করলেন গডফ্রে। ১১০০ সালের মার্চ মাস নাগাদ অ্যাসক্যালন, ক্যাসারিয়া, আক্রা ও আরসাফের আমিররা আত্মসমর্পণ করে গডফ্রেকে তাদের প্রভু স্বীকার করে নেন। ট্রান্সজর্ডানের শেখরাও তা অনুসরণ করে। এদিকে তানক্রেড গ্যালিলিতে একটি ছোট রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিস্থিতি ছিল অনিশ্চিত। রাজ্যটির এখন রক্ষা করার মতো সীমান্ত থাকলেও পরবর্তী ২৫ বছর তাকে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল। কারণ এটি তীব্র বৈরী শত্রুদের পরিবেষ্টিত ছিল।

ক্রুসেডারদের প্রধান সমস্যা ছিল জনশক্তি। জেরুসালেম জয় হওয়ামাত্র তাদের বেশির ভাগ সৈন্যই দেশে ফিরে গিয়েছিল, পেছনে কেবল একটি কঙ্কাল সেনাবাহিনী রয়ে গিয়েছিল। জেরুসালেম বিশেষভবে জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় এক লাখ লোকের বাস করা নগরীতে এখন ফাঁকা, ভুতুরে পরিবেশে মাত্র কয়েক শ' লোক থাকে। উইলিয়াম টায়ার বলেছেন, 'আমাদের দেশের লোকজন সংখ্যায় এত কম ও এত অভাবগ্রস্ত যে রাস্তায় তাদের দেখা পাওয়া দুঃসাধ্য। ৩ নিরাপত্তার জন্য তারা হলি সেপালচারে প্যাট্রিয়ার্কের কোয়ার্টারে গাদাগাদি করে থাকত।১৪ নগরীর বাকি অংশ ছিল জনশূন্য, রাস্তাগুলো অপরাধী আর বেদুইনদের উপস্থিতিতে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। এসব লোক খালি বাড়িগুলোতে ঢুকে পড়ত। জেরুসালেম পর্যাপ্তভাবে রক্ষা করা হয়নি : গডফ্রে যখন তার সৈন্যদের নিয়ে কোনো অভিযানে বের হতেন, তখন অল্প কয়েকজন অযোদ্ধা ও তীর্থযাত্রীকে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রেখে যাওয়া হতো। বৈরিতার অবসান হওয়ামাত্র মুসলিম ও ইহুদিরা বৈরুত, সিডন, টায়ার ও একরের মতো নগরীগুলোতে ফিরে আসতে লাগল। মুসলিম কৃষকেরা গ্রাম এলাকায় রয়ে গিয়েছিল। জেরুসালেম জয়ের পর ক্রুসেডারেরা পবিত্র নগরীতে ইহুদি ও মুসলিমদের নিষিদ্ধ করে; স্থানীয় খ্রিস্টানদেরকেও বহিষ্কার করা হয়। কারণ ক্রুসেডাররা তাদেরকে ইসলামের দুষ্কৃতির সহযোগী বলে সন্দেহ করত। অমার্জিত পাশ্চাত্যের লোকজনের কাছে এসব ফিলিস্তিনি, কপ্টিক ও সিরিয়ান খ্রিস্টানকে আরবদের থেকে ভিন্ন বলে মনে হতো না। নগরীটি যতই পবিত্র হোক না কেন, ফ্রাঙ্কদের খুব কম লোকই জেরুসালেমে বাস করতে চাইত। আগের জেরসালেমের ছায়ায় পরিণত হয়েছিল বর্তমান নগরী। বেশির ভাগই উপকূলীয় নগরীগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। সেখানে জীবন ছিল অনেক সহজ, ব্যবসা-বাণিজ্যের আরো বেশি সুযোগ ছিল।

জয়ের পরপরই গডফ্রে আকসা মসজিদে সরে গিয়েছিলেন। এটি পরিণত হয়েছিল রাজকীয় বাসভবনে। তিনি ডোম অব দি রককে চার্চে পরিণত করেছিলেন। এর নাম হয় 'টেম্পল অব দি লর্ড।' ক্রুসেডারদের কাছে হারামের বিশাল অর্থ ছিল। বায়েজান্টাইনরা জেরুসালেমের এই অংশের প্রতি কোনো আগ্রহ দেখায়নি। তবে ক্রুসেডাররা বিশ্বাস করছিল যে তারা নতুন মনোনীত জাতি। আর এ কারণে তারা এই ইহুদি পবিত্র স্থানটির

উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত তাদেরই। শুরু থেকে এটি ক্রুসেডার জেরুসালেমের আধ্যাত্মিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়। দাইমবার্ট 'টেম্পল অব দি লর্ডকে' তার সরকারি আবাসে পরিণত করেন। ক্রুসেডারদের কাছে হারামের গুরুত্ব বোঝা যায় এই তথ্যে যে প্যাট্রিয়ার্ক ও তার অ্যাডভোকেট এই জনহীন দূরবর্তী এলাকায় বসবাসের জন্য পছন্দ করেছিলেন। ওয়েস্টার্ন হিলের ওপর থাকা প্রধান ক্রুসেডার মহল্লাগুলো থেকে এটি ছিল অনেক দূরে। তাদের সবচেয়ে কাছাকাছি প্রতিবেশী ছিলেন বেনেডিকটাইন সন্ন্যাসীরা। গডফ্রে তাদেরকে কিদরন ভ্যালির ভার্জিন মেরির সমাধিতে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন।

গডফ্রের শাসনকাল ছিল সংক্ষিপ্ত। ১১০০ সালের জুলাই মাসে তিনি টায়ফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাকে অ্যানাস্তাসিসে সমাহিত করা হয়। ক্রুসেডারেরা একে চার্চ অব দি হলি সেপালচার বলতেই পছন্দ করত। প্যাট্রিয়ার্ক দায়ামবার্ট সেক্যুলারের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক নেতৃত্বও গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু গডফ্রের ভাই ব্যান্ডউইনের কৌশলের কাছে পরাজিত হন। ব্যান্ডউইন ছিলেন আর্মেনিয়ার ক্রুসেডার রাজ্য এডেসার কাউন্ট। লরেন থেকে আগত তার দেশী লোকেরা তাকে জেরুসালেমে আসতে তাগিদ দিয়েছিল। তিনি তার ভাইয়ের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও বাস্তববাদী ছিলেন। যুব বয়সে পাদ্রির প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ব্যান্ডউইন বেশির ভাগ সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি শিক্ষিত ছিলেন। তিনি ক্রুসেডার জেরুসালেম রাজ্যকে টিকে থাকার সম্ভাবনাময়ে পরিণত করেছিলেন। ১১০০ সালের ৯ নভেম্বর তিনি পবিত্র নগরীতে পৌঁছালে কেবল ফ্রাঙ্করা নয়, সেইসাথে স্থানীয় খ্রিস্টানেরাও উচ্ছ্বসিতভাবে স্বাগত জানায়। তারা নগরীর বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ব্যান্ডউইন উপলব্ধি করলেন যে নিকট প্রাচ্যে ফ্রাঙ্কদের টিকে থাকতে হলে তাদের প্রয়োজন বন্ধুর। আর যেহেতু ইহুদি আর মুসলিমদের বিবেচনাই করা যায় না, তাই গ্রিক, সিরিয়ান, আর্মেনিয়ান ও ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানেরা হতে পারে সহজাত মিত্র। ব্যান্ডউইনের আর্মেনিয়ান এক স্ত্রী ছিল। ব্যান্ডউইন দাইমবার্টের অবজ্ঞার শিকার প্রাচ্যের খ্রিস্টানদের মন জয় করেছিলেন।

ব্যান্ডউইন ১১ নভেম্বর রাজা দাউদের নগরী বেথলেহেমের ন্যাটিভিটি চার্চে 'ল্যাতিনদের রাজা' হিসেবে মুকুট পরেন। জেরুসালেমে সোনার মুকুট পরতে বা রাজা হিসেবে

অভিহিত হতে তার কোনো অস্বস্তি ছিল না। তার নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা একটির পর একটি দারুণ জয় পায়। ব্যান্ডউইন ১১১০ সালের মধ্যে ক্যাসারিয়া, হাইফা, জাফা, ত্রিপলি, সিডন ও বৈরুত জয় করে। ক্রুসেডারেরা এখন চতুর্থ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এটি ছিল ত্রিপলি দেশ। বিজিত নগরীগুলোতে লোকজনকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়, মসজিদগুলো ধ্বংস করা হয়। ফিলিস্তিনিরা নিরাপত্তার জন্য ইসলামি ভূখণ্ডে পালিয়ে যায়। এসব গণহত্যা ও বাস্তুচ্যুতির ঘটনা পরবর্তীকালে স্থানীয় লোকজনের সাথে ক্রুসেডারদের স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার কাজটি কঠিন করে ফেলেছিল। ক্রুসেডাররা মনে হচ্ছিল অপ্রতিরোধ্য। অবশ্য সেলজুক আমির ও স্থানীয় রাজবংশগুলো কোনো বড় ধরনের প্রতিরোধ গড়তে পারছিলেন না। তারা তখনো ব্যক্তিগত বিবাদে মত্ত ছিলেন। ফলে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বাগদাদ থেকে প্রত্যাঘাতের কোনো আশা ছিল না। খলিফা এখন আরোগ্য-অসম্ভব দুর্বল হয়ে পড়ায় তার পক্ষে অনেক দূরের ফিলিস্তিনের যুদ্ধকে গুরুত্বপূর্ণভাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। পর্যায়ক্রমে ক্রুসেডাররা নিকট প্রাচ্যে প্রথম উপনিবেশ গড়তে সক্ষম হয়েছিল।

ব্যাল্ডউইনকে জেরুসালেমের সবচেয়ে সমস্যাটির সমাধান করতে হয়েছিল। নগরীতে তখনো জনসংখ্যা ছিল অতি নগন্য। ফলে বলা যায় নগরীটি প্রায় জনমানবহীনই ছিল। ফ্রাঙ্করা তখনোও উপকূলের আরো সমৃদ্ধ নগরীগুলোর দিকে ছুটে চলছিল। তারা ছিল প্রধানত কৃষক ও সৈনিক। তারা কারিগর বা শিল্পী ছিল না। ফলে স্থানীয় হালকা শিল্পের ওপর নির্ভরশীল একটি নগরীতে বাস করা তাদের জন্য ছিল কঠিন। ১০৯৯ সালের ‘বিজয়ের আইনের ফলে ক্রুসেডে অংশ নেওয়া লোকজন ভূস্বামী ও বাড়ির মালিকে পরিণত হয়েছিল। তারা এখন ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক ক্রমপরম্পরা থেকে মুক্ত ছিল। আর মুক্ত মানুষ হিসেবে তারা সম্পত্তির মালিক হতে পারত। এসব বারসিজের (পূর্ণস্বশাসিত নগরের অধিবাসী, তারা এভাবেই নিজেদের অভিহিত করত) অনেকে এখন জেরুসালেমে এক বা একাধিক বাড়ি কিংবা আশপাশের এলাকায় এস্টেট বা গ্রামের মালিক। তাদেরকে নগরীতে বাস করানোর লক্ষ্যে ব্যান্ডউইন নতুন একটি আইন করেন। এতে যে লোক এক বছর ও এক দিন কোনো বাড়িতে বাস করলে তাকে ওই বাড়ির মালিকানা দিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে সঙ্কটের সময় লোকজনকে তাদের এস্টেট ত্যাগ

করা থেকে বিরত রাখে এই আশায় যে স্বস্তিদায়ক সময়ে তারা ফিরতে পারবে। এসব অধিকার প্রাপ্ত লোকজন ফ্রাঙ্কিশ জেরুসালেমের মেরুদণ্ডে পরিণত হয়। তারা নগরীতে পাচক, কসাই, দোকানদার ও কর্মকার হিসেবে কাজ করে। তবে তাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না।

ব্যান্ডউইন স্থানীয় খ্রিস্টানদেরকে জেরুসালেমের চার্চ ও মঠগুলোতে ফিরিয়ে আনার আশা করেছিলেন। ১১০১ সালে তিনি সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন, মনে হলো স্বর্গ থেকেই এসেছে তা। ইস্টারের আগের রাতে লোকজন পূর্বের মতোই হলি ফায়ারের অলৌকিকত্বের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিছুই ঘটল না : ঐশী আলো (হলি ফায়ার) আবির্ভূত হতে ব্যর্থ হলো। অনুমান করা হতে লাগল যে গ্রিকরা সাথে করে এই গোপন রহস্য নিয়ে গেছে, তারা এর রহস্য ল্যাতিনদের কাছে ফাঁস করতে চায়নি। এই ব্যর্থতা অলুক্ষুণে মনে হলো : ফ্রাঙ্করা কি কোনোভাবে ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করেছে? বেশ কিছু সময় পর দাইমবার্ট পরামর্শ দিলেন যে ল্যাতিনদের উচিত হবে, তার সাথে টেম্পল অব লর্ডসে যাওয়া। সেখানেই ঈশ্বর সোলায়মানের প্রার্থনার জবাব দিয়েছিলেন। স্থানীয় খ্রিস্টানদেরও প্রার্থনা করতে বলা হলো। পর দিন সকালে ঘোষণা করা হলো যে সমাধির পাশে দুটি আগুনের শিখা আবির্ভূত হয়েছে। স্বর্গ থেকে আসা বার্তার অর্থ স্পষ্ট মনে হলো। আর্মেনিয়ান ইতিহাসবিদ এডেসার ম্যাথু দাবি করলেন যে 'ফ্রাঙ্কদের মঠগুলো থেকে আর্মেনিয়ান, গ্রিক, সিরিয়ান ও জর্জিয়ানদের বহিষ্কার করার ঘটনায়' ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং প্রাচ্যের খ্রিস্টানেরা অগ্নিশিখা কামনা করায় সেটি পাঠিয়েছেন। সমাধির চাবি আবার গ্রিকদের দেওয়া হলো, পবিত্র নগরীর অন্যান্য সম্প্রদায়কে তাদের উপাসনালয়, ও চার্চগুলোতে ফেরার অনুমতি দেওয়া হলো।

এই সময় থেকে জেরুসালেমের রাজা স্থানীয় খ্রিস্টানদের রক্ষাকর্তায় পরিণত হলেন। উচ্চতর পুরোহিত ল্যাতিনই থেকে গেলেন। তবে হলি সেপালচার চার্চে গ্রিক নিয়ম বজায় থাকল। ১০৯৯ সালে মিসরে পালিয়ে যাওয়া জ্যাকোবাইতরা ফিরে এলে তাদেরকে মেরি ম্যাগদালিন মঠে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হলো। আর্মেনিয়ানদের বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করা হলো। কারণ এখন রাজপরিবারে আর্মেনিয়ান সদস্য রয়েছে। ব্যান্ডউইন আর্মেনিয়ার সাথে

বিশেষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করলেন। ফলে সম্প্রদায়টি ও সেন্ট জেমস কনভেন্ট সমৃদ্ধ হলো। গুরুত্বপূর্ণ আর্মেনিয়ান ব্যক্তিত্ব ও অভিজাতেরা তীর্থযাত্রী হিসেবে জেরুসালেমে আসার সময় মূল্যবান উপহার নিয়ে আসতেন। এসবের মধ্যে ছিল এম্ব্রয়ডরি করা পোশাক, সোনার ক্রুস, পানপাত্র, মূল্যবান পাথরে মোড়া ক্রুশ, কনভেন্ট লাইব্রেরি উজ্জ্বল করার পাণ্ডুলিপি। এসব সামগ্রী এখনো উৎসবের দিনে ব্যবহৃত হয়। হলি সেপালচার চার্চে সেন্ট মেরির চ্যাপেলে আর্মেনিয়ানদেরও অভিভাবক করা হয়।

ব্যাল্ডউইন ১১১৫ সালে ট্রান্সজর্ডানের সিরিয়ান খ্রিস্টানদের আমদানি করে জেরুসালেমের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। ক্রুসেডারদের নৃশংসতার পর থেকে এসব লোক মুসলিম বিশ্বে অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়েছিল। ব্যান্ডউইন তাদেরকে নগরীতে প্রলুব্ধ করেন বিশেষ সুবিধা প্রদান ও নগরীর উত্তর- পশ্চিম প্রান্তের ফাঁকা বাড়িঘরগুলোতে তাদের বাস করতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তাদেরকে তাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য চার্চ নির্মাণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হলো। তাদের চার্চ গুলো হলো স্টিফেন্স গেটের কাছে সেন্ট আব্রাহামস ও সেন্ট জর্জেস এবং প্যাট্রিয়ার্কস কোয়ার্টারের কাছে সেন্ট ইলিয়াসেস ও সেন্ট জ্যাকবস।

ব্যাল্ডউইনের নীতি অবশ্যই ফলপ্রসূ হয়েছিল। কারণ, এই পর্যায়ে জেরুসালেমের উন্নতি ঘটেছিল, জনসংখ্যা প্রায় ৩০ হাজারে উন্নীত হয়েছিল। এটি আবারো রাজধানী নগরীতে পরিণত হয়েছিল। তাছাড়া এর ধর্মীয় তাৎপর্য থাকায় এটি হয়েছিল ফ্রাঙ্কিশ রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রধান মেট্রোপলিশ। এটা জেরুসালেমে নতুন জীবন ও আনন্দ বয়ে আনে। অনেক দিক থেকে এটি পাশ্চাত্যের কোনো নগরীর মতোই সংগঠিত হতে থাকে। মুসলিম শরিয়াহ আদালতের স্থলাভিষিক্ত হয় তিনটি ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালত : অভিজাতদের জন্য হাই কোর্ট, বারসিজের জন্য আদালত ও সিরিয়ানদের জন্য আদালত। শেরষাক্ত আদালতটি ছিল স্থানীয় খ্রিস্টানদের জন্য। তারাই এটি পরিচালনা করত। ক্রুসেডারেরা হলি সেপালচারের পাশে পুরনো রোমান ফোরামে ও কার্ডোজুড়ে থাকা বাজারগুলো বহাল রাখে। তারা সম্ভবত স্থানীয় খ্রিস্টানদের কাছ থেকে সুক সংগঠন সম্পর্কে শিখেছিল। কারণ, তারা পল্ট্রি, বস্ত্র, মশল্লা ও খাবারের দোকান আলাদা আলাদা জায়গায় রাখার

প্রাচ্যের ব্যবস্থাটি বহাল রেখেছিল। ফ্রাঙ্ক ও সিরিয়ানরা একসাথে ব্যবসা করত, তবে তারা রাস্তার বিপরীত দিকে অবস্থান করত। জেরুসালেম কখনো বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়নি, কারণ এটি ছিল প্রধান রুটগুলো থেকে অনেক দূরে। ইতালির বিভিন্ন নগরী থেকে আসা বণিকেরা উপকূলীয় নানা শহরে নিজস্ব সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারা জেরুসালেমের নাগরিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও কখনো সেখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাই করেনি। সবসময়ের মতো নগরীটি পর্যটক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল থেকে যায়। জেরুসালেমকে ধর্মীয় নগরী হিসেবে পরিচালনা করার পুরোহিতীয় ধারণাটি ভণ্ডুল করে দিয়েছিল। দাইমবার্টের১৬ কবল থেকে মুক্তি লাভ করা মাত্র তিনি অধীনস্ত ভূমিকায় থাকতে রাজি, এমন প্যাট্রিয়ার্কদের মনোনীত করেন। ১১১২ সাল থেকে পুরনো খ্রিস্টান কোয়ার্টারে প্যাট্রিয়ার্কের পূর্ণ এখতিয়ার ছিল। কিন্তু ব্যান্ডউইন বাকি নগরী শাসন করতেন। সমসাময়িক ইউরোপের যেকোনো নগরীর চেয়ে এই রাজ্য ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে অনেক বেশি স্বাধীন ছিল।

টেম্পলারদের এ সিলটি, এতে দুই নাইটকে একই ঘোড়ায় চড়তে দেখা যাচ্ছে, ধনী ও শক্তিশালী হওয়ার আগে যিশু খ্রিস্টের গরিব সৈন্যদের প্রাথমিক আদর্শবাদ প্রতিফলিত করছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, শুরুতে উগ্র ধর্মীয় বিষয় থাকলেও ক্রুসেডার জেরুসালেম অনেক বেশি সেক্যুলার স্থানে পরিণত হয়েছিল। পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পর ফ্রাঙ্কেরাও একে পাশ্চাত্য নগরীতে পরিণত করার কাজ শুরু করে দেয়। ১১১৫ সালে তারা ডোম অব দি রক নিয়ে কাজ করা শুরু করে। এটি ছিল ফ্রাঙ্কিশ জেরুসালেমে এ স্থানটির গুরুত্ব থাকার আরেকটি নিদর্শন। এই ভবনের ইতিহাস সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা ক্রুসেডারদের ছিল না। তারা বুঝতে পেরেছিল, এটি রাজা সোলায়মানের নির্মাণ করা টেম্পল নয়। তবে তাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে কনস্টানটাইন কিংবা হেরাক্লিয়াস পবিত্র টেম্পলের এই স্থানটির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিলেন একটি ভবন নির্মাণ করে, আর মুসলিমেরা এটি ঈশ্বরের অবমাননা প্রদর্শন করে নিজেদের জন্য ব্যবহার করছিল। ১১১৫ সালে সম্ভবত তারা এর আদি বিশুদ্ধতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে। ডোমের শীর্ষে তারা

একটি ক্রুশ সংযোজন করে, একটি বেদী ও কোইয়ারের জন্য মার্বেল দিয়ে ঢেকে দেয়। আর কোরআনের আয়াতগুলোর স্থানে ল্যাতিন বাণী উৎকীর্ণ করা হয়। এটি ছিল মুসলিম উপস্থিতি মুছে ফেলতে বিশেষ ক্রুসেডার উদ্যোগ। তবে তা ফলপ্রসূ হয়নি কখনো। অবশ্য কারিগরদের দক্ষতা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের। রককে ঘিরে ক্রুসেডারদের নির্মিত গ্রিল ছিল মধ্যযুগের ধাতবশিল্পের টিকে থাকা শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনগুলোর অন্যতম। এতে সময়ও লেগেছিল : 'টেম্পল অব দি লর্ড' ১১৪২ সালের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র করা হয়নি। নতুন চার্চের উত্তরে ক্রুসেডারেরা আগাস্টিয়ানদের জন্য তপস্যা করার জন্য নির্জন স্থান তৈরি করে, ডোম অব দি চেইনকে জেমস ও জাদিককে নিবেদন করা চ্যাপেলে পরিণত করে। জাদিক টেম্পল মাউন্টে শহিদ হয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা হতো।

শুরুতে আকসা মসজিদ সংস্কারের জন্য অর্থ ছিল না। বিজয়ের সময় এটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও লুণ্ঠিত হয়েছিল। ব্যান্ডউইন ছাদের সীসার আস্তরণ পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর ১১১৮ সালে নাইটদের একটি ছোট দল (তারা নিজেদেরকে যিশু খ্রিস্টের 'গরিব সাথী সৈনিক' বা পয়ুর ফেলো সোলজার্স নামে অভিহিত করত) রাজার কাছে নিজেদেরকে পেশ করে দাতব্য পরিষেবার প্রস্তাব দেয়। তারা বেদুইন ও অন্যান্য মুসলিম বেপরোয়া দুর্বৃত্তদের থেকে ফিলিস্তিনের রাস্তাগুলো ও নিরস্ত্র তীর্থযাত্রীদের পাহারা দেবে। রাজ্যের তখন এটিই প্রয়োজন ছিল। ব্যান্ডউইন সাথে সাথে সদরদফতরের জন্য তাদেরকে আকসার একটি অংশ দিয়ে দেন। টেম্পল অব দি লর্ডের খুব কাছাকাছি তারা থাকায় গরিব সৈনিকেরা (পুয়র সোল্ডার্স) টেম্পলার্স হিসেবে পরিচিত ছিল।১৭ এই পর্যায় পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের জন্য অস্ত্র বহন ও যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু চার্চ যখন টেম্পলারদেরকে আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, তখন পবিত্র সহিংসতা কিছুটা মাত্রায় হলেও নিয়মে পরিণত হয়ে যায়। এসব সৈনিক সন্ন্যাসী নতুন ইউরোপের দুটি মহা আবেগ তথা যুদ্ধ ও উপাসনাকে একসাথে ধারণ করতেন। তারা অল্প সময়ের মধ্যেই নতুন নতুন রিক্রুট আকৃষ্ট করেন। তারা রাজ্যের কঠিন জনশক্তি সমস্যার সমাধানে সহায়তা করেন। ১১২০-এর দশকে টেম্পাররা ক্রুসেডরত সেনাবাহিনীতে অভিজাত বাহিনীতে পরিণত হয়। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল পুরোপুরি রক্ষণাত্মক সামরিক উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারা ওই উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়েছিল।

কাকতালীভাবে গরিব নাইটেরা অল্প সময়ের মধ্যেই ধনী হয়ে যান, চার্চের অন্যতম সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রুপে পরিণত হন। তারা আকসায় তাদের সদরদফতর ঘষেমেজে ঝকঝকে তকতকে করে নেন। এটি পরিণত হয় তাদের সামরিক কম্পাউন্ডে। ভূগর্ভস্থ হেরডিয়ান ভল্টগুলো তাদের আস্তাবলে পরিণত হয়। সোলায়মানের আস্তাবল নামে পরিচিত স্থানটিতে তারা সহিসসহ হাজারের বেশি ঘোড়া রাখত। কক্ষগুলোকে আলাদা করতে মসজিদের ভেতরে তরা অভ্যন্তরীণ প্রাচীর নির্মাণ করে : গুদামঘরগুলো অস্ত্রশস্ত্র, শস্য, গোসলখানা, টয়লেটে পরিপূর্ণ ছিল। ছাদে ছিল বিনোদন উদ্যান, প্যাভিলিয়ন, চৌবাচ্চা নির্মাণ করা হয়েছিল। টেম্পলাররা মসজিদের পশ্চিম দিকে একটি নতুন আশ্রম, একটি ভোজনশালা, একটি মদ্য ভাণ্ডার নির্মাণ করেছিল। তারা জাঁকজমকপূর্ণ একটি নতুন চার্চের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছিল। অবশ্য কারিগরি দক্ষতা ছিল উচ্চমানের। বিশেষ করে ভাস্কর্যে 'ওয়েট-লিফ' নক্সা দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। এতে বায়েজান্টাইন, ইসলামি ও রোমান পদ্ধতির চমৎকার সমন্বয় সাধন করা হয়েছিল।

অবশ্য টেম্পলাররা ক্রুসেডার জেরুসালেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছিল। ক্রুসেডে অংশ নেওয়াকে বিবেচনা করা হতে ভালোবাসা প্রকাশের কাজ হিসেবে। পোপ ইউরোপের নাইটদেরকে ইসলামি বিশ্বে তাদের খ্রিস্টান ভাইদের সহায়তার জন্য যেতে বলেছিলেন। পৌত্তলিকদের কবল থেকে খ্রিস্টের পৈত্রিক সম্পত্তি মুক্ত করার চেষ্টায় খ্রিস্টের প্রতি ভালোবাসায় হাজার হাজার ক্রুসেডার মারা গিয়েছিল। ক্রুসেডে অংশ নেওয়াটা সাধারণ মানুষের জন্য এমনকি মঠের আদর্শে বসবাসের মতোই ব্যাপার ছিল।১৮ তবে এই 'ভালোবাসা' প্রকাশিত হয়েছিল সহিংসতা ও নৃশংসতায়। টেম্পলারদের ক্যারিয়ারও গরিব ও নির্যাতিতদের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও উদ্বিগ্ন হওয়ার ধারণাটি দ্রুত বদলে গিয়ে সামরিক আগ্রাসনে পরিণত হয়। হারামে সব ধরনের সহিংসতা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন আকসা সামরিক ছাউনি আর সামরিক অস্ত্রভাণ্ডারে রূপান্তরিত হলো। অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র ইউরোপ অ্যানাস্তাসিসের মডেলে নির্মিত গোলাকার টেম্পলার চার্চে ছেয়ে গেল। এর মাধ্যমে খ্রিস্টানদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো যে পুরো খ্রিস্টান বিশ্ব জেরুসালেম রক্ষায় পবিত্র যুদ্ধের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে।

আমরা একই প্রবণতা দেখি টেম্পলারদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাইটস হসপিটালারদের বেলাতেও। তারা প্যাট্রিয়ার্কস কোয়ার্টারের সেন্ট জন দি অ্যালমনারের পুরনো ল্যাতিন হসপিসে ঘাঁটি গেড়েছিল। মঠাধ্যক্ষ গেরার্ড জেরুসালেম অবরোধের সময় ও বিজয়ের পর ক্রুসেডারদের সহায়তা করেছিলেন। গরিব ও অভাবগ্রস্তদের পরিচর্যা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভবকারী একদল নাইট ও তীর্থযাত্রী তার সাথে যোগ দিয়েছিল। এরপর থেকে নাইটেরা আর কখনো পরিচর্যার কায়িক শ্রমের কাজে নিজেদেরকে অসম্মাজনক মনে করার স্বপ্ন দেখেনি। তবে গেরার্ডের অধীনে তারা স্বেচ্ছায় গরিবদের সাধারণ জীবনযাপন করত, নিজেদেরকে দাতব্য কাজে নিবেদিত করত। টেম্পলারদের মতো হসপিটালারাও পবিত্র দারিদ্র্যের আদর্শে উজ্জীবিত ছিল। প্রথম ক্রুসেডে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবার হসপিটালাররাও ফিলিস্তিন ও ইউরোপে নানা পেশার লোকজনকে আকৃষ্ট করেছিল। ১১১৮ সালে গেরার্ড মারা যান, তার স্থলাভিষিক্ত হন লে পুইয়ের রেমন্ড। তিনি এই গ্রুপকে ইউরোপে ছড়িয়ে দিতে অনেক অবদান রাখেন। তবে টেম্পলারদের মতো হসপিটালরাও ছিল পুরোপুরি জেরুসালেমকেন্দ্রিক। তাদের শাসনে আউট্রেমার (‘বিদেশ’) বলতে বোঝাত ইউরোপ। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝিতে হসপিটালররাও সৈনিকে পরিণত হয়, তারাও ক্রুসেডরত সেনাবাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করত, তাদের দাতব্য কাজ অনিবার্যভাবে সামরিকবাদের পথ ধরে। অবশ্য তারা কখনো দাতব্য কাজ পরিত্যাগ করেনি। হলি সেপালচারের দক্ষিণে তাদের জন্য নির্মাণ করা বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ কম্পাউন্ডে পুরুষ নার্সেরা সারা বছর হাজার হাজার লোকের পরিচর্যা করত, গরিবদেরকে বেশ বড় ধরনের দান-খয়রাত, পোশাক, খাবার দিত। হলি সেপালচারের খুব কাছে থেকেই হসপিটাল ক্রুসেডের আরো বেশি আকর্ষণীয় অবনবের প্রতিনিধিত্ব করত।

জেরুসালেমের এসব খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীর মতো ক্রুসেডাররাও বিশ্বাস করত যে তারা যিশুর পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। তারা তাদের ক্রুশ (তাদের অভিযানের শুরুতে তাদের পোশাকে লাল ক্রুশ যত্নের সাথে লাগাত) গ্রহণ করেছিল, পবিত্র নগরীর জন্য ও প্রতিরক্ষায় তাদের জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিল। তাদের তরবারিই ছিল তাদের স্বপ্নাবিভাবের কেন্দ্রবিন্দু।

তীর্থযাত্রীরা সবসময়ই হসপিটালদের প্রতিই সবচেয়ে মুগ্ধ হতো। তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জেরুসালেম আবিষ্কার করতে শুরু করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বায়েজান্টাইনরা টেম্পল মাউন্টে কখনো তীর্থযাত্রীদের চালিত করেনি। তারা স্থানটিকে স্রেফ ইহুদি ধর্মের পরাজয়ের প্রতীক হিসেবে দেখেছিল, তাদের উপাসনাব্যবস্থায় টেম্পল মাউন্টের কোনো স্থান ছিল না। তবে ১১০২ সালের শুরুর দিকে ব্রিটিশ তীর্থযাত্রী সাইউলফ জেরুসালেম সফরের সময় গর্বভরে হারামের উপাসনাগুলো ঘুরে দেখেন। স্থানটি অল্প সময়ের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেছিল। এখন গেট অব মার্সিকে ভার্জিন মেরির মা-বাবা জোয়াকিম ও আনার প্রথম সাক্ষাতের স্থান হিসেবে দেখা হতে লাগল। হারামের আরেকটি ফটক ছিল 'বিউটিফুল গেট।' এখানে সেন্ট পিটার ও সেন্ট জন এক পঙ্গুকে সুস্থ করেছিলেন। ডোম অব দি রক এখন টেম্পল হিসেবে পূজনীয় হয়ে ওঠল। তারা মনে করতে লাগল, এখানে যিশু তার সারা জীবন প্রার্থনা করেছেন। রকে তার পদাঙ্ক দেখা যেত। ক্রুসেডারদের উপাসনাব্যবস্থায় হারাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।১৯ তাদের সব গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে 'টেম্পল অব দি লর্ডে' শোভাযাত্রা অন্তর্ভুক্ত থাকত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পাম সানডে উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এ স্থানটিই। নগরীর ধর্মীয় জীবনে আরেকটি পরিবর্তন এসেছিল। তা হলো প্যাসনের অনেক স্থান, যা আগে মাউন্ট সায়নে ছিল, এখন শহরে উত্তরে সরে গিয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে সাইউলফ দেখেছিলেন, যে স্তম্ভের যিশুকে চাবকানো হয়েছিল, সেটি এখন মাউন্ট সায়নের বদলে হলি সেপালচার চার্চে অবস্থিত। তীর্থযাত্রীরা ভাবতে শুরু করেছিল প্রায়েটোরিয়াম (পিলেত যেখানে যিশুকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন) অ্যান্টোনিয়া দুর্গে অবস্থিত। আগে মনে করা হতো, স্থানটি টাইরাপোয়েন ভ্যালিতে অবস্থিত। এই পরিবর্তনে টেম্পলররা উদ্দীপ্ত হয়েছিল। তারা হয়তো চেয়েছিল এ পবিত্র স্থানটি তাদের জেরুসালেম এলাকার মধ্যে থাকুক।

প্রথম ব্যান্ডউইন মারা যান ১১১৮ সালে। তার উত্তরসূরি হন তার কাজিন এডেসার কাউন্ট লে বার্গের ব্যান্ডউইন। তিনি ধার্মিক, সেইসাথে পরিবারবৎসল লোক ছিলেন। তিনি তার আর্মেনিয়ান স্ত্রী ও চার মেয়ের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। ব্যান্ডউইনই প্রথম রাজা হিসেবে বেথলেহেম ব্যাসিলিকার বদলে হলি সেপালচার চার্চে মুকুট পরেছিলেন। তিনি

রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা বের করেন। এসময় বেলকনি ও ছাদগুলো প্রাচ্যের কম্বলের সাথে ফেস্টুন শোভা পেয়েছিল। জেরুসালেমের প্যাট্রিয়ার্ক, বিশপ ও ল্যাতিন ও স্থানীয় পুরোহিতদের উপস্থিতিতে তিনি খ্রিস্টের সমাধির সামনে চার্চ, পাদ্রি, বিধবা ও এতিমদের রক্ষা করার সংকল্প ব্যক্ত করেন। তিনি প্যাট্রিয়ার্কের অনুগত থাকার শপথও গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের পর রাজা টেম্পল অব দি লর্ডের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে তিনি তার মুকুটটি বেদীতে রাখেন। তারপর আকসায় নগরীর নাগরিকদের আয়োজিত ভোজসভায় অংশ নেন। ১১২০ সালে ব্যান্ডউইন তার আকসার বাড়ি খালি করে পুরো মসজিদটি টেম্পলারদের দিয়ে দেন। তিনি নগরদুর্গের কাছে নতুন একটি প্রাসাদে ওঠেন। এখানে তিনি ক্রুসেডার জেরুসালেমের আরো কাছাকাছি অবস্থান করতে থাকেন।

ব্যান্ডউইন ১১২০ সালে নাবলুস কাউন্সিলে যোগ দেন। এটি ছিল অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রজন্মের অনেকের স্থানীয় সংস্কৃতিতে মিশে যাওয়া হ্রাস করার চেষ্টা। ক্রুসেড রাজত্বের প্রথম দিকে চারত্রেজের ফুলচার ইউরোপের লোকজনকে উদ্দীপ্তভাবে বলেছিলেন : ‘পাশ্চাত্যবাসীরা, আমরা প্রাচ্যের লোক হয়ে গেছি! গতকাল যারা ইতালিয়ান আর ফরাসি ছিল, আজ তারা বদলে গিয়ে গ্যালিলি আর ফিলিস্তিনি হয়ে গেছি।২০ তার এ মন্তব্য নিশ্চিতভাবেই অতিরঞ্জিত ছিল। তবে সময়ের পরিক্রমায় ফ্রাঙ্করা বদলে গিয়েছিল। একটি পুরো প্রজন্ম প্রাচ্যে জন্মগ্রহণ করেছিল। ইউরোপ নিয়ে তাদের কোনো স্মৃতি ছিল না। তারা নিয়মিত গোসল করত, যা পাশ্চাত্যে প্রায় অশ্রুতই ছিল; তারা কাঠের চালাঘরের বদলে বাড়িতে বাস করত, নরম পোশাক ও কেফিয়ে পরত। তাদের স্ত্রীরা মুসলিম নারীদের মতো বোরকা পরত। দেশ থেকে আসা তীর্থযাত্রীদের এটি কষ্ট দিত : ফিলিস্তিনের ফ্রাঙ্করা মনে হচ্ছে স্থানীয় হয়ে গেছে। স্থানীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করার কারণ হলো, জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে ইউরোপের চেয়ে ইসলামি বিশ্ব অনেক এগিয়ে ছিল। কিন্তু রুঢ় প্রকৃতির এসব খ্রিস্টানের কাছে প্রাচ্যের ব্যবস্থা গ্রহণকে অবনতি ও জীর্ণ জীবনধারা মনে হতো। অনেক ফিলিস্তিনি ফ্রাঙ্ক বুঝতে পেরেছিল যে তাদেরকে টিকে থাকতে হলে তাদেরকে খাপ খাইয়ে নিতেই হবে। তাদেরকে মুসললিমদের সাথে বাণিজ্য করতে হবে, স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দ্বিতীয় ব্যান্ডউইন এমনকি জেরুসালেম থেকে ইহুদি ও মুসলিমদেরকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা

পর্যন্ত অবলম্বন করেছিলেন। মুসলিমদেরকে এখন খাদ্য এনে নগরীতে বিক্রি করার, সীমিত সময়ের জন্য সেখানে থাকার অনুমতি দেওয়া হতো। ১১৭০ সাল নাগাদ একটি ইহুদি রঞ্জক পরিবার রাজপ্রাসাদের কাছে বসবাসও করছিল।

কিন্তু এই একীভূত ছিল কৃত্রিম। ১১২০-এর দশকে বৈরী মুসলিমবিশ্বের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে ফ্রাঙ্করা তাদের রাজ্য ঘিরে পুরনো দুর্গগুলো ব্যবহারোপযোগী ও নতুন প্রাসাদের বৃত্ত তৈরি করতে থাকে। মালে আদুমিন, জেরিকো রোডের ওপর, হেবরন, বেথানি, নবি সামউইল, আল-বিরাহ ও রামাল্লায় জেরুসালেমকে ঘিরে সুরক্ষিত চার্চ ও মঠের সারি গড়ে ওঠতে থাকে। পাশ্চাত্য খ্রিস্টান ও ইসলামের মধ্যে বিরাজমান ঘৃণার প্রতিবন্ধকতা ক্রুসেডাররা না ভেঙে বরং তাদের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে বিশাল বিশাল পাথুরে প্রাচীর নির্মাণ করতে থাকে। তাদের রাজ্যগুলো কৃত্রিম পাশ্চাত্য ছিটমহলে পরিণত হয়ে ওই অঞ্চলে পরদেশী ও অনিষ্টকর হিসেবে বিরাজ করতে থাকে। এগুলো ছিল আগ্রাসীভাবে ও অব্যাহতভাবে আক্রমণ শানাতে প্রস্তুত সামরিক রাজ্য। দ্বাদশ শতক ছিল ইউরোপের বিপুল সৃষ্টিশীলতার সময়। তবে ওই সৃষ্টিশীলতা ক্রুসেডার রাজ্যগুলোতে দেখা যায়নি। তাদের প্রধান উদ্ভাবন ছিল সামরিক গ্রুপ ও সামরিক স্থাপত্য। তাদের প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক আবেগ ছিল পাশ্চাত্যের আইন। ফ্রাঙ্করা কখনো নিকট প্রাচ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির খোঁজ করার সত্যিকারের কোনো চেষ্টা করেনি। ফলে সত্যিকারের কোনো শিকড়ের সন্ধান পায়নি। তাদের কর্মশক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল টিকে থাকা নিয়ে এবং তারা যেসব সমাজ সৃষ্টি করেছিল, সেগুলো অনিবার্যভাবে ছিল তাদের আশপাশের অঞ্চলের বিরুদ্ধে কৃত্রিমভাবে সংরক্ষিত।

অবশ্য ক্রুসেডাররা সৃষ্টিশীল হতে এবং তাদের জয় করা ভিন দেশে তাদের চিহ্ন রেখে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। ১১২৫ সালে ফ্রাঙ্করা জেরুসালেমে ব্যাপক নির্মাণ কর্মসূচি শুরু করে। ফিলিস্তিনে তারা যত নির্মাণ করেছে, ততটা এমনকি হেরড ও করেননি। পবিত্র ভূমিতে ইউরোপ নির্মাণ করার মাধ্যমে তারা দেশকে অনুভব করার চেষ্টা করেছে। ফলে তাদের ভবন ও চার্চগুলোতে খুব কমই বায়েজান্টাইন বা মুসলিম চিহ্ন দেখা গেছে। আবার ক্রুসেডাররা ইউরোপের নতুন স্থাপত্য বিকাশ সম্পর্কেও অবগত ছিল না। তারা

রোমানেসকিউ সময়ে আটকে থেকে যায়, গোথিকের স্পর্শ পায়নি, তাদের তৈরি ভবনগুলো ক্রুসেড আমলের আগে দেশে যে ধরনের ছিল, সে ধরনের দেখাতে থাকে। প্রথমে তারা বিশালভাবে হলি সেপালচার চার্চ পুনঃনির্মাণ করা শুরু করে। এটি ১১৪৯ সালে নগরী দখল করার পঞ্চাশতম বার্ষিকীর সময় সমাপ্ত হয়। তারপর তারা বাথ-হেসদা পুলের পাশে ভার্জিন মেরির মা সেন্ট আনাকে নিবেদন করে অনিন্দসুন্দর রোনাসেকিউ নির্মাণ করে। খ্রিস্টানেরা ষষ্ঠ শতক থেকে ভার্জিনের জন্মস্থান হিসেবে শ্রদ্ধা করছিল। এখন এটি বেনেডিকটাইন কনভেন্ট ও চার্চে পরিণত হয়েছে। তাদের নির্দয়তা ও ভীতি সত্ত্বেও ফ্রাঙ্করা তখনো আধ্যাত্মিকতার কিছুটা ধারণ করত। সেন্ট আনা চার্চে চোখটি সরাসরি উচ্চ বেদিতে টানা হয়েছে কেন্দ্র থেকে স্তম্ভের সারির মাধ্যমে; একেবারে সাদামাটার অর্থ হলো কোনো বিচ্যুতি ঘটবে না, তবে বিভিন্ন দিক থেকে চার্চে ফেলা আলো ছায়ার সূক্ষ্ম প্যাটার্ন ও দূরত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করবে।

ফ্রাঙ্করা কিদরন ভ্যালি ও মাউন্ট অলিভেসের গেথসেমেন ও ভার্জিন মেরি সমাধির চার্চাগুলোও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এসব চার্চে ক্রুসেডাররা মঠ নির্মাণ করে, ফ্রেসকো ও মোজাইক দিয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষ সজ্জিত করে। গোলাকার অ্যাসেনসন চার্চও পুনঃনির্মাণ করা হয়, প্যারিসিয়ান মার্বেল দিকে সাজানো হয়। এ চার্চটিও ক্রুসেডারদের যুদ্ধ মেশিনের অংশে পরিণত হয়, তাদের যুধ্যমান ধর্মানুরাগ প্রতিফলিত করে। তীর্থযাত্রী থিওডোরিচ আমাদের বলছেন যে এটি ছিল ‘পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে ছোট বড় নানা টাওয়ার, প্রাচীর ও গুলিবর্ষণের ছিদ্র, নৈশ টহল-সজ্জিত শক্তিশালীভাবে সুরক্ষিত।২১ ৬১৪ সালে পারসিকরা ইলেয়না ব্যাসিলিকা ধ্বংস করেছিল। এটি আর কখনো পুনঃনির্মিত হয়নি। ক্রুসেডাররা এ স্থানে দুটি চার্চ নির্মাণ করে লর্ডস প্রেয়ারের যিশুর শিক্ষা ও শিষ্যদের প্রতি অ্যাপসলের ক্রিডের স্মরণে। হলি সায়নের ব্যাসিলিকাটি ধ্বংস করেছিলেন আল- হাকিম। এটি আর কখনো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখন ক্রুসেডাররা কয়েকটি চার্চকে (চ্যাপেল অব স্টিফেন-ইউদোকিয়ার চার্চে স্থানান্তরের আগে এখানে শহিদের লাশ রাখা হয়েছিল, লাস্ট সাপারে আপার রুম এবং এর ঠিক পাশে থাকা চ্যাপেল অব পেন্টেকস্ট, আত্মার অবতরণের ছবি অঙ্কিত) ঘিরে ‘মাদার অব অল দি চার্চেস’ সংস্কার করে। মেঝের নিচে ছিল ‘গ্যালিলি চ্যাপেল’। এখানে পুনরুত্থানের পর এখানেই যিশু তাঁর শিষ্যদের সামনে আবির্ভূত

হয়েছিলেন। ২২ এ চ্যাপেলটি পুনঃগঠনের সময় ক্রুসেডাররা আবিষ্কার করে যে এখানে কিভাবে কাজ করতে হবে তা তারা জানে না। প্রাচীন প্রাচীরগুলোর একটি ধসে গেলে একটি গুহা বের হয়ে আসে। এতে একটি সোনার মুকুট ও একটি রাজদণ্ড পাওয়া যায়। বর্তমানে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে এটি সম্ভবত প্রাচীন কোনো সিনাগগ ছিল। মিস্ত্রি আতঙ্কে প্যাট্রিয়ার্কের কাছে ছুটে যায়। তিনি বিষয়টি নিয়ে কারাইত সন্ন্যাসীর সাথে পরামর্শ করেন। তারা সিদ্ধান্ত নেন যে দাউদ ও জুদার রাজাদের সমাধির সন্ধান পাওয়া গেছে। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত লোকজন মাউন্ট সায়নকে ওফেল পাহাড়ে থাকা মূল ইর ডেভিডের সাথে গুলিয়ে ফেলেছিল। দীর্ঘ দিন ধরে ধারণা করা হচ্ছিল যে পশ্চিম ফটকের পাশে থাকা দুর্গটি দাউদের দুর্গ এবং হেরডের হিপিকাস টাওয়ারটি সাধারণভাবে পরিচিত ছিল দাউদের টাওয়ার হিসেবে। ফলে সম্ভবত অনিবার্য ছিল যে একদিন কেউ মাউন্ট সায়নে তার সমাধিটি 'আবিষ্কার' করবে। গুহাটিতে অনুসন্ধান চালাতে চেয়েছিলেন প্যাট্রিয়ার্ক। কিন্তু মিস্ত্রিরা ছিল খুবই ভীত। এ কারণে প্যাট্রিয়ার্ক 'স্থানটি বন্ধ করে আড়ালে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন ইহুদি পর্যটক তুরেদার বেনিয়ামিন। তিনি ১১৭০ সালে জেরুসালেম গিয়েছিলেন। তার মতে, 'এ কারণে বর্তমান সময়ে দাউদ ও জুদার রাজাদের সমাধির সন্ধান পাওয়া যায় না।২৩ অবশ্য পরে ক্রুসেডাররা দাউদের সমাধির সন্ধান পেয়েছিল। তখন তারা একে হলি সায়নের ব্যাসিলিকার অংশে পরিণত করেছিল। তবে পরে এ নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছিল।

দ্বিতীয় ব্যান্ডউইন মারা যান ১১৩১ সালে। তার উত্তরসূরী হন তার বড় মেয়ে মেলিসেন্দে ও তার স্বামী আনজুর কাউন্ট ফাল্ক। ফাল্ক ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তিনি মধ্য বয়সে জেরুসালেম রক্ষায় তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। রাজ্যের তখন একজন শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কারণ প্রথমবারের মতো নিকট প্রাচ্যের ইতিহাসে একজন শক্তিশালী মুসলিম শাসকের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি হলেন ইমাদ উদ্দিন জাঙ্গি। তিনি ছিলেন মসুল ও আলেপ্পোর তুর্কি কমান্ডার তিনি আমিরদের গৃহবিবাদে অশান্তিতে নিমজ্জিত এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। ধীরে ধীরে ও পরিকল্পিতভাবে জাঙ্গি সিরিয়া ও ইরাকের স্থানীয় গোষ্ঠীপতিদের বশ মানাতে থাকেন। বাগদাদের সমর্থন নিয়ে তিনি একে একে তাদেরকে তার কর্তৃত্বে নিয়ে আসেন। ফ্রাঙ্কদের দখলে থাকা ভূখণ্ড

পুনরুদ্ধারে জাঙ্গি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন না। তার হাত তখন অবাধ্য মুসলিম আমিরে ভর্তি। তবে ফ্রাঙ্করা জাঙ্গির ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিল। ফাল্ক আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে আরো ভালোভাবে রাজ্যের সীমান্তগুলো সুরক্ষিত করেন, ১১৩৭ সালে বেথ-গিবরিনের সীমান্ত প্রসাদে হসপিটালারদের গ্যারিসন করেন। ওই বছর তিনি দামাস্কাসের প্রিন্স উনারের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। এই নগরী যাতে জাঙ্গির সাম্রাজ্যে হজম হয়ে না যায়, সে ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন উনার।

ক্রুসেডারদের যুধ্যমান ধর্মানুরাগ ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমরা এমনটি দেখি ফ্রান্সের ক্রেসাকের টেম্পলার চার্চে। এর প্রাচীরগুলো পুরোপুরি এমনসব ফ্রাসকোতে পরিপূর্ণ, যাতে দেখা যাচ্ছে যে নাইটেরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে জেরুসালেম যাচ্ছে।

এই চুক্তির আলোচনায় অংশ নেওয়া কূটনীতিকদের একজন ছিলেন সিরিয়ার প্রিন্স উসামা ইবনে মুনদিক। চুক্তি সইয়ের পর তাকে ফ্রাঙ্কিশ ফিলিস্তিনে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি আমাদের জন্য তার স্মৃতিকথা রেখে গেছেন। এতে হঠাৎ করে মুসলিম অঞ্চলে এসে পড়া পাশ্চাত্যের লোকজন সম্পর্কে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। পরিমার্জিত, অমায়িক উসামা ফ্রাঙ্কদের নিয়ে ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাদের শারীরিক সাহসের প্রশংসা করলেও তাদের সেকেলে চিকিৎসাব্যবস্থা, নারীদের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ, তাদের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা দেখে আতঙ্ক বোধ করেন। কোনো এক তীর্থযাত্রী উসামার ছেলেকে পাশ্চাত্যে পড়াশোনার জন্য ইউরোপে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়েছিলেন। ফ্রাঙ্কদের দেশে থাকার চেয়ে তার ছেলে কারাগারেও ভালো থাকবে বলে তার মনে হয়েছিল। অবশ্য তবুও তিনি স্বীকার করেছেন যে প্রাচ্যে জন্মগ্রহণ করা ফ্রাঙ্করা নবাগতদের চেয়ে ভালো। তার মনে হয়েছে, নবাগতরা ইউরোপের আদি বদ্ধ সংস্কারে পরিপূর্ণ। তিনি নির্দেশনামূলক উদাহরণ দিয়ে তার অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরেছেন। তিনি জেরুসালেমের টেম্পলারদের সাথে বন্ধুত্ব গড়েছিলেন। তিনি যখনই আকসায় তাদের কাছে গেছেন, তারা তার নামাজের জন্য ছোট একটু জায়গার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। একদিন মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার সময় এক ফ্রাঙ্ক তার কক্ষে ছুটে এসে উসামাকে শূন্যে তুলে জোর করে তাকে পূর্ব দিকে মুখ করে দেয় : এদিকে মুখ করে

প্রার্থনা করতে হয়। তিনি ব্যাখ্যা করেন। টেম্পলাররা দ্রুত ছুটে এসে লোকটিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু 'তারা সরে যাওয়া মাত্র লোকটি আবারো একই কাজ করে। টেম্পলাররা লজ্জা পেয়ে ব্যাখ্যা করে বলে যে এই লোক বিদেশী; মাত্র আজই তার উত্তরের দেশ থেকে এখানে এসেছে। সে কখনো কাউকে পূর্ব দিক ছাড়া অন্য কোনো দিকে মুখ করে প্রার্থনা করতে দেখেনি। উসামা মর্যাদার সাথে নামাজ শেষ করে বলেন, আমি নামাজ শেষ করলাম। লোকটির মূর্খতায় আমি অবাক হয়ে গেলাম। কাউকে কিবলার দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে থেকে সে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিল, কষ্ট পেয়েছিল।

মা ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করা ও এই কাহিনীতে থাকা টেম্পলারদের মতো যেসব ফ্রাঙ্ক মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করত ও তাদের প্রতিবেশীদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চাইত এবং অন্য ধর্মের সাথে সহাবস্থানকে অসম্ভব বিরেচনাকারী ইউরোপ থেকে আসা নবাগতদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জেরুসালেম রাজ্য ক্রমবর্ধমান হারে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই কোন্দল এমন একসময় বাড়ছিল যখন তাদের মুসলিম প্রতিবেশীরা অন্তত তাদের ধ্বংসাত্মক দলাদলি বাদ দিয়ে একজন শক্তিশালী নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল। ১১৪৪ সালে ফ্রাঙ্করা এক আঘাত পায়। তারা যে কতটা অরক্ষিত, সেটিই এই আঘাত দেখিয়ে দেয়। ওই বছরের নভেম্বরে দামাস্কাসের বিরুদ্ধে অভিযানকালে জাঙ্গি ক্রুসেডারদের নগরী এডেসা জয় করে ফ্রাঙ্কিশ রাজ্যটি ধ্বংস করে দেন। মুসলিম বিশ্বে উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে। মদ্যপায়ী, নির্দয় যোদ্ধা জাঙ্গি হঠাৎ করেই ইসলামের বীর হিসেবে নিজেকে দেখতে পান। দুই বছর পর তিনি নিহত হলে তার স্থলাভিষিক্ত হন তার ছেলে মাহমুদ। তিনি সাধারণভাবে তার নূর উদ্দিন (বিশ্বাসের আলো) পদবিতেই বেশি পরিচিত। নূর উদ্দিন ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ সুনি। তিনি ফ্রাঙ্ক ও শিল্পা উভয়ের বিরুদ্ধে জিহাদে নিয়োজিত থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি মুহাম্মদের (সা.) মিতব্যয়ী জীবনযাপন করতেন, গরিবদের বিপুল পরিমাণে অর্থ দান করতেন। তিনি জিহাদের জন্য কার্যকর প্রপাগান্ডা অভিযান করেছিলেন। পবিত্র কোরআন সব ধরনের যুদ্ধকে অপছন্দনীয় হিসেবে অভিহিত করে পরিহার করতে বলা হয়েছে, তবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, দুঃখজনকভাবে, কিছু কিছু সময়ে সুস্থ মূল্যবোধগুলো রক্ষা করতে নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজন পড়ে। যদি মানুষ হত্যা করা হয়, তাদেরকে

তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়, তাদের উপাসনার স্থান ধ্বংস করা হয়, তবে মুসলিমদের উচিত হবে আত্মরক্ষার্থে ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ করা।' কোরআনের এই বিধিনিষেধ ক্রুসেডারদের ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে প্রয়োগযোগ্য। তারা লাখ লাখ মুসলিমকে হত্যা করেছে, তাদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের মসজিদ জ্বালিয়ে দিয়েছে। তারা আল-কুদসের হারামেরও অবমাননা করেছে। নূর উদ্দিন জেরুসালেমের প্রশংসাসূচক রচনা ফাজায়েল আল-কুদস প্রচার করেন, ফ্রাঙ্কদের কবল থেকে জেরুসালেম মুক্ত করার পর আকসা মসজিদে স্থাপনের জন্য একটি সুন্দর মিম্বার তৈরি করেন।

জিহাদের চর্চা নিকট প্রাচ্যে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্য ক্রুসেডারদের নির্দয় আগ্রাসন সেটিকে আবার উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু তাদের অনড় বদ্ধসংস্কারের কারণে নূর উদ্দিনের আবেদনে কার্যকর কোনো সাড়া মেলেনি। ১১৪৮ সালে দ্বিতীয় ক্রুসেডের সেনাবাহিনী যখন অবশেষে ফিলিস্তিনে অবতরণ করে, তখন চাপে থাকা ফ্রাঙ্করা স্বস্তি পায়। তবে তারা আলেপ্পোতে নূর উদ্দিনকে হামলা করার বদলে মুসলিমবিশ্বে তাদের একমাত্র মিত্র দামাস্কাসের উনারের বিরুদ্ধে এগিয়ে যায়। এর ফলে, উনারের কাছে নূর উদ্দিনের সহযোগিতা কামনা করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প খোলা রইল না। ক্রুসেডাররা এরপর দামাস্কাস অবরোধে চূড়ান্ত ধরনের অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাদের মূর্খতায় নিমজ্জিত হয়। পরিণতিতে অপমানজক ব্যর্থতা বরণ করতে হয় তাদেরকে। দ্বিতীয় ক্রুসেড প্রমাণ করে যে ইসলামি বিশ্বের প্রতি ফ্রাঙ্কদের বৈরিতা তাদেরকে আত্মঘাতী দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই অঞ্চল থেকে তাদের নিঃসঙ্গতার আরেকটি অর্থ ছিল তারা নিকট প্রাচ্যের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে পারেনি।

দ্বিতীয় ক্রুসেডের ব্যর্থতা অবশ্যই ১১৪৯ সালের ১৫ জুলাই নগরী বিজয়ের ৫০তম বার্ষিকীতে হলি সেপালচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত চার্চের উৎসর্গকে তিক্ত করেছিল। অনুষ্ঠানের পর লোকজন শোভাযাত্রা করে টেম্পল অব দি লর্ডে যায়, কিদরন ভ্যালি সফর করে। জেরুসালেম যুদ্ধে নিহত ক্রুসেডারদের এখানেই সমাহিত করা হয়েছিল। তাদের শোভাযাত্রা শেষ হয় উত্তর প্রান্তের প্রাচীরের মোড়ে। এখান দিয়েই ১০৯৯ সালে গডফ্রের

সৈন্যরা নগরীতে প্রবেশ করেছিল। সাম্প্রতিক ব্যর্থতার সাথে তুলনা অবশ্যই বেদনাদায়ক হয়েছিল। অবশ্য নতুন চার্চটি হয়েছিল বিরাট কিছু। ক্রুসেডাররা সেখানকার সব ভগ্ন উপাসনালয়কে এক বিশালাকার রোমানেস্ক ভবনের মধ্যে এনেছিল। এসবের মধ্যে ছিল খ্রিস্টের কবর, গলগোথার টিলা ও যে ভূগর্ভস্থ কক্ষে হেলেনা ট্রু ক্রুসটি পেয়েছিলেন বলে ধরা হয় সেটি। (দেখুন ডায়াগ্রাম।) তারা একাদশ শতকে কনস্টানটাইন মোনোমারচুসের বানানো রোতানদাকেও তাদের নতুন চার্চের ভেতরে নিয়ে এসেছিল। পুরনো আঙিনার স্থানে এ স্থাপনাটি একটি উঁচু বড় খিলানের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছিল I পাশ্চাত্যের স্থাপত্য যদিও বায়েজান্টাইনের সাথে সঙ্ঘাত সৃষ্টি করেনি, স্থানীয় স্টাইলের সাথে সমন্বয় সাধনের ক্রুসেডাদের প্রয়াস ছিল এমন এক কৃতিত্ব যা তারা জীবনে অর্জন করতে পারেনি। সমাধির যা অবশিষ্ট ছিল তা একটি মার্বেল স্ল্যাব দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। পরে এতে সোনার একটি আবরণ দেওয়া হয়। মোজাইক ও রঙিন মার্বেলের স্ল্যাবে প্রাচীরগুলো এমনভাবে সাজানো হয় যে তা হয়ে পড়ে দুর্দান্ত ও রাজসিক। বর্তমানের স্বল্পালোকিত ভবনে এর জাঁকজমকতা কল্পনা করা কঠিন।

নূর উদ্দিন তার অভিযান অব্যাহত রাখেন। তার পরিকল্পনা ছিল জিহাদে নিবেদিত একটি মুসলিম সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ফ্রাঙ্কদের ঘিরে ফেলা। তবে জেরুসালেম রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। মনে হতে থাকে ক্রুসেডার রাজ্যগুলোর জীবনের প্রতিটি বিভাগে থাকা আগ্রাসন তাদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে তাড়া করতে থাকে। ১১৫২ সালে তরুণ রাজা তৃতীয় ব্যান্ডউইন তার মা মেলিসিন্দের সাথে সঙ্ঘাতে জড়িয়ে পড়েন। মেলিসিন্দে তার ছেলের বিরুদ্ধে জেরুসালেমকে সুরক্ষিত করতে থাকেন। গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠতে থাকায় জেরুসালেমের নাগরিকেরা মেলিসিন্দকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। টেম্পলার ও হসপিটালাররাও সহিংস বিরোধিতায় মত্ত হয়ে ওঠে। তাদের কেউই রাজা ও প্যাট্রিয়ার্কের কাছে আনুগত্য স্বীকার করেনি। হসপিটালাররা তাদের কমপ্লেক্সে একটি টাওয়ার নির্মাণ করে। এটি হলি সেপালচারের চেয়ে উঁচু ছিল। এটি ছিল পরিকল্পিতভাবে একটি অবমাননা ও অবাধ্যতামূলক কাজ। তারা হলি সেপালচারের উপাসনা কার্যক্রমও ভণ্ডুল করে দিচ্ছিল। টায়ারের উইলিয়াম আমাদের বলেন যে প্যাট্রিয়ার্ক বক্তৃতা দিতে উঠামাত্র তারা ‘তাদের বিশাল বিশাল ঘণ্টাগুলো অব্যাহতভাবে প্রচণ্ড শব্দে বাজাতে থাকত

যাতে প্যাট্রিয়ার্কের কণ্ঠস্বর হট্টগোলে শোনাই না যায়। প্যাট্রিয়ার্ক তাদের কাছে জোরালো প্রতিবাদ জানালে তারা তীব্রবেগে হলি সেপালচারে ছুটে গিয়ে তীরের বন্যা বইয়ে দেয়। ২৬ স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে, পবিত্র নগরীতে বসবাস করা সত্ত্বেও কোনোভাবেই ক্রুসেডারদেরকে ভালোবাসা ও মানবিকতার খ্রিস্টের মূল্যবোধ অনুসরণ করতে উদ্দীপ্ত করেনি।এটা।

রাজ্যটির প্রাণঘাতী অনৈক্য তিক্ত পরিণতির দিকে যেতে থাকে, খ্রিস্টানেরা তুচ্ছ বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে শক্তি ক্ষয় করতে থাকে। নূর উদ্দিন যাতে ফাতেমি মিসর জয় করতে না পারেন, সেজন্য ফ্রাঙ্করা আগেই সেটি দখল করার পরিকল্পনা করে। কিন্তু কুর্দি জেনারেল শিরকুহ সেটি জয় করলে ক্রুসেডারদের উদ্যোগ ভণ্ডুল হয়ে যায়। তার ভাইয়ের ছেলে ইউসুফ বিন আইয়ুব ১৯৭০ সালে উজির হিসেবে শিরকুহর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি শিয়া খিলাফত বিলুপ্ত করেন। পাশ্চাত্যের কাছে ইউসুফ পরিচিত হয়েছিলেন তার পদবি সালাহ উদ্দিন (বিশ্বাসের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থেকে আসা সালাদিন নামে। তিনি জিহাদের প্রতি আবেগপূর্ণভাবে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নূর উদ্দিন নয়, তার নিয়তিতেই রয়েছে জেরুসালেম মুক্ত করা। এটিই তার প্রভুর সাথে তাকে সাংঘর্ষিক অবস্থানে এনে দেয়। ১১৭৪ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নূর উদ্দিন ইন্তিকাল করেন। সালাহউদ্দিন তার সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব লাভের জন্য তার ছেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তার ক্যারিশমা, দয়ালুচিত্ত, স্পষ্ট ধার্মিকতা মুসলিমদের সমর্থন এনে দেয় তাকে। ১০ বছরের মধ্যে এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান মুসলিম নগরীর বেশির ভাগই তার নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়। ক্রুসেডাররা একজন নিবেদিতপ্রাণ ও ক্যারিশমেটিক সুলতানের নেতৃত্বে তাদের রাজ্য ধ্বংস সাধনে আন্তরিক একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সাম্রাজ্যে নিজেদের ঘেরাও অবস্থায় দেখতে পেল।

এমনকি এই নিশ্চিত হুমকির মুখেও ফ্রাঙ্করা নিজেদের মধ্যে বিবাদ চালাতে থাকল। যখন খুব বেশি প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী নেতৃত্বের, তখন তাদের তরুণ রাজা চতুর্থ ব্যান্ডউইন কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। রাজ্যের ব্যারনরা রাজ- প্রতিভূ ত্রিপলির কাউন্ট রেমন্ডকে সমর্থন করেন। তিনি বুঝতেন যে সালাহউদ্দিনকে শান্ত করার একমাত্র আশা

নিহিত রয়েছে তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে। অবশ্য তাদের বিরোধিতা করতেন একদল নবাগত। তারা রাজপরিবারের আশপাশে নিজেদের জড়ো করে পরিকল্পিতভাবে উস্কানিমূলক নীতি অনুসরণ করে। এসব যুদ্ধবাজের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ছিলেন চ্যাটিলনের রেনল্ড। তিনি সালাহউদ্দিনের সাথে করা রেমন্ডের প্রতিটি চুক্তি লঙ্ঘন করেছিলেন মুসলিম কাফেলায় হামলা চালিয়ে। তিনি অন্তত দুবার (অসফলভাবে) মক্কা ও 'মদিনায় হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। রেনল্ডের কাছে ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও মুসলিমবিশ্বের প্রতি চরম বিরোধিতাই ছিল একটি ঐশী কর্তব্য ও একমাত্র সত্যিকারের দেশপ্রেম। রাজ্যটির আধ্যাত্মিক নেতৃত্বেরও অভাব ছিল। আরেক নবাগত প্যাট্রিয়ার্ক হেরাক্লিয়াস ছিলেন নিরক্ষর ও স্বাভাবিক কাজ করতে অক্ষম। তিনি আবার তার মিস্ট্রেসের প্রতি প্রকাশ্যে অনুরাগ প্রকাশ করতেন। ১১৮৫ সালের মার্চে 'কুষ্ঠ রাজার' মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন তার শিশু ছেলে ৫ম ব্যান্ডউইন। তিনিও এক বছর পর মারা যান। তখন উত্তরাধিকারী নিয়ে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতিতে সালাহউদ্দিন দেশটি আক্রমণ করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। রেনাল্ড আবারো যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেন। অথচ ওই যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে রেমন্ড রাজ্যে দম ফেলার অবকাশ সৃষ্টি করেছিলেন। ব্যারনরা কুষ্ঠ রাজার ভগ্নিপতি লুসিগন্যানের গাইকে তাদের রাজা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ লোকটি তাদের রাজা হিসেবে ছিলেন দুর্বল ও অকার্যকর নবাগত। তবে তারা তখনো তীব্রভাবে বিভক্ত ছিল। ১১৮৭ সালে গ্যালিলিতে সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পুরো সেনাবাহিনী যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনো তাদের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধ চলছিল। যুদ্ধবাজ দলটি রাজা গাইকে অনেক শক্তিশালী হিসেবে তুলে ধরে তাকে মুসলিমদের আক্রমণ করতে প্ররোচিত করে, এমনকি যদিও রেমন্ড তাগিদ দিচ্ছিলেন যে অপেক্ষা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তখন ছিল ফসল তোলার মওসুম। সালাহউদ্দিন তখন তার বিশাল বাহিনীকে আর বেশি দিন বিদেশে মাটিতে রাখতে পারবেন না। কিন্তু গাই এই স্পর্শকাতর উপদেশে কান দিলেন না। তিনি এগিয়ে গিয়ে হামলার নির্দেশ দিলেন। ফলাফল ছিল তাইবেরিয়াসের কাছে হিত্তিনের যুদ্ধে মুসলিমদের বিপুল বিজয়। জেরুসালেমের খ্রিস্টান রাজ্য হেরে গেল।

হিত্তিনের পর সালাহউদ্দিন ও তা সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনজুড়ে অগ্রসর হতে থাকে, একটির পর একটি শহর তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে থাকে। যেসব খ্রিস্টান বেঁচে গিয়েছিল, তারা টায়ারে আশ্রয় নেয়। তবে পবিত্র নগরী রক্ষার বেপরোয়া চেষ্টায় কিছু লোক জেরুসালেমেও গিয়েছিল। সবশেষে মুসলিম সেনাবাহিনী মাউন্ট অলিভেসের ওপর শিবির স্থাপন করে। সালাহউদ্দিন ওপর থেকে হারামের ওপর থাকা অপবিত্র উপাসনাগাহ আর ডোম অব দি রকের উপরের ক্রশটির দিকে তাকালেন। তিনি তার অফিসারদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন, ফাজায়েল আল-কুদসের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন : জেরুসালেম হলো টেম্পলের নগরী, নবীদের নগরী, ইশরা ও মিরাজের নগরী, হাশর ময়দানের নগরী। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, ১০৯৯ সালের গণহত্যার বদলা নেওয়া তার কর্তব্য এবং তিনি অধিবাসীদের প্রতি কোনো করুণা না দেখাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। নগরীর ভেতরে থাকা খ্রিস্টানেরা ভীত হয়ে পড়ল। কার্যকর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করার মতো কোনো নাইট ছিল না। তখন প্রখ্যাত ব্যারন ইবেলিনের ব্যালিয়ান উপস্থিত হলেন। মনে হলো তাদের প্রার্থনায় সাড়া পাওয়া গেছে। তিনি সালাহউদ্দিনের অনুমতি নিয়ে তার স্ত্রী ও পরিবারকে টায়ারে নিয়ে যেতে সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি মাত্র একটি রাত জেরুসালেমে ব্যয় করার সংকল্প ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু অবরুদ্ধ খ্রিস্টানদের দুর্দশা দেখে তিনি সুলতানের কাছে ফিরে গিয়ে তাকে তার শপথ থেকে মুক্তি দিয়ে অনুরোধ করেন। ব্যালিয়ানকে সম্মান করতেন সালাহউদ্দিন। তিনি সম্মত হলেন, তার পরিবার ও তাদের সব সম্পদ উপকূলে নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি রক্ষী দল পাঠিয়ে দেন।

ব্যালিয়ান তার সামান্য সম্পদ নিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার কাজ ছিল হতাশায় ভরা। ১১৮৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সালাহউদ্দিন নগরীর পশ্চিম গেট দিয়ে আক্রমণ শুরু করেন, তার প্রকৌশল বাহিনী সেন্ট স্টিফেন গেটের কাছে উত্তর দিকের প্রাচীরের ভিতে গর্ত খুঁজে ধসিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করে। তিন দিন পর 'গডফ্রেস ক্রস'সহ দেয়ালের একটি পুরো অংশ পরিখায় পড়ে যায়। তবে মুসলিমদেরকে ভেতরের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের মুখোমুখি হতে হলো এখন। ব্যালিয়ান অবশ্য শান্তির আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রথমে সালাহউদ্দিন করুণা করতে রাজি হননি। তিনি ব্যালিয়ানকে বলেছিলেন, [জেরুসালেম] দখল করার সময় আপনারা লোকজনের সাথে যেমন আচরণ

করেছিলেন, আমরা ঠিক তেমনই করব- খুন করে, ক্রীতদাস বানিয়ে ও অন্যান্য বর্বরতার মাধ্যমে। ২৭ তবে ব্যালিয়ান মরিয়া আবেদন করেন। একবার সব আশা শেষ হয়ে গেলে খ্রিস্টানেরা হারাবার আর কিছু পাবে না। তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করবে, তাদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেবে, সালাহউদ্দিনের সেনাবাহিনী আসার আগেই ডোম অব দি রক আর আল-আকসা গুঁড়িয়ে দেবে, তাদের প্রত্যেকে মারা যাওয়ার আগে একজন করে মুসলিমকে হত্যা করবে। সালাহউদ্দিন তার আলেমদের সাথে পরামর্শ করে শান্তিপূর্ণভাবে নগরী গ্রহণ করতে রাজি হলেন। তবে ফ্রাঙ্করা কোনোভাবেই নগরীতে অবস্থান করতে পারবে না। তারা তার বন্দি হবে। অবশ্য একেবারে সামান্য কিছু অর্থ দিয়ে তারা মুক্তি পেতে পারে।

মুসলিমেরা ১১৮৭ সালের ২ অক্টোবর যখন নবীর মিরাজ ও ইশরা উদযাপন করছিল তখন সালাহউদ্দিন ও তার সৈন্যরা বিজয়ী বেশে জেরুসালেমে প্রবেশ করলেন। সুলতান তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। একজন খ্রিস্টানকেও হত্যা করা হয়নি। ব্যারনেরা সহজেই তাদের মুক্তিপণ আদায় করেছিল, তবে গরিব মানুষেরা পারেনি। তারা যুদ্ধবন্দি হয়। অবশ্য বিপুলসংখ্যককে মুক্তি দেওয়া হয়। কারণ দাসত্বের কারণে আলাদা হয়ে যাওয়া পরিবারগুলোর দুর্দশা দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন সালাহউদ্দিন। সালাহউদ্দিনের ভাই আল-আদিলও এত বিষণ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে তার নিজের ব্যবহারের জন্য রাখা এক হাজার বন্দিকে তিনি সাথে সাথে মুক্ত করে দেন। প্রতিটি মুসলিম কল্পনাতীত কষ্ট পেয়েছিলেন এটি দেখে যে ধনী খ্রিস্টানেরা তাদের স্বদেশী লোকদের মুক্তিপণ দেওয়ার কোনো চেষ্টা না করেই তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে পালাচ্ছে। মুসলিম ইতিহাসবিদ ইমাদ উদ্দিন যখন দেখলেন যে প্যাট্রিয়ার্ক হেরাক্লিয়াসের গাড়ির ঘোড়াগুলো তার সম্পদের ভারে গোঙাচ্ছে, তখন তিনি সালাহউদ্দিনের সাথে অনুনয় করেছিলেন ওইসব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বাকি বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে। কিন্তু সালাহউদ্দিন তা করতে অস্বীকার করেন এই যুক্তিতে যে শপথ ও চুক্তি অবশ্যই আক্ষরিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। খ্রিস্টানেরা সব খানে তাদের প্রতি দেখানো দয়ার কথা স্মরণ করবে। ২৮ সালাহউদ্দিন ঠিক কথাই বলেছিলেন। পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানেরা অস্বস্তিকরভাবে অবগত ছিলেন যে তাদের নিজস্ব ক্রুসেডারেরা যখন জেরুসালেম জয়ের সময় যা করেছিল এই শাসক তাদের সাথে তার

চেয়ে অনেক বেশি 'খ্রিস্টান' আচরণ করেছেন। তারা নানা কিংবদন্তি সৃষ্টি করে যা সালাহউদ্দিনকে এক ধরনের সম্মানজনক খ্রিস্টানে পরিণত করে; এসব কাহিনীর কোনো কোনোটিতে এমনকি এমন কথাও জোর দিয়ে বলা হয় যে সালাহউদ্দিন গোপনে ব্যাপ্টাইজ হয়েছিলেন। জেরুসালেমে ক্রুসেড অভিজ্ঞতা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। মুসলিমেরা সহাবস্থান ও আল-কুদসের একীভূতকরণের পুরনো ব্যবস্থাটি আবার সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ক্রুসেডার শাসনের সহিংস অসন্তোষ ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার সম্পর্ক মৌলিক পর্যায়ে নষ্ট করে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য বিশ্বের ব্যাপারে এটি ছিল মুসলিমদের প্রথম অভিজ্ঞতা। আর তা বর্তমান সময়েও বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয়নি। ক্রুসেডারদের হাতে তাদের দুর্ভোগও পবিত্র নগরী সম্পর্কে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এরপর থেকে আল-কুদসের প্রতি তাদের ভক্তি আত্মরক্ষামূলক হয়ে পড়ে। ফলে এটি এখন থেকে আরো আগ্রাসী ইসলামি নগরীতে পরিণত হয়ে যায়।

জিহাদ

ফরাসিরা জেরুসালেম ত্যাগ করা মাত্র মুসলিমরা নগরীর চারপাশ ঘুরে ক্রুসেডারদের জেরুসালেমের জাঁকজমক দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। অনেক দিক থেকেই এটি ছিল বাড়ি ফেরার মতো। সালাউদ্দিন ক্রুসেডার জেরুসালেমের কেন্দ্রে অবস্থিত হাসপিটালে সিংহাসনে বসে আমির, সুফি ও আলেমদের স্বাগত জানান। তার মুখ তখন ছিল উজ্জ্বল, জানাচ্ছেন ইমাদ-উদ-দিন। কবি ও পবিত্র কোরআনের হাফেজরা তার প্রশংসা করে কবিতা আবৃতি করছিলেন, অন্যরা প্রচণ্ড আনন্দে কাঁদতে শুরু করছিলেন। তবে মুসলিমরা জানত, নগরী জয়ের মাধ্যমেই জেরুসালেমের জন্য জিহাদ শেষ হয়ে যায়নি। জিহাদ শব্দের অর্থ কেবল 'পবিত্র যুদ্ধ' নয়। এর মূল অর্থ 'সংগ্রাম' এবং পবিত্র কোরআনে প্রধানত এই অর্থেই তা ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিমদেরকে ত্রুটিযুক্ত, বিয়োগান্ত বিশ্বে আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রয়াসের জন্য জীবনকে তৈরি করতে 'আল্লাহর পথে সংগ্রাম' করতে বলা হয়েছে। যুদ্ধ থেকে ফিরে একটি বিখ্যাত বিখ্যাত হাদিসে হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন : 'আমরা এখন ছোট জিহাদ থেকে আরো বড় জিহাদে ফিরে এসেছি।' অর্থাৎ নিজের হৃদয়ে নিজের সমাজ ও সততায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আরো গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো। সালাউদ্দিন পবিত্র কোরআনের আদর্শ অনুযায়ী জিহাদ পরিচালনা করেছিলেন : ক্রুসেডাররা যখনই চাইত, তিনি সবসময় যুদ্ধবিরতি মঞ্জুর করতেন; বেশির ভাগ সময়ই বন্দিদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ও দয়ালু আচরণ করতেন। তিনি বিপুল জয়ের সময়ও মানবিক আচরণ করতেন। বস্তুত অনেক মুসলিম ইতিহাসবিদ বিশ্বাস করেন, তিনি একটি ভুল করে ফেলেছিলেন। তিনি টায়ারে খ্রিস্টানদের জমায়েত হতে সুযোগ দেওয়ায় তারা ফিলিস্তিনে পা রাখার জায়গা ধরে রেখেছিল। ফলে সঙ্ঘাতটি আরো এক শ' বছর চলতে পেরেছিল। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড ও ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের নেতৃত্বে তৃতীয় ক্রুসেডে জেরুসালেম পুনর্ভয়ে ব্যর্থ হলেও জাফা থেকে বৈরুত পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলীয় এলাকায় একটি সরু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল ফ্রাঙ্করা। তাদের রাজধানী ছিল অ্যাকর। এর শাসকেরা খুবই যত্নের সাথে নিজেদের

জেরুসালেমের রাজা হিসেবে অভিহিত করতেন। ক্রুসেডার স্বপ্ন শুকিয়ে যায়নি। ফ্রাঙ্করা যত দিন ফিলিস্তিনে ছিল, মুসলিমরা তত দিন উদ্বিগ্ন ও রক্ষণাত্মক ছিল।

তবে ১১৮৭ সালে মুসলিম আশা ছিল বিপুল। সালাউদ্দিন জানতেন, জেরুসালেমকে আবারো সত্যিকারের মুসলিম নগরীতে পরিণত করতে হলে তাকে ভিন্ন ধরনের জিহাদে অংশ নিতে হবে। প্রথম দায়িত্ব ছিল হারামকে পরিশুদ্ধ করা। টেম্পলারদের ল্যাট্রিন ও ফার্নিচারগুলো অপসারণ করে আল আকসা মসজিদকে জুমার নামাজের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। কাবাঘরের দিক নির্দেশকারী অংশ তৈরি করতে হবে। টেম্পলারদের তোলা ভেতরের দেয়ালগুলো ভেঙ্গে মেঝকে কার্পেট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কয়েক বছর আগে নূরউদ্দিন যে মিম্বার তৈরি করেছিলেন, সেটি দামাস্কাস থেকে এনে স্থাপন করা হলো। ডোম অব দি রকের (কুব্বাতুল সাখরা) ছবি ও মূর্তিগুলো সরানো হলো, কোরআনের খোদাইলিপি প্রকাশিত হলো, রককে ঢেকে রাখা মার্বেল কেসিং সরিয়ে দেওয়া হলো। মুসলিম ইতিহাসলেখকেরা আমাদের জানাচ্ছেন, উমরের মতো সালাউদ্দিনও সারা দিন তার লোকজনের সাথে কাজ করেছিলেন, আঙিনাগুলো ধুয়ে-মুছে সাফ করেন, হারামের পথ চলাচলের স্থানগুলো গোলাপ-পানি দিয়ে পরিষ্কার করেন, গরিবদের সহায়তা করেন। ১০৯৯ সালের পর প্রথমবারের মতো শুক্রবার, ৪ শাবান নামাজিতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল আল আকসা। জেরুসালেমের কাজি মহিউদ্দিন আল কোরেশি যখন নতুন মিম্বারে উঠেন, তখন লোকজন আবেগে কাঁদতে থাকেন।

ক্রুসেডের আগে মুসলিম জেরুসালেম মোটামুটিভাবে হারাম এলাকা ও আশপাশের ভবনরাজি নিয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু সালাউদ্দিনের নতুন ভবন নির্মাণের জিহাদ অনুযায়ী খ্রিস্টান মানচিত্রের ওপর স্থান পেল মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলো I আবারো বিজেতাদের হাতে আদর্শিক অস্ত্রে পরিণত হলো নির্মাণকাজ। গুরুত্বপূর্ণ একটি মুসলিম স্থাপনা-সংবলিত খ্রিস্টান প্রাধান্যপূর্ণ নগরীর বদলে জেরুসালেম নিশ্চিতভাবেই হয়ে ওঠেছিল মুসলিম নগরী। খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি নতুন বৈরিতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। হলি সেপালচারের পাশে থাকা প্যাট্রিয়াকের বাসভবন বাজেয়াপ্ত করেছিলেন সালাহউদ্দিন, রাষ্ট্রীয় তহবিলে কনভেন্ট ও সেন্ট আনার চার্চ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি এসব ভবনকে মসজিদে

রূপান্তরিত করেননি। শিয়াদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের অংশ হিসেবে নূরউদ্দিন ও সালাহউদ্দিন উভয়েই তাদের দখল করা প্রতিটি নগরীতে সুফি খানকাহ ও উচ্চতর মাদরাসা স্থাপন করেছিলেন। প্রখ্যাত সাধক ইমাম আল-গাজ্জালির পারিকল্পনায় সংস্কার করা সুন্নায় এগুলোই ছিল প্রধান প্রতিষ্ঠান। তিনি নিজেও প্রথম ক্রুসেডের সামান্য আগে গেট অব মার্সির ওপরে থাকা সুফি খানকায় বাস করতেন। এখন সালাহউদ্দিন সেন্ট আনা চার্চকে মুসজিদে রূপান্তরিত করলেন। আর এর পাশে থাকা কনভেন্টকে করা হয় মাদরাসায়, প্যাট্রিয়ার্কের বাসভবন পরিণত হয় খানকায়। উভয় প্রতিষ্ঠান ওয়াকফ করে দেন সুলতান, তাতে তার নামও অঙ্কিত ছিল। একেবারে শুরুর সময় থেকেই জেরুসালেমে সুফিরা ছিলেন। তবে এখন সালাউদ্দিন জোর দিয়ে বললেন, তার নতুন খানকায় সুফিরা কোনোভাবেই স্থানীয় বাসিন্দা হতে পারবেন না। তা হলে তারা শিয়াদের দিয়ে কলুষিত হয়ে থাকতে পারেন। তাদেরকে সুন্নি মূলভূমি থেকে আসতে হবে।

সুফি ও বিদ্বজনেরা এসব নতুন প্রতিষ্ঠানে বাস করার জন্য আসতেন। আলেমরা আসতেন হারামে দায়িত্ব পালন করার জন্য। জেরুসালেম জয়ের পর দীর্ঘ সময় শত্রুদের দখলে থাকা নগরীটি দেখার জন্য হাজার হাজার লোক পরিদর্শনে আসে। নগরীর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া ও নতুন গভর্নর নিযুক্ত করার আগে পর্যন্ত তিনি মাউন্ট অব অলিভেসে খাটানো ক্যাম্পেই অবস্থান করেন। দুর্গে একটি সেনা ছাউনি স্থাপন করা হয়। তারপর সালাহউদ্দিন দামাস্কাস ফিরে যান তৃতীয় ক্রুসেডের জন্য মুসলিমদের তৈরির কাজে। সৈন্য ও বেসামরিক আমলারা সাবেক প্যাট্রিয়ার্কের কোয়ার্টারে বসতি স্থাপন করে। জয়ের অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তর আফ্রিকা থেকে মুসলিমরা আল-কুদসে আসতে শুরু করেছিল। তারা বারবার গোত্রগুলোর হাতে উৎখাত হয়েছিল। এই মাগরেবি মুসলিমরা হারামের উত্তর-পশ্চিম দিকে বসতি স্থাপন করে। তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্য বহাল রেখেছিল। তাদেরকে টেম্পলারদের ভোজনকক্ষকে তাদের নিজস্ব মসজিদে রূপান্তরিত করার অনুমতি দেওয়া হয়। আর মাগরেবি কোয়ার্টার পরিণত হয় জেরুসালেমের নতুন বৈশিষ্ট্য। তবে সালাহউদ্দিন খ্রিস্টান ও ইহুদিদের নগরী থেকে পুরোপুরি সরিয়ে দিতে চাননি : একীকরণ ও সহাবস্থানের পুরনো রীতি বহাল থাকে। কয়েক হাজার সিরিয়ান ও আর্মেনিয়ান খ্রিস্টান জিম্মি হিসেবে থেকে যাওয়ার অনুমতি চায়। সালাউদ্দিন গ্রিক

অর্থোডক্সকে হলি সেপালচার চার্চের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। এসব স্থানীয় খ্রিস্টানকে ইউরোপিয়ান ক্রুসেডারদের জন্য দোষারোপ করা যেত না। হলি সেপালচার এখন নতুন নতুন ইসলামি ভবনে ঘিরে থাকল। সালাহউদ্দিন গভর্নরের বাসবভন, একটি হাসপাতাল, একটি মসজিদের জন্য হসপিটালের বিশাল একটি অংশগ্রহণ করেন। এগুলো ওয়াকফ করেন তার ছেলে আফজাল। দুর্গেও একটি নতুন মসজিদ ছিল। এটি দাউদ নবীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। খ্রিস্টান পবিত্র স্থানটির চার দিকে এখন অনেক মিনার শোভা পাচ্ছিল। প্যাট্রিয়ার্কস কোয়ার্টারের রাস্তাগুলো দিয়ে নামাজের আজান প্রতিধ্বনিত হতো। কয়েকজন আমির চেয়েছিলেন হলি সেপালচারই গুঁড়িয়ে দিতে। কিন্তু সালাহউদ্দিন তাদের অভিমত না শুনে তার অধিকতর বিজ্ঞ অফিসারদের- তাদের মতে এটি চার্চ নয়, বরং খ্রিস্টানদের ঐশী স্থান- সাথে একমত হন। তৃতীয় ক্রুসেডের পর এমনকি ইউরোপের ল্যাতিন তীর্থযাত্রীদেরও জেরুসালেমে তীর্থযাত্রা করার অনুমতি দেওয়া হতো।

সালাহউদ্দিন ইহুদিদেরও জেরুসালেমে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ক্রুসেডাররা তাদের প্রায় পুরোপুরি উচ্ছেদ করে দিয়েছিল। ইহুদি বিশ্বজুড়ে সালাহউদ্দিনকে নতুন সাইরাস হিসেবে প্রশংসা করা হলো। ক্রুসেড কেবল মুসলিম বিশ্বেই নতুন জিহাদকে উদ্বুদ্ধ করেনি। ক্রুসেডের ফলেই ইউরোপের ও ইসলামি সাম্রাজ্যের ইহুদিদের মধ্যে নতুন ধরনের ইহুদিবাদের বিকাশ ঘটে। এই নতুন ধর্মীয় জায়নবাদের প্রথম প্রবল আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে টোলেদান চিকিৎসক জুদা হ্যালেভি মুসলিম স্পেন ও খ্রিস্টান ভূখণ্ডের পুনর্দখলে খ্রিস্টানদের যুদ্ধের ক্রসফায়ারে পড়ে গিয়েছিলেন। স্থানচ্যুতির এই অভিজ্ঞতার ফলে তার মনে ধারণা জন্মে যে ইহুদিদের অবশ্যই তাদের পিতৃপুরুষদের ভূমিতে ফিরে যেতে হবে। বিশ্বে এটিই তাদের সত্যিকারের স্থান। পবিত্র ভূমি বর্তমানে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইরত খ্রিস্টান বা মুসলিমদের নয়। ইহুদিদের অবশ্যই ফিলিস্তিন ও পবিত্র নগরী নিয়ে তাদের দাবি জানাতে হবে। জেরুসালেম হলো পৃথিবীর কেন্দ্রে। এখানে নশ্বর দুনিয়া ঐশী সত্তার কাছে উন্মুক্ত হয়। ডেভিরের স্থানেও ওপরে থাকা গেট অব হেভেন দিয়ে প্রার্থনা উঠে এবং স্বর্গীয় শক্তি এখান দিয়েই ইসরাইলি জনসাধারণের কাছে নেমে আসে, তাদেরকে নবুয়তি শক্তিতে পরিপূর্ণ করে। একমাত্র ফিলিস্তিনেই ইহুদিরা ঐশী দুনিয়ার সাথে নিজেদেরকে সৃষ্টিশীলভাবে সম্পর্কিত করতে পারে, সত্যিকারের ইহুদি

হতে পারে। ফিলিস্তিনকে আলিয়ায় পরিণত করার এবং জায়নের জন্য তাদের জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করার কর্তব্য রয়েছে তাদের। তারপর শেখিনা ফিরবেন জেরুসালেমে, ' পরিত্রাণ শুরু হবে তখন।

' হ্যালেভি নিজে স্পেন থেকে সমুদ্রপথে যাত্রা শুরু করেন। তবে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তিনি জেরুসালেমে পৌছাতে পারেননি। তিনি সম্ভবত ১৯৪১ সালে মিসরে মারা যান। এই পর্যায়ে খুব কম ইহুদিই তাকে অনুসরণ করার প্রবণতা প্রদর্শন করতে পেরেছিল। তবে তার কাহিনী কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল। লোকজন যখন তাদের আশপাশের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মনে করে যে পৃথিবীতে তাদের কোনো আবাসভূমি নেই, তখন তারা স্বস্তি পাওয়ার জন্য তাদের শিকড়ে ফিরে যাওয়ার টান অনুভব করে। বীর। ... ... সালাহউদ্দিনের জেরুসালেম জয় ইহুদি জনগোষ্ঠীর জন্য ছিল বিস্ময় ও সেইসাথে গোলযোগপূর্ণও। সুলতান ইহুদিদেরকে দেশে এনে তাদেরকে পবিত্র নগরীতে বিপুল সংখ্যায় বাস করার সুযোগ দিয়েছিলেন। ১১৮৭ সালের সেপ্টেম্বরে সালাহউদ্দিন অ্যাসক্যালন জয় করেন। তবে পরের মাসে যখন জেরুসালেম বিজয় হয়, তখন মুসলিমরা উভয় নগরী রক্ষা করতে পারেনি। ফলে অ্যাসক্যালন পরিকল্পিভাবে ধ্বংস করা হয়, এর অধিবাসীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১১৯০ সালে অ্যাসক্যালনের ইহুদিরা জেরুসালেমে বসতি স্থাপন করে, তাদেরকে সিনাগগ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। তাদের জন্য মাগরিবি কোয়ার্টারের পশ্চিম দিকের জায়গা বরাদ্দ করা হয়। তাদের জন্য বরাদ্দ করা অংশের অপর পাশে ছিল শারাফ কোয়ার্টার। ১১৯৮ সালে উত্তর আফ্রিকা থেকে আরো ইহুদি আসতে শুরু করে। ফ্রান্স থেকে দুটি গ্রুপে ১২১০ সালের দিকে তিন ইহুদি পরিবার আলিয়া করে। এই প্রত্যাবর্তন ছিল উত্তেজনাপূর্ণ, আসন্ন পরিত্রাণের মেসাইনিক আশায় উদ্দীপ্ত। তবে জেরুসালেমের ইসলামিকরণও ছিল চরমভাবে বিতৃষ্ণকর। ইহুদিরা যে নগরীকে তাদের বলে দাবি করছিল, সেটির জন্য খ্রিস্টান ও ইহুদিদের লড়াই করতে দেখাটি ছিল বিভ্রান্তিকর। স্প্যানিশ কবি ইয়েহুদা আল-হারিজি ১২১৭ সালে জেরুসালেমে তার তীর্থযাত্রার সময় হারামের ওপর মুসলিম ভবনগুলো বিপর্যয়কর অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন।

আমাদের পবিত্র আঙিনাগুলোকে অপরিচিত মন্দিরে রূপান্তর করার দৃশ্য দেখা ছিল পীড়াদায়ক! আমরা চেষ্টা করি, একসময় প্রভিডেন্টস যেখানে বাস করতেন সেখানে দাঁড়ানো বিশাল ও রাজসিক চার্চটি থেকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে রাখতে।

ক্রমাগত বেশি বেশি ইহুদি বুঝতে পেরেছিল যে স্থানটি এর সত্যিকারের অধিবাসীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছে। হ্যালেভি উল্লেখ করেছেন, এর পবিত্রতা থেকে খ্রিস্টান বা মুসলিমদের কেউই উপকৃত হতে পারে না।

এমনকি সংযত মাইমোনিদেস পর্যন্ত এই উদ্দীপনায় আপ্লুত হন। এই ইহুদি দার্শনিক ছিলেন সালাহউদ্দিনের অন্যতম ব্যক্তিগত চিকিৎসক। তিনি উপলব্ধি করেন, জেরুসামে ইহুদি জনসাধারণের মধ্যাকর্ষণ শক্তির কেন্দ্র হিসেবে বহাল রয়েছে এবং অন্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইহুদি রাষ্ট্র বৈধতা পাবে না। ইহুদি রাজ্য ও ইহুদি আইন অবশ্যই হতে হবে টেম্পলভিত্তিক। টেম্পল মাউন্ট হয়তো গোয়িমরা অবমাননা করছে, কিন্তু এটি এখনো পবিত্র স্থান। কারণ সোলায়মান সর্বকালের জন্য এটি পবিত্র করে গিয়েছিলেন। ঐশী উপস্থিতি কখনোই টেম্পল মাউন্ট থেকে সরে যায়নি। একইভাবে হারাম পরিদর্শনের সময় ইহুদিদের এমন আচরণ করতে হবে যাতে মনে হবে যে টেম্পল এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তারা যখন পূর্ব দিকে মুখ করার সময় (একসময় যেখানে দেভির দাঁড়ানো ছিল) কোনোভাবেই নিষিদ্ধ এলাকায় যাওয়ার ঝুঁকি নেবে না বা অপ্রাসঙ্গিক কোনো কাজ করতে পারবে না। টেম্পলটি হারিয়ে গিয়েছিল, তবে স্থানটির পবিত্রতা সর্বকালের জন্য টিকে ছিল। এটি ছিল ঈশ্বরের অব্যাহতভাবে তার জাতিদের পরিচর্যা করার প্রতীক।

সালাহউদ্দিন ১১৯৪ সালে টায়ফয়েডে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন। তার সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা হয়ে যায়। এর বিভিন্ন নগরী আইয়ুব পরিবারের সদস্যরা শাসন করতে থাকে। প্রত্যেকের নিজস্ব সেনাবাহিনী ও প্রশাসন ছিল। তবে যে ঐক্য সালাহউদ্দিন উদ্দীপ্ত করতে পেরেছিলেন, তা তার মৃত্যুর সাথে সাথেই হারিয়ে গিয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তার উত্তরসূরিরা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে দেয়। এই অভ্যন্তরীণ সঙ্ঘাতে দুর্ভোগে পড়ে জেরুসালেম। অবশ্য আল- কুদসের প্রতি উদ্দীপনা ম্লান হয়নি। জেরুসালেম হারানোতে মুসলিমরাও কষ্ট পেয়েছিল। এখন তারা যা ফিরে পেয়েছে তার প্রতি ছিল

আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে নিবেদিতপ্রাণ। তারা তাদের জিহাদ-কর্মসূচি অব্যাহত রাখল। ১১৯৩ সালে জেরুসালেমের আমির ইজ্জাদউদ্দিন জারদিক হলি সেপালচারের কাছে একটি মসজিদ আবার উৎসর্গ করলেন। এটি প্রথম ক্রুসেডের আগে উমরের প্রতি উৎসর্গ করা ছিল। এই মসজিদের পাশে একটি হেফজখানাও চালু করা হয়। আল-আফজাল একটি মাদরাসাও উদ্বোধন করেন এর পাশে। আল-আফজাল পুরো মাগরিবি কোয়ার্টারকে ওয়াকফ করে দেন, যাতে সাহায্য ও পরিষেবা উত্তর আফ্রিকার তীর্থযাত্রী ও গরিবদের সহায়তা করা যায়। তিনি সেখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে উত্তর আফ্রিকান মালিকি মাজহাব পড়ানো হতো।

এটি ছিল জেরুসালেমে ওয়াকফ দানের অন্যতম প্রাচীন উদাহরণ। এই ব্যবস্থায় কোনো দাতা দোকানের মতো আয়-সৃষ্টিকারী কোনো সম্পত্তির মালিকানা সমর্পণ করতে পারতেন, ভালো কাজে এর মুনাফা (পরিচালনা ব্যয় বাদ দিয়ে) দান করে দিতে পারতেন। ওয়াকফের অর্থ যুদ্ধবন্দিদের মুক্ত করতে, লঙ্গরখানা চালাতে কিংবা মাদরাসা নির্মাণে ব্যয় হতে পারে। এ ধরনের দান-খয়রাত পণ্যের কাজ বিবেচিত হতো, বিশেষ করে আল-কুদসে। এখানে ভালো কাজের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করা হতো। তবে এতে বাস্তব কিছু সুবিধাও ছিল। অনেক দাতা তাদের বংশধরদের জন্যও ওয়াকফকে ব্যবহার করত। এসব বংশধর দান করা ভবনে বাস করতে পারত কিংবা দানকৃত প্রতিষ্ঠান তদারকির দায়িত্ব পালন করে বেতনও পেতে পারত। অনেক সময় মাদরাসা বা খানকায় দাতার জন্য অ্যাপার্টমেন্ট থাকত। তারা শেষ জীবন জেরুসালেমে কাটানোর কথা ভাবতেন। ওয়াকফ ছিল বাস্তব দান : এটি ইসলামি শিক্ষা প্রচার করত, অভাবগ্রস্ত ছাত্রদের বৃত্তি দিত, গরিবদের সহায়তা করত। এই ব্যবস্থা এসবের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করত। এটি পবিত্র কোরআনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা। আর এটি জেরুসালেমের জন্য জিহাদের একটি প্রধান উপপাদ্য বিষয়। ওয়াকফ নগরীর সৌন্দর্য ও আবরণকেই সমৃদ্ধ করেনি, এটি চাকরিও ব্যবস্থা করেছিল। টানাপোড়েনমূলক পরিস্থিতিতে কেউ মাদরাসায় চাকরি নিতে পারত কিংবা সুফি তরিকায় যোগ দিতে পারত। যেকোনো ওয়াকফের যেকোনো পরিমাণের উদ্বৃত্ত অর্থ সবসময় গরিব লোকদের দিয়ে দেওয়া হতো। এর ফলে দানের ওপর নির্ভরশীল লোকজনের জন্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার

সাথে আচরণ করার সুযোগ সৃষ্টি করত। একেবারে শুরু থেকে জেরুসালেমের পবিত্রতার মূল বিষয় ছিল ন্যায়বিচার আর সহানুভূতি। ক্রুসেডার জেরুসালেমে এটি তেমন দেখা যায়নি। কিন্তু সালাহউদ্দিনের কাছে বিষয়টির খুবই গুরুত্ব ছিল। ক্রুসেডাররা চলে যাওয়ার পর হারামের বিশুদ্ধকরণের সাথে দান-খয়রাতের কাজও চলেছে। এখন ওয়াকফ প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে গরিব ও অভাবগ্রস্তদের সহায়তার জন্য। জেরুসালেমের আইয়ুবি ইসলামিকরণে এটি ছিল অপরিহার্য অংশ।

তবে ক্রুসেডাররা তখনো জেরুসালেমে থেকে যাওয়ায় মুসলিমরা শিথিলতা দেখাতে পারছিল না। বস্তুত, যেসব ফ্রাঙ্ক অ্যাকর রাজ্যে বাস করত, তারা শান্তি বজায় রাখতে উদ্বিগ্ন ছিল। তারা হিত্তিনের যুদ্ধ থেকে অনেক মূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানেরা ছিল অনেক বেশি মারমুখী। তারা জেরুসালেম মুক্ত করার জন্য ক্রুসেডার পাঠানো অব্যাহত রাখে। আল-আদিলের ছেলে আল মোয়াজ্জেম ১২০০ সালে দামাস্কাসের সুলতান হন। তবে তিনি আল- কুদসের প্রতি এতটাই নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন যে তিনি সেখানেই নিজের প্রধান বাসভবন নির্মাণ করেন। তিনি দুটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। একটি ছিল তার নামে। এটি হারামের উত্তরে হানাফি মাজহাবের মাদরাসা ছিল। অপরটি গেট অব মার্সিতে আরবি শিক্ষা দিত। আল-মোয়াজ্জেম হারাম সীমান্তের আশপাশের স্তম্ভশ্রেণির মেরামতের কাজ করেন। তবে ১২১৮ সালে পাশ্চাত্য থেকে আরেকটি ক্রুসেড আসে।

এবার ক্রুসেডাররা সরাসরি ফিলিস্তিনে না গিয়ে মিসর থেকে মুসলিমদের উৎখাত করার চেষ্টা করল। তারা আশা করেছিল, এর মাধ্যমে জেরুসালেম পুনর্দখল করতে তারা একটি ঘাঁটি পাবে। নিকট প্রাচ্যে ক্রুসেডারদের স্রেফ উপস্থিতিই পুরো অঞ্চলজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে যথেষ্ট ছিল। লোকজন ১০৯৯ সালের গণহত্যার স্মৃতিতে সন্ত্রস্ত ছিল, তারা এখন নতুন নৃশংসতার আশঙ্কা করছিল। আল-মোয়াজ্জাম ধরে নিয়েছিলেন, ক্রুসেডাররা জেরুসালেমে ফিরে আসবে, লোকজনকে গলা কেটে হত্যা করবে, পুরো ইসলামিবিশ্বকে শাসন করবে। বস্তুত, প্রাথমিক সাফল্যের পর ক্রুসেড সামান্য অগ্রসরও হয়েছিল। কিন্তু ফ্রাঙ্করা সন্ত্রাসের যে নৃশংস ইতিহাস পেছনে রেখে গিয়েছিল যে মুসলিমদের কাছে

পরিস্থিতিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। আল-মোয়াজ্জাম নির্দেশ দিলেন, নগর-প্রাচীরগুলো ভেঙ্গে ফেলতে হবে, যাতে ক্রুসেডাররা সেখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে। এটি ছিল ভয়াবহ পদক্ষেপ। জেরুসালেমের আমিররা যুক্তি দিয়েছিলেন যে তারা ক্রুসেডার হামলা প্রতিহত করতে পারবেন। কিন্তু আল-মোয়াজ্জাম তাদের আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে জোর দিয়ে বললেন যে তিনি নিজে ধ্বংসের কাজ তদারকি করবেন। নগরীতে সার্বিকভাবে বিপুল মর্মপীড়ার সৃষ্টি হয়। একেবারে শুরু থেকেই যেকোনো নগরীর সবচেয়ে বড় যুক্তি ছিল এর অধিবাসীদের নিরাপত্তা প্রদান করা। ফলে সুলতানের প্রকৌশলী, ওস্তাগার ও শ্রমিকেরা জেরুসালেমে এসে প্রাচীর ধ্বংস করার কাজ শুরু করলে সেখানে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। নগরীর সবচেয়ে অরক্ষিত লোকজন- নারী, মেয়ে ও বৃদ্ধরা – কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় ছুটে গেল, পোশাক দিয়ে চোখ মুখতে লাগল। তারা প্রথমে হারামে জমায়েত হলো। তারপর দামাস্কাস, কায়রো ও কেরাকে চলে গেল, পেছনে রেখে গেল তাদের পরিবার ও সহায়-সম্পত্তি। শেষ পর্যন্ত নগরীটির সব প্রতিরক্ষা ধ্বংস করে এর সেনা ছাউনিও সরিয়ে নেওয়া হলো। কেবল দাউদ টাওয়ার তার স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল।

আল-কুদস আর টেকসই নগরী রইল না। এখন এর কোনো প্রাচীর নেই, মুসলিমরা সেখানে বাস করতে সাহস পাচ্ছিল না, ফ্রাঙ্করা অ্যাকরের কাছে এসে নগরীর কাছাকাছি থেমে থাকল। নগরীটি তখন একটি গ্রামের চেয়ে বেশি কিছু। মাত্র কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ দরবেশ ও মুফতি অবস্থান করতে লাগলেন। তারা কোনোমতে আইয়ুবি প্রতিষ্ঠানগুলো চালু রেখেছিলেন, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও অল্প কিছু সৈনিককে সহায়তা দিতে লাগলেন। আল-মোয়াজ্জামের সিদ্ধান্ত পরে অপরিণত বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ ১২২১ সালে ক্রুসেডাররা বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য ক্রুসেড ওই অঞ্চলকে এত প্রবলভাবে নগরীকে অস্থিতিশীল করে গিয়েছিল যে মুসলিমদের জন্য পাশ্চাত্যের উপস্থিতিকে কোনো মাত্রায় আস্থায় আনা বা শান্তভাবে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। জেরুসালেমের জন্য মুসলিম অনুভূতিতে নতুন ধরনের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। এটি নগরীর জন্য ধ্বংসকরী হতে পারত।

মুসলিম শাসকদের জন্য নিরাপত্তাই প্রধান অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ে পরিণত হলো। ১২২৯ সালে মিসরের সুলতান আল-কামিল নতুন ক্রুসেডার হামলা মোকাবিলা ভয়াবহ আশঙ্কার চেয়ে জেরুসালেম ত্যাগ করার জন্যই তৈরি ছিলেন। এদিকে ইউরোপের হলি রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক পবিত্র ভূমিতে নতুন অভিযানে নেতৃত্ব দিতে পোপের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। স্টুপার মান্ডি, বিশ্বের বিস্ময় হিসেবে সমসাময়িক লোকদের কাছে পরিচিত ফ্রেডেরিক অব্যাহতভাবে পাশ্চাত্যের প্রত্যাশাগুলোকে বিদ্রুপ করতেন। তিনি কসমোপলিটান সিসিলিতে বেড়ে ওঠেছিলেন। ফলে ইউরোপের সহজাত বৈদেশিকতা-ভীতি তার মধ্যে ছিল না। ইসলামের প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ ছিল না। বরং তিনি অনর্গল আরবি বলতে পারতেন, মুসলিম পণ্ডিত ও শাসকদের সাথে কথোপকথন ও পত্র বিনিময় উপভোগ করতেন। তিনি জেরুসালেমের জন্য ক্রুসেডকে সময়ের অপচয় মনে করতেন। তবে জানতেন, গণদাবিকে এড়িয়ে গিয়ে বেশি দিন চলতে পারবেন না। তিনি নৈরাশ্যমূলকভাবে আল-কামিলের কাছে প্রস্তাব দেন তার কাছে জেরুসালেমকে হস্তান্তর করতে। সর্বোপরি নগরীতে কোনো প্রাচীর ছিল না, সুলতান একে অর্থনৈতিক বা কৌশলগত- কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারতেন না। আল- কামিল রাজি হওয়ার জন্য তৈরি ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তার ভাই দামাস্কাসের সুলতান আল-মোয়াজ্জামের সাথে তার মারাত্মক বিবাদ চলছিল। অথচ ঐক্যবদ্ধ বাহিনী ছাড়া ক্রুসেড সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা চিন্তা করা যায় না। আবার অরক্ষিত জেরুসালেমে ফ্রাঙ্কিশ উপস্থিতি কোনো সামরিক হুমকিও সৃষ্টি করবে না। আর নগরীটি ফ্রাঙ্কদের কাছে ফিরিয়ে দিলে পাশ্চাত্য থেকে বিপদ ও প্রশমিত হতে পারে। ফ্রেডেরিক হতে পারেন আল-মোয়াজ্জামের বিরুদ্ধে কার্যকর মিত্র।

পরিণামে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রাথমিক কিছু ইতস্ততার পর ফ্রেডেরিক ও আল- কামিল ১২২৯ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি জাফায় একটি চুক্তিতে সই করেন। চুক্তিটি করা হয়েছিল ১০ বছরের জন্য। চুক্তি অনুযায়ী খ্রিস্টানেরা জেরুসালেম, বেথলেহেম ও নাজারেথ ১০ বছরের জন্য গ্রহণ করবে। তবে ফ্রেডেরিক জেরুসালেমের প্রাচীর নির্মাণ করতে পারবেন না। ইহুদিদের নগরী ছাড়তে হবে, তবে মুসলিমরা হারাম বহাল রাখতে পারবে। কোনো

ধরনের বাধা ছাড়াই মুসলিমরা সেখানে প্রার্থনা করতে পারবে, মুসলমি পরিচিতি প্রদর্শিত হবে।

চুক্তির খবরে মুসলিম ও খ্রিস্টান উভয় বিশ্বে ক্রোধের সঞ্চার করেছিল। মুসলিমরা ক্রোধে বাগদাদ, মসুল ও আলেপ্পোকে বিক্ষোভ করল, ইমামেরা তেল আল-আজুলে আল-কামিলের শিবিরে ছুটে গেল। তাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে তাড়াতে হয়েছিল। মৃত্যুশয্যায় থাকা আল-মোয়াজ্জাম এই খবরে এতই কষ্ট পেয়েছিলেন যে জেরুসালেমের অবশিষ্ট জেরুসালেমের অবশিষ্ট প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের কাজ ব্যক্তিগতভাবে তদারকির জন্য বিছানা ছেড়ে যাওয়ার জন্য চাপাচাপি করতে লাগলেন। দামাস্কাসের গ্রেট মসজিদে জনতা চিৎকার, শোক প্রকাশ করতে লাগল। আল-কামিলকে শেখ সিবত আল-কাউজি ইসলামের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে অভিহিত করলেন। আল-কামিল আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন : : তিনি ইসলামের পবিত্র স্থাপনাগুলো খ্রিস্টানদের কাছে ছেড়ে দেননি, হারাম এখনো মুসলিম অধিকারে রয়েছে। তারা কেবল 'কিছু চার্চ আর বিধ্বস্ত বাড়িঘর ছেড়ে দিয়েছে, এসবের প্রকৃত কোনো মূল্য নেই। পরের কোনো এক সময় এই নগরী পুনরুদ্ধার করা মুসলিমদের জন্য কঠিন কোনো কাজ হবে না। তবে রক্তপাত ও যুদ্ধের পর জেরুসালেম মুসলিম অখণ্ডতার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। ফলে কোনো ইসলামি শাসকই সহজে পবিত্র নগরী ছেড়ে দিতে পারতেন না।

খ্রিস্টানেরাও একইরকম কষ্ট পেয়েছিল। বিধর্মীদের সাথে এ ধরনের চুক্তি করা ঈশ্বর অবমাননার সামিল। কোনো খ্রিস্টান নগরীতে হারামকে মুসলিমদের কাছে বহাল রাখতে দেওয়া অসহ্যকর। ফ্রেডেরিক যখন পবিত্র নগরীটি সফর করেছিলেন, তখন ফ্রেডেরিকের আচরণ চরমভাবে কেলেঙ্কারিতে পরিণত হয়েছিল। কারণ সম্প্রতি পোপ তাকে সমাজচ্যুৎ করেছিলেন, কোনো পাদ্রিই তাকে জেরুসালেমের রাজা হিসেবে মুকুট পরায়নি। ফলে সম্রাট নিজেই হলি সেপালচার চার্চের উঁচু বেদিতে নিজের মাথায় মুকুট পরান। তারপর তিনি হেঁটে হারামে যান, আরবিতে পার্শ্বচরদের সাথে কৌতুক করেন, স্থাপত্যের প্রশংসা করেন, বাইবেল হাতে আল-আকসায় প্রবেশে সাহস দেখানোর জন্য এক খ্রিস্টান পাদ্রিকে প্রহার করেন। তিনি যখন শুনলেন যে তার সফরের সময় কাজি আজান দিতে নিষেধ

করেছেন, তখন তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী আজান দিতে বলেন। এটি কোনোভাবেই ক্রুসেডার আচরণ হতে পারে না! টেম্পলাররা ফ্রেডেরিককে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, তিনি দ্রুততার সাথে দেশটি ত্যাগ করেন। তিনি একেবারে ভোরে দ্রুততার সাথে জাহাজে ওঠেন, অ্যাকরের কসাইরা তার দিকে নাড়িভুঁড়ি ও গোবর ছুঁড়ে মেরেছিল। জেরুসালেম এখন খ্রিস্টান বিশ্বের কাছে এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে পরিণত হলো যে কেউ যদি মুসলিমদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে বা পবিত্র নগরী সম্পর্কে হেলাফেলা করে, তার নিহত হওয়ার শঙ্কা সৃষ্টি হলো। ফ্রেডেরিকের অনন্য ক্রুসেডের পুরো ঘটনাটি প্রমাণ করে যে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের পক্ষে একে অপরকে মেনে নেওয়া অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হয়েছে : কোনো পক্ষই সহাবস্থান ও শান্তির প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত না।

তা সত্ত্বেও চুক্তিটি ১০ বছরই টিকে থাকে, এমনকি যদিও ফ্রেডেরিকের বিদায় নেওয়ার পরপরই হেবরন ও নাবলুসের মুসলিমরা নগরীতে হামলা চালিয়েছিল, উপকূল থেকে জেরুসালেমগামী তীর্থযাত্রীরা পথে হয়রানির স্বীকার হচ্ছিল। তবে জেরুসালেম রক্ষার মতো সম্পদ খ্রিস্টানদের ছিল না। ১২৩৯ সালে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে কেরাকের গভর্নর আল-নাসির দাউদ সামান্য অবরোধের পর ফ্রাঙ্কদের নগরী ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। তবে আইয়ুবিদের মধ্যে তখনো তীব্র বিবাদ চলতে থাকায় মিসরের সুলতানদের বিরুদ্ধে তাদের সহায়তার বিনিময়ে সামান্য পরে খ্রিস্টানদের কাছে নগরীটি হস্তান্তর করেছিলেন। এবার মুসলিমদের কাছে হারামের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তারা আতঙ্কের সাথে শুনল যে আল আকসা মসজিদে খ্রিস্টানেরা বিশাল বিশাল ঘণ্টা বেঁধেছে, মাস উৎসবে 'রকের ওপর মদের বোতল রেখেছে।' তবে খ্রিস্টানদের মেয়াদ ছিল খুবই কম। ১২৪৪ সালে খাওয়ারাজমাইনের তুর্কি সেনাবাহিনী, মধ্য এশিয়ায় তাদের ভূমিতে মঙ্গোল হামলা থেকে তারা পালিয়ে গিয়েছিল, ফিলিস্তিনে বিপুলভাবে জমায়েত হয়। মিসরের সুলতান সিরিয়ায় তার যুদ্ধগুলোতে তাকে সহায়তার জন্য তাদেরকে তলব করেন। তারা দামাস্কাস লুণ্ঠন করে, জেরুসালেমে তাণ্ডব চালায়, সেখানকার খ্রিস্টানদের হত্যা করে, হলি সেপালচার চার্চসহ ধর্মীয় স্থানগুলোর অবমাননা করে। নগরী আবার আইয়ুবিদের হাতে ফিরে যায়। তবে এর অনেক বাড়ি ও চার্চ ধোঁয়া সৃষ্টিকারী ধ্বংসস্তূপের চেয়ে বেশি কিছু

ছিল না। এই বিপর্যয়ের পর বেশির ভাগ অধিবাসী তুলনামূলক নিরাপদ উপকূলীয় নগরীগুলোতে পালিয়ে যায়। এখন মাত্র হাজার দুয়েক মুসলিম ও খ্রিস্টান অধিবাসী একসময়ের সমৃদ্ধ মেট্রোপলিসে বাস করছিল।

ফ্রান্সের রাজা ৯ম লুইয়ের নেতৃত্বে সপ্তম ক্রুসেড জেরুসালেম পুনঃজয় করতে ব্যর্থ হয়। বস্তুত ১২৫০ সালে পুরো সেনাবাহিনীকে মিসরে বন্দি করা হয়। ক্রুসেডাররা যখন বন্দি ছিল, তখনই অসন্তুষ্ট মামলুকদের একটি গ্রুপ মিসরের আইয়ুবিদেরকে পরাজিত করে নিজেদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। মামলুকেরা মূলত ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমান্তের বাইরে থাকা ইউরেসিয়ান স্তেপ অঞ্চল থেকে এসেছিল। শৈশবে মুসলিমরা তাদেরকে ক্রীতদাস করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছিল। পরে তাদেরকে মুসলিম সেনাবাহিনীর দুর্ধর্ষ রেজিমেন্টে ভর্তি করায়। তাদের বন্দি ও ধর্মান্তরের পর তাদের জীবন নাটকীয়ভাবে উন্নত হওয়ায় তারা নিবেদিতপ্রাণ মুসলিমে পরিণত হয়েছিল। তারা তাদের স্বতন্ত্র জাতিগত পরিচিতি বজায় রেখেছিল, একে অপরের প্রতি প্রবল সংহতি অনুভব করত। এখন বাহারিয়া রেজিমেন্ট মিসর দখল করে নতুন মামলুক রাজ্য সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে তারা নিকট প্রাচ্যের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়।

মামলুকদের উত্থানে প্রথমে জেরুসালেমের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি। সালাউদ্দিনের সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট আইয়ুবিরা তাদের বিরোধিতা করে, জেরুসালেমের অবস্থান অব্যাহতভাবে অস্থিতিশীল থাকে। তবে ১২৬০ সালে মামলুক সুলতান আল জাহির বেইবার্স (১২৬০-৭৬) গ্যালিলির আইন জালুতের যুদ্ধে হানাদার মঙ্গোল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। এটি ছিল গৌরবময় অর্জন : মঙ্গোলেরা আব্বাসি খিলাফতকে বিধ্বস্ত করেছিল, খোদ বাগদাদসহ মুসলিম নগরীগুলো লুণ্ঠিত ও ধ্বংস করেছিল। এখন বেইবার্স ফোরাত উপকূল থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে ইসলামের বীরে পরিণত হলেন। মঙ্গোলেরা আইয়ুবি সুলতানদেরও পরাজিত করেছিল বলে বেইবার্স এখন সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের শাসকে পরিণত হলেন। তাকে তখনো মাঝে মাঝে মঙ্গোল আক্রমণ মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। এর মধ্যেই তিনি উপকূলীয় রাজ্য থেকে ফ্রাঙ্কদের বিতাড়িত

করতে মনস্থ করলেন। কয়েক বছর ধরে ওই অঞ্চলে যে নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলা চলছিল, মামলুকরা শেষ পর্যন্ত এর অবসান ঘটান।

মামলুকদের কাছে জেরুসালেমের কোনো কৌশলগত গুরুত্ব ছিল না। তারা কখনো প্রাচীর পুনঃনির্মাণ করতে আগ্রহী হয়নি। তবে তারা নগরীর পবিত্রতায় সবচেয়ে বেশি অভিভূত হয়েছিল। তাদের আমলে এই নগরীর ধর্মীয় মর্যাদা ব্যাপকভাবে বাড়ে। প্রায় সব সুলতান জেরুসালেম সফর করেছেন, সেখানে নতুন নতুন ভবনে সুশোভিত করেছেন। বেইবার্স ১২৬৩ সালে আল-কুদস সফর করেন। তিনি হারামের সংস্কার কাজ ছাড়াও জেরুসালেমের নিরাপত্তা সমস্যার অভিনব সমাধান করেন। ইস্টার ছিল বিশেষভাবে বিপজ্জনক সময়। কারণ তখন নগরীটি খ্রিস্টানদের দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। এ কারণে বেইবার্স দুটি নতুন ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণ করেন : একটি জেরিকোর কাছে নবী মুসা (নেবি মুসা) এবং অপরটি রামাল্লায় আরবের নবী সালির সম্মানে। ইস্টারের আগের সপ্তাহে এই দুই নবীর উৎসব হতো। ফলে জেরুসালেমের আশপাশ তখন এই অরক্ষিত সময়ে মুসলিম তীর্থযাত্রীতে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। নবী মুসা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তীর্থযাত্রীরা জেরুসালেমের চারপাশ ঘুরে হারামে যেত, রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা বের করত, যেমনটি তারা কয়েক শ’ বছর ধরে খ্রিস্টানদের করতে দেখেছিল। তারা আল-কুদসে তাদের মালিকানা প্রদর্শন করত, ঠিক যেভাবে একসময় খ্রিস্টানেরা করত। নবী মুসায় বিশেষ ব্যানার উড়ানো হতো। সব তীর্থযাত্রী জেরুসালেমে সমবেত হওয়ার পর জনতা পবিত্র স্থানটির উদ্দেশে যাত্রা করত। এর মাধ্যমে তাদের বিপুল সংখ্যার বিষয়টি খ্রিস্টানদের জানানো হতো। নবী মুসায় তারা সপ্তাহ ধরে ইবাদত করত, কোরাআন তিলায়াত করত, সুফি তরিকার বিধিবিধানের চর্চা করত। এছাড়া তারা ওই ধর্মীয় স্থান ও আশপাশের পাহাড়গুলোতে শিবির স্থাপন করে নিজেদের সাহচার্য উপভোগ করত। এদিকে খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা জেরুসালেমে ইস্টার উদযাপনের সময় জানত যে আল-কুদস রক্ষার জন্য মুসলিমরা তৈরি হয়ে আছে। এটি ছিল কুশলী পরিকল্পনা। তবে নবী উৎসবের পাশাপাশি নতুন নতুন ধর্মীয় স্থানে অন্য যেসব উৎসবের আয়োজন করা হতো, সব মিলে মুসলিম ধর্মানুরাগের নতুন রক্ষাণাত্মক অবস্থা প্রদর্শন করত।

একটি উগ্র উপাদানও জেরুসালেমে ইহুদি ধর্মানুরাগে অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছিল। ১২৬৭ সালে রাব্বি মোসেস বেন ন্যাচম্যান, তিনি ন্যাচম্যানিডেস নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন, খ্রিস্টান স্পেন থেকে জেরুসালেমে আলিয়া করেন। তিনি নগরীর দুর্দশা দেখে আঁতকে ওঠেছিলেন। তিনি পৌছে মাত্র দুটি ইহুদি পরিবার দেখেছিলেন। অকুতোভয় ন্যাচম্যানিডেস জিউশ কোয়ার্টারে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে সুন্দর ফটকশোভিত একটি সিনাগগ প্রতিষ্ঠা করেন। রামবান সিনাগগটি (রাব্বি মোসেস বেন ন্যাচমেনের নামে) মামলুক জেরুসালেমে ইহুদি জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তালমুদবাদী হিসেবে ন্যাচম্যানিডেসের বুদ্ধিবৃত্তিক খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ছাত্ররা তার কাছে আসতে থাকে। তারা তার ইয়েশিভার অধ্যায়নের জন্য জেরুসালেমে বসতি স্থাপন করে। শেকড়ের টানহীন নতুন অনুভূতিতে ন্যাচম্যানিডেস জেরুসালেমের সাথে দৈহিক সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে স্বস্তি পেয়েছিলেন। তিনি এর পাথরগুলোকে 'আদর' ও 'সোহাগ' করতে পারতেন, ধ্বংস্তুপের ওপর কান্না করতে পারতেন। ধরে নেওয়া হতো যে বিধ্বস্ত নগরীটি স্পেনে ফেলে তার স্ত্রী ও পরিবারের মতো হয়ে ওঠেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সব ইহুদির দায়িত্ব হলো ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করা। জেরুসালেম ও আশপাশের এলাকার করুণ দশায়, যা তিন শ' বছরের সবিরাম যুদ্ধে ভেঙ্গে পড়েছিল, মনে হচ্ছিল যে খ্রিস্টান বা মুসলিমদের অধীনে আর কখনো এই ভূমিটি সমৃদ্ধ হবে না, তবে এর সত্যিকারের মালিকদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছে। ন্যাচম্যানিডেস মনে করেছিলেন, আলিয়া ছিল একটি ইতিবাচক কর্মবিধি' একটি বাধ্যবাধকতামূলক নির্দেশ, যা ইহুদিদের প্রতিটি প্রজন্মের ওপর বর্তায়। তবে স্পেনে ন্যাচম্যানিডেস যে সেমিটিকবিরোধী নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, তাতে তার মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, খ্রিস্টান ও মুসলিমদের প্রতি বিতৃষ্ণার জন্ম হয়েছিল। অথচ পূর্ববর্তী শতকগুলোতে ইসলামের অধীনে আন্দালুসিয়ায় ইহুদিরা কয়েক শত বছর ধরে সফলভাবে একসাথে বাস করেছিল। তিনি এখন তার ইহুদি জাতির উদ্দেশে যেসব কথা বলছিলেন, সেগুলো ফিলিস্তিনে তার জাতির রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করছিল:

আমাদের উচিত হবে ওইসব জাতির ধ্বংস উপভোগ করা যদি তারা আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। তবে যদি তারা শান্তি স্থাপন করতে চায়, আমরা তাদের সাথে শান্তি স্থাপন

করব, তাদেরকে কিছু শর্ত পালন করতে দেব। তবে আমরা তাদের হাতে বা অন্য কোনো জাতির হাতে আর কখনোই এই ভূমি ছেড়ে দেব না!

প্রাচ্যে ক্রুসেড ও ইউরোপে পুনর্জয় তিন ইব্রাহিমি ধর্মের মধ্যে নতুন ও স্থায়ী ভাঙন সৃষ্টি করেছিল।

ন্যাচম্যানিডেস ছিলেন কাব্বালিপন্থী। এই গ্রুপের লোকজন ১৩ শতকে স্পেনে বিকশিত মরমিবাদের সন্ন্যাস ধরণটি অনুশীলন করত। এমনকি যদিও অল্প কিছু সংখ্যক ইহুদির এ ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করার সামর্থ্য ছিল। কাব্বালার আধ্যাত্মিক দর্শন ও মিথ পরে ইহুদি ধর্মানুরাগের আদর্শে পরিণত হয়েছিল। বস্তুত কাব্বালারা এই সময়ে ইহুদি ধর্মের অনেক বেশি যৌক্তিক রূপের বিপরীতে পুরানতত্ত্বের বিজয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। নতুন বিতৃষ্ণায় স্প্যানিশ ইহুদিরা তাদের দুর্দশা থেকে দার্শনিক ঈশ্বরকে অনেক দূরে দেখতে পেয়েছিল। তারা সহজাতভাবে পুরনো ঐশী ভূগোলের দিকে নজর দিয়েছিল। এই ভূগোল তখনো আরো বেশি অন্তর্মুখী ও আধ্যাত্মিকসম্পন্ন হয়ে পড়েছিল। দেভিরে অপ্রবেশযোগ্য ঈশ্বরের কাছ থেকে পবিত্রতার ১০ ডিগ্রি বিচ্ছুরণ দেখার বদলে ইহুদিরা এখন ধারণাতীত ও চরমভাবে রহস্যময় ঈশ্বর (যাকে তারা বলত আইন সফ : 'অনন্ত') কল্পনা করতে লাগল, যা ১০ সংখ্যায় পৃথিবীর দিকে ছুটতে লাগল, ঈশ্বরের প্রতিটি গোপন বার্তায় পরবর্তী পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করত বা মানবীয় সত্তার সীমিত মনের সাথে খাপ খাইয়ে নিত। এই ১০ সংখ্যা সচেতনতারও প্রতিনিধিত্ব করত, যা মরমি সাধকেরা ঈশ্বরের পথে যেত। আবারো বলা যায়, এটি ছিল 'ধারণাতীত অন্তরাত্মা'। জেরুসালেম টেম্পলের আধ্যাত্মিকতার পুনঃঘোষণাবিষয়ক কাব্বালার ধারণাটি ঈশ্বর ও মানুষ উভয়ের ভেতরে অংশকে প্রতীকীভাবে ফুটিয়ে তোলে। স্বর্গীয় প্রকৃতি ও মানবতার ধারার মধ্যকার এই পরিচিতির ওপর জোর দিত কাব্বালা। শেষ সৃষ্টি ছিল শেখিনা, যাকে বলা হতো মালখুথ ('প্রাধান্য')। এটি একইসাথে ঐশী উপস্থিতি ও ইসরাইলি জনগণকে ঐক্যবদ্ধকারী শক্তিকে ধারণ করত। এখানে নিচে থাকা শেষ সৃষ্টি জায়নের সাথে শনাক্ত হয়। এটি ঐশী মণ্ডলকে এর জাগতিক বাস্তবতা না হারিয়েই ধরে রাখত। ঐশী উপস্থিতি, ইসরাইল, জেরুসালেম অবিভাজ্য থাকার অনুভূতি প্রবল করে।

কাব্বালা জেরুসালেমে আলিয়া না করেই প্রবাসেই ঈশ্বর যাত্রা সৃষ্টি করতে সক্ষম করে তোলে। তবে এতে জোর দেওয়া হয় যে জায়ন থেকে ইহুদি বিচ্ছিন্নতা ছিল শয়তানি শক্তির জয়।’ এক্সডাসের সময় ইসরাইলিরা আতঙ্কের মরুভূমি’ নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়েছিল, বুনো পরিবেশে তাড়িত হয়ে দানবীয় শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল তাদেরকে। ইসরাইলিরা স্থানের দখল নিয়ে মাউন্ট জায়নের ওপর প্রার্থনাবিধি উদ্বোধন করার সাথে সাথেই শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সবকিছুই যযথাযথ স্থানে ফিরে এসেছিল। শেখিনা বাস করেছিল দেভিরে, যা ছিল পুরো বিশ্বের আশীর্বাদ, উর্বরতা, শৃঙ্খলার উৎস। এখন সব অস্তিত্বের কেন্দ্রে গভীর ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে, যা সংশোধিত হবে যখন ইহুদিরা জায়নের সাথে আবার ঐক্যবদ্ধ হবে, তাদের যথার্থ স্থানটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এই কিংবদন্তি দেখায়, কিভাবে তাদের ভৌগোলিক স্থানচ্যুতি ইহুদি আত্মাকে আক্রান্ত করেছিল : এটি সত্তার উৎস থেকে আরো বেশি বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছিল। এখন ইহুদিদের স্পেন থেকে বের করে দিতে শুরু করেছে খ্রিস্টানেরা। তারা নতুন করে নিঃসঙ্গ অনুভব করতে লাগল। কাব্বালার মিথগুলো ইউরোপের বাকি অংশে ইহুদিদের অবস্থার কথাও প্রকাশ করতে লাগল। ক্রুসেডারদের বারবারের নির্যাতনের পর থেকে তাদের জীবন অসহ্যকর হয়ে পড়েছিল। এই পুরানতত্ত্ব, স্পষ্টভাবে বলা যায় তার ঘরোয়া বিশ্ব, ইহুদি দার্শনিকদের আরো বেশি কল্পনাপ্রসূত মতবাদ আরো গভীরভাবে ধারণ করেছিল। এই পর্যায়ে বেশির ভাগই ছিল প্রতীকি ও জায়নে আধ্যাত্মিকভাবে ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত। বস্তুত, ফিলিস্তিনে আলিয়ার মাধ্যমে পরিত্রাণ ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করা তখনো ভুল বিবেচিত হতো। তবে ন্যাচমানিদেসের মতো কোনো কোনো কাব্বালবাদী জেরুসালেমের সাথে দৈহিক যোগাযোগের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করার অনুপ্রেরণা অনুভব করতেন।

পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানেরা এই অবস্থার মুখোমুখি পড়তে হয়েছিল যে তারা সম্ভবত আর কখনোই জেরুসালেমে ফিরে গিয়ে এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে না। ১২৯১ সালে মামুলক সুলতান খালিল শেষ পর্যন্ত অ্যাকর রাজ্য ধ্বংস করে ফ্রাঙ্কদেরকে তাদের উপকূলীয় রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেন। দুই শত বছরের মধ্যে এই প্রথম পুরো ফিলিস্তিন মুসলিমদের হাতে এলো। এই পর্যায় থেকে জেরুসালেমের ভাগ্য বদলাতে থাকে। ফ্রাঙ্করা

দৃশ্যপটে আর না থাকায় মুসলিমরা নগরীতে ফিরে আসতে নিরাপদ বোধ করতে থাকে। অবশ্য তখনো নগরীতে যথাযথ দুর্গ ছিল না। তবে খ্রিস্টানেরা হাল ছাড়েনি। কয়েক শ' বছর পর্যন্ত তারা নতুন ক্রুসেডের পরিকল্পনা করা, পবিত্র নগরী মুক্ত করার স্বপ্ন দেখা অব্যাহত রাখে। জেরুসালেমে পাশ্চাত্যের শক্তি কিছুটা সুরক্ষিত থাকাটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। অ্যাকর পতনের সামান্য পর পোপ চতুর্থ নিকোলাস হলি সেপালচারে কাজ করার জন্য এক দল ল্যাতিন পাদ্রিকে সুযোগ দিতে সুলতানকে অনুরোধ করেন। সুলতান তাতে রাজি হন। পোপ নিজে ফ্রান্সিসক্যান হওয়ায় তিনি জেরুসালেমে একটি ছোট ভিক্ষু দলকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। তাদের কোনো কনভেন্ট ছিল না, আয় ছিল না। তাদেরকে সাধারণ তীর্থ হোস্টেলে থাকতে হতো। ১৩০০ সালে তাদের দুর্দশার বিষয়টি সিসিলির রাজা রবার্টের নজর কাড়ে। তিনি সুলতানকে উপহার হিসেবে বিপুল অর্থ দিয়ে ফ্রান্সিসকানদেরকে মাউন্ট সায়নে, হলি সেপালচার চার্চে দি মেরি চ্যাপেল, চার্চ ও ন্যাটিভিটি কেভ নির্মাণ করার অনুরোধ করেন। এতেও সুলতান রাজি হন। এই প্রথমবারের মতো পাশ্চাত্যের কোনো শক্তি জেরুসালেমে ল্যাতিনদের স্বার্থ বাড়ানোর জন্য তাদের প্রভাব প্রয়োগ করল। এরপর এ ধরনের ঘটনা আরো ঘটেছিল। এরপর সায়ন চার্চ ফ্রান্সিসকানদের নতুন সদরদফতরে পরিণত হয়, ফাদার সুপিরিয়র প্রাচ্যের বসবাসরত সব ইউরোপিয়ানের কাস্টস বা অভিভাবকে পরিণত হন। তিনি কার্যত জেরুসালেমে কাউন্সিলের ভূমিকা পালন করছিলেন। ফ্রান্সিসকানরা বিশ্বের অন্যান্য অংশে ইসলামের বিরুদ্ধে জঙ্গিনীতি গ্রহণ করেছিল। ইউরোপে তাদের ধর্মীয় প্রচারণা প্রায়ই সেমিটিকবিরোধী নির্যাতনের কথা বলত। ফলে জেরুসালেমে প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকায় নামা তাদের জন্য হয়ে পড়েছিল কঠিন।

এখন দেশে শান্তি বিরাজ করছে। মঙ্গোল ও ক্রুসেডার হুমকি কমে যাওয়ায় মামলুকদের আমলে ফিলিস্তিন সমৃদ্ধ হয়। জেরুসালেম কখনো তাদের সাম্রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল না। এটি শাসিত হতো নিম্ন পর্যায়ের আমিরের মাধ্যমে। আনুকূল্যবঞ্চিত কর্মকর্তাদের নির্বাসনে পাঠানোর মতো করে এখানে দায়িত্ব দেওয়া হতো। এই অরক্ষিত শহরে তারা সামান্যই ক্ষতি করতে পারতেন। তবে এসব নির্বাসিতদের অনেকে আল-কুদসের ধর্মীয় জীবনে আকৃষ্ট হতেন। তাদের অনেককে জেরুসালেমের দুটি হারাম ও

হেবরনের সুপারিনটেন্ডেন্টের মর্যাদা দেওয়া হতো। অনেকে ওয়াকফ বিভাগে কাজ করতেন। ভবন নির্মাণের পূণ্য কাজ অব্যাহত ছিল। এটিই অনেক সুফি, আলেম, শিক্ষক, ফকিহ, তীর্থযাত্রীকে শহরে নিয়ে আসে। মামলুকেরা জেরুসালেমকে বদলে দিয়েছিল। হারামে কিছু নির্মাণের অধিকার ছিল কেবল সুলতানদেরকেই। এই সুবিধা বেশির ভাগ সুলতানই গ্রহণ করতেন। ১৩১৭ সালে সুলতান আল-নাসির মুহাম্মদ উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তগুলোজুড়ে নতুন স্তম্ভ শ্রেণি নির্মাণ করেন। তিনি আকসার গম্বুজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, ডোম অব দি রক নতুন করে সোনায় মুড়িয়ে দেন। তিনি পুরনো ক্রুসেডার মার্কেটের স্থানে নতুন একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র নির্মাণ করেন। চতুর্দশ শতকের শুরুর দিকে এটি ছিল জেরুসালেমের নতুন সমৃদ্ধির চিহ্ন। নগরীতে সাবান, সূতা ও লিনেন সামগ্রী তৈরি হতো। হারাম নথিপতে দেখা যায়, প্রাচ্যের বিদেশী ব্যবসায়ীরা, বিশেষ করে বস্ত্র বণিকরা, প্রায়ই নগরীতে উপস্থিত হতেন। অবশ্য আমাদের কাছে বাণিজ্যের প্রকৃত আকার সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। সুলতানের নতুন বাজারটিকে বলা হতো সুক আল-কাত্তানিন তথা কটন মার্চেন্ট মার্কেট। তিনি হারাম প্রাচীরের সাথে একে সংযোগ সাধন করতে চেয়েছিলেন। তিনি সেখানে নতুন একটি চমকপ্রদ ফটক নির্মাণ করেন। এর নাম ছিল বাব আল-কাত্তানিন। এখান দিয়ে ২৭টি ধাপ পাড়ি দিয়ে হারাম প্লার্টফমে যেতে হতো।

পবিত্র স্থানের সাথে সংযোগ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি অনেক সময় ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ইহুদি ভক্তিকে ফুটিয়ে তুলত। মামলুক আমলে হারামকে স্পর্শ করার এই আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে দৃশ্যমান হতো নতুন নতুন মাদারাসা তথা হারামের প্রান্তগুলোজুড়ে নির্মাণে। স্থপতিরা প্রায়ই প্রখর প্রতিভাধর ছিলেন। কারণ স্থান ছিল মহার্ঘ (ডায়াগ্রাম দেখুন)। হারামের কেবল উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তগুলোতেই নির্মাণ সম্ভব ছিল। কারণ পূর্ব ও দক্ষিণ দিকগুলোর প্রান্তভাগ ছিল খুবই সরু। তবে সব দাতাই চাইতেন তাদের মাদরাসা থেকে যেন হারাম দেখা যায় বা পবিত্র স্থানের ভূমি স্পর্শ করে। প্রথম দিকে ওয়াকফ করা পশ্চিম দিকের সহায়ক প্রাচীরসহ একটি ভবনকে ওয়াকফ করেছিলেন তানজিক, ১৩২৮ সালে। তিনি ছিলেন সিরিয়ার ভাইসরয়। তিনি ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থানটির এত কাছে ভবন নির্মাণ করতে পেরে গর্বিত ছিলেন। তানজিকিয়া মাদরাসার মসজিদে থাকা একটি খোদাইলিপিতে লেখা ছিল : '[আল্লাহ] আকসা মসজিদের পাশে তার মসজিদ

নির্মাণ করিয়েছেন, এই ঘনিষ্ঠ নৈকট্য কতই না ভালো।' ভবনটি ছিল দারুণভাবে সুসজ্জিত। ক্রুশাকার আকারের এই ভবনে চারটি লেকচার হল ও সামাজিক নামাজঘর ছিল। সবগুলোই মাঝখানের আঙিনায় শেষ হয়েছিল। তানজিকিয়া কেবল একটি মক্তবই ছিল না। এতে ১১ জন সুফির জন্য একটি খানকাহ, এতিমদের জন্য একটি স্কুল ছিল। অধ্যায়ন, আধ্যাত্মিক সাধনা, জনহিতৈষী- সবই হতো একই ছাদের নিচে। পরিকল্পনাটি একীকরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। এটি পবিত্র স্থান সম্পর্কে মুসলিম ধারণার এখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এতে আরো দেখা যায়, কেন্দ্রীয় বাস্তব দান আল-কুদসকে কিভাবে ইসলামিকরণ করেছিল। অবশ্য ওই স্থপতি আবিষ্কার করেন যে স্থানটি সব প্রতিষ্ঠানকে পর্যাপ্তভাবে ধারণ করার পক্ষে খুবই ছোট। ফলে তার সুফিদের খানকাহ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে হয়েছিল সুলতানের হারামের পশ্চিম সীমান্তের ওপর বারান্দার উপরিভাগে। এখন সুফিরা তাদের আধ্যাত্মিক দীক্ষায় তাদের নিজস্ব অনুসন্ধানের মডেল হিসেবে ডোম অব দি রকের দিকে তাকাতেন।

অন্যান্য দাতা দ্রুততার সাথে তানজিকের উদাহরণ অনুসরণ করেন। আমিনিয়া মাদরাসাটি (১২২৯-৩০) খুবই সংকীর্ণ স্থানে (মাত্র ৯ মিটার, অ্যান্টোনিয়া পাহাড় ও রাস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত) ঠাসাঠাসি অবস্থায় ছিল। ফলে নির্মাণকাজ হয়েছে ঊর্ধ্বমুখী। তৃতীয় তলা নির্মাণ হয়েছে উত্তর দিকের ছাদে। মালিকিয়া মাদরাসাও একইভাবে সমস্যাটির সমাধান করে। ফলে শরিয়াহ মাদরাসাটি থেকে হারাম দেখা যেত। মানজাকিয়া মাদরাসা (১৩৬১) পুরোপুরি ছাদে নির্মিত হয়েছিল। এটি নির্মাণ করা হয়েছিল বাব আল-নাসিরের ছাদে। মামলুক আমলে এটি ছিল হারামের ব্যস্ততম প্রবেশপথ। তুলুনিয়া মাদরাসা ও ফারানিয়া মাদরাসাও নির্মিত হয়েছিল উত্তর বারান্দার শীর্ষে। বাব-আল-আসবাতের (গেট অব দি ট্রাইবস) দুই দিকে ছিল এ দুটি স্থাপনা। অন্য কোনো প্রবেশপথ না থাকায় ছাত্রদেরকে মিনারের সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হতো।

হারাম আস-শরিফের সীমান্তগুলোর এই দৃশ্য প্রমাণ করছে, মামলুকদের জন্য পবিত্র স্থানটির প্রান্ত ঘেষে ছাদগুলোর উপরে তাদের মাদরাসা নির্মাণ কিভাবে সম্ভব ছিল।

ইহুদি ধর্মের মতো এখানে আইন অধ্যায়ন নিরস, প্রাতিষ্ঠানিক ছিল না। বরং এখানে আধ্যাত্মিক উপাসনার ব্যবস্থা ছিল, দেহ-মনে আল্লাহর দিকে পরিচালনার সুযোগ ছিল। মহান ইসলামি আধ্যাত্মিক যাত্রার প্রতীক ডোম অব দি রকের দিকে তাকিয়ে অধ্যায়ন করার আকাঙ্ক্ষায় তা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তবে মঙ্গোল হামলার পর মাদরাসা সম্পূর্ণ নতুন গুরুত্ব লাভ করে। অসংখ্য লাইব্রেরি, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি লুণ্ঠিত ও পুড়িয়ে দেওয়া হওয়ায় মুসলিমরা তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের নতুন করে তাগিদ অনুভব করে। যা কিছু হারিয়ে গেছে সেইসব পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে, এবং সম্ভবত অনিবার্যভাবে, এক ধরনের নতুন সংরক্ষণবাদ প্রবেশ করে ইসলামি চিন্তাধারায়। হারামের চারদিকে সুরক্ষামূলকভাবে নির্মিত এসব মাদরাসাকে পবিত্র স্থান ও বৈরী বিশ্বের মধ্যকার নিরাপত্তা বেষ্টনি সৃষ্টির চেষ্টা হিসেবেও দেখা যেতে পারে। মুসলিমরা জেরুসালেমকে কোন দৃষ্টিতে দেখে তা নতুন রক্ষণাত্মক অবস্থানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। নগরীজুড়ে নির্মিত সংযমমূলক লঙ্গরখানাগুলোর (রিবাত) মাধ্যমেও বিষয়টি দেখা যেতে পারে। শুরুতে রিবাত ছিল সামরিক দুর্গ। এখন তা দরবেশ, গরিব ও তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়ের স্থান হিসেবে দেখা হতে লাগল।

নতুন রক্ষণশীলতা মোকাবিলা করেছিল সুফি আন্দোলন। মঙ্গোল অভিশাপের পর মুসলিমরা বিপর্যয় ও দুর্ভোগ সম্পর্কে কিছু চূড়ান্ত ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করার প্রেক্ষাপটে এটি বিপুলভাবে বিকশিত হয়েছিল। আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে চতুর্দশ শতকে আল-কুদসে সুফিদের জমায়েত অনেক বেশি হয়েছিল। এদের অনেকে হারামের পাশে গড়ে ওঠা নতুন নতুন ভবনে বাস করতে শুরু করেন, অনেকে নগরীজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরো ছোট সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান করে নেন। সুফিবাদ অল্প কিছু লোকের গ্রহণ করা কোনো শাস্ত্র ছিল না। এটি জনপ্রিয় আন্দোলনও ছিল। প্রচণ্ড রকমের ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে আলেমদের প্রচলিত শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে বলত। অবশ্য অনেক সুফি শেখ মাদরাসাগুলোও সুফিবাদের শিক্ষা দিতেন। শেষ পর্যন্ত সুফিবাদ ইসলামি বিশ্বে মুক্ত চিন্তার চেতনা প্রবর্তন করে। সুফিরা বিশাল তরিকা গঠন করতে শুরু করে, তাদের অনেকে এই সময় জেরুসালেম নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে তাদের সদস্যরা খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের মতো দুনিয়া বিমুখ হওয়ার শিক্ষা দিতেন না। অত্যন্ত

প্রভাবশালী কাদিরিয়া তরিকা, এর সদরদফতর ছিল পুরনো হসপিটাল কমপ্লেক্সে, শিক্ষা দিত যে সামাজিক ন্যায়বিচার হলো সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্তব্য। জিহাদের জন্য আধ্যাত্মিক ও অন্তরাত্মার ইবাদত একসাথে জরুরি। আর এর সাথে থাকতে হবে বাস্তব অনুরাগ। নগরীর উত্তরে বিস্তামিয়ায় প্রতিষ্ঠিত বিস্তামিয়া তরিকা স্বপ্ন ও স্বপ্নবিভাব যে স্তরে থাকে, তাতে আরো গভীরভাবে মিশে যেতে তরিকার সদস্যদের আরো মনোযোগী করতে সহায়তার জন্য যোগ সাধনা শেখাত। এই তরিকায় সুলেহ কুল (সার্বজনীন সমন্বয় সাধন) নামের একটি কর্মসূচিও পরিচালনা করত। এতে বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য একে অপরকে বোঝা সহজ হতো। কয়েক শ' বছরের ঘৃণা ও যুদ্ধের পর এটি ছিল পুনঃএকীকরণের একটি প্রচেষ্টা যা আল-কুদসের উত্তপ্ত নগরীতে ছিল খুবই মূল্যবান।

রক্ষণশীল ও উদ্ভাবনশীলদের মধ্যকার সঙ্ঘাত চতুর্দশ শতকের সংস্কারক তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়ার রচনাবলীতেও দেখা যায়। তিনি জেরুসালেমের প্রতি নতুন তীব্র অনুরাগে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল, এটি ইসলামি ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মামলুক আমলে ফাজায়েল-কুদস শ্রেণির অন্তত ৩০টি নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এগুলোতে বারবার নগরীর পবিত্রতা নিয়ে পুরনো ঐতিহ্যগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে মুসলিমদেরকে জেরুসালেম জিয়ারতের আহ্বান জানানো হয়। অতি সঙ্গোপনে হারাম ভক্তির যে ব্যবস্থা প্রচারিত হয়েছিল, তাতে ইমাম তাইমিয়া বিরূপ হয়েছিলেন। আমরা দেখেছি, কিছু সময়ের জন্য মুসলিমরা জেরুসালেমে হজের কিছু শাস্ত্রাচার পালন করত। মক্কা থেকে আল-কুদস যে কিছু পবিত্রতা হাসিল করেছে, এটি ছিল তাদের ওই বিশ্বাস প্রকাশের পন্থা। ইবনে তাইমিয়া তার ছোট কিতাব 'ইন সাপোর্ট অব পায়াস ভিজিটস টু জেরুসালেম'-এ জোর দিয়ে বলেছেন, মক্কার হজ থেকে আল-কুদস জিয়ারতকে আলাদা রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাবাঘরের মতো ডোম অব দি রকে তাওয়াফ করা ও চুমু খাওয়াও ভুল। ক্র্যাডল অব জেসাসের মতো ধর্মীয় স্থানগুলোর পুরোপুরি বানোয়াট, একমাত্র বোকারাই এসব বিশ্বাস করতে পারে। অবশ্য ইবনে তাইমিয়া তখনো বিশ্বাস করতেন যে জেরুসালেম ইসলামি বিশ্বের তৃতীয় পবিত্রতম নগরী। তবে তিনি পরিষ্কার করে দাবি করতেন যে জিয়ারত হতে পারে কেবল ব্যক্তিগত ভক্তি থেকে, হজের মতো এটি মুসলিমদের জন্য বাধ্যবাধকতাপূর্ণ নয়। ঐতিহ্য রক্ষা ও

বিদায়াত (উদ্ভাবন) বন্ধ করতে তার প্রবল আগ্রহ ছিল ওই সময়ের বৈশিষ্ট্য। জেরুসালেম সম্পর্কে তার চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। তারা তখনো ফাজায়েল আল-কুদস থেকে উদ্ধৃতি দিত, জেরুসালেমবিষয়ক সব মতবাদকে নির্ভুল মুসলিম ধর্মানুরাগ বিবেচনা করত।

এই ধর্মানুরাগ সবসময় সহজেই পরিশীলিত করা সম্ভব হয় না। কোনো কোনো ফাজায়েলে জিয়ারতকে সাহসিকতা ও সহিষ্ণুতা প্রয়োজন হয়, এমন ধার্মিক কাজ হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুহাম্মদের (সা.) উদ্ধৃতি দিয়ে নতুন একটি হাদিসে বলা হয়, যে 'জেরুসালেমে বাস করবে, সে মনে করবে সে জিহাদে নিয়োজিত যোদ্ধা। অন্যরা আল-কুদস সফরের 'অসুবিধা ও বিরূপতা'র কথা বলেন। চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ নাগাদ মামলুক ব্যবস্থায় প্রথম ফাটল দেখা যায়। নতুন সুলতানেরা তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে কঠিন অবস্থায় পড়েছিলেন। ক্রুসেডার আমলে জেরুসালেমে হামলা করতে ভয় পেত বেদুইনেরা। এখন তারা আবার ঘন ঘন আক্রমণ চালাতে শুরু করল। ১৩৪৮ সালে সত্যিই তারা নগরীর সব অধিবাসীকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ১৩৫১-৫৩ সময়কালে 'ব্ল্যাক ডেথে' জেরুসালেম ভয়াবহভাবে আক্রান্ত হয়। তারপর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে গভর্নর নিযুক্ত হতেন একেবারে স্বল্প সময়ের জন্য। তারা আবার স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান থাকত না। পঞ্চদশ শতকের শুরুতে বেদুইন হামলা বাড়তে লাগল, খ্রিস্টান জলদস্যুরা ফিলিস্তিনের উপকূলীয় নগরীগুলোতে হানা দিতে লাগল। অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ল, কর বেড়ে গেল। এছাড়া নগরীতে প্রায়ই দাঙ্গার সৃষ্টি হতো, এতেও হতাহতের ঘটনা ঘটত। এসব সমস্যা সত্ত্বেও ভবন নির্মাণ জিহাদ অব্যাহত ছিল। সুলতান আন-নাসির হাসান (১৩৪৭-৫১) ও আল-সালিহ সালিহ (১৩৫১-৫৪) আল-আকসা মসজিদের বড় ধরনের সংস্কার সাধন করেন। নগরী ও হারামের আশপাশে নতুন নতুন মাদরাসা ও রিবাত চালু হয়। এসব ফাউন্ডেশনের জন্য জেরুসালেমে অর্থ আসতে থাকে। তবে এসব অর্থ নগরীর অর্থনীতির জন্য সহায়ক হয়নি। কারণ মাদরাসাগুলো কোনো আয় সৃষ্টি করত না।

অন্যান্য সময়ের মতো মুসলিম জেরুসালেমের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা খ্রিস্টান ও মুসলিমদের শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস আরো কঠিন করে তুলেছিল। ইহুদিরা ইসলামের প্রতি বৈরিতা অনুভব করত না। চতুর্দশ শতকে ইহুদি সম্প্রদায়কে সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছে সফরকারীরা। তবে এই কঠিন সময়ে নতুন অভিবাসীদের বেশির ভাগই গ্যালিলিতে বসবাস করতে চাইত এখানে অনেক বেশি সুযোগ ছিল। স্থানটি রাব্বানিক পবিত্র স্থানে পরিণত হয়েছিল। তীর্থযাত্রীরা এখন রাব্বি ইয়োহানান বেন জাক্কাই ও রাব্বি আকিভার মতো তালমুদীয় মহান পণ্ডিতদের কবরে প্রার্থনা করতে পছন্দ করত। কাব্বালবাদী ক্লাসিক জোহরের নায়ক রাব্বি সাইমিয়ন বেন ইয়োহইয়ের কাছে সাফেদ আরেকটি পবিত্র নগরীতে পরিণত হয়। বিশেষ করে মরমিবাদের দিকে ঝোঁকবিশিষ্ট ইহুদিরা এই স্থানের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হতো। মুসলিমরাও এসব কবরকে সম্মান জানাত। ইহুদি সফরকারীরা উল্লেখ করেছেন, ফিলিস্তিনে একই ধর্মীয় স্থানে ইহুদি ও 'সারাসিনেরা' যেত। স্থানীয় খ্রিস্টান ও আর্মেনিয়ানদের সাথে সুসম্পর্ক উপভোগ করত মুসলিমরাও। আল-কুদসের শান্তি বিঘ্ন ঘটাতে প্রধান সমস্যা সৃষ্টি করত মুসলিম ও পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের মধ্যকার উত্তেজনা। এটি ছিল ক্রুসেডের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৩৬৫ সালে সাইপ্রাসের ঘাঁটি থেকে হসপিটালাররা আলেক্সান্দ্রিয়ায় আক্রমণ করলে মুসলিমরা পুরো ফ্রান্সিসক্যান সম্প্রদায়কে গ্রেফতার করে, হলি সেপালচার বন্ধ করে দেয়। ফ্রান্সিসক্যানরা কিছু না করেই এ পরিস্থিতির শিকার হয়ে ছিল, এমন নয়। তারা মাঝে মাঝেই আত্মঘাতী হামলা চালাতে শুরু করেছিল। ইসলামি বিশ্বের অন্যান্য অংশে অন্যান্য ফ্রান্সিসক্যান এ ধরনের হামলা শুরু করেছিল। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই তারা জেরুসালেমে মুসলিম এস্টাবলিশমেন্টে হামলা করত। ১৩৯১ সালের ১১ নভেম্বর তাদের একটি গ্রুপ আল-আকসায় গিয়ে কাজির সাথে কথা বলার দাবি জানাতে থাকে। তাদেরকে কাজির কাছে নিয়ে যেতেই তারা চিৎকার করে বলতে থাকে যে মুহাম্মদ ছিলেন 'কামুক, খুনি, পেটুক, লুণ্ঠনকারী- যিনি মনে করতেন যে মানব- জীবনের উদ্দেশ্য হলো খাওয়া, সম্ভোগ, ও দামি পোশাক পরা। এই মৌখিক আক্রমণের কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে ক্রুদ্ধ জনতা কাজির দরজার সামনে জড়ো হয়। নবীকে আক্রমণ করা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ হওয়ায় কাজি তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে

তাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার ধর্মীয় বিকল্প জানান। ফ্রান্সিসকানদের উদ্দেশ্যই ছিল এমনটি। তারা মুসলিমদেরকে বাধ্য করেছিলেন, তাদের যেন শহিদ করা হয়। তারা 'বিধর্মীদের হাতে মৃত্যু ও নিন্দিত হতে চেয়েছিল।১২ ১৩৯৩ সালে এ ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটে। এ সময় তিন সন্ন্যাসী প্রকাশ্যে আলেমদের সাথে বিতর্কের আমন্ত্রণ জানিয়ে তারপর মুহাম্মদকে ভণ্ড হিসেবে অভিহিত করে কঠোর ভাষায় গালাগাল করতে থাকে। এসব ঘটনায় মুসলিম-খ্রিস্টান সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটায়। মুসলিমরা শোষিত ও অবহেলিত অনুভব করতে থাকে, হামলায় তাদের মনে হতে থাকে, সত্যিকারের সহাবস্থান অসম্ভব।

এর ফলে উত্তেজনা বাড়তে থাকে, মুসলিমদের নির্মাণ জিহাদ অনেক সময় উদ্দেশ্যমূলক মনে হতে থাকে- এবং নিশ্চিতভাবেই ধরে নেওয়া হতে থাকে- অন্যান্য পবিত্র স্থানে আক্রমণ চালাতেই তা করা হচ্ছে। চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে রামবান সিনাগগ লাগোয়া এক মসজিদের একটি মিনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। এই নির্মাণ পরবর্তীকালে বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। ১৪১৭ সালে সালিহিয়া খানকার শেখ একটি মিনার নির্মাণ করেছিলেন। এটি হলি সেপালচারকে উস্কানিমূলকভাবে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। জেরুসালেমের মুসলিমরা বিশ্বাস করত, শেষ বিচারের দিনে এই কাজের জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হবে। তবে স্বাভাবিকভাবেই মাউন্ট সায়নে ফ্রান্সিসকানদের সদরদফতরই ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ আগ্রাসী সজ্ঘাতের কেন্দ্র।

ফ্রান্সিসক্যানেরা ১৩০০ সালে সায়ন চার্চের স্থানটি কিনে নেয়। এর মধ্যে ছির তথাকথিত দাউদের কবর। ক্রুসেড আমলে স্থানটি আলোচনায় এসেছিল। এটি তেমন আকর্ষণীয় স্থান ছিল না। ইহুদি লোককাহিনীর প্রতি ফ্রানসিসক্যানদের দরদ ছিল সামান্যই। তারা যখন তীর্থযাত্রীদেরকে ঘুরিয়ে দেখাত, তখন নিউ টেস্টামেন্টের সাথে এর সম্পৃক্ততার ওপরই জোর দিত। সায়ন চার্চ মূলত ছিল প্রথমদিককার চার্চের স্মৃতি। তীর্থযাত্রীদের আপার রুম, পেন্টেকস্ট শ্রাইন, সেন্ট জন যেখানে ভার্জিন মেরির জন্য মাস করতে অভ্যস্ত ছিলেন বলে উল্লেখিত স্থানটি, পৃথিবীর বুকে জীবনের শেষে যেখানে মেরি 'ঘুমিয়ে পড়েছিলেন' সেই স্থানগুলো দেখানো হতো। দাউদের কবর ও জুদার রাজাদের কবর প্রায়ই মাউন্ট সায়নের

তীর্থযাত্রীদের ভাষ্যের শেষের দিকে উল্লেখ থাকত। তবে নগরীর ইহুদিরা হঠাৎ করেই উপলব্ধি করতে পারল যে জেরুসালেমের প্রথম ইহুদি রাজার করবটি খ্রিস্টান যাজকীয় এলাকায় ঢুকে গেছে। তারা বারবার সুলতান বার্সবেকে (১৪২২-৩৭) স্থানটি তাদের হাতে স্থানান্তর করতে বলতে লাগল। এটি ছিল ভুল কাজ। বার্সবেকে যখন বলা হলো, কবরটি নবী দাউদের, তখন তার পক্ষে এটিকে ইসলামের শত্রুদের হাতে সমর্পণ করা অসহ্যকর ব্যাপারে পরিণত হলো। তিনি মাউন্ট সায়নে নেমে এসে কবরটি এমনভাবে বন্ধ করে দিলেন যে ফ্রান্সিসক্যানদের পক্ষে তাদের কনভেন্ট থেকে এখানে প্রবেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। তিনি তারপর কবরটির সাজসজ্জা গুঁড়িয়ে দিয়ে একে মসজিদে রূপান্তরিত করলেন। সবশেষে তিনি আপার রুম, যা কেন্যাকল চার্চ নামেও পরিচিত ছিল, বন্ধ করে দিলেন। কারণ এটি ছিল সরাসরি দাউদের কবরের উপরে ছিল। নতুন মসজিদের ওপর দিয়ে হাঁটাহাটি করা খ্রিস্টানদের জন্য উপযুক্ত ছিল না।১৩ ল্যাতিন খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলা যায়, সহাবস্থান ও একীভূত করার পুরনো মুসলিম আদর্শ দ্রুত ক্ষয়ে পড়ছিল।

মাউন্ট সায়নের ওপর তথাকথিত দাউদের কবরটি পঞ্চদশ শতক থেকে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করে। বর্তমানে গোঁড়া ইহুদিরা তাদের ছেলেদের প্রথম চুল কাটানোর ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৌশলে স্থানটির ওপর তাদের দাবি প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে।

সুলতান আল-জাহির জাকমাকের (১৪৩৮-৫৩) মাধ্যমে জিহাদ অব্যাহত থাকে। তিনি আক্ষরিক অর্থে আইনের বিধান প্রয়োগ করে অনুমতি ছাড়া জিম্মিদের উপাসনার স্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ করে দেন। তিনি সায়ন চার্চের বাকি অংশ বন্ধ করে দেন, কাছের কবরস্থানে সমাহিত সন্ন্যাসীদের হাড়গোড় তুলে ফেলেন। হলি সেচালচার চার্চে 'অবৈধভাবে' তোলা একটি কাঠের ঝুল বারান্দা আল আকসায় নিয়ে যান। বেথলেহেমের নতুন ভবনগুলোও ধ্বংস করা হয়। সিরিয়ার একটি কনভেন্টও বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে সুলতানের সবচেয়ে বড় আঘাত ছিল মূলত ল্যাতিনদের প্রতি। তিনি আর্মেনিয়ানদের অনুকূলে বিশেষ ফরমান জারি করে অপ্রয়োজনীয় করারোপ করে তাদের হয়রানি না করতে জেরুসালেমের আমিরকে নির্দেশ দেন। এই নির্দেশটি আর্মেনিয়ান কোয়ার্টারের

পশ্চিম প্রবেশপথে একটি ফলকে খোদাই করা ছিল। আর্মেনিয়ানরা ক্রুসেডের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকলেও তারা ইসলামের কঠোর সমালোচক ও প্রবল ঘৃণা প্রদর্শন করত না। তারা ইতোমধ্যেই পক্ষ না নেওয়ার বিষয়টি শিখে ফেলেছিল। ফলে আগের তিন শত বছরের উত্থান-পতনে একমাত্র তাদের সম্প্রদায়ই নিজস্ব মহল্লা অটুট রাখতে পেরেছিল।

নগরীতে এই উত্তেজনা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের বিপুলসংখ্যক তীর্থযাত্রী জেরুসালেম সফর করা অব্যাহত রাখে। তারা সবসময় স্বস্তিতে থাকতে পারত না। তবে তাদেরকে তারা যা দেখতে আসত, তা দেখতে দেওয়া হতো, তাদের সফর বেশ দক্ষতার সাথে সংগঠিত করা হতো। তারা একটি পুরো রাত হলি সেচালচারে কাটাত, নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী পুরো নগরী পাহারা দিয়ে তাদেরকে ঘোরানো হতো। মুসলিমরা যাতে ক্ষুব্ধ না হয়, সেজন্য এর সূচনা হতো ভোরে। এটি শুরু হতো হলি সেপালচার চার্চ থেকে। সেখান থেকে তীর্থযাত্রীরা নীরবে নগরীর পূর্ব দিকে (বর্তমান তা লায়ন গেট নামে পরিচিত) অগ্রসর হয়ে কিদরন ভ্যালি দিয়ে গেথসেমানে যেত। তারপর তারা মাউন্ট অলিভেসের অ্যাসেনশন চার্চে যেত। তারা সিলোয়াম পুল দিয়ে নগরীতে ফিরে এসে শেষ পরিদর্শন স্থান হিসেবে মাউন্ট সায়নে যেতে পারত। বেথলেহেম ও রিভার জর্ডানেও তিন দিনের সফর কর্মসূচি ছিল। আগের মতোই তীর্থযাত্রীরা খুব কমই মসজিদ ও মাদরাসার কথা উল্লেখ করত, যদিও ফ্রান্সিসক্যানেরা হারামের বিশেষ খ্রিস্টান তাৎপর্যের ওপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে এর ইসলামিকরণের বিরোধিতা করত। তারা তখনো ডোম অব দি রককে বলত 'টেম্পল অব দি লর্ড'। তাদের কাছে এটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ ছিল এখানেই শিশু হিসেবে ঈশ্বরের কাছে ভার্জিন মেরিকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। পরে তিনি টেম্পলের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, সেখানেই সেন্ট যোশেফের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। খ্রিস্টানেরা এখন জোর দিয়ে আল-আকসাকে 'চার্চ অব আওয়ার লেডি' হিসেবে অভিহিত করত।

'প্যাসন অব ক্রাইস্টের' প্রতি ফ্র্যান্সিসক্যানদের বিশেষ ভক্তি ছিল। তারা যিশুর শেষ যন্ত্রণাদায়ক সময়ের সাথে সম্পর্কিত স্থানগুলোর দিকে নজর দিতে শুরু করেছিল। এখন ল্যাতিনদের সাথে সম্পর্কিত সব স্থান ছিল জেরুসালেমের উত্তর দিকের এলাকা। ক্রুসেড

আমল থেকে শুরু হওয়া মাউন্ট সায়ন থেকে স্থানান্তর দৃশ্যত শেষ হয়ে আসছিল। ফলে জেরুসালেম সফরকারী জেমস অব ভেরোনা ১৩৩৫ সালে পুল অব বাথ-হেসদার কাছে অবস্থিত পূর্ব দিকের (লায়ন) গেট দিয়ে নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সেন্ট অ্যানার চার্চ (বর্তমানে সিলিহিয়া মাদরাসা) অতিক্রম করেন, বর্তমানে ভায়া ডোলোরোসা নামে পরিচিত সড়ক দিয়ে এগিয়ে যান। তাকে এই রাস্তায় থাকা আন্নাসের বাড়ি (বর্তমানে মসজিদ) ও হেরডের বাড়ি দেখানো হয়। তিনি পিলেতের বাড়ি' (হ্যাড্রিয়ানের ফোরামের 'ইচি হোমো আর্চ', যিশুকে ক্রুশ বহন করে নিয়ে যেতে দেখে মেরি যেখানে মুর্ছা গিয়েছিলেন এবং যে স্থান দিয়ে যিশু নগরী ত্যাগ করেছিলেন, সেখানকার গেটের ধ্বংসাবশেষ দেখেন। হলি সেচালচার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেই জেমস অন্যান্য 'কেন্দ্রে' বিরতি নেন। গলগোথায় চড়ার আগে যিশু যেখানে বিশ্রাম নিয়েলেন, সেখানকার আঙিনায় ফাটল ধরা একটি পাথর ছিল। ক্রুশটি তৈরি হওয়ার সময় চার্চের ভেতরে থাকা একটি গুহায় তাকে বন্দি রাখা হয়েছিল, সেখানেই তার পোশাক খুলে নেওয়া হয়েছিল। তারপর আসে খোদ গলগোথা, আনক্টশনের ব্ল্যাক স্টোন ও সবশেষে কবরটি। এসব স্থানের কিছু বদলে গিয়েছিল। ক্রসের স্টেশনগুলো কোথায়, তা আজ আর জানা যায় না। ফ্রান্সিসক্যানেরা যখন টর্চের আলোতে ভায়া ডোলোরোসা দিয়ে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে যেত, তখন তারা বিপরীত দিক থেকে যেত। তবে মাঠ প্রস্তুত করা হয়েছিল। এখন হলি সেচালচারে ল্যাতিন খ্রিস্টানদের তেমন জায়গা ছিল না। তারা বাইরের অন্যান্য স্থানের পরিচর্যা করত।

বর্তমানে ফ্রানসিসক্যানেরা জেরুসালেমের পবিত্র স্থানগুলোর সরকারি রোমান ক্যাথলিক অভিভাবক হিসেবে ডায়া ডোলোরোসার মালিকানা ভোগ করে। তবে মুসলিম অধিবাসীদের কারণে কিছুটা উদ্বেগে থাকে।

জার্মান ডোমিনিক্যান ফেলিক্স ফ্যাবরি ১৪৮০ সালের দিকে জেরুসালেম সফর করে তার তীর্থযাত্রা সম্পর্কে প্রাণবন্ত রচনা লিখে গেছেন। তার জাহাজ জাফায় নোঙর করার সময়ই তিনি মুসলিম লোকজন ও ল্যাতিনদের মধ্যে তখন বিরাজমান উত্তেজনা সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। মুসলিম কর্মকর্তারা প্রতিটি তীর্থযাত্রীকে শক্ত করে ধরে তার নাম ও ঠিকানা জানতে চাইছিলেন। তারপর ফেলিক্সকে 'একটি বিধ্বস্ত ভল্টের নিচে অন্ধকারময় ও ক্ষয়ে

যাওয়া স্থানে এমনভাবে ছুঁড়ে দিলেন যে দুধ দোহনের জন্য ভেড়াকেও এভাবে আস্তাবল থেকে নিক্ষেপ করা হয় না। ১৪ এখানে তার দোভাষী কাম গাইডকে নিয়োগ করেন। এই লোকই তার অবস্থানকালে মুসলিম বিশ্বের সাথে তার যোগসূত্র ছিল। আর ফ্রান্সিসক্যান কর্মচারীরা তীর্থযাত্রীদের কড়া বক্তৃতা দিয়েছিল। দোভাষী ছাড়া তারা কোনোভাবেই ঘোরাফেরা করতে পারবে না। দেয়ালে কিছু খোদাই করা যাবে না, মুসলিম নারীদের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকানো বা প্রকাশ্যে মদ্যপান (এটি হয়তো মুসলিমদের মধ্যে ভয়াবহ বিদ্বেষ সৃষ্টি করত) নিষিদ্ধ। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, মুসলিমদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক একেবারেই ছিল না। উত্তেজনা এখন এত বেশি ছিল যে কর্তৃপক্ষ আর স্থানীয় লোকজনের সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের নিশ্চয়তা দিতে পারছিল না।

এ ধরনের ভয়াবহ আপ্যায়নেও তীর্থযাত্রীর প্রবল আবেগ হ্রাস পায়নি। ফেলিক্স আমাদের বলছেন যে পবিত্র নগরী দেখামাত্র তারা তাদের গাধা থেকে লাফ দিয়েছিলেন, কান্নায় ভেঙে পড়লেন। হলি সেপালচার প্রথম দর্শনে তারা আরো বেশি কেঁদেছিলেন : 'এ ধরনের হৃদয়ছোঁয়া আর্তনাদ, এ ধরনের মধুর কান্না, এ ধরনের গভীর দীর্ঘশ্বাস, এ ধরনের কষ্ট, এ ধরনের ফোঁপানো আসে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। ১৫ কোনো কোনো তীর্থযাত্রী জম্বির (জ্যান্ত লাশ) মতো ঘুরে বেড়াত, চলার পথে তাদের পশুগুলোকে বেদম প্রহার করত। নারীরা প্রসব যন্ত্রণার মতো করে কাতরাত, তীর্থযাত্রীরা লাশের মতো শুয়ে থাকত। তীর্থযাত্রীরা নিয়মিতভাবেই এত কাহিল হয়ে পড়ত যে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হতো। জেরুসালেমের প্রতি পাশ্চাত্যের ভক্তি উন্মাদনার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। এখানে কোনো শৃঙ্খলাপূর্ণ 'আরোহণপথ' ছিল না, সত্যিকারের কোনো আধ্যাত্মিকতা ছিল না। এসব তীর্থযাত্রী দৃশ্যত তাদের আত্মকষ্টে ভুগত।

অবশ্য পাশ্চাত্য ধর্মানুরাগও অন্যান্য পন্থায় বদলে যাচ্ছিল। ফেলিক্স নিজে তার প্রতিক্রিয়া এমন বিশ্লেষণাত্মকভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা আগেকার তীর্থযাত্রাগুলোতে দেখা যায়নি। তিনি দেখেছেন, তীর্থযাত্রা খুবই কঠিন কাজ। প্রচণ্ড রোদে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া, মাটিতে ভর করে চলা, সহজ নয়। সবচেয়ে বড় কথা, কাজগুলো ঠিকমতো করা যাবে কিনা তা নিয়ে উদ্বেগও ছিল। 'দৈহিকভাবে এক স্থান থেকে অন্য

স্থানে হাঁটার সময় মানসিক বিমূর্ততায় সংগ্রাম ছিল ভয়াবহ রকমের শ্রমসাধ্য বিষয়। ১৬ ফেলিক্সও কয়েকটি স্থানের যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। কিভাবে মূল কবরটি এত কাল অটুট থাকতে পারে? কেন দাউদের কবর আগে কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি?' একটি নতুন কঠিন চেতনা আত্মপ্রকাশ করায় অনেক পাশ্চাত্য তীর্থযাত্রীর জন্য ঐতিহ্যবাহী তীর্থযাত্রাকে অসম্ভব করে তুলেছিল।

তবে তীর্থযাত্রার স্বর্ণযুগ সম্ভবত শেষ হয়ে গিয়েছিল। সব প্রধান ধর্মই জোর দিয়ে বলছিল, সত্যিকারের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অবশ্যই বাস্তব সহানুভূতির মাধ্যমে প্রকাশিত হতে হবে। এটি ছিল নির্ভুল আধ্যাত্মিকতার লিটমাস টেস্ট। অতীতে জেরুসালেম একে অপরের প্রতি বা অন্যান্য ধর্মের সদস্যদের প্রতি পরহিতপরায়ণ হতে খ্রিস্টানদের সহায়তা করেনি। ক্রুসেডারদের ধর্মের উদ্ভট অনুকরণকারী হিসেবে দেখা যেতে পারে : এটি আসলে মূর্তিপূজা, যেখানে পবিত্র স্থানগুলোর নিয়ন্ত্রণে নেওয়াকেই বিবেচনা করা হয়েছে চূড়ান্ত লক্ষ্য। এখন আধুনিকতার প্রান্তে এসে সমালোচক ফেলিক্স জেরুসালেমের অন্যান্য অধিবাসী সম্পর্কে ভালো কোনো বলার অবকাশই বলতে গেলে পাননি। তিনি বলেন, সারাসেনরা সব ধরনের কপটতা করতে বলতে গেলে বাকি রাখেনি, তারা মূর্তিপূজকের চেয়েও জঘন্য, ইহুদিদের চেয়েও খারাপ;' গ্রিক চার্চ একসময় জ্ঞানী হলেও এখন 'সীমাহীন ভুলে নিমজ্জিত;' সিরিয়ানরা 'শয়তানের সন্তান;' এবং আর্মেনিয়ানরা ধর্মভ্রষ্টতায় ডুবে আছে; ইহুদিরা বাকি সবার কাছে যথাযথ কারণেই ঘৃণিত, দুর্দশাগ্রস্ত জীবন ও অবমাননাকর অবস্থার কারণে তাদের বোধশক্তি ভোঁতা হয়ে যায়। জেরুসালেমের সব বাসিন্দার মধ্যে কেবল ফ্রান্সিসক্যানেরাই ধার্মিক জীবন নির্বাহ করে। তাদের ধর্মানুরাগের প্রধান চিহ্ন হলো পবিত্র নগরী জয়ের লক্ষ্যে নতুন ক্রুসেডের জন্য মন- প্রাণ উজাড় করা' আকাঙ্ক্ষা।' এই হতাশাজনক তালিকা প্রমাণ করে যে তীর্থযাত্রা ফেলিক্সকে তার মনে গেঁথে থাকা কোনো ধারণা থেকেই মুক্ত করেনি, বরং ঘৃণিত ও আত্ম-সত্যনিষ্ঠতার কানাগলিতে তাকে চালিত করেছে।

সুলতান আল-আশরাফ কেতবের (১৪৬৮-৯৬) আমলে মামলুক সাম্রাজ্য শেষ অধ্যায়ে প্রবেশ করে। এশিয়া মাইনরের উসমানিয়া তুর্কিদের সেনাবাহিনী তাদের এলাকা দখল

করে নিতে থাকে; বেদুইনরা নগরীতে বিপজ্জনক মাত্রায় হামলা চালাতে থাকে : ১৪৬১ সালে জেরুসালেমের প্রাচীরের বাইরে বেদুইন হামলায় ৬০ জন নিহত হয়। পর্তুগিজদের মাধ্যমে মামলুকদের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু তবুও সুলতান জেরুসালেমকে অবহেলা করেননি। তিনি হারামের পশ্চিম দিকের প্রাচীরের বাইরে নতুন মাদরাসা চালু করেন। মামলুক ভবনগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে প্রাণবন্ত ছিল আশরাফিয়া মাদরাসা। মুজির উদ্দিন একে হারামের তৃতীয় রত্ন হিসেবে অভিহিত করেছেন। বালাদিয়া মাদরাসা ও হারামের বারান্দার ছাদের ওপর নির্মিত এ মাদরাসাটি হারামের সম্প্রসারণের দিক থেকেও ছিল অনন্য। এমনকি আল কুদসও যখন মামলুকদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল তখনো রকের প্রতি রাজবংশটির শেষ দিকের শাসকদের আকূলতার কারণেই চলে এসব নির্মাণকাজ। আবারো বলা উচিত, আশরাফিয়া মাদরাসা ইসলামের একীকরণকে প্রতীকীভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। এতে চার মাজহাব ও ৬০ সুফি ছিলেন। তবে সুলতান জেরুসালেমের ধর্মীয় উত্তেজনা হ্রাস করার চেষ্টাও করেছিলেন। ফ্রান্সিসক্যানেরা তার যৌবনকালে তার প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। জেরুসালেমে নির্বাসিত থাকার বিষয়টি কেইতবে ভোলেননি। তিনি তাদেরকে মাউন্ট সায়ন ফিরিয়ে দেওয়া অনুমোদন করেছিলেন, সেখানে তারা আরো ঘিঞ্জি মহলে বাস করত, বর্বর নজরদারির মধ্যে থাকত তারা। ১৪৮৯ সালে তারা ঘুষ দিয়ে দাউদের সমাধি ও কেন্যাকল চ্যাপেলও ফেরত পেয়ে সেগুলো পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ নেয়। তবে পরের বছর আলেমদের এক সমাবেশে ঘোষণা করা হয় যে স্থানটি একসময় মসজিদ হওয়ায় তা খ্রিস্টানদের হাতে ফেরত দেওয়া অবৈধ।

জেরুসালেমে মুসলিম ও ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্কও এই শেষ বছরগুলোতে খারাপের দিকে মোড় নেয়। ১৪৭৩ সালে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে রামবান সিনাগগের অংশবিশেষ ভেঙ্গে পড়ে। এটি পুনঃনির্মাণের জন্য ইহুদিরা আবেদন করলে সংলগ্ন মসজিদের কর্মকর্তারা প্রতিবাদ জানান। তারা জানান, তাদের উচিত সিনাগগের আঙিনা না ডিঙিয়ে সরাসরি রাস্তা থেকে মসজিদে প্রবেশের সুযোগ লাভ করা। ইহুদিরা যথাযথ ঘুষ দিয়ে স্থানটি বহাল রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু এতে তাদের মুসলিম প্রতিবেশীরা ক্ষুব্ধ হয়ে এক রাতে সিনাগগটিই ভেঙ্গে ফেলে। অবশ্য সুলতান কুতসবে ইহুদিদের পছন্দ করতেন। তিনি সিনাগগটি আবার নির্মাণ করার নির্দেশ দেন। এখন জেরুসালেমে মাত্র

৭০টির মতো ইহুদি পরিবার বাস করত। তাদের বেশির ভাগই ছিল গরিব, থাকত ভাঙ্গাচোরা বাড়িতে। তবে তাতে পুরোপুরি মুসলিমদের দোষ ছিল না। ইতালিয়ান পর্যটক ওবায়দিয়া দা বাতিনেরো উল্লেখ করেছেন, তিনি ১৪৮৭ সালে জেরুসালেম সফর করেছেন। ইহুদিদের প্রধান সমস্যা ছিল জার্মানি থেকে আগত আশকেনাজি ও স্পেন ও ইসলামি বিশ্বের অন্যান্য স্থান থেকে আসা সেফারদি ইহুদিদের মধ্যকার মতভেদ। ইহুদিদের এখন হারামে পা রাখা নিষিদ্ধ বলে ওবাদিয়া আমাদের বলছেন। অনেক সময় হারামের মেরামত কাজের প্রয়োজন হতো। কিন্তু তাদের শাস্ত্রীয় শুদ্ধতার ব্যবস্থা না থাকায় তাদের এসব কাজে নিয়োজিত করা হতো না। এই প্রথমবারের মতো স্ব-আরোপিত বিধিনিষেধের কথা আমরা শুনতে পাই। অনেক ইহুদি এখন পর্যন্ত তা মেনে চলছে। মাইমোনিদেসও একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। জেরুসালেম সফরের সময় হারামে প্রবেশ করতে তিনি সক্ষম বলে মনে করেননি। এখন টেম্পল মাউন্ট তাদের কাছ থেকে আরো দূরে সরে গেল, ইহুদিদের জন্য নতুন পবিত্র স্থান প্রয়োজন পড়ল। ওবাদিয়া হারামের পশ্চিম দিকের সহায়ক প্রাচীর অতিক্রম করার সময় বিশেষ আবেগ অনুভব করেননি। প্রাচীরটি ছিল ‘বিশাল, ভারী পাথর দিয়ে তৈরি ছিল এ ধরনের পুরনো ভবন রোম বা অন্য কোনো নগরীতে আমি কখনো দেখিনি।১৯ ওয়েস্টার্ন ওয়াল তখনো জেরুসালেমে ইহুদিদের জন্য পবিত্র স্থান ছিল না। তবে এই অবস্থা অল্প সময় পরেই বদলে গিয়েছিল।

ইতিহাসবিদ মুজিরউদ্দিন ১৪৯৬ সালের রচনায় মামলুকদের শেষ দিনগুলোতে জেরুসালেমের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। মামলুক শতকগুলোতে জেরুসালেমের পবিত্রতা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে মুসলিম কল্পনাশক্তিতে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে নগরী তখনো ছিল প্রাচীরবিহীন। এমনকি সেখানে কার্যত কোনো সেনাছাউনিও ছিল না। দুর্গের সান্ধ্যকালীন প্যারেড নিয়মিত হতো না, গভর্নর সাধারণ মানুষের মতো বাস করতেন। এমনকি মামলুকেরা হারামের ব্যাপারে ভালোবাসাময় অনেক মনোযোগ দিলেও তারা কখনো নগরীটিকে দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত করার উদ্যোগ নেয়নি। তাদের কাছে এই নগরী ছিল সম্পূর্ণভাবে কৌশলগত গুরুত্বহীন। মামলুকেরা অবশ্য নগরীর জাগতিক জীবনকে অবহেলা করেনি। মুজির আমাদের বলছেন,

নগরীর ভবনগুলো দৃঢ়ভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল, মিনারগুলো ছিল বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর। হারামের প্রতি মামলুকদের ভক্তি নগরীর ফোকাস বদলে দিয়েছিল। ফলে নাগরিক জীবনের কেন্দ্র কনস্টানটাইনের আমল থেকে জেরুসালেমকে প্রাধান্য বিস্তারকারী ওয়েস্টার্ন হিল থেকে সরে হারাম এলাকায় নিবদ্ধ হয়েছিল। সালাউদ্দিন যখন প্রথম জেরুসালেম জয় করেন, তখন তিনি ও তার আমিরেরা হলি সেপালচারের পাশে বাস করেছিলেন। মুজিরের আমল নাগাদ গভর্নর বাস করতেন হারামের উত্তর সীমান্তের পাশে। প্রাচ্যের বেশির ভাগ নগরীর মতো জেরুসালেম ছিল নানা মহল্লায় বিভক্ত। জেরুসালেমের অধিবাসীরা তাদের ধর্ম ও জাতিগত উৎসের আলোকে বিভিন্ন মহল্লায় বাস করত। আমেনিয়ান ও মাগরিবিরা একসাথে বাস থাকত। আবার ইরান, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের মুসলিমরা হারামের উত্তর-পশ্চিম কোণে বাস করত একত্রে। অবশ্য কঠোরভাবে বিভক্তি ছিল না। নগরীর দক্ষিণ দিকের এলাকায ইহুদি ও মুসলিমরা পাশাপাশিও বাস করত। একইভাবে উত্তর-পূর্ব দিকের বাজেথা এলাকায় খ্রিস্টান ও মুসলিমরা পাশাপাশি বাস করত। বিভক্তি তখনো সর্বগ্রাসী হয়নি। সুলতান আল-আশরাফ আকুক আল-গুরির (১৫১৩-১৬) রাজত্বকালে স্পষ্ট হয়ে যায়, মামলুকেরা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উসমানিয়াদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ১৪৫৩ সালে উসমানিয়ারা কনস্টানটিনোপল দখল করে, পুরনো খ্রিস্টান সাম্রাজ্য বায়জানটিয়াম হজম করে নেয়। একসময় মনে হয়েছিল তারা ইউরোপও জয় করে নেবে। কিন্তু বেলগ্রেডে হাঙ্গেরি সেনাবাহিনী তাদের ঠেকিয়ে দেয়। তারপর ১৫১৫ সালে উসমানিয়া সুলতান প্রথম সেলিম আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। তিনি চালদিরান যুদ্ধে ইরানি অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করেন, আলেপ্পোর উত্তরে মার্জ-দিবিকে মামলুকদের পরাজিত করেন। কায়রোর বাইরে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে মামলুক সাম্রাজ্য কার্যত শেষ হয়ে যায়। ১৫১৬ সালের ১ ডিসেম্বর সেলিম জেরুসালেমের বাইরে উপস্থিত হন। কোনো প্রতিরোধ ছিল না। আলেমরা বাইরে এসে সুলতানের সাথে সাক্ষাত করে তার হাতে আল-আকসা ও ডোম অব দি রকের চাবি তুলে দেন। সাথে সাথে সেলিম তার ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন : 'শুকরিয়া আল্লাহ! আমি প্রথম কিবলার পবিত্র স্থানটির মালিক!'

উসমানিয়া নগরী

জেরুসালেমের লোকজন স্বস্তির সাথে উসমানিয়াদের স্বাগত জানিয়েছিল। মামলুক সাম্রাজ্যের পতন হওয়ায় নগরীটি অবহেলার শিকার হচ্ছিল : ওয়াকফ সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, অর্থনৈতিক অবস্থা মন্দা হচ্ছিল, রাস্তাগুলোতে বেদুইনেরা সন্ত্রাস চালাচ্ছিল। উসমানিয়ারা তত দিনে অভিজ্ঞ সাম্রাজ্য নির্মাতায় পরিণত হয়েছে। তারা একটি শক্তিশালী, কেন্দ্রীভূত প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। মামলুকদের মতো তারাও মূলত ছিল সামরিক শক্তি। তাদের সেনাবাহিনী ও তাদের রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল জাননেসারি নামের এলিট পদাতিক বাহিনী। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে প্রবল আগ্রহই ছিল এই বাহিনীর সবচেয়ে বড় শক্তি। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সাম্রাজ্য তার ক্ষমতার শীর্ষে থাকাবস্থায় ১২ থেকে ১৫ হাজার জাননেসারি ছিল। উসমানিয়ারা ফিলিস্তিনে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিল : বেদুইনদের দমন করা হয়েছিল, তারা পল্লী এলাকার ক্ষতি করা বন্ধ করা মাত্র কৃষি খাতে অগ্রগতি হচ্ছিল। প্রাথমিক সময়ে উসমানিয়ারা আরব প্রদেশগুলোর প্রতি উদার ছিল। তারা দক্ষ প্রশাসন প্রবর্তন করেছিল, অর্থনীতি উন্নত হয়েছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য সমৃদ্ধ হয়েছিল। ফিলিস্তিনকে জেরুসালেম, নাবলুস ও গাজাভিত্তিক তিনটি জেলায় (সানজাক) বিভক্ত করা হয়েছিল। এগুলো ছিল দামাস্কাস প্রদেশের (বিলায়েত) অংশ। তুর্কিদের দিয়ে জেরুসালেমের জনসংখ্যা চিত্র বদলানোর কোনো চেষ্টা ছিল না। উসমানিয়ারা স্রেফ একজন গভর্নর (পাশা), বেসামরিক কর্মকর্তা, ও ছোট সামরিকবাহিনী পাঠাত। এই বাহিনী দুর্গে মোতায়েন থাকত।

সুলতান মহান সোলায়মানের আমলে (১৫২০-৬৬) জেরুসালেমের অবস্থা নাটকীয়ভাবে উন্নতি ঘটে। তিনি ইউরোপে যুদ্ধ করেছেন, পাশ্চাত্যে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করেছেন, তারপর এর অভ্যন্তরীণ উন্নয়নে মনোনিবেশন করেছেন। সোলায়মানের আমলে উসমানিয়া সাম্রাজ্য সাংস্কৃতিক পুনঃজীবন উপভোগ করে, জেরুসালেম ছিল এর অন্যতম সুবিধাভোগী। তুর্কি যুদ্ধগুলো সহজাতভাবেই ইউরোপে ইসলাম-সম্পর্কিত ঘৃণা নতুন করে জোরদার করে। নতুন ক্রুসেড নিয়ে কথাবার্তা চলছিল। কথিত আছে, সোলায়মান স্বপ্ন দেখেছেন যে নবী মুহাম্মদ (সা.) নিজে জেরুসালেম রক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য তাকে

নির্দেশ দিয়েছিলেন। আসল ঘটনা যা-ই হোক না, ১৫৩৬ সালে সোলায়মান নগর-প্রাচীর পুনঃনির্মাণের নির্দেশ দেন। এটি ছিল বিশাল প্রকল্প। এতে বিপুল ব্যয় ও ব্যাপক দক্ষতার সম্পৃক্ততা ছিল। খুব কম নগরীতে উসমানিয়ারা এত বিশাল সুরক্ষামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এখনো টিকে থাকা প্রাচীরটি ছিল দুই মাইল লম্বা ও প্রায় ৪০ ফুট উঁচু। ৩৪টি টাওয়ার ও সাতটি উন্মুক্ত ফটক-সংবলিত প্রাচীরটি নগরীকে পুরোপুরি ঘিরে ফেলেছিল। মহান রাজদরবারি স্থপতি সিনান নির্মাণকাজের সময় 'নগরী সফর করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। নগরীর উত্তরের দামাস্কাস ফটকটির নক্সা ব্যক্তিগতভাবে করেছিলেন। ১৫৪১ সালে প্রাচীর নির্মাণ শেষ হলে জেরুসালেম তিন শতাধিক বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো যথার্থভাবে সুরক্ষিত হয়েছিল।

জেরুসালেমের পানিব্যবস্থায় বিপুল বিনিয়োগ করেছিলেন সোলায়মান। নগরীতে ছয় শত সুন্দর ঝর্ণা নির্মাণ করা হয়েছিল, খাল ও পুকুর খনন করা হয়েছিল এবং নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 'সুলতানের সরোবর' নতুন করে সংস্কার, কৃত্রিম পানি-ব্যবস্থা মেরামত করা হয়। জেরুসালেমকে আরো শক্তিশালী করার জন্য সোলায়মান তার প্রজাদেরকে সেখানে বসতি স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষ করে ১৪৯২ সালে খ্রিস্টান স্পেন থেকে বিতাড়িত হয়ে উসমানিয়া সাম্রাজ্যে আসা ইহুদি উদ্বাস্তুদেরকে তিনি সেখানে বাস করতে উৎসাহিত করেন। উসমানিয়াদের আদমশুমারি থেকে আমরা জানতে পারি যে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জনসংখ্যা প্রায় তিনগুণ বেড়েছিল। ১৫৫৩ সালে সেখানে লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১৩,৩৮৪ জন। ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৬৫০ জন করে। বেশির ভাগ মুসলিম ছিল আরব সুন্নি। অবশ্য উত্তর আফ্রিকা, মিসর, পারস্য, ইরাক, বসনিয়া, ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়ার মুসলিমরা ছিল। নগরীটি এখন নতুন সমৃদ্ধি উপভোগ করছিল। বাজারগুলো উন্নত ও বড় করা হয়েছিল, পণ্যের দাম বেড়েছিল। এগুলো জীবনযাত্রার সাধারণ মান বৃদ্ধির সূচক। নগরীতে পাঁচটি প্রধান শিল্পের মধ্যে ছিল খাদ্য, বস্ত্র, সাবান, চামড়া ও ধাতবসামগ্রী। সাবান রফতানি করা হতো মিসরে, খাদ্য রফতানি করা হতো মিসর, রোডস ও দুবরোভনিকে। বস্ত্র ও চাল আমদানি করা হতো মিসর, পোশাক ও কফি আনা হতো দামাস্কাস থেকে, বস্ত্র ও কম্বল আনা হতো ইস্তাম্বুল, চীন ও হিজাজ থেকে। জেরুসালেমের বিভিন্ন শিল্প ও পেশাগুলো

প্রায় ৪০টি গিল্ডে (তাইফা) সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। প্রতিটিতে একজন শেখ ও তার সহকারী ছিলেন। এমনকি গায়ক ও নৃত্যশিল্পীদেরও নিজস্ব তাইফা ছিল। জনসংখ্যা, আয় ও নগরীর ধর্মীয় মর্যাদার কারণেও ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এর প্রশাসনিক মর্যাদা বাড়ানো হয়। এটি এখন মুতাসারিফলিক (সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ইউনিট, যার মধ্যে ছিল নাবলুস ও গাজার সানজ্যাকগুলোও)। জেরুসালেম শাসনকারী পাশার পদবি ছিল মুতাসারিফ। আল-কুদসের কাজির এখতিয়ার ছিল অনেক বেশি, গাজা থেকে হাইফা পর্যন্ত বিস্তৃত। ঘটনাক্রমে এই দুই কর্মকর্তার বেতন ছিল একই।

প্রাথমিককালের উসমানিয়াদের জেরুসালেমের প্রতি প্রতিশ্রুতি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল সোলায়মানের রাজসিক নগর-প্রাচীর নির্মাণের মাধ্যমে। এসব প্রাচীর এখনো পুরনো নগরীর সবচেয়ে বিখ্যাত স্মারক হিসেবে বিবেচিত হতো।

সোলায়মান হারামকেও অবহেলা করেননি। ডোম অব দি রকের বাইরের দিকের উপরের অংশে মোজাইক আবার করা হয়, নিচের অংশে মার্বেল দিয়ে জৌলুষ বাড়ানো হয়েছিল। ডোম অব দি চেইনেরও সুন্দর চিনামাটির আবরণ দেওয়া হয়। সোলায়মান আল আকসার সামনের আঙিনায় চমকপ্রদ একটি ওজুখানা নির্মাণ করেন। হারামের ওয়াকফ আবারো গড়ে তোলা হয়, এর কয়েকটি মাদরাসা ছিল। ডোম অব দি রকে বছরব্যাপী কোরআন তেলায়াতকারীর ব্যয়ভার মেটানোর জন্য সুলতান তীর্থযাত্রীদের প্রবেশ-করে তার অংশে ছাড় দেন। ওয়াকফ সম্প্রসারিত করায় চাকরি ও দাতব্য কাজের পরিধি বাড়ে। সুলতানের রুশ- বংশোদ্ভূত স্ত্রী রোক্সেলানা ১৫৫১ সালে তাকিয়া লঙ্গরখানা নির্মাণ করেন। এই বিশাল কমপ্লেক্সে একটি মসজিদ, একটি রিবাত, একটি মাদরাসা একটি সরাইখানা ও একটি লঙ্গরখানা ছিল। লঙ্গরখানা থেকে ছাত্র, সুফি ও গরিবদের খাবার সরবরাহ করা হতো। ওয়াকফ হিসেবে রামাল্লা এলাকার কয়েকটি গ্রাম দান করে দেওয়া হয়। লঙ্গরখানাটি ফিলিস্তিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

উসমানিয়াদের সৃষ্ট নতুন স্থিতিশীলতা জিম্মিদের ভাগ্যও পরিবর্তন করে। বেশির ভাগ ইহুদি তাইবেরিয়াস বা সাফেদে বাস করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। তবে সোলায়মানের আমলে জেরুসালেমে ইহুদি সম্প্রদায় বাড়তে থাকে। অবশ্য তবুও সেখানে আনুষ্ঠানিক

কোনো ইহুদি মহল্লা ছিল না। নগরীর রিশা, শারাফ ও মাসলাখ এলাকার আবাসিক স্থানগুলোতে ইহুদিরা বাস করতে চাইত। এখানে তারা মুসলিমদের সাথে মিলেমিশে বাস করত। ইউরোপ থেকে সফরে আসা ইহুদিরা ফিলিস্তিনি ইহুদিদের ভোগ করা স্বাধীনতায় অবাক হয়ে যেত। ১৫৩৫ সালে ইতালিয়ান ইহুদি ডেভিড দাই রোসি উল্লেখ করেছেন যে ইহুদিরা এমনকি সরকারি পদেও রয়েছে, যা ইউরোপে ছিল অভাবনীয় : 'এখানে আমরা নির্বাসিত নয়, নিজ দেশের মতো আছি। এখানে... শুল্ক ও কর বিভাগে ইহুদিদেরই নিয়োগ করা হয়। ইহুদিদের ওপর বিশেষ কর নেই।' উসমানিয়ারা ইহুদিদের ব্যাপারে প্রযোজ্য আর্থিকব্যবস্থা-সংক্রান্ত শরিয়াহ আইন কড়াকড়িভাবে আরোপ করেনি। জেরুসালেমের সব ইহুদিকে জিজিয়া কর দিতে হতো না, আর যাদেরকে দিতে হতো, তারাও দিত সর্বনিম্ন সরকারি হারে। বিচারালয়গুলো ইহুদিদের রক্ষা করত, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করত, উসমানিয়া কর্মকর্তারা ইহুদি সম্প্রদায়কে উৎসাহিত ও সুরক্ষা দিতেন।২

উন্নত মর্যাদাভোগের প্রেক্ষাপটে ইহুদিরা ১৫২৩ সালে মেসাইয়া হওয়ার দাবি করে জেরুসালেমে আগত এক অদ্ভূত তরুণ ইহুদিকে নিয়ে চরমভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল : তারা আশঙ্কা করত যে তার কার্যক্রম উসমানিয়া কর্মকর্তারা বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করবে, এটি তাদের অবস্থানকে বিপজ্জনক করবে। ডেভিড রেউভেনি বলতেন যে তিনি ছিলেন সুদূর অতীতে ইসরাইলের হারিয়ে যাওয়া ১০ গোত্রের এক ইহুদি রাজ্যের প্রিন্স। সব গোত্র শিগগিরই জেরুসালেমে ফিরবে, তবে প্রথমে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। রাজা সোলায়মানের আমলে বিদ্রোহী জেরোবোয়াম পৌত্তলিক মন্দির থেকে একটি পাথর টেম্পল মাউন্টের পশ্চিম দিকের দেয়ালে রেখেছিলেন। এটি যত দিন সেখানে থাকবে, তত দিন পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। জেরুসালেমের ইহুদিদের অত্যন্ত বিপজ্জনক ও নিশ্চিতভাবে জঘন্য কাজটির ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না : কথিত প্রাচীরটির অস্তিত্ব সুলতান সোলায়মান আমলে ছিল না। রেউভেনি ইতালির উদ্দেশে রওনা হওয়ার পর জেরুসালেমের এক রাব্বি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, এ লোককে নিয়ে ইতালির ইহুদিদের করার কিছু নেই। তবে গাজা, মিসর ও স্যালোনিসা থেকে ইহুদিদের ঢল আসন্ন বলে ঝামেলাপূর্ণ গুজব আসছিল। বলা হচ্ছিল, ইহুদিরা তাদের সব সম্পত্তি বিক্রি করে মেসাইয়াকে স্বাগত জানাতে পাসওভারে জেরুসালেমে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাব্বি

মর্মপীড়ায় বলেন, 'ঈশ্বর আমাদের প্রতি রহম করুন।' এই বিশাল লোকের আগমন কেবল কর্তৃপক্ষকেই ঝামেলায় ফেলত না, এত লোককে বাস করতে দেওয়া বা খাবার যোগান দেওয়াও হতো অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু পাসওভারের সময় ইহুদিরা দৃশ্যমান কিছু প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়। তবে ডেভিড রেউভেনি ইতালিতে বেশ ভালো সংখ্যক অনুসারী আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সেখানে নিজেকে নতুন রাজা দাউদ হিসেবে জাহির করেন। তিনি জেরুসালেমে তার অবস্থান নিয়ে উদ্ভট গল্প বলতেন : তিনি তার শিষ্যদের জানাতেন যে মুসলিম এস্টাবলিশমেন্ট তাকে সম্মানের সাথে স্বাগত জানিয়েছিল, তাকে মর্যাদার সাথে হারামে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে তিনি পাঁচ সপ্তাহ রকের নিচের একটি গুহায় বাস করেছিলেন। ডেভিরের স্থানে এই প্রার্থনা ও উপবাস একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শাভুথের প্রথম দিনে ডোম অব রকের শীর্ষে নতুন চাঁদ পূর্বমুখী হয়ে যায়, একে ঠিক করা যায়নি। ডেভিড এটিকে তার রোমের উদ্দেশে যাত্রার সময় হিসেবে চিহ্নিত করেন।

ডেভিডের মেসাইনিক আন্দোলন নিস্প্রভ হয়ে পড়েছিল। স্পেন থেকে বহিষ্কারের পর ইহুদি বিশ্বে এটি ছিল চরম মর্মপীড়ার বহিঃপ্রকাশ। ইসলামের অধীনে ইহুদিরা আল-আন্দালুসে সোনালি যুগ উপভোগ করছিল। স্প্যানিশ ইহুদিদের ক্ষতি বিশ্বজুড়ে শোক বয়ে আনে। কারণ টেম্পল ধ্বংসের পর থেকে এটিই ছিল সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপে সেমিটিকবিরোধী নির্যাতন ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ইহুদিদেরকে এক নগরী থেকে আরেকটিতে বহিষ্কার করা হতে থাকে। আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে ইহুদিদের অবস্থা অনেক বেশি খারাপ হতে থাকে, অনেকে বাড়ি ও অতীত থেকে এই বেদনাদায়ক বিচ্ছিন্নতার নাটকীয় অবসান হতে পারে বলে স্বপ্ন দেখতে থাকে। উসমানিয়াদের, তারা ইহুদি নির্বাসিতদের প্রতি বন্ধত্বপূর্ণ ছিল, জেরুসালেম জয় বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ইহুদিদের মধ্যে বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এক শ' বছরের বেশি সময় ধরে তা অব্যাহত থাকে।

জেরুসালেমে ডেভিড রেউভেনির মিশনে হারামের পশ্চিম দিকের সহায়ক প্রাচীরের ওপর নিবদ্ধ ছিল। এটি শুরুতে নির্মাণ করেছিলেন রাজা হেরড। এটি বাস্তবে ছিল হারানো

টেম্পলের শেষ অবশিষ্টাংশ। মামলুক আমলে মাদরাসাগুলো এই প্রাচীরজুড়ে নির্মিত হয়, ব্যতিক্রম ছিল কেবল তারিক আল-সিলসিলা (স্ট্রিট অব দি চেইন) ও মাগরিবি গেটের মধ্যকার প্রায় ২২ মিটার বিস্তৃত এলাকা। প্রাচীরের এই অংশের প্রতি ইহুদিরা আগে কখনোই বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখায়নি। হেরডের আমলে স্থানটি ছিল একটি শপিং সেন্টারের অংশ, এর কোনো ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল না। এই সময় পর্যন্ত ইহুদি তীর্থযাত্রীরা মাউন্ট অলিভেস ও হারামের গেটগুলোতে প্রার্থনার জন্য জড়ো হতো। ক্রুসেডার আমলে নগরী থেকে তাদেরকে যখন বের করে দেওয়া হলো, তখন তারা টেম্পল মাউন্টের পূর্ব দিকের প্রাচীরেও অনেক সময় প্রার্থনা করত। তবে মামলুক শাসনের শেষ বছরগুলোতে পরিবর্তন দেখা যেতে থাকে। হয়তো ঘন ঘন বেদুইন হামলার কারণে নগরীর বাইরে মাউন্ট অলিভেসে জমায়েত হওয়াটা ইহুদিদের জন্য নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। এর বদলে তারা হারামের পশ্চিম প্রাচীরের খালি স্থানটির দিকে নজর দিতে থাকে। তারা অতীতের সাথে একে সংযুক্ত করার দিকে ঝোঁকে।

নগর প্রাচীর নির্মাণের সময় সম্ভবত সিনানের বাসভবন থাকায় এবং তিনি দামাস্কাস গেট নিয়ে কাজ করতে থাকায় সোলায়মান ওয়েস্টার্ন ওয়ালে প্রার্থনা করার অনুমতি দিয়ে দেন। সোলায়মান ফরমান জারি করে ওয়েস্টার্ন ওয়ালের একটি স্থানে ইহুদিদেরকে প্রার্থনা করার ব্যবস্থা করে দেন। সিনান এ স্থানটির নক্সা করেছিলেন বলে কথিত রয়েছে। তিনি নিচের দিকে খনন করে প্রাচীরটির উচ্চতা বাড়িয়ে দেন এবং মাগরিবি কোয়ার্টার থেকে ইহুদি উপাসনা স্থানটিকে আলাদা করতে সমান্তরাল একটি প্রাচীর নির্মাণ করেন। স্থানটি ছিল খুবই সংকীর্ণ, মাত্র প্রায় ৯ মিটার চওড়া। তবে প্রাচীরটি উপাসনাকারীদের বেশ ভালো জমায়েতের সৃষ্টি করত। ওয়েস্টার্ন ওয়ালের ছোট্ট উপাসনা স্থানটি শিগগিরই জেরুসালেমে ইহুদি ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। আনুষ্ঠানিক কোনো ভক্তি না থাকলেও ইহুদিরা বিকেলটা সেখানে কাটাতে পছন্দ করত, সাম পড়ত, পাথরগুলোতে চুমু খেত। জেরুসালেমে স্রেফ আরো ইহুদি আকৃষ্ট করতে ইচ্ছুক সোলায়মানকে ইসরাইলের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অভিনন্দিত করা হয়। ইহুদি কিংবদন্তি অনুযায়ী, তিনি নিজে স্থানটি পরিষ্কার গোলাপ পানি দিয়ে এটি পরিশুদ্ধ করেছেন বলে বলা হয়ে থাকে, যেভাবে উমর ও সালাহউদ্দিন টেম্পল মাউন্ট নতুন করে পরিশোধনের কাজ করেছিলেন।

ওয়েস্টার্ন ওয়ালের ছোট প্রার্থনা অংশটির ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছিলেন সোলায়মান। বলা হয়ে থাকে যে এর নক্সা করেছিলেন ইস্তাম্বুলে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের প্রধান স্থপতি সিনান।

ওয়েস্টার্ন ওয়াল অল্প সময়ের মধ্যেই পবিত্র স্থানের সাথে সম্পর্কিত স্বাভাবিক মিথগুলোর কয়েকটির সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়। দেভিরের পশ্চিম প্রাচীর-সম্পর্কিত তালমুদের ঐতিহ্যের সাথেও এটি স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট হয়। তাতে রাব্বিরা বলেছেন, শেখিনা কখনো পরিত্যক্ত হননি এবং ঈশ্বর এ স্থানটি চির দিনের জন্য সংরক্ষিত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' এখন তালমুদের ওইসব ভাষ্য হারামের পশ্চিম দিকের সহায়ক প্রাচীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে লাগল। ঐশী উপস্থিতি সেখানে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় ইহুদিরা সেখানে প্রবেশ করার আগে জুতা খুলে ফেলত। তারা তাদের আর্জি কাগজের টুকরায় লিখে তা পাথরের ফাঁকে ফাঁকে গুজে রাখত, যাতে ঈশ্বরের কাছে ধারাবাহিকতা থাকে। এটি টেম্পলের খুব কাছে থাকায় বলা হয়ে থাকে যে গেট অব হেভেন ঠিক ওয়েস্টার্ন ওয়ালের উপরে এবং প্রার্থনা সরাসরি ওই স্থান থেকে ঐশী সিংহাসনে পৌছে যায়। কারাইতে মোসেস ইয়েরুশালমি ১৬৫৮ সালে লিখেছিলেন, 'ওয়েস্টার্ন ওয়ালে বিপুল পবিত্রতা রয়েছে, এতে থাকা মূল পবিত্রতা তখন ও চিরদিনের জন্য লেগে আছে।' তারা যখন সংকীর্ণ স্থানটিতে পা বাড়াত, তাদের দিকে দৃঢ়ভাবে ও সুরক্ষিতভাবে উঁচু হয়ে থাকা দেয়ালের দিকে তাকাত, ইহুদিরা তখন ঐশী উপস্থিতির মধ্যে নিজেদের অনুভব করত। প্রাচীরটি ঐশী প্রতীকে পরিণত হয়। সেইসাথে তা ইহুদি জনগণের প্রতীকও হয়ে যায়। সব রাজসিকতা নিয়ে, প্রাচীরটি ছিল ধ্বংসাবশেষ- ধ্বংস ও পরাজয়ের প্রতীক। মোসেস ইয়েরুশালমি আরো বলেন, 'টেম্পল থেকে মাত্র একটি, ও মাত্র একটি প্রাচীরই টিকে ছিল।' এটি একইসাথে অনুপস্থিতি ও উপস্থিতির স্মৃতি জাগিয়ে তুলত। ইহুদিরা যখন ওয়েস্টার্ন ওয়াল আঁকড়ে ধরত, পাথরগুলোতে চুমু খেত, তারা তখন অনুভব করত যে তারা অতীত প্রজন্মগুলো ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া গৌরবের স্পর্শ পাচ্ছে। ইহুদিদের মতো প্রাচীরটি ছিল টিকে থাকা সত্তা। তবে এটি তাদের টেম্পলের পবিত্রতাহানির কথাও স্মরণ করিয়ে দিত। এটি ইসরাইলের পঞ্জিভূত মর্মান্তিকতার প্রতীকীভাবে ফুটিয়ে তুলত। প্রাচীরে কান্না করার সময় ইহুদিরা অতীতে ও বর্তমানে তাদের হারানো সবকিছুর জন্যই প্রার্থনা

করতে পারত। টেম্পলের মতোই ওয়েস্টার্ন ওয়ালও ঈশ্বর ও খোদ ইহুদি উভয়ের প্রতিনিধি হিসেবে ধরা দিত।

উসমানিয়া জেরুসালেমে ইহুদিদের জীবন পুরোপুরি মনোমুগ্ধকর ছিল না। রোমান সিনাগগের পাশে থাকা আল-উমারি মসজিদ কর্মকর্তাদের সাথে তাদের উত্তেজনা তখনো চলছিল। ১৫৩০ ও ১৫৪৯-এর দশকে দুবার মুসলিমরা সিনাগগটি বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ইহুদিদের পক্ষে রায় দিয়েছেন কাজি। ১৫৫৬ সালে সিনাগগে এত বেশি ইহুদি উপাসনাকারী ছিল যে তাদের মুসলিম প্রতিবেশীরা তাদেরকে উৎখাত করার জন্য আরেকটি চেষ্টা করেছিল। তারা অভিযোগ করেছিল যে ইহুদিরা মুসলিম পোশাক নিয়ে হাস্যকর অনুকরণ করে আইন লঙ্ঘন করছে, তারা কেফিয়া দিয়ে প্রার্থনা শাল বানিয়ে উপাসনা করে। তারা জোরে জোরে প্রার্থনা করে পাশের মসজিদে থাকা মুসুল্লিদের নামাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ১৫৮৭ সালে সিনাগগটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়, যদিও বন্ধ করার কাজটি করা হয় নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।' ইহুদিদের তাদের স্কুলগুলো রাখার, নিজেদের বাড়িতে প্রার্থনা করার অনুমতি দেওয়া হয়। নবী স্যামুয়েলের কবর নিয়েও একই সমস্যা দেখা দেয়। জেরুসালেম থেকে ৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত এ স্থাপনাটি ইহুদি ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে শ্রদ্ধেয় ছিল। ইহুদিরা সেখানে একটি সিনাগগ রেখেছিল, তারা সেখানে নিয়মিতভাবে তীর্থযাত্রা করত। স্থানীয় মুসলিমরা অভিযোগ করত যে ইহুদিরা স্থানীয় দখল করে নিয়ে পবিত্র স্থানে মুসলিম জেয়ারতকারীদের প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ করে। অবশ্য এবার কাজি স্থায়ীভাবে ইহুদিদের পক্ষে আদেশ জারি করে তাদের সিনাগগটি বহাল রাখেন।

উত্তেজনাটি গভীরভাবে বিরাজমান নিরাপত্তাহীনতাই প্রকাশ করে। একই পবিত্র স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মীয় মতবাদের নৈকট্য চরমভাবে ঝামেলাপূর্ণ হতে পারে। বিপুলসংখ্যক ইহুদির উপস্থিতিকে মুসলিমরা হুমকিপূর্ণ মনে করে, ইহুদিদের উপাসনা তাদের মধ্যে অস্বস্তি সৃষ্টি করে। একই স্থানে দুই সম্প্রদায়ের একত্রিত হওয়াটা, প্রত্যেকের জোর দাবি যে তারাই সত্যের একমাত্র দাবিদার, কঠিন প্রশ্ন সৃষ্টি করে। তাদের কোনটা ঠিক? ইহুদি প্রার্থনা শাল সম্পর্কিত অভিযোগটি স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র মুসলিম পরিচিতি প্রতিষ্ঠা এবং এই বিভ্রান্তি থেকে

ইসলামকে আলাদা করা আকাঙ্ক্ষার কথাই প্রকাশ করে। বিশ শতকের ক্রমবর্ধমান হারে বহুত্ববাদী হয়ে ওঠা বিশ্বে একই ধরনের অনেক সঙ্ঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল, বিশেষ করে ধর্মীয় গ্রুপগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধও দেখা যায়। এ ধরনের সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনাটি হলো পূর্ব গাঙ্গেয় সমভূমির অযোধ্যায় বর্তমান মুসলিম-হিন্দু সঙ্ঘাত। উভয় সম্প্রদায়ই একে পবিত্র স্থান গণ্য করে। ইহুদিরা উসমানিয়া জেরুসালেম অরক্ষিত অনুভব করা শুরু করতে থাকে। সোলায়মানের রাজত্বের শেষ দিকে তারা নগরী ত্যাগ করতে আরম্ভ করে। তারা রিশা ও মাসলাখ জেলাও ত্যাগ করতে থাকে। এখানে তারা মুসলিমদের পাশাপাশি বাস করত। এখন তারা শারাফ জেলার দিকে সরে যেতে থাকে। এটি ওয়েস্টার্ন ওয়ালের আরো কাছাকাছি ছিল। একটি নতুন ইহুদি ছিটমহল সৃষ্টি হচ্ছিল। ষোড়শ শতকের শেষ নাগাদ শারাফ বিবেচিত হতো ইহুদি মহল্লা হিসেবে। এটি আশপাশের মুসলিম এলাকাগুলো থেকে বেশ আলাদা ছিল।

জেরুসালেমে মুসলিম ও পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের মধ্যেও নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। উসমানিয়া বিজয় বিভিন্ন খ্রিস্টান গ্রুপের তুলনামূলক মর্যাদায় বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করে। গ্রিক অর্থোডক্স, সিরিয়ান ও আর্মেনিয়ান খ্রিস্টানরা সবাই ছিল উসমানিয়া প্রজা। তারা ছিল স্বীকৃত ধর্মীয় তাইফার সদস্য। তবে ফ্রান্সিসক্যানেরা ছিল স্রেফ আবাসিক বিদেশী। তারা তখনো মাউন্ট সায়নের ঘিঞ্জি মহল্লায় বাস করছিল। দাউদের কবর তাদের হাতে না থাকলেও কেন্যাকল চার্চ তাদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। মামলুক সাম্রাজ্যের শেষ বছরগুলোতে ফ্রান্সিসক্যানেরাও হলি সেপালচার চার্চে স্থান করে নিতে পেরেছিল। ফলে এখন আটজন পাদ্রি ও তিনজন অনুচর অন্ধকার, বদ্ধ ভূগর্ভস্ত অ্যাপার্টমেন্টে বাস করত, সবসময় মাথাব্যথা ও জ্বরে ভুগত। তারা যেভাবেই হোক না কেন, উসমানিয়ারা পৌঁছার আগে হলি সেপালচারের প্রধান স্থানগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পেরেছিল। এই বিনিময় সম্পর্কে কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে ফ্রান্সিসক্যানেরা পদবির প্রমাণ হিসেবে নথিপত্রের মূল্য বুঝতে পেরেছিল। এ কারণে তারা দক্ষতার সাথে সরকারি দলিল ও ফরমান সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল।

তারপরও ১৫২৩ সালে অবস্থার অবনতি ঘটে। তখনো ইউরোপে যুদ্ধে ব্যস্ত সোলায়মান শুনে আতঙ্কিত হলেন যে কিছু 'ধার্মিক ফ্রাঙ্ক' দাউদ নবীর কবরের ঠিক ওপরে একটি চার্চ দখল করে আছে, তারা তাদের ভুয়া উপাসনার সময় বাদ্য বাজায়।' তিনি সেন্যাক্যাল চার্চকে বন্ধ করে একে মসজিদে পরিণত করার একটি ফরমান জারি করেন। সেন্যাক্যালের পূর্ব দিকের দেয়ালে এখনো লেখা রয়েছে : সম্রাট সোলায়মান, উসমানের বংশধর, এ স্থানটিকে পবিত্র করার ও কাফিরদের বিতাড়িত করে একে শ্রদ্ধার সাথে আল্লাহর নাম উচ্চারণের জন্য মসজিদে পরিণত করার নির্দেশ দিয়েছেন।' ফ্রান্সিসক্যানেরা মাউন্ট সায়নের একটি বেকারিতে চলে গেল। তাদের পক্ষ থেকে ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। তবে সুলতান তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে জেরুসালেমের অন্য সব খ্রিস্টান পবিত্র স্থান নিরাপদ ও সুরক্ষিত রয়েছে।

ইউরোপের পরাশক্তিগুলোর সমর্থন জেরুসালেমে ফ্রান্সিসক্যানদের নাজুক অবস্থার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্যের ব্যবস্থা করত। ১৫৩৫ সালে সোলায়মান ইউরোপিয়ান সম্রাট পঞ্চম চার্লসের বিরুদ্ধে প্রথম ফ্রান্সিসের সাথে একটি চুক্তি করেন। ফ্রান্সের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী সোলায়মান ক্যাপিচুলেশনের (শর্তাধীন সমর্পণ) ব্যবস্থা করেন। এর ফলে ফরাসি বণিকদেরকে উসমানিয়া এখতিয়ারের আওতামুক্ত থেকে সাম্রাজ্যের বাণিজ্য করার সুবিধা লাভ করে। ফ্রান্সিস মুসলিম আইনিব্যবস্থার কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ ছাড়াই উসমানিয়া ভূখণ্ডে ফরাসি বণিক অন্যান্য প্রজার মধ্যকার দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা বিচার করার জন্য ফরাসি 'বেইলিফ' বা 'কাউন্সিল' নিয়োগ করতে পারতেন। ক্যাপিটুলেশন জেরুসালেমের পবিত্র স্থানগুলোর প্রধান

স্থানগুলোর প্রধান রক্ষক হিসেবে ফ্রান্সিসক্যানদের অবস্থানও নিশ্চিত করে। ১২ এসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে সামান্যই। পাশ্চাত্যের কোনো কাউন্সিলের জেরুসালেমে স্থায়ীভাবে বসবাস করার তিন শত বছর আগেকার ঘটনা এটি। সোলায়মান সদাশয়তার চেতনায় ক্যাপিটুলেশনের আয়োজন করেছিলেন। তখন উসমানিয়া সাম্রাজ্য ছিল ক্ষমতার শীর্ষে। পরে তার উত্তরসূরিরা ফ্রান্স ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের সাথে একই ধরনের চুক্তি

করেছিলেন। তবে সোলায়মান ভুল হিসাব কষেছিলেন। উসমানিয়া সাম্রাজ্য যখন ক্ষয়ে আসছিল, তখন এ ধরনের ব্যবস্থা তুর্কি সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করার মতো করে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য সুযোগটি কাজে লাগিয়েছিল পাশ্চাত্য।

স্বাভাবিকভাবেই পবিত্র স্থানগুলোর ফ্রান্সিসক্যানদের নিয়ন্ত্রণ গ্রিক অর্থোডক্সের সাথে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। কারণ গ্রিক অর্থোডক্স ক্রুসেডের সময় থেকে ল্যাতিন চার্চের প্রতি সদয় দৃষ্টিতে তাকাতে সক্ষম হয়নি। ক্রুসেডারেরা কেবল বলপূর্বক হলি সপালচার থেকে তাদের বিদায়ই করেনি, সেইসাথে ১২০৪ সালে চতুর্থ ক্রুসেডের সেনাবাহিনীর কনস্টানটিনোপল লুণ্ঠন ছিল পুরো ক্রুসেড ইতিহাসের অন্যতম লজ্জাজনক ঘটনা। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, ক্রুসেডারদের এই আক্রমণ থেকে বায়জানটিয়াম আর কখনো আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারেনি। ফলে গ্রিকরা ল্যাতিনদের তাদের শত্রু গণ্য করবে, এমনটিই স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও গ্রিকরা শিখতে পারেনি কিভাবে উসমানিয়া কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করতে পারেনি কিংবা সর্বোচ্চ প্যাট্রিয়ার্কের উসমানিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তাম্বুলে (ওই সময়ে বলা হতো কনস্টানটিনোপল) বাস করার সুযোগটিও কাজে লাগাতে পারেনি। ১৫৪১ সালে জেরুসালেমের প্যাট্রিয়ার্ক জারমানাস অর্থোডক্স খ্রিস্টবিশ্বের পক্ষ থেকে পবিত্র স্থানগুলোর আনুষ্ঠানিক অভিভাবক হিসেবে হলি সেপালচারের হেলেনিক কনফেডেরেসি প্রতিষ্ঠা করে। একই সময়ে পবিত্র স্থানগুলোর সুরক্ষা দিতে ফ্রান্সিসক্যানেরা নিজেদের নিয়ে ল্যাতিন খ্রিস্টবিশ্বের পক্ষ থেকে একটি জাতীয় সম্প্রদায় গঠন করে। যুদ্ধরেখা টানা হলো এবং প্রাথমিক সঙ্ঘাতের মাধ্যমে খ্রিস্টের সেপালচারের নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্রিক ও পাশ্চাত্য খ্রিস্টানদের মধ্যে দীর্ঘ, ধর্মীয় যুদ্ধ শুরু হয়। ১৫৫১ সালে আরেকটি যুদ্ধে জয়ী হয় ফ্রান্সিক্যানেরা। ভেনেশিয়ানরা হলি সেপালচারের পশ্চিমে ছোট্ট একটি কনভেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য সোলায়মানের কাছে অনুমতি চায়। ওই সময় বাড়িটিতে কয়েকজন জর্জিয়ান নান বাস করতেন। জর্জিয়ান খ্রিস্টানেরা প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু অর্থে অনেক কিছু হয়। ফলে নানদেরকে চলে যেতে হয়। ১৫৫৯ সালের জুলাই মাসে ফ্রান্সিসক্যানেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করে নতুন নামকরণ করে কনভেন্ট সেন্ট স্যাভিয়র্স নাম দেয়। এটি জেরুসালেমে তাদের প্রধান সদরদফতরে পরিণত হয়। তারা আশপাশের কিছু বাড়িও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে শুরু করে। ১৬০০ সাল নাগাদ

একটি কাঠমিস্ত্রি ও মুচির দোকানসহ সেন্ট স্যাভিয়ার্স একটি প্রাণবন্ত কম্পাউন্ডে পরিণত হয়। ১৬৬৫ সাল নাগাদ একটি ছেলেদের স্কুল, একটি লঙ্গরখানা, একটি পাঠাগার, একটি আরোগ্যালয় (এখানে নগরীর সেরা চিকিৎসাসেবা প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সোলায়মানের মৃত্যুর পর, ১৫৬৬ সালে, তার সম্রাজ্যে দুর্বলতা ফুটে ওঠতে থাকে। সামন্তবাদীব্যবস্থা ধীরে ধীরে অবনতির দিকে যেতে থাকে। একবার বিজয়ের যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী হারানোর ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য সিপাহিরা, সামন্তপ্রভুরা তাদের এলাকায় কৃষকদের শোষণ করার চেষ্টা করতে থাকে। এতে করে কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এতে অপ্রত্যাশিতভাবে সাম্রাজ্য সঙ্কটে পড়ে যায়। উসমানিয়া সাম্রাজ্য পতনের অন্য যেসব কারণ রয়েছে সেগুলো হলো ভারতবর্ষগামী সমুদ্র রুটের সূচনা, নতুন বিশ্ব আবিষ্কারের পর রৌপ্য

মুদ্রার মান কমে যাওয়া, জাননেসারিদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোস, তুরস্ক ও অন্যান্য প্রদেশের কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকা। ১৫৭১ সালে লেপান্তোর যুদ্ধে উসমানিয়াদের হার দিয়ে এসবের শুরু হয়। সাম্রাজ্যও তার সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব হারায়। ক্রমবর্ধমান সঙ্কট প্রতিফলিত হয় জেরুসালেমে পাঠানো উসমানিয়া কর্মকর্তাদের মানের অবনতি। পাশারা মুসলিম ও জিম্মি উভয়দের নির্যাতন করতে থাকে : ১৫৭২ ও ১৫৮৪ সালে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমরা নগরী ত্যাগ করতে থাকে। জন-নিরাপত্তায় অবনতি ঘটে, বিশেষ করে নগরগামী রাস্তাগুলো আবার বেদুইনরা ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাত করতে থাকে। ষোড়শ শতকের শেষ নাগাদ বেদুইনরা নিয়মিতভাবে হেবরন ও নবী মুসা সফরকারী তীর্থযাত্রীদের ওপর হানা দিতে থাকে, মসজিদগুলোতে ইমামদেরকে খুতবা দিতে বাধা দেওয়া হতে থাকে। সরকার একটি সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছিল : তারা বেদুইনদের প্রতিভূ করে জায়গিরদার হিসেবে শেখদের নিয়োগ করে। তীর্থযাত্রীদের কাফেলার কর আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে তাদের সহায়তা পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। তারা এমনকি গ্রামীণ এলাকার বেদুইনদের জন্য পল্লী বসতি স্থাপনের ব্যবস্থাও করেছিল। দুর্গ ও সেনাবাহিনী মোতায়েনও করা হয়। ১৬৩০ সালে সুলতান চতুর্থ মুরাদ বেথলেহেম ও

সুলতানের সরোবরের কাছে বিশাল দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু তারা তখন পরাজয়ের যুদ্ধে লড়ছিল। ইস্তাম্বুল এখন ইউরোপ ও রাশিয়ার উভয়ের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। প্রদেশগুলোতে আইন প্রয়োগের মতো জনশক্তির অভাব দেখা দেয়।

তবে সুলতানেরা হারামকে অবহেলা করেননি। ১৫৯৭ সালে সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদ, ১৬০৩ সালে প্রথম আহমদ ও ১৬১৭ সালে প্রথম মোস্তফা ডোম অব দি রক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তারা পবিত্র স্থানগুলো সম্পর্কে প্রতিনিয়ত ফরমান জারি করতেন। পাশারাও হারামকে সুষ্ঠু রাখাকে তাদের প্রধান কর্তব্য মনে করতেন, স্থানটি যাতে পরিচ্ছন্ন ও যথাযথভাবে মেরামত হয়, তা নিশ্চিত করতেন। ওয়াকফ রাজস্ব রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হতো। তবে সরকার প্রয়োজন পড়লে সবসময় ব্যয়ভার বহন করতে রাজি থাকত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সতের শ' শতকে জেরুসালেমের পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। অবশ্য নগরীটি তখনো ছিল আকর্ষণীয়। তুর্কি পর্যটক ইভলিই চেলেবি ১৬৪৮ সালে আল-কুদস সফরের সময় দুর্গ, হারামে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি অর্থনীতির প্রশংসাও করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, হারাম, আশপাশের মাদরাসার জন্য বেতনভোগী আট শ ইমাম, ধর্মপ্রচারক, মোয়াজ্জিন ও হাফেজ রয়েছেন। মুসলিম তীর্থযাত্রীরা তখনো হারামের চারপাশ জেয়ারত করতেন, এর চূড়ান্ত 'মঞ্জিলগুলোতে' দোয়া পড়তেন। চেলেবি ছোট ডোম অব প্রফেটে বেশি অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, এর কালো পাথরটি মূলত ছিল রুবির মতো লাল। তবে চোখের পানির ঢলে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তিনি ডোম অব চেইনে নামাজ পড়েন, উজ্জ্বল নীল রঙে রঙিন এর অনন্য কাশেম টাইলসের প্রশংসা করেন। এগুলোর রং ছিল উজ্জ্বল নীল। হারাম ছিল তীব্র আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র। বারান্দাগুলো ভারতবর্ষ, পারস্য, কুর্দিস্তান ও এশিয়া মাইনরের দরবেশে পরিপূর্ণ ছিল। সারা রাত তারা পবিত্র কোরআন তেলায়াত করতেন, জিকির করতেন, সুর করে আল্লাহর নাম জপতেন। আর এসব করা হতো স্তম্ভশ্রেণিগুলোতে নিয়মিত ব্যবধানে জ্বালানো বাতিগুলোর আলোতে। ফজরের নামাজের পর আরেক দফা জিকির হতো হারামের দক্ষিণ-পশ্চিম

কোণে থাকা মাগরিবি মসজিদে। চেলেবির এই কাজকে হইচই আর পাগলামিময় কাণ্ড মনে হয়েছে।

তিনি জানিয়েছেন যে জেরুসালেমের পাশার কমান্ডে ছিল পাঁচ শ' সৈন্য। তাদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল প্রতি বছর দামাস্কাস প্রদেশের হজ কাফেলাকে মক্কায় পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া। তখনো কাজি ও পাশা সমান বেতন পেতেন, হজ বাণিজ্য থেকে অতিরিক্ত ৫০ হাজার পিয়াস্ত্রে পেতেন। কেবল ইস্টারেই নগরীতে পাঁচ হাজার থেকে ১০ হাজার খ্রিস্টান তীর্থযাত্রী থাকতেন। প্রবেশ ফি হিসেবে প্রত্যেকে ১০ থেকে ১৫ পিয়েস্ত্রা করে না দিলে কেউ হলি সেপালচারে প্রবেশ করতে পারত না। নবি মুসা বা হেবরন জিয়ারতে গেলে সড়ক নিরাপত্তা বাবদ মুসলিম জেয়ারতকারীদেরকেও কর দিতে হতো। চমৎকার পাথরের বাড়িঘর আর মনোরম প্রাচীরঘেরা জেরুসালেমকে চেলেবির কাছে দুর্গ নগরী মনে হয়েছিল। তিনি বলেন, এখানে ৪৩টি আঙুর বাগান ছিল। জেরুসালেমবাসী বছরে তিন মাস এসব ফল উপভোগ করতে পারত। এছাড়া ছিল অনেক ফুলবাগান আর সবজি খামার। আশপাশের পাহাড়গুলো ঢাকা ছিল জলপাই উদ্যানে। নগরীর বাতাস ছিল টাটকা, পানি ছিল মিষ্টি। মুহতাসিব (সুক তদারককারী) অফিসের নথিপত্র পরীক্ষা করে তিনি উল্লেখ করেন, জেরুসালেমে রয়েছে ২,০৪৫টি দোকান, ছয়টি সরাইখানা, ছয়টি হাম্মামখানা, বেশ কয়েকটি চমৎকার বাজার। তবে সর্বোপরি এটি ধর্মীয় শহর। আর্মেনিয়ানদের রয়েছে দুটি চার্চ, গ্রিকদের তিনটি, ইহুদিদের আছে দুটি সিনাগগ :

নগরীটি ছোট মনে হলেও এতে আছে ২৪০টি মিরহাব, হাদিস শেখানোর সাতটি প্রতিষ্ঠান, কোরআন শেখানোর ১০টি প্রতিষ্ঠান, ৪০টি মাদরাসা, সুফিদের ৭০টি খানকাহ।১৩

নিরাপত্তাগত কারণে প্রতি রাতে ফটকগুলো বন্ধ থাকে, মাউন্ট সায়ন ছাড়া নগর-প্রাচীরের বাইরে কোনো বাড়ি নেই। মাউন্ট সায়নকে তিনি 'দাউদের উপকণ্ঠ' হিসেবে অভিহিত করেছেন।১৪

চেলেবি অবশ্যই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তবে সোলায়মানের আমলে প্রাণবন্ত উন্নয়নের পর নগরীটির অবস্থা অবনতি ঘটতে থাকে। বেশির ভাগ নির্মাণকাজ ছিল সংস্কারমূলক,

উদ্ভাবনমূলক নয়। রাজকীয় সঙ্কটের কারণে ইস্তাম্বুলের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ছিল সামান্য। স্থানীয় আরব অভিজাত ব্যক্তিদের অনেক সময় জেরুসালেমের গভর্নর নিযুক্ত করা হতো। অষ্টাদশ শতকে এই রীতি বেশি করে অনুশীলন চলে। কাজি সাধারণত ইস্তাম্বুল থেকে আসতেন। তবে তার অধস্তন পদগুলো সাধারণ জেরুসালেমের শীর্ষস্থানীয় পরিবারগুলো থেকে পূরণ করা হতো। আবুল লুতফ পরিবার থেকে চারজন মুফতি নিয়োগ করা হয়েছিল, দাজানি পরিবার থেকে একজন। প্রধান প্রধান শিক্ষক পদেও পরিবারগুলো লোক যোগান দিত। এগুলো ঐতিহ্য পরম্পরা হয়ে পড়েছিল। এর ফলে অনিবার্যভাবেই মানের পতন ঘটেছিল। ১৬৭০ সালে পর্যটক আল-খিয়ারি ব্যাখ্যা করেন যে তিনি পুরো আল-কুদসে তিনি একজন খ্যাতিমান আলেমও খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে তখনো মাদরাসাগুলো খোলা ছিল : চেলেবি উল্লেখ করেছেন যে ৫৬টি মামলুক মাদরাসার মধ্যে ৪০টি সক্রিয় রয়েছে। তবে টানাপোড়েন দেখা যাচ্ছিল। শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বেতন তখনো রাষ্ট্র বহন করে যাচ্ছিল। তবে সপ্তদশ শতক নাগাদ অনেক সময় ছাত্রের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশি হয়ে যেত। আকসা মসজিদের সংস্কার মানসম্পন্ন হয়নি, ফলে দরবেশদেরকে বারান্দায় থাকার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ওয়াকফ ব্যবস্থার অবনতি হয়েছিল : অবহেলা, অসততা ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ছিল।

উসমানিয়া সাম্রাজ্যের পতনে ভারসাম্য বিধান করেছিল ইউরোপিয়ান শক্তিগুলোর উত্থান। তারা এখন সুলতানদের শর্ত বেঁধে দিতে পারত। এর পরিণামে ফ্রান্সিসক্যানদের অবস্থা অব্যাহতভাবে ভালো হতে লাগল'। উসমানিয়া ও ইউরোপের মধ্যে প্রায় প্রতিটি সামরিক ও বাণিজ্য চুক্তিতে হলি সেপালচার-সংক্রান্ত কোনো না কোনো ধারা অন্তর্ভুক্ত থাকতই। ইউরোপের রাজারা অবশ্য যতটুকু চাইতেন, জেরুসালেমের বিষয়াদিতে ততটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন না। ১৬২১ সালে ফ্রান্স ও সুলতান প্রথম মোস্তফার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির পর প্রথম ফরাসি কনসাল হিসেবে এম জ্যাঁ লেম্পায়ারকে জেরুসালেমে পাঠানো হয়েছিল। তার দায়িত্ব ছিল ফ্রান্সিসক্যান ও পাশ্চাত্যের তীর্থযাত্রীদের অধিকার সুরক্ষা করা। তিনি ফি, জরিমানা ও ঘুষের আকারে তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৬৩১ সাল নাগাদ পাশারা সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তারা কনসালকে ক্ষতির উৎস হিসেবে দেখতে পেলেন : জাফা বন্দর ছিল

মাত্র আট ঘণ্টা দূরে। আর কত পাশ্চাত্য 'কনসাল' লেপেরারের পর এসে তাদের শুল্কে হস্তক্ষেপ করতে থাকবে? রাজকীয় ডিক্রি বাতিল করা হলো, কনসাল দেশে ফিরে গেলেন। আর কোনো কনসালকে জেরুসালেমে অনুমোদন দেওয়া হয়নি। তবে ১৬৬১ সালে ফ্রান্স তাদের দাবি বজায় রাখতে সক্ষম হলো যে সিডন ও একরে তাদের কনসাল জেরুসালেমে ল্যাতিনদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তারা শর্ত দিলো যে প্রতিটি ইস্টারে তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করতে এবং কোনো ধরনের বাধা ছাড়াই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন নিশ্চিত করতে তিনি জেরুসালেমে আসার অনুমতি পাবেন।

গ্রিক অর্থোডক্সরা আরো দক্ষতার সাথে তাদের বিষয়াদি সংগঠিত করতে শুরু করল। ইস্তাম্বুলের সর্বোচ্চ প্যাট্রিয়ার্ক রাজদরবারে বিষয়গুলো টেনে আনতে সফল হলেন, সুলতান ও উজিরদের ঘুষ দিতে সক্ষম হলেন। ১৬৩৪ সালে সুলতান চতুর্থ মুরাদের সাথে সাক্ষাতকালে জেরুসালেমের প্যাট্রিয়ার্ক থিওফ্যানি ৬৩৮ সালে প্যাট্রিয়ার্ক সোফ্রোনিয়াসকে দেওয়া খলিফা উমরের পত্র উত্থাপন করেন। এতে পবিত্র স্থানগুলোর ওপর গ্রিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রদান করা হয়েছিল। ইস্তাম্বুলের ফরাসি রাষ্ট্রদূত সাথে সাথে ঘোষণা করলেন যে পত্রটি জাল। এর জবাবে থিওফ্যানিকে সাম্প্রতিক সময়ে আরো কিছু উসমানিয়া নথিপত্র উপস্থাপন করেন। এগুলো প্রথম সেলিম ও সোলায়মানের প্রদত্ত বলে দাবি করা হলো। সুলতান মুরাদ গ্রিকদের অনুকূলে একটি ফরমান ইস্যু করে তাদেরকে বেথলেহেমের ন্যাটিভিটি চার্চ এবং হলি সেপালচার চার্চের বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের কর্তৃত্ব দিয়ে দিলেন। তবে পোপ, ফ্রান্স ও ভেনিসের চাপে সুলতান ২৬ হাজার পিয়েস্ত্রা পরিশোধের পর ফরমানটি বাতিল করেন। ফলে ফ্রান্সিসক্যানেরা ক্ষমতা ফিরে পায়। অবশ্য তা দীর্ঘ সময়ের জন্য নয়। উসমানিয়ারা এখন আয়ের একটি মূল্যবান উৎস পেয়ে গেল : পবিত্র স্থানগুলো সর্বোচ্চ দরপত্রদাতার কাছে চলে যেত। ১৬৩৭ সালে গ্রিকরা নতুন ফরমান পেয়ে হলি সেপালচারে অপেক্ষাকৃত শ্রেয় অবস্থানে চলে আসে।

এটি শ্রেষ্ঠত্বের জন্য লড়াইয়ের জন্য অশোভন স্থান ছিল। কারণ খ্রিস্টান বিশ্বাস অনুযায়ী এখানেই ঈশ্বর-মানুষ স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। ফ্র্যান্সিসক্যানেরা বিশেষভাবে খ্রিস্টের আগের প্রতি ভক্তিময় থাকলেও তারা

নিজেদের জীবনে এই শিক্ষা প্রয়োগ করতে দৃশ্যত অসমর্থ্য ছিল। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে বিষাক্ত প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল : ষোড়শ শতকে আরো দুই ফ্রান্সিসক্যান হারামে প্রবেশ করে নবী মুহাম্মদকে গালিগালাজ করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। শহিদ হওয়ার এই আগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা ছিল মৃত্যুর দিকে খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরণের নিজস্ব পন্থা, যদিও এটি ভালোবাসার চেয়ে ঘৃণায় উদ্দীপ্ত ছিল বেশি। খ্রিস্টের মৃত্যুর সাথে শনাক্ত করার তাদের আরেকটি পদ্ধতি ছিল ক্রুশের কেন্দ্রগুলোর প্রতি নতুন ভক্তি। এগুলো তখন জেরুসালেম দৃশ্যপটের অংশবিশেষ হয়ে পড়েছিল। সপ্তদশ শতকের শুরুতে ফ্রান্সিসক্যানেরা প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় ভায়া ডোলোরোসায় শোভাযাত্রা বের করত। এসময় খালি পায়ে তারা পথজুড়ে আটটি 'মঞ্জিলে' তারা অ্যাভ ও প্যাতেরনস্তার বলত। এটি শুরু হতো 'এসে হোমো আর্চের' 'পিলেত হাউস' থেকে। তারপর তারা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলত, যেখানে ক্রুশের ভারে ক্রিস্ট পড়ে গিয়েছিলেন, তার মায়ের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, সেরেনের সাইমন সহায়তা করেছিলেন, নগরীর নারীদের কাছে জেরুসালেম ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেসব স্থানে যাত্রাবিরতি করত। তারপর তারা গলগোথায় যাওয়ার আগে হলি সেপালচার চার্চের খ্রিস্টের কারাগার' পরিদর্শন করত। অন্য তীর্থযাত্রীদের তাদের নিজস্ব ধরনের মঞ্জিল ছিল। তাদের অনেকে খ্রিস্টের তীর্থযাত্রার তাদের দেশের চার্চগুলো চালু করেছিল। শেষ পর্যন্ত চার্চ দেয়ালজুড়ে বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে ১৪টি মঞ্জিলের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। ঊনিশ শতকে জেরুসালেমের ভায়া ডোলোরোসার মঞ্জিলগুলোর সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোতে আরো ছয়টি মঞ্জিল যোগ করা হয়। এটি ছিল পাশ্চাত্য ভক্তির বিশেষত্ব। গ্রিক অর্থোডক্স প্যাসন অব খ্রিস্টের চেয়ে পুনরুত্থানের ওপর বেশি গুরুত্ব দিত। তবে মঞ্জিলগুলো ছিল ঐশী পথ বেয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত দুর্ভোগ থেকে জনগণকে ঊর্ধ্বে উঠাতে সহায়ক।

ইহুদিরাও একই ধরনের শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ তৈরি করেছিল। স্পেন থেকে বহিষ্কারের পর ইহুদি উদ্বাস্তুদের অনেকে শেষ পর্যন্ত স্যাফেদে বসতি স্থাপন করেছিল। সেখানে কাব্বালিপন্থী আইজ্যাক লুরিয়ার প্রভাবে তারা নির্বাসনের অভিজ্ঞতার ওপর জোর দিয়ে নতুন ধরনের আধ্যাত্মিকতা বিকশিত করেছিল। লুরিয়ানিক কাব্বালাহ কিংবদন্তিতে বলা হতো, একেবারে শুরুতে ঈশ্বর সৃষ্ট বিশ্বের জন্য জায়গা করে দিতে নিজের একটি

অংশকেই নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। একটি প্রাথমিক বিপর্যয়ের সময় শেখিনা, ঈশ্বরের কণে, ঈশ্বর-প্রকৃতি থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিল। ঐশী সত্তা এখন সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে নিকৃষ্ট বস্তুতে বন্দি হয়ে পড়ে। এর ফলে সত্তার নিজের কেন্দ্রেই বিচ্যুতি ঘটে। কোনো কিছুই ঠিক মতো হচ্ছিল না। ইহুদিদের নির্বাসন ঈশ্বর ও মানুষের একই ধরনের মহাজাগতিক গৃহহীনতার বিষয়টিই প্রতীকীভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। তবে ইহুদিরা সতর্কভাবে তাওরাত অনুসরণ ও আধ্যাত্মিক উপাসনার মাধ্যমে শেখিনার নির্বাসনের অবসান ঘটাতে পারত। এসব কাব্যিক কল্পকথা- প্রাচীন পৌত্তলিক কিংবদন্তির পুনঃসৃষ্টি- অনেক ইহুদি লোকের কাছে সরাসরি বলা হতো। তারা এসব অন্ধকার বছরগুলোর অভিজ্ঞতা নির্বাসনে নতুন করে অর্জন করত। শিকড় থেকে উচ্ছেদ হওয়া ইহুদিরা বিশ্বকে ভৌতিক বিশ্ব হিসেবে দেখত, জীবনকে দেখত অশুভ শক্তির সাথে সংগ্রাম হিসেবে। লুরিয়ার কল্পলোক আদি ঐক্যের সাথে চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে তাদের নিজেদের দুর্দশা অতিক্রম করে যেত। এটি সময়ের শুরুর সময়কার অস্তিত্ব প্রকাশ পেত।

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে স্যাফেদ ও জেরুসালেমের কাব্বালপন্থীরা এমন এক শাস্ত্রীয় আচরণের মাধ্যমে শেখিনার পরিত্রাণ উপভোগ করত- সময়োচিতভাবে- যেটাকে তারা ঐশী সত্তার প্রতিক্রিয়া মনে করত। প্রতি শুক্রবার বিকেলে তারা ঈশ্বরের ঐশী কণে শেখিনাকে স্বাগত জানাতে নগরীর বাইরে মাঠে সাদা কাপড় পরে শোভাযাত্রা সহকারে অপেক্ষা করত। তারা তারপর ঐশী উপস্থিতিকে তাদের বাড়ি নিয়ে যেত। প্রতিটি বাড়িতে খাবারের ঘরে বিবাহ চাঁদোয়া, মদ, ধূপদানি রাখা হতো। এগুলো টেম্পলের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। অর্থাৎ শেখিনা প্রতীকীভাবে দেভিরে প্রবেশ করতেন, ঐশীভাবে পবিত্র স্থানে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হতেন। আইজ্যাক লুরিয়া একটি ভজন রচনা করেছিলেন। এটি সাবাতের খাবারের পর সবসময় গাওয়া হতো :

দক্ষিণ দিকে আমি মরমি মোমদানি রাখি,

আমি উত্তরে জায়গা রাখি রুটি রাখার টেবিলের জন্য...

শেখিনাকে ছয় সাবাত রুটি দিয়ে ছয় দিক থেকে ঐশী পবিত্রতা দিয়ে

ঘিরে রাখার জন্য।

দুর্বল ও অচ্ছ্যুৎ অশুদ্ধ শক্তি বের করে দেবে

তাণ্ডবকারী দানবগুলোর

পায়ে বেড়ি পরানো হবে। ৫

প্রতিটি বাড়ি টেম্পলের প্রতিকৃতিতে পরিণত হয়েছিল; প্রতিটিই এর মাধ্যমে প্রতীকীভাবে ঈশ্বরের ঐশী বাসস্থান ঐশী জেরুসালেমের সাথে সম্পর্কিত ছিল। শেখিনার শাস্ত্রাচারগত প্রত্যাবর্তনের অর্থ হতো প্রতি সপ্তাহে এক রাতের জন্য সবকিছু যথার্থ স্থানে চলে যেত, অশুভ শক্তি নিয়ন্ত্রণে থাকত। এর মাধ্যমে সাবাত সাময়িক তীর্থে পরিণত হতো। এর মাধ্যমে জীবন যেমন হওয়া উচিত তেমন ছবি প্রকাশ করা হতো। শুক্রবার রাতের শাস্ত্রাচারও ঐশী সত্তার চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তনের ভাবমূর্তি প্রকাশ করত। মিলনের বিষয়টি লুরিয়ানিক কাব্বালাহর যৌন কল্পনার কথা প্রকাশ করত।

স্যাফেদে টেম্পলের জন্য শোক শাস্ত্রাচার নতুন এক তাগিদ সৃষ্টি করে। লুরিয়ার অন্যতম শিষ্য আব্রাহাম হ্যালেভি বারুখিম একবার স্বপ্নবিভাবে কালো পোশাক পরে শেখিনাকে কাঁদতে দেখেন, আর এর ছাপ ওয়েস্টার্ন ওয়ালে রয়ে যায়। প্রতি দিন মধ্য রাতে তিনি জেগে স্যাফেদের রাস্তায় রাস্তায় দৌড়াতেন, চিৎকার করতেন বলতেন, 'ঈশ্বরের দোহাই জাগো, শেখিনা নির্বাসনে, আমাদের প্রার্থনা গাহ পুড়ে গেছে, ইসরাইল মহা যন্ত্রণায় রয়েছে।' অন্যরা আরো বিস্তারিত মধ্যরাতের শাস্ত্রাচার পালন করত। মরমি সাধক 'রাচেলের অনুষ্ঠান' পালন করার জন্য জাগতেন, পোশাক পরতেন। এতে তিনি কল্পনাপ্রসূতভাবে শেখিনার নির্বাসনে প্রবেশ করতেন। শেখিনার মতো করে কাঁদতেন তিনি, জুতা খুলে মুখে ধুলা মাখতেন। এটি ছিল ঈশ্বরের অনুকরণ। এটি মহাজাগতিক পর্দা উন্মোচনে তার অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ করত। তবে লুরিয়া তার শিষ্যদের কখনো কষ্টে ফেলেননি। তিনি আনন্দ আর উদযাপনের ওপর গুরুত্ব দিতেন। সূর্যোদয়ের সময় তিনি 'লেহর আচার' পালন করতেন : তিনি শেখিনার চূড়ান্ত পরিত্রাণ বর্ণনা

করতেন, ঈশ্বর-প্রকৃতির কথা ভাবতেন, যতক্ষণ না তার মনে হতো তার দেহটি চ্যারিয়ট-থর্নের আকার ধারণ করেছে। প্রতিরাতে কাব্বালিরা সত্তার উৎসের সাথে উল্লাসপূর্ণ পুনঃএকত্রিত হতো। তিনি ঐশী উপস্থিতির (অবতার জেরুসালেম ও দেহ-মন্দির) মানব উপাসনালয়ে পরিণত হয়েছিলেন।১৭

লুরিয়ানিক কাব্বালাহ ছিল পুরনো পৌরাণিকতত্ত্বের আধ্যাত্মিক সংস্করণ। জেরুসালেমে দৈহিক আলিয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইহুদিরা ওই নগরীকে মূল্যবান করা সত্যের সাথে তাদের নিজের বাড়িতে ও নিজের সত্তার মধ্যেই মুখোমুখি হতে পারত। ন্যাচমানিডেদের মতো লুরিয়া ইহুদিবাদী ছিলেন না। তার আইডিয়াগুলো ইউরোপে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তার ঐশী নির্বাসনের দর্শন দুর্ভোগ ও বাস্তুচ্যুত ইহুদিদের কথা বলত। প্রাচীন বিশ্বের ঐশী ভূগোলের মতো এই ধরনের আধ্যাত্মিকতা ছিল অনিবার্যভাবে কল্পনাশক্তিমূলক অনুশীলন। এটি নির্ভর করত তাদের আয়ত্তের বাইরে থাকা সত্যকে প্রতীকের আকারে দেখার সামর্থ্যের ওপর। মানুষের পক্ষে যতটা উপলব্ধি করা সম্ভব ততটা অসম্পূর্ণভাবে প্রতিনিধিত্ব করে তারা অদেখা আধ্যাত্মিকতায় অবগাহন করেছিল, যাতে তারা উপাসনাকারীদের সংস্পর্শে দুই সত্তা পরিণত হতে পারে একক সত্তায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কাব্বালার মিথ আক্ষরিকভাবে উপলব্ধি করা হয়ে থাকলে এগুলো হয় ছিল স্পষ্টভাবে অযৌক্তিক বিষয় কিংবা এমনকি ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে চালিত করতে পারত। শাব্বাতাই জেভির ঘটনায় বিষয়টি ফুটে ওঠে। এই বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ইহুদি এমনসব লক্ষণ প্রকাশ করতেন, যেগুলোকে বর্তমান সময়ে আমরা মানসিক-বৈকল্য হিসেবে অভিহিত করতে পারি।১৮ তিনি তার 'বাতিকগ্রস্ত' অবস্থায় ঈশ্বরের নামে পুরোপুরি নিষিদ্ধ খাদ্য বিধান লঙ্ঘন করেছেন, ঘোষণা করেছিলেন যে তাওরাতকে বাতিল করা হয়েছে। এসবের পর এসেছিল ঘোর হতাশা। ভ্রাম্যমান জীবনে শাব্বেইতির সাথে সাক্ষাত হয়েছিল গাজার তরুণ কাব্বালপন্থী রাব্বি নাথানের। এই রাব্বি ধ্যানমগ্ন হয়ে তাকে মেসাইয়া ঘোষণা করেন। বিষণ্নতায় ডুবে গেলে শাব্বেতাই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ভুতুরে রাজ্যে প্রবেশ করতেন। তিনি শেখিনাকে ধুলা থেকে তুলে এনে নির্বাসনের অবসান ঘটাতেন। তার 'বাতিক' পর্যায় ছিল পরিত্রাণের

(যেখানে তাওরাতের আর প্রয়োজন পড়ে না, কোনো কিছুই নিষিদ্ধ থাকবে না) পর মেসাইনিক মেয়াদের পূর্ব লক্ষণ।

শাব্বেতাই ১৬৬৫ সালের ৩১ মে নিজেকে মেসাইয়া ঘোষণা করে জানালেন যে তিনি জেরুসালেম পর্যন্ত রওনা হচ্ছেন। তিনি তার শিষ্য হিসেবে ১২ জন তরুণ রাব্বিকে বাছাই করেন, ইসরাইলের প্রতিটি গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে একজন মনোনীত হলেন। তার পরিকল্পনা ছিল টেম্পল মাউন্ট গিয়ে সেখানে উৎসর্গ শাস্ত্রাচার আবার শুরু করা : নাথান নিযুক্ত হলেন উচ্চ পুরোহিত। খবরটি জেরুসালেমের ইহুদিদের কাছে পৌঁছাল তাদের মধ্যে আতঙ্ক ও সন্ত্রস্ত্রতা সৃষ্টি করল। তাদের অবস্থান ইতোমধ্যেই নাজুক হয়ে পড়েছিল। ফলে শাব্বেতাই যদি হারামের পবিত্রতা লঙ্ঘন করেন, তবে মুসলিম প্রতিশোধ ভয়ঙ্কর হতে পারে। তারা পরিকল্পনা পরিত্যাগ করার জন্য শাব্বেতাইয়ের কাছে অনুনয় করল। তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। মুক্তি এত কাছে এসে গেলেও এখন আবারো তা বিলম্বিত হচ্ছে! তিনি সত্যিই জেরুসালেমে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে ঘোষণা করেন, তাওরাত বাতিল হয়ে গেছে, তাকে ইসরাইলের রাজা ঘোষণা করা হয়েছে। রাব্বিরা তাকে কাজির হাতে তুলে দিলেন, তিনি তাকে বিদ্রোহের অভিযোগ থেকে খালাস দিলেন। সন্দেহাতীতভাবে কাজির মনে হয়েছে, লোকটির মাথা ঠিক নেই। কিন্তু শাব্বেতাই মনে করলেন, এটি তার মিশনের প্রমাণ। তিনি সবুজ জোব্বা পরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে নগরীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এটি ছিল আরেকটি বেয়াদবিপূর্ণ কাজ। কারণ জিম্মিদের ঘোড়ায় চড়ার অনুমতি ছিল না, আর সবুজ ছিল নবীর রঙ।

শাব্বেতাই জেরুসালেম ত্যাগ করলেন। তবে এই মরমি মেসাইয়ার বাতিকগ্রস্ত উন্মাদনা পুরো উসমানিয়া সাম্রাজ্যে এবং সেইসাথে ইতালি, হল্যান্ড, জার্মানি, পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়ায় ইহুদি সমাজগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে শেষ পরিণতি হলো খুবই খারাপ। ১৬৬৬ সালে শাব্বেতাই ইস্তাম্বুলে পৌঁছে সুলতানকে বললেন ইহুদিদের রাজা ঘোষণা করে জেরুসালেম নগরীতে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে। সুলতান এর বদলে ইহুদি বিদ্রোহের শঙ্কা নিয়ে তাকে বিবেচনা করলেন। তাকে ইসলামে ধর্মান্তর কিংবা মৃত্যু-এর কোনো একটি বেছে নিতে বললেন। শাব্বেতাই ধর্মান্তরই গ্রহণ করলেন। তিনি দৃশ্যত

নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম হিসেবে ১০ বছর পর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বিস্ময়কর সংখ্যক অনুসারী রেখে গিয়েছিলেন। তবে বেশির ভাগ ইহুদি মুরতাদ মেসাইয়ার কেলেঙ্কারিতে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারা কেবল শাব্বেতাইয়ের প্রতিই নয়, সেইসাথে তার আবেদনের চালক শক্তি লুরিয়াবাদী আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারেও মোহমুক্ত হয়েছিল। অবশ্য লুরিয়াবাদী পুরাণতত্ত্ব ছিল অন্তরাত্মার সাথেই সম্পর্কিত। এর মানে এই নয় যে আক্ষরিক অর্থেই রাজনৈতিক দুনিয়ার বাইরে বাস করতে হবে। লুরিয়া ইহুদিদের শারীরিকভাবে জায়নে ফেরার জন্য কাজ করতে বলেননি। তিনি বরং তাদের জন্য আধ্যাত্মিক পথ বাতলে দিয়েছেন। এটি সত্তার উৎস থেকে সরে যাওয়া ও বাস্তুচ্যুতের কথা বলা হয়েছে। পুরানতত্ত্ব দুনিয়াবি বাস্তবতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে এর কোনো অর্থ হয় না।

ইউরোপের লোকজন ক্রমবর্ধমান হারে বুঝতে পারছিল যে ঐশী ভূগোলের পুরনো কিংবদন্তির আবেদন তাদের কাছে আর নেই। তারা যে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব শুরু করেছিল তা শেষ পর্যন্ত বিশ্বকে বদলে দিয়েছিল। নতুন বাস্তবতার বীজ বপণ করা হলো, যা অদেখার প্রতীক হিসেবে দেখার বদলে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়কেই প্রপঞ্চের বস্তুগত গুণগুলোকে পরীক্ষা করতে উৎসাহিত করল। তারা অবশ্যই এ ধরনের অপ্রমাণিত ও অসম্ভাব্য সম্পৃক্ততা নির্দয়ভাবে বর্জন করেছিল এবং তাদের বস্তুরাজি ও আক্ষরিকভাবে কী দিয়ে গঠিত সে দিকে মনোনিবেশন করেছিল। তাদের আবিষ্কারগুলো লোকজনকে বিশ্বের মানচিত্রের দিকে বৈজ্ঞানিকভাবে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে, জেরুসালেমকে পৃথিবীর কেন্দ্র বলাকে মূর্খতা মনে করতে থাকে। ইউরোপিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাওয়ায় তারা আগের কল্পকাহিনী, উপাখ্যান, রহস্যময়তার বদলে আরো যৌক্তিক ধর্মের দিকে তাকাতে শুরু করে এবং আরো যৌক্তিকভাবে তুলে ধরতে পারে, এমন বিশ্বাসের তথাকথিত বাস্তবতার দিকে মনোনিবেশন করে। কল্পনার ধর্মের জন্য তাদের হাতে কোনো সময় ছিল না। লোকজন যুক্তির কঠিন পাথরে সেগুলোকে যাচাই করা শুরু করায় ধীরে ধীরে বিশ্বাসের প্রতীক ও ছবিগুলো বিপুল তাৎপর্য বহন করা বন্ধ করে দেয়। এগুলো স্রেফ প্রতীকে পরিণত হয়, এগুলো যে অদেখা বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করছিল, তা থেকে একেবারেই আলাদা হয়ে যায। শাস্ত্রাচার নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়; উপাসনা পদ্ধতি আর তাতে থাকা আধ্যাত্মিক গতিশীলতা থেকে আলাদা থাকে না। প্রটেস্ট্যান্ট

সংস্কারকরা ইতোমধ্যেই ঐশী বাস্তবতা থেকে প্রতীককে সরিয়ে দিয়েছিল। ইউচারিস্টের রুটিকে খ্রিস্টের দেহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে স্রেফ প্রতীক হিসেবে দেখেছেন জ্বিনগলি। ক্যাথলিকদের ব্যাপক আনুষ্ঠানিক উপাসনা পদ্ধতি ছিল সত্য থেকে অর্থহীন বিহ্বলতা সৃষ্টিকারী। কোনো অনুকরণই বর্তমানে কালোত্তীর্ণ আধ্যাত্মিকতাকে বয়ে আনতে পারছিল না। যিশুর জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান ছিল এমনসব ঘটনা যা অতীতে ঘটেছিল, এগুলোর বাস্তবতার কোনো শ্বাশত মাত্রা নেই।

স্বাভাবিকভাবেই এটি পুরনো ঐশী ভূগোলকে অর্থহীন করে ফেলেছিল। ‘পবিত্র স্থানগুলো’ স্বর্গীয় দুনিয়ার সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারছিল না। ঈশ্বর স্রেফ একটি স্থানে সীমিত থাকতে পারছিলেন না। কারণ তিনি অসীম। ফলে নির্দিষ্ট কোনো স্থান কেবল ‘ঐশী’ হতে পারে যদি এর ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্য আলাদা করে রাখা হয়। পিউরিটিয়ান জন মিলটন তীর্থযাত্রার প্রতি তার তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছিলেন এভাবে :

...যা ঘুরে বেড়াতেই থাকে,

যে স্বর্গে বাস করে সে গলগোথায় মারা যায়। ১৯

তবে ক্যাথলিকরাও ইউরোপের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সাথে সমান সংশ্লিষ্ট ছিল। আর তারা ক্রমবর্ধমান হারে বুঝতে পেরেছিল যে তাদের কাছে প্রার্থনা স্থানের ভিন্ন একটি অর্থ রয়েছে।

ফেলিক্স ফ্যাবরি ইতোমধ্যেই নতুন ইউরোপের উদীয়মান সংশয়বাদ দৃষ্টিগোচরীভূত করেছিলেন। সপ্তদশ শতক নাগাদ ইউরোপিয়ানরা তীর্থযাত্রী হিসেবে নয়, বরং পর্যটক হিসেবে জেরুসালেমে আসতে শুরু করে। ১৬০১ সালে ব্রিটিশ পর্যটক জন স্যান্ডারসন হলি সেপালচার দেখে কান্না করেননি বা মুর্ছা যাননি। তিনি স্রেফ ধীরে সুস্থে চার্চটি ঘুরে দেখেছেন, সংশ্লিষ্টতাহীন কৌতূহলের সাথে ক্যাথলিক বা অর্থোডক্স উত্তাপ নিরক্ষণ করেছেন। আলেপ্পোতে ইংলিশ লেভেন্ট কোম্পানির চ্যাপলিন হেনরি মড্রেল ১৬৯৭ সালে ফিলিস্তিন সফর করেছিলেন। তিনি তার পূর্বপুরুষদের কাঁপিয়ে দেওয়া ‘ফালতু অতীত

স্মৃতির আবর্জনার' প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন। তিনি বাইবেলের স্থানগুলো হিসেবে থাকা গ্রিক ও রোমান প্রত্নসামগ্রীগুলোর প্রতি আগ্রহী ছিলেন। হলি ফায়ার অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে তিনি দর্শকদের আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের অনুভূতিতে আতঙ্কবোধ করেছিলেন। তার কাছে এসবকে পুরোপুরি 'পাগলা গারদের পাগলামি' বলে মনে হয়েছিল।২১

তিনি খ্রিস্টের সমাধিতে গ্রিক ও ল্যাতিনদের বিবাদে বিশেষভাবে বিতৃষ্ণ হয়েছিলেন। তারা প্রচণ্ডতম ক্রোধ ও উন্মাদনা প্রকাশ করত যা সংযত যুক্তির সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ১৬৮৮ সালে বেলগ্রেড যুদ্ধে উসমানিয়াদের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড ও ভেনিসের জয়ের পর হলি সেপালচারে সম্প্রতি আরেক দফা ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তন হয়েছিল। ফ্র্যান্সিসক্যানেরা আবার দায়িত্ব ফিরে পায়। মন্ড্রিল ব্যাখ্যা করেছেন যে তারা ও তাদের গ্রিক অর্থোডক্স প্রতিদ্বন্দ্বীরা

অনেক সময় হাতাহাতি, কাটাকাটিতে মেতে ওঠে, এমনকি সেচালচারের একেবারে প্রতিটি দরজাও তাদের করা উৎসর্গ বস্তুর রক্ত মাখামাখি হয়ে যায়। [ফ্রান্সিসক্যান] ফাদার গার্ডিয়ান ক্রোধের কারণ হিসেবে আমাদেরকে তার বাহুতে একটি বড় দাগ দেখালেন। তিনি জানান, এ ধরনের কোনো একটি অপবিত্র যুদ্ধের সময় বলশালী গ্রিক পাদ্রি এই আঘাত দিয়েছিলেন তাকে। ২২

এসব 'পবিত্র স্থান' মুক্ত করতে নতুন ক্রুসেডের স্বপ্ন দেখা ছিল ভিত্তিহীন। কারণ তাদের সৃষ্ট এ ধরনের অখ্রিস্টান ক্রোধ ও বৈরিতার ঘটনায় তাদরে বন্দিদশা দেখে উপলব্ধি করা যেতে পারে যে 'এগুলো মুক্ত করা হলে, এগুলো নিয়ে কী মাত্রায় দুঃখজনক প্রতিযোগিতা হবে।'২৩

অষ্টাদশ শতক নাগাদ উসমানিয়া সাম্রাজ্য দৃশ্যত অনিবার্য পতনের দিকে যেতে থাকে। সুলতানেরা ছিলেন দুর্বল, তারা ব্যক্তিগত বিলাসে নিয়োজিত ছিলেন। তারা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিক্রি করে প্রমোদের ব্যয় মেটাতে থাকেন। প্রদেশ ও সানজেকগুলোর গভর্নরেরা আর তাদের সক্ষমতার আলোকে নিয়োগ পেতেন না, তারা ক্ষমতায় যেতেন ঘুষ দিয়ে। সুলতানেরা যখন দেখলেন, তারা পাশাদের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন,

তখন তাদেরকে প্রায় বার্ষিক ভিত্তিকে পরিবর্তন করতেন। প্রদেশগুলোতে এর পরিণাম হয়েছিল মারাত্মক। পরের বছর যদি কারো বদলি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে সে কোনোভাবেই ভবন মেরামত বা স্থানীয় প্রশাসন সংস্কারকাজ করবে না। আর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পাশার সম্পত্তি অনেক সময়ই বাজেয়াপ্ত করা করা হতো বলে গভর্নরেরা প্রায়ই অন্যায়ভাবে করারোপ, শোষণ, ভূমি অবৈধভাবে বাজেয়াপ্তকরণসহ অন্য সব পন্থা ব্যবহার করে তারা যতটুকু সম্ভব তাদের জেলাগুলো থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন। ইস্তাম্বুল কার্যত অনৈতিক কর্মকর্তাদের কাছে সাম্রাজ্য ছেড়ে দিয়েছিল। লোভী পাশাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে কৃষকেরা তাদের গ্রাম ত্যাগ করতে লাগল। এতে করে বেদুইন হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ভূমি আরো ক্ষতির মুখে পড়ল। ১৬৬০ সালে ফরাসি পর্যটক এল. ডি অ্যারিয়াক্স উল্লেখ করেন যে বেথলেমেরে আশপাশের এলাকা প্রায় পুরোপুরি জনহীন হয়ে পড়েছে, জেরুসালেমের কৃষকেরা পাশাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পালাচ্ছে।

জেরুসালেমের লোকজন ১৭০৩ সালে নগরীর গভর্নর জারজি মুহাম্মদ পাশার নির্দয় করারোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মুহাম্মদ ইবনে মোস্তফা আল-হোসাইনি দুর্গে এক আক্রমণে তাদের নেতৃত্ব দেন। তারা সব বন্দিকে মুক্ত করে, পাশাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। আল-হোসাইনি প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নর হন। নগরীর নিয়ন্ত্রণ আবার গ্রহণ করতে উসমানিয়াদের দুই বছর লেগেছিল। পরিণঅমে ১৭০৫ সালের নভেম্বরে এখন দামাস্কাসের প্রাদেশিক গভর্নর (ওয়ালি) জারজি মুহাম্মদ দুই হাজার জাননেসারি নিয়ে জেরুসালেম আক্রমণ করেন। তুর্কিরা সহজে নগরী দখল করতে পারেনি : তাদেরকে কয়েক ঘণ্টা তীব্র ও মরিয়া লড়াই করতে হয়েছিল।

তুর্কি গভর্নরেরা ক্রমবর্ধমান হারে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ছিলেন। অনীহ লোকজনের কাছ থেকে তারা কর পর্যন্ত আদায় করতে পারতেন না। প্রতি বছর দামাস্কাসের ওয়ালিকে লোকজনকে কর দিতে বাধ্য করার জন্য সৈন্য নিয়ে আসতে হতো। কিন্তু তারপরও সবসময় তারা সফল হতেন না। অষ্টাদশ শতকে কার্যত উসমানিয়া নথিপত্রে নগরীর রাজস্ব সম্পর্কে কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। এর কারণ সম্ভবত করের পরিমাণ এতই কম ছিল যে তারা তা উল্লেখ করার দরকার মনে করতেন না।৪ বেদুইনদের ঘুষ না দিয়ে

পাশারা তাদের নিজস্ব সানজাকে অবাধে চলাচল করতে পারতেন না। এর ফলে ইস্তাম্বুলের কাছে গভর্নর হিসেবে স্থানীয় আরবদের নিয়োগ করা সুবিধাজনক মনে হতে থাকে। নাবলুসের তুরকান ও নিমর পরিবার জেরুসালেমের কয়েকজন গভর্নর সৃষ্টি করতে থাকে। উমর আর-নিমর (১৭১৭-৩১) ছিলেন বিশেষভাবে কার্যকর। ১৭৩৩ সালে তাকে দ্বিতীয় মেয়াদেও নিয়োগ করা হয়। তিনি জেরুসালেমের অভিজাতদের সাথে সহযোগিতা করেন, হজ রুটকে বেদুইন থেকে মুক্ত রাখেন, এমনকি যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে খ্রিস্টানদের বিবাদ থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হন। তবে বেশির ভাগ গভর্নরই ছিলেন অথর্ব। তারা এমনকি প্রাচীরের ভেতরেও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চরমভাবে ব্যর্থ হন। জেরুসালেমবাসী তাদের মর্জিমতো না হলে অনেক সময় গভর্নরকে নগরীতে প্রবেশ করতে দিত না।

গভর্নরদের দুর্বলতার সুযোগে জেরুসালেমের প্রধান প্রধান পরিবার ক্ষমতার শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে আসে। হোসাইনি, খালিদি, আবুল লুতফরা ক্রমবর্ধমান হারে নগর প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে থাকে। তারা ছিল স্থানীয় জনসাধারণ ও ক্ষমতাসীন অংশের একমাত্র যোগসূত্র। তারা ১৭০৩ সালের বিপ্লবের পর থেকে দামাস্কারস ও ইস্তাম্বুলের প্রভাবশালী লোকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে থাকে। পুরস্কার হিসেবে তাদেরকে বিশাল বিশাল ভূসম্পত্তি ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। অষ্টাদশ শতকে আবুল লুতফ পরিবার অব্যাহতভাবে মুফতি সরবরাহ করতে থাকে, হোসাইনিরা শরিয়াহ আদালতে সভাপতিত্ব করে। কয়েক প্রজন্ম ধরে খালিদিরা ডেপুটি জাজ ও শরিয়াহ আদালতের প্রধান কেরানির দায়িত্ব পালন করে। ইসলামি আইনশাস্ত্রের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মুসা আল খালিদি (১৭৬৭- ১৮৩২) ছিলেন ইস্তাম্বুলে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন। তিনি আনাতোলিয়ার প্রধান কাজি হয়েছিলেন। এটি ছিল সাম্রাজের তিনটি সর্বোচ্চ বিচারিক পদের অন্যতম।

জেরুসালেম তখনো সিরিয়া ও মিসরের সুফি ও আলেমদের আকৃষ্ট করত। সত্যিকার অর্থেই সপ্তদশ শতকের চেয়ে এই সময় নগরীটিতে অনেক বেশি আলেম ছিলেন। অনেক আলেম নগরীতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন। তবে মাদরাসাগুলো দ্রুত

ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছিল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝিতে মাত্র ৩৫টি মাদরাসা টিকে থাকে। পরে তাদের কোনোটিই টিকে থাকেনি। অর্থনৈতিক দুর্দশা গভীর হওয়ায়, নগরী ও লোকজন গরিব হতে থাকায় ওয়াকফ সম্পত্তিও বিলুপ্ত হতে থাকে। অনেক সম্পত্তি ভেঙে যায়, হাতছাড়া হয়ে যায়। মুসলিমরা ওয়াকফ সম্পত্তি লিজ নিয়ে, এমনকি সেগুলো অমুসলিমদের কাছে বিক্রি করে হলেও ক্ষতি পূরণ করার চেষ্টা করেছিল।

জিম্মিরাও মুসলিমদের মতো খুবই খারাপ অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপ থেকে আসা আশকেনাজিক ইহুদিরা সংখ্যায় এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে তারা পাশাকে ঘুষ দিয়ে একটি সিনাগগ, একটি ইয়েশিভা ও জেরুসালেমের দক্ষিণে গরিবদের জন্য ৪০টি আবাসিক ভবন নির্মাণের অনুমতি সংগ্রহ করে নেয়। কিন্তু এর পরপরই তারা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে, মাত্রাতিরিক্ত সুদ দিতে বাধ্য হয়। আশকেনাজিক ইহুদিরা জেরুসালেমে নানা জটিলতায় পড়ছিল। কারণ তারা আরবি ভাষা জানত না, এই ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হতে শেখেনি। ফলে তারা বাড়ি থেকেই বের হতে ভয় পেত, কারণ তারা আশঙ্কায় থাকত, বাড়ি থেকে বের হলেই ঋণদাতারা তাদেরকে ধরে কারাগারে নিক্ষেপ করবে। ১৭২০ সালে তারা বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তুর্কিরা তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। তারা শেষ পর্যন্ত নগরী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। দুই শ পরিবার হেবরন, স্যাফেদ ও দামাস্কাসের উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়। এসব নগরীতে তাদের অবস্থা কিছুটা ভালো ছিল। ২৫ জেরুসালেমে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে আশকেনবাদীদের আরেকটি শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছিল। জেরুসালেমের ইহুদি তাইফা এখন পুরোপুরি সেফারদিক। তারা শারাফ এলাকায় থাকত। শতাব্দীর যন্ত্রণা ও উসমানিয়া সঙ্কট গভীরতর হতে থাকায় এলাকাটির অবস্থা অবনতি ঘটতে থাকে। সেফারবাদীরা চারটি পরস্পরযুক্ত সিনাগগে প্রার্থনা করত। এগুলো রাব্বি ইয়োহানান বেন জাক্কাইয়ের ইয়েশিভা এলাকায় তৈরি হয়েছিল : বেন জাক্কাই সিনাগগের পাশে আরো তিনটি ছোট সিনাগগ ছিল। এগুলো হচ্ছে প্রফেট ইলিজা, কেহাল জায়ন ও ইস্তাম্বুলি। অষ্টাদশ শতক নাগাদ এগুলোর অবস্থা নাজুক হয়ে পড়েছিল। পুরো ইহুদি মহল্লা ছিল অবহেলিত বাড়িঘরে ভরা। এর রাস্তাগুলো পচা জঞ্জালে পরিপূর্ণ। সিনাগগগুলো ছিল পড়ো পড়ো। ভবনগুলো ভেঙ্গে পড়ছিল, বৃষ্টির সময় ছাদ দিয়ে পানি পড়ত, সিনাগগগুলো বন্যায়

ভেসে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতো। জমায়েতের লোকজনকে কান্নায় স্থান ত্যাগ করাটা বিরল ছিল না।

ল্যাতিন খ্রিস্টানেরা ছিল অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায়। কারণ বিদেশের ধনী সম্প্রদায়গুলো তাদের সতায়তা করত। ১৭২০ সালে, যে বছর আশকেনাজিরা তাদের সম্পত্তি খুইয়েছিল, ফ্রান্সিসক্যানেরা হলি সেপালচার চার্চের মোজাইকগুলো আবার সাজাতে সক্ষম হয়, সেখানে তাদের ভূগর্ভস্থ কনভেন্ট সম্প্রসারণ করে। তবে গ্রিকদের বিপরীতে কপ্ট ও আর্মেনিয়ানরা, চার্চে তাদেরও অ্যাপার্টমেন্ট ছিল, কার্যত বন্দি হয়ে পড়েছিল। তুর্কি কর্তৃপক্ষ চাবি হাতে রাখত, দখল অধিকার হারানোর ভয়ে খ্রিস্টানেরা ভবনটি ত্যাগ করতে সাহস করত না। সামনের দরজায় থাকা বড় একটি ছিদ্র দিয়ে তাদেরকে খাবার সরবরাহ করা হতো। প্রতিটি গ্রুপ চার্চের বিভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণ করত। ১৭২০ সালেও ফ্রান্সিসক্যানেরা সবচেয়ে পছন্দের স্থানটি দখলে রেখেছিল। ফ্রান্স ১৭৩২ সালে সুলতানের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়, তাদেরকে স্থায়ীভাবে নতুন ক্যাপিচুলেশন প্রদান করা হয়। ফরাসিরা এখন উসমানিয়া সাম্রাজ্যে রোমান ক্যাথলিকদের সরকারি ‘রক্ষাকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি পেল, হলি সেপালচারে ফ্রান্সিসক্যানদের অভিভাবত্ব আবার নিশ্চিত করা হলো। ১৭৫৭ সালে ফ্রান্সিসক্যানদেরকে কিদরন ভ্যালিতে ভার্জিন টম্বও দেওয়া হলো।

গ্রিক অর্থোডক্স আরো বেশি ক্রোধে এসব ঘটনার ওপর নজর রাখছিল। অবশেষে এসব কিছু তাদের সহ্যের সীমার বাইরে চলে গেল। ১৭৫৭ সালে পাম সানডের আগে এক দিন তারা বলপূর্বক রোতান্দায় প্রবেশ করে ল্যাতিন আসবাবপত্র ও বাতি ভাংচুর করে। রক্তপাত ঘটে, বেশ কয়েকজন মারাত্মক আহত হয়। ফ্রান্সিসক্যানেরা সেন্ট স্যাভিয়র্সে আশ্রয় নিলে অর্থোডক্স চার্চের গ্রিক ও আরব সদস্যরা সেটিও অবরোধ করে। প্যাট্রিয়ার্ক দ্রুত ইস্তাম্বুলে রাজদরবারে ছুটে যান। এদিকে ফরাসিরা ইউরোপে সেভেন ইয়ার্স যুদ্ধে অত্যাধিক ব্যস্ত থাকায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুরস্ককে সহায়তা করতে পারছিল না। এতে গ্রিকদের অনুকূলে ফরমান ইস্যু করার ব্যাপারে নিজেকে বাধ্যবাধকতামুক্ত বলে মনে করলেন সুলতান। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ নথিটি বর্তমান সময়েও বলবৎ রয়েছে। গ্রিকরা এখনো হলি সেপালচারের প্রধান অভিভাবক। ১৭৭৪ সালে উসমানিয়া সাম্রাজ্যে অর্থোডক্স

খ্রিস্টানদের আনুষ্ঠানিক অভিভাবক হিসেবে রাশিয়ার নাম ঘোষিত হওয়ার পর তাদের হাত আরো শক্তিশালী হয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষ নাগাদ জেরুসালেম নিঃস্ব নগরী হয়ে পড়েছিল। ফরাসি পর্যটক কনস্টানটিন ভলনি ১৭৮৪ সালে ফিলিস্তিন সফরে গিয়ে যা দেখেছেন, তা নিজের চোখেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। নাবলুসে ত্যাগের দু'দিন পর তিনি এমন এক শহরে পৌঁছেন, যেখানে দেখা গেল মানবীয় দুরাবস্থার অবাক করা উদাহরণ : আমরা এর দেয়ালগুলো ধরলে সেগুলো পড়ে গেল, এর খাদগুলো ভরে গেছে, এর ভবনগুলো লজ্জাজনকভাবে ধসে পড়েছে, আমরা কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে আমরা একটি বিখ্যাত নগরীতে আছি, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যগুলোতে সে রুখে দিয়েছে, জেরুসালেমকে চিনতে আমাদের কষ্ট হচ্ছিল। ২৬

ভলনে ছিলেন ইউরোপের নতুন লোকজনদের একজন। তিনি তীর্থযাত্রায় আসেননি, এসেছিলেন জেরুসালেমে প্রথম বৈজ্ঞানিক জরিপ পরিচালনা করার জন্য, প্রস্তুত করা একটি প্রশ্নপত্র পূরণ করার জন্য। তার উদ্দেশ্য ছিল নগরীর ভূগোল, জলবায়ু, সমাজ জীবন, অর্থনীতি নিয়ে সমীক্ষা চালানো। এর পবিত্রতার প্রতি তার ওইটুকুই আগ্রহ ছিল, যতটুকু ছিল অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত। ভলনে উল্লেখ করেন, খ্রিস্টানদের মূর্খতা থেকে তুর্কিরা বিপুলভাবে মুনাফা লুটে নিচ্ছে। গ্রিক, কপ্ট, আবিসিনিয়ান, আর্মেনিয়ান ও ফ্রাঙ্করা নিজেদের জন্য কিছু সুবিধা আদায় কিংবা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে তা কেড়ে নিতে' ঘুষ হিসেবে গভর্নরের হাতে নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হতো।

প্রতিটি গ্রুপ অনিয়মের ব্যাপারে একে অন্যের বিরুদ্ধে স্থায়ীভাবে অভিযোগ করে যেত। কেউ কি গোপনে চার্চ মেরামতের কাজ করেছে; কিংবা স্বাভাবিক সীমার বাইরে কোনো দখলা করা হয়েছে কিনা; কোনো তীর্থযাত্রী প্রথা লঙ্ঘন করে কি ভিন্ন দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে? এসব ছিল গভর্নরের কাছে অভিযোগে বিষয়। আর গভর্নর জরিমানা ও উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার সুযোগ কখনো হাতছাড়া করতেন না।২৭

.

দখল অধিকারের জন্য নিরর্থক সংগ্রাম এখন জেরুসালেমের খ্রিস্টানেরা ব্যস্ত থাকায় পবিত্র নগরীতে তাদের অবস্থান ও মর্যাদা সত্যিকার অর্থেই ক্ষয়ে যাচ্ছিল।

ভলনে উল্লেখ করেছেন, ইউরোপ থেকে খুব কম তীর্থযাত্রীই আসে জেরুসালেমে। এ তথ্যটি নগরীর অন্যান্য সম্প্রদায়কে কেলেঙ্কারিতে ফেলে দিয়েছিল। অনেক পর্যটক জেরুসালেমের ভয়াবহ বর্ণনা শুনে সেখানে যেতে ভয় পেয়ে থাকবেন। সত্যিই কঠিন সময়ে পড়েছিল নগরীটি। তবে তিনি যেভাবে বলেছেন, ছবিটি তত বিবর্ণ ছিল না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রাচীরগুলো তার দাবি অনুযায়ী মাটিতে মিশে যায়নি। অবশ্য এর চারপাশের অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা ঠিকই ছিল। নগরীর ভেতর ও আশপাশে এলোমেলোভাবে জঞ্জাল ছড়িয়ে ছিল। পাথর, মাটি, ছাই, মৃৎপাত্রের টুকরা, পচা কাঠ নগরীর নিচে গভীর উপত্যকাগুলো পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অনেক সময় এগুলো ৪০ ফুট স্তূপ হয়ে ছিল। বস্তুত, নগরীর বেশির ভাগ অংশই নির্মিত হয়েছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জমে থাকা জঞ্জালের উপর। প্রাচীরবদ্ধ নগরীর উত্তরে সাবান কারখানাগুলোর কৃত্রিম আবর্জনা জমে ছিল। ২৮ জেরুসালেম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য পরিচিত ছিল। কোনো পয়োঃনিষ্কাষণব্যবস্থা ছিল না, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল বাজে, দারিদ্রতার ছাপ ছিল প্রকট। তবে এটিই একমাত্র কাহিনী ছিল না। ৯টি সাবান কারখানা পুরো দমে উৎপাদনে ছিল; সিরামিকও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে পরিণত হয়েছিল, বাজারগুলোতে মজুতও ছিল বিপুল। ইভলিয়ে চেলেবি নগরী ও আশপাশের এলাকায় আঙুর বাগান ও উদ্যান দেখে হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। এগুলো তখনো ছিল জেরুসালেমের বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে নগরীর জনবিরল উত্তর-পূর্বের বেজেথা এলাকায়। শেখ মুহাম্মদ আল-খালিলির ওয়াকফিয়া দেখাচ্ছে যে প্রাচীরগুলোর ভেতরে ও বাইরে অনেক ডুমুর, জলপাই, আপেল, ডালিম, মালবেরি, এপ্রিকট ও কাঠবাদামের উদ্যান ও খামার ছিল। শহরের আকার হ্রাস পাচ্ছিল। তবে জেরুসালেমের প্রধান পরিবারগুলোর সুন্দর ভিলা ও ম্যানসনও ছিল। শেখ নিজে নগর-প্রাচীরের বাইরে দুটি বিশাল বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি বাড়িগুলো যথাযথভাবে মেরামত করা ও অমুসলিমদের হাতে না পড়ার ব্যাপারে জোর দিতেন। এসব বাড়ির দিকে অমুসলিমরা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত।২৯ অপেক্ষাকৃত সচেতন অধিবাসীরা নতুন ফরাসি ও রুশ 'অভিভাবকত্ব' নিয়ে অস্বস্তিতে ছিল। বিশেষ করে ফ্রান্স আবারো

জেরুসালেমে কনসাল প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে তারা সুনজরে দেখেনি। স্থানীয় মুসলিমরা চেয়েছিল, তাকে সরিয়ে দিতে। তবে কনস্টানটিন ভলনি ও তার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা আরো প্রবল পাশ্চাত্য উপস্থিতির পূর্বাভাস দিচ্ছিল। নেপোলিয়ন ১৭৯৮ সালে বেশ কয়েকজন প্রাচ্যবিদ নিয়ে মিসর যাত্রা করেন। তারা উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তুতি হিসেবে অঞ্চলটি নিয়ে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালানোর দায়িত্ব পেয়েছিল। নেপোলিয়নের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ দখলদারিত্ব চ্যালেঞ্জ করতে প্রাচ্যে ফরাসি উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করা। তিনি তার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ আরো এগিয়ে নিতে নতুন 'প্রাচ্য' বিজ্ঞান ব্যবহারের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ১৭৯৯ সালের জানুয়ারিতে নেপোলিয়ন ১৩ হাজার সৈন্য পাঠান ফিলিস্তিনে। তারা আর আরিশ ও গাজায় উসমানিয়া সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। তারপর তারা ফিলিস্তিনের প্রধান নগরী অ্যাকর উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়। তিনি তার সেনাবাহিনীর সাথে মানচিত্র প্রস্তুতকারী ও অনুসন্ধানী নিয়ে এসেছিলেন। সৈন্যরা যখন উপকূলীয় সড়কগুলোতে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন তারা পাহাড়ি এলাকায় তথ্যানুসন্ধান মিশনে নেমে পড়ে। রামলেতে নেপোলিয়ন ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমদেরকে উসমানিয়া জোয়াল ঝেড়ে ফেলে বিপ্লবী ফরাসি মুক্তির বাণী গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু স্থানীয় লোকজন এই স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিতে অভিভূত হয়নি। তাদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি এক পাশ্চাত্য শক্তির কাছে অধীনতা কবুল করা বলে মনে হয়েছে। জেরুসালেমে আতঙ্ক আর ক্রোধ ছিল। মুসলিমরা সেন্ট স্যাভিয়র্সে হামলা করে, ফরাসিদের অনুসারী ফ্রান্সিক্যানদের কয়েকজনকে পণবন্দি হিসেবে সাথে নিয়ে যায়। তবে সুলতান জোর দিয়ে বলেন, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত জিজিয়া দেবে, ততক্ষণ তাদের চার্চ আর সম্পত্তি রক্ষা করতে হবে। জেরুসালেম-বংশোদ্ভূত আনাতোলিয়ার কাজি শেখ মুসা আল-খালিদি ফরাসিদের বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষার জন্য ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। আর জেরুসালেমের সব সক্ষম আরব দামাস্কাসের ওয়ালির নেতৃত্বে যুদ্ধ করার জন্য উসমানিয়া সেনাবাহিনীতে নাম লেখায়। নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী প্লেগের শিকার হয়। তবে তিনি অ্যাকর ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। তবে সেখান থেকে কেবল ব্রিটিশ নৌবহরের মাধ্যমেই বিতাড়িত হননি, সেইসাথে সিডনের ওয়ালি আহমদ জেজার পাশার সেনাবাহিনীও এতে অংশ নিয়েছিল। এই বাহিনী দৃষ্টান্তমূলক সাহসিকতা ও কার্যকারিতা প্রদর্শন করেছিল। একটি প্রাচ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নেপোলিয়নের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। তিনি ইউরোপে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

তবে তার অভিযান ফিলিস্তিনে পাশ্চাত্য আধুনিকতা ও বিজ্ঞানের প্রবর্তন ঘটায়। এখান থেকেই বিজয় ও সাম্রাজ্যবাদের ইউরোপিয়ান স্বপ্নের সূচনা হয়। অন্য উপনিবেশবাদীরা অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের অনুসরণ করেছিল, জেরুসালেমকে টেনে আধুনিক যুগে নিয়ে গিয়েছিল।

পুনঃজীবন

জেরুসালেমে ঊনিশ শতক শুরু হয়েছিল বাজেভাবে। নগরীতে ছিল দারিদ্র্যতা আর উত্তেজনা। উসমানিয়া ব্যবস্থা তখনো বিশৃঙ্খলায়, অপঃশাসনে লোকজন দুর্ভোগ পোহাচ্ছিল। সাধারণভাবে দামাস্কাস প্রদেশের অংশ নগরীটি নতুন শতকের শুরুতে প্রকৃতপক্ষে সিডনের ওয়ালির মাধ্যমে শাসিত হতো। আরব গভর্নরের সংখ্যা বাড়ছিল। তাদের একজন ছিলেন মুহাম্মদ আবু মুরাক। মুসলিম ও জিম্মি উভয়েই তার উৎপীড়নে জর্জরিত ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ ছিল। ১৮০০ সালে জেরুসালেমে ছিল ৮,৭৫০ জন অধিবাসী। এদের মধ্যে ৪,০০ ছিলেন মুসলিম, ২,৭৫০ জন খ্রিস্টান ও ২,০০০ ছিলেন ইহুদি। তাদের সবার জন্য ছিল অভিন্ন বাজার (সুক), তাদের প্রধান উপাসনালয়গুলোর চারপাশে গুচ্ছাকারে বাস করত। কিছু আন্তঃসম্প্রদায়গত সম্পর্ক ছিল বন্ধুপ্রতীম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মাগরিবি মহল্লার মুসলিমদের সাথে ইহুদিদের সুসম্পর্ক ছিল। ওয়েস্টার্ন ওয়ালে যেতে ইহুদিরা তাদের মহল্লার ভেতর দিয়েই যেত। তবে হলি সেপালচারে প্রবেশ করা ইহুদিদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। খ্রিস্টানদের সাথে ইহুদিদের সম্পর্ক এতই খারাপ ছিল যে তারা তাদের আশপাশের এলাকা থেকেও দূরে থাকত। খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলো একসাথে বাস করলেও তাদের মধ্যে বৈরিতা এতই বিষাক্ত ছিল যে তা সামান্যতম উস্কানিতেই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারত। ইহুদি মহল্লায় সেফারদিম ও অ্যাশকেনাজিমের, তারা ১৮১০ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে জেরুসালেমে ফিরে এসেছিল, মধ্যে উত্তেজনা ছিল। নগরীর শান্তি হতাশা ও ক্ষোভে ফুটছিল, একীভূত হওয়ার পুরনো আদর্শ হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন মনে হচ্ছিল। এই ক্রোধ প্রায়ই দাঙ্গা আর গণ-আন্দোলনে ফুঁসে ওঠত।

হলি সেপালচারে ১৮০৮ সালে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আর্মেনিয়ান সন্ন্যাসীর অধীনে থাকা সেন্ট হেলেনার ক্রিপ্টে তা শুরু হয়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পুরো চার্চ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, ডোমের সহায়ক স্তম্ভগুলো ধসে পড়ে। বিপর্যয়ের জন্য সম্প্রদায়গুলো একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকায় অভিযোগের পর অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে। চার্চের স্থিতিবস্থা পরিবর্তনের জন্য আর্মেনিয়ানরা পরিকল্পিতভাবে আগুন লাগিয়েছে বলে

অভিযোগ ওঠতে থাকে; অন্যরা বলতে থাকে যে গ্রিক অর্থোডক্স পাদ্রিরা মদ্যপ অবস্থায় কাঠে আগুন ধরাতে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটিয়ে ফেলেছেন, পরে তা নেভাতে গিয়ে ব্র্যান্ডি ব্যবহার করায় সেটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায। পুনঃনির্মাণ যেহেতু বৈধ মালিকানার সাথে জড়িত ছিল, তাই পুনঃনির্মাণের দায়িত্ব পেতে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। প্রতিটি স্থানের অধিকারীই অন্যদের দাবি নাকচ করছিল, সমর্থনের জন্য বিদেশী 'রক্ষকদের' কাছে আবেদন জানাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত গ্রিকরাই এ সুবিধাটি পেয়ে যায়, মেরামতের কাজ শুরু হয় ১৮১৯ সালে। তবে নির্মাণকাজ কখনো জেরুসালেমের নিরপেক্ষ কার্যক্রম ছিল না। হলি সেপালচার চার্চ নিয়ে মুসলিমরা অনেক আগে থেকেই অস্বস্তিতে ছিল, বিশেষ করে অর্থনৈতিক দুরাবস্থার সময়। মুসলিমরা এখন কাজ বন্ধ করার দাবিতে গভর্নরের বাসভবন ঘেরাও করল। তাদের সাথে যোগ দিলো স্থানীয় জাননেসারিরা। নগরদুর্গে অন্য সৈন্যদের রাখায় তারা ক্রুদ্ধ হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই নগরীর সর্বত্র পূর্ণ মাত্রায় যুদ্ধ শুরু হলো। বিদ্রোহীরা গ্রিক অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ারচাট আক্রমণ করল, দুর্গ দখল করে নিলো। গভর্নরকে নগরী থেকে বহিষ্কার করা হলো। দামাস্কাসের ওয়ালি দুর্গ অবরোধ করার জন্য সৈন্য পাঠানোর আগে পর্যন্ত আন্দোলন থামেনি। ৪৬ জন নেতাকে শিরোশ্ছেদ করে তাদের মাথা দামাস্কাস পাঠানো হয়।

হলি সেপালচারের পুনঃনির্মাণ অব্যাহত থাকে। তবে পুনঃনির্মাণ নিজেই একটি যুদ্ধে পরিণত হয়। গ্রিকরা সুযোগটি লুফে নিয়ে ভবন থেকে ল্যাতিন দখলদারিত্বের সব চিহ্ন মুছে ফেলে। তারা অষ্টাদশ শতকে সমাধির ওপর ফ্রান্সিসক্যানদের নির্মিত ইডিকিউল (সৌধ) পুনঃস্থাপন করে, বোলনের গডফ্রে ও রাজা প্রথম ব্যান্ডউইনের কবর উপড়ে ফেলে। এরপর থেকে এক গ্রিক সন্ন্যাসী সেপালচারের ওপর স্থায়ী পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকে। তারা এখন কবর ও গলগোথা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকল; ফ্রান্সিক্যানেরা ভবনের উত্তর দিকে সীমিত হয়ে পড়ল, আর্মেনিয়ানরা সেন্ট হেলেনার ক্রিপ্টে, কপ্টরা কবরের পশ্চিমে ছোট চ্যাপেলে, সিরিয়ানরা রোতানদার ওপর থাকা চ্যাপেলে অবস্থান নেয়। ইথিওপিয়ানরা ছাদের ওপর তাদের মঠ ও চার্চ নির্মাণ করতে বাধ্য হয়। খ্রিস্টানরা তাদের পবিত্রতম উপাসনালয়ে সম্প্রীতিপূর্ণভাবে একসাথে বাস করতে অক্ষম হয় : একটি মুসলিম পরিবারকে চার্চের চাবির মালিকানা দেওয়া হয়। তারা বর্তমানে চার্চ খোলা ও বন্ধ করার

কাজটি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় পরিচালনা করে। এই দুরূহ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কারণ কোনো সম্প্রদায়ই অন্যদের ওপর দায়িত্বটি ন্যস্ত করতে চায় না। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী সমাধির ধর্মীয় কার্যক্রম চালানোর জন্য পালাক্রমে চাবি গ্রহণ করে, তবে এতে প্রায়ই মারামারি লেগে যায়, অভব্যতা দেখা যায়। এক শোকাহত ব্রিটিশ পর্যটক এই দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছিলেন :

ধরুন কপ্টরা উপাসনালয়ের সামনে দাঁড়াল : তারা তাদের ৬০ মিনিটের উপাসনা শেষ করার অনেক আগেই আর্মেনিয়ানরা কয়ারের সামনে বিপুলসংখ্যায় সমবেত হতে থাকে। না, তাদের সাথে প্রার্থনায় যোগ দিতে বা হাঁটু গেড়ে ভক্তি জানানোর জন্য নয়, বরং কপ্টিক ধর্মগুরুদের বিদ্রুপ করতে, সকালের প্রার্থনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য।

প্রার্থনাকারীরা প্রায়ই হাতাহাতিতে মেতে ওঠে। তখন 'মোমবাতি, কুঁজো হওয়া ও ক্রুশবিদ্ধকরণ নিয়ে চলা লড়াই থামানোর জন্য স্থায়ীভাবে চার্চের বাইরে মোতায়েন তুর্কি প্রহরীরা প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসে। রক্তপাত না ঘটলে উপাসনা অব্যাহত থাকে। অবশ্য তখনো প্রহরীরা বন্দুক প্রস্তুত করে দাঁড়িয়ে থাকে। বিশ্বাসের প্রতীক যদি হয় বদান্যতা ও ভালোবাসা-দয়ার্তা, তবে খ্রিস্টান ধর্ম জেরুসালেমে সুস্পষ্টভাবেই ব্যর্থ হয়েছে।

খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে আবারো মুসলিম শক্তি প্রদর্শন হয়েছিল ১৮২১ সালে। এবার পেলোপোনেসের গ্রিকরা উসমানিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আবারো গ্রিক অর্থোডক্স প্যাট্রিয়াচাট আক্রান্ত হন। অবশ্য ইস্তাম্বুলের কড়া নির্দেশে কাজি ও জেরুসালেমের অভিজাত পরিবারগুলো সহিংসতা থামাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল। ১৮২৪ সালে আবারো মারাত্মক গোলযোগের সৃষ্টি হয়। দামাস্কাসের নতুন ওয়ালি মোস্তফা পাশা আগের হারের চেয়ে কর ১০ গুণ বাড়িয়ে দেন। জেরুসালেমের আশপাশের গ্রামগুলোর কৃষকেরা সাথে সাথে বিদ্রোহ করে, পাশা পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহ শান্ত করার জন্য রওনা হন। এবার জেরুসালেমের অভিজাতেরা উসমানিয়া এস্টাবলিশমেন্টকে সমর্থন করেনি, তারা বরং একসাথে কৃষক ও নগরবাসীর সাথে জোট বাঁধেন। পাশা দামাস্কাস ফিরে যাওয়ার মাত্র, তিনি মনে করেছিলেন বিদ্রোহ শান্ত হয়ে গেছে, জেরুসালেমের

লোকজন দুর্গ আক্রমণ করে উসমানিয়া সেনাবাহিনী বিতাড়িত করে অস্ত্র কেড়ে নেয়, নগরী থেকে সব অনারব নাগরিককে তাড়িয়ে দেয়। সম্ভবত এটি ছিল জেরুসালেমে আরব সংহতির প্রাথমিক প্রকাশ। এমনকি সিডনের গভর্নর আবদুল্লাহ পাশা দুই হাজার সৈন্য ও সাতটি কামান নিয়ে এলেও আরবরা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এক সপ্তাহ ধরে লড়াই চলে, মাউন্ট অলিভেস থেকে নগরীতে অব্যাহতভাবে গোলাবর্ষণ করা হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তুর্কিরা বিদ্রোহীদের দাবি মেনে নেয় : কর হ্রাস করা হয়, নগরীর দৈনন্দিন জীবনে সেনাবাহিনী আর কোনো হস্তক্ষেপ না করতে সম্মত হয়, জেরুসালেমের ভবিষ্যত সব কর্মকর্তা আরব হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়।

তবে ১৮৩১ সালে তুর্কি শাসনে জেরুসালেম আরো জোরদার হয়। আলবেনিয়ান তুর্কি ও উসমানিয়া কমান্ডার মুহাম্মদ আলী মিসরে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ফরাসিদের বিদায় নেওয়ার পর তিনি কার্যত ইস্তাম্বুল থেকে স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হন। তার উচ্চাভিলাষ ছিল পাশ্চাত্যের আদলে মিসরকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করা, যেখানে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে থাকবে সমান। সেনাবাহিনী আধুনিকায়ন করা হয়, ১৮৩১ সাল নাগাদ ফিলিস্তিন ও সিরিয়া আক্রমণ করার মতো শক্তি অর্জন করেন। তিনি উসমানিয়াদের কাছ থেকে এসব প্রদেশ কেড়ে নেয়। জেরুসালেমের ইতিহাসে এটি ছিল টার্নিং পয়েন্ট। মুহাম্মদ আলী ১৮৪০ সাল পর্যন্ত সিরিয়া ও ফিলিস্তিন নিয়ন্ত্রণ করেন। ওই ৯ বছরে তিনি আধুনিকরণ ধারণাগুলো প্রয়োগ করে জেরুসালেমের জীবনযাত্রা স্থায়ীভাবে বদলে দেন। তার ছেলে ইব্রাহিম পাশা বেদুইনদের দমন করতে সক্ষম হন, তাদেরকে মিসরীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার দেন। তিনি একটি সেক্যুলার বিচারিকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি কার্যকরভাবে শরিয়াহ আদালতের ক্ষমতা খর্ব করে। এর ফলে জিম্মিরা জীবন ও সম্পত্তির ওপর পূর্ণ সাম্য ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ভোগ করতে থাকে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরও জেরুসালেমের মজলিশে (নগরীর গভর্নরকে পরামর্শ দানের জন্য গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ) প্রতিনিধি করা হয়। জেরুসালেমে সেক্যুলারবাদের আগমন ঘটে, রাষ্ট্র ও বিচারিকব্যবস্থা ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে থাকে।

স্বাভাবিকভাবেই এসব সংস্কারের বিরোধিতাও ছিল। জেরুসালেমের প্রধান পরিবারগুলো ও স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিরা অনেক বছর ধরে যে সুবিধা ও মর্যাদা ভোগ করে আসছিল, তা খোয়ানোর শঙ্কায় পড়ে। ১৮৩৪ সালে পুরো ফিলিস্তিন ও ট্রান্সজর্দানে বিদ্রোহ ঘটে। পাঁচ দিন ধরে বিদ্রোহীরা নগরীর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে, তারা রাস্তায় রাস্তায় ছুটে চলে, জিম্মিদের দোকানপাট লুট করে। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইব্রাহিম পাশাকে তার পুরো সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে। অবশেষে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, মিসরীয় সরকার সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখে। নগরীতে আধুনিক শিল্পব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের জন্য ইব্রাহিম পাশা জেরুসালেমে প্রথম দুটি উইন্ডমিল নির্মাণ করেন। জিম্মিরা তাদের নতুন স্বাধীনতা উপভোগ করতে থাকে। তারা এখন ঘুষ আর অসাধু উপায় অবলম্বন ছাড়াই তাদের উপাসনালয়ের সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

তারা সাথে সাথে এই সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করে। ১৮৩৪ সালে ভূমিকম্পের কারণে অনেক খ্রিস্টান মঠ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সন্ন্যাসীরা এখন সাথে সাথে সেগুলো সংস্কার করতে সক্ষম হলো। ফ্রান্সিসক্যানেরাও সেন্ট স্যাভিয়ার্সের মেরামত কাজ সেরে নেয়। সাম্প্রতিক বিদ্রোহে সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় এটি বিশাল কমপ্লেক্সে পরিণত হয়েছিল। ফ্রান্সিসক্যানেরা এখন প্রতি সপ্তাহে আট শ' খ্রিস্টান ও মুসলিমকে রুটি দিচ্ছিল, তারাই প্রথম আরব খ্রিস্টানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ক্যাথলিক দীক্ষা গ্রহণকারী পরিবারগুলোর ৫২টি ছেলেকে আরবি, ইতালিয়ান ও ল্যাতিন পড়তে ও লিখতে শেখানো হয়। অবশ্য গণিত বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শেখানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আরব মেয়েদের জন্য একটি সেলাই শিক্ষার স্কুলও ছিল। ১৮৩৯ সালে ফ্রান্সিসক্যানেরা নগরীতে তাদের অবস্থান সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়। তখনো নগরীর বিশাল অংশ ছিল জনবসতিহীন ফ্যাগেলেশনে তাদের চার্চটি ছিল ভায়া ডোলোরোসার পাশে নির্মিত প্রথম খ্রিস্টান ভবন। উনিশ শতকে এটি ধীরে ধীরে নতুন খ্রিস্টান মহল্লায় পরিণত হয়।

ইহুদিরাও নির্মাণের সুযোগটি গ্রহণ করে। ১৮৩৪ সালে মুহাম্মদ আলী একটি ফরমান ইস্যু করে বিধ্বস্ত বেন জাক্কাই সিনাগগ নতুন করে নির্মাণের জন্য সেফারদিমদের অনুমতি দেন। পোল্যান্ড থেকে নতুন অভিবাসীর আগমন ঘটায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে

অ্যাশকেনাজিক সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তাদেরও উপাসনার জন্য নতুন স্থান নির্মাণ করার প্রয়োজন পড়ে। ১৮৩৬ সালে অ্যাশকেনাজিম নতুন সিনাগগ ইয়েশিভা ও মিকভে নির্মাণ করার সুযোগ পায়। তারা ১৭২০ সালে স্থানটি খালি করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। পুরো সম্প্রদায় নতুন ভবন নির্মাণকাজে নেমে পড়ে। রাব্বি, ছাত্র, এমনকি বুড়ো লোকজন পর্যন্ত ভিত্তি খনন করে, আবর্জনা পরিষ্কার করে। নতুন হারভা সিনাগগের প্রথম অংশের উদ্বোধন হয় ১৮৩৭ সালে। তবে এই ভবন বিবাদের উৎসে পরিণত হয়। মিনস্কের রাব্বি বারদাকি নতুন সিনাগগের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, স্থানটি এর বদলে গৃহায়নের জন্য ব্যবহার করা উচিত। তখন প্রায় পাঁচ শ' অভিবাসী বাস্তবিকই গৃহহীন ছিল। এর প্রতিবাদে তিনি ও তার অনুসারীরা সুকোথ শ্যালম সিনাগগ নির্মাণ করেন। এতে অ্যাশকেনাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিভক্তির সৃষ্টি হয়। এটি ছিল নানা বিরোধের প্রথমটি। ঊনিশ শতকে ইহুদি সম্প্রদায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল : অ্যাশকেনাজিমের বিরোধী ছিল সেফারদিম, হ্যাসিদিম লড়াই করত মিতনাগেদিমের বিরুদ্ধে, বড় বড় গ্রুপের মধ্যে উপদল গড়ে উঠছিল। ইহুদি মহল্লা নানা দলাদলিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রতিটি গ্রুপই নিজ নিজ রাব্বিকে ঘিরে আলাদা হয়ে পড়েছিল, প্রায়ই তারা বিভিন্ন সিনাগগে উপাসনা করত।

জেরুসালেমের প্রায় প্রতিটি নতুন ঘটনা সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়ে দিত, নগরীতে তা বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করত। মুহাম্মদ আলী পাশ্চাত্যের সমর্থন লাভ করতে উদগ্রিব ছিলেন। এ কারণে তিনি ইউরোপিয়ানদের নগরীতে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করতেন। ফলে প্রথমবারের মতো পাশ্চাত্য শক্তি জেরুসালেমে কনস্যুলেট প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। স্থানীয় লোকজন এ নিয়ে দীর্ঘ দিন লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল। ১৮৩৯ সালে ইংরেজ কূটনীতিক উইলিয়াম টার্নার ইয়ং ব্রিটিশ ভাইস-কনস্যাল হিসেবে জেরুসালেমে আসেন। পরের ১৫ বছরে ফ্রান্স, প্রুসিয়া, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া পবিত্র নগরীতে তাদের কনস্যুলেট খোলে। কনসালরা জেরুসালেমে চরম গুরুত্বপূর্ণভাবে নিজেদের উপস্থাপন করে। তারা নগরীতে আধুনিক চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রযুক্তি নিয়ে আসে। তবে প্রত্যেকেরই নিজস্ব রাজনৈতিক এজেন্ডা ছিল। আর তা প্রায়ই আগে থেকেই বিভক্ত নগরীতে নতুন সঙ্ঘাতের সৃষ্টি করত। স্থানীয় লোকজনকেও ইউরোপিয়ান শক্তিগুলোর বিবাদে জড়িয়ে

ফেলা হতো। এমন প্রেক্ষাপটে ইউলিয়াম ইয়ং অ্যাশকেনাজিক ইহুদিদের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠলেন। জেরুসালেমে একটি 'প্রটেকটোরেট' প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিল ব্রিটেন। ফ্রান্স ও রাশিয়া ইতোমধ্যেই তা করেছিল। তবে প্রোটেস্ট্যান্টদের জন্য কোনো কনসাল ছিল না। আবার ইউরোপিয়ান ইহুদিদের কোনো স্পন্সর ছিল না। ইয়ং নিজেকে তাদের অঘোষিত পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সামনে নিয়ে এলেন। তিনি প্রাচীন সহস্রাব্দ স্বপ্নে উদ্দীপ্ত ছিলেন। সেন্ট পল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে দ্বিতীয় আগমনের (সেকেন্ড কামিং) আগে সব ইহুদি গ্রহণ করবে খ্রিস্ট ধর্ম। আর ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ব্রিটিশ খ্রিস্টান মনে করত যে তারা এই ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করা তাদের কর্তব্য। তারা স্পষ্টভাবে মনে করত, মহা পরিত্রাণের পথে হতে এটিই চূড়ান্ত বাধা। ১৮৩৯ সাল নাগাদ ইয়ংয়ের প্রভাবে 'লন্ডন সোসাইটি ফর প্রমোটিং খ্রিস্টানিটি অ্যামং দি জিউশ'কে ('লন্ডন জিউশ সোসাইটি' নামেও পরিচিত) জেরুসালেমে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে পবিত্র নগরীতে প্রথম প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারির আগমন ঘটে। তবে তারা পুরনো খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলো ও ইহুদি (খ্রিস্টান তৎপরতায় তারা ক্ষুব্ধ ছিল) উভয়ের বিরাগ ভাজন হয়েছিল।

এখন জেরুসালেমে আধুনিক ধ্যান-ধারণা প্রবেশ করতে শুরু করেছে। আর এর কোনো বিরতি ছিল না। ১৮৪০ সালে ইউরোপিয়ান শক্তিগুলো যখন মিসরীয়দের ফিলিস্তিন ত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং উসমানিয়ারা আবার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, তখন পুরনো ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তনের কোনো প্রশ্নই ছিল না। আধুনিকতার কাছে নতি স্বীকার করে ইস্তাম্বুল। সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ সংস্কার করা একটি সেনাবাহিনী নিয়ে আরো কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার তানজিমাত ('নিয়ন্ত্রণ') জিম্মিদের নতুন সুবিধা নিশ্চিত করে। তাদেরকে তখনো সামরিক সুরক্ষার জন্য জিজিয়া প্রদান করতে হলেও অধিকতর ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত, স্থানীয় মুসলিমদের কোনো বাধা ছাড়াই তারা তাদের উপাসনার স্থানগুলো নির্মাণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারত। উসমানিয়ারা এখন জেরুসালেমের প্রতি আরো আগ্রহ দেখাল। এর কিছু অংশ অবশ্য পবিত্র নগরীতে পাশ্চাত্য দখলে বদলে গিয়েছিল। মিসরীয় অভিযানের আগে একর বিবেচিত হতো ফিলিস্তিনের প্রধান নগরী। এখন জেরুসালেম এর স্থান দখল করল। এটি এখনো মুতাসারিফলিক অর্থাৎ প্রশাসনিক দিক থেকে প্রদেশ (ইয়ালেত) ও জেলার (সানজাক) মাঝামাঝি এর

অবস্থান। তবে গাজা, জাফা ও (১৮৫৮ সাল পর্যন্ত) নাবলুস সানজাকগুলো জেরুসালেমের সাথে যুক্ত হয়। ১৮৭২ সালে স্বল্প সময়ের জন্য জেরুসালেম আলাদা হয়ে যায় : সিডন বা দামাস্কাসের ওয়ালির অধীনে না থেকে গভর্নর সরাসরি ইস্তাম্বুলের কাছে দায়বদ্ধ থাকতেন। জনসংখ্যাও বাড়ছিল। ১৮৪০ সালে নগরীতে জনসংখ্যা যেখানে ছিল ১০,৭৫০ জন। এদের মধ্যে ইহুদি ছিল ৩,০০০, খ্রিস্টান ৩,৩৫০ জন। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে নাটকীয়ভাবে। ১৮৫০ সালে ইহুদিরা নগরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, ১০ বছরে তাদের বৃদ্ধি ঘটে প্রায় দ্বিগুণ। এই ধারা অব্যাহত থাকে। নিচের টেবিলটিতে বিষয়টি স্পষ্ট হবে :

বছর	মুসলিম	খ্রিস্টান	ইহুদি	মোট
১৮৫০	৫,৩৫০	৩,৬৫০	৬,০০০	১৫,০০০
১৮৬০	৬,০০০	৪,০০০	৮,০০০	১৮,০০০
১৮৭০	৬,৫০০	৪,০০০	১১,০০০	২২,০০০
১৮৮০	৮,০০০	৬,০০০	১৭,০০০	৩১,০০০
১৮৯০	৯,০০০	৮,০০০	২০,০০০	৪২,০০০
১৯০০	১০,০০০	১০,০০০	৩৫,০০০	৫৫,০০০
১৯১০	১২,০০০	১৩,০০০	৪০,০০০	৭০,০০০
১৯২২	**১৩,৫০০**	**১৪,৭০০**	**৩৪,৭০০**	**৬২,৬০০**

একটি জনহীন, নিরাশায় ভরা নগরী জেরুসালেম একটি সমৃদ্ধশীল আধুনিক মেট্রোপলিশে পরিণত হয়। টেম্পল ধ্বংস হওয়ার পর প্রথমবারের মতো আবারো ইহুদিরা ওপরের দিকে উঠতে থাকে।

এদিকে পাশ্চাত্য শক্তিগুলো কনসাল ও চার্চগুলোর মাধ্যমে পবিত্র নগরীতে তাদের প্রভাব বাড়ানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে থাকে। প্রুসিয়া ও ব্রিটেন যৌথভাবে জেরুসালেমে প্রথম প্রটেস্ট্যান্ট বিশপ নিয়োগ করে। তারপর ১৮৪২ সালের ২১ জানুয়ারি ইহুদি ধর্মান্তরিত বিশপ মাইকেল সলোমন জেরুসালেমে এসে ঘোষণা করেন যে তার প্রথম কর্তব্য হলো নগরীর ইহুদিদেরকে খ্রিস্টের কাছে নিয়ে আসা। স্বাভাবিকভাবেই এটি ইহুদিদের সতর্ক করে। নতুন প্রটেস্ট্যান্ট ক্যাথেড্রালকে বলা হতো হিব্রু ক্রাইস্ট চার্চ। এটি নির্মিত হয় জাফা গেটের কাছে, ব্রিটিশ কনস্যুলেটের ঠিক পাশেই। ১৮৪৩ সালের ২১ মে কনসাল ইয়ংয়ের উপস্থিতিতে তিন ইহুদি ক্যাথেড্রালে হিব্রু আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে ব্যাপ্টাইজ হয়। স্বাভাবিকভাবেই ইহুদিরা এসব প্রটেস্ট্যান্টের কল্যাণ ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গরিব ইহুদিদের চার্চে নিয়ে যেতে প্রলুব্ধ করার কাজে ক্ষুব্ধ হয়। ইহুদি সম্প্রদায়ে অদ্ভুত হয়ে যাওয়া এসব ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাতারে সামিল হওয়া খ্রিস্টানরা সহায়তা করে। ১৮৪৪ সালে আরো ইহুদি ব্যাপ্টাইজ হয়। এতে ইহুদিরা উপলব্ধি করতে থাকে যে খ্রিস্টান আক্রমণ প্রতিহত করতে তাদেরও কিছু করতে হবে।

জেরুসালেমের পবিত্রতায় লোকহিতৈষী কার্যক্রম সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এখন এটিও আগ্রাসী ও বিভক্তসূচক হয়ে পড়ে। ১৮৪৩ সালে লন্ডন জিউশ সোসাইটি ইহুদি মহল্লার কাছাকাছি একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে বিনা মূল্যে ওষুধ প্রদানের সুযোগ দেয়। কনসাল পদে ইয়ংয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যখন জেমস ফিন এলেন, তখন তিনি ধর্মান্তর কর্মসূচিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করে বৈরুতের কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে রাশিয়া হতে আগত ইহুদি অভিবাসীদেরকে সুরক্ষা প্রদান করার প্রস্তাব দিলেন। উসমানিয়ারা ১৮৫০ সালে সাম্রাজ্যে জমি কেনার জন্য বিদেশীদের অনুমতি দিলে ফিন প্রাচীরের বাইরে মাউন্ট সায়নের এক মাইল পশ্চিমে একটি এস্টেট কিনে নেন। এটি তালবিয়া কলোনিতে পরিণত হয়। এখানে ইহুদিরা কৃষিকাজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারত। ফিনের প্রধান দাতা ছিলেন চেলটেনহ্যামের মিস কুক। এই নারীর তহবিলে আরো দুটি খামার প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি বেথলেহেমের কাছে, অপরটি জাফা গেটের উত্তরে ইব্রামিমের আঙুর বাগানে। এখানে ছয় শত ইহুদির চাকরির ব্যবস্থা হয়। ফিন নিশ্চিত ছিলেন, ইহুদিরা যদি ইহুদি

মহল্লার জঘন্য পরিবেশ ত্যাগ করে, নিজেদের জীবিকা উপার্জন করে তবে তাদের অবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটবে। জেরুসালেমের ইহুদিদের বেশির ভাগ বেঁচে থাকত হালাকার ওপর, অর্থাৎ প্রবাসী ইহুদিদের দান-দাক্ষিণার ওপর। ইহুদিরা যাতে পবিত্র নগরীতে বাস করে তাওরাত ও তালমুদ অধ্যায়ন করতে পারে, সেজন্যই প্রবাসীরা এই সহায়তা করত। আলোকিত ইহুদি লোকহিতৈষীদের মতো ফিন বিশ্বাস করতেন, ইহুদিদের জন্য অস্বাস্থ্যকর নির্ভরতা থেকে সরে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর কোনো কারণে হালাকা যদি না আসে, তবে ইহুদিদের জীবন বিপন্ন হয়ে যাবে। শিক্ষাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নতুন প্রটেস্ট্যান্ট বিশপ গোবাট ইহুদি ধর্মান্তরিত ও আরব খ্রিস্টানদের জন্য দুটি স্কুল খোলেন। একটি ছেলেদের জন্য, অপরটি মেয়েদের জন্য। মাউন্ট সায়নের উত্তর ঢালুতে ছিল স্কুল দুটি। জার্মান চার্চের পক্ষ থেকে ক্রাইস্ট চার্চের কাছে ইহুদিদের জন্য একটি স্কুল খোলা হয়। লন্ডন জিউশ সোসাইটিও ক্রাইস্ট চার্চের কাছে একটি হাউস অব ইন্ডাস্ট্রি খোলে তরুণ ইহুদিদের ব্যবসা-বাণিজ্য শেখাতে। এসব প্রতিষ্ঠান দারিদ্র- পীড়িত ইহুদিদের অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট করত। স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে, এই হুমকি প্রতিরোধ করার সর্বোত্তম উপায় ছিল ইহুদি কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান খোলা। ১৮৪৩ সালে ব্রিটিশ ইহুদ জনদরদি স্যার মোসেস মন্টেফিওর নগরীতে একটি ইহুদি ক্লিনিক খোলেন। রথচাইল্ডস ১৮৫৪ সালে মাউন্ট সায়নের দক্ষিণ ঢালুতে মসিগ্যাভ লাদাচ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে স্কুল ও স্বল্প সুদে মূলধন প্রদানের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়।

এই প্রটেস্ট্যান্ট চ্যালেঞ্জের ফলে অপেক্ষাকৃত পুরনো খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলোও নতুন নতুন জনসেবায় উদ্দীপ্ত হয়। গ্রিক অর্থোডক্স সেন্ট স্যাভিয়র্সের চেয়ে অনেক বড় কারিকুলাম নিয়ে আরব ছেলেদের জন্য একটি স্কুল খোলে। ল্যাতিন প্যাট্রিয়াচেট আবার চালু করার লক্ষ্যে রোমান ক্যাথলিক চার্চ উদ্দীপ্ত হয় প্রটেস্ট্যান্ট বিশপের আগমনে। ক্রুসেডার রাজ্য বিলীন হওয়ার পর থেকেই তারা ম্লান হয়ে পড়েছিল। নতুন প্যাট্রিয়ার্ক জাফা গেটের কাছে নতুন ভবনে সরে যান। এটি পরিণত হয় জেরুসালেমের আধুনিক এলাকা। তার উপস্থিতি নগরীতে নতুন বিভেদের সৃষ্টি করে। তিনি গ্রিকদের সামনে অবধারিত চ্যালেঞ্জই দেননি, সেইসাথে এই নিয়োগে অপমানিত হওয়া সেন্ট স্যাভিয়ার্সের ফ্রান্সিসক্যানদেরও ক্ষিপ্ত করেন। নতুন প্যাট্রিয়াচেটের অর্থ হলো নগরীতে আরো বেশি ক্যাথলিক ব্যবস্থা চালু করা।

অল্প সময়ের মধ্যেই সিস্টার্স অব জায়ন' (লন্ডন জিউশ সোসাইটির রোমান ক্যাথলিক সংস্করণ) ভায়া ডোলোরোসার ইসে হোমো আর্চের কাছে একটি কনভেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তারা মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলে।

আধুনিক দুনিয়ার কাছে জেরুসালেম নিজেকে উন্মুক্ত করে দিচ্ছিল। ১৮৫২ সালের এপ্রিলে নগরীতে পা দিয়েই আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ অ্যাডওয়ার্ড রবিনসন পরিবর্তনটি লক্ষ্য করেন। তিনি এর আগে ১৮৩৮ সালে মিসরীয় দখলদারিত্বের আমলে জেরুসালেম সফর করেছিলেন। তবে এবার তিনি সাথে সাথে আধুনিক অ্যাঙ্গিক্যান চার্চ, কনস্যুলেট ও জাফা গেটের কফি হাউস দেখে মোহিত হন। 'জেরুসালেমে অগ্রগতি চলছে, পুরনো ঘরবাড়ি ভেঙ্গে ফেলে নতুন নতুন তৈরি হচ্ছে। এটি আমাকে অনেকটা নিউ ইয়র্কের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। রাস্তা-ঘাটে অনেক বেশি তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। অনেক বেশি লোক উদ্যোমী, অনেক বেশি গতিশীল ব্যবসা দেখা যাচ্ছে। অবশ্য রবিনসনকে প্রাচীন জেরুসালেম নিয়ে খুবই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গবেষণা করতে আসতে হয়েছিল। তিনি বাইবেলের সত্যকে বৈজ্ঞানিক ও সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে আক্ষরিকভাবে সত্য প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে ইব্রাহিম, মুসা ও যশুয়ার সফরের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ১৮৮৩ সালের সফরকালে তিনি হেজেকিয়ার নির্মিত পানিব্যবস্থা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছিলেন। তার বাইবেলিক রিসার্চেস ইন প্যালেস্টাইন (১৮৪১) ফিলিস্তিনে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। দৃশ্যত এটি ছিল ধর্মের সত্যতা প্রদর্শন এবং বাইবেলের ঐতিহাসিক বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বিজ্ঞানী, ভূতত্ত্ববিদ ও শাস্ত্রবিদদের তীব্র সমালোচনার জবাব দেওয়ার প্রয়াস। এই নতুন 'বাইবেলিক প্রত্নতত্ত্বের' লক্ষ্য ছিল কল্পনাপ্রসূত পুরানতত্ত্বভিত্তিক হিসেবে নয়, বরং তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে আধুনিক পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ধর্ম হিসেবে প্রকাশ করা। জেরুসালেম অবশ্য ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাস থেকে আলাদাভাবে কাজ করে এমন কিছুর প্রতি অনেক কম বুদ্ধিবৃত্তিক টান প্রদর্শন করত। নগরীতে রবিনসনের প্রথম সফরকালে তিনি নিজেকে পুরোপুরি আবেগে আচ্ছন্ন দেখতে পেয়েছিলেন। শৈশব থেকে স্থানটি কল্পনাপ্রসূতভাবে তার সামনে হাজির করা হয়েছিল। ফলে তিনি আগে কখনো নগরীটি সফর না করলেও তার মনে হয়েছিল এই সফর ছিল তার 'প্রত্যাবর্তন' এবং তিনি তরুণতর সত্তার মুখোমুখি হয়েছেন। স্থানগুলো 'সবই ছিল আমার কাছে

পরিচিত, মনে হচ্ছিল যে আগের স্বপ্নগুলো বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল, আমি শৈশবের লালিত দৃশ্যগুলোতে পৌঁছে গেছি।'

রবিনসন ১৮৫২ সালে জেরুসালেমে ফিরে এসে দারুণ একটি আবিষ্কার করেন। আগের বছর আমেরিকান প্রকৌশলী জেমস বার্কলে মামলুক মাদরাসাগুলো সংরক্ষণ নিয়ে পরামর্শ দিতে উসমানিয়াদের অতিথি হিসেবে নগরী সফর করেছিলেন তিনি। ওয়েস্টার্ন ওয়ালে তিনি একটি বিশাল সরদল (লিন্টেল) লক্ষ্য করেন। এটি হেরড টেম্পলের একটি দরজার উপরে ছিল। এখন রবিনসনের নজরে পড়ে ওয়েস্টার্ন ওয়ালের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল বিশাল পাথর। তিনি সেগুলোর ওপর থেকে মাটি সরিয়ে ফেলে বুঝতে পারেন এটি অবশ্যই যোশেফাসের বর্ণিত টাইরোপোয়ন ভ্যালিতে বিস্তৃত কোনো সৌধের খিলান হবে। 'বার্কলেস গেট' ও 'রবিনসনস আর্চ' ছিল মূল্যবান আবিষ্কার। অবশ্য এসব পাথরের সত্যিকারের কোনো ধর্মীয় তাৎপর্য আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়ে গেছে। অবশ্য প্রত্নতত্ত্ব তার নিজস্ব পবিত্র যুদ্ধে ইন্ধন দিতে পারে। ক্যাথলিকেরা এসব ও অন্যান্য প্রটেস্ট্যান্ট আবিষ্কারকে চ্যালেঞ্জ করতে উদ্বুদ্ধ হলো। ১৮৫০ সালে ফেলিসিয়েন সি সলসি (এই সৈনিক লোকটির পুরাতত্ত্বের ওপর কোনো প্রশিক্ষণও ছিল না) দাবি করেন যে হারামের হেরডিয়ান প্রচীরগুলো সোলায়মান নির্মাণ করেছিলেন এবং আদিয়াবেনের রানির প্রথম শতকে নির্মিত 'টম্ব অব দি কিংস' ছিল দাউদ ও জুদার রাজাদের কবর। এসব দাবির সপক্ষে কোনো ধরনের প্রমাণ না দিয়ে ডি সলসি প্রটেস্ট্যান্ট উদ্যোগ (রবিনসন বিশ্বাস করতেন যে দাউদের কবর রয়েছে মাউন্ট সায়নে) বাতিল করার আশা করেন এবং সাধারণভাবে প্রটেস্ট্যান্ট বিশ্বাসের ওপর সন্দেহের রেখাপাত করেন।

এসব অধিকতর গবেষণামূলক বিতর্ক চলতে থাকার মধ্যেই জেরুসালেমের খ্রিস্টানদের তিক্ত বিবাদ পরাশক্তিগুলোর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়। ১৮৪৭ সালে ন্যাটিভিটি চার্চে গ্রিক ও ল্যাতিন পাদ্রিদের মধ্যে কলঙ্কজনক বিবাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। খোয়া যাওয়া একটি রুপার তারা নিয়ে রক্ত ঝরে, তীব্র দোষারোপ দেখা যায়। এ নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের 'রক্ষক' ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে সঙ্ঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। আর ফ্রান্স এই সুযোগে পবিত্র স্থানগুলো নিয়ে তার দাবি আবার প্রকাশ করে। তবে রাশিয়া জবাব

দেয়, স্থিতিবস্থা বজায় রাখতেই হবে, অন্যসব সম্প্রদায়ের চেয়ে গ্রিকদের অপেক্ষাকৃত উচ্চ মর্যাদায় রাখতে হবে। এই বিবাদ উসমানিয়া ভূখণ্ডে নতুন কোনো রুশ অগ্রগতি রুখে দিতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রয়োজনীয় অজুহাত পেয়ে যায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স। ১৮৫৪ সালে ক্রিমিয়া যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। নতুন সেক্যুলারবাদ সত্ত্বেও জেরুসালেম ইস্যুটি তখনো খ্রিস্টান শক্তিগুলোর মধ্যে বড় ধরনের সঙ্ঘাত ছড়িয়ে দিত।

রাশিয়ার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ১৮৫৫ সালে যুদ্ধ সমাপ্ত হলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইস্তাম্বুলের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করে। কয়েক শত বছরের মধ্যে এই প্রথম খ্রিস্টানদের জন্য হারাম খুলে দেওয়া হয়। ব্রাবান্তের ডিউক ও ডুচেস ১৮৫৫ সালের মার্চে প্রথম পাশ্চাত্য পর্যটক হিসেবে পবিত্র ধর্মীয় স্থানটি পরিদর্শন করেন। এর কয়েক মাস পর যুদ্ধে ব্রিটেনের অংশগ্রহণের স্বীকৃতি হিসেবে স্যার মোসেস মন্টেফিওরি সাম ১২১ আবৃতি করতে করতে হারাম প্লাটফর্মে আরোহণ করেন। তবে তাকে সেডান চেয়ারে করে বহন করা হয়েছিল যাতে নিষিদ্ধ এলাকার কোথাও তার পা অসাবধনতা বশেও স্পর্শ না করে। অন্যদের আনুকূল্যও আসন্ন ছিল। ক্রুসেডার চার্চ সেন্ট আনা ফরাসি জনগণকে উপহার হিসেবে তৃতীয় নেপোলিয়নকে ফিরিয়ে দেন সুলতান। সুলতান সালাহউদ্দিন সেটিকে মাদরাসায় রূপান্তরিত করেছিলেন। আর ব্রিটিশরা জোর দিয়ে বলতে থাকে, হুরভা সিনাগগে ইহুদিদের যেন প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়।

যুদ্ধের পর আধুনিকায়ন-প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। খ্রিস্টান চার্চগুলো প্রিন্টিং প্রেস কিনে আনে। ১৮৬২ সাল নাগাদ দুটি ইহুদি প্রেস চালু হয়। এক বছরের মধ্যে সেখান থেকে দুটি হিব্রু পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহুদি ছেলেদের আধুনিক শিক্ষা প্রদান করার জন্য লাইমেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারা এখানে আরবি, গণিত ও সেইসাথে তাওরাতও শিখত। এটি ইহুদি মহল্লায় বৈরিতার সৃষ্টি করে। কারণ অধিকতর রক্ষণশীল ইহুদিরা, বিশেষ করে অ্যাশকেনাজিম সম্প্রদায়ের সদস্যরা এই ইহুদি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক রাখেনি। নগরীতে আধুনিক ভবনরাজি নির্মাণ শুরু হয়। অস্ট্রিয়া সরকার ১৮৬৩ সালে সুকের প্রধান রাস্তাগুলোর একটি মোড়ে ক্যাথলিক তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি পান্থনিবাস নির্মাণ করে। কাছাকাছি স্থানে দামাস্কাস গেটের কাছে বেজেথার সুন্দর একটি বাড়িতে

অস্ট্রিয়ান কনস্যুলেট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটিও আধুনিকতার কেন্দ্র সূচিত করে। ব্রিটিশ ও ফরাসি কনস্যুলেটগুলো এই এলাকায় সরিয়ে নেওয়া হয়। ফলে এটি শহরের অন্যতম আকর্ষণীয় এলাকায় পরিণত হয়।

অবশ্য প্রাচীর ঘেরা নগরী থেকে বের হওয়ার গতি ছিল অনেক বেশি। এটি শুরু হয় ১৮৫৭ সালে মন্টিফিওরি মাউন্ট সায়নের বিপরীতে এক টুকরা জমি কেনার অনুমতি লাভ করলে। এটি ছিল তালবিয়া এস্টেটের চেয়ে কয়েক শ' গজ সামনে ছিল নগরীর। তিনি প্রথমে সেখানে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। পরে মন পরিবর্তন করে নিঃস্ব ইহুদি পরিবারগুলোর জন্য আশ্রয়শিবির নির্মাণ করেন। তিনিও অতিরিক্ত জনাকীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর ইহুদি মহল্লা থেকে ইহুদিদের সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কুঠিরগুলো থেকে দেখা যায়, এমন একটি পাহাড়ের ওপর জেরুসালেমের সবচেয়ে উন্নত উইন্ডমিল নির্মাণ করেন তিনি। ফিনের মতো মন্টিফিওরিও চেয়েছিলেন, ইহুদিরা যেন স্ব-নির্ভর হয়। অন্যান্য ইহুদি এই আইডিয়ায় আকৃষ্ট হয়। ১৮৬০ সালে রুশ ইহুদি ডেভিড ইয়েলিন নগরী থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে ক্যালোনিয়া গ্রামের কাছে জমি কেনেন। ১৮৮০ সালে এসব নতুন ইহুদি শহরতলীর সংখ্যা ছিল ৯টি। এগুলোর একটি ছিল অ্যাশকেনাজি কলোনি। জাফা গেট থেকে অর্ধ মাইল দূরে মিয়া শেয়ারিম (শত তোরণ) নামে অভিহিত করা হতো। এটি তাওরাতের নিয়ম কঠোরভাবে অনুসরণ করে নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে ছিল নিজস্ব সিনাগগ, বাজার ও ইয়েশিভা (ইহুদি বিদ্যালয়)। তবে এসব বসতিতে সরে আসাটা ছিল বিপজ্জনক। মন্টিফিওরি কটেজের যাওয়া প্রথম পরিবারগুলো ডাকাতদের ভয়ে এত সন্ত্রস্ত্র থাকত যে তারা রাতের বেলায় চুপি চুপি তাদের পুরনো কুটিরে ফিরে যেত। অ্যাশকেনাজিমরা প্রায়ই মিয়া শেয়ারিমে যাওয়ার পথে হামলা চালাত। তা সত্ত্বেও বসতিগুলো সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হতে থাকে। একবার তারা ইহুদি মহল্লা ত্যাগ করতে শুরু করার পর জেরুসালেমের ইহুদিদের স্বাস্থ্য নাটকীয়ভাবে ভালো হতে শুরু করে। ১৯ শতকে ইহুদি সম্প্রদায়ের দ্রুত বৃদ্ধির এটিও অন্যতম কারণ। আরেকটি কারণ হলো পরিচ্ছন্ন জীবিকা আয়ের নুতন সুযোগ সৃষ্টি। জেরুসালেমে ইহুদিদের জীবন সবসময়ই কঠিন ছিল। এ কারণে নবাগত অভিবাসীদের অনেকে স্যাফেদ বা তাইবেরিয়াসে বসতি স্থাপন করাকে অগ্রাধিকার দিত। এখন ওই বাধা দূর হয়েছে। ইহুদিরা স্বাভাবিকভাবেই

তাদের পবিত্র নগরীতে আসতে চাইত। স্যাফেদে যখনই কোনো ভূমিকম্প বা অন্য কোনো বিপর্যয় ঘটত, তারা সহজাতভাবেই জেরুসালেমে বসতি স্থাপন করত।

আরবরাও প্রাচীরের বাইরে বসতি স্থাপন শুরু করে। এর মাধ্যমে মুসলিম, খ্রিস্টান ও মিশ্র সমাজ সৃষ্টি হতে থাকে। ১৮৭৪ সালে নগরীর উত্তরে করিম আল- শেখ ও বাব আল-জাহরেবে, দামাস্কাস ফটক থেকে চার শ' গজ উত্তর-পশ্চিমের মুরেসায়, জাফা তোরণ থেকে এক মাইল দূরে কাতামনে এবং হিন্নম ও কিদরন উপত্যকা থেকে দেখা যাওয়া আবু তুরে পাঁচটি আরব আবাসিক শহরতলী গড়ে ওঠে। খ্রিস্টান সমাজগুলোও প্রাচীরের বাইরে সরে যাওয়া শুরু করে। ১৮৬০ সালে সুইস জার্মান ব্রাদারহুড আরব শিশুদের জন্য জাফা ফটকের বাইরের খামারগুলোতে একটি এতিমখানা গড়ে তোলে। জার্মান নারী গির্জা-কর্মী জাফা রোডের দক্ষিণের খামারগুলোতে মেয়েদের জন্য তালিথা কুমি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭১ সালে ওরটেমবার্গের প্রটেস্ট্যান্টরা নগরীর দক্ষিণে জার্মান কলোনি নির্মাণ করে। তারা শুরু করে একটি চার্চ, একটি পান্থনিবাস, স্কুল ও হাসপাতাল দিয়ে। ১৮৮০ সালে আমেরিকান পরিবার স্প্যাফোর্ডস দামাস্কাস গেটের উত্তরে নতুন প্রটেস্ট্যান্ট মিশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে। এটি আমেরিকান কলোনিতে পরিণত হয়। খুব বেশি বিলম্ব হওয়ার আগেই রুশরা নগরীর পশ্চিমে একটি বিশাল পান্থনিবাস নির্মাণ করে। এতে এক হাজার তীর্থযাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হয়। জাফা থেকে আগতদের প্রথমেই এর বিশেষ সবুজ গম্বুজগুলোই চোখে পড়ত। ক্যাথলিকেরাও ১৮৮০-এর দশকে প্রাচীরের বাইরে প্রতিষ্ঠান খোলা শুরু করে। তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে দামাস্কাস গেটের বিপরীতে প্রাচীরের উত্তর-পশ্চিম কোণে স্কমিডট কলেজ, সেন্ট ভিনসেন্ট পল মনাস্টেরি, নটর ডেম ডি ফ্রান্স, সেন্ট লুই হাসপাতাল।

আধুনিক জেরুসালেমের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয় দামাস্কাস গেট। অবশ্য অনেক সময় পরিবহন মাধ্যম, পোশাকের স্টাইল আর স্থাপত্য নতুন ও পুরাতন পাশাপাশি অবস্থান করতে থাকে।

আরব জেরুসালেমও উন্নত হতে থাকে। ১৮৬৩ সালে নগরীতে প্রথম মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল (বালাদিয়া অল-কুদস) প্রতিষ্ঠিত হয়। ভায়া ডেলোরোসায় দুটি ছোট রুমে ছিল

এর অফিস। ইস্তাম্বুলে এ ধরনের অফিস চালুর পর সম্ভবত জেরুসালেমেই ছিল এ ধরনের প্রতিষ্ঠান চালু হওয়া প্রথম উসমানিয়া শহর। ১০ সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিলে ছিলেন ছয়জন মুসলিম, দুজন খ্রিস্টান, একজন ইহুদি; ১৯০৮ সালে ইহুদি সংখ্যা বাড়িয়ে দুই করা হয়েছিল। নগরীতে উত্তেজনা সত্ত্বেও তিন ধর্মের লোকজন সৃষ্টিশীলভাবে একসাথে কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল। পুরুষ উসমানিয়া নাগরিকদের ভোটে প্রতি চার বছরের জন্য কাউন্সিল নির্বাচিত হতো। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা ছিল তাদের বয়স হতে হবে ২৫ বছরের বেশি এবং বছরে অন্তত ৫০ তুর্কি পাউন্ড কর দিতে হবে। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে মেয়র নিয়োগ করতেন গভর্নর। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বেশির ভাগ মেয়রই হতেন খালিদি, আলামি, হোসাইনি ও দাজানি পরিবারগুলো থেকে। নিয়োগের সময় বিখ্যাত খান্দানগুলো বিশেষ করে খালিদি ও হোসাইনি পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা হতো। জেরুসালেমের উন্নয়নে মিউনিসিপ্যালিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করত। একেবারে শুরু থেকে সংস্থাটি জেরুসালেমের অবকাঠামো উন্নয়ন, ফুটপাত তৈরি ও রাস্তা পরিচ্ছন্ন রাখা, পয়ঃনিষ্কাষণ স্থাপন, নগরীকে আলোকিত ও পরিষ্কার রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। ১৮৯০-এর দশকে কাউন্সিল নিয়মিতভাবে পানি ছিটানো, আবর্জনা সংগ্রহ, রাস্তায় রাস্তায় গাছ লাগনো, জাফা রোডে নগর পার্ক প্রতিষ্ঠা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পুলিশ বাহিনী প্রবর্তন করাও ছিল কাউন্সিলের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তারা বিনা পয়সায় চিকিৎসা সহায়তাও প্রদান করত। শতাব্দীর শেষ প্রান্তে জাদুঘর ও জাফা গেটের কাছে একটি থিয়েটার স্থাপন করা হয়। থিয়েটারে তুর্কি, আরবি ও ফরাসি ভাষায় অনুষ্ঠান হতো। উসমানিয়া সাম্রাজ্যে অল্প কিছু নগরীতেই কেবল এ ধরনের সক্রিয় ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মিউনিসিপ্যাল সংস্থা ছিল।

এসবের অন্যতম পথিকৃত ছিলেন ইউসুফ আল-খালিদি। তিনি ৯ বছর মেয়রের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ফিলিস্তিনি নতুন নগরবাসীর প্রতিনিধিত্ব করতেন। তিনি জেরুসালেমের প্রথম আরব হিসেবে আধুনিক, পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য খালিদির কোনো জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি ছিলেন অনুগত উসমানিয়া নাগরিক। ১৮৭৭-৭৮ সময়কালে স্বল্প মেয়াদি উসমানিয়া পার্লামেন্টে জেরুসালেমের প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। এখানে তিনি নির্ভীকভাবে সুলতান আবদুল হামিদের প্রশাসন

দখল ও অসাংবিধানিক আচরণের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সংস্কার করা উসমানিয়া রাষ্ট্রের উচিত আধুনিক শিক্ষা, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সাংবিধানিক অধিকার ও উন্নত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।১৮৭৯ সালে বরখাস্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন জেরুসালেমের স্থানীয় নায়ক। স্থানীয় পরিবারগুলোর ক্ষমতা কেড়ে নিতে উদ্যোগী গভর্নর রউফ পাশা তাকে অপসারণ করেছিলেন। এটি জেরুসালেমে খালিদিদের রাজনৈতিক উত্থানের সমাপ্তি ঘটায়, আরো রক্ষণশীল ও অসহিষ্ণু হোসাইনিদের এগিয়ে যাওয়ার সূচনা ঘটায়। তবে জেরুসালেমে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় এ ধরনের ঘটনা সবসময় সহায়ক হয় না।

রউফ পাশা চেষ্টা করেছিলেন খালিদি ও অন্যান্য আরব অভিজাতের স্থানে তুর্কি কর্মকর্তাদের বসাতে। তবে এ নিয়ে জেরুসালেমে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এই ব্যবস্থাকে আরববিরোধী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়েছিল। এটি ছিল নতুন ঘটনা। এর পর থেকে জাতিগত পরিচিতির চেয়ে ধর্মীয় পরিচিতিই অনেক বেশি গুরুত্ব পেতে থাকবে। ১৮২৫ সালের আন্দোলনের সময় প্রথম আত্মপ্রকাশ করা নতুন আরব সচেতনতা ফিলিস্তিনের আরব জাতীয়তাবাদকে প্রথমবারের মতো নাড়া দিতে থাকে। কনস্যালরা লক্ষ্য করেন যে জেরুসালেমের আরবদের ক্ষোভে তুর্কিরা ক্রমবর্ধমান হারে বিরক্ত হচ্ছে। এসব আরব ভবিষ্যতের সংগ্রামে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। স্বতন্ত্র আরব পরিচিতি ঘোষণার আরেকটি নিদর্শন দেখা যায় ১৮৭২ সালে। এ সময় গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের আরব সদস্যরা তাদের চার্চে অধিকতর অংশগ্রহণের জন্য জোরালো আন্দোলন শুরু করে। তারা এলিট গ্রিক সংখ্যালঘুদের হাতে তাচ্ছিল্যের শিকার ও কোণঠাসা রয়েছে বলে মনে করতে থাকে। জেরুসালেমে বিবাদ শুরু হলেও তা ফিলিস্তিনের বাকি অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এতে উৎসাহ দিয়েছিলেন রুশ কনস্যাল। পবিত্র ভূমিতে অর্থোডক্সির গ্রিক প্রাধান্যে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে তার নিজস্ব অজুহাত ছিল। একপর্যায়ে আরব আচরণ এত সহিংস হয়ে পড়ে যে ব্রিটিশ কনস্যাল একে বিদ্রোহের প্রাথমিক অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও আরব ক্ষোভ ভেতরে ভেতরে ধূমায়িত হতে থাকে। ১৮৮২ সালে আরব খ্রিস্টানেরা তাদের চার্চে বিদেশী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অর্থোডক্স প্যালেস্টাইন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আরবরা তাদের দেশের জন্য নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়নের চেষ্টা করে। তবে ইউরোপিয়ানরাও ফিলিস্তিনি অবস্থানের দিকে আগ্রহ নিয়ে চোখ রাখছিল। তারা জেরুসালেমের আধুনিকতাকে 'শান্তিপূর্ণ ক্রুসেড' হিসেবে দেখতে চাচ্ছিল। তারা চাচ্ছিল এর মাধ্যমে দখল ও আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে। ফরাসিরা একটি সফল ক্রুসেডের মাধ্যমে জেরুসালেম ও সমগ্র প্রাচ্যকে ক্রুশের অধীনে আনার কথা ভাবছিল। তাদের কাজ ছিল সুলতানের অধীন থেকে জেরুসালেম মুক্ত করা, তাদের প্রধান অস্ত্র হবে উপনিবেশবাদ। জার্মান কলোনি নির্মাণকারী প্রটেস্ট্যান্টরা নিজেদেরকে টেম্পলার্স বলত। তারা তাদের সরকারকে ক্রুসেডারদের কাজ সম্পন্ন করার তাগিদ দিত। ব্রিটিশদের ছিল ভিন্ন নীতি। তারা জাতিগত জায়নবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের বাইবেল পাঠ তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল যে ফিলিস্তিনির মালিক ইহুদিরা। ১৮৭০-এর দশকেই সংযত ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকেরা গ্রেট ব্রিটেনের সুরক্ষায় ফিলিস্তিনে ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এটি প্রটেস্ট্যান্ট ইংল্যান্ডের অনেক লোকের কাছে অবধারিত ধারণায় পরিণত হয়। এখানে বাইবেল অনেকটা আক্ষরিক অর্থে পাঠ করা হতো। এতে বলা হতো, ইহুদিরা একদিন জায়নে ফিরে যাবে, আর আরবরা সাময়িক সময়ের আন্দোলনকারী।৮

ইউরোপিয়ানরা দেশটিকে দখল করার উপায় হিসেবে জেরুসালেমে আধুনিকতাকে ব্যবহার করছিল। ১৮৬৫ সালে ব্রিটিশ রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ার্সের ক্যাপ্টেন চার্লস উইলসন জেরুসালেমের পানিবিজ্ঞান সমীক্ষার জন্য ফিলিস্তিনি আসেন। তিনি পবিত্র নগরীর প্রথম সরকারি মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন। এতে পাশ্চাত্য মানসিকতায় পুরনো ঐশী ভূগোল ছাপিয়ে যাওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। হারামের ভূগর্ভস্থ জলাধার অনুসন্ধানের সময় উইলসন 'রবিনসন্স আর্চের সমান্তরালে একটি বিশাল স্মারক আর্চ লক্ষ্য করেন। প্রস্তাবিত নতুন পানিব্যবস্থার চেয়ে 'রবিনসন্স আর্চ' ব্রিটিশ জনমানষে অনেক বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উইলসনের ডিসপ্যাচের ফলে পবিত্র ভূমির প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস গবেষণার জন্য ১৮৬৫ সালে প্যালেস্টাইন এক্সপ্লোরেশন ফান্ড (পিইএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শান্তিপূর্ণ ক্রুসেডের' সহজাত দাবির আলোকে নতুন সোসাইটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এর সভাপতি ইয়র্কের আর্চবিশপ বক্তব্য রাখেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'ফিলিস্তিন দেশটির মালিক আপনি ও

আমি; এটি অনিবার্যভাবেই আমাদের। এই ভূমি থেকেই আমাদের মুক্তির বার্তা এসেছিল। এই ভূমিতেই আমাদের সব আশার ভিত্তি রয়েছে। এই ভূমিতে প্রতি আমরা এই পুরনো ইংল্যান্ডের মতোই দেশপ্রেমের দিকে তাকিয়ে থাকি।' খ্রিস্টান কল্পনাশক্তিতে ফিলিস্তিন এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ হওয়াতে নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে নির্মোহ দৃষ্টিতে বিবেচনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এটি যেভাবেই হোক না কেন খ্রিস্টান অহং ও পরিচিতির অংশে পরিণত হয়। এতে করে সেখানে সত্যিই যারা বসবাস করছে ও যারা নিজেদের দেশ বানিয়েছে, তাদেরকে আমলে নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে বিবেচনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ফিলিস্তিনের জনগণ অল্প সময়ের মধ্যেই এই নতুন ক্রুসেডিং প্রত্নতত্ত্বের নেপথ্যে থাকা বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়ে পড়ে। ১৮৬৩ সালে জেরুসালেমে ডি সলসি ফিরে আসেন রাজাদের কবর খননকাজ অব্যাহত রাখতে। এবার তিনি ক্রুদ্ধ স্থানীয় অধিবাসীদের তোপের মুখে পড়েন। তারা তাদের ভূমি ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দাবি করে। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। ইহুদিরাও অভিযোগ করে যে ডি সলসি তাদের পূর্বপুরুষদের কবর অপবিত্র করছে। ইউরোপিয়ানরা মনে করতে থাকে যে তারা যেখানে অনুসন্ধানকাজ চালাচ্ছে, সেখানে তা করার একচেটিয়া অধিকার তাদের আছে। রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ার্সের চার্লস ওয়ারেন ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে জেরুসালেমে পৌঁছে দেখতে পান যে কর্তৃপক্ষ বৈরী ও সন্দিহান। তাকে খোদ হারামে খননকাজ চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি : এসব নতুন ক্রুসেডারের ক্রুবার, জ্যাক আর ব্লাককে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। সমস্যাটি সমাধান করার জন্য হারামের দক্ষিণ প্রান্তের দিকে একটি বেসরকারি প্লট ভাড়া নিয়ে গভীর গর্ত খনন করে ভূগর্ভের পথ দিয়ে প্রাচীরের ভিত্তি পর্যন্ত যান ওয়ারেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে হেরডের টেম্পলটি বাইবেল আমলে সঞ্চিত নরম খোয়া জমে জমে ও টাইরোপোয়ন ভ্যালিতে জমা হওয়া স্তূপের ওপর নির্মিত হয়েছিল। ওফেল খননের সময় তিনি প্রাচীন জেবুসিত পানি প্রবাহ ব্যবস্থার দেখা পান। এটিই পরে 'ওয়ারেন শ্যাফট' নামে পরিচিত হয়।

ফিলিস্তিনে তথ্যানুসন্ধানী পাশ্চাত্য পর্যটকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছিল। পুরনো আমলের তীর্থযাত্রীদের মতো তারা আর বিশ্বাসের আলোকে ঐশী ভূগোল অনুসন্ধান করত না।

তারা বরং এমন প্রমাণ সংগ্রহ করার চেষ্টায় থাকত যাতে প্রমাণিত হয় যে তাদের বিশ্বাস সত্য। পিইএফ জাফা গেটে একটি দোকান ও লেকচার রুম প্রতিষ্ঠা করে। গাইডদেরকে পিইএফের অনুসন্ধানকারীদের গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে জেরুসালেমের ইতিহাসবিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতো। ‘বাইবেলের প্রত্নতত্ত্ব শুরু হয়েছিল বুদ্ধিবৃত্তিক নিশ্চয়তা অনুসন্ধান করতে। তবে এটি আরো জটিল বাস্তবতা উন্মোচন করতে থাকায় ওই ধরনের নিশ্চয়তাকে কঠিন করে তুলছিল। জেরুসালেমের অতীত সম্পর্কে সহজ বিবৃতি তৈরি করা সত্যিই সম্ভব ছিল না। আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ ফ্রেডেরিক জে ব্লিসের খননকাজের ফলে জেরুসালেম থেকে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে তেল আল-হেসিতে একটি প্রাচীন হস্তলিপি ট্যাবলেট আবিষ্কৃত হয়। এটি সম্প্রতি মিসরের লেত আল-আমারনায় পাওয়া ট্যাবলেটগুলোর মতো। স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে, ‘পবিত্র ভূমির ইতিহাস বাইবেল দিয়ে শুরু হয়নি। ব্লিস জেরুসালেমেও একই জটিলতার সন্ধান পান। তিনি প্রমাণ না করতে পারলেও বুঝতে পারেন যে দাউদের মূল নগরীটি কয়েক শ’ বছর ধরে লোকজন যেমনটি মনে করছে, সে অনুযায়ী মাউন্ট সায়নে ছিল না। বরং তা ছিল ওফেল পাহাড়ে। এটি কি তথাকথিত দাউদ সমাধির জন্য সংগ্রাম করা মূর্খতাপূর্ণ কাজ হিসেবে প্রমাণ করছে? ওফেলে খননকাজ শুরু হলে ব্লিস দেখতে পান যে ইর ডেভিড খনন করা ও এর রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব নয়। তিনি প্রাচীন যেসব কাঠামোর সাক্ষাত পান, সেগুলোর কয়েকটির তারিখ নির্ধারণ সহজ নয়। তবে তাতে স্পষ্ট হয় যে পাহাড়টিতে ব্রোঞ্জ যুগ থেকে বায়েজন্টাইন আমল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে লোকজন বাস করে গেছে। বিভিন্ন স্তর সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর অবস্থায় একে অপরকে ছাড়িয়ে গেছে। ফলে জেরুসালেমের অতীত সম্পর্কে নির্ভুল ছবি তৈরি করতে প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনেক বছর সময় লেগে যাবে। বাইবেল-পাঠের বিশ্বাসী মন যতটা ধারণা করে, তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল এ বিষয়টি।১০

ডোমিনিক্যান প্রত্নতত্ত্ববিদ হিউ ভিনসেন্ট ১৯১০ সালে ওফেলে রিসের খননকাজের বাকি অংশ সম্পন্ন করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে জেরুসালেমে প্রাথমিক নগরী আসলে মাউন্ট সায়নে নয়, এখানেই ছিল। তিনি ব্রোঞ্জ যুগের কবর, পানিব্যবস্থা, দুর্গ খুঁজে পান। এতে প্রমাণ হয় যে দাউদের আগেও সেখানে শহরের অস্তিত্ব ছিল।’ ফলে ইহুদিরাই ছিল এ

নগরীতে প্রথম, কাজেই এটি তাদের- এমন দাবি করা সম্ভব নয়। বস্তুত বাইবেল পরোক্ষ ও অস্পষ্ট পন্থায় দেখিয়েছে যে ইসরাইলিরা আদিবাসী জনসাধারণের কাছ থেকে ফিলিস্তিন ও জেরুসালেম উভয়টি কেড়ে নিয়েছিল। অর্থাৎ আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বিশ্বাসের বেশ কিছু অবধারিত বিষয়ও হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছেন।

জেরুসালেম মুসলিমদের কাছে প্রত্নতত্ত্ব তখনো এমন আশঙ্কাপূর্ণ ঈশ্বর- অবমাননাকর তৎপরতা যা রূঢ়, আগ্রাসী সব পন্থায় ঐশী সত্তার রহস্যে অনুপ্রবেশ করতে চায়। পিয়েরে ভিনসেন্টের খননকাজ হয়েছিল আর্ল অব মর্লের ছেলে মন্টেগু ব্রাউনলো পার্কারের লজ্জাজনক অভিযানের প্রেক্ষাপটে। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে হারামের ভূগর্ভস্থ ভল্টগুলোতে গুপ্তধন চাপা পড়ে আছে। পুরোপুরি অপ্রশিক্ষিত পার্কার যাতে মূল্যবান প্রমাণ ধ্বংস না করে ফেলেন, তা নিশ্চিত করতেই ভিনসেন্ট তাকে সহায়তা করতে রাজি হয়েছিলেন। ১৯১০ সালের ১৭ এপ্রিল রাতে পার্কার ঘুষ দিয়ে হারামে প্রবেশ করে রকের নিচে গুহায় অনুসন্ধান শুরু করেন। হারামে ঘুমানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এক মুসলিম প্রহরী শব্দ শুনে ডোম অব রকে ছুটে গিয়ে পার্কারকে একটি হাতকুঠার দিয়ে ঐশী টিলাটি খুঁড়তে দেখেন। জেরুসালেমের মুসলিমেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, কয়েক দিন ধরে নগরীতে দাঙ্গা চলে। পার্কার ছিলেন পাশ্চাত্য সেক্যুলারবাদের সবচেয়ে খারাপ ঘটনার উদাহরণ। তিনি প্রাচীন পবিত্রতার বিধান লঙ্ঘন করেছিলেন এবং জ্ঞান আহরণের জন্য নয়, বরং আক্ষরিকভাবেই পুরোপুরি পুরোপুরি জাগতিক লাভের জাগতিক লাভের জন্য পবিত্রতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলেন।

আধুনিকতা ধীরে ধীরে ধর্মকে বদলে দিচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের লোকজন নিদর্শন ও ছবিতে থাকা চিন্তাভাবনার শিল্প হারিয়ে ফেলেছিল। এর বদলে তারা চিন্তাধারার আরো রৈখিক, অসংলগ্ন ধারা তৈরি করতে থাকে। সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদের মতো নতুন নতুন মতাদর্শ পুরনো ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে। তারপরও ঐশী ভূগোলের পুরানতত্ত্ব গভীরে প্রবেশ করে। আমরা দেখিছি যে এ ধরনের ধর্ম মানানসই মনে করেনি বায়েজান্টাইন খ্রিস্টানেরা, পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় তাদের ধারণাগুলোও সংশোধন করে নিয়েছিল। খ্রিস্টের কবর আবিষ্কার হওয়ামাত্র তারা দ্রুত ঐশী স্থানের

নিজস্ব পুরানতত্ত্ব বিবর্তিত করেছিল। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে অনেক ইহুদি জায়নের পুরনো মতাদর্শ নতুন পন্থায় বলতে থাকে। ইউরোপিয়ান ইহুদিরা একটি বড় ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যান্ডে তারা মুক্তি পেয়ে আধুনিক সেক্যুলার সমাজে যোগ দিতে উৎসাহিত হয়। তবে ঘেটো থেকে মুক্তি পেয়ে অনেকে বিকশিত হলেও অন্যদের কৌতূহল হারিয়ে গেছে বলে মনে হতে থাকে। তারা তাদের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই নিজেদেরকে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেল। আধুনিক বিশ্বে ইহুদি হওয়ার মানে কী? জেরুসালেম কি ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয় ছিল? কিছুসংখ্যক ইহুদি পৌরাণিক কাহিনীমুক্ত বিশ্বাস তৈরি করে যা পরিকল্পিতভাবে মেসাইনিবাদ ও টেম্পল পুনঃনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা এড়িয়ে যায়। তারা আসলে রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করতে চেয়েছিল। তবে অন্যদের কাছে এই সমাধান সন্তোষজনক মনে হয়নি। অধিকন্তু, তারা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছিল যে ইউরোপের এই নতুন সহিষ্ণুতা কৃত্রিম। সেমিটিকবাদবিরোধিতা খ্রিস্টান প্রকৃতির অনেক গভীরে প্রোথিত, এটি সহজে দূর হওয়ার নয়। ইউরোপিয়ানরা কার্যত তাদের নতুন উদ্দীপনার আলোকে ইহুদিদের সম্পর্কে তাদের পুরনো কল্পকথা নতুন করে ব্যাখ্যা করেছিল। কিছু সংখ্যক ইহুদি ক্রমবর্ধমান হারে দূরে সরে যাচ্ছিল, সাহসী নতুন আধুনিক বিশ্বে তারা অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল। তাদের নিজেদের জন্য একটি সত্যিকারের স্থান না থাকায় তারা সহজাতভাবেই জায়নের দিকে মুখ ফেরায়।

দামাস্কাসে ফ্রান্সিসক্যানদের প্ররোচনায় ইসলামি বিশ্বের প্রথম সেমিটিকবিরোধী প্রগ্রমের পর ১৮৪০-এর শতকের শুরুর দিকে সারায়েভোর সেফারদিক রাব্বি ইহুদা হাই আলচেলাই নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার জন্য ইহুদিদের প্রতি আহ্বান জানান। তারা ইসলামি বিশ্বকে যতটুকু নিরাপদ মনে করেছিল, কার্যত তা ছিল না। মেসাইয়ার জন্য অসহায়ভাবে অলস বসে থাকা কোনো কাজের বিষয় ছিল না : পরিত্রাণ শুরু হবে ইহুদিদের নিজেদের প্রয়াসে, লিখেছেন মিনহাত ইয়েহুদা।১২ তাদেরকে অবশ্যই সংগঠিত হতে হবে, নেতা পছন্দ করতে হবে, ফিলিস্তিনে ভূমি কেনার জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে হবে। ১৮৬০ সালে অ্যাশকেনাজিক রাব্বি জভি হিরশচ ক্যালিশচার পোল্যান্ডে তার স্থানীয় প্রতিবেশীদের মধ্যে নতুন জাতীয়তাবাদ দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। এটি নিজেদের

কোনো ভূমি না থাকা ইহুদিদের কোথায় নিয়ে যাবে? তাদেরকে অবশ্যই তাদের নিজস্ব জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করতে হবে। ক্যালিশচার আরো ভাবলেন যে মেসাইয়ার জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকাটা ভালো হবে না। ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি স্থাপনের জন্য মন্টিফিওরি ও রথচাইল্ডদের একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে ইহুদিরা নিজেদের বলে দাবি করতে পারে এমন একটি স্থানে তাদের গণ-অভিবাসনের ব্যবস্থা করা উচিত। বেশির ভাগ অর্থোডক্স রাব্বি, তারা আধুনিকতার ব্যাপারে কোনো ধরনের ছাড় দিতে নারাজ ছিলেন এবং কঠোরভাবে ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থা অনুসরণ করতেন, নতুন জায়নবাদে কোনো ভূমিকা পালন করতেন না। তারা একে তাড়াহুড়া করে পরিত্রাণকে সংগঠনের অধার্মিক প্রয়াস হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তবে অ্যালচেলাই ও ক্যালিশচার প্রমাণ করেছিলেন, বৈরী বিশ্বে ইহুদিরা যখন নিজেদের নিঃসঙ্গ মনে করছেন, তখন তাদেরকে জায়নের দিকে তাকানোই সহজাত ব্যাপার। জায়নবাদ ছিল সেক্যুলার আন্দোলন। ধর্মের প্রতি আস্থা হারানো ইহুদির বেশির ভাগই এতে উদ্দীপ্ত হলেও এই দুই রাব্বি প্রমাণ করেন যে আন্দোলনটির ধর্মীয় সম্ভাবনাও রয়েছে।

অবশ্য যে লোকটিকে জায়নবাদের পিতা হিসেবে অভিহিত করা হয় তার নাম মোসেস হেস। মার্কস ও অ্যালেঞ্জসের শিষ্য হেস সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদের বৈপ্লবিক আদর্শের আলোকে পুরনো বাইবেলবিষয়ক পুরানতত্ত্ব নতুন করে ব্যাখ্যা করেন। ধর্মের বদলে বর্ণের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী জার্মানিতে সেমিটিকবাদবিরোধী মনোভাব বাড়ার নতুন অবয়বটি দেখতে পেয়েছিল যেসব লোক, তিনি ছিলেন তার অন্যতম। জার্মানরা পিতৃভূমির প্রতি অনেক বেশি নিবেদিতপ্রাণ হওয়ায় ইহুদিদের ঘৃণা ও নির্যাতন করা হবে। কারণ ইহুদিরা আর্য জাতি নয়, তাদের নিজেদের কোনো ভূমি নেই। ওই সময় খুব কম লোকই হেসের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। কারণ তখন বেশির ভাগ লোকের মনে হচ্ছিল যে ইহুদিদের একীভূত করে নিতে চায় জার্মানি। তবে ওই সময় সমাজের অনেক গভীরে থাকা স্রোতটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন হেস। তিনি তার জায়নবাদী ক্লাসিক রোম অ্যান্ড জেরুসালেমে (১৮৬০) যুক্তি দিয়েছিলেন যে ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনে একটি সমাজবাদী সমাজ গড়তেই হবে। মাজিনি যেভাবে তাইবারে শ্বাশত নগরী মুক্ত করেছিলেন, ইহুদিদেরও মাউন্ট মরিয়ার শ্বাশত নগরী মুক্ত করতে হবে। সমাজবাদ ও ইহুদিবাদ

পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। নবীরা ন্যায়বিচারের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন, গরিবদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ইহুদিরা জেরুসালেমে সমাজবাদী কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠা করা মাত্র জায়ন থেকে আবার আলো বের হতে থাকবে। হেস যেটিকে ইতিহাসের সাবাথ' বলেছিলেন, এটি তাই হবে। আর কার্ল মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণী করা ইউটোপিয়কে মেস মেসাইনিক রাজ্যের সাথে তুলনা করেন।

ইউরোপে যেসব ইহুদি মনে করত যে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, তারা জার্মান ইতিহাসবিদ হেইনরিচ গ্রাটজের কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠল। তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ইহুদি ধর্ম তাদের আমলের অতি মাত্রায় রাজনীতিতে ভারাক্রান্ত বিশ্বেও প্রাসঙ্গিক। হিস্টরি অব দি জিওশ ফ্রম দি অ্যানসিয়েন্ট টাইমস টু দি প্রেজেন্ট (১৮৫৩-৭৬) নামের তার ইহুদি ইতিহাসবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে গ্রাটজ যুক্তি দেন যে সংস্কার মনস্ক ইহুদিদের সুপারিশ মতো রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করা কিংবা খ্রিস্ট ধর্মের অনুসরণ করার মধ্যে কোনো লাভ নেই। ইহুদি ধর্ম অনিবার্যভাবেই রাজনৈতিক বিশ্বাস। রাজা দাউদের সময় থেকে ইহুদিরা সৃষ্টিশীলভাবে ধর্মকে রাজনীতির সাথে সংযুক্ত করেছে। এমনটি টেম্পল হারানোর পরও ইহুদিরা পবিত্র ভূমির বিকল্প হিসেবে তালমুদ বিকশিত করেছিল। তাওরাত বিশ্বের যেকোনো স্থানের প্রতিটি ইহুদি বাসাকে নিখুঁতভাবে ফিলিস্তিনিতে পরিণত করতে পারত। ৩ অর্থাৎ তাদের রক্তে রয়েছে পবিত্র ভূমি। 'ফলে যে কেউ বলতে পারত যে তাওরাত, জাতি ও পবিত্র ভূমির একটির সাথে অপরটির আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল। তারা অদৃশ্য বন্ধনে অবিভাজ্যভাবে ঐক্যবদ্ধ।' এগুলোর ছিল ঐশী মূল্য, ইহুদি পরিচিতির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তিনি হেসের গবেষণার প্রশংসা করলেও ইহুদিদের ফিলিস্তিনে অভিবাসনের পক্ষে কথা বলেননি। তিনি পবিত্র নগরী সফরের সময় জেরুসালেমের পশ্চাদমুখী ধারণায় বিশ্বাসী ইহুদি ও সেখানকার চরম নোংরা পরিবেশ নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে ছিলেন। জায়নবাদী স্বার্থের প্রতি তার অবদান ছিল তার গ্রন্থ হিস্টরি। এই গ্রন্থ ইহুদিদের একটি পুরো প্রজন্মকে শিক্ষিত করে, তাদেরকে আধুনিক দর্শনের আলোকে তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে।

ফিলিস্তিন ও জেরুসালেমের ইতিহাসে ১৮৮১-৮২ সময়কালটি ছিল মাইলফলক। প্রথমত, ব্রিটিশরা মিসর জয়ের মাধ্যমে এই অঞ্চলে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। আসন্ন সংগ্রামে তারা ভাগ্য নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। মিসরীয় অভিযানে অন্যতম নায়ক ছিলেন জেনারেল চার্লস 'চাইনিজ' গর্ডন। খার্তুম পতনের পর সুদানে তাকে হত্যা করা হয়। জেরুসালেমে তার প্রধান অবদান ছিল 'গার্ডেন টম্ব' আবিষ্কার। হলি সেপালচার চার্চের প্রতি বিরক্ত অনেক ইউরোপিয়ান এই সেকেলে ভবনটিকে ক্রুদ্ধ, অমার্জিত সন্ন্যাসীদের সাথে তাদের ধর্মের নির্মল মরমিবাদের সাথে মেলাতে পারেননি। জেরুসালেম নিয়ে উইলসনের অর্ডন্যান্স জরিপ পাঠ করে গর্ডন লক্ষ করেন যে নক্সা রেখাগুলোর একটি নারীদেহের মতো, যা 'মাথাটি' দামাস্কাস গেটের উত্তরের ছোট একটি পাহাড়। এটি অবশ্যই 'খুলির স্থান' (প্লেস অব দি স্কাল) হবে। তিনি তার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর আস্থা রেখে সেখানে দৃশ্যত প্রাচীন পাথর কবর দেখতে পান। তিনি সাথে সাথে পাহাড়টিকে গলগোথা এবং কবরটিকে খ্রিস্টের কবর হিসেবে চিহ্নিত করেন। তার মৃত্যুর পর গার্ডেন টম্ব পরিণত হয় প্রটেস্ট্যান্ট পবিত্র স্থান। এটি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্মৃতিসৌধ। এটি জেরুসালেমের ইতিহাস স্থায়ীভাবে বদলে দিয়েছিল।

রাশিয়ায় ১৮৮২ সালে ভয়াবহ ইহুদি নির্যাতন (প্রগ্রোম) ছড়িয়ে পড়ার পর ফিলিস্তিনে প্রথম দিককার জায়নবাদী কলোনিগুলো গড়ে ওঠে। তবে এগুলো জেরুসালেমে নয়, গ্রামীণ এলাকায় ছিল। এসব কলোনি সমাজবাদী আদর্শে পরিচালিত হতো। এগুলো সফল না হলেও ফিলিস্তিনকে বদলে দেওয়া ইহুদি উদ্দীপনা একটি স্থানীয় প্রকৃতি লাভ করে, মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। প্যাট্রিয়ার্কদের ভূমিতে জায়নবাদ বাস্তব অস্তিত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৮৯৯ সালে সুইজারল্যান্ডের ব্রাসেলসে প্রথম সম্মেলনের মাধ্যমে জায়নবাদীরা তাদের প্রথম আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম লাভ করে। প্রথম দিকের এসব জায়নবাদীর অনেকে সেক্যুলারপন্থী হলেও এবং তারা ঐতিহ্যবাদী ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসে আর বিশ্বাসী না হলেও তারা তাদের আন্দোলনকে পবিত্র নগরীর অন্যতম প্রাচীনতম নামে অভিহিত করত, যা দীর্ঘ দিন মুক্তির ভাবমূর্তি ছিল। তারা প্রচলিত ইহুদি কল্পনাচিত্রে তাদের আদর্শগুলো প্রকাশ করত। এ কারণে জায়নবাদের মুখপাত্রে পরিণত হওয়া থিওডোর হারজলকে মঞ্চে উঠতে দেখে বেশ উদ্দীপ্ত হয়েছিল। তাকে 'সকল কিংবদন্তির গৌরব নিয়ে হঠাৎ করে কবর

থেকে ওঠে আসা রাজা দাউদ পরিবারের কোনো এক সদস্যের' মতো লাগছিল বলে স্মৃতিচারণ করেছিলেন ওযেসা থেকে যাওয়া প্রতিনিধি মরডেচাই বেনঅ্যামি। মনে হচ্ছিল দুই হাজার বছর ধরে আমাদের জনগণ যে স্বপ্নকে লালন করে আসছিল, সেটি অবশেষে সত্যে পরিণত হলো, দাউদের সন্তান মেসাইয়া আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। ১৫

হারজল অবশ্য মৌলিক চিন্তাবিদ ছিলেন না। অবশ্য তার গ্রন্থ দি ইহুদি স্টেট (১৮৯৬) জায়নবাদী ক্লাসিকে পরিণত হয়েছিল। তিনি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিও ছিলেন না। তিনি একীভূত হওয়ার আদের্শ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, এমনকি খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনাও গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তবে তিনি ফ্রান্সের ড্রেফাস ঘটনায় মর্মাহত হয়েছিলেন। এতে ইহুদি লোকজনের রক্ষাকবচ না থাকার বিষয়টিই ফুটিয়ে তুলেছিল। আসন্ন সেমিটিকবিরোধী বিপর্যয় তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন (যথার্থভাবে)। তিনি ইহুদিদের জন্য একটি স্বর্গভূমি পাওয়ার চেষ্টায় কঠোর পরিশ্রম করে যান। গণসংযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি সুলতান, পোপ, কায়সার, ব্রিটিশ উপনিবেশিক সচিবের সাথে ছুটে যান। এর মাধ্যমে তিনি জায়নবাদকে বিশ্বের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে পরিচিত করতে সক্ষম হন। নতুন ইহুদি রাষ্ট্র ফিলিস্তিনেই হতে হবে, এমনটি তিনি বিশ্বাস করতেন না। তার মতে উগান্ডায় হতে পারে এমন একটি রাষ্ট্র। কিন্তু দ্বিতীয় জায়নবাদী সম্মেলনে তার প্রস্তাবটি প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়লে তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন। নেতৃত্ব ধরে রাখার জন্য হারজলকে তার আইডিয়াটিকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। তিনি প্রতিনিধিদের সামনে তার ডান হাত উঁচু করে সাম থেকে এ কথাগুলো উদ্ধৃত করেন : 'আমি যদি ভুলে যাই, হে জেরুসালেম, আমার ডান হাত যেন শুকিয়ে যায়!'

অবশ্য ১৮৯৮ সালে হারজল যখন সত্যিই জেরুসালেম সফর করেছিলেন, তিনি তেমন অভিভূত হননি। বরং তিনি এর 'দুর্গন্ধময় অলিগলিতে দুই হাজার বছরের অমানবিকতা, অসহিষ্ণুতা ও অন্যায়ের নোংরা স্তূপে আতঙ্কিত হয়েছিলেন।' তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, জায়নবাদীরা যদি কখনো জেরুসালেমের নিয়ন্ত্রণ পায়, তবে তাদের প্রথম কাজ হবে এসব পরিষ্কার করা।

ঐশী নয়, এমন সবকিছু আমি পরিষ্কার করে ফেলব, শ্রমিকদের বাড়িঘর নগরীর বাইরে নিয়ে যাব, ফাঁকা ও নোংরা ইঁদুরের গর্তগুলো ভরাট করে দেব, ঐশী নয় এমন ধ্বংসাবশেষ জ্বালিয়ে দেব, সব স্থানে বাজার বসাব। তারপর পুরনো স্থাপত্য স্টাইলগুলো যতটা সম্ভব রেখে দেব এবং আলো-বাতাসে ভরপুর, স্বস্তিদায়ক, যথাযথ পয়োঃপ্রণালী বানাব, পবিত্র স্থানগুলোর চারপাশে ঝকঝকে নতুন নগরী নির্মাণ করব। ১৬

কয়েক দিন পর তিনি তার মন পরিবর্তন করেন : তিনি প্রাচীরগুলোর বাইরে একটি নতুন সেক্যুলার নগরী নির্মাণ করে পবিত্র ধর্মস্থানগুলোকে তাদের নিজেদের ছিটমহলে ছেড়ে দেবেন। নতুন সেক্যুলারবাদী আদর্শে এটি ছিল নিখুঁত ভাবমূর্তি : ধর্ম অবশ্যই আলাদা পরিমণ্ডলে থাকবে। প্রাথমিক জায়নবাদী আন্দোলনে জেরুসালেমের পবিত্রতা সামান্য ভূমিকা পালন করেছিল। আন্দোলনের বেশির ভাগ আদর্শবাদীই নগরী ত্যাগ করাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে এর ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোকে তাদের নিজেদের মতো থাকতে দিতে চেয়েছিল। হারজল মনে করতেন, মুক্তি উপর থেকে আসবে না : এটি থাকবে নগরীর বাইরে নির্মাণ করতে ইচ্ছুক সাহসী নতুন নগরীতে। 'চারপাশের পাহাড়ের ঢালগুলোতে প্রশস্ত, সবুজ বেষ্টনি' হবে 'নতুন জেরুসালেমের গৌরবময় স্থান। ইহুদি ধর্মের পুরনো ধর্মীয় ঐতিহ্য পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। এর পরপরই ওয়েস্টার্ন ওয়াল পরিদর্শন করে ইহুদিদের জঘন্য বেদনাময় ও ভীরু দৃষ্টিভঙ্গিতে হারজল তার বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেন। তার দৃষ্টিতে এসব ইহুদি এমনসব প্রতীকী পাথর আঁকড়ে ধরে থাকে, যেগুলো থেকে জায়নবাকে অবশ্যই উর্ধ্বে ওঠতে হবে।

অবশ্য, ওই প্রতিক্রিয়া সব জায়নবাদীর ছিল না। ওয়েস্টার্ন ওয়াল প্রথমবারের মতো দেখে শিশুর মতো কেঁদেছিলেন মোরদেচাই বেন হিলেল। এটি ছিল ইহুদি জাতির মতো টিকে থাকা অবশিষ্ট স্মারক, এর শক্তি তথ্য বা যুক্তি থেকে আসেনি, এসেছে 'কিংবদন্তি' থেকে যা প্রবল মানসিক শক্তি বিচ্ছুরণ করে।১৮ লেখক এ এস হিসবার্গেরও একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল ১৯০১ সালে জেরুসালেম সফর করার সময়। মাগরেবি কোয়ার্টার দিয়ে হাঁটার সময় তিনি অস্বস্তি পড়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলেন। তবে ওয়েস্টার্ন ওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে সেফারদিক চৌকিদারের দেওয়া প্রার্থনা গ্রন্থ হাতে নেওয়া মাত্র তিনি

অনিয়ন্ত্রিত কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি প্রবল ধাক্কার শিকার হয়েছিলেন। পরে তিনি তার অস্তিত্ব নিয়ে স্মৃতিচারণ করে বলেছেন : 'আমার সব ব্যক্তিগত ঝামেলা আমাদের জাতির দুভার্গের সাথে মিলে গিয়ে একটি প্রবল ধারার সৃষ্টি করে।' প্রাচীরটি একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। শিকড়হীনতা আর নিঃসঙ্গতায় আক্রান্ত সেক্যুলার ইহুদিদের বেশির ভাগের জন্যই এটি ছিল আরোগ্যকারী ক্ষমতাসম্পন্ন। এর শক্তিতে তারা বিস্মিত হয়েছিল, তাদের হৃদয়-মন জয় করেছিল।

রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ থেকে জায়নবাদী নতুন বসতি স্থাপনকারীদের নতুন ঢেউ ১৯০২ সালে ইসরাইলে আসতে শুরু করে। তারা ছিল সেক্যুলার বিপ্লবী। তারা সমাজবাদী আদর্শে ছিল নিবেদিতপ্রাণ। তাদের একজন হলেন তরুণ ডেভিড বেন-গুরিয়ান। এই অভিবাসনকে 'সেকেন্ড আলিয়া' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটি এই আন্দোলনের ইতিহাসকে বদলে দিয়েছিল। বেন-গুরিয়ান ধার্মিক ছিলেন না। তার নতুন জেরুসালেম ছিল সমাজবাদী সংস্করণ। তার স্ত্রী পলার কাছে তিনি লিখেছিলেন : 'কষ্ট ও চোখের পানিতে তুমি উঁচু পর্বতে উঠবে, তা থেকে নতুন দুনিয়ার দৃশ্যপট দেখবে, সর্বোচ্চ সুখ ও গৌরবময় অস্তিত্বের শ্বাশত নতুন আদর্শের শিখার উজ্জ্বলতা দেখতে পাবে। তাদের সেক্যুলার বিশ্বাস সাধারণভাবে ধর্মের সাথে থাকা পরমানন্দ নিয়ে এসব বসতি স্থাপনকারীদের পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। তারা ফিলিস্তিনে তাদের অভিবাসনকে আলিয়া হিসেবে অভিহিত করার প্রধান কারণ ছিল এটি ছিল ইসরাইল ভূমিতে তাদের প্রত্যাবর্তনের ঐতিহ্যবাহী পরিভাষা। অবশ্য এটি উচ্চতর স্তরে আরোহণের প্রতীকও প্রকাশ করেছিল। অবশ্য তাদের মতে পবিত্রতা ভূমিতে বাস করে, স্বর্গে নয়। এসব জায়নবাদীর কেউ কেউ জেরুসালেমে বসতি স্থাপন করেছিল। অবশ্য অনেকেই হারজলের বিতৃষ্ণার সাথেও একমত ছিল। ১৯০৯ সালে আরব বন্দর জাফার পাশে তারা তেল আবিব নির্মাণ শুরু করে। এই নগরী তাদের নতুন ইহুদি ধর্মের প্রদর্শন কেন্দ্রে পরিণত হয়।

বসতি স্থাপনকারীদের বেশির ভাগই ছিল শহরবাসী। অবশ্য জায়নবাদী উপাসনালয়ে তারা কখনো কিবুতজিমের বসতি স্থাপনকারীদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এসব সম্মিলিত

খামারের প্রথমটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯১১ সালে গ্যালিলির দাগ্যানিয়ায়। জায়নবাদী তাত্ত্বিক নাহুম সোলোলভ মন্তব্য করেছেন : 'মধ্যাকর্ষণের মূল বিন্দুটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জেরুসালেম থেকে স্থানান্তরিত হয়ে খামার আর কৃষি স্কুল, মাঠ আর তৃণভূমিতে চলে গেছে।২১ প্রাচীন ইসরাইল যেভাবে জেরুসালেমের বাইরে থেকে এসেছিল, একইভাবে নতুন ইসরাইলও পবিত্র নগরীতে নয়, বরং গ্যালিলির কিবুবতজিমে গঠিত হয়েছিল।

অবশ্য জেরুসালেম তখনো ছিল একটি প্রতীক। এর ছিল এসব সেক্যুলার জায়নবাদীকে উদ্দীপ্ত করার শক্তি। এই শক্তিতেই তারা নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করার সংগ্রাম করেছিল, যদিও তারা নশ্বর বাস্তবতা হিসেবে নগরীর জন্য তাদের সময় ছিল খুবই কম। আইজ্যাক বেন-জভি রাশিয়ায় একটি বিপ্লবী সমাবেশে বক্তৃতা করার সময় জায়নবাদ গ্রহণ করেন। পরে তিনি ইসরাইল রাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তিনি হঠাৎ করেই তার আশপাশের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভুল স্থানে অবস্থান করার বিষয়টি অনুভব করেন। তিনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি এখানে কেন, সেখানে নয় কেন?' তারপর তিনি একটি স্বপ্নাবিভাব লাভ করেন। 'আমার মনের চোখ খুলে গেল, ধ্বংসস্তূপ, সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পবিত্র নগরী জেরুসালেমের জীবন্ত ছবি দেখলাম।' ওই মুহূর্ত থেকে তিনি আর রাশিয়ায় বিপ্লবের কথা ভাবেননি, বরং ভেবেছেন কেবল 'আমাদের জেরুসালেম' নিয়ে। তিনি বলেন, 'ঠিক ওই মুহূর্ত থেকে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমাদের স্থান হচ্ছে ইসরাইল ভূখণ্ডে। আমাকে অবশ্যই সেখানে যেতে হবে, আমার জীবনকে নিবেদন করতে হবে এটি গড়ে তোলার জন্য এবং তা করতে হবে যত দ্রুত সম্ভব।'২২ তিনি তার সত্যিকারের পথ আবিষ্কার করেন, বিশ্বে তার নিজের স্থান খুঁজে পান।

আরব ও ইহুদিদের মধ্যকার আধুনিক সঙ্ঘাতের বীজ এর আগেই বিশ শতকের শুরুতে বপণ করা হয়ে গিয়েছিল।

সমস্যা হলো জেরুসালেম এর সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন' ছিল না। তার সন্তানেরা আগে থেকেই ছিল। তারা কয়েক শ' বছর ধরে বাস করছিল, নগরীর ব্যাপারে তাদেরও নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল। আর বেন-জভি যেভাবে কল্পনা করেছেন, নগরটি তেমন বিধ্বস্তও ছিল না। ১৮৭০-এর দশক থেকে ১৪টি নতুন উপশহর গড়ে ওঠেছিল। জেরুসালেমে ছিল

আধুনিক শপিং আর্কেড, জাফা গেটে ছিল হোটেল, ঝকমকে পার্কে বিকেলগুলোতে মিউনিসিপ্যালের ব্যান্ড সঙ্গীত পরিবেশন করত, জাদুঘর ছিল, থিয়েটার ছিল, ছিল আধুনিক ডাকঘর, টেলিগ্রাফব্যবস্থা। পবিত্র নগরী থেকে জাফাকে সংযুক্তকারী একটি নতুন ক্যারেজ রোড ছিল। একটি রেলওয়ে উপকূল থেকে সফরকারীদের বাকা ভ্যালিয়ে বয়ে আনত। জেরুসালেম গর্ব করার মতো নগরীতে পরিণত হয়েছিল। আরব অধিবাসীরা তুর্কি দখলদারিত্ব নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল। তারা জায়নবাদী বসতি স্থাপনকারীদের আগমনে শঙ্কিতও ছিল। ১৮৯১ সালে জেরুসালেমের অভিজাত সম্প্রদায় ইস্তাম্বুলে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে ইহুদি অভিবাসন বন্ধ ও জায়নবাদীদের কাছে জমি বিক্রি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে একটি আবেদন দাখিল করে। ইউসুফ আল-খালিদির শেষ পরিচিত রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল হারজলের বন্ধু রাব্বি জাদক কানের কাছে একটি পত্র লেখা। তাতে তিনি ফিলিস্তিনকে নিজের মতো করে থাকার সুযোগ প্রদান করার জন্য তার কাছে অনুনয় করেন। তিনি বলেন, জেরুসালেমে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমেরা একসাথে বাস করতে সক্ষম হয়েছে। এসব জায়নবাদী প্রকল্প এই সহাবস্থানকে নস্যাৎ করে দেবে। ১৯০৮ সালে ইয়ং তুর্কি বিদ্রোহের পর ফিলিস্তিনের আরব জাতীয়তাবাদীরা তাদের তুর্কি দখলমুক্ত নিজস্ব আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ১৯১৩ সালে প্রথম আরব কংগ্রেসের সময় নিকট প্রাচ্যের ৩৮৭ আরবের সই হওয়া একটি সমর্থক টেলিগ্রাম আসে। সইকারীদের মধ্যে ১৩০ জনই ছিলেন ফিলিস্তিনি। ১৯১৫ সালে বেন গুরিয়ান ফিলিস্তিন নিয়ে এসব আরব আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে সচেতন হন। তার দৃষ্টিতে তারা ছিলেন খুবই গোলযোগ সৃষ্টিকারী। তিনি পরে বলেছিলেন, 'এটি বোমার মতো আমাকে আঘাত করেছিল। আমি চরম বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ২৩ অবশ্য ইসরাইলি লেখক অ্যামোস এলোন আমাদেরকে বলেন যে এই বোমার আঘাত সত্ত্বেও বেন-গুরিয়ান ফিলিস্তিনি আরবদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা অব্যাহত রাখেন। এর দুই বছর পর তিনি অবাক করা পরামর্শ দেন যে 'ঐতিহাসিক ও নৈতিক দিক থেকে' ফিলিস্তিন ছিল 'অধিবাসীবিহীন' একটি দেশ।২৪ ইহুদিরা একে নিজ দেশ মনে করায় ওই দেশের অন্য সব অধিবাসীকে স্রেফ বিভিন্ন বিজয়ীর জাতিগত বংশধর মনে করা হতো। বেন-গুরিয়ান আরব ও অন্য ব্যক্তিদের কল্যাণ কামনা করলেও মনে করতেন যে জাতি হিসেবে তাদের কোনোই অধিকার নেই। জেরুসালেমের মতো ইসরাইল ভূমিও ইহুদিদের মনে গেঁথে

ছিল। এমনকি বেন- গুরিয়ানের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নাস্তিকও তার চেহারার সামনে ভাসতে থাকা জনসংখ্যাগত ও ঐতিহাসিক তথ্যগুলোর চেয়ে এর পবিত্র অবস্থান তার আবেগগত মানচিত্রে অনেক বেশি স্থানজুড়ে ছিল। যদিও এই প্রবল অস্বীকার অল্প সময়ের মধ্যেই অবধারিতভাবেই কিছু কঠিন বাস্তবতার মুখে পড়েছিল। এর আংশিক কারণ ছিল অস্বীকার। তা ইহুদি ও আরবদের মধ্যে মর্মান্তিক স্বার্থের সঙ্ঘাত সৃষ্টি হচ্ছিল।

বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে ১৯১৪ সালে। ফরাসি ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তুর্কিরা জার্মানদের পক্ষে অবস্থান নেয়। জেরুসালেম হয় তুর্কি অষ্টম কোরের সদরদফতর। ১৯১৫ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যা ভবিষ্যতের বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দেয়। এ ঘটনা জেরুসালেমের ইতিহাসে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সরকারি তুর্কি নীতিতে আর্মেনিয়ান জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যার কথা বলা হয়। জেরুসালেমে আর্মেনিয়ানরা দীর্ঘ সময় নিম্ন মর্যাদার কাঘাকাতসিরা নির্যাতনের শিকার হয়নি। সরকারি পদমর্যাদায় থাকা লোকজন তাদের পদ থেকে বঞ্চিত হলেও আর্মানিয়ান মহল্লায় তাদের পারিবারিক জীবন স্বাভাবিকই ছিল। তবে ব্যতিক্রম ছিল এই যে কেবল তাদের তরুণ সদস্যদের তুর্কি সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে হতো। উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে আর্মেনিয়ানদের নির্দয়ভাবে ধ্বংস করা হয়। এই গণ-হত্যার কোড শব্দ ছিল ‘বহিষ্কার’। পরবর্তীকালে নাৎসি জার্মানিও এই কোড শব্দ ব্যবহার করেছিল। লোকজনকে দল বেঁধে নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে পানিতে ফেলে দেওয়া হতো। যারা সাঁতার কেটে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করত, তাদেরকে সৈন্যরা গুলি করত। খাদ্য ও পানি ছাড়াই মরুভূমিতে লাখ লাখ লোককে ফেলে দেওয়া হতো। এভাবে লাখ লাখ আর্মেনিয়ান মারা যায়। আরো লাখ লাখ লোক নির্বাসনে যায়। তাদের অনেকে জেরুসালেমে গিয়ে আর্মেনিয়ান মহল্লায় ঠাঁই নেয়। উদ্বাস্তুদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে সেন্ট জেমস কনভেন্টে বাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে সেক্যুলারদের সাধারণত এই সুবিধা দেওয়া হতো না। বিশ শতকের প্রথম গণহত্যা অনেককে জেরুসালেমের প্রাচীন পবিত্রতায় আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ব্রিটিশরা ১৯১৬ সালে সিদ্ধান্ত নেয় যে নিকট প্রাচ্যে একটি দর্শনীয় জয় ফ্রান্সের পরিখা যুদ্ধকৌশলের অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে পারে। ব্রিটিশ ইজিপ্টিয়ান এক্সপেডিশনারি ফোর্স সরে যায় সিনাই উপদ্বীপে। তবে তারা গাজায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তুর্কি প্রতিরোধের মুখে পড়ে। জেনারেল মারের স্থলাভিষিক্ত হওয়া

জেনারেল অ্যাডওয়ার্ড অ্যালেনবাই প্রধানমন্ত্রী লয়েড ‘জর্জকে ব্রিটেনের জনগণের জন্য ক্রিসমাস উপহার হিসেবে জেরুসালেম জয় করতে বলেন। অ্যালেনবাই সতর্কতার সাথে পিইএফ প্রকাশনাগুলো অধ্যায়ন করেন : এক শ’ বছর আগে নেপোলিয়নের অভিযানের সময়ও সামরিক দখলদারিত্বের প্রস্তাবনা ছিল বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে অ্যালেনবাই গাজা দখল করে জেরুসালেমের দিকে অগ্রসর হন। গভর্নর জামাল পাশা তুর্কিদেরকে নগরী ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। ৯ ডিসেম্বর মেয়র হোসাইন সেলিম আল-হোসাইনি নগরী ত্যাগ করার একমাত্র কর্তৃপক্ষ ছিলেন। তিনি আর্মেনিয়ান মিশনারি থেকে একটি সাদা চাদর ধার করে ছোট ছেলেদের একটি শোভাযাত্রা নিয়ে জাফা গেট দিয়ে পুরনো নগরী ত্যাগ করেন। তিনি বিস্ময়াভূত দুই ব্রিটিশ স্কাউটের কাছে জেরুসালেম সমর্পণ করেন। ১১ ডিসেম্বর অ্যালেনবাই জাফা গেটে পৌঁছালে তাকে নগরীতে স্বাগত জানাতে নগরীর ঘণ্টাগুলো বেজে ওঠে। জেরুসালেমের পবিত্রতার প্রতি সম্মান দেখাতে অ্যালেনবাই ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে নগরীতে প্রবেশ করেন। তিনি দুর্গের সিঁড়িতে অবস্থান করেন। তিনি ‘আশীর্বাদপুষ্ট জেরুসালেমের অধিবাসীদের আশ্বাস দেন যে তিনি পবিত্র স্থানগুলো রক্ষা করবেন, মহামান্য সরকারের নামে ইব্রাহিমের তিন ধর্মের অনুসারী সবার ধর্মীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখবেন। তিনি ক্রুসেডাদের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

ইসরাইল

জেরুসালেমের দীর্ঘ ও মর্মান্তিক ইতিহাসে নগরীকে অনেকবার ধ্বংস করা হয়েছে, পুনঃনির্মাণও করা হয়েছে। ব্রিটিশদের আগমনে নগরীটি আরেক দফা পরিবর্তনের বেদনাদায়ক পর্বের মুখে পড়ে। ক্রুসেডার দখলদারিত্বের সংক্ষিপ্ত সময় বাদ দিলে জেরুসালেম প্রায় ১৩ শত বছর ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি নগরী হিসেবে বহাল ছিল। এখন সেই উসমানিয়া সাম্রাজ্য বিজিত হয়েছে, এই অঞ্চলের আরবদেরকে তাদের স্বাধীনতা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। প্রথমে ব্রিটিশ ও ফরাসিরা নিকট প্রাচ্যে ম্যান্ডেট ও প্রটেকটোরেট প্রতিষ্ঠা করলেও একে একে আরব রাষ্ট্র ও রাজতান্ত্রিক দেশ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এগুলো হচ্ছে জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া, মিসর ও ইরাক। এ প্রেক্ষাপটে অন্য সব কিছু একই রকমের থাকলে ফিলিস্তিনও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারত। আর গুরুত্বপূর্ণ নগরী হিসেবে জেরুসালেম হতে পারত এর রাজধানী। কিন্তু তা ঘটেনি। ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের সময় জায়নবাদীরা নিজেদেরকে দেশটিতে প্রতিষ্ঠা করে একটি ইহুদি রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। জেরুসালেম ধর্মীয় ও কৌশলগত মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিরাজ করে। এর মালিকানা নিয়ে ইহুদি, আরব ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিরোধে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৭ সালে ইহুদি সামরিক ও কূটনৈতিক উদ্যোগই সফল হয়, জেরুসালেম হয় ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের রাজধানী। বর্তমান সময়ে জেরুসালেমের আরব বৈশিষ্ট্য হলো অ্যালেনবাই ও তার সৈন্যদের নগরীতে প্রবেশ করার সময়কার ছায়ামাত্র।

জায়নবাদী বিজয় ছিল একটি নজিরবিহীন পশ্চাদগমন। ১৯১৭ সালে ফিলিস্তিনের মোট জনসংখ্যার ৯০ ভাগ ছিল আরব, জেরুসালেমের জনসংখ্যার ৫০ ভাগের সামান্য কম ছিল তারা। ইহুদি ও আরবরা অবাক দৃষ্টিতে পেছনের ঘটনার দিকে তাকায়। বিপুল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জায়নবাদীরা তাদের সাফল্যকে প্রায় আশ্চর্য ঘটনা মনে করে; আরবরা তাদের পরাজয়কে বলে আল-নাকবা। এই শব্দটি দিয়ে আসমানি গজবের কাছাকাছি পর্যায়ের কিছু প্রকাশ করতে চায় তারা। সংগ্রামের লিখিত ভাষ্যের ব্যাপারে উভয় পক্ষের অতি সরলিকরণ বিস্ময়কর কিছু নয়। তারা একে নায়ক আর খলনায়ক হিসেবে বর্ণনা করে, সম্পূর্ণ ভালো আর মন্দ হিসেবে বিবেচনা করে, আল্লাহ ইচ্ছা বা

আসমানি গজব হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা ছিল অনেক বেশি জটিল। মূলত জায়নবাদী নেতাদের দক্ষতা ও সম্পদের মাধ্যমেই ফলাফল নির্ধারিত হয়েছে। তারা প্রথমে ব্রিটিশ ও পরে আমেরিকান সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এসব নেতা কূটনৈতিক-প্রক্রিয়ার ধূর্ত-চালবাজি বুঝতে পেরেছিলেন। যখন কোনো পরাশক্তি তাদেরকে কিছু দিতে চাইত, প্রায় সবসময়ই তারা তা গ্রহণ করতেন, এমনকি তা যদি তাদের চাহিদা বা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কমও হতো। তবে শেষ পর্যন্ত তারা সবকিছুই পেত। জায়নবাদীরা তাদের নিজস্ব আন্দোলনের মধ্যে থাকা আদর্শগত বিভক্তিও উত্রাতে সক্ষম হয়। আরবরা ততটা সৌভাগ্যবান ছিল না। উসমানিয়া সাম্রাজ্যের হঠাৎ করে দুঃখজনক পতন ও ব্রিটিশদের আগমনে বিচলিত ফিলিস্তিনি আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাস্তব রাজনৈতিক যৌক্তিকতা ও অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারেনি। অথচ একদিকে ইউরোপিয়ান ও অন্য দিকে জায়নবাদীদের মোকাবিলা করার জন্য এর দরকার ছিল খুবই বেশি। তারা প্রবল টেকসই প্রতিরোধ গড়তে পারেনি, আবার পাশ্চাত্য কূটনীতির পদ্ধতিগুলোতেও অভ্যস্ত ছিল না। তারা অব্যাহতভাবে তাদেরকে দেওয়া যেকোনো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করত এই আশায় যে প্রত্যাখ্যানের দৃঢ় ও আপসহীন নীতি জনসংখ্যাগত ও ঐতিহাসিকভাবে তাদের অধিকার বলে মনে হওয়া এলাকায় স্বাধীন আরব রাষ্ট্রের নিশ্চিত অধিকার পেয়ে যাবে। শুরুতে তারা বোকার মতো মনে করেছিল যে তাদের প্রতি ব্রিটিশদের কল্যাণকর উদ্দেশ্য রয়েছে। তাদের বারবারের ভেটোর ফলে তারা শেষ পর্যন্ত কিছুই পায়নি এবং ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর গৃহহীন, সমূলে উচ্ছেদ ও অধিকারহারা ফিলিস্তিনিদের স্থলাভিষিক্ত হয় অধিকারহারা, সমূলে উচ্ছেদ ও ভাসমান ইহুদিরা।

ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের সময় জেরুসালেম মন্থর ও বেদনাদায়ক এমন এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় যা একে আরব নগরী থেকে ইহুদি প্রাধান্যপূর্ণ নগরীতে পরিণত করে।

ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য ও নীতিও ছিল বিভ্রান্তিকর ও সন্দেহজনক। উভয় পক্ষের কাছেই ব্রিটিশদের উদ্দেশ্যে পূরণের সাথে কাজ করা কঠিন বলে মনে হয়। মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার আরব ও ইহুদি উভয়কেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ১৯১৫ সালে তুর্কিদের

বিরুদ্ধে হিজজের আরবদের বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করতে মিসরের হাইকমিশনার স্যার হেনরি ম্যাকমোহন মক্কার শরিফ হোসাইন ইবনে আলীকে প্রতিশ্রুতি দেন যে আরব দেশগুলোর ভবিষ্যত স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেবে ব্রিটেন। এর ফলে পবিত্র স্থানগুলো একটি 'স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে। ফিলিস্তিন বা ইসলামের তৃতীয় পবিত্র স্থান জেরুসালেমের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। ম্যাকমোহনের প্রতিশ্রুতি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুস্বাক্ষর করা চুক্তি ছিল না, বরং এতে চুক্তির তাৎপর্য ছিল। ১৯১৬ সালে হোসাইন যখন টি ই লরেন্সের সহায়তায় আরব বিদ্রোহের ঝান্ডা উড়ালেন, তখন তেমনই মনে হয়েছিল। ম্যাকমোহনের এই চুক্তি নিয়ে আলোচনা করার সময়ই ব্রিটেন ও ফ্রান্স গোপন সাইকিস-পিকট চুক্তি নিয়ে কথাবার্তা বলছিল, যাতে উপদ্বীপের উত্তরে পুরো আরব বিশ্বকে ব্রিটিশ ও ফরাসি জোনে ভাগ করার কথা ছিল।

তারপর অ্যালেনবাইয়ের জেরুসালেম জয়ের ঠিক এক মাস পর ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ তার পররাষ্ট্রসচিব আর্থার বেলফোরকে নির্দেশ দেন এই ঘোষণা-সংবলিত একটি চিঠি লিখতে লর্ড রথচাইল্ডকে :

মহাহান্য সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদি জনগণের জন্য জাতীয় আবাসভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। আর এই লক্ষ্য হাসিলে সরকার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবে। তবে এটিও স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে যে ফিলিস্তিনে বিদ্যমান অ-ইহুদি সম্প্রদায়গুলোর বেসামরিক ও ধর্মীয় অধিকারগুলো কিংবা অন্য কোনো দেশের ইহুদিদের ভোগ করা অধিকার ও রাজনৈতিক মর্যাদা সংস্কারে কিছু করা হবে না।

.

ব্রিটেন দীর্ঘ দিন ফিলিস্তিনে ইহুদিদের ফেরানোর কল্পনা লালন করেছে। ১৯১৭ সালে বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে তাদের কৌশলগত বিবেচনাগুলোও হয়তো কাজ করেছে। কৃতজ্ঞ ইহুদিদের ব্রিটিশ প্রটেক্টরেট হয়তো ওই অঞ্চলে ফরাসি উচ্চাভিলাষকে প্রতিরোধ করবে বলে মনে করা হয়েছিল। তবে বেলফোর তার সরকারের দেওয়া অত্যন্ত সজ্ঘাতপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলোর ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। ১৯১৯ সালের আগস্টে এক স্মারকে তিনি উল্লেখ করেন যে

ব্রিটেন ও ফ্রান্স জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে নিকট প্রাচ্যে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে ফিলিস্তিনে 'আমরা দেশটির বর্তমান অধিবাসীদের ইচ্ছার আলোকে কোনো কিছু করার প্রস্তাব করছি না।'

জায়নবাদের প্রতি চারটি পরাশক্তি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর প্রাচীন ওই ভূমিতে বর্তমানে বসবাসরত সাত লাখ আরবের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও পছন্দ-অপছন্দের চেয়ে ভুল হোক বা ঠিক হোক, ভালো হোক বা মন্দ হোক, জায়নবাদ দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য বর্তমানের জন্য প্রয়োজনীয় ও ভবিষ্যতের জন্য ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনায় শিকড় গেড়ে রয়েছে।

অবাক করা উদাসিন্যে বেলফোর সমাপ্তি টানলেন যে 'ফিলিস্তিন সম্পর্কে বলা যায়, শক্তিগুলো এমন কোনো বক্তব্য দেয়নি, যা স্পষ্টভাবেই ভুল। লঙ্ঘন করা হতে পারে- এমন কোনো উদ্দেশ্যে তারা কোনো ধরনের বক্তব্য দেয়নি। ২ প্রশাসনের করা পরিষ্কার, সুস্পষ্ট বক্তব্যে এটি অর্থহীন কথা ছিল না।

ফিলিস্তিন ও জেরুসালেম ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২০ সালের জুলাই পর্যন্ত ছিল ব্রিটিশ সামরিক নিয়ন্ত্রণে (অধিকৃত শত্রু এলাকার প্রশাসন)। সামরিক গভর্নর ছিলেন লে. কর্নেল রোন্যাল্ড স্টরস। তিনি ১৯১৬ সালের আরব বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার প্রথম কর্তব্য ছিল নগরীতে যুদ্ধে বিধ্বস্ত এলাকা মেরামত করা। পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়েছিল, পরিষ্কার পানির কোনো ব্যবস্থা ছিল না, রাস্তাগুলো আর চলাচল উপযোগী ছিল না। ব্রিটিশরা পবিত্র স্থানগুলোর পরিচালনার দায়দায়িত্ব নিয়ে অনেক বেশি আচ্ছন্ন ছিল। আর ভদ্র, মার্জিত ব্যক্তিত্ব স্টোর্স জেরুসালেমকে ভালোবাসতেন। তিনি ঐতিহাসিক স্থানগুলো সুরক্ষা করতে প্রো-জেরুসালেম সোসাইটি গঠন করেন তিন ধর্মের ধর্মীয় লোক ও স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিদের নিয়ে। এই সংস্থা সরকারি ভবন ও স্মৃতিসৌধগুলো মেরামত ও সংস্কারের কাজ সম্পাদন করত। বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে নগর পরিকল্পনা করা ও প্রাচীন স্থানগুলো সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাদেরকে। এই সংস্থার গ্রহণ করা একটি অন্যতম কার্যকর সিদ্ধান্ত ছিল নগরীতে সব নতুন ভবনে অবশ্যই স্থানীয় হলুদাভ পাথর ব্যবহার করতে

হবে। এই নির্দেশ এখনো অনুসরণ করা হয়। এটি জেরুসালেমের সৌন্দর্য সংরক্ষণে সহায়ক হয়।

অবশ্য উত্তেজনাও ছিল। বেলফোর ঘোষণা সম্পর্কে আরবদের আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করা হয়নি। তবে খবরটি ফাঁস হয়ে যায়। খবরটি তাদের কাছে বিস্ময়কর না হলেও সন্দেহজনক ও আতঙ্কমূলক ছিল। তারা লক্ষ করেছে যে সরকারি নোটিশগুলোতে ইংরেজি ও আরবি ভাষার পাশাপাশি হিব্রু ভাষাও চালু করা হয়েছে। এছাড়া প্রশাসনে ইহুদি আমলা ও অনুবাদকও নিয়োগ করা হয়েছে। তবে তারা তখনো আশা করছিল, ব্রিটিশরা তাদের স্বার্থের প্রতি ন্যায়বিচার করবে। স্টোর্সের ১৯১৮ সালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে অন্তত তারা নিশ্চিত প্রাধান্য ধরে রেখেছিল। এতে ছয় সদস্যের মধ্যে প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দুজন করে ছিলেন। তবে মেয়র ছিলেন মুসলিম। স্টোর্স মেয়র পদে নিয়োগ দেন মুসা কাসিম আল-হোসাইনিকে। তার এখন দুজন সহকারী : একজন ইহুদি, অপরজন খ্রিস্টান। এই ব্যবস্থায় ইহুদিরা পুরোপুরি খুশি ছিল না। কারণ তারা এখন নগরীর জনসংখ্যার প্রায় ৫০ ভাগ। আরব মেয়ররা পদটিকে রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে বেলফোর ঘোষণার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন বলে মনে হওয়াতেও তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

বিদেশ থেকেও বৈরী বার্তা আসত। বর্তমানে ব্রিটিশদের জয় করা জেরুসালেম নিয়ে ভ্যাটিকান তার উদ্বেগ প্রকাশ করে জানায়, এটি খ্রিস্টানদের হাতেই থাকা উচিত। খ্রিস্টান ধর্মের বেশির ভাগ পবিত্র উপাসনালয় যদি অ-খ্রিস্টানদের হাতে দেওয়া হয়, তবে তা হবে' মর্মান্তিক ব্যাপার। নবগঠিত জাতিপুঞ্জের ১৯১৯ সালে কিং-ক্রেন প্রতিবেদনে উপসংহার টানে যে বেলফোর ঘোষণা বাস্তবায়ন করা উচিত নয়। এর বদলে ফিলিস্তিনের উচিত হবে সাময়িক কর্তৃত্ব লাভ করে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে সিরিয়ার সাথে যোগ দেওয়া। এই প্রতিবেদন কোনো কাজে আসেনি। এটি যখন বিবেচনার সময় এসেছিল, তখন প্রেসিডেন্ট উইলসনের মনোযোগ ছিল অন্যত্র, এটি শেলফে তুলে রাখা হয়েছিল।

নগরীতে ১৯২০ সালের ৪ এপ্রিল নবী মুসা উৎসবের সময় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিল মামলুকেরা। ওই সময় জেরুসালেম পাশ্চাত্য ক্রুসেডারদের হুমকির মুখে ছিল। নতুন ক্রুসেডার অ্যালেনবাই নগরীতে আসার পর থেকে ফিলিস্তিনের আরবরা মনে করতে থাকল যে আল-কুদস আবার বিপদের মুখে। আরববিশ্বে ক্রুসেডারদের নিয়ে নতুন করে আগ্রহের সৃষ্টি হলো। কুর্দি সালাহউদ্দিন এখন আরব নায়ক বনে গেলেন। আর জায়নবাদীদের নতুন ক্রুসেডার কিংবা অন্তত ক্রুসেডে নিয়োজিত পাশ্চাত্যের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হতে লাগল। নবী মুসা শোভাযাত্রা সবসময়ই প্রতীকভাবে পবিত্র নগরীর নিয়ন্ত্রণ লাভ বলে গণ্য হতো। কিন্তু এবার মুসলিম জনতা প্রথা ভেঙে ইহুদি মহল্লার মধ্য দিয়ে ছুটে গেল। আরব পুলিশ বাহিনী দাঙ্গাকারীর পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে, সহিংসতা শান্ত করতে ব্রিটিশ সৈন্যরা এলো না। ইহুদিরা তাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করার কথা ভুলে গিয়েছিল। হতাহতদের বেশির ভাগই ছিল ইহুদি। ৯ জন নিহত ও ২৪৪ জন আহত হয়েছিল। জেরুসালেমে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও মাঝে মাঝে সহিংসতা ছিল। কিন্তু ১৯২০ সালের দাঙ্গা দেখাল যে পরিস্থিতি আরো অবনতির দিকে যাচ্ছে। এই ঘটনা ইহুদি ও ব্রিটিশদের মধ্যেও ফাটল সৃষ্টি করল। জায়নবাদীরা সাথে সাথে এই নির্যাতনের জন্য স্টোর্স ও প্রশাসনকে দায়ী করল। তাদের মতে, তারা আরবদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছে। এর পর থেকে ইহুদি ও আরব উভয় পক্ষই 'অন্য দলের পক্ষাবলম্বনের জন্য ব্রিটিশদের দায়ী করতে থাকে।

বস্তুত, ব্রিটিশনীতির মধ্যেই সঙ্ঘাতের সহজাত উপাদান ছিল। ১৯২০ সালের এপ্রিলে নিয়োগ পাওয়া ফিলিস্তিনে ম্যান্ডেটরি শক্তিতে পরিণত হয় ব্রিটেন। জাতিপুঞ্জের ধারা ২২-এ জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে ব্রিটেন 'সভ্যতার পবিত্র আমানতের আকারে [ফিলিস্তিনি জনগণের] কল্যাণ ও উন্নয়নের নীতিমালা' প্রয়োগ করবে। তবে ব্রিটিশরা বেলফোর ঘোষণাও বাস্তবায়ন করছিল, ফিলিস্তিনে ইহুদি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার পথও তৈরি করছিল। এই কাজ করার জন্য ও সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়নে (ধারা ৪) সরকারি সংস্থা হিসেবে একটি জিউশ এজেন্সিও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এজেন্সির আরেকটি দায়িত্ব ছিল 'ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনি নাগরিকত্ব পাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য কাজ করা (ধারা ৬) ও

'যথাযথ শর্তে ইহুদি অভিবাসনের ব্যবস্থা করা (ধারা ৭)। এসব পদক্ষেপ কি ফিলিস্তিনে 'অইহুদি সম্প্রদায়গুলোর অধিকারের ওপর কোনো আঘাত সৃষ্টির বিপদ ছিল না?

ফিলিস্তিনে প্রথম বেসামরিক হাই কমিশনার হিসেবে ১৯২০ সালের জুলাই মাসে নিয়োগপ্রাপ্ত স্যার হারবার্ট স্যামুয়েল ছিলেন ইহুদি। এটি জায়নবাদীদের জন্য আশার নিদর্শন হলেও আরবদের কাছে ছিল অলুক্ষুণে বার্তা। স্যামুয়েল ছিলেন বেলফোর ঘোষণার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে তিনি দায়িত্ব পালনের পাঁচ বছর কালে আরবদের জোরালোভাবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেন, তাদের ভূমি কখনো তাদের কাছ থেকে নেওয়া হবে না এবং কোনো ইহুদি সরকার কখনো মুসলিম ও খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসন করবে না। এমন কিছু করা 'বেলফোর ঘোষণার অর্থ নয়।' তবে এসব আশ্বাস আরবদের ভয় প্রশমিত করতে পারেনি, তারা ইহুদিবৈরী হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশ সচিব উইস্টন চার্চিলের ১৯২২ সালের শ্বেতপত্রে একই যুক্তি অবতারণা করা হয় : আরব সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কোনোভাবেই দমন করা হবে না। বেলফোর ঘোষণার ধারণাটি ছিল স্রেফ (সার্বিকভাবে নয়) ফিলিস্তিনের ভেতরে একটি কেন্দ্র সৃষ্টি করা, যেখানে ইহুদিরা কোনো দুর্ভোগ পোহানো ছাড়াই বাঁচতে পারবে। আবারো বলা যায়, কোনো পক্ষই খুশি হয়নি। আরবরা শ্বেতপত্র প্রত্যাখ্যান করে, অবশ্য পরে বেশি কিছু পাওয়া যাবে, এই আশায় ইহুদিবাদিরা তা গ্রহণ করে।

অবশ্য যেভাবেই হোক না কেন, ম্যান্ডেটের অধীনে জেরুসালেম সমৃদ্ধ হচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল। ক্রুসেডের পর প্রথমবারের মতো এটি ছিল ফিলিস্তিনের রাজধানী নগরী। ১৯২০-এর দশকে ইংল্যান্ডের মতো নতুন উদ্যান উপশহর গড়ে ওঠতে থাকে। এগুলো ছিল জেরুসালেমের আশপাশে মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে। তালপিয়ত, রেহাভিয়া, বায়িত বেগান, কিরয়াত মোশে ও বেইত হাকেরেম ছিল ইহুদি এলাকা। এসব এলাকায় পার্ক, খোলা জায়গা ও ব্যক্তিগত উদ্যান ছিল। এগুলো পুরনো নগরীর পশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পুরনো নগরী প্রাচীরের পশ্চিমে একটি নতুন বাণিজ্যিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। গ্রিক অর্থোডক্স প্যাট্রিয়াচেটের কাছ থেকে এই জমি কেনা হয়েছিল : এর প্রধান রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছিল ইতিহাসবিদ ইলিজার বেন-ইয়েহুদার নামে। তিনি

আধুনিক, কথ্য ভাষা হিসেবে হিব্রুর ব্যবহার পুনর্জীবন করেন। একটি দ্বিতীয় বাণিজ্যিক সেন্টারের কাজও শুরু হয় মাহানেহ ইয়েহুদা মার্কেটে। এছাড়া তালবিয়া, কাতামন ও বাকা ও সেইসাথে শেখ জারা ও ওয়াদি আল-যশে অভিজাত আরব এলাকা ছিল। আর ছিল আমেরিকান কলোনি। জেরুসালেমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস ছিল মাউন্ট স্কপাসে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন। বেলফোর এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন। এটি ছিল ফিলিস্তিনে তার প্রথম ও একমাত্র সফর। অনুষ্ঠানজুড়ে তার চিবুক বেয়ে প্রকাশ্যেই গড়িয়ে চোখের পানি ঝরছিল। তবে মনে হয় তিনি লক্ষ করেননি যে জেরুসালেমের রাস্তাগুলোতে আরবরা ধর্মঘট পালন করছে, নীরবে প্রতিবাদ করছে। তারা সুকে শোক প্রকাশের কালো পতাকাও উড়িয়েছিল।

জেরুসালেমে নতুন নতুন নেতার উদয় হয়েছিল। স্যামুয়েলের প্রথম নিয়োগগুলোর একটি ছিল মুফতি হিসেবে হাজি আমিন-আল হোসাইনিকে নিয়োগ। এটি জায়নবাদীদের আতঙ্কিত করেছিল। কারণ হোসাইনি ছিলেন চরমপন্থী আরব জাতীয়তাবাদী। তিনি ১৯২০ সালের দাঙ্গায় নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন। স্যামুয়েল সম্ভবত আশা করেছিলেন, হাজি আমিনকে কো-অপ্ট করার মাধ্যমে তাকে প্রশমিত করতে পারবেন। অবশ্য বেশির ভাগ ব্রিটিশের মতো তিনিও এই তরুণে সত্যিকার অর্থেই অভিভূত হয়েছিলেন। বিনয়ী, স্বল্পবাক, মর্যাদাসম্পন্ন এই নতুন মুফতিকে ক্রোধ-সঞ্চারকারী বলে মনে হতো না। পরের বছর তিনি সুপ্রিম মুসলিম কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন। এই নতুন সংস্থাটিকে গঠন করা হয়েছিল ফিলিস্তিনে ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলো তদারকি করার জন্য। তিনি এটিকেই ভিত্তি বানিয়ে বেলফোর ঘোষণার বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত হলেন। তিনি হারামে একটি নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিলেন। এর মানে হলো, তাকে বিপুল মাত্রায় প্রপাগান্ডা কার্যক্রমে অংশ নিতে হবে। জায়নবাদীরাও তাদের টেম্পল পুনঃনির্মাণের স্বপ্ন দেখছে বলে মুফতি দাবি করলেন। তিনি আরো জানালেন, এতে হারামের ওপর থাকা মুসলিম ইবাদতগাহগুলো অনিবার্যভাবেই বিপদে পড়বে। এসব অভিযোগ জায়নবাদী নেতাদের কাছে কল্পনাবিলাস বলে মনে হলো। তাদের বেশির ভাগই টেম্পলের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ ছিল না, তারা ওয়েস্টার্ন ওয়ালের দিকেও তেমন যেত না। তবে এখন আমরা যা দেখছি, তাতে করে বলা যায়, হোসাইনির ভয় একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না।

হোসাইনির নিয়োগের ফলে জেরুসালেমের আরবেরা পরস্পর বিপরীত অবস্থান নিয়ে দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পরে। চরমপন্থীরা মুফতির দিকে ঝোঁকে, উদারপন্থীরা নতুন মেয়ার রাগিব আল-নাশাশিবির সাথে যোগ দেয়। এই মেয়র জায়নবাদের বিরোধিতা করলেও যখনই সম্ভব কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার নীতিতে বিশ্বাস করতেন। স্যামুয়েল দৃশ্যত স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত ছিলেন যে জেরুসালেম ব্যাপকভাবে ইসলামি নগরী। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল সম্প্রসারিত করা হয়, এখন এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল চারজন মুসলিম, তিনজন খ্রিস্টান ও তিনজন ইহুদি সদস্য। মেয়র অব্যাহতভাবে মুসলিম রয়ে গেছেন। তবে ইহুদিরা যাতে বেশি করে ভোট দিতে পারে, সেজন্য ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করেন স্যামুয়েল। উভয় পক্ষের কাছে নিরপেক্ষ থাকায় হাই কমিমনার কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারেননি। ফিলিস্তিন ও জেরুসালেম নিয়ে জায়নবাদী ও আরবদের পারস্পরিকভাবে বর্জনশীল পরিকল্পনা থাকায় সজ্ঘাত হয়ে পড়ে অনিবার্য।

জায়নবাদীদের স্বাভাবিকভাবেই তাদের নিজস্ব নায়ক ও পথপ্রদর্শক ছিল। ফিলিস্তিনিদের তাদের সংগ্রামে ইন্ধন দিতে নতুন করে কোনো পুরানতত্ত্ব ও মতাদর্শ সৃষ্টির প্রয়োজন পড়েনি। ফিলিস্তিন ছিল তাদের বাড়ি, তারা আল-কুদসে শত শত বছর ধরে বাস করছিল, এর পবিত্রতা উদযাপন করছিল। তাদের ভূমি ও নগরী সম্পর্কে বইপত্র লেখার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না তাদের : প্রিয়তমা স্ত্রীকে নিয়ে কোনো লোকের কি আবেগময় কবিতা লেখার দরকার পড়ে? তবে ফিলিস্তিনকে নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য জায়নবাদীদেরকে বইপত্র লিখতে হয়েছিল। তারা অচেনা, বৈরী বিশ্বে তাদের নিজেদের একটি স্থান খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় দেশটিতে এসেছিল। আলিয়া অবশ্য প্রায়ই যন্ত্রণাদায়ক হতো, বেদনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা দিত। নতুন পথিকৃতদের বেশির ভাগই ১৯২০-এর দশকে দেশটি ত্যাগ করে : জীবন ছিল কঠিন, দেশটি ছিল অদ্ভূত। এটি তাদের দেশের মতো লাগেনি। ভূমিটির সাথে আধ্যাত্মিকভাবে নিজেদের সম্পৃক্ত করার জন্য তাদের দরকার ছিল যুক্তিনির্ভর মতাদর্শেরও বেশি কিছুর। তারা তাদের মতাদর্শগুলোকে সহজাতভাবেই কাব্বালার পুরনো আধ্যাত্মিক ভূগোলের দিকে চালিত করে। সূচনায় সেক্যুলার থাকা একটি আন্দোলন আধ্যাত্মিক মাত্রা নেয়।

এই জায়নবাদী কাব্বালাহর মুখ্য নায়কেরা জেরুসালেমে বাস করতেন না, পবিত্র নগরীকেন্দ্রিকও ছিলেন না তারা। রাশিয়ায় কাব্বালার সূচনাকারী এ ডি গর্ডন আলিয়া করেছিলেন তুলনামূলক তারুণ্যে, ৪৬ বছর বয়সে। ডেদানিয়ার তার কিবুজে তরুণ পথিকৃতদের সাথে মাঠে মাঠে কাজ করতেন তার সাদা দাড়ি দুলিয়ে। তার কাছে ফিলিস্তিনে অভিবান ছিল খুবই কঠিন : তিনি রাশিয়ার জন্য খুবই গৃহকাতরতা অনুভব করতেন। তার কাছে ফিলিস্তিনের নিকটপ্রাচ্যের ভূ- প্রকৃতি অচেনা মনে হয়েছিল। তিনি মাটিতে কাজ করার সময় যে অবস্থায় পড়তেন বলে বলতেন, আগেকার সময়ে সেটিকেই বলা হতো শেখিনার প্রকাশ। তার মনে হতো যে তিনি জেরুসালেমের ঈশ্বরের সংস্পর্শকে প্রায়শই ফুটিয়ে তোলা সেই আদি সামগ্রিকতায় ফিরে গেছেন। গ্যালিলিতে গর্ডন সেই সংস্পর্শ পেয়েছিলেন। প্রবাসে ইহুদিদেরকে যন্ত্রণাদায়ক ও অপ্রাকৃত জীবন কাটাতে হয়েছিল। গর্ডন তার কবিতা ও বক্তৃতায় তরুণ পথিকৃতদের শিক্ষা দিতেন। ভূমিহীন ও মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা ঘেটৌর নাগরিক জীবনে নিজেদেরকে অনিবার্যভাবে অপরিণত করে ফেলেছে। তবে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা নিজেদেরকে ঈশ্বর ও নিজেদের- উভয় থেকেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। জুদা হ্যালেভির মতো গর্ডনও বিশ্বাস করতেন যে ইসরাইল ভূমি (ইরেজট ইসরায়েল) ছিল অনন্যভাবে ইহুদি চেতনার সৃষ্টি। তাদের কাছে ঐশী স্বচ্ছতা, অসীমতা ও জ্যেতি প্রকাশ করে। এটিই তাদেরকে সত্যিকারের স্বকীয় করে তোলে। এই সত্তার উৎস থেকে আলাদা হওয়ার কারণেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। এখন ভূমির বিপুল পবিত্রতায় অবগাহন করে তাদের কর্তৃব্য হয়ে দাঁড়াল একেবারে নতুন হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলা। গর্ডন লিখেছেন, ‘আমাদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন হয়ে পড়ল নতুন করে সাজিয়ে নেওয়ার। ফলে অপ্রাকৃতিক, ত্রুটিপূর্ণ ও দলছুট ব্যক্তিকে নিজেকেই বদলে প্রাকৃতিক, সামগ্রিক মানবে পরিণত হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ল, যে নিজের কাছে সত্যে পরিণত হবে।’ তবে গর্ডনের আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আগ্রাসনের ইঙ্গিত ছিল : ইহুদিদেরকে অবশ্যই তার ভাষায় শ্রমের মাধ্যমে জয় করা ভূটিতে তাদের দাবি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শারীরিক কষ্টে নিজেদের নিয়োজিত করবে ইহুদিরা। ফিলিস্তিনের পবিত্রতায় সাড়া দিয়ে তারা এর সত্যিকারের মালিক হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে।

নেগেভের এসব জায়নবাদী বসতি স্থাপনকারীদের প্রথম কাজ ছিল ১৯৪৬ সালে তাদের প্রতিষ্ঠিত নতুন কিবুজের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া তোলা। ইহুদিদের জন্য 'লেবার জায়নবাদ' ইতিবাচক ছিল। এদের সমাজবাদী মূল্যবোধ সত্ত্বেও তারা ফিলিস্তিনের থেকে আবর জনসাধারণকে বাদ দিয়েছিল। এমনকি এ ডি গর্ডনও আরবদেরকে 'চরম নোংরা', 'ফালতু', ও 'ঘৃণ্য' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

প্রাচীন কালে থেকে ইহুদিরা জেরুসালেমে তাদের টেম্পলের আদি সম্প্রীতিতে একইভাবে ফিরে যেতে চাইত। কিন্তু গর্ডন জায়নবাদীদের শিক্ষা দিলেন যে শেখিনাকে আর মাউন্ট জায়নে পাওয়া যাবে না, বরং তাকে পাওয়া যাবে গ্যালিলির মাঠে-ময়দানে আর পাহাড়-পর্বতে। প্রাচীনকালে অ্যাডোদার অর্থ ছিল টেম্পলের উপাসনা। কিন্তু গর্ডনের কাছে অ্যাভোদার অর্থ হলো কায়িক শ্রম। অবশ্য অল্পসংখ্যক জায়নবাদী টেম্পল মাউন্টে অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশা করছিল। লেবার জায়নবাদের সেক্যুলার নেতাদের মাধ্যমে কোণঠাসা ও উপহাসাস্পদের শিকার হওয়া ধর্মীয় জায়নবাদীরা একটি গ্রুপ গঠন করেছিলেন। তারা একে বলতেন 'মিজরাচি'। তারা অধিকতর সনাতন ধারণায় জেরুসালেমকে বিশ্বের কেন্দ্র মনে করতেন। তাদের নেতা ছিলেন রাব্বি আব্রাহাম আইজ্যাক কুক। তিনি ১৯২১ সালে জেরুসালেমের অ্যাশকেনাজিমের প্রধান রাব্বি হন। বেশির ভাগ অর্থোডক্স ইহুদি পুরো জায়নবাদী উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করলেও কুক আন্দোলনকে সমর্থন করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে না-বুঝেই সেক্যুলার জায়নবাদীরা ঈশ্বরের রাজ্য গঠনে সহায়তা করছে। ভূমিতে ফেরা অনিবার্যভাবেই তাদেরকে তাওরাতে প্রত্যাবর্তনের দিকে চালিত করবে। কাব্বালিস্টবাদী কুক বিশ্বাস করতেন যে ইহুদিরা যখন ফিলিস্তিন থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তখন সমগ্র বিশ্বের ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ঐশী সত্তা অ-ইহুদি বিশ্বের পাপাচারে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রবাসের সিনাগগ ও ইয়েশিবাগুলোতে লুকিয়ে ছিল। এখন পুরো বিশ্বকে পরিত্রাণ করা হবে : বিশ্বের সব সভ্যতা আমাদের চেতনার রেনেসাঁসে নতুন করে জাগবে। সব বিবাদের অবসান ঘটবে, আমাদের পুনর্জাগরণের ফলে নতুন জন্মের আনন্দে সকল জীবন আলোকিত হবে।' বস্তুত পরিত্রাণ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। কুক ইতোমধ্যেই তার মনের চোখে দেখতে পেয়েছিলেন যে পুনঃনির্মিত টেম্পল বিশ্বের কাছে ঐশী সত্তাকে প্রকাশ করছে :

এখানে টেম্পল তার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সব মানুষ আর রাজ্যের সম্মান ও গৌরব নিয়ে। এবং এখানে আমরা আমাদের সামনে আনন্দ-ভূমির বয়ে আনা ফসল আনন্দচিত্তে গ্রহণ করি, এই আনন্দ-ভূমির শস্য ও মদে পরিপূর্ণ আমাদের মদ্য প্রস্তুত করার যন্ত্রের চমৎকারিত্বে আমাদের হৃদয় খুশি হয় এবং এখানে আমাদের আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন টেম্পলের প্রভু, ইসরাইলের ঈশ্বরের পুরোহিত, পবিত্র-মানব ও দাসেরা।

.

এটি সুদূরের কোনো স্বপ্ন ছিল না : 'আমরা অদূর ভবিষ্যতেই প্রভুর পর্বতের ওপর তাদেরকে আবার দেখতে পাব, এবং প্রভুর এসব পুরোহিতকে এবং তাদের পবিত্র উপাসনা দেখে এবং তাদের চমৎকার সঙ্গীত শুনে আমাদের হৃদয় ফুলে ওঠবে। অবশ্য জেরুসালেমের ফিলিস্তিনি মুসলিমদের মধ্যে বিপুল আনন্দ বয়ে আনার কোনো স্বপ্নাবিভাব ছিল না। রাব্বি কুক তার জীবদ্দশায় পাগলাটে ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কেবল আমাদের সময়েই তার ধারণাগুলো কার্যকারিতাসহ পূর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছে।

হার্বার্ট স্যামুয়েলের উত্তরসূরি হিসেবে নিযুক্ত হন লর্ড প্লামার, ১৯২৫ সালে। তার আমলে ফিলিস্তিন ছিল আপত দৃষ্টিতে শান্তিপূর্ণ। ইহুদি সম্প্রদায় বা ইউশুব ম্যান্ডেটের অধীনে একটি সমান্তরাল রাষ্ট্র নির্মাণে ব্যস্ত ছিল। তার ছিল নিজস্ব সেনাবাহিনী (হাগানা), কিবুতজিম ও বাণিজ্যিক ইউনিয়নগুলোর (হিসতাদরুথ) সমন্বয়ে একটি পার্লামেন্টারি সংস্থাও ছিল। তাদের নিজস্ব করব্যবস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপারি অনেক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও দাতব্য সংস্থাও ছিল। জিওশ এজেন্সি (পশ্চিম জেরুসালেমের রেহাভিয়ায় ছিল এর সদরদফতর) ব্রিটিশ সরকারের কাছে ইউশুভের আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। আরবরা ছিল অনেক কম সংগঠিত। জায়নবাদের বিরোধিতা প্রশ্নে হোসাইনি ও নাশাশিবি উপদলের উত্তেজনায় তারা বিভক্ত ছিল। অবশ্য জায়নবাদী-আরব সজ্ঘাতের উভয় পক্ষেই চরমপন্থীরা ক্রমাগত গুরুত্ব পাচ্ছিল। তারা আর বর্তমান অবস্থাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। চরমপন্থী জায়নবাদীরা ভ্লাদিমির জ্যাকোতিনস্কির আদর্শে আকৃষ্ট হয়েছিল। আর মুফতি তার অনুসারীদেরকে ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতা বন্ধ করতে আহ্বান জানাচ্ছিলেন।

সঙ্ঘাতটি উভয় জনগোষ্ঠীর গভীরতম আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বিবেচিত নগরী জেরুসালেমে নতুন ও মর্মান্তিক অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। ব্রিটিশদের আগমনের পর থেকে আরবেরা ওয়েস্টার্ন ওয়ালের প্রতি ইহুদিদের ভক্তিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেছিল। ঊনিশ শতকে মন্টেফিওর ও রথচাইল্ড উভয়ে প্রার্থনার এলাকাটি কেনার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯১৮ সাল থেকে মুসলিমেরা লক্ষ্য করেছিল যে ইহুদিরা তাদের উপাসনাকালে চেয়ার, বেঞ্চ, পর্দা, টেবিল ও স্কুলসহ বেশি বেশি আসবাবপত্র নিয়ে আসছে। মনে হতে থাকে উসমানিয়া আমলের স্থিতিবস্থার যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেটি লঙ্ঘন করে তারা সেখানে একটি সিনাগগ নির্মাণ করতে যাচ্ছে। মুফতি তার অনুসারীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, জায়নবাদীরা হারামের নিয়ন্ত্রণ লাভ করার পরিকল্পনা করছে। তিনি প্রাচীরে ইহুদিদের এসব কার্যক্রমকে বড় ধরনের উদ্যোগের আগে ছোট পরিবর্তন হিসেবে অভিহিত করেন। গোলযোগ ঘটে ১৯২৮ সালের যম কিপুরের প্রাক্কালে। জেরুসালেমের জেলা কমিশনার অ্যাডওয়ার্ড কি রোচ পুলিশপ্রধান ডগলাস ডাফকে নিয়ে পুরনো নগরীতে হাঁটছিলেন। তানজিকিয়া মাদরাসায় মুসলিম শরিয়াহ কোর্টে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তারা নিচে ইহুদি উপাসনা অনুষ্ঠানের দিকে তাকালে রোচ লক্ষ করেন যে প্রার্থনার সময় নারী ও পুরুষদের আলাদা করার জন্য একটি বেডরুমের পর্দা ব্যবহার করা হয়েছে। কক্ষে থাকা মুসলিম আলেমরা এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, রোচ তাদের সাথে একমত হয়ে বলেন যে এটি স্থিতিবস্থার লঙ্ঘন। পর দিন ছিল যম কিপুর। পর্দা সরিয়ে ফেলার জন্য পুলিশ পাঠানো হয়। তারা উপস্থিত হয়েছিল উপাসনার সবচেয়ে ভাবগম্ভীর সময়ে। এ সময় নীরব উপাসনায় নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল উপাসনাকারীরা। উপাসনা শেষ হয়ে হওয়ার সাথে সাথেই সংবেদনহীনভাবে পুলিশ পর্দা সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করে। স্পষ্টভাবে অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করায় ইহুদিরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ফিলিস্তিনজুড়ে ইউশুভ ক্রুদ্ধভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঈশ্বর অবমাননার অভিযোগ আনে।

মুফতি এখন নতুন প্রচারণা শুরু করলেন। তিনি জোর দিয়ে বলতে থাকেন যে স্থিতিবস্থা কঠোরভাবে পালন করতে হবে। প্রাচীরটি হারামের অংশ, এটি ইসলামি ওয়াকফের সম্পত্তি। এটি সেই স্থান যেখানে মুহাম্মদ (সা.) নৈশ সফরে বোরাককে বেঁধেছিলেন। ইহুদিদের উচিত হবে না আসবাবপত্র এনে কিংবা সোফার বাজিয়ে হারামে মুসলিমদের

নামাজে বিঘ্ন ঘটিয়ে স্থানটিকে তাদের সম্পত্তি বিবেচনা করার মতো আচরণ করা। তারা ছিল যন্ত্রণাদগ্ধ। মুফতি ভক্তিকেন্দ্রিক আক্রমণও শুরু করেন। কাছেই ছিল একটি সুফি খানকাহ। হঠাৎ করেই জিকিরের শব্দ খুবই বেড়ে গেল, আর তা বিশৃঙ্খল বলে মনে হলো। প্রাচীরে ইহুদিরা যখন উপাসনা করত, ঠিক তখনই মোয়াজ্জিনেরা আজান দিতে লাগলেন। সবশেষে সুপ্রিম মুসলিম কাউন্সিল উপাসনা স্থানটির উত্তর দিকের প্রাচীর খুলে দিলো যাতে ওই রাস্তাটির অস্তিত্ব আর না বোঝা যায়। এতে করে পুরোটিই হারামের প্রান্ত দেশের সাথে মাগরিবি এলাকাকে সংযুক্ত হয়ে যায়। আরবরা ইহুদিদের উপাসনার সময় সেখান দিয়ে পশু নিয়ে যেত, সাবাতের সময় দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট ধরাত। স্বাভাবিকভাবেই ইউশুভের, সেক্যুলার ও ধর্মীয়- সব ইহুদিই, বিশেষ করে ব্রিটিশেরা এই নীতিগর্হিত কাজগুলোকে অনুমোদন করায় অব্যাহতভাবে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হচ্ছিল।

জুরিখে ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মে হয় ১৬তম জায়নবাদী সম্মেলন। প্রথম দিনে জ্যাবোটিনস্কি জ্বালাময়ী বক্তৃতায় জর্ডানের উভয় তীরে ইহুদি রাষ্ট্র (হোমল্যান্ড নয়) প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। সম্মেলনে উদারপন্থী জায়নবাদীদের মাধ্যমে তার প্রস্তাবটি বড় ব্যবধানে বাতিল হয়ে যায়। তবে আরবেরা এই ঘটনায় অত্যন্ত সতর্ক হয়ে যায়। তারপর এভের নবম দিনে (১৫ আগস্ট) জ্যাবোটিনস্কির তরুণ শিষ্যদের একটি গ্রুপ জেরুসালেমে ম্যান্ডেটরি অফিসের বাইরে বিক্ষোভ করে। তারপর তারা ওয়েস্টার্ন ওয়ালে গিয়ে ইহুদি জাতীয় পতাকা দোলায়, মৃত্যু পর্যন্ত তারা প্রাচীরটি রক্ষা করার সংকল্প ব্যক্ত করে। উভয় পক্ষে উত্তেজনা বাড়ে। পর দিন জুমার নামাজের সময় আরবরা হারামে সমবেত হতে শুরু করে। মুফতির কয়েকজন সমর্থক প্রাচীরে ইহুদি উপাসনালয়ের দিকে ছুটল। এবার পুলিশ দাঙ্গা দমন করে। তবে পরে একটি মর্মান্তিক ঘটনা বড় ধরনের সঙ্ঘাতের সূচনা করে। এক ইহুদি বালকের বল আরবদের একটি বাগানে পড়েছিল। এ নিয়ে দস্তাদস্তির একপর্যায়ে ছেলেটি মারা যায়। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় জায়নবাদীরা ক্রুদ্ধভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ২২ ও ২৩ আগস্ট ফিলিস্তিনি কৃষকেরা লাঠি ও ছুরি নিয়ে জেরুসালেমে আসে। কারো কারো কাছে আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত ছিল। ক্রোধ প্রশমিত করতে মুফতি কিছুই করলেন না। ওই শুক্রবারের জুমার খুতবায় আসলে উস্কানিমূলক কিছু বলেননি। কিন্তু তবুও নামাজের পর উত্তেজিত জনতা হারাম থেকে ছুটে গিয়ে সামনে যে ইহুদিই পড়েছে,

তাকেই আক্রমণ করেছে। আবারো এ ধরনের ঘটনায় প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। লর্ড প্লামার ব্রিটিশ পুলিশ সদস্য কমিয়ে দিয়েছিলেন। তারা এখন এই সঙ্কট যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারছিল না। পুরো ফিলিস্তিনে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। আগস্ট মাসের শেষ নাগাদ ১৩৩ জন ইহুদি নিহত ও ৩৩৯ জন আহত হয়। ব্রিটিশ পুলিশ ১১০ আরবকে হত্যা করে। তেল আবিবের কাছে ইহুদি পাল্টা হামলায় নিহত হয় আরো ছয় আরব।

জেরুসালেমের গ্র্যান্ড মুফতি হাজি আমিন আল-হোসাইনকে (মাঝে), দেখা যাচ্ছে আরব লিগের সদস্যদের সাথে। জায়নবাদের বিরোধিতায় তিনি ছিলেন আপসহীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের সাথে দেখা করে তিনি শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলেন বলে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করে।

ওয়েস্টার্ন ওয়ালের দাঙ্গা অনিবার্যভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়। আপতভাবে প্রাচীরের যুদ্ধে আরবেরা জয়ী হয়। ঘটনা তদন্তে গঠিত শ কমিশন উসমানিয়া আমলের স্থিতিবস্থা ব্যবস্থা বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করে। ইহুদিরা উপাসনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম আনতে পারবে, তবে স্ক্রল, মেনেরারা ও আর্ক কোনোভাবেই সেখানে আনতে পারবে না। প্রাচীর এলাকায় সোফার বাজানো যাবে না, কোনো সঙ্গীত চলবে না। মুসলিমদেরও উচ্চস্বরে জিকির করতে মানা করা হয়, তাদের পশুগুলো ইহুদি উপাসনার সময় সেখান দিয়ে পারাপারের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তবে এটি ছিল ফাঁকা বিজয়। হিটলার ক্ষমতায় এলে জায়নবাদ আরো চরম, মরিয়া সংগ্রামে পরিণত হয়। আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি হারে জার্মানি ও পোল্যান্ড থেকে উদ্বাস্তুরা আসতে থাকে। জায়নবাদীদের পুরনো ধীরে চলার নীতি এখন আর চলনসই রইল না। আর ইউশুভে না হলেও পরবাসী ইহুদিরা হঠাৎ করে আরো বেশি হারে জ্যাবোটিনস্কির রিভিশনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে থাকে। চরমপন্থী ইহুদি গ্রুপগুলো (তাদের অনেকে রাব্বি কুকের কাজে উদ্দীপ্ত হয়েছিল) আরো বেশি চরমপন্থী হয়ে ওঠে, জঙ্গি সংগঠন গড়ে তুলতে থাকে। তারা বেন গুরিয়ানের সমাজবাদী আদর্শের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখায়নি। তাদের নায়ক ছিলেন যশুয়া ও রাজা দাউদ। কারণ এ দুজন বলপ্রয়োগে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এসব ডানপন্থী গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইরগুন ভেই লিউমি। তখনো ফিলিস্তিনে ইউশুভদের মাত্র ১০ থেকে ১৫ ভাগ ইহুদি সত্যিকার অর্থে ডানপন্থীদের দিকে ঝুঁকেছিল। বেন গুরিয়ান অব্যাহতভাবে সংযত থাকার নীতি অবলম্বনের তাগিদ দিতে থাকেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, হিটলারের সেমিটিকবিরোধী উন্মাদগ্রস্ত নীতি জায়নবাদী স্বার্থের জন্য অনুকূলই হবে।

ইহুদি অভিবাসন ১৯৩০-এর দশকে বাড়ায় আরবরা চরমভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা অভিযোগ করতে থাকে যে জায়নবাদীরা তাদের স্বার্থ পূরণ করার লক্ষ্যে জার্মান বিপদকে ব্যবহার করছে। তারা প্রশ্ন করতে থাকে, ইউরোপের সেমিটিকবিরোধী অপরাধের কারণে তাদের দেশ কেন দুর্ভোগ পোহাবে? এটি ছিল পুরোপুরি যৌক্তিক ও জবাব-অযোগ্য প্রশ্ন। আরবদের উদ্বেগ বোধগম্য ছিল। ১৯৩৩ সালে ইহুদিরা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৮.৯ ভাগ, ১৯৩৬ সালে তারা বেড়ে হয় ২৭.৭ ভাগ। আরবরা আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি মনে করতে থাকে। আরব শিবিরে এখন আরো চরমপন্থী দলের উদ্ভব ঘটতে থাকে। অবশ্য এই পর্যায় পর্যন্ত আরব শিবিরের নিয়ন্ত্রণ ছিল অভিজাতদের হাতে। এসব দলের মধ্যে ছিল ডিফেন্স পার্টি, রিফর্ম পার্টি, প্যান-আরব ইস্তিকবাল। ফিলিস্তিনিদের অনেকে ব্রিটিশ ও জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য গেরিলা সংগঠনগুলোতে যোগ দিতে শুরু করে। ১৯৩৫ সালের নভেম্বরে শেখ আল- কাসামের গেরিলারা জেনিনের কাছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়। এ সময় শেখ নিহত হন। তিনি ফিলিস্তিনের অন্যতম প্রথম শহিদ হন। ১৯৩৬ সালে মুফতির সভাপতিত্বে জেরুসালেমে আরব হায়ার কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতে নতুন দলগুলোর নেতারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। ফলে উভয় পক্ষই আরো চরমপন্থী পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছিল। জায়নবাদী ও আরবরা চূড়ান্ত সঙ্ঘাতের জন্য নিজেদের সশস্ত্র করছিল।

নগরীতে উত্তেজনা বাড়ার মধ্যেই জেরুসালেমের সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন অব্যাহত থাকে। প্রাচীরের বাইরে কিং ডেভিড হোটেলের মতো বিখ্যাত ল্যান্ডমার্ক, বিশালাকার ওয়াইএমসিএ ভবন, ডাকঘর ও রকফেলার মিউজিয়ামের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। জেরুসালেম দ্রুততার সাথে মেট্রোপলিটান এলাকা ছাড়িয়ে বহু দূর পর্যন্ত দ্রুত বিস্তৃত হতে

থাকে। ব্রিটিশরা তাই ব্যাপকভিত্তিক জেরুসালেম উপ- বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে। এতে পুরনো নগরী ঘিরে নতুন নতুন ইহুদি ও আরব উপশহর গড়ে ওঠতে থাকে। ফিলিস্তিনে ইহুদিরা যেমন ঢলের মতো আসতে থাকে, একইভাবে জেরুসালেমে আরব জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে। মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে ইহুদিরা এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বর্তমানে এক লাখ ইহুদির বিপরীতে মুসলিম ও খ্রিস্টানের সংখ্যা ৬০ হাজার। তবে উপ-জেলায় আরবরা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের কিছু বেশি ছিল, তারা ৮০ ভাগ সম্পত্তির মালিক। বিশেষ করে পশ্চিম জেরুসালেমে বড় আকারের মধ্যবিত্ত আরব উপশহর গড়ে ওঠতে থাকে। এছাড়া কাতামন, মুসরারাহ, তালবিয়া, আপার ও লোহার বাকা, গ্রিক ও জার্মান কলোনি, শেখ জারা, আবু তোর, মামিলা, নবি দাউদ ও শেখ বদর ছিল মূল্যবান আরব রিয়েল এস্টেট। (দেখুন মানচিত্র।) এসব আরব এলাকার কোনো কোনোটি ছিল পশ্চিম জেরুসালেমে। বর্তমানে এগুলো ইহুদি প্রাধান্যপূর্ণ এলাকা।

এরপর ১৯৩৬ সালের সাধারণ ধর্মঘটের সময় স্পষ্ট আইন অমান্য আন্দোলনকালে আরব অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঘটে আরব বিদ্রোহ। এতে জেরুসালেম ব্যাপকভাবে ঝামেলায় পড়ে। আরব বিক্ষোভকারীরা ক্রুদ্ধভাবে বিক্ষোভ করে। ইহুদিদের একটি ধর্মীয় স্কুলে একটি বোমা ফেলা হলে ৯ শিশু মারা যায়, আরো কিছু সন্ত্রাসী হামলায় ৪৬ জন ইহুদি মারা যায়। ১৯৩৮ সালের একপর্যায়ে ফিলিস্তিনি বিদ্রোহীরা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য নগরী দখল করে নিয়েছিল। এই সঙ্কটকালে জায়নবাদী নেতারা সংযত থাকার আহ্বান জানালেও ইরগুন বোমা নিক্ষেপ ও সন্ত্রাসী হামলা চালাতে থাকে। এতে ৪৮ জন আরব প্রাণ হারায়। বিদ্রোহের সময় জায়নবাদী প্রতিরোধের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে জেরুসালেম তার স্থান হারায়। মুফতি ও আরব হায়ার কমিটিকে ব্রিটিশরা নগরীছাড়া করে। মুফতি বাইরে গিয়ে হিটলারের সাথে মিত্রতা স্থাপন করলে ফিলিস্তিনি স্বার্থ মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। ফিলিস্তিনে নেতৃত্ব চলে যায় গ্রামীণ শেখদের হাতে। তারা আরো নির্মম পদ্ধতি প্রয়োগ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

Romema

Givat Shad

সহিংসা বাড়তে থাকার প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশেরা ফিলিস্তিন প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করতে থাকে। ১৯৩৭ সালে পিল কমিটি দেশটিকে ভাগ করার করার সুপারিশ করে। গ্যালিলি ও উপকূলীয় সমতলে একটি ইহুদি রাষ্ট্র হবে, আর নেগেভসহ বাকি ভূখণ্ড আরবদের হাতে থাকা উচিত বলে কমিটি অভিমত প্রকাশ করে। কমিশনারেরা আরো সিদ্ধান্ত নেন যে জেরুসালেম ও এর উপ-বিভাগগুলো ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের স্থায়ী নিয়ন্ত্রণে একটি করপাস সেপারেটাম (আন্তর্জাতিক তদারকির আওতায়) হিসেবে থাকবে। এর পর থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ফিলিস্তিন বিভক্তির বেশির ভাগ পরিকল্পনায় জেরুসালেমকে সঙ্ঘাতের বাইরে রাখার চেষ্টা করে এমনটা নিশ্চিত করতে যে পবিত্র স্থানগুলোতে (এগুলো সভ্যতার 'ঐশী আমানত'- পিল কমিশনাররা এভাবে অভিহিত করেছিলেন) সবার প্রবেশাধিকার থাকবে।১১ জায়নবাদীরা প্রচণ্ড বিতর্কের পর পিল পরিকল্পনা গ্রহণ করে, অবশ্য তারা তাদের বিভক্তির নিজস্ব পরিকল্পনাও পেশ করেছিল। এই জায়নবাদী পরিকল্পনায় জেরুসালেম বিভক্ত করার কথা ছিল : ইহুদিরা পাবে পশ্চিম জেরুসালেমের নতুন এলাকাগুলো, আর পুরনো নগরী ও পূর্ব জেরুসালেম থাকবে ম্যান্ডেটরি নিয়ন্ত্রণে।

পিল পরিকল্পনার প্রতি আরবেরা সম্মতি দেয়নি। ১৯৩৯ সালে তাদের দৃঢ় অবস্থানের সুফল পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে থাকা ব্রিটিশ সরকারকে বেশ কয়েকটি আরব রাষ্ট্র জায়নবাদের প্রতি তার সমর্থন হ্রাস করার অনুরোধ করে। নতুন একটি শ্বেতপত্রে ফিলিস্তিনে ইহুদি অভিবাসন ব্যাপকভাবে সীমিত করা ও পিল বিভক্তি পরিকল্পনা বাতিল করার কথা বলা হয়। এর বদলে আরব ও ইহুদি উভয়ের যৌথভাবে শাসন করা হবে এমন একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র সৃষ্টির রূপরেখা দেওয়া হয়। জায়নবাদীদের জন্য এটি ছিল মারাত্মক আঘাত। তারা আর কখনো ব্রিটেনকে বিশ্বাস করতে পারেনি, এমনকি যদিও যুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে সমর্থন করা ছাড়া তাদের আর কোনো বিকল্প ছিল না। অবশ্য এটি রিভিশনিস্টদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা বাড়িয়ে দেয়। ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত আব্রাহাম স্টার্নের লেহি গ্রুপ ব্রিটিশ ও নাৎসিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেনি।

পরবর্তীকালে শীর্ষস্থানীয় দুই ইহুদি সন্ত্রাসী ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল। ১৯৪২ সালের এক অভিযানে স্টার্ন নিহত হলে আইজ্যাক শামির হন 'স্টার্ন গ্যাঙের' নেতা। জ্যাবোটিনস্কির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাকারী মেনাচেম বেগিন ১৯৪২ সালে অবৈধভাবে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে ইরগুনের অন্যতম নেতা হন। এমনকি উদার বেন গুরিয়ান পর্যন্ত ১৯৪২ সালে আরো চরমপন্থী হয়ে যান। ইউশুভের পুরনো ধীরে চলা নীতি পরিত্যক্ত হলো। 'আবাসভূমির' আলোচনা আর ছিল না। জায়নবাদীরা মনে করেছিল যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ইহুদি রাষ্ট্রই ইহুদিদের জন্য নিরাপদ স্বর্গের ব্যবস্থা করতে পারে, এমনকি এর অর্থ যদি হয় আরবদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করাও। ১২

যুদ্ধপরবর্তী অধ্যায়ে উভয় পক্ষে সন্ত্রাস বাড়ে। নাৎসি ক্যাম্প থেকে বেঁচে যাওয়া এক লাখ উদ্বাস্তুকে ফিলিস্তিনে প্রবেশের সুযোগ দিতে জায়নবাদীদের অনুরোধ একগুঁয়েভাবে প্রত্যাখ্যান করে ব্রিটিশরা। এর বদলা নিতে কিং ডেভিড হোটেলের একটি অংশ উড়িয়ে দেয় ইরগুন। এর একটি ফ্লোর ব্যবহার করত ব্রিটিশ সেনাবাহিনী। এতে ৯১ জন নিহত ও ৪৫ জন আহহ হয়। এই শেষ বছরগুলোতে ব্রিটিশরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে বলে মনে হতে থাকে। ম্যান্ডেট নিয়ে বিভ্রান্তি শুরু হয়। অসম্ভব একটি নীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে গিয়ে ১৯৪৭ সাল নাগাদ ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ কর্মকর্তারা মনোবল ও ধৈর্য হারিয়ে ফেলে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা দেশটির জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয়। তাদের চলে যাওয়ার সুযোগ খোঁজা উচিত বলে মনে হতে থাকে। ১৯৪৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্রসচিব আরনেস্ট বেভিন ম্যান্ডেটটিকে সদ্য গঠিত জাতিসঙ্ঘে পাঠিয়ে দেন। জাতিসঙ্ঘ তখন নতুন বিভক্তি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। এতে দেশটিকে এমনভাবে ভাগ করা হয়, যাতে পিল পরিকল্পনার চেয়ে ইহুদিরা বেশি সুবিধা পেয়ে যায়। পূর্ব গ্যালিলি, আপার জর্ডান ভ্যালি, নেগেভ, উপকূলীয় সমভূমি নিয়ে একটি ইহুদি রাষ্ট্র ও বাকি অংশ নিয়ে একটি আরব রাষ্ট্রের প্রস্তাব করা হয়। জেরুসালেম ও বেথলেমেহের করপাস সেপারেটাম থাকবে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে। ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে জেরুসালেমের আন্তর্জাতিক জোনের মর্যাদা নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। আরবেরা জাতিসঙ্ঘের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে, জায়নবাদীরা তাদের স্বাভাবিক বাস্তবতাবোধের আলোকে তা গ্রহণ করে।

তারা জেরুসালেমের আন্তর্জাতিকীকরণকেও গ্রহণ করে নেয়। ১৯৪৬ সালের আগস্টে জাতিসঙ্ঘে উত্থাপিত ওই প্রস্তাবটিতে জেরুসালেমকে আবারো করপাস সেপারেটামে রাখার কথা বলা হয়। এই পর্যায়ে পবিত্র নগরীর মালিকানা নতুন ইহুদি রাষ্ট্রের কাছে অপরিহার্য বিবেচিত হয়নি।

জাতিসঙ্ঘ প্রস্তাবটি পাস হওয়ার প্রায় সাথে সাথে ফিলিস্তিনে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ২ ডিসেম্বর উত্তেজিত আরব জনতা জাফা গেট দিয়ে ঢুকে বেন ইয়েহুদা স্ট্রিটের ইহুদি বাণিজ্যিক কেন্দ্র লুট করে। এর বদলা নিতে ইরগুন কাটামন ও শেখ জারার আরব উপশহরগুলোতে হামলা চালায়। ১৯৪৮ সালের মার্চের মধ্যে জেরুসালেমের আশপাশের লড়াইয়ে ৭০ জন ইহুদি ও ২৩০ জন আরব নিহত হয়। তখনো ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অবসান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘটেনি। সিরিয়া ও ইরাকি সৈন্যরা দেশটিতে প্রবেশ করে জেরুসালেমগামী রাস্তাগুলো অবরোধ করে। হাগানা সামরিক 'প্লান দালেট' বাস্তবায়ন শুরু করে। এটি শেষ পর্যন্ত জেরুসালেম থেকে উপকূল পর্যন্ত একটি করিডর সৃষ্টি করতে সফল হয়। ব্রিটিশরা এতে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে আরবেরা পশ্চিম জেরুসালেমে ইহুদি উপশহরগুলো অবরোধ করেছিল। হাগানা ওই রাস্তাগুলো খুলে দেওয়ার আগে পর্যন্ত দেশের বাকি অংশ থেকে উপশহরগুলো বিচ্ছিন্ন থাকে। ১০ এপ্রিল যুদ্ধ নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। এসময় ইরগুন জেরুসালেম থেকে তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত দির ইয়াসিনে আরব গ্রামগুলোতে হামলা চালায়। এতে ২৫০ জন পুরুষ, নারী ও শিশু নিহত হয়। লাশগুলো বিকৃত করা হয়। ১৩ এপ্রিল ইরগুন সন্ত্রাসীদের বহন করা বহরে হামলা চালায় আরবেরা। এসব সন্ত্রাসী দির ইয়াসিনে আহত হয়েছিল। তাদেরকে মাউন্ট স্কপাস মেডিক্যাল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই হামলায় ৪০ নির্দোষ ইহুদি মেডিক্যাল স্টাফ নিহত হয়।

ব্রিটিশেরা ১৯৪৮ সালের ১৫ মে চলে যাওয়ার আগে ইরগুন জাফায় হামলা চালায়, আর দির ইয়াসিনের ভীতির কারণে ৭০ হাজার নগরী ৭০ হাজার আরব অধিবাসী পালিয়ে যায়। এটি ফিলিস্তিনিদের তাদের বাড়িঘর ত্যাগ করার এক্সডসের সূচনা করে। কোনো কোনো উদ্বাস্তু জেরুসালেমে একটি নিরাপদ স্থান কামনা করেছিল। ২৬ এপ্রিল হাগানা

পশ্চিম জেরুসালেমের বিশাল মধ্যবিত্ত আরব শহরতলীগুলোতে হামলা চালায়। হানাদার দলগুলো টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন কেটে ফেলে। ভ্যানে রাখা লাউডস্পিকারে রাস্তায় রাস্তায় প্রচণ্ড শব্দে বলা হতে থাকে, 'বাড়িঘর ত্যাগ না করলে তোমাদেরকেও দির ইয়াসিনের ভাগ্য বরণ করতে হবে!' অধিবাসীরা শেষ পর্যন্ত মে মাসের শেষ নাগাদ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে যায়। তাদের অনেকে পুরনো নগরীতে আশ্রয় নেয়। মে মাসের প্রথম দিকে জাতিসঙ্ঘ প্রতিনিধিরা আন্তর্জাতিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জেরুসালেমে আসে। কিন্তু ব্রিটিশ ও সেইসাথে বিবদমান পক্ষগুলোও তাদের অগ্রাহ্য করে। ১৪ মে বেন-গুরিয়ান নতুন ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম ঘোষণা করতে তেল আবিবে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। পর দিন ব্রিটিশরা যখন শেষ পর্যন্ত নগরী ত্যাগ করে, ইহুদি বাহিনী পুরনো নগরীতে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তবে জর্দানি আরব বাহিনী শেষ মুহূর্তে এসে গেলে তারা ওই আক্রমণটি চালায়নি। এই বাহিনী প্রাচীরঘেরা নগরী ও পূর্ব জেরুসালেমে একটি সামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে।

জাতিসঙ্ঘ ১৯৪৮ সালের জুলাই মসে একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তির ব্যবস্থা করার সময় নগরীটি ইসরাইল ও জর্দানের মধ্যে ভাগ করা ছিল। পুরনো নগরীর পশ্চিম প্রাচীরজুড়ে নগরীটি দুই ভাগে বিভক্ত থাকে, বিধ্বস্ত-জনশূন্য এলাকাটি নো ম্যান্স ল্যান্ড হিসেবে থাকে। (মানচিত্র দেখুন।) জিউশ কোয়ার্টারের দুই হাজার বাসিন্দাকে পুরনো নগরী থেকে বহিষ্কার করা হয়। তারা পশ্চিম জেরুসালেমের নতুন সীমান্তের ওপরে বর্তমানে ইসরাইল-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম জেরুসালেমের ৩০ হাজার আরব বাসিন্দা ইসরাইল রাষ্ট্রে তাদের বাড়িঘর হারায়। পুরনো নগরী এখন জাফা, হাইফা, শহরতলী ও জেরুসালেমের আশপাশের গ্রামগুলোর তখন উদ্বাস্তে ঠাসা। ইসরাইল বা জর্দানের কেউই জেরুসালেম এলাকা ত্যাগ করতে রাজি হয়নি। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী রেজুসালেমকে আন্তর্জাতিকভাবে করপাস সেপারেটামে পরিণত করার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জেরুসালেম ও এর আশপাশের এলাকা থেকে সরে যাওয়া-সংক্রান্ত জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব ৩০৩-এর প্রতি কর্ণপাত করতে অস্বীকার করে তারা। ১৫ নভেম্বর জর্দানের রাজা আবদুল্লাহকে কপ্টিক বিশপ পুরনো নগরীতে জেরুসালেমের রাজা হিসেবে মুকুট পরিয়ে দেন। পূর্ব জেরুসালেম ও জর্দানের পশ্চিম তীর জর্দানের ভূখণ্ড

ঘোষিত হলো। ১৩ ডিসেম্বর জর্দানের পার্লামেন্ট জর্দান ও ফিলিস্তিনের ইউনিয়নকে অনুমোদন করে। স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র সৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন করার মতো কেউ ছিল না।

এর বদলে রাজা পূর্ব জেরুসালেম ও পশ্চিম তীরের অধিবাসীদের জর্দানের নাগরিকত্ব দেন। এই জর্দানি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলো জোরালো প্রতিবাদ জানালেও শেষ পর্যন্ত হয়েই যখন গেছে, তখন আর কিছু করার নেই বিবেচনায় তারা তা মেনে নেয়। ইসরাইলি পক্ষ থেকে বেন-গুরিয়ান ১৩ ডিসেম্বর ঘোষণা করেন যে প্রতিরক্ষা, পুলিশ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়া নেসেট ও সব সরকারি অফিস পশ্চিম জেরুসালেমে সরে যাবে। ১৯৪৯ সালের ১৬ মার্চ দুই দেশের মধ্যকার বৈধ সীমান্ত হিসেবে অস্ত্রবিরতি রেখাকে স্বীকার করে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করে ইসরাইল ও জর্দান। জাতিসঙ্ঘ জেরুসালেমে ইসরাইলি/জর্দানি দখলদারিত্বকে অবৈধ বিবেচনা করা অব্যাহত রাখলেও ১৯৫০ সালের এপ্রিলের পর জেরুসালেম প্রশ্নে আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

অভ্যন্তরীণভাবে অসংখ্যবার ভাগ হওয়া জেরুসালেম এখন দেড় মাইলের বেশি দুর্ভেদ্য সীমান্ত, কাঁটাতারের বেড়া ও বিশাল প্রতিরক্ষা প্রাচীর দিয়ে বিভক্ত। উভয় পক্ষের স্নাইপাররা নো ম্যান্স ল্যান্ডের অপর পাড়ের ভূখণ্ডে গুলি ছুড়ছিল। নো ম্যান্সল্যান্ডের মধ্যেও ছিল অনেক রাস্তা ও ১৫০টি পরিত্যক্ত ভবন। পুরনো নগরীর তিনটি গেট (নিউ গেট, জাফা গেট ও জায়ন গেট) বন্ধ করে দিয়ে কংক্রিটের প্রাচীর দিয়ে মজবুত করা হয়। নগরীটি এখন লম্বা প্রতিবন্ধকতায় বিভক্ত, উভয় পক্ষে লাখ লাখ মাইন পোঁতা হয়। একমাত্র ক্রসিং পয়েন্ট ছিল তথাকথিত ম্যান্ডেলবাম গেট। জনৈক ম্যান্ডেলবামের মালিকানাধীন একটি বাড়ির কাছে থাকা একটি খোলা রাস্তায় ছিল এই গেট। একটি প্রতিবন্ধকতা দিয়ে এটি অতিক্রম করতে হতো। কেবলমাত্র ধর্মীয় লোকজন, কূটনীতিক, জাতিসঙ্ঘ প্রতিনিধিদলের সদস্য, কয়েকজন বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পর্যটককে এক দিক থেকে অপর দিকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো। ইসরাইল থেকে পূর্ব জেরুসালেমে প্রবেশ করার অনুমতি লাভের জন্য বেশির ভাগ পর্যটককে খ্রিস্টান ধর্মের প্রমাণপত্র দেখাতে হতো। তাদেরকে ইসরাইলে ফিরে যেতে দেওয়া হতো না। বরং জর্দান থেকে তাদেরকে তাদের নিজ দেশে ফিরতে হতো। পানি, টেলিফোন ও রাস্তা-ঘাট দুই ভাগে

বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। জর্দানি জেরুসালেমে মাউন্ট স্কপাস হয়ে পড়েছিল একটি ইহুদি ছিটমহল। সেখানকার হাদাসা হাসপাতাল ও হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো জাতিসঙ্ঘের তদারকিতে রাখা হয়েছিল। ছোট স্কপাস গ্যারিসনে সরবরাহ পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভক্তি রেখা দিয়ে ইসরাইলি একটি বহরকে অনুমতি দেওয়া হতো। ১৯৪৮ সালের আগে শত্রুর মালিকানায় থাকা ভূখণ্ড ও ভবনগুলো উভয় পক্ষেই একজনের জিম্মায় দেওয়া হলো। বিভক্তির অমানবিকতা বিশেষভাবে মর্মভেদী হয়ে ওঠেছিল বায়েত সাফাফা গ্রামে। গ্রামটি দুই ভাগে ভাগ করা হয় : এক ভাগ ছিল ইসরাইলি ভূখণ্ডে, অপর ভাগ জর্দানে। পরিবার ও বন্ধুরা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। অবশ্য বিয়ে অনুষ্ঠানগুলোতে মাঝে মাঝে লোকজনকে একত্রিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো। কখনো কোনো উপলক্ষে সীমান্তের রেললাইনের ধারে সমবেত হওয়ার সুযোগও দেওয়া হতো। তারা তখন বিভক্তি রেখার ওপর দিয়ে খবর আর গুজব চিৎকার করে বলত।

ইসরাইলি-জর্দানি অস্ত্রবিরতি চুক্তির ধারা ৮-এ ওয়েস্টার্ন ওয়ালে ইসরাইলি ইহুদিদের অবাধে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও পশ্চিম জেরুসালেমের আরব উপশহরগুলো ফিরিয়ে দিতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি মেনে চলতে অস্বীকার করে। কয়েক বছরের চাপের পর ইসরাইলের আরব খ্রিস্টানদেরকে ক্রিসমাস ও ইস্টারে হলি সেপালচার ও ন্যাটিভিটি চার্চে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে এই অনুমতি ছিল মাত্র ৪৮ ঘণ্টার জন্য। পবিত্র স্থানগুলোর পবিত্রতা লঙ্ঘনের জন্য দুই পক্ষই অপর পক্ষকে অভিযুক্ত করত : মাউন্ট অব অলিভেসে থাকা ইহুদি কবরস্থান ও পুরনো নগরীর জিউশ কোয়ার্টারের সিনাগগগুলো নষ্ট করার জন্য জর্দানকে দায়ী করে ইসরাইলিরা। এসব স্থান এখন ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। আরবেরা তিক্তভাবে অভিযোগ করছিল যে মামিলায় তাদের ঐতিহাসিক কবরস্থানটি ধ্বংস করেছে ইসরাইলিরা। এখানে অনেক বিখ্যাত আলেম, মরমি সাধক ও বীর যোদ্ধার কবর ছিল।

জর্দানি জেরুসালেম অনেক সমস্যায় জর্জরিত ছিল। ১৩ ১৯৪৮ সালের যুদ্ধের পর ফিলিস্তিনে ইসরাইলিদের একটি রাষ্ট্র হলো, এটি জাতিসঙ্ঘের রূপরেখায় থাকা এলাকার চেয়ে বড় ছিল। আশপাশের আরব দেশগুলোর মধ্যে কেবল জর্দানই ইসরাইলি বাহিনীর

অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করতে সক্ষম ছিল। বৈরিতার সময় ফিলিস্তিনের প্রায় সাড়ে সাত লাখ আরব দির ইয়াসিনের খবরে সন্ত্রস্ত্র হয়ে দেশটি ছেড়ে পালিয়েছিল। এসব উদ্বাস্তের অনেকে আশপাশের আরব রাষ্ট্রগুলোতে শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের কাউকে তাদের গ্রাম ও শহরে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়নি। অনেক ফিলিস্তিনি তাদেরকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার জন্য জর্দানকে দায়ী করে। মিসরে প্রবাসী সরকার হিসেবে মুফতি ফিলিস্তিন জাতীয় পরিষদ গঠন করেন। বাদশাহ আবদুল্লাহ প্রভাবশালী আরব পরিবারগুলোকে কাছে টানার চেষ্টা করেন। তারা ঐতিহ্যগতভাবে মুফতির বিরোধী ছিল। তাদের অনেকে আম্মানে সরকারি পদ লাভ করে, অনেকে জর্দানি পার্লামেন্টে আসন পর্যন্ত পায়। এর ফলে জেরুসালেম থেকে আসা অনেক অভিজাত পরিবার আম্মানে বসতি স্থাপন করে। এটি নগরীর পরিবেশ বদলে দেয়। জেরুসালেমে রয়ে যাওয়া ফিলিস্তিনিদের বেশির ভাগই আম্মানের তীব্র বিরোধী ছিল। তারা ছিল তুলনামূলক বেশি শিক্ষিত এবং পূর্ব তীরের বেশির ভাগ আরবের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। তাদের কাছে জর্দানের অনুগত হওয়াটা অসহ্যকর মনে হয়েছে। জর্দান সরকার ঝামেলায় পড়লে প্রায়ই জেরুসালেমে দাঙ্গা হতো। এটি জর্দান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। আল-কুদসের আরবদের কাছে মনে হচ্ছিল যে পুরো বিশ্ব হলি সিটির মালিকানা থেকে তাদের বঞ্চিত করতে চায়। বাদশাহ আবদুল্লাহ এর অবসান চাইলেন।

আরব জেরুসালেম ১৯৪৮ সালের পর মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। সে তার আভিজাত্য হারিয়েছিল। বাদশাহ আবদুল্লাহ জেরুসালেমে তার শক্তির ঘাঁটি থাকাটা নিশ্চিত করার জন্য জর্দানের সমর্থক হেবরনের অধিবাসীদের আল-কুদসে বসতি স্থাপন করতে উৎসাহিত করলেন। নগরীতে বিপুল উদ্বাস্তু সমস্যা ছিল। যুদ্ধের সময় এটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। জর্দানের সম্পদও সীমিত হয়ে আসছিল। জেরুসালেম এলাকায় বাধ্য হয়ে ভিড় করা বাস্তুহারা ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা লাঘব করার মতো অবস্থা ছিল না জর্দানের। কয়েক মাসের যুদ্ধের ফলে পুরনো নগরীর অবস্থা ভয়াবহ খারাপ হয়ে পড়েছিল। অবশ্য ফিলিস্তিন জাতীয়তাবাদের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত একটি নগরীতে বিনিয়োগ করার আগ্রহও ছিল না বাদশাহের। প্রায়ই আবদুল্লাহ জেরুসালেমের চেয়ে নাবলুস ও হেবরনকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। সরকারি অফিসগুলো জেরুসালেম থেকে

আম্মানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৫১ সালের এপ্রিলে মুফতির এজেন্টদের হাতে আকসা মসজিদের প্রবেশপথে বাদশাহ নিহত হওয়ার সময় জর্দানি সরকারের সাথে নগরীর সম্পর্ক উন্নতি হয়নি।

অবশ্য জর্দানি জেরুসালেম সেরে ওঠছিল। ১৯৫৩ সালে আকসা মসজিদ পুনর্গঠন করা হয়, মুসলিম চ্যারিটেবল সোসাইটি ফর দি রিকনস্ট্রাকশন অব জেরুসালেম প্রতিষ্ঠা করা হয় স্কুল, হাসপাতাল ও এতিমখানা স্থাপনের জন্য। ১৯৫০-এর দশকে ওফেল হিল ও ওয়াদি জজ, আবু তর, শেখ জারায় নতুন নতুন বাড়িঘর নির্মাণ করা হয়। অবশ্য জর্দানিরা তখনো ম্যান্ডেটের আমলে করা জেরুসালেমের মাস্টার প্লানের প্রতি কঠোরভাবে অনুরক্ত ছিল। নগরীর সৌন্দর্য সংরক্ষণের জন্য তারা মাউন্ট স্কপাসের ঢালে বা কিদরন ভ্যালিতে কোনো নির্মাণকাজ করেনি। পুরনো নগরীর উত্তর ও পূর্ব দিকে একটি নতুন বাণিজ্যিক এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৮ সালে হারামের বড় ধরনের সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়। ধীরে ধীরে অর্থনীতিও বিকশিত হতে থাকে। জেরুসালেম কখনো শিল্পকেন্দ্র ছিল না। সরকার এই এখান থেকে সরে এসে জেরুসালেমের শহরতলী থেকে আম্মান পর্যন্ত পর্যটন শিল্প ও কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তবে জর্দান জেরুসালেমে পর্যটন শিল্প গড়ে তুলেছিল। এটিই পশ্চিম তীরের ৮৫ ভাগ আয়ের ব্যবস্থা করেছিল। ১৯৪৮ সালে পূর্ব জেরুসালেমে মাত্র একটি আধুনিক হোটেল ছিল, ১৯৬৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭০-এ। নগরীতে ধনী ও গরিবের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ছিল। তবে ১৯৬০-এর দশকে আরব জেরুসালেম তার সহিংস বিভক্তি থেকে অনেকাংশে উদ্ধার পেয়ে বসবাসের জন্য মনোরম নগরীতে পরিণত হয়। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি সম্ভবত পশ্চিম জেরুসালেমে তাদের ইসরাইলি প্রতিপক্ষদের চেয়ে অনেক উন্নত জীবনমান উপভোগ করত। অবশ্য আধুনিকায়নের প্রক্রিয়াটি জেরুসালেমের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী পরিবেশকে ধ্বংস করেনি। নগরীটি তার বিশেষ আরব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।

নগরীর মর্যাদাও উন্নত হয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিরোধিতা প্রতিরোধ করে ইসরাইলিরা তাদের রাজধানী হিসেবে পশ্চিম জেরুসালেমকে গড়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সেখানেই নেসেট সরিয়ে নেয়। জর্দান মনে করে, তাদেরও জবাব দিতে হবে। ১৯৫৩

সালের জুলাই মাসে জর্দানি মন্ত্রিসভা প্রথমবারের মতো জেরুসালেমে বৈঠক করে। এরপরপরই সেখানে পার্লামেন্টের সভা আহ্বান করা হয়। ১৯৫৭ সালের শুরুতে রাউহি আল-খতিব আরব জেরুসালেমের মেয়র হলে স্থানীয় সরকার অনেকটাই স্থিতিশীলতা অর্জন করে। কঠোর সংযমী ও দক্ষ প্রশাসক হিসেবে তিনি আম্মান ও ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিরাজমান উত্তেজনার কিছুটা প্রশমিত করতে সক্ষম হন। জর্দানের সাথে সম্পর্ক উন্নত হয়। ১৯৫৯ সালে জেরুসালেমের মর্যাদা বালাদিয়া (মিউনিসিপ্যালটি) থেকে বাড়িয়ে আমানায় (জিম্মাদারি) উন্নীত করা হয়। এর মাধ্যমে এর মর্যাদা আম্মানের সমপর্যায়ের হয়ে যায়। বাদশাহ হোসাইন ঘোষণা করেন যে জেরুসালেম হবে জর্দানের দ্বিতীয় রাজধানী। তিনি নগরীর উত্তরে একটি প্রাসাদ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন।

সীমান্তের অপর পাড়ে পশ্চিম জেরুসালেমেও সম্ভবত একই সমস্যা ছিল। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে বেন গুরিয়ান ঘোষণা করেন যে জেরুসালেমে উপস্থিতি বজায় রাখা ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য :

ইহুদি জেরুসালেম ইসরাইল রাষ্ট্রের মূল ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি ইসরাইলের ইতিহাস, ইসরাইলের বিশ্বাস ও আমাদের জনগণের প্রতিটি আত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ। জেরুসালেম হলো ইসরাইল রাষ্ট্রের হৃদয়ের হৃদয়। ১৪

যুদ্ধের ভাগ্যে পশ্চিম জেরুসালেম ইসরাইলি হাতে চলে আসায় নগরীর প্রতি পুরনো জায়নবাদী উদাসিনতা উধাও হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫০-এর দশকে ইসরাইলিরা ইসরাইলের সক্রিয় রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নীতির দিকে অগ্রসর হয়, যদিও আন্তর্জাতিক আইনে এমনটি নিষিদ্ধ ছিল। জাতিসঙ্ঘ তখনো জেরুসালেমকে করপাস সেপারেটাম হিসেবে বহাল রাখতে চাইছিল আর ক্যাথলিক দেশগুলো বিশেষভাবে নগরীর বিভক্তির বিরোধিতা করছিল। ১৯৫২ সালে আইজ্যাক বেন-ভি ইসরাইলের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট হন। তিনি তার অফিস তেল আবিব থেকে জেরুসালেমে সরিয়ে আনেন। ফলে বিদেশী রাষ্ট্রদূতেরা সমস্যায় পড়ে যান। তারা যদি পশ্চিম জেরুসালেমে প্রেসিডেন্টের কাছে পরিচয়পত্র পেশ করেন, তবে তা প্রচ্ছন্নভাবে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে নগরীর

স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে যায়। কোনো কোনো রাষ্ট্রদূত পশ্চিম জেরুসালেমে আসতে শুরু করে দেন। তারপর ১৯৫৪ সালে ব্রিটিশ ও আমেরিকান রাষ্ট্রদূত দুজন যখন জেরুসালেমে প্রেসিডেন্ট বেন-ভির কাছে তাদের পত্র উপস্থাপন করেন, তখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে ধীরে ধীরে বয়কটের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ে ঘোষণা করে যে তারা জাতিসঙ্ঘ প্রস্তাবের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখবে। তবে আনুষ্ঠানিক অস্বীকৃতি সত্ত্বেও ইসরাইলিরা প্রথম রাউন্ডে জয়ী হয়। তারপর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশে শারেত তার প্রধান অফিস পশ্চিম তীরে সরিয়ে নেন। আর বিদেশী দূতেরাও ধীরে ধীরে সেখানে তার সাথে সাক্ষাত করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৬৭ সাল নাগাদ প্রায় ৪০ ভাগ বিদেশী কূটনীতিক তেল আবিব থেকে পশ্চিম জেরুসালেমে সরে যায়।

যদিও পশ্চিম জেরুসালেমকে রাজধানী করতে বিশ্ব বিরোধিতা করছিল, ইসরাইলি সরকার তা অগ্রাহ্য করে চলেছিল। নেসেটের বেশির ভাগ সদস্য ছিল কিতনিক। তারা নগরীগুলোর প্রতি খুব একটা আগ্রহী ছিল না, নগরনীতির ব্যাপারেও তাদের পরিষ্কার কোনো ধারণা ছিল না। রাজধানীর মর্যাদা পাওয়া পশ্চিম জেরুসালেমের যতটুকু উপকৃত হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। সামগ্রিকভাবে ইসরাইলের যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছিল, তা থেকে অনেক কম ছিল পশ্চিম জেরুসালেমের। প্রধান নিয়োগকারী সরকার ও হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এগুলো সম্পদ-উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ছিল না। আবার পশ্চিম জেরুসালেমে পর্যটনও বিকশিত হয়নি। বেশির ভাগ আকষর্ণীয় স্থান পড়েছিল নো ম্যান্স ল্যান্ডের অপর পাড়ে। এখানে ছোট হালকা শিল্প ছিল, দাম ছিল বেশি। ইহুদি জেরুসালেমের কিছু অংশ ছিল বস্তি। আরব দেশগুলো থেকে আসা ইহুদি উদ্বাস্তুরা এখানে ঠাঁই পেয়েছিল। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টি ও ফিলিস্তিনিদের বহিষ্কার করার পর তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। এসব প্রাচ্য, সেফারদি ইহুদিদের প্রথম দলটিকে অ্যাশকেনাজি জায়নবাদী এস্টাবলিশমেন্টের কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য হয়নি। তারা নো ম্যান্স ল্যান্ডের কাছাকাছি অধিকতর বিপজ্জনক এলাকাগুলোতে বাস করত। তারা ছিল আরব অস্ত্রধারীদের নাগালের মধ্যে। ইহুদি নগরীতে বৈষম্য ও ক্ষোভ ছিল।

বস্তুত, পশ্চিম জেরুসালেমে না ছিল দৃঢ়তা, না ছিল ঐক্য। এখানে ছিল অনেক উপনগরী, প্রতিটিতে আলাদা আলাদা জাতিগত বা ধর্মীয় গ্রুপ বাস করত। তারা তাদের মতো করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। এটি নিজের বিরুদ্ধে বিভক্ত নগরীও ছিল : সেফারদিম বনাম অ্যাশকেনাজিম, ধর্মীয় বনাম সেক্যুলার ইহুদি। অর্থোডক্সরা তখনো আবেগপূর্ণভাবে ইসরাইল রাষ্ট্রের বিরোধী ছিল। সাবাথের বিশ্রামদের নিয়ম লঙ্ঘনকারী ইসরাইলিদের গাড়ির দিকে লক্ষ করে পাথর ছোড়ার জন্য সাবাতের দিনে তারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকত। পুরনো নগরী কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিম জেরুসালেম অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। এটি অবশিষ্ট ইসরাইল থেকে বিচ্ছিন্ন ও একেবারে প্রান্তিক অবস্থানে তিন দিক থেকে আরব ভূখণ্ড দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল। উপকূল থেকে আসা রাস্তাগুলোর শেষ প্রান্ত থেকে সামান্য কিছু বেশি ছিল এই নগরী। পরবর্তীকালে মেয়র হওয়া টেডি কলেক বলেছিলেন, এটি ছিল 'একটি সংকীর্ণ করিডোরের প্রান্তে, রাস্তাগুলোর কোনো গন্তব্য ছিল না। আধা ঘণ্টা ধরে গাড়ি চালাতে এক জায়গায় গিয়ে দেখা যাবে লেখা রয়েছে 'থামো! বিপদ! সামনে সীমান্ত! ১৬ তিনি তার ক্লাসিক উপন্যাস মাই মাইকেল-এর উপজীব্য এই পর্যায়ের ঘটনাবলী। ইসরাইলি লেখক অ্যামোস ওজও নগরী হিসেবে পুরনো নগরীর একই অবস্থা তুলে ধরেছেন। নগরীটি তখন মৃত্যু-আঘাতে জর্জরিত। এর শহরতলীগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, দুর্গগুলো নির্জন। ভীতিকর স্থানগুলোতে শেয়াল চড়ে বেড়াচ্ছে। এটি ছিল প্রাচীর, ধ্বংস্তূপ আর পতিত জমির নগরী। এই নগরী এখনো ইহুদি অধিবাসীদের জন্য ছিল বন্ধ।' ওজের নায়িকা হানা জানতে চান, 'কেউ কি জেরুসালেমে বাড়ি থাকার কথা কখনো ভাবতে পারে, এমনকি সে যদি এখানে এক শ' বছরও থাকে?'৮। মনে হয় এটি সাধারণ একটি নগরী। কিন্তু একটি কোণের দিকে তাকালে হঠাৎ করে শূন্যের বিপরীতে তাকানো হবে :

মাথা যে দিকেই ঘোরাবে, দেখবে পাথুরে ভবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ। জলপাই গাছ, শুষ্ক প্রান্তর। সীমা ছাড়ানো ঘন উপত্যকা। অগণিত পায়ে মাড়ানো রাস্তার সংযোগস্থলগুলো জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর নব-নির্মিত ভবনটির আশপাশে গবাদি পশু চড়ছে। ১৯

প্রাচীন নগরীটি নির্মাণ করা হয়েছিল জীবনযাপনে অসম্ভব বিবেচিত মরুভূমির দানবীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে নিরাপদ এলাকা হিসেবে। এখন পশ্চিম জেরুসালেমের নাগরিকেরা সার্বক্ষণিক জনহীন প্রান্তরের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, এই বিপজ্জনক এলাকায় মৃত্যু আর বিলুপ্তির শঙ্কায় থাকত। বস্তুত, খোদ জেরুসালেমই প্রাচীন দুঃস্বপ্ন জনহীন প্রান্তরের আক্রমণের শিকার হয়েছিল। এটি কোনোমতে টিকে ছিল। হানা বলেছেন, 'জেরুসালেম বলে কিছু নেই। ২০

ইসরাইল রাষ্ট্রটি ব্যর্থ হয়ে যাওয়া ঠেকাতে পারত না। ইহুদিদের বিরুদ্ধে হিটলারের নাৎসি ক্রুসেড যদি না ঘটত, তবে জায়নবাদী উদ্যোগটি সফল হতো না কখনোই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিবিরগুলোতে অপরাধ, দুর্বিসহ অবস্থা ও নিষ্ঠুরতার তথ্য প্রকাশের ফলে ইহুদি জনগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতির স্রোত বইয়ে দেয়। এটি নিশ্চিতভাবেই ইহুদি স্বার্থের সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু ৬০ লাখ লোকের মৃত্যুজনিত বিপর্যয়ের সাথে কিভাবে ইহুদি জনগোষ্ঠী ও ইসরাইল রাষ্ট্র মানিয়ে নিয়েছিল? পবিত্র নগরীগুলো শুরুতে স্বর্গ বিবেচিত হয়েছিল, যা ধ্বংস থেকে এর অধিবাসীদের সুরক্ষা দিত। এখন ইউরোপের (যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইহুদিদের ভীতিকর মানসে দুঃস্বপ্নে তাড়িত করত) পৈশাচিক কল্পনার মুখোমুখি হয়ে ইহুদিরা বিলুপ্তির শঙ্কায় পড়ে গেল। এক্সোডাসের কল্পকথায় প্রাচীন ইসরাইলের লোকজন প্রতিশ্রুত ভূমির নিরাপত্তা লাভের জন্য প্রাচীন ইসরাইলের লোকজন মরুভূমির শূন্যতা দিয়ে তাদের সফরের কথা স্মরণ করেছিল। শিবিরগুলোতে ভয়ঙ্করভাবে নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কা থেকেই আধুনিক ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল। তবে পশ্চিম জেরুসালেমে নগরীর মধ্যেই মরুভূমির ভয়াবহ শূন্যতা দেখা যেত : হলুকাস্টের নিয়তি এড়ানোর কোনো উপায় ছিল না। জায়নবাদী নেতারা মোটামুটিভাবে পোল্যান্ড, রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ থেকে এসেছিলেন। তারা প্রায় মৃতে পরিণত হওয়া ইহুদিদের জন্য তাদের রাষ্ট্র নির্মাণ করেছিলেন। এই নতুন সেক্যুলার ইহুদি জেরুসালেমের অন্যতম উপাসনার স্থান ছিল ইয়াদ ভাশেমের হলুকাস্ট মেমেরিয়াল। এর ওহেল আইজকোরে ('মেমোরিয়াল তাবেরনাকল') ২১টি বৃহত্তম মৃত্যু শিবিরের নাম খোদাই করা ছিল। ইসরাইলিদের সৃষ্ট নতুন জেরুসালেমের যে কোনো অর্থই ছিল না, তাতে অবাক হওয়ার মতো কিছু আছে

সামান্যই। শেষ পর্যন্ত আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাব যে অনেক ইহুদি ঐশী স্থানের পুরনো কল্পকথা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে শান্তি খুঁজে পেয়েছিল।

অবশ্য ফিলিস্তিনিরাও দুর্ভোগে ছিল। তারা তাদের আবাসভূমি হারিয়েছে, মানচিত্র থেকে মুছে গেছে। তারাও এক ধরনের নিশ্চিহ্ন হওয়ার মতো অবস্থায় পড়েছে। জেরুসালেম বিভক্তির এসব বছরে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় জেরুসালেমের অধিবাসীরা ছিল সবচেয়ে কষ্টে। ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের বিপর্যয়কে মেনে নিতে হয়েছিল আর ইসরাইলিরা এই অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতার মুখে পড়েছিল যে ইউরোপের নির্মমতার শিকার হয়ে তারা টিকে থাকার মরিয়া চেষ্টায় অন্য জনগোষ্ঠীকে ভয়াবহভাবে আঘাত করেছিল। অন্যকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছিল উভয়েই। আরব পর্যটন মানচিত্রগুলোতে পশ্চিম জেরুসালেমকে ফাঁকা সাদা স্থান হিসেবে দেখানো হতো। ইসরাইলে প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ার একটি কথা বিখ্যাত হয়ে আছে : 'ফিলিস্তিনিদের অস্তিত্ব নেই।' নগরীর উভয় অংশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই এই পারস্পরিক অস্বীকারকে উৎসাহিত করা হতো। ইসরাইলি বা আরব কোনো অংশের শিশুদেরকেই পর্যাপ্তভাবে 'অন্য পক্ষের' ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হতো না। ইসরাইলিরাও আরব জেরুসালেমের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল : আবারো তাদেরকে নগরীতে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছিল না। কয়েক শ' বছর আগে হারানো টেম্পলের জন্য ইহুদিরা মাউন্ট অলিভেস থেকে কাঁদত। ইসরাইলিরা এখন তা করতে পারত না। কারণ পর্বতটি ছিল জর্দানিদের হাতে। উৎসবের দিনগুলোতে মাউন্ট সায়নের উঁচু ভবনগুলোর শীর্ষ থেকে (এখন থেকে ইহুদি মহল্লা দেখা যেত) তারা প্রার্থনা করত।

কিন্তু বাস্তবে নগরীর দুই অংশ একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।২২ জর্দানি সরকারের মধ্যে উত্তেজনা সত্ত্বেও আরব জেরুসালেম ছিল স্বাভাবিকভাবেই প্রাচ্যপ্রবণ, আম্মানমুখী এবং পশ্চিম জেরুসালেমের অগ্রহণযোগ্য বাস্তবতা থেকে দূরে। ইহুদি জেরুসালেমেও ইসরাইলিরা অনিবার্যভাবে তেল আবিব ও উপকূলগামী নো ম্যান্স ল্যান্ডের বিপন্নতা থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল। সীমান্তের পাশে থাকা এলাকাগুলোতে ছিল অনেক বস্তি। সেখানে বসবাস করত সেফারদিম ইহুদিরা। স্নাইপারদের পাল্লার মধ্যে পড়ায় বেন ইয়েহুদি স্ট্রিটের বাণিজ্যিক কেন্দ্রটি অবহেলিত ছিল। পশ্চিমের পাহাড়গুলোর

শীর্ষে নতুন নতুন এলাকা তৈরি করা হয়েছিল। পশ্চিম জেরুসালেমের ভৌগোলিক কেন্দ্র এখন গিবাত রামে অবস্থিত হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ছিল ১৯৪৮-পূর্ব মিউনিসিপ্যালের অনেক পশ্চিমে। এই অবস্থা চলতে থাকলে জেরুসালেম সত্যিই দুটি আলাদা নগরীতে পরিণত হতো। দুই নগরীর মাঝখানে থাকত মনুষ্যহীন ও নো ম্যান্স ল্যান্ডের কাঁটাতারের বেড়া।

বেন গুরিয়ানের নতুন রাতি লেবার পার্টির সদস্য টেডি কোলেক ১৯৬৫ সালে পশ্চিম জেরুসালেমের মেয়র হন। তিনি সীমান্তের অপর পাড়ের রাহি আল-খতিবের মতোই বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। মোটাসোটা, উজ্জ্বল বর্ণের প্রাণবন্ত এ লোকটি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে ইসরাইলি মিউনিসিপ্যালটিকে বেশি স্থিতিশীলতা প্রদান করেন। তিনি পশ্চিম জেরুসালেমকে উপকূলমুখী করার চেষ্টা করেন। সীমান্তের ঠিক লাগোয়া মিউনিসিপ্যালটি ভবনটি নতুন জেরুসালেমের পশ্চিম অংশে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কোলেক যেখানে ছিলেন, সেখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ মেয়র ও তার কাউন্সিলকে তাদের সীমান্ত বস্তিগুলোতে থাকা প্রাচ্যের ইহুদিদের পরিত্যাগ করা উচিত হবে না। সর্বোপরি 'সীমান্তে অবস্থান করার মাধ্যমে আমরা আমাদের বিশ্বাসকে চূড়ান্ত পর্যায়ে জেরুসালেমের একত্রীকরণের আশ্বাস দিচ্ছিলাম। ২৩ যুদ্ধপরবর্তী বিভক্তি ও অভাব- অনটনের মধ্যে ইসরাইলিরা সামগ্রিকতা ও একীকরণের স্বপ্ন নিয়ে কাজ শুরু করেছিল।

ইসরাইল ও আরব দেশগুলো ১৯৬৭ সালের মে মাসে আরেকটি যুদ্ধের ভয়ঙ্কর শঙ্কার মুখে পড়ে। ১৩ মে সিরিয়াকে সোভিয়েতরা অবগত করে যে ইসরাইল তাদের দেশে হামলা চালানোর দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। তাদেরকে সম্ভবত ভুল তথ্য প্রদান করা হয়েছিল। কারণ এ ধরনের হামলার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। তবে মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদাল নাসের তার আরব মিত্রের বিরুদ্ধে এই অনুমিত হুমকির প্রতিক্রিয়ায় সিনাই উপদ্বীপে এক লাখ সৈন্য মোতায়েন করেন, ইসরাইলি জাহাজ চলাচলের জন্য আকাবা উপসাগর বন্ধ করে দেন। সঙ্ঘাত থেকে দূর থাকার জন্য জর্দানের কাছে ইসরাইল অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও ৩০ মে জর্দানের বাদশাহ হোসেন মিসরের সাথে একটি

সামরিক চুক্তিতে সই করেন। পরাশক্তিগুলো পক্ষ নেয়, ভয়ঙ্কর সঙ্ঘাত আসন্ন বলে মনে হয়। ইসরাইলিদেরকে নাসেরের আবেগপূর্ণ বাগাড়ম্বরতা, তাদের সবাইকে সাগরে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকির কথা শুনতে হয়। অনিবার্যভাবেই তাদেরকে সবচেয়ে খারাপ পরিণতি ও নতুন হলুকাস্টের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয়।

অবশ্য যুদ্ধ শুরুর তিন সপ্তাহ আগে পশ্চিম জেরুসালেম অত্যন্ত খুশির দিন অতিবাহিত করে, তারা তাদের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এটি ছিল বিশেষ ঘটনা : বার্ষিকীটির হিসাব করা হয়েছিল হিব্রু পঞ্জিকা অনুসারে। ফলে ১৯৬৭ সালের মতো ১৪ মে বিশেষ দিবসের সামঞ্জস্য হওয়ার ঘটনাটি ঘটে বিরলভাবে। জেরুসালেমে কোনো অস্ত্র বা সামরিক সরঞ্জামের অনুমোদন জাতিসঙ্ঘ না দেওয়ায় সামরিক প্যারেড হয়নি। এর বদলে কোলেক পরামর্শ দেন সুপরিচিত গায়ক নোয়ামি শেমারের একটি গান মিউনিসিপ্যাল স্পন্সর করবে। 'জেরুসালেম অব গড' সাথে সাথে বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। এটি ছিল করুণ অবস্থায় থাকা নগরীর প্রতি 'এর হৃদয়ে থাকা প্রাচীরের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গীত। এতে ইসরাইলি জীবনের দুর্বোধ্যতাও প্রকাশ করে :

কিভাবে জলাধারগুলো শুকিয়ে গেছে :

বাজার ফাঁকা

পুরনো নগরীর টেম্পল মাউন্ট কেউ সফর করে না। অবশ্য নগরী কোনোভাবেই জনশূন্য হয়নি। এর সুক ছিল জনাকীর্ণ। এখানে বিলাসী পণ্য বিক্রি হতো, যা পশ্চিম জেরুসালেমের ইসরাইলিদের কাছে সহজলভ্য ছিল না। হারাম ছিল ধার্মিক মুসাফির ও ইবাদতকারীদের দিয়ে পরিপূর্ণ। এই গানেও ধরে নেওয়া হয়েছিল যে আরব জেরুসালেমের কোনো অস্তিত্ব নেই। এদিকে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট আমলের জেরুসালেমের প্রখ্যাত প্রধান রাব্বির ছেলে রাব্বি ভি ইয়েহুদা কুক পশ্চিম জেরুসালেমের অপর পারে মারকাজ হারাভ ইয়েশিভায় ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম উদযাপন উপলক্ষে বার্ষিক ধর্মীয় বক্তৃতা করছিলেন। হঠাৎ করে তার শান্ত কণ্ঠস্বর উচ্চকণ্ঠ হয়ে গেল, তার শ্রোতাদের কাছে মনে হলো তার ওপর নবুয়তি আত্মা ভর করেছে। একপর্যায়ে তিনি চিৎকার করে কাঁদলেন;

ইরেতজ ইসরায়েলের জীবন্ত দেহ থেকে বের হওয়া টেম্পল মাউন্ট, হেবরন, শেচেম ও জেরিকোর মতো নগরী (ইহুদি জনগোষ্ঠীর কাছে পবিত্র বিবেচিত পশ্চিম তীরের জেরুসালেম) ও স্থানগুলো নিয়ে আকূলতা প্রকাশ করলেন। রাব্বি কেঁদে কেঁদে বললেন, গোয়িমদের হাতে এসব পবিত্র স্থান রাখা পাপ।২৪ তিন সপ্তাহ পর ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর ট্যাঙ্কগুলো যখন পশ্চিম তীরের এসব নগরীতে ঢুকে পড়ে, জেরুসালেমের পুরনো নগরীর সাথে ইহুদি জনসাধারণকে আবার একত্রিত করে তখন রাব্বিকে ইসরাইলের সত্যিকারের নবী হিসেবে অভিনন্দিত করা হয়।

1. জায়ন?

যে হলুকাস্ট নিয়ে ১৯৬৭ সালে বিপুলসংখ্যক ইসরাইলি আতঙ্কে ছিল, তা সন্দেহাতীতভাবে কখনো তাদের সামনে আসেনি। ৫ জুন ইসরাইলি বাহিনী সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আগাম হামলা চালায়, মিসরীয় বিমান বাহিনীর প্রায় পুরোটা মাটিতেই ধ্বংস করে দেয়। জেরুসালেমের সুরক্ষা অপর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও এই ঘটনার অনিবার্যভাবে জর্দানকে যুদ্ধে টেনে নেয়। মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য ছিল সেখানে। তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল। হলি সিটি রক্ষার জন্য দুই শ' লোক জীবন দেয়। কিন্তু ৭ জুন বুধবার ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী পুরনো নগরী ঘিরে ফেলে, লায়ন গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। তখনো বেশির ভাগ বেসামরিক ইসরাইলি নাগরিক বিমান হামলা থেকে রক্ষা পেতে নিরাপদ আশ্রয়ে ছিল। তবে মুখে মুখে আরব জেরুসালেম দখলের খবর ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে লোক ম্যান্ডেলবাম গেটের সামনে জড়ো হয়।

এদিকে ইসরাইলি সৈন্য ও অফিসারদের লক্ষ্য ছিল একটি : যত দ্রুত সম্ভব ওয়েস্টার্ন ওয়ালে যাওয়া। সৈন্যরা সরু রাস্তাগুলো দিয়ে দৌড়ে হারাম প্লাটফর্মে ছুটে যায়, আড়চোখে একনজরে মুসলিম উপাসনা স্থানগুলো দেখে নেয়। অল্প কিছু সময় আগেও প্রায় ২০ বছর ধরে ইহুদিদের জন্য বন্ধ হয়ে থাকা ছোট্ট স্থানটিতে সাত শ' সৈন্য ক্যামোফ্লাজ মুখে রক্তভেজা পোশাকে গাদাগাদি করে অবস্থান করছিল। বেলা প্রায় ১১টার দিকে জেনারেলরা পৌঁছাতে শুরু করে, আইডিএফের প্রধান রাব্বি জেনারেল শলোমো গোরেনকে আনা হয়। ১৯২৯ সালের পর প্রথমবারের মতো শোফার ফোঁকার সম্মান তাকেই দেওয়া হয়। প্রাচীরে রাব্বি ভি ইয়েহুদা কুককে নিয়ে আসার জন্য জনৈক প্লাটুন কমান্ডার একটি জিপও পাঠান। এসব লোকের ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, প্রাচীরের সামনে আসা ছিল বিপুল ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, এমনকি মর্মভেদী বিষয়ও। মাত্র কয়েক দিন আগে তারা নিশ্চিহ্ন হওয়ার শঙ্কায় পড়েছিল। এখন তারা আবারো অপ্রত্যাশিতভাবে ইহুদি বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্র স্থান হিসেবে পরিচিত এলাকার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছে। সেক্যুলার তরুণ ছত্রীসেনারা পাথরগুলো আঁকড়ে ধরল, কেঁদে ফেলল : অন্যরা ছিল প্রচণ্ড রকমের হতবিহ্বল, এমনকি তাদের পক্ষে নড়াচড়া করাও অসম্ভব বলে মনে

হচ্ছিল। রাব্বি গোরেন যখন শোফার ফুঁকলেন, সুর করে সাম পাঠ করতে লাগলেন, নাস্তিক অফিসারেরা তখন একে অপরজে জড়িয়ে ধরলেন। এক তরুণ সৈনিক স্মৃতিচারণ করেছেন যে তার মাথা ঝিমঝিম করছিল, তার পুরো দেহ জ্বলে গিয়েছিল। এটি ছিল নাটকীয় ও অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন যা পুরনো ইহুদি কল্পকথনের প্রায় বিস্ময়কর পুনরাবৃত্তি। আবারো ইহুদি জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুখে পড়েছিল, কিন্তু আবারো তারা ঘরে ফিরতে পেরেছে। এই ঘটনা ঐশী স্থানটির স্বাভাবিক সব অভিজ্ঞতা উস্কে দিলো। প্রাচীরটি স্রেফ কোনো ঐতিহাসিক স্থান ছিল না, বরং তা ছিল একটি প্রতীক যা দ্বিধাহীনভাবে প্রতিটি সৈনিকের ইহুদি পরিচিতির মূলে পৌঁছে গিয়েছিল। এটি ছিল উভয় অন্যটি- 'এমন কিছু যা বড় ও ভয়ঙ্কর এবং অন্য বিশ্ব থেকে আগত'- এবং প্রবলভাবে পরিচিত- 'এক পুরনো বন্ধু, ভুল করা অসম্ভব। এটি ভয়ঙ্কর তবে মুগ্ধকারী; পবিত্র, এবং একইসাথে ইহুদি সত্তার প্রতিফলিত ছবি। এটি দাঁড়িয়ে আছে টিকে থাকার জন্য, ধারাবাহিকতার জন্য, মানবজাতির আকাঙ্ক্ষা করা চূড়ান্ত সমন্বয় সাধনের প্রতিশ্রুতির জন্য। পাথরগুলোতে চুমু খাওয়ার সময় আব্রাহাম দাভদেভানির মনে হলো একইসাথে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যত তার সামনে উপস্থিত হয়েছে : 'আর কোনো ধ্বংসের প্রয়োজন নেই, প্রাচীরটি আর কখনো নিঃসঙ্গ হবে না।' এটি সহিংসতার, ধ্বংসের ও বিচ্ছিন্নতার সমাপ্তির পূর্বাভাস দিচ্ছে। এটি এমন এক বিষয় যা অন্যান্য প্রজন্ম হয়তো স্বর্গে প্রত্যাবর্তন বলে অভিহিত করেছে।

'বিজয়ী প্রজন্মকে দেখতে এমনই মনে হয়। ১৯৬৭ সালে পুরনো নগরী জয়ের পর উল্লসিত ইহুদি সৈন্যরা ডোম অব দি রকের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছিল।

ধার্মিক ইহুদিরা, বিশেষ করে রাব্বি কুক দি ইয়ংগারের শিষ্যদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে পরিত্রাণ শুরু হয়ে গেছে। তারা মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগের রাব্বির কথাগুলো স্মরণ করে স্থির বিশ্বাসে পৌছাল যে ঈশ্বর তাকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। বিজয়ের দিনে প্রাচীরটির সামনে দাঁড়িয়ে রাব্বি কুক ঘোষণা করলেন যে 'স্বর্গীয় আদেশে' ইহুদি জনগোষ্ঠী 'এই মাত্র পবিত্রতা ও আমাদের নিজস্ব পবিত্র নগরীর বাড়িতে ফিরেছে।' তার ছাত্র ইসরাইল 'অ্যারিয়াল' স্টিটিগলিজ প্রাচীর ত্যাগ করে হারাম প্লাটফর্মে হেঁটে ছিলেন। এসময় পাক-

সাফের বিধান ও নিষিদ্ধ এলাকাটি নিয়ে তার মধ্যে কোনো পরোয়া ছিল না, রক্তের ছাপ ও নোংরার ব্যাপারেও তার কোনো খেয়াল ছিল না। পরে তিনি স্মৃতিচারণ করেছিলেন : ‘আমি এমন এক স্থানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানে উচ্চ পুরোহিত বছরে একবার প্রবেশ করতেন খালি পায়ে, মিকভায় পাঁচবার অবগাহন করে। তবে আমি ছিলাম জুতা পরা, সশস্ত্র অবস্থায় ও হেলমেট পরিহিত। আমি নিজেকেই বলেছিলাম, বিজয়ী প্রজন্মকে দেখতে এমনই মনে হয়।০ শেষ যুদ্ধে লড়া হয়ে গিয়েছিল, ইসরাইল এখন পুরোহিতদের জাতিতে পরিণত হয়েছে। এখন সব ইহুদি হলি অব হলিজে প্রবেশ করতে পারে। রাব্বি কুক বারবার বলছিলেন যে পুরো ইসরাইলি সেনাবাহিনী ছিল ‘পবিত্র’ এবং এর সৈন্যরা দৃঢ় পদক্ষেপে ঈশ্বরের উপস্থিতির দিকে এগিয়ে যাবে।

নাৎসি হলুকাস্টের ব্যাপারে আর কখনো নয়!’ পরিভাষাটি এখন সাথে সাথে ইহুদিদের ঠোঁটে ঠোঁটে ছড়িয়ে পড়ছিল। এ মর্মান্তিক ঘটনাটি নতুন রাষ্ট্রের পরিচিতির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে যায়। অনেক ইহুদি ইসরাইল রাষ্ট্রটিকে অন্ধকারের মুখে নতুন জীবন সৃষ্টির প্রয়াস হিসেবে বিবেচনা করে। নাসেরের ঘৃণামিশ্রিত বাগাড়ম্বরতার কারণে হলুকাস্টের স্মৃতি ‘ছয় দিনের যুদ্ধের’ আগের সপ্তাহগুলোতে অনিবার্যভাবেই ভাসছিল। এখন তারা ওয়েস্টার্ন ওয়ালে ফিরে ‘আর কখনো নয়!’ পরিভাষা এই নতুন প্রেক্ষাপটেই শোনা গিয়েছিল। বিজয়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাব্বি কুক ঘোষণা করলেন ‘আমরা আর কখনো এখান থেকে নড়ব না।’ জেনারেল মোশে দায়ান ছিলেন ঘোষিত নাস্তিক। তিনি প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে বিভক্ত জেরুসালেম নগরী ‘পুনঃএকত্রিকরণের’ কাজ করছে আইডিএফ। ‘আমরা আমাদের সবচেয়ে পবিত্র স্থানে ফিরে এসেছি; আমরা ফিরে এসেছি এবং আমরা আর কখনো এগুলো ফিরিয়ে দেব না।’ তিনি নগরীর সব গেট খুলে দিতে, কাঁটাতারের বেড়াগুলো সরিয়ে ফেলতে এবং নো ম্যান্স ল্যান্ডে থাকা সব মাইন অপসারণের নির্দেশ দেন। পেছনে ফেরার আর কোনো প্রশ্নই নয়।

নগরীর প্রতি ইসরাইলের দাবি ছিল সংশয়পূর্ণ। ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরাইল কেবল জেরুসালেম নয়, পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা, সিনাই উপদ্বীপ ও গোলান মালভূমিও (মানচিত্র দেখুন) দখল করে। ১৯০৭ সালের হেগ রেগুলেশন্স বা ১৯৪৯ সালের জেনেভা

কনভেনশন- কোথাও ইসরাইলি দাবির প্রতি সমর্থন ছিল না। আন্তর্জাতিক আইনে কোথাও সামরিকভাবে জয় করা ভূমি স্থায়ীভাবে নিজের করে নেওয়ার অনুমোদন ছিল না। প্রধানমন্ত্রী লেভি ইশকলসহ অনেক ইসরাইলি আরব বিশ্বের সাথে শান্তি স্থাপনের বিনিময়ে সিরিয়া, মিসর ও জর্দানকে এসব অধিকৃত এলাকা ফিরিয়ে দিতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু জেরুসালেমের পুরনো নগরী আরবদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্ন ১৯৬৭ সালে ছিল না। ওয়েস্টার্ন ওয়াল বিজয়ের মাধ্যমে একসময়ের প্রবল সেক্যুলার জায়নবাদী ধারায় অতিপ্রাকৃত উপাদান প্রবেশ করে। এমনকি সবচেয়ে কট্টর নাস্তিকও তাদের হলি সিটিকে 'পবিত্র' হিসেবে অভিহিত করে। জাতিসঙ্ঘে নিযুক্ত ইসরাইলি প্রতিনিধি আবা ইবান বিষয়টি বলেছেন এভাবে, জেরুসালেম নিহিত রয়েছে 'নিচে ও ওপরে, আগে ও পরে, সব রাজনৈতিক ও সেক্যুলার বিবেচনায়।' ইসরাইলিদের কাছে বিষয়টিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখা ছিল অসম্ভব। কারণ তাদের সামনে থাকা প্রাচীরটি ছিল ইহুদি আত্মা।

বিজয়ের সন্ধ্যায় লেভি ইশকল ঘোষণা করেন যে জেরুসালেম হলো 'ইসরাইলের চিরন্তন রাজধানী। ১০ নগরী বিজয় এত বিপুল অভিজ্ঞতা ছিল যে, অনেক ইহুদি লোকজনের কাছে, তা অনিবার্যভাবে 'সঠিক' মনে হতে থাকে : এটি ছিল নির্বাসনে থাকার সময় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইহুদিদের মধ্যে লালিত কল্পকথন ও কিংবদন্তিগুলোর চমকপ্রদ স্মৃতিচারণ। কাব্বালবাদীদের কাছে মনে হলো, জায়নে ফিরে এসেছে ইসরাইল, বিশ্বের সবকিছু ও পুরো মহাবিশ্ব এর যথার্থ স্থানে ফিরেছে। অবশ্য জেরুসালেমের আরবেরা এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কোনোভাবেই একমত হতে পারছিল না। ইসরাইলি বিজয় নগরীর 'পুনএকীকরণ' ছিল না, বরং এটি ছিল এক বৈরী শক্তির দখলদারিত্ব। আরব বাহিনীর প্রায় দুই শত সৈন্যের লাশ রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে ছিল; আরব বেসামরিক লোকজনকে হত্যা করা হয়। ইসরাইলি রিজার্ভ ইউনিটগুলো অস্ত্রের সন্ধানে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালায়, ওয়ান্টেড তালিকায় থাকা শত শত ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার করা লোকজন তাদের পরিবারগুলো ছেড়ে যায়, তাদের মনে হচ্ছিল, তারা যাচ্ছে মৃত্যুর পথে। সন্ধ্যায় যখন তাদের ফিরতে দেওয়া হয়, তখন তারা কান্নায় স্বাগত জানায়, মনে করতে থাকে আজরাইলের কবল থেকে তারা ফিরে এসেছে। সৈন্যদের পেছনে পেছনে আসছিল লুটেরা

বাহিনী। কয়েকটি মসজিদে লুটপাট চালানো হয়, ফিলিস্তিন আর্কিওলজি মিউজিয়াম থেকে ডেড সি স্কুল সরিয়ে নেওয়া হয়। পুরনো নগরী ও পূর্ব জেরুসালেমের ফিলিস্তিনি বাসিন্দারা ভয়ে তাদের বাড়িতে দরজা বন্ধ করে থাকে। এই অবস্থা কাটে মেয়র রুহি আল-খাতিবের উদ্যেগে। তিনি এক ইসরাইলি অফিসারকে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে ঘর থেকে বের হয়ে এসে দোকানপাট খুলতে বলেন তাদেরকে, যাতে লোকজন খাবার কিনতে পারে। ৯ জুন শুক্রবার আরব মিউনিসিপ্যালের অর্ধেক কর্মী কাজে যোগ দেয়। মেয়র ও তার সহকারীর নির্দেশে তারা মৃতদের দাফন করতে থাকে, পানিব্যবস্থা মেরামত করতে থাকে। পরে তাদের সাথে পূর্ব জেরুসালেমের ইসরাইলি মিউনিসিপ্যাল শ্রমিকরা যোগ দেয়।

তবে এই সহযোগিতা স্থায়ী হয়নি। টেডি কোলেক একেবারে বিজয়ের দিনেই দায়ানের কাছে গিয়ে প্রতিশ্রুত দেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নো ম্যান্স ল্যান্ডের অপসারণ কাজ তদারকি করবেন। কাজটিতে মারাত্মক বিপদ ও জটিলতা ছিল। দায়ানের মতো তিনিও 'সৃষ্ট বাস্তবতার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন, যা হলি সিটিতে স্থায়ী ইহুদি উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করবে, যাতে করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষে এটি খালি করার কোনো প্রশ্নই না আসে। শনিবার রাতে, ২ জুন, অস্ত্র বিরতি সই হওয়ার পর, মাগরিবি কোয়ার্টারের ৬১৯ জন অধিবাসীকে তিন ঘণ্টা সময় দেওয়া হয় তাদের বাড়িঘর খালি করার জন্য। তারপর বুলডোজার দিয়ে এ ঐতিহাসিক এলাকাটি (জেরুসালেম ওয়াকফ) গুঁড়িয়ে দিয়ে এর আয়তন হ্রাস করা হয়। জেনেভা কনভেনশনের লঙ্ঘনমূলক এ কাজটি তদারকি করেন কোলেক। তিনি চেয়েছিলেন ওয়েস্টার্ন ওয়ালে সম্ভাব্য হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর স্থান সঙ্কুলানের মতো যথেষ্ট বড় একটি প্লাজা সৃষ্টি করতে। এটি ছিল নগর পুনরুদ্ধারের' দীর্ঘ ও অব্যাহত প্রক্রিয়ার শুরু মাত্র। আর এই পুনরুদ্ধারের মূলে ছিল ঐতিহাসিক আরব জেরুসালেম ধ্বংস করা। আর তা নগরীর অবয়ব ও বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বদলে দেয়।

ইসরাইলি নেসেট ২৮ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে পুরনো নগরী ও পূর্ব জেরুসালেমকে যুক্ত করে একে ইসরাইল রাষ্ট্রের অংশ বলে ঘোষণা করে। এটি ছিল হেগ কনভেনশনের সরাসরি পরিপন্থী। ইতোমধ্যেই আরব দেশগুলো, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট ব্লক

অধিকৃত আরব জেরুসালেম থেকে প্রত্যাহার করার জন্য ইসরাইলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। নগরীকে স্থায়ীভাবে জয় করা বিবেচনা না করার জন্য ইসরাইলিদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিল ব্রিটেন। এমনকি ইসরাইলের প্রতি সবসময় প্রসন্ন থাকা যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত নগরীর মর্যাদা পরিবর্তন করার কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক আইন প্রণয়ন না করার জন্য হুঁশিয়ার করে দেয়। কারণ আন্তর্জাতিক আইনে এর কোনো অবকাশ নেই। নেসেটের নতুন আইন ও ২৮ জুনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্সে সতর্কভাবে 'স্থায়ীকরণ' শব্দটি পরিহার করা হয়েছিল। ইসরাইলিরা এর বদলে আরো ইতিবাচক পরিভাষা 'একত্রীকরণ ব্যবহার করে। একইসাথে জেরুসালেম মিউনিসিপ্যালের সীমানাও সম্প্রসারণ করে নেসেট, যাতে নগরী এখন আরো বিস্তৃত এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। নতুন সীমানাগুলো এমন কৌশলে আঁকাবাঁকা করে করা হয় যাতে বিশাল আরব লোকজন বাইরে থাকে এবং নতুন নতুন ইসরাইলি বসতি স্থাপনের জন্য প্রচুর ফাঁকা জায়গা পাওয়া যায়। (মানচিত্র দেখুন) এটি নিশ্চিত করে যে নগরীর ভোটদাতা লোকজন প্রধানত ইহুদি থাকবে। দখলের পর শেষ পর্যন্ত মেয়র আল-খাতিব ও তার পরিষদকে অপমানজনক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরখাস্ত করা হয়। সামরিক পুলিশ তাদেরকে তাদের বাড়ি থেকে মিউনিসিপ্যাল ভবনের কাছাকাছি থাকা গ্লোরিয়া হোটেলে নিয়ে যায়। সেখানে উপ সামরিক গভর্নর ইয়াকব সালমান আগে থেকে তৈরি একটি বিবৃতি ভাষণের মতো করে পাঠ করে জানান যে মেয়র ও তার পরিষদের সেবার আর প্রয়োজন নেই। আল-খাতিব লিখিত বিবৃতির অনুরোধ করলে সালমানের সহকারী ডেভিড ফারহি হোটেলের পেপার ন্যাপকিনে ক্ষিপ্র হাতে লিখে তা আরবিতে অনুবাদ করে দেন।১২ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল মেয়রকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানাতে এবং তার ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে তার কাছে জেরুসালেমের নতুন আইনগত মর্যাদা ব্যাখ্যা করার জন্য। কিন্তু তা করা হয়নি। সাবেক মেয়র ও তার পরিষদ সদস্যরা তাদেরকে বরখাস্ত করার কারণে কষ্ট পাননি। তারা মনে করতেন, তাদের বরখাস্ত করা অনিবার্য। যা তাদের অপমানিত করেছে তা হলো অপদস্থ ও অমর্যাদার অনুষ্ঠান। এমন অনুষ্ঠান ওই ঘটনার জন্য মানানসই ছিল না। ইসরাইলি সরকারের কিছু কিছু সদস্য মনে করেছিলেন যে আরব মিউনিসিপ্যালটি পশ্চিম জেরুসালেমের মিউনিসিপ্যালটির সাথে বা অধীনে পাশাপাশি থেকে কিছু ধরনের কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। টেডি কোলেক এতে সম্মত হননি। তিনি বলেছিলেন, আরবেরা

আমার কাজে সমস্যার সৃষ্টি করবে। তিনি সংবাদপত্রকে বলেন, 'জেরুসালেম এক নগরী। কাজেই এতে একটি মিউনিসিপ্যালটি থাকবে। ৩

নগরীকে বিভক্তকারী প্রতিবন্ধকতাগুলো অপসারণ করা হয় ২৯ জুন দুপুরে, আরব ও ইসরাইলিরা নো ম্যান্স ল্যান্ড অতিক্রিম করে 'অন্য দিকে' যায়। বিজয়ী ইসরাইলিরা উচ্ছ্বসিতভাবে পুরনো নগরীতে ছুটে যায়, সুকে দেখতে পাওয়া সবকিছু কিনতে থাকে। তারা কষ্টের সাথে দেখে যে আরবেরা বিলাসবহুল খাবার, আমদানি করা বিদেশী পণ্য উপভোগ করছিল, যা পশ্চিম জেরুসালেমে পাওয়া যায় না। আরবরা ছিল বেশি ইতস্তত। তাদের অনেকে কাতামন ও বাকায় তাদের পুরনো বাড়ির চাবিগুলো সাথে নিয়েছিল। ওইসব স্থানেই তারা ১৯৪৮ সাল থেকে বাস করছিল, তারা তাদের সাবেক বাড়িঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তাকায়। আরবেরা যখন দরজায় নক করে তাদের পারিবারিক বাড়িগুলোর ভেতরটা দেখার জন্য বিনীতভাবে অনুমতি চাইছিল, তখন কিছু ইহুদি অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল। অবশ্য কোনো সহিংসতা ঘটেনি। দিন শেষে ইসরাইলিদের মনে সাধারণভাবে বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে আরবরা নগরীর 'একীকরণকে মেনে নিতে শুরু করেছে। পরের ঘটনাবলীতে প্রমাণিত হয়েছিল যে, তারা স্রেফ হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। আল-কুদস আরবদের কাছেও পবিত্র স্থান ছিল। ফিলিস্তিনিরা ১৯৪৮ সালে তাদের স্বকীয়তা বিলীন হওয়ার কষ্ট সহ্য করেছিল। এখন তারা জেরুসালেম থেকেও নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করেছিল। তাদের সাবেক মেয়র হুহি আল-খাতিব হিসাব কষেছিলেন যে ইসরাইলি যুদ্ধের কারণে ১৯৬৭ সালে প্রায় ১০৬,০০০ আরব জেরুসালেমবাসী প্রবাসী হয়েছিল।১৪ এখন সুবিধামতো সীমানা টানার কারণে নগরীর মোট জনসংখ্যার মাত্র প্রায় ২৫ ভাগে পরিণত হয়েছে আরবেরা। গৃহহীনতা, বিচ্ছিন্নতার কারণে প্রবাসে ফিলিস্তিনিরা দুর্ভোগ পোহাচ্ছিল। তারা কাব্বালবাদীদের স্বপ্নে অংশীদার হতে পারছিল না : তাদের ক্ষেত্রে সবকিছুই ভুল স্থানে ছিল। স্থানচ্যুতি ও হারানোর এই অভিজ্ঞতা আরবদের কাছে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে জেরুসালেমকে বেশি মূল্যবান করে তোলে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও ইসরাইলের জেরুসালেম যুক্ত করার বিষয়টি গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিল না। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে জাতিসঙ্ঘ এই 'একীকরণ' বাতিল করার জন্য এবং জেরুসালেমের মর্যাদা পরিবর্তন করে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য ইসরাইলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে দুটি প্রস্তাব পাস করে। যুদ্ধ ও এর পরিণাম অবশেষে ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের দুর্দশার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখন আরো হাজার হাজার লোক ইসরাইল অধিকৃত এলাকা থেকে পালিয়ে আরব দেশগুলোর আশপাশের শিবিরগুলোতে ভিড় করতে থাকে। সবশেষে ১৯৬৭ সালের ২২ নভেম্বর জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদ ২৪২ নম্বর প্রস্তাব পাস করে : ছয় দিনের যুদ্ধের সময় ইসরাইল যেসব ভূখণ্ড দখল করেছে, সেখান থেকে তাকে অবশ্যই প্রত্যাহার করতে হবে। এই অঞ্চলের সব রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে।

কিন্তু বেশির ভাগ ইসরাইলি ও প্রবাসে থাকা অনেক ইহুদি ঐশী স্থানের প্রতি তাদের নতুন আবেগে বাঁধা পড়েছিল তারা। তারা এসব প্রস্তাবের বৈধতা মেনে নিতে পারছিল না। টেম্পল ধ্বংসের পর ইহুদিরা ধীরে ধীরে বাস্তবভাবে জেরুসালেম দখল করার ধারণা ত্যাগ করেছিল। ঐশী ভূগোল অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছিল, অনেক অর্থোডক্স তখনো ইসরাইল রাষ্ট্রকে অপবিত্র মানব সৃষ্ট বিবেচনা করছিল। তবে ৭ জুনের নাটকীয় ঘটনাগুলো এই ধারণা বদলাতে শুরু করে। পরিস্থিতি কনস্টানটাইন আমলের জেরুসালেম নিয়ে খ্রিস্টান ধারণায় পরিবর্তনের চেয়ে অমিল ছিল না। ইহুদিদের মতো খ্রিস্টানেরাও মনে করত যে তারা ঐশী স্থানগুলোতে ভক্তিতে সীমিত থাকার অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। কিন্তু খ্রিস্টের সমাধির সাথে অপ্রত্যাশিত পুনঃএকীকরণের সাথে সাথে ঐশী প্রতীক হিসেবে জেরুসালেম নিয়ে নতুন প্রশংসার পথ সৃষ্টি করে। ইহুদিদের মতো চতুর্থ শতকের খ্রিস্টানেরাও নৃশংস নির্যাতনের আমল থেকে বের হয়ে এসেছিল। ইহুদিদের মতো তারা আবারো বিশ্বের সম্পূর্ণ 'নতুন রাজনৈতিক অবস্থান করায়ত্ত করেছিল সদ্য। নাৎসি বিপর্যয় এমন গভীর একটি আঘাত চাপিয়ে দিয়েছিল যা যৌক্তিক সান্ত্বনায় আরোগ্য লাভ করার মতো ছিল না। পুরনো কল্পকথন- প্রাচীন ধরনের মনোস্তত্ত্ব – আত্মার অপেক্ষাকৃত কম যৌক্তিকভাবে বোধগম্য অংশের আরো গভীরে পৌঁছাতে পারে। জেরুসালেমের পবিত্রতার এই নতুন

ইহুদি আবেগ স্রেফ জাতিসঙ্ঘের নির্দেশনা বা তর্কসাপেক্ষ যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যায় না। এটি আইনসম্মত বা যৌক্তিক- এজন্য শক্তিশালী ছিল না, বরং এটি কল্পকথন বলেই যথাযথ হয়েছিল।

কনস্টানটাইনের সময়ে খ্রিস্টের সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছিল ইতিহাসের অন্যতম প্রথম লিপিবদ্ধ করা প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজে। সমাহিত ও তখন পর্যন্ত অগম্য পবিত্রতায় যাওয়ার জন্য মাটির নিচে খনন করার এ প্রক্রিয়াটি নিজে থেকেই ছিল মনোস্তাত্ত্বিক উপশম লাভের অনুসন্ধানের একটি শক্তিশালী প্রতীক। চতুর্থ শতকে খ্রিস্টানেরা আর নির্যাতিত, অসহায় সংখ্যালঘু না হওয়ায় তাদের ধর্মকে নতুন করে মূল্যায়ন করছিল, নতুন খ্রিস্টান পরিচিতি নির্মাণের লক্ষ্যে সংগ্রাম করে (প্রায়ই বেদনার সাথে) শক্তির উৎস খুঁজছিল। ফ্রয়েড প্রত্নতত্ত্ব ও মনোস্তত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় তাড়াহুড়া করেছেন। ইসরাইলেও, যেমনটা ইসরাইলি লেখক অ্যামোস অ্যালন প্রবলভাবে অনুভব করেছেন, প্রত্নতত্ত্ব আধা-ধর্মীয় আবেগপূর্ণ বিষয় হয়ে পড়েছিল। কৃষিকাজের মতো এটি ছিল ভূমির সাথে অভিবাসীদের একে নিজের করে নেওয়ার উপলক্ষ। তারা যখন পূর্ববর্তী সময়ের ফিলিস্তিনের ইহুদি জীবনের জমিনে অবয়বগত প্রমাণ পেল, তখন তারা দেশটির প্রতি তাদের অধিকারে নতুন বিশ্বাস লাভ করল। এটি তাদের ফিলিস্তিনি পূর্বসূরিদের ব্যাপারে থাকা তাদের সন্দেহ প্রশমিত করতে সহায়তা করে। ইসরাইলের সবচেয়ে বিখ্যাত সৌখিন প্রত্নতত্ত্ববিদ মোশে দায়ন এ ব্যাপারে এক সাক্ষাতকারে বলেছেন যে প্রত্নতত্ত্বে ইসরাইলিরা তাদের 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' আবিষ্কার করেছির। তারা জানতে পেরেছিল যে তাদের পূর্বপুরুষেরা তিন হাজার বছর আগে এই দেশে ছিল। এটি ছিল মূল্যবোধ... এর মাধ্যমে তারা লড়াই করেছিল, এ নিয়েই তারা বেঁচেছিল।১৫ অ্যালন যুক্তি দিয়েছেন, দেশপ্রেমমূলক প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানের এই কাজে 'বিশ্বাস বা ফ্রয়েডিয়ান বিশ্লেষণ হিসেবে এটি লক্ষ করা সম্ভব ছিল যে উপশমের একটি ধরন অর্জন; মানুষ তাদের সন্দেহ ও ভয় থেকে উত্তানো এবং সত্যিকারের বা কল্পিত ভয় থেকে উদ্ধার পেয়ে লুকানো মূলের দিকে যায় সবসময়। ১৬

ছয় দিনের যুদ্ধে জয় করা 'ডেড সি স্ক্রলগুলো রাখার জন্য নির্মিত প্রদর্শন হল দেখাচ্ছে, ইসরাইলিরা কিভাবে তাদের নিজস্ব প্রয়োজনের আলোকে ঐশী ভূগোলের পুরনো প্রতীকের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এর শ্বেত গম্বুজটি ইহুদি জেরুসালেমের সবচেয়ে বিখ্যাত স্মারকে পরিণত হয়। নেসেটের দিকে মুখ করা এ গম্বুজটি হলি সিটির প্রতি দাবি করে খ্রিস্টান ও মুসলিম গম্বুজগুলোকে চ্যালেঞ্জ করছে। অ্যালন উল্লেখ করেছেন, ইসরাইলিরা এই বিরোধপূর্ণ দেশে মালিকানার দলিল হিসেবে ক্রলগুলোকে বিবেচনা করে। ১৯৪৭ সালে এগুলোর আবিষ্কারের সময়ই কাকতালীয়বাবে ইহুদি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ফলে ফিলিস্তিনে ইসরাইলের পূর্ববর্তী অস্তিত্ব একেবারে যথাযথ সময়ে প্রমাণিত হয়। 'শ্রাইন অব দি বুক' নামে পরিচিত ভবনের নামটিই এর ঐশী তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপাসনালয়টির গর্ভাশয়-ধরনের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করতে হয় একটি কৃষ্ণ, সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ দিয়ে। এটি আসলে আদি শান্তি ও সম্প্রীতিতে ফিরে যাওয়ার গ্রাফিক প্রতীক। আর তা বিশ শতকের সেক্যুলার সমাজের জন্মপূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত। উপাসনালয়টির কেন্দ্রে থাকা শিষ্ণু, মুগুর-সদৃশ ভাস্কর্যটি টিকে থাকার জাতীয় ইচ্ছাটিই প্রদর্শন করে। তবে এটি হারানো স্বর্গে নারী ও পুরুষের একসাথে থাকার জীবনকেও ফুটিয়ে তোলে। পবিত্র স্থানটি অনেক সময়ই উর্বরতার উৎস হিসেবে বিবেচিত হতো। ইলোন বলেছেন, উপাসনালয়ের 'প্রত্নতাত্ত্বিক ও জাতীয়তাবাদ প্রাচীন ও পুনর্জীবিত উর্বরতার শাস্ত্রাচারের ঐক্যবদ্ধ রূপ। শ

কামরানের তীব্র ধর্মতত্ত্বের মতো উপশম ও জাতীয় পরিচিতির এই অনুসন্ধানের একটি আগ্রাসী দিকও রয়েছে। প্রথম থেকেই মোশে দায়ান পরিষ্কার করে দেন যে ইসরাইল খ্রিস্টান ও মুসলিমদেরকে তাদের নিজস্ব উপাসনালয়গুলো পরিচালনার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। ইসরাইলিরা গর্বভরে জর্দানিদের আচরণের (তারা ওয়েস্টার্ন ওয়ালে ইহুদিদের প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করেছিল) সাথে তাদের আচরণের তুলনা করে। বিজয়ের পর ওই দিনই পশ্চিম তীরের সামরিক গভর্নর একটি সভা করে জেরুসালেমের সব খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে আশ্বাস দেন। আর ১৭ জুন দায়ান মুসলিমদেরকে বলেন যে তারা হারামের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখতে পারবে। রাব্বি গোরেনের স্থাপিত আর্কটি তাকে দিয়ে অপসারণ করিয়ে সেটিকে প্লাটফর্মের দক্ষিণ প্রান্তে স্থাপন করতে

বলেন দায়ান। হারামে প্রার্থনা করা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করা ইহুদিদের জন্য নিষিদ্ধ করে ইসরাইলি সরকার। কারণ এটি এখন মুসলিম পবিত্র স্থান। ইসরাইলি সরকার কখনো এই নীতি থেকে সরে আসেনি। এতে প্রমাণিত হয় যে জায়নবাদী বিজয়ীরা জেরুসালেমে তাদের পূর্বসূরীদের পবিত্র অধিকারের প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধাহীন ছিল না। তবে দায়ানের সিদ্ধান্তটি সাথে সাথে কিছু ইসরাইলির মধ্যে ক্রোধের সৃষ্টি করে। জেরুসালেমে একটি গ্রুপ টেম্পল মাউন্ট ফেইথফুল নাম দিয়ে সংগঠিত হয়। তারা বিশেষভাবে ধার্মিক ছিল না। তাদের অন্যতম নেতা গারশোম সোলোমন ছিলেন বেগিনের ডানপন্থী হেরুত পার্টির সদস্য। তার ধর্মীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার চেয়ে অনেক বেশি ছিল জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনা। তিনি যুক্তি দেন যে টেম্পল মাউন্টের ওপর ইহুদিদের প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ করার কোনো অধিকার নেই দায়ানের। কারণ হলি প্লেসেস বিল সব উপাসনাকারীকে স্বাধীন প্রবেশাধিকার দিয়েছে। অন্য দিকে টেম্পল মাউন্ট যেহেতু প্রাচীন ইসরাইলের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র, তাই নেসেট, প্রেসিডেন্টের বাসভবন ও সরকারি অফিসগুলো হারামে সরিয়ে নেওয়া উচিত।' গুরুত্বপূর্ণ ইহুদি উৎসবগুলোতে টেম্পল মাউন্ট ফেইথফুল হারামে প্রার্থনা করা অব্যাহত রাখে, নিয়মিতভাবে পুলিশ তাদেরকে বের করে দেয়। মাগরেবি কোয়ার্টার ধ্বংস করার ক্ষেত্রেও একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল : ইসরাইলি উগ্রপন্থীদের দৃষ্টিতে পবিত্র স্থানটিতে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তনের সাথে সেখানে মুসলিম উপস্থিতির ধ্বংসের বিষয়টি সম্পৃক্ত।

বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় ১৯৬৭ সালের আগস্টে। ওই সময় রাব্বি গোরেন ও কয়েকজন ইয়েশিভা ছাত্র অ্যাভের নবম দিবসে মুসলিম রক্ষী ও ইসরাইলি পুলিশের সাথে দস্তাদস্তির পর হারামে এগিয়ে যান। তারা উপাসনায় অংশ নেন। এটি শেষ হয় রাব্বি গোরেনের শোফার ফোঁকার মাধ্যমে। ইসলামের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধের অস্ত্রে পরিণত হয় প্রার্থনা। দায়ান মুসলিমদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি একটি মামলুক মাদরাসায় গোরেনের প্রতিষ্ঠিত রাব্বানেত অফিস বন্ধ করে দেন। অবশ্য উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ামাত্র ধর্মমন্ত্রী জেরাহ ওয়ারফতিগ একটি সাক্ষাতকার প্রকাশ করে দাবি করেন যে আরুনাহ দি জেবুসাইতের কাছ থেকে দাউদের স্থানটি কেনার পর থেকেই টেম্পল মাউন্ট ইসরাইলের মালিকানাধীন রয়েছে।১৯ তিনি বলেন, এর ফলে ডোম অব দি রক ও আকসা মসজিদ

ধ্বংস করার আইনগত অধিকার আছে ইসরাইলের। অবশ্য মন্ত্রী আসলে কর্মপন্থা হিসেবে এই সুপারিশ করেননি। কারণ ইহুদি বিধানে বলা হয়েছে, কেবল মেসাইয়াকেই তৃতীয় টেম্পল নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হবে। (স্মরণ করা যায় যে এমনকি এ ধরনের উপাসনালয় কার্যত চতুর্থ ইহুদি মন্দির হলেও হেরডের নির্মাণকাজের সময় উপাসনার ধারাবাহিকতায় কোনো বিরতি পড়েনি। ফলে এটি দ্বিতীয় টেম্পল হিসেবেও পরিচিত হয়।)

বিজয়ের দিন, ওয়েস্টার্ন ওয়ালে চুমু খাওয়ার জন্য জমায়েত হওয়া সৈন্যদের মনে হয়েছিল যে শান্তি ও সম্প্রীতির নতুন যুগের সূচনা ঘটেছে। তবে বাস্তবে শান্তির নগরী জায়নে আবারো ঘৃণা আর অনৈক্যের দৃশ্য দেখা যেতে থাকে। পবিত্র স্থানগুলো ইহুদিদের কাছে ফিরিয়ে দিলে তা কেবল ইসলামের সাথেই নতুন করে সজ্ঘাতের সৃষ্টি করত না, সেইসাথে ইসরাইলি সমাজের মধ্যেও গভীর সজ্ঘাতের সৃষ্টি করত। মাগরিবি কোয়ার্টারকে ধ্বংস করে প্রায় সাথে সাথে নতুন প্লাজা সৃষ্টির ঘটনাটি ইহুদিদের মধ্যে বিবাদের নতুন উৎসে পরিণত হয়। কোলেকের ত্বরিত পদক্ষেপ দৃশ্যত কেবল অমানবিকই ছিল না, বরং সেইসাথে নন্দনগতভাবেও ছিল ভুল। পুরনো সংকীর্ণ বদ্ধ এলাকাটি যতটুকু ছিল, তার চেয়ে বড় দেখাত। এখন এটি তানজিকিয়া মাদরাসা বা সোলায়মানের নগর প্রাচীরের লাগোয়া প্রাচীরগুলোর চেয়ে উঁচু দেখাতে লাগল। এসব প্রাচীর এখন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হলো। উদ্বোধনের দিনে এক সফরকারী হতাশার সাথে বলেছিলেন, ‘এর বিশাল বিশাল পাথর ছোট মনে হয়, এগুলোর আকার বিলীন হয়ে গেছে।’ প্রথম নজরে প্রাচীরটি ‘বাম দিকে বাড়িগুলোর পাথরের সাথে মিশে গিয়েছে।’ সংকীর্ণ এলাকার ঘনিষ্ঠতা বিদায় নিয়ে গেছে। নতুন প্লাজাটি আর মনোস্তাত্ত্বিক ঘনিষ্ঠতার সুযোগ দেয় না, যে-ই আসবে, সে-ই আগের মতোই তার স্রষ্টার সাথে একক হয়ে যাওয়ার অনুভূতি লাভ করে না। ২০

অল্প সময়ের মধ্যে স্থানটির ব্যবস্থাপনা ও করণীয় নিয়ে ধার্মিক ও সেক্যুলার ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে অপবিত্র বিরোধ বিস্ফোরিত হয়। প্রাচীরটি এখন পর্যটক আকর্ষণের স্থান, লোকজন আর কেবল প্রার্থনার জন্য সেখানে যেত না। ফলে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রাচীরের একেবারে সামনে বেড়া দিয়ে নতুন প্রার্থনা স্থান নির্মাণ করতে চাইল। এতে

সেক্যুলার ইসরাইলিরা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ল : মন্ত্রণালয় কিভাবে অন্য ইহুদিদের প্রাচীরে যেতে না দেওয়ার সাহস দেখায়? তারা তো জর্দানিদের মতোই খারাপ লোক! শিগগিরই রাব্বিরাও এই পবিত্র স্থানের সত্যিকারের প্রেক্ষাপট নিয়ে তিক্ত সঙ্ঘাতে জড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ যুক্তি দিলো যে প্রাচীরের সামনে থাকা অংশসহ পুরো ওয়েস্টার্ন ওয়াল পবিত্র। তারা তানজিকিয়া মাদরাসার বেসমেন্ট খুঁড়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলোর একটিতে সিনাগগ প্রতিষ্ঠা করে ঘোষণা করল, প্রতিটি কক্ষ বা ভল্টকে তারা পবিত্র স্থানের মর্যাদা দিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমেরা শঙ্কিত হলো যে এই ধর্মীয় প্রত্নতত্ত্ব চরমভাবে ও আক্ষরিকভাবে তাদের নিজস্ব পবিত্র স্থানটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তবে রাব্বিরা ইহুদি সেক্যুলারপন্থীদেরকেও জেরুসালেম থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছিল। তারা মিউনিসিপ্যাল এলাকার ঈশ্বরহীন স্থানে পবিত্রতার সীমান্ত ঠেলে দিচ্ছিল। এই সংগ্রাম আরো তীব্র হয়েছিল ইসরাইলি প্রত্নতত্ত্ববিদ বেনিয়ামিন মাজার হারামের দক্ষিণ প্রান্তে খননকাজ শুরু করায়। এটি আবারো মুসলিমদের আতঙ্কিত করে।

তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে এতে আকসা মসজিদের ভিত্তিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পবিত্র স্থানগুলোতে এই অপবিত্র অনুপ্রবেশে ধার্মিক ইহুদিরাও ক্ষুব্ধ হয়েছিল। বিশেষ করে মাজারের ওয়েস্টার্ন হিলের পাদদেশে তার তৎপরতা চালালে ও রবিনসন্সের আর্চ পর্যন্ত এগুতে থাকলে তারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। নগরীর ‘একীকরণের’ কয়েক মাসের মধ্যে ওয়েস্টার্ন ওয়ালে একটি নতুন ‘বিভাজন’ সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ প্রান্ত এখন নতুন ঐতিহাসিক, ‘সেক্যুলার’ জোন; পুরনো প্রার্থনা এলাকাটি ছিল ধর্মীয় প্রাধান্যবিশিষ্ট; এবং এই দুয়ের মাঝামাঝি ছিল একটি নিরপেক্ষ এলাকা বা নতুন নো ম্যান্স ল্যান্ড। এখানে অবশিষ্ট কয়েকটি আরব বাড়ি ছিল। এগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া মাত্র প্রতিটি পক্ষ অন্য পক্ষের এলাকার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। ১৯৬৯ সালের গ্রীষ্মকালের দুটি ঘটনায় উপাসনাকারীরা আক্ষরিক অর্থেই ঈশ্বরের জন্য এই নিরপেক্ষ এলাকাটি মুক্ত করতে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আক্রমণ করেছিল।

ইসরাইলি সরকার পবিত্র স্থানগুলোতে শান্তি বজায় রাখার উদ্যোগ নিলেও তখন জেরুসালেমের দখল নিয়ে নিজস্ব যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল, ভবনের সময়োত্তীর্ণ অস্ত্রের আশ্রয়

নিয়েছিল।২২ প্রায় সাথে সাথেই পূর্ব জেরুসালেমের চারপাশে সুউচ্চ অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের নিরাপত্তা জোন নির্মাণের মাধ্যমে জেরুসালেম আরো ইহুদি আনার নতুন 'সত্য' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে। এগুলো নির্মাণ করা হয় ফ্রেঞ্চ হিল, রামাত এশকল, রামত, ইস্ট তালপিত, নেভে ইয়াকুক ও গিরোতে। (মানচিত্র দেখুন) আরো কয়েক মাইল পূর্ব দিকে জর্দান উপত্যকার পাহাড়গুলোর কাছে মালুত আদুমিনে বাইরের একটি নিরাপত্তা বেষ্টনি নির্মাণ করা হয়। নির্মাণকাজ চলে ক্ষিপ্রগতিতে, বেশির ভাগই আরব ভূমি দখল করে। কৌশলগত রাস্তাগুলো একটি বসতি থেকে অপরটিকে সংযুক্ত করে। এটি কেবল নান্দনিক বিপর্যয়ই জেরুসালেমের স্কাইলাইন এসব কুৎসিত ব্লকে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল) ছিল না, সেইসাথে দীর্ঘ দিন ধরে থাকা আরব এলাকাগুলো কার্যত ধ্বংস করা হয়েছিল। দখলের ১০ বছরের সময়কালে ইসরাইলি সরকার আরবদের কাছ থেকে প্রায় ৩৭,০৬৫ একর জমি দখল করে। এটি ছিল জয় ও ধ্বংসের কাজ। বর্তমানে পূর্ব জেরুসালেমের মাত্র ১৩.৫ ভাগ আছে আরবদের হাতে। ২৩ নগরীটি বাস্তবিকই 'ঐক্যবদ্ধ' হয়েছে। কারণ, ইহুদি ও আরব জেরুসালেমের মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো পার্থক্য নেই। তবে নবীরা যে ঐক্যবদ্ধ জায়নের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন, এটি তেমন ছিল না। ইসরাইলি ভূগোলবিদ মাইকেল রোমান ও আলেক্স ওয়াইড পরিকল্পনাকারীদের যুধ্যংদেহী পরিভাষা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে তারা যখন 'আচ্ছন্ন করা, 'লঙ্ঘন করা, 'অনুপ্রবেশ করা,' 'ভূখণ্ডগত আধিপত্য,' ও 'নিয়ন্ত্রণ'- এর কথা বলে, তাতে নগরীর আরব জনসাধারনের প্রতি তাদের আগ্রাসী উদ্দেশ্যই প্রকট হয়। ২৪

তারা আল-কুদস থেকে নিংড়ে বের করে দেওয়া হবে এমন আশঙ্কায় আরবরা নিজস্ব কায়দায় প্রতিরোধে নামে, যদিও এই ভবন আক্রমণ প্রতিরোধে তাদের কিছুই করার ছিল না। তারা সরকারের কাছ থেকে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ছাড় আদায় করতে সমর্থ্য হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে তারা কাজি আইন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। এটি ইসরাইলের মূল ভূখণ্ডে মুসলিম কর্মকর্তাদের ওপর আরোপ করা হয়েছিল। জেরুসালেমের কাজি আইন বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, ওয়াকফ ও নারীদের মর্যাদার মতো বিষয়াদিতে পরিবর্তন এনে ইসরাইলি আইনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের ২৪ জুলাই আলেমেরা ঘোষণা করেন, তারা সুপ্রিম মুসলিম কাউন্সিল

পুনর্জীবন করতে যাচ্ছেন। কারণ মুসলিম ধর্মীয় বিষয়াদি অবিশ্বাসীদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হওয়াটা ইসলামি বিধানের পরিপন্থী। সরকার অধিকতর মুসলিম বিরোধীদের কয়েকজনকে বহিষ্কার করে এর জবাব দিলেও শেষ পর্যন্ত কৌশলে হলেও সুপ্রিম মুসলিম কাউন্সিলের অস্তিত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়। আরবেরাও জেরুসালেমে ইসরাইলি শিক্ষাব্যবস্থা আরোপ করার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রচারকাজ চালায়। কারণ, এটি তাদের নিজস্ব জাতীয় আকাঙ্ক্ষা, ভাষা ও ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করেনি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাইবেল, মিসনাহ ও হাগাদার জন্য যেখানে বরাদ্দ ছিল ১৫৬ ঘণ্টা, সেখানে কোরআনের জন্য ছিল মাত্র ৩০ ঘণ্টা। এসব স্কুল থেকে শিক্ষা লাভকারী ছাত্রদের আরব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করার জন্য যোগ্য বিবেচিত হতো না। শেষ পর্যন্ত সরকারকে আপস করতে হয়, নগরীতে জর্দানি কারিকুলাম সমান্তরালভাবে চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়।

ইসরাইলিরা আবিষ্কার করতে থাকে যে জেরুসালেমের আরবরা ইসরাইলি মূল ভূখণ্ডের আরবদের মতো ততটা মানানসই নয়। আগস্টে তারা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় : ১৯৬৭ সালের ৭ আগস্ট সব দোকানপাট, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও রেস্তোরাঁ সারা দিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়। পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটিয়ে ইয়াসির আরাফাতের ফাতাহর চরমপন্থী সদস্যরা নগরীর ভেতরে সেল প্রতিষ্ঠা করে সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করে। এসব সেলের তিনটি একযোগে ৮ অক্টোবর জায়ন সিনেমা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ১৯৬৮ সালেল ২২ নভেম্বর জাতিসঙ্ঘ প্রস্তাব ২২-এর বার্ষিকীতে মাহানে ইয়েহুদা মার্কেটে এক গাড়ি বোমায় ১২ জন নিহত হয়, ৫৪ জন আহত হয়। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে আরো কয়েকটি গাড়ি বোমা হয় : একটি হয় হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ায়। এতে ২৬ জন নিহত হয়। এই হামলায় বেশ ক্ষতি হয়। ইসরাইলের অন্য যেকোনো নগরীর চেয়ে পশ্চিম জেরুসালেমেই সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসী হামলা হয়, আর স্বাভাবিকভাবেই এর প্রতিশোধ নেয় ইহুদিরা। ১৯৬৮ সালের ১৮ আগস্ট নগরীর কয়েকটি স্থানে বিস্ফোরণ ঘটার পর কয়েক শত তরুণ ইহুদি আরব এলাকাগুলোতে চড়াও হয়ে দোকানপাটে ভাংচুর চালায়, রাস্তায় যে আরবকেই দেখেছে, তাকে প্রহার করে।

এই আরববিরোধী নিধনযজ্ঞে ইসরাইলি লোকজন কষ্ট পায়। তারাও ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ছড়িয়ে পড়া আরব ঘৃণা ও সন্দেহের গভীরতা দেখে আতঙ্কিত হয়। ওই সময় আকসা মসজিদে আগুন লেগে নূরউদ্দিনের বিখ্যাত মিম্বারটি ধ্বংস হয়ে যায়, সিলিংকে ঠেস দেওয়া কাঠের বিমগুলো পুড়িয়ে দেয়। শত শত মুসলিম মসজিদে ছুটে যায়, কাঁদতে কাঁদতে জ্বলতে থাকা ভবনে ঢুকে পড়ে। তারা ইসরাইলি দমকল বাহিনীর সদস্যদের প্রতি চিৎকার করে গালিগালাজ করে, আগুনে গ্যাসোলিন ছিটানোর জন্য তাদেরকে অভিযুক্ত করে। নগরজুড়ে আরবেরা বিক্ষোভ করে, পুলিশের সাথে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়। হারামে কিছু ইসরাইলির উত্তেজক আচরণের বিষয়টি বিবেচনা করা হলে মুসলিমদের জন্য এটি বিবেচনা করা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে অগ্নিসংযোগকারী ছিল জায়নবাদী। অবশ্য বাস্তবে অগ্নিসংযোগকারী ছিল অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত ডেভিড রোহান নামের এক তরুণ খ্রিস্টান পর্যটক। খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন ত্বরান্বিত করার আশায় তিনি মসজিদে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। রোহান ইহুদি এজেন্ট নয়, তিনি সত্যিই খ্রিস্টান এবং হারামের উপাসনালয়গুলো ধ্বংস করার কোনো পরিকল্পনা ইহুদিদের নেই- এই তথ্য বিশ্বাস করিয়ে মুসলিমদের ভয় দূর করতে ইসরাইল সরকারের কয়েক মাস সময় লেগেছিল।

নতুন ইহুদি বসতিগুলো ১৯৭৪ সাল নাগাদ জেরুসালেমের স্কাইলাইনে প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে, পুরনো ক্রুসেডার ক্যাসলগুলোর মতো নগরীকে ঘিরে ফেলে। আবারো জেরুসালেম পরিণত হয় দুর্গ নগরী, বৈরী প্রতিবেশীদের কোণঠাসা করে।

পরের চার বছরে জেরুসালেমে চাপা ক্ষোভ নেমে আসে। অবশ্য এমন লক্ষণও দেখা যেতে থাকে যে ইসরাইলি ও আরবরা একে অপরের সাথে বসবাস করা রপ্ত করতে শুরু করেছে। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে নাসেরের মৃত্যুর পর ইসরাইল রাষ্ট্রের এই শত্রুর জন্য শোক শোভাযাত্রা আয়োজন করতে জেরুসালেমের আরবদের অনুমতি দেয় সরকার। বৃহস্পতিবার, ১ অক্টোবর, নগরীর পুরো আরব জনগোষ্ঠী নীরবে সমবেত হয়, নিখুঁত শৃঙ্খলায় শোভাযাত্রা করে হারামে যায়। সমঝোতা অনুযায়ী কোনো ইসরাইলি পুলিশ রাস্তায় ছিল না, আবার কোনো ইসরাইলবিরোধী প্লাকার্ডও দেখা যায়নি। অবশ্য এই শান্তির সময়ও অনেক ইসরাইলি আশা করলেও ফিলিস্তিনিরা তাদের দাবি ত্যাগ করেনি। তারা

সুমাদ ('অবিচলতা') নীতি গ্রহণ করে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে নগরীতে তাদের প্রকাশ্য উপস্থিতিই তাদের প্রধান অস্ত্র। ইসরাইল তাদেরকে যেসব কল্যাণমুখী ও অর্থনৈতিক সুবিধা দিতে আগ্রহী সেগুলো গ্রহণ করতে হবে, তদেরকে জেরুসালেমে অব্যাহতভাবে বাস করতে হবে, সন্তান জন্ম দিতে হবে। এক ফিলিস্তিনি নেতা বলেছিলেন, 'আমরা আমাদেরকে ছুঁড়ে ফেলার অজুহাত তোমাদেরকে দেব না। আমরা কেবল সেখানে উপস্থিত থেকেই প্রতিদিন তোমাদের মনে করিয়ে দেব যে জেরুসালেম সমস্যাটির সমাধান করতে হবে। ২৫

যম কিপুরে ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে ইসরাইলের ওপর আকস্মিকভাবে হামলা চালায় মিসর ও সিরিয়া। এটি দুই পক্ষের মধ্যকার মনোভাব বদলে দেয়। এবার আরবরা অনেক ভালো করে। ঘোর কাটিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালাতে আইডিএফের কয়েক দিন সময় লাগে। জেরুসালেমে ফিলিস্তিনিদের মনোবল চাঙ্গা হয়, তারা আশা করতে থাকে যে আল-কুদসে ইসরাইলি দখলদারিত্ব কেবল সাময়িক ব্যাপার হবে। আত্মতৃপ্তি কেটে যায় ইসরাইলের। নিকট প্রাচ্যে ইসরাইল তাদের নিঃসঙ্গতার বিষয়টি নতুন করে বুঝতে পারে। এই ভয় ইসরাইলের নতুন অপরিবর্তনীয় মনোভাবের সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে ধর্মীয় গ্রুপগুলোর মধ্যে। যুদ্ধের অল্প সময় পর রাব্বি কুকের শিষ্যরা গুশ ইমুনিম (ব্লক অব দি ফেইথফুল) প্রতিষ্ঠা করে।২৬ ইসরাইলি এস্টাবলিশমেন্টের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা কেটে গিয়েছিল : ঈশ্বর ১৯৬৭ সালে ইসরাইলকে দারুণ একটি সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু অধিকৃত ভূখণ্ডে উপনিবেশ গড়া ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অগ্রাহ্য করার বদলে সরকার স্রেফ গয়িমকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে গেছে। যম কিপুর যুদ্ধ হলো ঈশ্বরের শাস্তি এবং এর মাধ্যমে কল্যাণকরভাবে আসল দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেক্যুলার জায়নবাদের মৃত্যু ঘটেছিল : এর বদলে পরিত্রাণ ও তাওরাতের জায়নবাদের প্রস্তাব করে গাশ। যুদ্ধের পর এর সদস্যরা অধিকৃত ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন শুরু করে। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিল যে এই পবিত্র উপনিবেশকরণের ফলে মেসাইয়ার আগমন ত্বরান্বিত হবে। গাস তৎপরতার প্রধান লক্ষ্য জেরুসালেম নয়, ছিল হেবরন। এখানে এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রাব্বি মোশে লেভিঙ্গার হেবরনের পাশে কিরিয়াত আরবায় নতুন শহর প্রতিষ্ঠার জন্য ইসরাইলি সরকারকে রাজি করাতে দক্ষ লবি জোগাড় করতে সক্ষম

হয়েছিলেন। এখানে বসতি স্থাপনকারীরা প্যাট্রিয়ার্ক কেভে আরো বেশি প্রার্থনার সময়ের দাবিতে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করল। ওই সময় পর্যন্ত ইহুদিদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই কেবল প্রার্থনা করার অনুমতি দেওয়া হতো। কিন্তু লেভিঙ্গার হেবরন নগরীতে ইহুদিদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করতে এবং ১৯২৯ সালের দাঙ্গার সময় ইহুদিদের গণহত্যার প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই যেখানে মানবীয় অবয়বে ইব্রাহিম তার ঈশ্বরের চাক্ষুষ সাক্ষাত পেয়েছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে, ওই স্থানটি ইসরাইলের সবচেয়ে সহিংস ও ঘৃণা-তাড়িত নগরীতে পরিণত হলো।

তারপর ১৯৭৭ সালে লেবার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে মেনাহেম বেগিনের নতুন লিকুদ পার্টি ক্ষমতায় এলে ডানদের আশা তুঙ্গে ওঠে, বিশেষ করে যখন পশ্চিম তীর প্রশ্নে ব্যাপক বসতি স্থাপনের জন্য নতুন সরকার আহ্বান জানায়। তবে তখন বেগিন আরববিশ্বের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করলে তার জনগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ২০ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদত তার ঐতিহাসিক জেরুসালেম সফর করেন। পরের বছর তিনি ও বেগিন ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে সই করেন। ইসরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় মিসর, এর বিনিময়ে সিনাই উপদ্বীপ থেকে প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দেন বেগিন। এটি ইসরাইলি বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে তীব্র সঙ্ঘাতের সৃষ্টি করে। তারা সিনাইয়ে ইহুদি নগরী ইয়ামিত নির্মাণ করেছিল। তারা এই নগরী গুঁড়িয়ে দেওয়া ঠেকাতে শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়াই করে যায়। নতুন ডানপন্থী গ্রুপগুলো চুক্তির বিরোধিতা করে জোট গঠন করে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যায়।

টেম্পল মাউন্টই ক্রমবর্ধমান হারে জেরুসালেমে নতুন উগ্রপন্থীদের তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। রাব্বি শলোমো অভিনার ১৯৭৮ সালে রাব্বি কুকের মারকেজ হারাভের সম্প্রসারণ হিসেবে ইয়েশিভাত অ্যাটেরেট হা-খুহানিম ('ক্রাউন অব দি প্রিস্টস ইয়েশিবা') প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৭ সালের জয়ের পর সরকার পুরনো ইহুদি কোয়ার্টার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। জর্দানি আমলে তা উদ্বাস্তু শিবিরে পরিণত হয়েছিল। ভাঙ্গা সিনাগগগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়, পুরনো বিধ্বস্ত বাড়িগুলো গুঁড়িয়ে নতুন নতুন বাড়িঘর, দোকানপাট ও গ্যালারি নির্মাণ করা হয়। আতেরেত হা- কোহানিমের চোখে এগুলো পর্যাপ্ত

ছিল না। প্রধানত আমেরিকান ইহুদিদের তহবিলে মুসলিম কোয়ার্টারের আরব সম্পত্তি কিনতে শুরু করে ইয়েশিভা। ১০ বছরের মধ্যে তারা ৭০টির বেশি ভবনের মালিক হয়ে যায়।২৭

অবশ্য, নতুন ইয়েশিভার প্রধান কাজ ছিল টেম্পলের ধর্মীয় অর্থ নিয়ে গবেষণা করা।২৮ রাব্বি অ্যাভিনার নিজেও বিশ্বাস করতেন না যে ইহুদিদের তৃতীয় টেম্পল নির্মাণ করা উচিত। তার মতে, এই দায়িত্ব মেসাইয়ার জন্য সংরক্ষিত। তবে তার সহকারী রাব্বি মেনাচেম ফ্রুম্যান চাইতেন তার শিষ্যরা যেন টেম্পলে উপাসনাসহ সামগ্রিক কাজের জন্য প্রস্তুত থাকে, যাতে মেসাইয়া আসামাত্র তারা তাকে সহায়তা করতে পারে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, নিকট ভবিষ্যতেই মেসাইয়ার আগমন ঘটবে। তিনি বলির বিধিবিধান ও পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, এই লোকবিদ্যা সম্পর্কে তার ছাত্রদের নির্দেশিকা প্রদান করেন। রাব্বি ডেভিড এলবোইম তাওরাতের নির্দেশনা পুঙ্গানুপুঙ্খভাবে (এবং তা প্রায়ই অস্পষ্ট) পুরোহিদের পোশাক বুনতে শুরু করেন।

অন্যরা বিশ্বাস করত যে আরো সুস্পষ্ট পদক্ষেপ প্রয়োজন। সাদাতের জেরুসালেম সফরের সামান্য পরই গাসের দুই সদস্য ইয়েহুদা ইজায়ন ও মেনাচেম লিভনি জেরুসালেমের কাব্বালপন্থী ইয়েহোশুয়া বেন-শোশানের সাথে গোপন বৈঠক করেন। ধীরে ধীরে একটি গোপন আন্দোলন গঠিত হয়। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল ডোম অব দি রক উড়িয়ে দেওয়া। এটি নিশ্চিতভাবেই শান্তি-প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেবে, ইহুদিদের ধর্মীয় দায়দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বজুড়ে ইহুদিদের মধ্যে প্রবল ধাক্কার সৃষ্টি হবে। তবে তারা বিশ্বাস করত, আধ্যাত্মিক বিপ্লবের ফলে মেসাইয়াকে পাঠাতে ও চূড়ান্ত পরিত্রাণে বাধ্য হবেন ঈশ্বর। লিভনি ছিলেন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। তিনি হিসাব করে দেখলেন যে আশপাশের এলাকার ক্ষতি সাধন না করেই ডোম অব দি রক গুঁড়িয়ে দিতে ২৮ কেজি নিখুঁত বোমার প্রয়োজন। তারা গোলান মালভূমির একটি সামরিক শিবির থেকে বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক সংগ্রহ করেন। তবে ১৯৮২ সালের হামলার মুহূর্তটিতে তাদের উদ্যোগকে আশীর্বাদ দিতে তারা কোনো রাব্বিকে পেলেন না। গ্রুপটির মধ্যে কেবল ইতজিয়ন ও বেন-শোশানই কোনো রাব্বির

অনুমোদন ছাড়া মিশন অব্যাহত রাখতে চেয়েছিলেন। ফলে পরিকল্পনাটি স্থগিত হয়ে গেল।

ইসরাইলে একটি ধর্মীয় উদ্দীপনার আবির্ভাব ঘটেছিল। এটি সহমর্মিতাবোধ নয়, বরং খুনে ঘৃণা বাড়িয়ে তুলছিল। ১৯৮০ সালে এনজিয়নের গ্রুপটি হেবরনে ছয় ইয়েশিবা ছাত্রকে হত্যার বদলা নিতে পশ্চিম তীরে পাঁচ আরব মেয়রকে বিকলাঙ্গ করার ষড়যন্ত্র করে। ষড়যন্ত্রটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। তবে দুই মেয়রকে নৃশংসভাবে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। ঘৃণার এই নতুন ইহুদিবাদের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ মূর্তরূপ ছিলেন রাব্বি মেইর কাহানি। তিনি নিউ ইয়র্কে তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। সেখানেই তিনি ইহুদিদের ওপর কৃষ্ণাঙ্গ যুবকদের হামলার প্রতিশোধ নিতে জিউশ ডিফেন্স লিগ গঠন করেছিলেন। ইসরাইলে এসে কাহানে খ্রিস্টান মিশনারিগুলোর কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জেরুসালেমের রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ আয়োজন করতে লাগলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, তার কার্যক্রম পবিত্র ভূমিতে গোয়িমের উপস্থিতি বিষয়ে নির্দিষ্ট রাব্বানীয় ঘোষণায় অনুমোদিত। অবশেষে ১৯৭৫ সালে কাহানে কিরয়ারত আরবায় চলে গিয়ে তার সংগঠনের নাম রাখেন ক্যাচ ('শক্তিবলে')। এখন তার প্রধান লক্ষ্য হলো ইসরাইল রাষ্ট্র থেকে আরবদের তাড়িয়ে দেওয়া। ১৯৮০ সালে দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ডোম অব দি রক ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের জন্য সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য কারারুদ্ধ হন।

এসব উগ্র গ্রুপে যোগদানকারী লোকজন সেকেলে বা অশিক্ষিত ছিল না। আকসা মসজিদে বোমা পোঁতার জন্য ১৯৮২ সালে কারারুদ্ধ ইয়েল লার্নার ছিলেন ম্যাসাচুটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির গ্রাজুয়েট ও ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। মুক্তির পর লার্নার টেম্পল মাউন্টে স্যানহেদ্রিন প্রতিষ্ঠার প্রচারণা শুরু করেন। এসব কার্যক্রমের সামষ্টিকভাবে বিপজ্জনক প্রভাব ছিল। ক্রমাগত বেশি বেশি লোক অনিষ্টকর কাজে জড়িয়ে পড়ছিল, এমনকি তাদের অনেকে সরকারি পদেও ছিল। ১৯৮৩ সালের মার্চে হারামে যাওয়ার পথে ৩৮ জন ইয়েশিভা ছাত্রসহ গ্রেফতার হন রাব্বি ইসরাইল 'অ্যারিয়াল'। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের মাধ্যমে হেরডিয়ান প্লাটফর্মের নিচে থাকা প্রথম টেম্পলের অবশিষ্টাংশে পৌঁছে সেখানে পাসওভার উদযাপন করা এবং সম্ভবত সেইসাথে

সেখানে একটি ভূগর্ভস্থ বসতি প্রতিষ্ঠা করা। তাদের লক্ষ্য ছিল হারামে একটি সিনাগগ নির্মাণ করতে ইহুদিদের অনুমতি দিতে মুসলিমদের বাধ্য করা। ওয়েস্টার্ন ওয়ালের দায়িত্বে থাকা রাব্বি মেইর ইহুদা গেটজও গোপনে হারাম ভল্টে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন, তিনিও প্লাটফর্মে একটি সিনাগগ প্রতিষ্ঠার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৮৪ সালে এতজিয়নের ডোম অব দি রক উড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার আগে পর্যন্ত তৃতীয় টেম্পল ছিল টাবু। ঈশ্বরের নামের মতো টেম্পল পুনঃনির্মাণের কথা মুখে বলাও বিপজ্জনক বিবেচিত হতো। কিন্তু এখন ওই টাবু উড়ে গেল, লোকজন সম্ভাব্য প্রকল্প হিসেবে এই ধারণার সাথে পরিচিত হয়ে গেল। তৃতীয় টেম্পল নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনার জন্য ১৯৮৪ সালে 'অ্যারিয়াল' প্রতিষ্ঠা করেন জফিয়া (সামনের দিকে তাকানো) নামের একটি সাময়িক পত্র। ১৯৮৬ সালে তিনি পুরনো নগরীতে টেম্পল জাদুঘর উদ্বোধন করেন। এখানে ইতোমধ্যে তৈরি নৌকা, বাদ্যযন্ত্র ও পুরোহিতের পোশাক প্রদর্শন করা হয়। অনেকে এই বিশ্বাসে উপনীত হয় যে ইহুদিরা এখন পুরোপুরি তৈরি। হারামের মুসলিম উপাসনালয়গুলো কোনোভাবেই হোক না কেন, ধ্বংস করে দেওয়া মাত্র তারা মাউন্ট জায়নে প্রবেশ করতে প্রস্তুত হবে, পূর্ণাঙ্গ আনুষ্ঠানিক উপাসনা শুরু করে দেবে। এর প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়-জাগানিয়া। আমেরিকান কৌশলবিদেরা হিসাব করে দেখেন যে স্নায়ুযুদ্ধের পরিস্থিতিতে আরবদের সমর্থন করছে রাশিয়া, ইসরাইলিদের সমর্থন করছে আমেরিকা। ফলে ইতজায়ন যদি ডোম অব দি রক উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা সফল হন, তবে তা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্ফূলিঙ্গ ছড়িয়ে দিতে পারে।

অ্যালেনবাইয়ের জেরুসালেম জয়ের ঠিক ৫০ বছর পর ১৯৮৭ সালের ৯ ডিসেম্বর গাজায় ইন্তিফাদা নামে পরিচিত ফিলিস্তিন গণআন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এর কয়েক দিনের মধ্যে কট্টরপন্থী জেনারেল অ্যারিয়াল শ্যারন পুরনো নগরীর মুসলিম কোয়ার্টারে তার নতুন অ্যাপার্টমেন্টে ওঠেন। এটি ছিল আরব জেরুসালেমে থাকার ইসরাইলি ডানপন্থীদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অবস্থানের প্রতীকী প্রকাশ। তবে মধ্য জানুয়ারি নাগাদ পূর্ব জেরুসালেমে ইন্তিফাদা ছড়িয়ে পড়ে : বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য ইসরাইলি সৈন্যরা হারামে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। অধিকৃত অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় জেরুসালেমে ইন্তিফাদার তীব্রতা কম থাকলেও নগরীতে গোলযোগ ও ধর্মঘট ছিল। ইসরাইলিরা এই বাস্তবতা মেনে

নিলো যে জেরুসালেম দখল করার ২০ বছর পরও আল-কুদসের ফিলিস্তিনি অধিবাসীরা অন্যান্য এলাকার বিদ্রোহীদের সাথেই পূর্ণভাবে একাত্ম। ইন্তিফাদার একটি বাস্তব পরিণতি ছিল এই যে জেরুসালেম আবারো দুটি নগরীতে পরিণত হলো। অবশ্য এবার পূর্ব ও পশ্চিম জেরুসালেমের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া ছিল না, নো ম্যান্স ল্যান্ডে কোনো মাইন ছিল না। তবে আরব জেরুসালেম এমন এক স্থানে পরিণত হয়েছিল, যেখানে প্রবেশ করলে আঘাত সহ্য ছাড়া বের হতে পারবে না বলে মনে করতে থাকল ইসরাইলিরা। তারা অদৃশ্যমান রেখাটি অতিক্রম করার সময় এখন এমন আশঙ্কা ছিল যে তারা বা তাদের গাড়িতে ফিলিস্তিনি তরুণরা পাথর নিক্ষেপ করবে, কোনো না কোনো ঘটনা ঘটবেই। পূর্ব জেরুসালেম পরিণত হলো শত্রু ভূখণ্ডে।

ইন্তিফাদা আন্তর্জাতিকভাবে অবাক করা ফলাফল অর্জন করল। সারা বিশ্বে সাধারণ মানুষ অধিকৃত জেরুসালেম ও ভূখণ্ডে ইসরাইলি আগ্রাসী প্রকৃতি সম্পর্কে নতুন করে অবগত হলো, পাথর-নিক্ষেপকারীদের ইসরাইলি সৈন্যদের ধাওয়া ও গুলি করে হত্যা করা বা তাদের হাতের হাড় ভেঙ্গে দেওয়ার দৃশ্য দেখে। গণ- আন্দোলনের পরিকল্পনাকারী ছিল ফিলিস্তিনের তরুণ প্রজন্ম। তারা ইসরাইলি দখলদারিত্বে বেড়ে ওঠেছিল, কোনো সাফল্য পেতে ব্যর্থ পিএলও'র নীতিতে তাদের কোনো বিশ্বাস ছিল না। আরব বিশ্বকেও মুগ্ধ করে ইন্তিফাদা। ১৯৮৮ সালের ৩১ জুলাই বাদশাহ হোসেন নাটকীয়ভাবে ঘোষণা দিয়ে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুসালেমের ওপর থেকে জর্দানি দাবি প্রত্যাহার করে নিলেন। অর্থাৎ এর মাধ্যমে এই ভূখণ্ডের মালিক যে ফিলিস্তিনি জনগণ, তা তিনি স্বীকার করে নিলেন। এতে যে ক্ষমতার শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা পিএলও গ্রহণ করে। ইন্তিফাদার নেতারা পুরনো অবাস্তববাদী নীতি পরিত্যাগ করার জন্য পিএলওর প্রতি আহ্বান জানান : ফিলিস্তিনিরা পছন্দ করুক বা না করুক, ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রই ইসরাইল-ফিলিস্তিন সঙ্ঘাতের প্রধান নির্ধারক। পিএলওকে অবশ্যই প্রত্যাখ্যানবাদী অবস্থান ত্যাগ করে জাতিসঙ্ঘ প্রস্তাব ২৪২ গ্রহণ করতে হবে, ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে, সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করতে হবে। ১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর পিএলও এই পথ অবলম্বন করে, ইসরাইলের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার অধিকার স্বীকার করে। এটি ফিলিস্তিনি স্বাধীনতার ঘোষণাও ইস্যু করে।

ইসরাইলের পাশে পশ্চিম তীরে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, এই ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী হবে জেরুসালেম [আল-কুদস আল-শরিফ]।

ইন্তিফাদা ইসরাইলি শান্তি আন্দোলনের হাতকেও শক্তিশালী করে। এটা জাতীয় স্বাধীনতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন প্রশ্নে ফিলিস্তিনিদের নিরঙ্কুশ প্রতিরোধ এতই জোরালো করেছিল যে তা অস্বীকার করা ইসরাইলিদের জন্য ক্রমবর্ধমান হারে কঠিন করে তোলে। আরো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সম্ভবত এই যে এই আন্দোলন অনেক বেশি আপসহীন কারো কারো চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী আইজ্যাক রবিন সবসময়ই ফিলিস্তিন প্রশ্নে কঠোর নীতি অনুসরণ করতেন। কিন্তু ইন্তিফাদা অবশেষে তার মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে মানবতাবোধ না হারিয়ে ইসরাইলের পক্ষে অধিকৃত ভূখণ্ড ধরে রাখা সম্ভব নয়। ইন্তিফাদায় অংশগ্রহণকারী মা ও সন্তানদের নতি স্বীকার করাতে অনির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে না ইসরাইল সেনাবাহিনীর শক্তিকে। ১৯৯২ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি পিএলওর সাথে শান্তি আলোচনা করার প্রস্তুতি নেন। পরে বছর ইসরাইল ও পিএলও ওসলো চুক্তিতে সই করে। এর ফলে গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরের অংশবিশেষ (মূলত জেরিকোর আশপাশের এলাকাগুলো) নিয়ে ফিলিস্তিন প্রশাসন গঠিত হয়। আরাফাত ও রবিন ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসের লনে হাত মেলান।

ওসলো চুক্তি তীব্র বিরোধিতার সৃষ্টি করে। উভয় পক্ষের লোকজনই মনে করতে থাকে যে তাদের নেতারা অনেক বেশি ছাড় দিয়ে ফেলেছেন। ফলে জেরুসালেমের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা ১৯৯৬ সালের মে পর্যন্ত স্থগিত হয়ে যায়। এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেওয়া হলো যে এটি হবে সবচেয়ে কঠিন কাজ। এটি যে কত কঠিন তা দেখা যায় ১৯৯৬ সালের জেরুসালেম মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে। এতে রক্ষণশীল লিকুদ প্রার্থী ইহুদ ওলমার্টের কাছে হেরে যান মেয়র টেডি কোলেক। ১৯৬৭ সালে মাগরেবি কোয়ার্টার ও আরব মিউনিসিপ্যাল ভেঙ্গে দেওয়ায় ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও কোলেককে বিবেচনা করা হতো উদার হিসেবে। তিনি আরব জেরুসালেমে অনেক সময় দিতেন, তাদের সাথে একাত্ম হতেন। তিনি জোর দিয়ে বলতেন যে জেরুসালেমে আরব জীবনব্যবস্থা সংরক্ষণ করার জন্য সবকিছু অবশ্যই করতে হবে। অবশ্য তিনি তখনো নগরীর 'পুনঃএকীকরণের' প্রতি

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। বিশ্বজুড়ে তিনি তার ঐক্যবদ্ধ নগরীর দর্শন নিয়ে শ্রোতাদের উদ্দীপ্ত করতেন, 'বিভক্তি' ও কাঁটাতারের বেড়া-সংবলিত সীমানার ভয় তাড়া করে ফিরতেন অবশ্য কোলেকের জেরুসালেমের ঐক্যের অর্থ সাম্য ছিল না। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৬৭ সাল থেকে ৬৪,৮৮০টি হাউসিং ইউনিট নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৮.৮০০ ইউনিট ছিল ফিলিস্তিনিদের জন্য। নগরীর ৯০০ স্যানিটেশন কর্মীর মধ্যে মাত্র ১৪ জন ছিল পূর্ব জেরুসালেমের জন্য বরাদ্দ। অপেক্ষাকৃত পুরনো আরব এলাকাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার জন্য নতুন কোনো রাস্তা নির্মাণ করা হয়নি। ২৯ স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে, এমনকি একজন ইসরাইলি 'উদার ও তার বদান্যতা প্রদর্শনে বৈষম্য করেছেন। অধিকন্তু, ইসরাইলি সরকারের গৃহীত আইনগত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ফলে পূর্ব জেরুসালেমের ৮৬ ভাগ ভূমি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের। মিউনিসিপ্যালটির এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এর ফলে ২১ হাজার ফিলিস্তিনি পরিবার বর্তমানে গৃহহীন রয়েছে বা অনেক ছোট বাড়িতে বাস করছে। বাড়ি করার জন্য আইনগত এলাকা না থাকা পূর্ব জেরুসালেমে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে নির্মাণের অনুমোদন পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কোনো পরিবার যদি অনুমতি না নিয়ে বাড়ি বানায়, তবে সেটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৯৪ সালের চিত্রে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে ১৯৮৭ সালের মধ্য ভাগ থেকে পূর্ব জেরুসালেমে ২২২টি ফিলিস্তিনি বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর মিউনিসিপ্যালিটির বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ইহুদি অধিবাসীদের জন্য উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব জেরুসালেমে আরো ৩১,৪১৩টি নতুন বাড়ি বানানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফিলিস্তিনিদের ধীরে ধীরে আল-কুদস থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। টেডি কোলেকের বিপরীতে নতুন মেয়র ইহুদ ওলমার্ট উদার কথাবার্তা বলার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি পশ্চিমে নয়, পূর্ব দিকে জেরুসালেম সম্প্রসারিত করব। চিরদিনের জন্য নগরীটি যাতে ইসরাইলি নিয়ন্ত্রণে ঐক্যবদ্ধ থাকে, সেজন্য আমি বাস্তব সব কাজ করব। এই ধরনের মনোভাবে শান্তির অস্তিত্ব থাকে না।

ইসরাইলি উদারপন্থীদের কাছে টানার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না ওলমার্ট। তিনি জেরুসালেমের উগ্র-অর্থোডক্সের সাথে জোট বেঁধে ক্ষমতায় এসেছিলেন। আর এই

উগ্রপন্থীরা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দ্রুত বেড়েছে। তারা আর মিয়া শেরিমের ঘেটোতে আবদ্ধ নয়, তারা নগরীর উত্তর অংশের বেশির ভাগ অংশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। ১৯৯৪ সালে ১০ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের ৫২ ভাগ ছিল উগ্র-অর্থোডক্স পরিবারের। আরবদের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। তাদের চিন্তা ছিল জেরুসালেমকে আরো ধর্মনিষ্ঠ নগরীতে পরিণত করা, সেক্যুলারদের নিয়ন্ত্রণে রাখা। তারা সাবাতে আরো কম অ-কোশার রেস্তোরাঁ, আরো কম থিয়েটার ও বিনোদন স্পট খোলা দেখতে চায়। ওলমার্টের সমর্থকেরা ফিলিস্তিনিদের সাথে সার্বভৌমত্বের কোনো ধরনের ভাগাভাগিতে বিশ্বাস করে না। উগ্র-অর্থোডক্স ও সেইসাথে উগ্র ডানপন্থী গ্রুপগুলোর জন্য ভাগাভাগি করা মানে ভাগ করা, আর বিভক্ত জেরুসালেম হলো মৃত জেরুসালেম।

ইসরাইলি সরকারগুলো বারবার জোর দিয়ে বলে আসছে যে জেরুসালেম হলো ইহুদি রাষ্ট্রের শ্বাশত অবিভাজ্য রাজধানী, এর সার্বভৌমত্ব ভাগাভাগি করার প্রশ্নই ওঠতে পারে না। আল-কুদসই হবে ফিলিস্তিনের রাজধানী- ফিলিস্তিনিদের এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য সরকার অব্যাহত চেষ্টা চালাতে থাকে। অবশ্য বলার ধরন পাল্টে গিয়েছিল। ইন্তিফাদার পর থেকে জেরুসালেম কার্যত বদলে গিয়েছিল : নগরীতে এমন স্থান খুবই কম আছে যেখানে আরব ও ইহুদিরা স্বাভাবিক পরিবেশে সাক্ষাত করতে পারে। পশ্চিম জেরুসালেমের প্রধান বাণিজ্যিক এলাকটি প্রায় পুরোপুরি ইহুদিদের, পুরনো নগরী প্রায় পুরোপুরি আরব। একমাত্র সংযোগস্থল হলো পূর্ব জেরুসালেমে ইসরাইলি বসতিগুলোর আগ্রাসীভাবে স্থাপন করা রিংটি। ক্রমবর্ধমানভাবে ইসরাইলিরা একে জীবনের বাস্তব সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নিচ্ছে। অনেকে জানতে চায়, যে এলাকায় তুমি সশস্ত্র প্রহরী ছাড়া প্রবেশ করতে পারো না, সেই স্থান দখল করার মানে কী? ১৯৯৫ সালের মে মাসে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফোরমেশন পরিচালিত এক জনমত জরিপে বিস্ময়কর তথ্য দেখা যায়। এতে প্রকাশ পায় যে ২৮ শতাংশ ইসাইলি ইহুদি প্রাপ্তবয়স্ক লোক ইহুদি এলাকাগুলোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার শর্তে হলি সিটির সার্বভৌমত্বে বিভক্তি মেনে নিতে প্রস্তুত।

জেরুসালেমে ১৯৯৫ সালের ১৩ মে পিএলও প্রতিনিধি ফয়সাল হোসাইনি আরব ভূমি বাজেয়াপ্তকরণের বিরুদ্ধে আয়োজিত বিক্ষোভে বক্তৃতা করেন। একসময় নো ম্যান্স ল্যান্ড হিসেবে বিরাজ করা পুরনো নগরীর প্রাচীরগুলোর নিচে দাঁড়িয়ে হোসাইনি বলেন, 'আমি ওই দিনের স্বপ্ন দেখছি যখন কোনো ফিলিস্তিনি বলবে 'আমাদের জেরুসালেম' এবং এর মানে হবে ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলিরা এবং কোনো ইসরাইলি বলবে 'আমাদের জেরুসালেম' এবং এর অর্থ দাঁড়াবে ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনিরা।৩২ এর প্রতিক্রিয়ায় লেখক, সমালোচক, শিল্পী ও সাবেক সিনেট সদস্যসহ সাত শ' প্রখ্যাত ইসরাইলি এই যৌথ বিবৃতিটি প্রদান করেন :

জেরুসালেম আমাদের, ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনিদের- মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের।

আমাদের জেরুসালেম হলো একবারে প্রথম দিন থেকে- কেনানি ও জেবুসিত ও ইসরাইলি, ইহুদি ও হেলেনিস, রোমান ও বায়েজান্টাইন, খ্রিস্টান ও মুসলিম, আরব ও মামলুক, উসমানিয়া ও ব্রিটন, ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলি- নগরীকে সমৃদ্ধ করা সব সংস্কৃতি, সব ধর্ম, সব আমলের জন্য একটি ছবি। তারা এবং সেইসাথে যারাই নগরীতে অবদান রেখেছে তাদের সবারই জেরুসালেমের আধ্যাত্মিক ও ভৌগোলিক দৃশ্যপটে স্থান রয়েছে।

তবে জেরুসালেম অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ, সবার জন্য উন্মুক্ত, এর সব অধিবাসীর মালিকানায় থাকতে হবে। আর সেখানে থাকতে পারবে না কোনো সীমানা, কাঁটাতারের বেড়া।

আমাদের জেরুসালেম অবশ্যই দুটি রাষ্ট্রের রাজধানী হবে, তারা এই দেশে পাশাপাশি বাস করবে- পশ্চিম জেরুসালেম হবে ইসরাইল রাষ্ট্রের রাজধানী, পূর্ব জেরুসালেম হবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী।

আমাদের জেরুসালেম অবশ্যই হতে হবে শান্তির রাজধানী। ৩৩

জায়ন যদি সত্যিই যুদ্ধ আর ঘৃণার নগরীর বদলে শান্তির নগরী হয়ে থাকে, তবে কোনো না কোনো ধরনের যৌথ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সমাধানের অনেক ধরনের প্রস্তাব রয়েছে। জেরুসালেম কি আন্তর্জাতিকভাবে শাসিত এলাকা হিসেবে থাকা উচিত?

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জন্য বিশেষ সুবিধা- সংবলিত ইসরাইলি সার্বভৌমত্ব থাকা উচিত সেখানে? কিংবা অবিভক্ত নগরীতে যৌথ ইসরাইলি-ফিলিস্তিনি প্রশাসন থাকবে, যেখানে দুটি আলাদা মিউনিসিপ্যালটি (পরিচালনা সংস্থা হতে পারে একটি বা দুটি)? এ নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক হয়। কিন্তু মূলনীতি সুস্পষ্ট না হলে এসব সমাধান কল্পকাহিনী হিসেবেই থেকে যাবে।

এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জেরুসালেমের ইতিহাস আমাদেরকে কী শিক্ষা দেয়? ১৯৯৫ সালের শরতে রাজা দাউদের নগরী জয়ের তিন হাজারতম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য বছরব্যাপী উৎসবের সূচনা করে ইসরাইলিরা। ফিলিস্তিনিরা এতে আপত্তি জানায়। তারা এই উদযাপনকে পুরোপুরি ইহুদি জেরুসালেমের প্রপাগান্ডা বিবেচনা করে। তবে দাউদের জয়ের কাহিনী ছিল ফিলিস্তিনিদের স্বার্থের প্রতি রক্ষণশীল ইসরাইলিদের কল্পনার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তারকারী। আমরা দেখেছি, সব একেশ্বরবাদী বিজয়ীই এই সত্যের মুখোমুখি হয়েছেন যে জেরুসালেম তাদের আগেও অন্য জাতির কাছে পবিত্র নগরী ছিল। তিন ধর্মের সবাই ব্যক্তির নিরঙ্কুশ ও ঐশী অধিকারের ওপর জোর দেয় বলে পবিত্র নগরীতে পূর্বসূরীদের প্রতি বিজয়ীদের আচরণই হবে তাদের আদর্শের প্রতি তাদের আন্তরিকতার পরীক্ষা। আমাদের হাতে থাকা অপূর্ণাঙ্গ তথ্যের আলোকে আমরা বলতে পারি যে রাজা দাউদ এই পরীক্ষায় উৎরে গেছেন ভালোভাবেই। তিনি জেরুসালেম থেকে জেবুসিত অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টা চালাননি, জেবুসিত প্রশাসন বহাল থাকে এবং ঐশী স্থানগুলো কেড়ে নেওয়া হয়নি। দাউদের অধীনে জেরুসালেম অনেকটাই জেবুসিত নগরীই থেকে যায়। ইসরাইল রাষ্ট্রকে এই মানদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম জেরুসালেমে ৩০ হাজার ফিলিস্তিনি তাদের বাড়িঘর হারায়। আর ১৯৬৭ সাল থেকে আরব ভূমি জবরদখল অব্যাহত রয়েছে, ক্রমবর্ধমান ও বিপজ্জনক হারে হারাম আল-শরিফের ওপর হামলা হচ্ছে। ইসরাইলিরা জেরুসালেমের সবচেয়ে খারাপ বিজয়ী নয় : তারা তাদের পূর্বসূরীদের নির্বিচারে হত্যা করেনি, যেভাবে ক্রুসেডাররা করেছিল, তাদেরকে তারা স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করেনি, যেভাবে নগরীতে বায়েজন্টাইনরা করেছিল ইহুদিদের। অন্য দিকে, তারা তারা খলিফা উমরের মতো উঁচু মানদণ্ডে পৌঁছাতে পারেনি। বর্তমান অসুখী পরিস্থিতিতে আমরা যা দেখছি, তাতে কষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে

অতীতে দু'বার জেরুসালেমে ইসলামি বিজয়ের পর ইহুদিদের তাদের পবিত্র নগরীতে ফিরে আসা সম্ভব হয়েছিল। উমর ও সালাহউদ্দিন উভয়েই জেরুসালেমে ইহুদিদের (খ্রিস্টান শাসকদের তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন) বসতি স্থাপন করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

কিংবদন্তিপ্রতীম ঘটনা ছিল ১৯৬৭ সালের বিজয়। এর প্রতীকী বিষয়টি ছিল সর্বগ্রাসী। ইহুদিরা অবশেষে সত্যিই জায়নে ফিরে গিয়েছিল। অবশ্য প্রথম থেকেই জায়ন কেবল একটি ভৌগোলিক সত্তা ছিল না। এটি ছিল একটি আদর্শও। জেবুসিত আমল থেকে জায়ন শান্তির নগরী হিসেবে, সম্প্রীতি ও একীকরণের দুনিয়াবি স্বর্গ হিসেবে শ্রদ্ধা পেয়ে আসছিল। ইসরাইলি সাম্যবাদী নেতা ও নবীরাও এই স্বপ্নাবিভাব বিকশিত করেছেন। কিন্তু জায়নবাদী জেরুসালেম দুঃখজনকভাবে ওই আদর্শ থেকে অনেক নিচু স্থানে রয়েছে। ক্রুসেডের পর থেকে তিন ইব্রাহিমি ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জেরুসালেম নার্ভাস, রক্ষণাত্মক নগরী হয়ে পড়েছে। এটি ক্রমবর্ধমানহারে বিরোধপূর্ণ স্থানেও পরিণত হয়ে আছে। কেবল ইহুদিরা নয়, খ্রিস্টান ও মুসলিমরাও লড়াই করেছে, একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করেছে। কিন্তু সহিংস সাম্প্রদায়িক বিভেদ তিনটি প্রধান সম্প্রদায়কে ভেতর থেকে তিক্তভাবে বিভক্ত দলে পরিণত করেছে। উনিশ শতকের প্রায় প্রতিটি ঘটনায় জেরুসালেম সাম্প্রদায়িক বিরোধে উস্কানি দিয়েছে বা বাড়িয়ে তুলেছে। বর্তমানে খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলো এখনো খ্রিস্টের সমাধিতে একে অপরের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ লড়াইয়ে নিয়োজিত। আর ছয় দিনের যুদ্ধে নগরীর আবেগগত বিজয়ের পর পরই ধর্মীয় ও সেক্যুলার ইসরাইলিরা ওয়েস্টার্ন ওয়ালে একে অপরের বিরুদ্ধে তীব্র দ্বন্দ্বে নিয়োজিত রয়েছে। রাজা দাউদ নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে যে জায়ন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এটি তেমন স্থানে পরিণত হয়নি।

ইসরাইল অব্যাহতভাবে জাতীয় নিরাপত্তার স্থায়ী গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে আসছে। ফিলিস্তিনিরা চায় মুক্তি, আর ইসরাইলিরা চায় সীমান্ত নিশ্চিত করতে। ইহুদি ইতিহাসে ক্ষতের মতো থাকা নৃশংসতার বিষয়টি বিবেচনা করলে এটি বিস্ময়কর মনে হবে না। নগরী থেকে লোকজন প্রথম যে জিনিসটি চায়, তা হলো নিরাপত্তা। প্রাচীন বিশ্বের রাজার

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল জনগণের আকাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা দিতে শক্তিশালী দুর্গব্যবস্থা সৃষ্টি। একেবারে শুরুর দিন থেকে জায়ন মানে ছিল শান্তির এক সুরক্ষিত স্থান। আর আবদি-হেপার আমল থেকে এটি ভেতর ও বাইরের শত্রুদের হুমকির মুখেও ছিল। বর্তমানে জেরুসালেম আবারো দুর্গ দিয়ে ঘেরাও নগরীতে পরিণত হয়েছে। পূর্ব দিকে এর সীমান্ত বিশাল বিশাল নতুন বসতি দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। এটি পুরনো ক্রুসেডার দুর্গায়নের মতো করে বৃত্তাবদ্ধ হয়ে আছে। তবে প্রাচীরগুলো কোনোই কাজে আসবে না, যদি ভেতরেই ভয়াবহ গোলযোগ শুরু হয়ে যায়। হতাশাবাদী পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন, কিছুটা সাম্যপূর্ণ সমাধান পাওয়া না গেলে জেরুসালেমও হেবরনের মতো সব অধিবাসীকে নিয়ে সহিংস ও বিপজ্জনক স্থানে পরিণত হবে।

একেবারে শুরু থেকে জায়নের ঐশী সত্তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ। কোনো প্রাচীন শাসক তার নগরীতে ঐশীব্যবস্থা আরোপ করতে পেরেছেন এবং নগরীটি ঈশ্বরদের শান্তি ও নিরাপত্তা উপভোগ করতে পারছে বলে নিশ্চিত হয়েছেন তখনই যখন তিনি বিশ্বাস করতে পেরেছেন যে আরো কিছুর মতো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার সামর্থ্যও তার রয়েছে। জেবুসিত জেরুসালেমের বাল ধর্মমতে সামাজিক ন্যায়বিচার ছিল আদর্শ। সামবাদী ও নবীরা জোর দিয়ে বলতেন যে জায়ন অবশ্যই হতে হবে গরিবদের আশ্রয়স্থল : বিশেষ করে নবীরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে ঐশী স্থানের প্রতি ভক্তি পুরোপুরি মূল্যহীন যদি ইসরাইলিরা তাদের সমাজের দুর্বল লোকদের পরিচর্যাকে অবহেলা করে। পি'র হলিনেস কোডে 'আগন্তুকদের জন্য উদ্বেগ ও ভালোবাসার কথা রয়েছে। ইসরাইলিদেরকে এসব লোককে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে বলে জোর দিয়ে বলা হয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচার পবিত্র কোরআনি বার্তার মূলেও রয়েছে। আর আইয়ুবি ও মামলুক আমলে বাস্তব সহানুভূতি ছিল জেরুসালেমের ইসলামিকরণের অনিবার্য আনুষাঙ্গিক বিষয়। বর্ষীয়ান উদ্যোক্তাদের সামাজিক জায়নবাদের মূলেও ছিল এটি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকে জায়নে এমনকি মেয়র টেডি কোলেকের সময়ও ফিলিস্তিনিদের স্বাগত জানানো হয় না। ইসরাইলিরা প্রায়ই জবাবে বলে যে আরব রাষ্ট্রগুলোতে ফিলিস্তিনিরা যে ধরনের আচরণ পেয়ে থাকে, তারা জেরুসালেমের ফিলিস্তিনিদের প্রতি তার চেয়ে ভালো আচরণ করা হয়ে থাকে। কথাটি হয়তো সত্য, কিন্তু

ফিলিস্তিনিরাতো নিজেদেরকে অন্য আরবদের সাথে নয় বরং তাদের ইহুদি নাগরিকদের সাথে তুলনীয় করতে চায়। ন্যায়বিচার ছাড়াই কোনো নগরী 'পবিত্র' বলে জোরালো দাবি করার অর্থ হলো জেরুসালেমের পবিত্রতার হস্তান্তর- অযোগ্য অংশকে বিপজ্জনক ধারায় চালিত করা।

আগেকার কয়েকটি আমলের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পারি এটি কত বিপজ্জনক। ওই সব সময়ে নগরীর অগ্রগতির ওপর জোর দেওয়া হলেও সহানুভূতির কর্তব্যকে অবহেলা করা হয়েছিল। হাসমোনিয়ান জেরুসালেমে বদান্যতা ছিল সামান্যই : ইহুদি জেরুসালেমের অখণ্ডতা রক্ষার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামের পর হাসমোনিয়ানরা রাজ্যের প্রভু বনে যায়। কিন্তু দেখা যায়, যে স্বৈরতন্ত্রকে পরাজিত করে তারা ক্ষমতায় এসেছিল, তাদের নৃশংসতা থেকে তারা আসলে খুব বেশি ভিন্ন ছিল না। তাদের আচরণের কারণে তারা ফারাসিদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। ফারাসিরা বদান্যতা ও ভালোবাসা-জাগানিয়ার দয়ার ওপরই জোর দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ফারাসিরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইহুদি রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার জন্য রোমানদের অনুরোধ করে : এসব খারাপ ইহুদি শাসনের চেয়ে বিদেশী শাসন অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল।

অন্যদের অধিকারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও নিরঙ্কুশ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনকে হিসাবের বাইরে রাখার ফলে যে বিপদ আসতে পারে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো খ্রিস্টান জেরুসালেম। নিউ টেস্টামেন্টে স্পষ্ট যে বদান্যতা ছাড়া বিশ্বাসের কোনো মূল্যই নেই। অবশ্য এই আদর্শ কখনো জেরুসালেমের খ্রিস্টান ধর্মমতে একীভূত করা হয়নি। এর কারণ হয়তো এই যে নগরীটির প্রতি তাদের ভক্তি এসেছে অনেক পরে এবং তা খ্রিস্টানদের কাছে প্রায় বিস্ময় ঠেকেছে। বায়জান্টাইন জেরুসালেম খ্রিস্টানদেরকে ঐশী সত্তার প্রবল সান্নিধ্য দিতে সক্ষম ছিল, তবে এটি ছিল সবচেয়ে বদান্যতাহীন নগরী। খ্রিস্টানেরা কেবল একে অপরের বিরুদ্ধে তীব্র দ্বন্দ্বেই অবতীর্ণই হয়নি, সেইসাথে তাদের নতুন জেরুসালেমের পবিত্রতা ও অখণ্ডতার জন্য অপরিহার্য বিষয় হিসেবে পৌত্তলিকতা ও ইহুদিধর্মকে গুঁড়িয়ে দেওয়া ও বহিষ্কার করাও অনিবার্য ভেবেছে। খ্রিস্টানদের জয়ের অর্থ ছিল ইহুদির ভাগ্যের পতন; পবিত্র নগরীর কাছাকাছি জুদার মরুভূমিতে বসবাসকারী কৃচ্ছ্র

সন্ন্যাসীদের বেশির ভাগই ছিল ভয়ঙ্কর রকমের সেমিটিকবিরোধী। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান সম্রাটদের অসহিষ্ণু নীতি ইহুদি ও 'ধর্মত্যাগীদেরকে' এতটাই দূরে সরিয়ে দিয়েছিল যে তারা পুরোপুরি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফিলিস্তিনে পারসিক ও মুসলিম হামলকারীদের উৎসাহভরে স্বাগত জানিয়েছিল ইহুদিরা, তাদেরকে কার্যকর সহায়তাও করেছিল।

ক্রুসেডার জেরুসালেম নিশ্চিতভাবেই ছিল আরো বেশি নির্মম নগরী। এটি গণহত্যা ও উচ্ছেদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমান ইসরাইলের মতো ক্রুসেডারেরাও এমন একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল যা ছিল নিকট প্রাচ্যে বিদেশী ছিটমহল। বৈরী রাষ্ট্রগুলোতে পরিবেষ্টিত অবস্থায় তারা বিদেশী সহায়তায় ওপর নির্ভরশীল ছিল। ক্রুসেডার রাজ্যের পুরো ইতিহাস ছিল টিকে থাকার সংগ্রাম। আমরা দেখেছি যে ক্রুসেডাররা যৌক্তিক কারণেই নিরাপত্তা নিয়ে ইসরাইলের মতোই এক ধরনের আবেগ অনুভব করত। ফলে ক্রুসেডার জেরুসালেমে সত্যিকারের সৃষ্টিশীলতা ছিল সামান্যই। কারণ, শিল্পকলা ও সাহিত্য এ ধরনের যুদ্ধবিক্ষত পরিবেশে সত্যিকার অর্থে বিকশিত হতে পারে না। বর্তমানের অনেক ইসরাইলির মতো জেরুসালেমের ফ্রাঙ্করাও বুঝতে পেরেছিল যে নিকট প্রাচ্যে পাশ্চাত্য ঘৌটো হিসেবে তাদের রাজ্য টিকে থাকতে পারে না। তাদেরকে অবশ্যই আশপাশের মুসলিমবিশ্বের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু ক্রুসেডারদের ঘৃণার ধর্ম খুবই বদ্ধমূল ছিল। একবার তারা ইসলামিবিশ্বে তাদের একমাত্র মিত্রের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল, একে অন্যের প্রতিও ভয়ঙ্করভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঘৃণার ধর্ম কাজ করেনি, এটি সহজেই আত্ম-বিধ্বংসী হয়ে পড়েছিল। ক্রুসেডাররা তাদের রাষ্ট্র হারিয়েছিল। বদান্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যটি অবহেলাজনিত ধর্মানুরাগের প্রচণ্ড অভাবের কারণে একটি পবিত্র স্থান হারানোর ঘটনা এখন সবচেয়ে বেশি দেখা যায় হলি সেপালচারের খ্রিস্টান উপদলগুলোর তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে অন্তহীন বিবাদে।

একেশ্বরবাদী পরিভাষায় কোনো উপাসনালয় বা কোনো নগরীকে ধর্মটির চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করাটা পৌত্তলিকতা। আমরা আদ্যোপান্ত দেখেছি যে এগুলো এমন প্রতীক যা একটি বৃহত্তর বাস্তবতার দিকে নিয়ে যায়। জেরুসালেম ও এর ঐশী স্থানগুলো ভয় ও ভক্তির উদ্রেকের অভিজ্ঞতা দেয়। এগুলো কোটি কোটি ইহুদি, খ্রিস্টান ও

মুসলিমকে ঐশী সত্তার সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। একইসাথে আমরা দেখেছি, অনেক একেশ্বরবাদীর কাছে এগুলোকে ঈশ্বরের ধারণার সাথে অবিভাজ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আর ঐশী সত্তা স্রেফ অতিপ্রাকৃতিক বাস্তবতার ‘চরম অস্বাভাবিক কিছু নয়, বরং অহংয়ের গভীরতার মধ্যেই তা অনুভূত হওয়ায় কারণে আমরা লোকজনের অন্তরাত্মার জগতের অংশ হিসেবেও বিবেচনা করতে দেখি পবিত্র স্থানগুলোকে। অনেক সময় কোনো উপাসনালয় নিয়ে বিরোধের সময় ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমেরা আকস্মিক চমক অনুভব করে, নিজেদেরই মুখোমুখি হয়ে পড়ে। এটি জেরুসালেম ও এর সমস্যাবলীকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিবেচনা করা তাদের জন্য কঠিন করে তোলে। ধর্মকে যখন পরিচিতি অনুসন্ধানের প্রধান বিষয় হিসেবে দেখা হয়, তখন অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। বিশ্বাসের একটি কাজ হলো অহংয়ের অনুভূতি জোরদার করা : আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং আমাদের ঐতিহ্য কেন স্বতন্ত্র্য ও বিশেষ তা ব্যাখ্যা করা। কিন্তু এটিই ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সব প্রধান বিশ্বধর্মই জোর দিয়ে নিজের নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষায় অন্যদের প্রায়ই কলঙ্কিত করে এমন ঠুনকো ও সর্বগ্রাসী অহংকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়। অহংকে পেছনে রাখা কেবল আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যই নয়, এটি সহানুভূতির শৃঙ্খলার জন্যও প্রয়োজনীয়। এটি আমাদের স্বার্থেন্বেষী আকাঙ্ক্ষাগুলোর সামনে অন্যদের অধিকারকে রাখার দাবি জানায়।

জেরুসালেম ইতিহাসের এড়ানো অযোগ্য একটি বার্তা হলো এই যে রোমান্টিক মিথগুলো যাই বলুক না কেন, সত্ত্বেও দুর্ভোগ আমাদেরকে কোনোভাবেই আরো উন্নত, আরো মহৎ লোকে পরিণত করে না। বরং প্রায়ই যা করে, তা মিথ-কথনের বিপরীত। বেবিলনে নির্বাসনের পর জেরুসালেম প্রথমে একটি বর্জনশীল নগরীতে পরিণত হয়। ওই সময় নতুন ইহুদি ধর্ম প্রাধান্যপূর্ণ পৌত্তলিক বিশ্বের স্বতন্ত্র পরিচিতি প্রতিষ্ঠায় ইহুদিদের সহায়তা করেছিল। দ্বিতীয় ইসাইয়া ঘোষণা করেছিলেন যে জায়নে প্রত্যাবর্তন শান্তির নতুন যুগের সূচনা ঘটাবে। কিন্তু আম হা- আরেতজকে বহিষ্কার করা হলে গোলাহ (ইহুদিদের পরবাসে থাকা) জেরুসালেমকে স্রেফ বিরোধের বিষয়ে পরিণত করে। রোমের হাতে নির্যাতনের

অভিজ্ঞতা খ্রিস্টানদেরকে অন্যদের দুর্ভোগের প্রতি আরো বেশি সহানুভূতিসম্পন্ন করেনি, ক্রুসেডারদের হাতে মুসলিমদের দুর্ভোগ পোহানোর পর আল-কুদস আরো বেশি আগ্রাসী ইসলামি নগরীতে পরিণত হয়েছিল। ফলে হলোকাস্টের বিপর্যয়ের সামান্য পরে প্রতিষ্ঠিত ইসরাইল রাষ্ট্রের সবসময় মধুরতা ও আলোকময় নীতিমালা বাস্তবায়ন না করাটা বিস্ময়কর নয়। আমরা দেখেছি যে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার ভীতিই প্রাচীন কালের লোকজনকে পবিত্র নগরী ও মন্দির নির্মাণ করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত করেছিল। প্রাচীন ইসরাইলি পুরানতত্ত্বে প্রতিশ্রুত ভূমির স্বর্গে পৌঁছার জন্য ঊষর প্রান্তরের (যেখানে কোনো মানুষই ছিল না, কিছুই ছিল না) ভুতুরে রাজ্যে তাদের সফরের কাহিনী বলা হয়েছে। ইহুদি জনগোষ্ঠী মৃত্যু শিবিরগুলোতে নজিরবিহীন মাত্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে পড়েছিল। ছয় দিনের যুদ্ধের সময় জায়নে তাদের প্রত্যাবর্তন তাদের মূলকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে তাদের অনেকে বিশ্বাস করেছিল যে এটি একটি নতুন সৃষ্টি, নতুন সূচনা। এই বিশ্বাস বিস্ময়কর কিছু নয়।

কিন্তু আজ ক্রমবর্ধমান হারে ইসরাইল পবিত্র নগরী ভাগাভাগি করে নেওয়ার বিষয়টি গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছে। অবশ্য দুঃখজনকভাবে শান্তির জন্য যেসব লোক কাজ করছে, তাদের বেশির ভাগই সেক্যুলার। সজ্ঘাতের উভয় পক্ষেই ধর্ম ক্রমবর্ধমান হারে বৈরী ও আগ্রাসী হয়ে ওঠছে। চরমপন্থীদের (তারা আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায়, অপর গোষ্ঠীর উপাসনালগুলো উড়িয়ে দেয়, তাদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করার কথা বলে থাকে) প্রলয়বাদী আধ্যাত্মিকতা অনুসরণ করছে খুবই ছোট্ট গ্রুপের লোকজন। তারা সংখ্যায় কম হলেও তারা অনেক বড় মাত্রায় ঘৃণা ছড়াচ্ছে। নৃশংসতার পর উভয় পক্ষের মনোভাব আরো কঠোর হয়ে পড়েছে, শান্তি আরো সুদূর পরাহত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ৬৬ সালে জিলটরাই (গোঁড়া) পিস পার্টির (শান্তিবাদী পক্ষ) বিরোধিতা করেছিল। প্রধানত তারাই জেরুসালেম ও এর টেম্পল ধ্বংসের জন্য দায়ী। আর চ্যালিটনের রেনাল্ড মনে করেছিলেন যে পৌত্তলিকদের সাথে কোনো ধরনের শান্তিচুক্তি পাপকাজ। তিনিই ক্রুসেডার রাজ্যের পতন ডেকে আনেন। ঘৃণার ধর্মটির এমন প্রতিক্রিয়া থাকে যা এর সাথে জড়িত লোকজনের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমানে সজ্ঘাতের উভয় পক্ষের ধর্মীয় চরমপন্থীরাই 'ঈশ্বরের' নামে নৃশংসতা চালানোর জন্য দায়ী। ১৯৯৪

সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি হেবরনের প্যাট্রিয়ার্কর্স কেভে অন্তত ৪৮ ফিলিস্তিনি মুসল্লিকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন বারুচ গোল্ডস্টেইন। অথচ এখন উগ্র ডানপন্থীরা তাকে ইসরাইলের শহিদ হিসেবে সম্মান করে। আরেকজন হলেন শহিদ হওয়া ইসলামি গ্রুপ হামাসের তরুণ সদস্য। ১৯৯৫ সালের ২৫ আগস্ট জেরুসালেমের একটি বাসে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে তিনি পাঁচজনকে হত্যা ও ১০৭ জনকে আহত করেছিলেন। এসব কাজ ধর্মের বিকৃত রূপের প্রতিনিধিত্ব করলেও জেরুসালেমের ইতিহাসে অনেকবারই ঘটেছে। কোনো ভূমি বা নগরীর দখলে আসামাত্র খুন থেকে বিরত থাকার কোনো কারণ থাকে না। সাথে সাথেই অন্য মানুষদের শ্রদ্ধা করার ঐশী বার্তা বিস্মৃত হয়ে যায়, 'ঈশ্বর' আমাদের নিজস্ব বদ্ধমূল ধারণা ও আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়ন করার চূড়ান্ত ঐশী অনুমোদন দিয়ে দেন। ধর্ম তখন সহিংসতা ও নৃশংসতার প্রজনন ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন ১৯৯৫ সালের ৪ নভেম্বর তেল আবিবে এক শান্তি সমাবেশে বক্তৃতার পর নিহত হন। ইসরাইলিরা আরো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এই খবর শুনে যে হত্যাকারী ছিল আরেকজন ইহুদি। প্রাণঘাতী গুলিটি ছুড়েছিল তরুণ ছাত্র আইগ্যাল আমির। হত্যাকারী ঘোষণা করেন যে ঈশ্বরের নির্দেশনায় তিনি কাজটি করেছেন। আর ইসরাইলের পবিত্র ভূমি শত্রুর হাতে তুলে দেয়ার জন্য যে ব্যক্তি প্রস্তুতি নেয়, তাকে হত্যা করা অনুমোদনযোগ্য। ঘৃণার ধর্মের তার নিজস্ব গতিশীলতা আছে বলে মনে হচ্ছে। ভয়ঙ্কর একগুঁয়ে নীতি এমন এক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে এটি কেবল শত্রুর বিরুদ্ধই পরিচালিত হচ্ছে না, একই ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ক্রুসেডার জেরুসালেম নিজেরাই তিক্তভাবে বিভক্ত ছিল। সালাহউদ্দিন যখন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন ফ্রাঙ্করা আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। তাদের একে অপরের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও তাদের কঠিন অন্তঃকলহ ছিল হাত্তিনের যুদ্ধে সালাহউদ্দিনের হাতে পরাজয়ের একটি কারণ।

রবিনের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ছিল অনেক ইসরাইলির কাছে তাদের নিজস্ব সমাজের গভীর বিভাজনের কষ্টকর বহিঃপ্রকাশ। ওই সময় পর্যন্ত এই বিভক্তির বিষয়টি তারা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। জায়নবাদীদের এমন এক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করতে ফিলিস্তিনে

আসতে হয়েছিল, যেখানে প্রাণঘাতী গোয়িম থেকে তারা নিরাপদ থাকবে। এখন ওই ভূমির জন্যই একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করল। বিশ্বজুড়ে ইহুদিরা এই বেদনাদায়ক উপলব্ধির সাথে লড়াই করে যে তারা কেবল শিকারই নয়, বরং তারাও ক্ষতি করতে পারে ও স্থায়ী নৃশংসতা চালাতে পারে। রবিনের মৃত্যু ধর্মের অপব্যবহারের বিষয়টিও তীব্রভাবে সামনে নিয়ে আসে। ইব্রাহিমের সময় থেকে ইসরাইলের ধর্মের সবচেয়ে মানবিক ঐতিহ্য এই ধারণা দেয় যে অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ঐশী সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারে। ফলে পবিত্রতা হলো মানবিকতা যা কখনো অন্য মানুষের জীবনকে উৎসর্গ করার অধিকার দেয় না। আইগাল আমির অবশ্য যশুয়া গ্রন্থের আরো সহিংস নৈতিকতা অনুসরণ করেন। তিনি পবিত্র ভূমিতে কেবল ঐশী সত্তাকেই দেখেছেন। এ ধরনের পৌত্তলিকতার বিপদকে ভীতিকরভাবে প্রদর্শন করাই ছিল তার অপরাধ।

কাব্বালবাদী মিথ শিক্ষা দেয় যে ইহুদিদের জায়নে ফেরার সময় বিশ্বের সবকিছুই যথাযথ স্থান ফিরে পেয়েছিল। রবিনের হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করে যে ইসরাইলে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তনের মানে বিশ্বের সবকিছু ঠিক স্থানে থাকা নয়। অবশ্য এই পুরানতত্ত্ব কখনো আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করার কথা বলে না। ১৯৪৮ সাল থেকে জায়নে ইহুদি জনগোষ্ঠীর ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তনের ফলে হাজার হাজার ফিলিস্তিনির তাদের আবাসভূমি ও সেইসাথে জেরুসালেম থেকে বাস্তুচ্যুতি ঘটে। আমরা জেরুসালেমের ইতিহাস থেকে জানি যে প্রবাস জীবন ছিল বিশ্বের সমাপ্তি, অঙ্গহানি ও আধ্যাত্মিক বিচ্যুতির অভিজ্ঞতা। একটি নির্দিষ্ট অবস্থান ও দেশমুখিতা ছাড়া সবকিছুই অর্থহীন হয়ে পড়ে। অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মরুভূমি হয়ে পড়ে বর্তমান, ভবিষ্যত হয় কল্পনা-অযোগ্য। নিশ্চিতভাবেই ইহুদিরা প্রবাস জীবনকে দানবীয় ও ধ্বংসকরী হিসেবে দেখেছিল। উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, মর্মান্তিকভাবে দুর্ভোগের এই বোঝা এখন ইসরাইল রাষ্ট্র চাপিয়ে দিয়েছে ফিলিস্তিনিদের ওপর। বিস্ময়কর নয় যে ফিলিস্তিনিরা সবসময় টিকে থাকার জন্য তাদের নিজস্ব সংগ্রামে সবসময় দৃষ্টান্তমূলক আচরণ করেনি। তবে আবারো বলতে হয় যে এমন ফিলিস্তিনিও আছে যারা স্বীকার করে যে তাদের আবাসভূমির অন্তত কিছু অংশ ফেরত পেতে হলে আপস করাও প্রয়োজনীয় হতে পারে। অসলো চুক্তি নিয়ে তারা তাদের নিজস্ব কঠিন পথ পাড়ি দিয়েছে : একসময় যে ইসরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি প্রদান করা ছিল অসম্ভব স্বপ্ন, তারা

সেটাকেও আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নিয়েছে। প্রবাসে জায়ন পরিণত হয়েছিল ইহুদিদের জন্য পরিত্রাণ ও সমন্বয় সাধনের প্রতিকৃতিতে। বিস্ময়কর নয় যে আল-কুদসও ফিলিস্তিনিদের প্রবাসে তাদের জন্য আরো বেশি মূল্যবান বস্তুতে পরিণত হয়েছে। দুই জাতিই বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে এখন একই পবিত্র নগরীতে আবার সুস্থ হয়ে ওঠতে চায়।

পরিত্রাণের- সেক্যুলার বা ধর্মীয়- অর্থ অবশ্যই হতে হবে নগরীর স্রেফ মালিকানা না হয়ে আরো বড় কিছু। ভেতরের প্রবৃদ্ধি ও মুক্তির ব্যবস্থা থাকতেই হবে। জেরুসালেমের ইতিহাস একটি জিনিস শেখায় আমাদের তা হলো, কোনো কিছুই পরিবর্তন-অযোগ্য নয়। এর অধিবাসীরা কেবল তাদের নগরীকে বারবার ধ্বংসই হতে দেখেনি, তারা দৃশ্যত অপছন্দনীয় নানা পন্থাতে এটি নির্মিত হতেও দেখেছে। ইহুদিরা যখন তাদের পবিত্র নগরীর পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার কথা শুনেছে, প্রথমে হ্যাড্রিয়ানের ঠিকাদারদের হাতে এবং তার পর কনস্টানটাইনের হাতে, তাদের তখন নিশ্চিতভাবে মনে হয়েছিল, তারা আর কখনো তাদের নগরীতে ফিরতে পারবে না। মুসলিমরাও ক্রুসেডারদের হাতে তাদের প্রিয় হারামকে অপবিত্র হতে দেখেছে। ওই সময় ক্রুসেডারদেরকে অপ্রতিরোধ্য মনে হয়েছিল। এসব ভবনের সবই তথ্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। তবে চূড়ান্তভাবে ইট আর সুড়কিই শেষ নয়। মুসলিমদের নগরীটি ফিরে পাওয়ার কারণ হলো ক্রুসেডাররা ঘৃণা আর অসহিষ্ণুতার স্বপ্নে আটকা পড়ে গিয়েছিল। আমাদের নিজেদের আমলেই সকল প্রতিকূলতার বিপরীতে ইহুদিরা জায়নে ফিরে এসে জেরুসালেমকে ঘিরে তাদের নিজস্ব বাস্তবতা সৃষ্টি করেছে। তবে জেরুসালেমের দীর্ঘ, মর্মান্তিক ইতিহাস যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কোনো কিছুই স্থায়ী নয়, নিশ্চিত নয়।

বর্তমানের যুধ্যমান ধর্মের একটি উদাহরণ হলো হামাস সদস্যরা। এই উগ্র ইসলামি গ্রুপের সদস্যরা তীব্রভাবে ওসলো চুক্তির বিরোধিতা করেছে, লাঠি ও শেকল ঘুরিয়ে গাজার রাস্তায় মিছিল করেছে।

পরিশিষ্ট

এ বইটির প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬ সালের জানুয়ারিতে ছাপাখানায় যাওয়ার পর থেকে জেরুসালেম বিষয়াদির অস্থায়িত্ব ও দ্রুত পরিবর্তনশীলতা প্রতি বছরই নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। তখনো শান্তির আশা বেশ উচ্চ মাত্রায় ছিল। কিন্তু ১৯৯৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ওইসব আশা ভেঙে খান খান হয়ে যায় হেবরন গণহত্যার দ্বিতীয় বার্ষিকীতে। জেরুসালেম, অ্যাশকেলন ও তেল আবিবে একের পর এক আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৫৭ ইসরাইলি নিহত হয়। লেবাননের ইসরাইলি নিরাপত্তা জোনে ইসলামি গ্রুপ হিজবুল্লাহর হাতে ছয় ইসরাইলি সৈন্য নিহত হওয়ার পর ১১ এপ্রিল ইসরাইল বড় ধরনের পাল্টা আক্রমণ চালায়। 'অপারেশন গ্রাপস অব রেখ নামের এই অভিযানে ব্যাপক গোলাবর্ষণ করা হয়, ১৫ শ' বার বিমান হামলা চালানো হয়। এর ফলে ১৬০ জন লেবাননি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়।

এই গোলযোগপূর্ণ অঞ্চলে নতুন দফার বৈরিতা আবারো শান্তির ভঙ্গুরতা প্রদর্শন করে। সহিংসতা আরো বেশি সহিংসতার সৃষ্টি করে। অতীতের মতো এবারো ধর্মীয় চরমপন্থীরা শান্তির সব আশা ধ্বংস করে দেয়। ইসলামি জঙ্গিবাদে অবরুদ্ধ অনুভব করে অনেক ইসরাইলি শান্তি-প্রক্রিয়ার ওপর থেকে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। ১৯৯৬ সালের ২৯ মে সাধারণ নির্বাচনে লিকুদ দলের যুধ্যমান নেতা বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সামান্য ব্যবধানে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন। নেতানিয়াহু যৌক্তিকতার আলোকে অসলো চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি অনেক দিন ধরেই শান্তির বিনিময়ে আরবদের সাথে ভূমি বিনিময় করার লেবার পার্টির ইচ্ছার তীব্র সমালোচনা করে আসছিলেন। নতুন শাসনের অধীনে পশ্চিম তীর থেকে ইসরাইলি প্রত্যাহার বন্ধ হয়ে যায়, গাজা ও পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনকারীদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সেখানে নতুন আটটি বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। এর ফলে ২০০০ সাল নাগাদ এসব ভূখণ্ডে বসতি স্থাপনকারীর সংখ্যা এক লাখ ৩০ হাজার থেকে বেড়ে দাঁড়ায় পাঁচ লাখ। নেতানিয়াহু স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে জেরুসালেমের ব্যাপারে কোনো আপস করা হবে না। পবিত্র

নগরী চির দিনের জন্য ইসরাইলি রাজধানী থাকবে, এর সার্বভৌমত্ব ভাগাভাগি করা হবে না, ইসরাইল জেরুসালেমের কোনো এলাকার কোনো অংশ বা রাস্তা ত্যাগ করবে না।

নেতানিয়াহু খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি সুড়ঙ্গ চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে ২৩ সেপ্টেম্বর জেরুসালেমের পবিত্র স্থানটি নতুন ধরনের মর্মান্তিক সহিংসতায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। সুড়ঙ্গটি ওয়েস্টার্ন ওয়াল ও হারাম আল-শরিফ ঘেষে ভায়া দোলোরোসা পর্যন্ত গেছে। এটি পুরনো নগরীর মুসলিম কোয়ার্টারের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। শান্তি-প্রক্রিয়ায় স্থবিরতা ও আত্মঘাতী বোমা হামলার পর অধিকৃত ভূখণ্ডে কঠোর বিধিনিষেধের কারণে কঠিন অবস্থায় থাকা ফিলিস্তিনিদের কাছে এটি ছিল খুব বেশি মাত্রায় লঙ্ঘন। সাথে সাথেই গাজা ও পশ্চিম তীরে ১৯৬৭ সালে এসব ভূখণ্ড জয় করার পর থেকে যে ভয়াবহ ধরনের সহিংসতা চলছিল, তা হঠাৎ করে ছড়িয়ে পড়ে। ২৭ সেপ্টেম্বর আল-আকসা মসজিদে জুমার নামাজের সময় হারামে ইসরাইলি পুলিশের সাথে সংঘর্ষে তিন ফিলিস্তিনি নিহত ও ১২০ জন আহত হয়, ওয়েস্টার্ন ওয়ালে ফিলিস্তিনিদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে ইহুদি উপাসনাকারীরা। সবশেষে সহিংসতা প্রশমিত হয়। তবে ততক্ষণে ৭৫ জন নিহত ও ১৫ শ' লোক আহত হয়ে গেছে।

অনেক হতভম্ব পর্যবেক্ষকের কাছে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান চালুর ফলে এ ধরনের রক্তপাতের ঘটনা তাদের কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছে। তবে যারা জেরুসালেমের মর্মান্তিক ইতিহাস অবগত রয়েছেন, তাদের কাছে এটি ছিল দুঃখজনকভাবে পরিচিত ঘটনা। জেরুসালেমে প্রত্নতত্ত্ব কখনোই পুরোপুরি স্বাভাবিক কার্যক্রম হিসেবে বিরাজ করেনি। ৩২৫ সালে কনস্টানটাইনের বিশপ মাকারিয়সকে খ্রিস্টের সমাধি (আফ্রোদিতির পৌত্তলিক মন্দির ধ্বংস করে) খনন করার অনুমতি দেওয়ার পর থেকে প্রত্নতত্ত্ব প্রায়ই নগরীর পবিত্র ভূখণ্ডে দাবি উত্থাপনে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটি মালিকানা দাবি ও মালিকানা খারিজ করার সাথে সম্পৃক্ত একটি বিভাগ। আলোচিত সুড়ঙ্গটি খনন করেছিল ১৯৬৮ সালে ইসরাইলের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়। সেটি ছিল সদ্য জয় করা নগরীতে তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের অংশবিশেষ। ভায়া ডোলোরোসায় সুড়ঙ্গটির আরেকটি দরজা খোলা নিয়ে আগের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে প্রকল্পটি খুবই স্পর্শকাতর। ফলে

এটি বাস্তবায়ন করার মানে হবে খুবই বাধা সৃষ্টিকারী। অবশ্য নেতানিয়াহু তার নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের হুঁশিয়ারি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তার সরকারের জেরুসালেম প্রশ্নে কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য।

এটিও সত্য যে সুড়ঙ্গতে কিছু করার মানে খোদ হারামে অনুপ্রবেশ নয়। তবে রাজনৈতিক উত্তেজনার সময়, বিশেষ করে তারা তাদের পবিত্র স্থানগুলোর প্রতি হুমকি অনুভব করলে জেরুসালেমের লোকজন সবসময় যৌক্তিকভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না। খ্রিস্টপূর্ব ১৭০ সালে অ্যান্টিচুস ইপিফানিসের তাদের টেম্পলকে অবমাননা করার পর থেকে ইহুদি লোকজন নিশ্চিতভাবেই এই অবস্থার মধ্যে পড়েছে। পরে বেশির ভাগ ইহুদি রোমের শাসন মেনে নিয়েছিল, তবে টেম্পলের পবিত্রতার প্রতি হুমকি যদি না থাকে তবেই। পন্টিয়াস পিলেত বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন যখন তিনি উস্কানিমূলকভাবে অ্যান্টোনিয়া ফর্টেসে দণ্ড হাতে রোমান সম্রাটের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। জোসেফাস আমাদের বলেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইহুদিদের তাদের টেম্পলের পবিত্র রক্ষায় দৃশ্যত আত্মঘাতী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব প্রদর্শন করলে কঠোর রোমান গভর্নর দুঃখ ও কষ্ট পেয়েছিলেন।

এই গ্রন্থজুড়ে আমরা দেখেছি যে জেরুসালেম ও এর উপাসনালয়গুলো কেবল ঐশী সত্তার শক্তিশালী প্রতীকই নয়, সেইসাথে এগুলো উপাসনাকারীদেরকে তাদের গভীর সত্তার মুখোমুখি হওয়ার ব্যবস্থাও করে দেয়। অ্যান্টিচুস ইপিফানেস যখন দেভিরের ভেতরের পবিত্র স্থানে (ইহুদি বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্র ও সবচেয়ে স্পর্শকাতর স্থান) ঢুকে পড়েছিলেন, তখন তা ভয়াবহ ধরনের ঘটনা তথা ইহুদি জাতিকে ধর্ষণ করার সামিল বলে মনে হয়েছিল। ১৯৬৭ সাল থেকে ফিলিস্তিনিরা ক্রমবর্ধমান হারে ইহুদি চরমপন্থীদের ঘন ঘন হুমকিকে অবরুদ্ধ জাতীয় পরিচিতির প্রতীক হিসেবে দেখছে। সুড়ঙ্গটি উদ্বোধনের মাত্র দুই মাস আগে ইসরাইলি হাইকোর্ট ২৬ জুলাই আকসা মসজিদের পশ্চিম প্লাজায় প্রার্থনা আয়োজন করতে টেম্পল মাউন্ট ফেইথফুলের প্রায় এক শ সদস্যকে অনুমতি দেয়। ফেইথফুলের নেতা গারশোম সলোমন দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে ''অ-ইহুদি' উপস্থিতি অপসারণ ও ইহুদি টেম্পলের আবারো মাথা উঁচু না করা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।'৩৪ শত শত ফিলিস্তিনিও ওই প্রার্থনার দিনে আকসার দিকে মিছিল

করে যায়। ইসরাইলি পুলিশের কারণেই কেবল ওই দিন সঙ্ঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছিল। তারা হারাম থেকে ইহুদি বিক্ষোভকারীদের সরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। হারাম আল-শরিফকেন্দ্রিক এই তীব্রতর উত্তেজনাকর পরিবেশে ফিলিস্তিনিরা এই পবিত্র স্থানে আরেকটি হামলা হিসেবে ধরে নিয়ে সহজাত ক্ষোভ ও কষ্ট নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে, ঠিক যেভাবে দুই শ' বছর আগে ইহুদিরাও তাদের ঐশী স্থানের (তাদের এবং সেইসাথে ইহুদি আত্মার) ওপর বিদেশী শাসকদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত আশঙ্কায় প্রদর্শন করেছিল।

মধ্যপ্রাচ্য শান্তি-প্রক্রিয়ার ভবিষ্যত বা পবিত্র নগরীর ভবিষ্যত- কোনোটির ব্যাপারেই আশাবাদী হওয়া কঠিন। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যভাগে আমি এটি যখন লিখছি, তখন পশ্চিম তীরের বেথ-ইল বসতিতে দুই ইহুদি অধিবাসীকে হত্যা করে ফিলিস্তিনি চরমপন্থীরা। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জবাবে অধিকৃত ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন বাড়ানোর হুমকি দিয়েছেন, সেখানে বাড়ি তৈরি ও বসবাস করতে আগ্রহীদের আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। বসতি স্থাপনকারীদের খুনের ঘটনায় প্রচণ্ড নিন্দা জ্ঞাপন করে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাকে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর হামলার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা ও অসলো চুক্তির সুস্পষ্ট বরখেলাপ বলে অভিহিত করে। হামাস পুরো ফিলিস্তিন মুক্ত করার লক্ষ্যে আরো হত্যাকাণ্ড চালানোর হুমকি দিয়ে নতুন ইসরাইলি পদক্ষেপের জবাব দেয়। উভয় পক্ষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা শান্তি না জয় চায়। অসলোতে মনে হচ্ছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলিরা গ্রহণ করে নিয়েছিল যে স্থায়ী শান্তি অর্জন করতে হলে উভয় পক্ষকে আপস করতেই হবে। বর্তমানে মনে হচ্ছে, উভয় পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ লোক একতরফা বিজয়ের জন্য সহিংস পন্থার দিকে ঝুঁকেছে।

দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমদের জন্য মহাপ্রয়লিক আশাবাদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে জেরুসালেম। নবী ও স্বপ্নাবিভাবকারীরা হিন্নম উপত্যকায় এমন সহিংস যুদ্ধের কল্পনা করেছিলেন, যেখানে ঈশ্বরের লোকজন জয়ী হবে, তার শত্রুরা হয় পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কিংবা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। এসব মহাপ্রলয়িক কল্পনাবিলাসে জেরুসালেমকে সামগ্রিক বিজয় এনে দেওয়া পবিত্র যুদ্ধের

নগরী, সজ্ঘাতের স্থান হিসেবে দেখা হয়েছে। অথচ গোলযোগপূর্ণ বিশ শতকের ধারায় আমাদের কাছে এটিকে অবাস্তব বলে মনে হয়। তবে নবী ইসাইয়ার সহস্রাব্দ জেরুসালেম নিয়ে ভিন্ন স্বপ্নাবিভাব ছিল। তিনি এমন এক সময়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন যখন নেকড়ে ও ছাগলছানা, সিংহ ও মেষশাবক- আগে যারা একে অপরের প্রতি ভয়াবহ রকমের সহিংসছিল- ঈশ্বরের পবিত্র পর্বতে শান্তিতে একসাথে বাস করবে। কয়েক দশকের রক্তাক্ত বিরোধের পর ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনিরা যদি তাদের পবিত্র নগরীতে এ ধরনের সহাবস্থান অর্জন করতে পারে, তবে জায়ন সত্যিই সমগ্র বিশ্বের জন্য আশার বাতিঘর, তথা জাতিগুলোর দৃষ্টিশক্তিতে পরিণত হবে। এ বইটি লেখার সময় শান্তির সম্ভাবনা বিবর্ণ মনে হয়েছে। তবে জেরুসালেমের ইতিহাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে বিস্ময়কর বিপরীত ঘটনা সবসময়ই সম্ভব এবং এমনকি সর্বোচ্চ মাত্রার ঘৃণাসহ কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। অনেক ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনি, অনেক আরব ও ইহুদি হয়তো এখনো শান্তির আকাঙ্ক্ষা করে, শান্তি অর্জনের জন্য কোরবানি দিতে প্রস্তুত। এ কথা এখনো সত্য যে জেরুসালেমের দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে পেছনে ফিরে তাকালে দেখতে পাবো যে ওই সমাজগুলোই পবিত্র নগরীতে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে টিকে ছিল, যারা সাধারণভাবে কোনো না কোনো ধরনের সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের জন্য প্রস্তুত ছিল। সার্বভৌমত্ব ও পূর্ণ বিজয়ের জন্য নিষ্ফল ও প্রাণঘাতী সংগ্রাম নয়, বরং সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানই হতে হবে বর্তমানে জেরুসালেমের পবিত্রতা উদযাপনের একমাত্র পথ।